মানবাধিকার ভাষ্য

গাজী শামছুর রহমান

PLATE LXXVIII

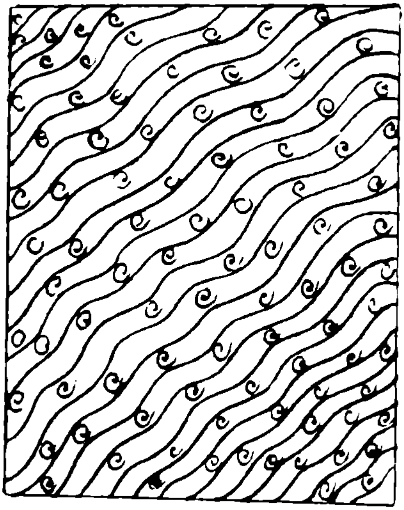

Fig. 1

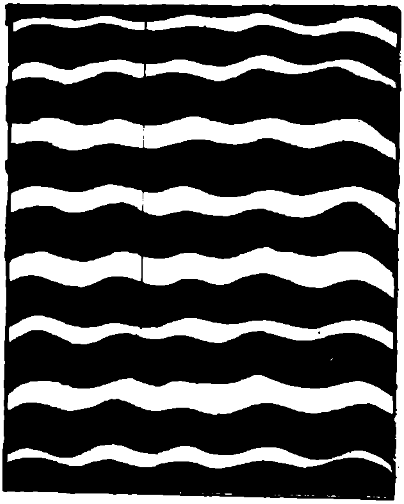

Fig 2

www.pathagar.com

www.pathagar.com

PLATE LXXIX

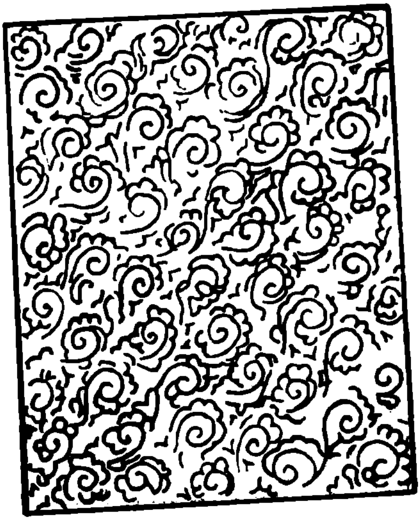

Fig. 1

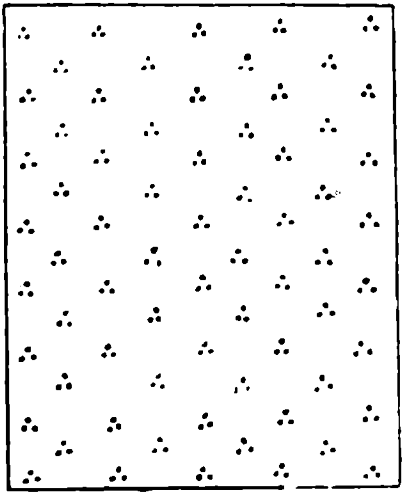

Fig. 2

www.pathagar.com

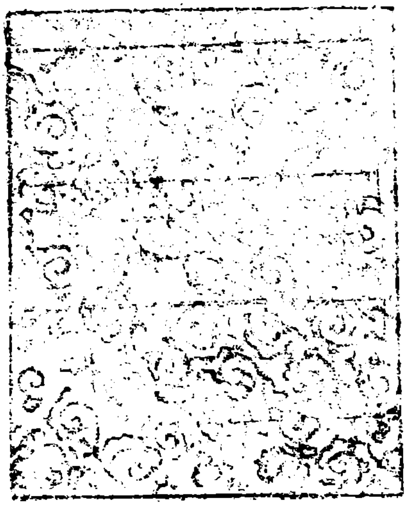

www.pathagar.com

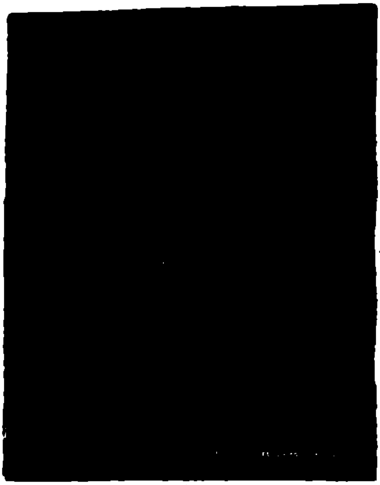

Fig 1

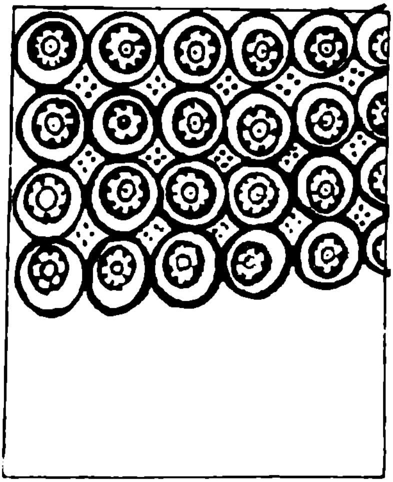

Fig. 2

www.pathagar.com

www.pathagar.com

PLATE LXXXI

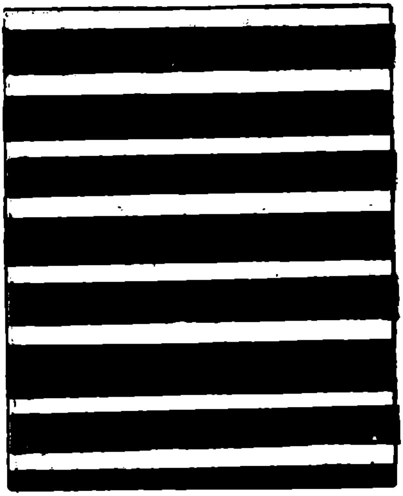

Fig. 1

www.pathagar.com

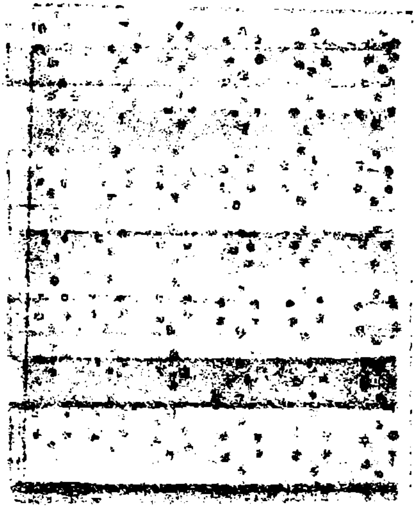

www.pathagar.com

PLATE LXXXII

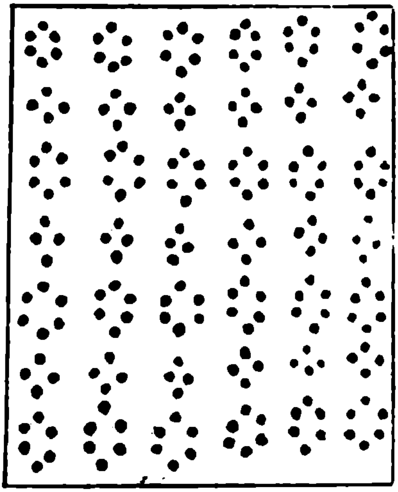

Fig. 1

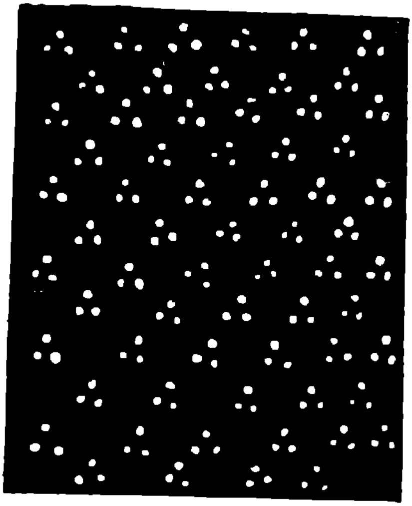

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মানবাধিকার ভাষ্য

[১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে প্যারিসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত এবং ঘোষিত মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ভাষ্য]

[A Commentary on the "Universal Declaration of Human Rights" adopted and proclaimed by General Assembly of the United Nations on 10 December 1948.]

গাজী শামছুর রহমান

বাংলা একাডেমী ঃ ঢাকা

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪০১
জুন ১৯৯৪

বাএ ৩০৫৬

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
সমাজবিজ্ঞান, আইন ও বাণিজ্য উপবিভাগ

প্রকাশক
গোলাম মঈনউদ্দিন
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রক
পুনর্মুদ্রণ প্রকল্প
বাংলা একাডেমী'র ব্যবস্থাধীনে
কাশবন মুদ্রায়ণ
১ ভিতরবাড়ি লেন, নবাবপুর, ঢাকা

প্রচ্ছদ
উৎপল দাস

মূল্য
তিনশত নব্বই টাকা মাত্র

MANOBADHIKAR BHASHYA (Commentary on Human Rights) by Ghazi Shamsur Rahman. Published by Gholam Moyenuddin, Director Text book Division, Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First Edition : June 1994. Price : Taka 390.00 only.

ISBN : 984-07-3065-7

www.pathagar.com

উৎসর্গ

হুমায়ূন আহমেদ

লোকে বলে, আমার লেখা কাজে লাগে ;
আমি বলি, তোমার লেখা ভাল লাগে।
লোকে বলে, আমার লেখা মূল্যবান ;
আমি বলি, তোমার লেখা অমূল্য।

গাজী শামছুর রহমান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

মানুষকে মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকতে হলে, যেসব অধিকার তার থাকা আবশ্যক, সেইসব অধিকারের নাম মানবাধিকার। মানুষের সম্ভাবনাকে পূর্ণভাবে বিকাশ হতে দেওয়ার জন্য, যেসব অধিকার তার থাকা আবশ্যক, সেইসব অধিকারের নামও মানবাধিকার। আন্তর্জাতিকভাবে যেসব অধিকারকে মানবাধিকার বলা হয়, নিজের দেশে সেগুলো মৌলিক অধিকার নামে চিহ্নিত করা হয়। আন্তর্জাতিক ঘোষণায় ১৯৪৮ সালে মানবাধিকার নীতিবদ্ধ হয় একটি প্রস্তাবনায় এবং ৩০টি অনুচ্ছেদে । এই অনুচ্ছেদগুলোতে প্রায় সকল অধিকার বাংলাদেশের সংবিধানে তৃতীয়ভাগে মৌলিক অধিকাররূপে বিধিবদ্ধ হয়েছে।

আমার দুর্ভাগ্য, যে সময়ে এবং যে পরিবেশে আমি জন্মেছিলাম এবং লালিত পালিত হয়েছিলাম এবং শিক্ষা লাভ করেছিলাম এবং সবশেষে কর্মজীবনে প্রবেশ করেছিলাম, সেই সময় এবং পরিবেশ মানবাধিকার বা মৌলিক অধিকারের অনুকূল ছিল না। অধিকারহীনতার পরিবেশে আমার জন্ম এবং বোধহয় এই অবস্থাতেই আমার জীবন শেষ হবে।

১৯২১ সালে আমার জন্ম তৎকালীন ভারতবর্ষের একটি প্রদেশে অর্থাৎ বঙ্গদেশে। বিশের দশকের সেই আদি থেকে চল্লিশের দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত আমার শিক্ষাজীবন বিস্তৃত। এই দীর্ঘকাল আমার জন্মভূমি ছিল ইংরেজের অধীন। ইংরেজরা তাদের নিজের দেশে মানবাধিকার সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন কিন্তু তাদের শোষিত উপনিবেশগুলোতে তারা স্বীকার করে নি কারো অধিকার। এই কালে তাই আমার পক্ষে মানবাধিকারের স্বাদ পাওয়া সম্ভব হয় নি।

বৃটিশ আমলেই আমি বিচারকরূপে কর্মজীবনে প্রবেশ করি। ১৯৪৭ সালে আমার দেশ স্বাধীন হয় বটে কিন্তু ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত এই স্বাধীন দেশের জন্য কোন সংবিধান রচিত হয় নি। ফলে এই সময়ের জন্য মানবাধিকার বা মৌলিক অধিকারের কোন দাবি আইন সমর্থিত ছিল না। ১৯৫৬ সালে একটি সংবিধান রচিত হয় বটে কিন্তু অত্যল্প কালের মধ্যেই অর্থাৎ ১৯৫৮ সালে সেই সংবিধানকে শেষ করে দেওয়া হয়। ১৯৬২ সালে একটি সংবিধান জারি হয় কিন্তু সেই সংবিধানে আমার জন্মভূমির স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয় নি। সেই স্বার্থ তথা অধিকার আদায়ের সংগ্রাম চলে এবং তারই পরিণতিতে বাংলাদেশ সার্বভৌম এবং স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে জন্ম লাভ করে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে সংবিধান প্রবর্তিত হয় এবং এই সংবিধানে মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিত হয়।

www.pathagar.com

সুতরাং ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত মৌলিক অধিকার সম্বলিত সংবিধান না থাকায় এবং ১৯৫৬ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত একটানা মৌলিক অধিকার সম্বলিত কোন সংবিধান না থাকায় এবং যেগুলো ছিল তাতেও বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষিত না হওয়ায় এই কালেও আমি মানবাধিকার বা মৌলিক অধিকারের স্বাদ পূর্ণভাবে পাই নি।

১৯৭২ সালে প্রায় সকল মানবাধিকার সদৃশ মৌলিক অধিকার সংবলিত একখানা মহান সংবিধান আমরা পাই। কিন্তু ১৯৭৫ সালে তাকে নিষ্ক্রিয় করা হয়। কিছুকাল পরে সংবিধানটি পুনরুজ্জীবিত হয় কিন্তু ১৯৮২ সালে তাকে স্থগিত করা হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, ১৯৭২ সালের পরেই আমরা মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিত কোন সংবিধানের বিরামহীন উপস্থিতি আমার বা এদেশের মানুষের ভাগ্যে জোটে নি।

বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র অঞ্চল। এই ক্ষুদ্র অঞ্চলের একটি ভাগকে অন্য ভাগ সম্পর্কে হীনমনোভাব পোষণ করতে দেখেছি। নোয়াখালির মানুষ বিশ্বাসযোগ্য নয়, সিলেটের মানুষ অভদ্র, বরিশালের মানুষ কুচক্রী এবং উত্তরবঙ্গের মানুষ মূর্খ, এই শ্রেণীর অমার্জনীয় অন্যায় উচ্চারণ পণ্ডিতজনের মুখে অহোরহ শুনেছি; কিছু কিছু ভ্রান্ত উদাহরণও তারা দিয়েছেন।

আমার নিজের একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। আমার জন্ম খুলনা জেলায়। আমি পড়েছি যশোরের একটি স্কুলে। যশোরের ছেলেরা প্রায়ই বলত, খুলনার ছেলেরা গণ্ডগোল পাকাতে ওস্তাদ। পরবর্তীতে আমি যখন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তাম তখন পশ্চিম বাংলার ছেলেরা বলত, পূর্ববাংলার ছেলেদের মাথায় গোবর। পরবর্তীতে আমি যখন আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম তখন পাঞ্জাবের ছেলেরা বলত, বাঙালিরা ভীরু ও কাপুরুষ।

এই যে ধারণা বা বোধ, তা মানবাধিকারের পরিপন্থী। দেশটি ছোট। অঞ্চলটি আরো ছোট, এরই মধ্যে একের পক্ষে অন্যের সম্পর্কে এই হীন ধারণা পোষণ নিতান্তই বিচারহীন অসাম্যবোধের পরিচায়ক।

বাংলাদেশের মানুষের মন মানসিকতায় কিছু বৈষম্যবোধ লক্ষ্য করেছি, যেগুলো কিঞ্চিৎ প্রশমিত হলেও এখনও বিদ্যমান। বাংলাদেশের হিন্দু সমাজে এখনও জাতিভেদ বিদ্যমান; ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের মধ্যে বিবাহের প্রচলন খুব বেশি নয়। ব্রাহ্মণ এখনও শূদ্রের তুলনায় নিজেকে উঁচু মনে করে।

মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা আগে জমিদার শ্রেণীভুক্ত ছিলেন তাঁরা জমিদারি হারিয়েছেন বটে, কিন্তু আভিজাত্যবোধ হারান নি। যাঁরা রায়ত শ্রেণীভুক্ত ছিলেন তাদের পরিবারের সঙ্গে জমিদার পরিবারের বিবাহের সম্পর্ক হওয়া খুব বিরল ঘটনা। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে এককালে খুব বড় বড় জোতদার ছিলেন; হাজার হাজার বিঘা জমি তাঁরা চাষাবাদ করতেন। তারা নিজেদেরকে উঁচু মনে করতেন।

www.pathagar.com

জমিদারি বা হাজার হাজার বিঘার জমির চাষাবাদ আজ আর নেই বটে, কিন্তু তাদের পারিবারিক কৌলীন্যবোধ ম্রিয়মাণ হলেও আজও অস্তিত্ববান।

পেশার কারণেও বাংলাদেশে বর্তমানেও দুটি শ্রেণী প্রায় অস্পৃশ্য।

প্রথম শ্রেণীতে আছে মেথর ও মুচি। এঁরা নির্দিষ্ট এলাকায় বাস করেন। এঁদের সঙ্গে সাধারণ মানুষ জ্ঞাতসারে একত্রে খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা করতে অস্বস্তিবোধ করে।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে আসে বারবণিতা বা দেহপোজীবিনী। তাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সামাজিক সংমিশ্রণ নেই বললেই চলে। শুনেছি এঁদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষাঙ্গনে গৃহীত হয় না।

মানবের স্তরে মানুষের মধ্যে সমতাবোধ জাগ্রত করা মানবাধিকার ঘোষণার মৌলিক লক্ষ্য, একদিনে এটি হবার নয়।

আমাদের দেশে, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতামতে, পরিবারের মধ্যে মানবাধিকারের চর্চা একেবারেই সীমিত। সাধারণভাবে আমাদের সমাজ পুরুষশাসিত এবং পিতৃতান্ত্রিক। এখানে মেয়েদের অধিকার সংকীর্ণ ও কুণ্ঠিত। কিছু কিছু পরিবার নারীশাসিত এবং মাতৃতান্ত্রিক। সেখানে আবার পুরুষের অধিকার নিয়ন্ত্রিত। পরিবারের মধ্যে অধিকার সচেতনতা না থাকায় বা দলিত হওয়ায় জীবনের অন্য ক্ষেত্রেও এর প্রতিফলন ঘটে।

সুতরাং যেমন ঘরের জীবনে তেমনি বাইরের জীবনে, আমাদের অধিকার-সচেতনতা নৈরাশ্যজনকভাবে কৃশ। অথচ এই অবস্থা চলতে দেয়া যায় না। অধিকার সম্পর্কে মানুষকে জাগ্রত করতে হবে। সেই জাগ্রত করার প্রথম পদক্ষেপ হবে মানবাধিকারের পরিচয় জানা। প্রাথমিক স্তরে এই জ্ঞান অপরিহার্য।

মানবাধিকার খুব সম্প্রতিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে স্থান পেয়েছে। এটি একটি কল্যাণমুখী পদক্ষেপ। ছাত্রবৃন্দ এবং দেশের মানুষ মানবাধিকার সম্পর্কে যাতে জ্ঞানলাভ করতে পারে, এই পুস্তক রচনার পিছনে আমার সেই অভিপ্রায় সর্বদাই সক্রিয়।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশে 'হইবে একটি গণতন্ত্র যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে।' এই অনুচ্ছেদটা সংবিধানের দ্বিতীয়ভাগে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি শীর্ষক পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের আশা-আকাঙ্ক্ষা এই পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু।

সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকারসমূহের বিধানগুলো পরিবেশিত হয়েছে। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার প্রতিটি অনুচ্ছেদ বিশ্লেষণের সময় সংবিধানের সদৃশ বিধান সংযোজন করা হয়েছে। তবুও আমি মনে করি সংবিধানে এই দুটো ভাগ একত্রে সন্নিবেশিত হওয়া প্রয়োজন। সেই কারণে এই ভাগদ্বয় পরিশিষ্ট-১-এ সংযোজন করা গেল।

www.pathagar.com

মানবাধিকার সম্পর্কে আমার ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা নিতান্তই সংকীর্ণ হলেও বিচারকরূপে আমার পেশাগত কর্তব্য সম্পাদনকালে আইনবিদ্যা ও অপরাধবিদ্যা এবং দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনের ভাষ্য রচনাকালে এবং সবশেষে বাংলাদেশের সংবিধানের উপর বৃহৎ একখানি গ্রন্থ রচনাকালে মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত অনেক বিষয়কে আমার চিন্তা-ভাবনা ও জ্ঞান-অবগতির মধ্যে আনতে হয়েছে। দেশ বিদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস এবং সবশেষে নিজের দেশের অবস্থা মনের মধ্যে নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। সেগুলোও স্বাভাবিকভাবে লেখার মধ্যে এসে যায়। কিন্তু এসব যথেষ্ট নয়।

এই গ্রন্থ রচনা করতে অনেক পুস্তকের সহায়তা নিয়েছি এবং কিছু কিছু অকুণ্ঠভাবে চয়ন করেছি। বইয়ের শেষে পরিশিষ্ট-২-এ গ্রন্থপঞ্জি শিরোনামে সেগুলোর সকৃতজ্ঞ উল্লেখ করেছি। পুনর্বার ঐসব পুস্তক ও লেখকের প্রতি আমার অপরিশোধনীয় স্বীকৃতি এবং সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

অধিকারের সাথে কর্তব্যও ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হলে মনকেও কর্তব্যের দিকে সজাগ থাকার নির্দেশ দিতে হয়। আমি আশা করবো বাংলাদেশের মানুষ ক্রমে ক্রমে অধিকারসচেতন ও কর্তব্যপরায়ণ হয়ে উঠবে।

গাজী শামছুর রহমান
জানুয়ারি ১৯৯৪

www.pathagar.com

উপক্রমণিকা

মানবাধিকার, আমার এই গ্রন্থের মূল বিষয়। মানবাধিকার শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে অর্থাৎ আরো সহজ করে বললে বলতে হবে 'মানবের অধিকার' বা মানুষের অধিকার। অতএব, মানুষ এবং অধিকার শব্দদ্বয় হচ্ছে মানবাধিকারের অন্তর্নিহিত বিষয়। শব্দ দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত। এ দুটি শব্দকে বিশ্লেষণ করলেই দুটি পৃথক গ্রন্থ হয়ে উঠবে। কিন্তু আমাদের এই স্বল্প পরিসরে সে অবকাশ নেই। এখানে আলোচ্য গ্রন্থের মূল আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে এ বিষয়ে কয়েকটি কথা বলে রাখছি যাতে পাঠক বিষয়টির গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও গভীরতা সহজে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন।

আসুন প্রথমেই চোখ বুলাই অধিকার শব্দটির উপর। লক্ষণীয় যে, আজকাল অধিকার শব্দের ব্যবহার হচ্ছে অত্যন্ত ব্যাপক। অবশ্য এক একজন শব্দটিকে এক একভাবে ব্যবহার করছেন।

বিদগ্ধ সমালোচক যখন তীর্যকভাবে ঘোষণা করেন যে, সুধীন দত্ত বা বিষ্ণুদের কবিতা বুঝতে হলে অনেক সাধনা করতে হয়, অনেক পরিশ্রম করতে হয়, তবেই তাদের কবিতা বোধ্য হবার অধিকার জাগে। এখানে অধিকার বলতে প্রজ্ঞা বা রস আস্বাদনের তীক্ষ্ণতা বোঝায়।

কোন শিল্পীর বিমূর্ত চিত্রকর্ম বা ধ্রুপদী গায়কের সুর বিস্তারে আনন্দ পেতে হলে এই দুই বিষয়ে দর্শক শ্রোতার গভীর জ্ঞান থাকতে হয়, নইলে সে বিষয়ে এদের অধিকার জন্মে না। এখানে অধিকার শব্দটি দ্বারা সুক্ষ্ম রুচিবোধের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

পীর সাহেব যে নির্দেশ দেন তা প্রায়শই মুরিদকূল মান্য করেন। পীর সাহেব মুরিদকে দিয়ে কিছু করিয়ে নেবার অধিকার রাখেন, যেমন অধিকার রাখেন ওস্তাদ সাগরেদের উপর, গুরু শিষ্যের উপর। এই করিয়ে নেবার ক্ষমতার নাম অধিকার। এখানে অধিকার বলতে এক ধরনের আধি-দৈহিক প্রভাব বোঝায়।

গ্রামবাংলায় আজো স্ত্রীরা তাদের স্বামীর নাম ধরে ডাকে না। এক কালে অধুনালুপ্ত জমিদারবাড়ির সামনে দিয়ে প্রজারা ছাতা মাথায় বা জুতা পায়ে যেতো না। স্ত্রীর উপর স্বামীর এবং প্রজার উপর জমিদারের এই অধিকার হচ্ছে ঐতিহ্যভিত্তিক। এক সময় গ্রামাঞ্চলে রবিবার ও বৃহস্পতিবারে কেউ বাঁশ কাটত না এবং অম্বুবাচির দিনে কৃষিক্ষেত্রে লাঙল দিত না, অনেকে আজো তেমন করে। এটি হচ্ছে সংস্কারের অধিকার।

www.pathagar.com

এ যাবৎ যেসব অধিকারের কথা বললাম এবং এ জাতীয় আরো কিছু অধিকার নৈতিক শ্রেণীভুক্ত। নৈতিক অধিকার বলতে এখানে সামাজিক, আধি-দৈহিক, ঐতিহ্যভিত্তিক, ঐতিহ্যাসিক এবং সামাজিক অধিকারকেও বোঝানো হচ্ছে।

কিন্তু মানবাধিকারে যে অধিকারের কথা বলা হচ্ছে সেটি শুধুমাত্র আইনগত অধিকার। যে অধিকারের ভিত্তি আইন। তাকেই আইনগত অধিকার বলা যায়। যেখানে আইন নেই সেখানে আইনগত অধিকারের কোন প্রশ্নই আসে না। আবার যে সব দেশে আইন আছে সেসব দেশেও আইনগত অধিকার যে একই রকম তা কিন্তু নয়। দেশে দেশে আইনের যেমন পার্থক্য আছে তেমনি পার্থক্য আছে আইনগত অধিকারেরও। আইনের পার্থক্য আইনগত অধিকারের পার্থক্যকেও চিহ্নিত করে।

কোন কোন ক্ষেত্রে অধিকারের প্রকৃতি যদিও বিভিন্ন রকম হতে পারে তথাপি কিছু কিছু অধিকার সকল দেশে সকল রকম মানুষের ক্ষেত্রবিশেষে অভিন্ন। যেমন দুজন মানুষের আঙুলের ছাপ মেলে না, এটা স্বাতন্ত্র্যের প্রতীক। আবার আঙ্গুলের ডগায় পিন ফোটালে সকলেই ব্যথা অনুভব করে, সকলের রক্তই লাল—এটা অভিন্নতার প্রতীক।

তবে অধিকার থাকা এবং তা বাস্তবায়িত হওয়া ভিন্ন বিষয়। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি বাংলাদেশের বহু জায়গায় আইনগত অধিকার থাকা সত্ত্বেও প্রতিনিয়তই তা ভঙ্গ হচ্ছে। বাংলাদেশের আইনানুসারে স্ত্রীর অধিকার আছে স্বামী কর্তৃক নির্যাতিত না হওয়ার, ভৃত্যের অধিকার আছে উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাওয়ার, পথিকের অধিকার আছে নিরাপদে পথ চলার, লেখক ও সাংবাদিকের অধিকার আছে লেখার বা না লেখার, নাগরিকের অধিকার আছে কাজ পাওয়ার—কিন্তু প্রতি প্রতিনিয়তই এসব অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। মানুষের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে, অথচ এই লঙ্ঘনের প্রতিকার নেই। যে রাষ্ট্রে মানুষের অধিকার বাস্তবায়নের জন্য আইন সর্বদাই সচল নয় সেই রাষ্ট্রে মানুষের অধিকার সত্যিই কি আছে?

বস্তুত তাত্ত্বিকভাবে অধিকার থাকা এক বিষয় আর বাস্তবে অধিকার যথার্থভাবে প্রতিফলিত হওয়া ভিন্ন বিষয়। তত্ত্বের সাথে বাস্তবের মিল না হলে পুথি পুস্তকে বর্ণিত অধিকার শুধুই বাগাড়ম্বর, অর্থহীন। মানবাধিকার হিসেবে যে সব অধিকার স্বীকৃত সেগুলো কার্যক্ষেত্রে প্রতিফলিত হওয়ার দাবি রাখে। বাস্তবে প্রতিফলিত না হলে এগুলোতে মানবজাতির কোনই কল্যাণ আসবে না।

যে সকল আইনগত অধিকারের মালিক মানুষ সেগুলোই মানবাধিকার। মানুষ যে মানবিক সত্তায় অতুলনীয় একথা উচ্চারিত হয়েছে যেমন বেদ পুরাণে তেমনি আল-কোরআনে উচ্চারিত হয়েছে। উচ্চারিত হয়েছে কবি কণ্ঠে কিংবা বাউলের গীতিতে। প্রাচীন বাংলার কবি চণ্ডিদাস বলেছেন, 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' প্রখ্যাত সফিস্ট দার্শনিক প্রোটাগোরাস বলেন, 'মানুষই সত্যের নিয়ামক। অনন্য নির্ভর সত্যের কোন অস্তিত্ব নেই।' সুতরাং মানুষ হচ্ছে অমৃতাস্য পুত্রাঃ, বা আশরাফুল মাখলুকাত বা সবার উপরে।

www.pathagar.com

মানবাধিকারের অভিব্যক্তিটি তুলনামূলকভাবে নতুন। দ্বিতীয়টি বিশ্বযুদ্ধ উত্তরকালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর এই অভিব্যক্তিটি ব্যাপক ব্যবহৃত হতে শুরু করে।

মানবাধিকার বলতে সেই অধিকার বোঝায় যা নিয়ে মানুষ জন্মায় এবং যা তাকে বিশিষ্টতা দেয় এবং যা হরণ করলে সে আর মানুষ থাকে না। মানুষ জন্মসূত্রেই চিন্তাশক্তি, উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং কথা বলার যোগ্যতা নিয়ে আসে। কোন রাষ্ট্র, সরকার বা সার্বভৌম শক্তি তাকে এসব প্রদান করে না। মানুষের জীবনটাও কোন রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের দান নয়। অতএব রাষ্ট্র, সরকার বা অন্য কোন শক্তি মানুষের এসব অধিকার কেড়ে নেয় তাহলে প্রকারান্তরে সে তার মনুষ্যত্বই কেড়ে নিল, হরণ করল তার মানবিক বৈশিষ্ট্য। এই অধিকারগুলো মানুষের অবিচ্ছেদ্য এবং অন্তর্নিহিত। এসব অধিকার থেকে মানুষকে পৃথক করা কোন উপায় নেই। অতএব মানবাধিকার বলতে সেই অধিকার বুঝায় যে অধিকার নিয়ে মানুষ জন্মায়। এবং যে অধিকার অর্জিত হলে মানুষ পূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারে। সৃষ্টির সেরা মানুষ, আর মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের শিখরে উঠতে দরকার মানবাধিকার। মানবাধিকার ছাড়া মানুষের পূর্ণতা আসে না, মানুষ পরিপূর্ণরূপে মানুষ হয়ে উঠতে পারে না।

ইউরোপীয় পুনর্জাগরণ তথা রেঁনেসার যুগ থেকেই মানবাধিকারের ধারণাটি মানব মনে দানা বাঁধতে শুরু করে। রেঁনেসার জোয়ারে অবগাহনকারী দার্শনিকগণই সর্বপ্রথম রাজশক্তি এবং ধর্মীয় শক্তির তথা উপাসানালয়ের একচ্ছত্র প্রাধান্যের পরিবর্তে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলতে শুরু করে। ১২১৫ সালের ম্যাগনাকার্টা, ১৬২৮ সালের পিটিশন অব রাইট ইত্যাদি মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাকে আইনগত স্বীকৃতি প্রদান করে। এসব দলিলেরও মূল কথা হচ্ছে, মানুষ এমন কিছু অধিকার নিয়ে জন্মায় যেগুলো অবিচ্ছেদ্য এবং যেগুলো কখনো পরিত্যাজ্য নয়। যেগুলো কেউ হরণ করতে পারে না।

সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের অভূতপূর্ব অগ্রগতি গোটা মানবসমাজকে এক অভূতপূর্ব আলোকিত যুগে নিয়ে আসে। গ্যালিলিও এবং নিউটনের আবিষ্কার, হব্‌সের বস্তুবাদ, দেকার্তের যুক্তিবাদ, স্পিনোজার সর্বেশ্বরবাদ, বেকন ও লকের অভিজ্ঞতাবাদ স্বভাবজ আইনের প্রতি মানুষকে উদ্দীপ্ত করে। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ দার্শনিক লক এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি দার্শনিক মন্টেস্কু, ভলতেয়ার, রুশো প্রমুখের লেখায় একা জোর দিয়ে উল্লেখ করা হয় যে, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগেই মানুষ যে সব অধিকার স্বভাবতই অর্জন করছে রাষ্ট্র সেগুলো কেড়ে নিতে পারে না। তাদের মতে, জীবনের অধিকার, স্বৈরাচারি শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা অধিকার, সম্পত্তির অধিকার ইত্যাদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগেও ছিল। Social Contract বা সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে মানুষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে এবং রাষ্ট্রকে নির্দেশ দেয় এইসব অধিকার রূপায়নের। সুতরাং বলা যায় যে, মানুষ রাষ্ট্রের কাছে তাদের অধিকারগুলো সমর্পণ করে নি বরং সেগুলো আমানত রেখেছে মাত্র। তারা বলেন, রাষ্ট্র কখনো মানুষের স্বভাবজ অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারে না। কারণ মানুষ জন্মেছে বিবেক আর যুক্তি নিয়ে এবং যা

www.pathagar.com

কিছু যুক্তি ও বিবেকের বিরুদ্ধে তা মানবতারই বিরুদ্ধে। বস্তুত স্বৈরাচারী রাষ্ট্রতন্ত্রের বিরুদ্ধে মানবতার যে আহ্বান তাই হচ্ছে মানবাধিকারের ভিত্তি।

ক্রমে মানবাধিকারের ধারণা দৃঢ়তা লাভ করে। দাসত্বের এবং দাস ব্যবসার মতো অমানবিক প্রথা নিষিদ্ধ হয়, কারখানা আইন প্রবর্তনের মাধমে শ্রমিকের মজুরি এবং কাজের সময়সীমা নির্ধারিত হয়, ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার অধিকার স্বীকৃতি লাভ করে, সর্বজনীন ভোটাধিকারের নীতি গৃহিত হয়। এসবই মানুষের স্বভাবজ অধিকার তথা মানবাধিকারের দাবির পরিণতি।

১৯৯৩ সালের জুন মাসে অস্ট্রিয়ার রাজধানি ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল মানবাধিকার সংক্রান্ত বিশ্বসম্মেলন। প্রায় সিকি শতাব্দী পর এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। ইতোপূর্বে ষাটের দশকে ইরানের রাজধানি তেহরানে এ জাতীয় একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমানে সারা বিশ্বে মানবাধিকার এক নন্দিত বিষয়। মানবাধিকারে উল্লেখিত অধিকারগুলো প্রকৃতিগতভাবে এমন যে রাষ্ট্র, গোষ্ঠী বা ব্যক্তি এসব অস্বীকার করতে পারে না। বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকারের বিষয়টি এতই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে যে, যারা এই অধিকার লঙ্ঘন করছেন, যারা মানুষের স্বাধীনতা হরণ করছে তারাও প্রকাশ্যে তা স্বীকার করছে না। তারা বরং তাদের অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মানবাধিকারের বক্তব্যকে ভুল বা বিকৃত ব্যাখ্যা করছে। বস্তুত অধিকার ও স্বাধীনতা হরণকারীরাও এই কাজটাকে যথার্থ যুক্তিসঙ্গত কাজ বলে মনে করে না আর মনে করলেও তা বলতে সাহস পায় না। বর্তমান বিশ্ব রাজনীতিতে 'মানবাধিকার' একটি বহুল আলোচিত শব্দ এবং সন্দেহ নেই যে, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

মানবাধিকার ও এর পরিধি

মানবাধিকার বলতে কি বোঝায়, এর পরিধি কতটুকু বিস্তৃত তা যদি আমরা পর্যলোচনা করি তাহলে দেখতে পাব যে, প্রথমত, মানবাধিকার এমন কিছু অধিকারকে নির্দেশ করে যা শুধু মানুষের, পশুপাখি বা গাছপালার নয়। দ্বিতীয়ত, মানবাধিকার হচ্ছে সকলের অধিকার, কোন শ্রেণী বা দলের নয়। তৃতীয়ত, মানবাধিকার সকল মানুষের সমানভাবে প্রাপ্য, কারো কম বা কারো বেশি নয়। চতুর্থত, মানবাধিকার কোন বিশেষ মর্যাদা বা সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল নয়। পঞ্চমত, মানবাধিকার হচ্ছে এমন অধিকার যা আদায়যোগ্য। ষষ্ঠত, মানবাধিকার সমগ্র বিশ্বের সর্বস্থানে, সর্বকালের সকল মানুষের প্রাপ্য। সপ্তমত, মানবাধিকার কেউ কাউকে দেয় না এবং এর প্রাপ্তি কারো কৃপার উপর নির্ভরশীল নয় ; মানুষ যেহেতু মানুষ সেহেতু সে এসব অধিকার লাভ করে।

মানবাধিকার ঃ মানুষের অধিকার

যে অধিকার একান্তভাবেই মানুষের, প্রথমত, তাকেই মানবাধিকার বলে। পশুপাখির প্রাণ আছে তাই তারা প্রাণী, মানুষের প্রাণ আছে, তাই মানুষও প্রাণী। প্রাণীর এই দুই শ্রেণীর মধ্যে

www.pathagar.com

নিশ্চয়ই তফাৎ আছে। পশুপাখি যা পারে না মানুষ তা পারে। মানুষের এই বিশেষ ক্ষমতাই তার বিশেষ অধিকার।

মানুষ চিন্তা করতে পারে, উদ্ভাবন করতে পারে। চিন্তা ও উদ্ভাবনের এই ক্ষমতা মানুষকে পশুপাখি থেকে পৃথক করেছে। এই শক্তি বা ক্ষমতা নিয়েই মানুষ জন্মেছে। এই শক্তির ব্যবহারের অধিকারই মানবাধিকার। অকারণে এই অধিকার খর্ব করা যায় না। খর্ব করলে বা নষ্ট করলে তাকে মানবাধিকারের উপর আঘাত বলে মনে হয়। কোন সমাজপতি, রাষ্ট্রপতি বা ধর্মপতি যদি মনে করেন উচ্চতর মেধা ও প্রতিভার কারণে তারাই শুধু চিন্তা ও উদ্ভাবনী শক্তির ধারক হতে পারেন তাহলে মানবাধিকারের দৃষ্টিতে সেটা অন্যায় দাবি বলে বিবেচিত হবে।

মানুষ কথা বলতে পারে কিন্তু পশুপাখি কথা বলতে পারে না। কাকের কা কা ধ্বনি, কোকিলের কুহু কুহু রব, অশ্বের হ্রেষা এবং হস্তির বৃংহিত তাদের নিজেদের ধ্বনি উচ্চারণের সীমা। মানুষ অনর্গল কথা বলতে পারে, নতুন ধ্বনি দিয়ে নতুন কথা সৃষ্টি করতে পারে আবার সুর , তাল, লয় দিয়ে কথাকে সঙ্গীতের রূপ দিতে পারে। এই যে ক্ষমতা এটি মানবকি ক্ষমতা এবং এর ব্যবহারের অধিকার মানবাধিকার। কেউ যদি মানুষের মুখের ভাষা কেড়ে নিতে চায় বা কেড়ে নেয় তাহলে সে মানুষের মানবাধিকার হরণ করে।

গাছপালারও প্রাণ আছে , তাই গাছপালা প্রাণী। অবশ্য এরা উদ্ভিদ নামে পরিচিত। গাছপালা চলাফেরা করতে পারে না। মানুষ পারে। চলাফেরার এই অধিকারও একান্তই মানুষের অধিকার। চলাফেরার অধিকার হরণ করাও মানবাধিকার হরণ করারই নামান্তর।

মানবাধিকারের প্রবক্তাগণ বলেন, মানুষের এসব অধিকারের ক্ষেত্রে তাঁকে বাধাহীন হতে হবে। এসব ক্ষেত্রে মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা থাকতে হবে। চিন্তা, ভাবপ্রকাশ, চলাফেরা, কথা বলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে মানুষের স্বাধীনতা থাকার মানবাধিকার। অকারণে এসব ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করা মানবাধিকারের পরিপন্থি।

মানুষ কি সত্যিই অবাধ এবং স্বাধীন? অবাধ স্বাধীনতা কি কল্যাণকর? মানুষের স্বাধীনতার সীমা কতটুকু? এসব বিষয়ে দার্শনিকদের মধ্যে বিস্তর মতপার্থক্য আছে। সে যাই হোক, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা মানুষের চিরন্তন। বংশের প্রভাব, পরিবেশের প্রতিক্রিয়া সদাসর্বদা মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করছে সত্য কিন্তু মানুষ এমন একটি জীব যে সকল নিয়ন্ত্রণকে উপেক্ষা করে তার নিজের ভাগ্যকে নির্মাণের প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। মানুষ ভাগ্যের হাতে ক্রীড়নক নয়, সে ভাগ্যের নির্মাতা।

মানবাধিকার : সকলের অধিকার

মানবাধিকার হচ্ছে সকল মানুষের অধিকার, প্রত্যেক মানুষের অধিকার ; এ অধিকার কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, শ্রেণী বা দেশের অধিকার নয়। সকল মানুষ অভিন্ন নয়, বরং প্রত্যেক মানুষই

www.pathagar.com

স্বতন্ত্র, কিন্তু জীবনের বৃহৎ এলাকায় সকল মানুষ অভিন্ন, এক। এই অভিন্ন এলাকায় যে কোন ধরনের বৈষম্য মানবাধিকারের পরিপন্থী। সুতরাং ইউরোপীয়দের অধিকার এক আর এশিয়ানদের অধিকার অন্য। এরূপ অধিকার মানবাধিকারের মধ্যে পড়ে না।

যে সব পার্থক্য প্রকৃতি প্রদত্ত, সে সকল বৈষম্য বা পার্থক্য সাধারণত অপরিবর্তনীয় এবং সে কারণে সে সব পার্থক্য থেকে উদ্ভূত অধিকার ভিন্ন হতে বাধ্য। মরু অঞ্চলের মানুষের চাহিদার সাথে মেরু অঞ্চলের মানুষের চাহিদার মিল হবে না। এই পার্থক্য স্বাভাবিক—এটাকে বৈষম্য বলা যায় না।

যে সব বৈষম্য মানুষের সৃষ্টি, যেমন—ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, জন্মস্থান, নারী-পুরুষ, সেগুলোর কারণে মানুষের অধিকারে কোন পার্থক্য হওয়া উচিত নয়। হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, জমিদার-প্রজা, শিল্পপতি-শ্রমিক, ধনী-দরিদ্র—এসব বিভাজনের কারণে মানুষের অধিকারে তারতম্য করা বা হেরফের করা মানবাধিকারের পরিপন্থি।

শক্তির নানারকম উৎস আছে। পীর, পুরোহিত, পাদ্রী, ভিক্ষু শক্তি লাভ করেন ধর্ম থেকে, অর্থ থেকে শক্তি লাভ করেন শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, জমিদারগণ ; সরকারি পদস্থ কর্মকর্তা কর্মচারীর শক্তি পান পদ থেকে ; রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী, এম.পি প্রমুখ শক্তি লাভ করেন রাজনীতি থেকে ; চিকিৎসক, আইনজীবী, অধ্যাপক শক্তি পান তাদের শিক্ষা ও দক্ষতা থেকে। শক্তির কারণে তাদের আচার ব্যবহারে পার্থক্য হতে পারে ; এই জাতীয় বৈষম্য মানবাধিকারের পরিপন্থি। মানবাধিকারে বর্ণিত অধিকার প্রতিটি মানুষের। কোন কারণে কোন অজুহাতে এই অধিকার থেকে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, ধর্ম বা বর্ণের মানুষকে বঞ্চিত করা যাবে না।

মানবাধিকার ঃ সকলের সমান প্রাপ্য

মানবাধিকারের ধারণার মধ্যে আছে সকল মানুষের সমানভাবে প্রাপ্যতা। মানবাধিকার যেমন সকল মানুষের অধিকার তেমনি এই অধিকার সকলের সমানভাবে প্রাপ্য। রাজা-বাদশা, গুরু-পুরোহিত, ইমাম, শিল্পপতি প্রমুখের অধিকার যতটুকু সাধারণ চাষী, মজুর, দরিদ্র বেকারেরও ঠিক ততটুকুই অধিকার। চুরি করলে জমিদার তনয়া শুধু ধমক খেয়ে ছাড়া পাবে আর দরিদ্র চাষীর মেয়ের হাত কাটা যাবে, জেল হবে—এমন অবস্থা মানবাধিকারের পরিপন্থি। অবশ্য মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত স্তর বিন্যাস যা প্রকৃতির অথবা মানুষের সৃষ্টি সেই স্তর বিভাজনকে অস্বীকরা করা হয় না।

মানবাধিকার ঃ বিশেষ মর্যাদানির্ভর নয়

বিশেষ মর্যাদার কারণে মানবাধিকারের ঘোষণা মানুষের মধ্যে ইতর বিশেষ করে না। জীবন ধারণের অধিকার, জীবনভোগের অধিকার, আহারের অধিকার, বিশ্রামের অধিকার, আশ্রয়ের

www.pathagar.com

অধিকার, নিরাপত্তার অধিকার, বিচারের অধিকার, ভাবপ্রকাশের অধিকার, চলাফেরার অধিকার, সমাবেশের অধিকার—এসব অধিকার মানুষ মাত্রেরই প্রাপ্য। বিশেষ মর্যাদার কারণে এসব অধিকারের উদ্ভব হয় না।

মানবাধিকার ঃ আদায়যোগ্য

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় বর্ণিত অধিকারসমূহ হচ্ছে এমন যেগুলো আদায়যোগ্য। মানবাধিকার হচ্ছে এমন অধিকার যেগুলো বিমূর্ত এবং অবাস্তব কিছু নয়। মানুষের বাস্তব জীবনের সাথে এসব অধিকারের যোগ, মানবজীবন থেকে এসবকে বিচ্ছিন্ন করার কোন উপায় নেই। মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে, মানুষের মতো বেঁচে থাকতে হলে এসব অধিকার আদায় করতেই হবে। এবং এগুলো আদায়ের অযোগ্য বা অসম্ভব কিছু নয়।

মানবাধিকার ঃ সর্বজনীন

স্থান, কাল, পাত্রভেদে যে সব অধিকারে তারতম্য হয় না সে সব অধিকারই মানবাধিকার। সময়ের চাকা ঘুরতে থাকবে, সভ্যতার বিকাশ হবে, চলতে থাকবে মানব জীবন, সমাজ পরিবর্তন হবে, ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে মানুষের জীবন জীবিকার পার্থক্য হবে কিন্তু পরিবর্তন হবে না মানবাধিকার। মানবাধিকার হচ্ছে এমন কতগুলো অধিকার যেগুলো সকল স্থানের, সকল সময়ের সকল মানুষের আর সেজন্যই এই অধিকারগুলোকে বলা হয় সর্বজনীন। এই অধিকারগুলো শাশ্বত এবং চিরন্তন।

মানবাধিকার ঃ করুণা নয়, অপরিহার্য

মানবাধিকার সম্পর্কে সর্বশেষ কথা হচ্ছে এই যে, এগুলো কেউ কাউকে দান করে না। কারো কৃপা বা করুণার উপর এগুলোর প্রাপ্তি নির্ভরশীল নয়। মানুষ মানুষ হিসেবে জন্মেছে বলেই এসব অধিকার তার প্রাপ্য হয়েছে। মানুষের জীবন মৃত্যু যেমন মানুষ থেকে অবিচ্ছেদ্য তেমনি এই অধিকারগুলো অপরিহার্য এবং অবিচ্ছেদ্য।

বিশ্ব্যাপী মানবাধিকারের চেতনা জাগ্রত হচ্ছে ; সক্রিয় হচ্ছে মানুষ মানবাধিকার রক্ষায়। দেশে দেশে এখন গড়ে উঠছে মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা, মানবাধিকার সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন কমিশন ও কমিটি। ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী রাষ্ট্র মানবাধিকারের বিষয়ে এখন সদা জাগ্রত। মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে তাই বিশ্ববিবেক সোচ্চার হয়ে ওঠে। বর্তমানে তাই ছাত্র–

www.pathagar.com

শিক্ষক, সাংবাদিক, রাজনীতিক, গবেষক, বিচারক, সরকার তথা সর্বস্তরের মানুষের জন্যই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্ব উপলব্ধি করেই বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি এই গ্রন্থে। মানুষের অধিকার সংরক্ষণে এই গ্রন্থখানি সামান্যতম কাজে আসলেও আমার শ্রম স্বার্থক মনে করবো। সকলের মনে মানবিক বোধ জাগ্রত হোক এই প্রত্যাশায় গ্রন্থখানি পাঠকের হাতে তুলে দিলাম।

গাজী শামছুর রহমান

www.pathagar.com

সূচিপত্র

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র ১—২০

প্রস্তাবনা ১; সাধারণ পরিষদ ২; ভাষ্য ৩; স্বাধীনতা; ৪ ন্যায়বিচার ৬; বিশ্বশান্তি ৬; প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১১; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৪; আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ১৮।

অনুচ্ছেদ ঃ ১ ২১—৩৭

ভাষ্য ২১; মানুষের ক্রমবিকাশ ২২; মানব স্বাধীনতা ২৪; স্বাধীনতাহীনতা ২৫; স্বাধীনতা আন্দোলন ২৬; সমমর্যাদা ২৭; সমঅধিকার ২৯; বিচারবুদ্ধি ও বিবেক ৩০; ভ্রাতৃত্ব ৩২; ইসলাম ও এই অনুচ্ছেদ ৩২; এই অনুচ্ছেদ ও বাংলাদেশের সংবিধান ৩৫; সারসংক্ষেপ ৩৬।

অনুচ্ছেদ ঃ ২ ৩৮—১১৩

ভাষ্য ৩৯; মানবাধিকারসমূহ ৪০; গোষ্ঠীগত পার্থক্য বা বৈষম্য ৪৩; বর্ণবৈষম্য ৪৫; নারী-পুরুষ বৈষম্য ৪৭; ভাষাভিত্তিক বৈষম্য ৫৩; ধর্মীয় কারণে বৈষম্য ৫৫; রাজনৈতিক কারণে বৈষম্য ৫৬; জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তিগত বৈষম্য ৫৮; সম্পত্তিগত বৈষম্য ৫৯; দেশসমূহের মর্যাদাগত পার্থক্য ৬২; এই অনুচ্ছেদ ও অন্যান্য অনুচ্ছেদ ৬৫; ইসলাম ও বৈষম্যহীনতা ৬৭; এই অনুচ্ছেদ ও বাংলাদেশের সংবিধান ৬৯; ব্যাখ্যা—প্রথম দফা ৭০; বৈষম্য ৭০; ধর্ম ৭০; গোষ্ঠী ৭১; বর্ণ ৭১; নারীপুরুষ ভেদ ৭১; জন্মস্থান ৭২; দ্বিতীয় দফা ৭২; তৃতীয় দফা ৭৩; জনসাধারণের বিনোদন স্থান ৭৪; জনসাধারণের বিশ্রাম স্থান ৭৪; শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৭৪; চতুর্থ দফা ৭৪; নারী ৭৫; শিশু ৭৫; সাধারণ আলোচনা ৭৬; ব্যাখ্যা—প্রথম দফা ৭৯; দ্বিতীয় দফা ৮০; তৃতীয় দফা ৮১; সাধারণ আলোচনা ৮২; নারীর অধিকার ৮৬; এই অনুচ্ছেদ ও নজির ৯০; লিঙ্গভেদ প্রসঙ্গ ৯১; এই অনুচ্ছেদ ও অন্যান্য সংবিধান ৯২; সকল প্রকার জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন ৯৪; পটভূমি ৯৪; সাধারণ পরিষদ ৯৫ ক্রোড়পত্র ৯৬; প্রথম ভাগ ৯৭; দ্বিতীয় ভাগ ১০২; সাধারণ পরিষদ ১০৯; তৃতীয় ভাগ ১১০; সারসংক্ষেপ ১১২।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ১১৪—১৩৯

ভাষ্য ১১৪; জীবনের অধিকার ১১৪; স্বাধীনতার অধিকার ১১৫; ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার ১১৬; এই অনুচ্ছেদ ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ১১৬; বাংলাদেশে মৃত্যুদণ্ড ১১৭; জীবনের নিরাপত্তা ১১৮; বঞ্চনা ১১৯;

www.pathagar.com

মানবদেহ সংক্রান্ত অপরাধসমূহ ১২০ ; দন্ডার্হ নরহত্যা খুন ১২০ ; আত্মহত্যায় সহায়তাকরণ সম্পর্কে দুইটি বিধান ১২৩ ; অবৈধ বাধা ১২৬ ; অবৈধ অবরোধ ১২৭ ; বলপ্রয়োগ ১২৭ ; অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ ১২৮ ; আক্রমণ ১২৮ ; আক্রমণ ও মারামারির মধ্যকার পার্থক্য ১২৯ ; অন্যান্য দেশের সংবিধান ১২৯ ; মানবিক অধিকার সংক্রান্ত ইউরোপীয় কনভেনশন ১৩০ ; জীবন স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা : বর্তমান পরিস্থিতি ১৩২ ; এই অনুচ্ছেদ ও ইসলাম ১৩৬ ; সারসংক্ষেপ ১৩৮।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪ ১৪০—১৪৯

ভাষ্য ১৪০ ; দাস ১৪০ ; দাস প্রথার উদ্ভব ১৪২ ; দাসপ্রথা অমানবিক কেন ১৪৪ ; দাসপ্রথা ও বর্তমান বিশ্ব ১৪৫ ; এই অনুচ্ছেদ ও ইসলাম ১৪৬ ; এই অনুচ্ছেদ ও বাংলাদেশের আইন ১৪৮ ; সারসংক্ষেপ ১৪৯।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫ ১৫০—১৬৫

ভাষ্য ১৫০ ; নিপীড়ন ১৫১ ; নারীর নিপীড়ন, নারী নির্যাতন ১৫৫ ; মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতন ১৫৬ ; নিষ্ঠুর আচরণ ১৫৭ ; সভ্য সমাজের কিছু রাজনৈতিক নিষ্ঠুরতার উদাহরণ ১৫৮ ; অমানবিক আচরণ ১৬০ ; মানহানিকর আচরণ ১৬১ ; নিষ্ঠুর, অমানবিক ও অপমানজনক শাস্তির শিকার ১৬২ ; আলোচ্য অনুচ্ছেদ ও ইসলাম ১৬৩ ; সারসংক্ষেপ ১৬৪।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ১৬৬—১৭৪

ভাষ্য ১৬৬ ;ব্যক্তির পরিচয় ১৬৬ ; ব্যক্তির ব্যাপ্তি ১৬৭ ; ব্যক্তি হিসাবে স্বীকৃতির অধিকার ১৬৯ ; ব্যক্তি হিসাবে স্বীকৃতির ইতিহাস ১৭০ ; আইনের সপক্ষে ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি ১৭৩ ; সারসংক্ষেপ ১৭৩।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ১৭৫—১৮৩

ভাষ্য ১৭৫ ; আইন ১৭৫ ; আইনের শাসন ১৭৭ ; আইনের শাসনের প্রয়োজনীয়তা ১৭৯ ; বৈষম্য ও বৈষম্যের উস্কানির বিরুদ্ধে রক্ষা কবচ ১৮০ ; এই অনুচ্ছেদ ও ইসলাম ১৮০ ; এই অনুচ্ছেদ ও বাংলাদেশের সংবিধান ১৮১ ; এই অনুচ্ছেদ ও অন্যান্য সংবিধান ১৮২ ; সারসংক্ষেপ ১৮২।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮ ১৮৪—২০৪

ভাষ্য ১৮৪ ; মৌলিক অধিকার ১৮৪ ; কোন্ কোন্ অধিকার মৌলিক ১৮৬ ; এই অনুচ্ছেদ ও অন্যান্য সংবিধান ১৮৮ ; হেবিয়াস কর্পাসজাতীয় নির্দেশদানের ক্ষমতা ১৮৯ ; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বিধৃত মৌলিক অধিকারসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১৯০ ; সরকারি নিয়োগ লাভের সুযোগের সমতার দাবিও একটা মৌলিক অধিকার ১৯২ ; পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা ১৯৮ ; বাধানিষেধের আলোচনা ১৯৮ ; ধর্মীয় স্বাধীনতা ১৯৯ ; সম্পত্তি বিষয়ে অধিকার ২০০ ; নিবর্তনমূলক আটক ২০২ ; সারসংক্ষেপ ২০৩।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ ঃ ৯ ২০৫—২২২

ভাষ্য ২০৫ ; গ্রেফতার ২০৫ ; আটক ২০৬ ; নির্বাসন ২০৭ ; খেয়াল খুশিমত গ্রেফতার, আটক ও নির্বাসন ২০৭ ; আলোচ্য অনুচ্ছেদ ও ইসলাম ২১১ ; আলোচ্য অনুচ্ছেদ ও বাংলাদেশের সংবিধান ২১২ ; ব্যাখ্যা ২১৩ ; জরুরি অবস্থায় এই অধিকার২১৪ ; জরুরি অবস্থা ঘোষণা ২১৪ ; বিশেষ ক্ষমতা আইন—১৯৭৪ ২১৫ ; এই অনুচ্ছেদ ও অন্যান্য সংবিধান ২১৭ ; মানবাধিকার সংক্রান্ত ইউরোপীয় কনভেনশন ২২০ ; অভিযোগবিহীন আটক ২২১ ; সারসংক্ষেপ ২২২।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০ ২২৩—২৩২

ভাষ্য ২২৩ ; অপরাধমূলক অভিযোগ ২২৪ ; পূর্ণ সমতা ২২৭ ; ন্যায্য ও প্রকাশ্য শুনানি ২৩১ ; সারসংক্ষেপ ২৩১।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১ ২৩৩—২৮০

ভাষ্য ২৩৪ ; আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ ২৩৪ ; প্রকাশ্য আদালতে ২৩৮ ; বাংলাদেশের আদালত ২৩৮ ; আইন অনুযায়ী ২৪৩ ; উপঅনুচ্ছেদ-খ ২৪৫ ; বাংলাদেশের বিচার বিভাগ ২৪৮ ; নজির ২৪৯ ; সংশোধন—আদিরূপ ২৫০-৫৬ ; বর্তমান সংশোধন—পূর্বরূপ ২৫৭ ; নজির ২৫৯ ; মার্শাল ল কোর্ট ২৬১ ; নজির ২৬৩ ; আপিল বিভাগে আপিল ২৬৪ ; অষ্টম সংশোধনের পূর্বের আদিরূপ ২৬৬ ; নজির ২৬৭ ; সাধারণ আলোচনা ২৬৭ ; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-অধঃস্তন আদালত ২৭৪ ; এই অনুচ্ছেদ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তি ২৭৭ ; সারসংক্ষেপ ২৮০।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২ ২৮১—২৯৬

ভাষ্য ২৮১ ; নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা ২৮২ ; ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ২৮২ ; পারিবারিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপত্তা ২৮৪ ; পরিবার হচ্ছে মানুষের শান্তির আধার ২৮৪ ; বসতবাড়িতে স্বেচ্ছাচারি হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপত্তা ২৮৫ ; চিঠিপত্রে হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপত্তা ২৮৫ ; সম্মান সুনাম ২৮৬ ; বাংলাদেশের আইনে ২৮৭ ; আইনে আশ্রয়লাভের অধিকার ২৮৮ ; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ২৮৯ ; এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশের আইন ২৯০ ; এই অনুচ্ছেদ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তি ২৯৪ ; এই অনুচ্ছেদ ও ইসলাম ২৯৫ ; সারসংক্ষেপ ২৯৬।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩ ২৯৭—৩০৬

ভাষ্য ২৯৭ ; রাষ্ট্রীয় সীমানা চিহ্নিতকরণ ২৯৭ ; রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে চলাচলের অধিকার ২৯৮ ; বসতি স্থাপনের অধিকার ২৯৯ ; দেশ ছেড়ে যাবার অধিকার ৩০০ ; স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অধিকার ৩০১ ; আন্তর্জাতিকতা ৩০২ ; এই অনুচ্ছেদ ও ইসলাম ৩০৫।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪ ৩০৭—৩১৭

ভাষ্য ৩০৭ ; রাজনৈতিক আশ্রয়ের অধিকার ৩০৭ ; রাজনৈতিক আশ্রয়ের প্রকারভেদ ৩০৮ ; আশ্রয় প্রদান ও প্রত্যাখানের অধিকার ৩১০ ; ভূ-খণ্ডগত

www.pathagar.com

আশ্রয়সংক্রান্ত ঘোষণা—১৯৬৭ ৩১১ ; শরণার্থী ও দেশত্যাগ সম্পর্কিত কনভেনশন ৩১৩ ; এই অনুচ্ছেদ ও ইসলাম ৩১৫ ; সারসংক্ষেপ ৩১৬।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫ ৩১৮—৩৩১

ভাষ্য ৩১৮ ; জাতি ৩১৮ ; জাতির বৈশিষ্ট্য ৩১৯ ; জাতীয়তা ৩২০ ; জাতীয়তার অধিকারের প্রয়োজনীয়তা ৩২০ ; জাতীয়তার অধিকার হরণ ৩২১ ; জাতীয়তা পরিবর্তন ৩২৩ ; জাতীয়তা পরিবর্তন ও নাগরিকত্ব পরিবর্তন ৩২৪ ; জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা ৩২৫ ; বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ৩২৬ ; জাতীয়তার ক্রমপরিবর্তনশীল ধারণা ৩২৮ ; এই অনুচ্ছেদ ও ইসলাম ৩৩০ ; সারসংক্ষেপ ৩৩১।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬ ৩৩২—৩৫৬

ভাষ্য ৩৩২ ; বিবাহ কাকে বলে ৩৩৩ ; পরিবার কাকে বলে ৩৩৬ ; পরিবারের প্রয়োজনীয়তা ৩৩৬ ; পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ও নারী ৩৩৮ ; অবাধ ও পূর্ণ সম্মতি ৩৪১ ; সমাজ ও রাষ্ট কর্তৃক সংরক্ষণ ৩৪৩ ; রাষ্ট্র কর্তৃক সংরক্ষণ ৩৪৩ ; এই অনুচ্ছেদ ও আন্তর্জাতিক চুক্তি ৩৪৪ ; এই অনুচ্ছেদ ও ইসলাম ৩৪৪ ; বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত ইসলামি আইন ৩৪৬ ; স্বামী কর্তৃক তালাক ৩৪৭ ; তালাকে আহসান ৩৪৭ ; তালাকে হাসান ৩৪৭ ; তালাকে বিদাত ৩৪৭ ; তালাক কখন বলবৎ হবে ৩৪৮ ; তালাকের ক্ষমতা হস্তান্তর ৩৪৮ ; স্ত্রীকে শর্তাধীন ক্ষমতা প্রদান ৩৪৯ ; বাধ্যতামূলক তালাক ৩৪৯ ; জিহ্বার তালাক ৩৪৯ ; যৌথ তালাক ৩৫০ ; ভবিষ্যৎ বিচ্ছেদ ৩৫১ ; পুনরায় বিবাহ ৩৫২ ; বিবাহ বিচ্ছেদের ফলাফল ৩৫৪ ; সারসংক্ষেপ ৩৫৬।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭ ৩৫৭—৩৭৩

ভাষ্য ৩৫৭ ; সম্পত্তির সংজ্ঞা ৩৫৭ ; সম্পত্তির প্রকারভেদ ৩৫৯ ; মালিকানা ৩৬২ ; সম্পত্তি অর্জনের উপায় ৩৬৩ ; এই অনুচ্ছেদ ও বাংলাদেশের সংবিধান ৩৬৯ ; এই অনুচ্ছেদ ও অন্যান্য সংবিধান ৩৭০ ; এই অনুচ্ছেদ ও ইসলাম ৩৭২ ; সারসংক্ষেপ ৩৭৩।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮ ৩৭৪—৩৯০

ভাষ্য ৩৭৪ ; চিন্তার স্বাধীনতার অধিকার ৩৭৫ ; চিন্তার স্বাধীনতা হরণ অমানবিক কেন ৩৭৭ ; বিবেকের স্বাধীনতার অধিকার ৩৭৮ ; বিবেকের স্বাধীনতা হরণ ৩৭৯ ; ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার ৩৮০ ; ধর্ম অনুশীললনের স্বাধীনতা ৩৮১ ; ধর্ম অনুষ্ঠানের স্বাধীনতা ৩৮১ ; ধর্ম পালনের স্বাধীনতা ৩৮২ ; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ৩৮২ ; সাধারণ আলোচনা ৩৮৩ ; মানবিক অধিকার সংক্রান্ত ইউরোপীয় কনভেনশন ৩৮৮ ; বাংলাদেশের প্রাসঙ্গিক আইন ৩৮৯ ; সারসংক্ষেপ ৩৯০।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯ ৩৯১—৪০৯

ভাষ্য ৩৯১ ; মতামত ৩৯২ ; মতামত প্রকাশ ৩৯৩ ; মতামত প্রকাশের মাধ্যম ৩৯৪ ; তথ্য ৩৯৫ ; ভাবধারণা ৩৯৬ ; ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার সীমা ৩৯৭ ; সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ৩৯৯ ; সংবোদপত্রের স্বাধীনতার সীমা ৪০১ ; এক. বিচার সম্পর্কীয় উক্তি ৪০৩ ; দুই. অন্যের অপযশ বা মানহানিকর উক্তি ৪০৩ ; তিন.অশ্লীল উক্তি ৪০৪ ; চার. রাষ্ট্রদ্রোহীতামূলক উক্তি ৪০৪ ; পাঁচ. শান্তিভঙ্গমূলক উক্তি ৪০৫ ; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ৪০৫ ; অন্যান্য সংবিধানে ৪০৫ ; এই অনুচ্ছেদ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তি ৪০৭ ; মানবাধিকার সংক্রান্ত ইউরোপীয় কনভেনশন ৪০৭ ; এই অনুচ্ছেদ ও ইসলাম ৪০৮ ; সারসংক্ষেপ ৪০৯।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০ ৪১০—৪২২

ভাষ্য ৪১০ ; সমাবেশ ও সংঘভুক্ত হওয়ার অধিকার ৪১০ ; সংঘের প্রয়োজনীয়তা ৪১১ ; সমাবেশ ও সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা ৪১২ ; বাস্তবে এই অধিকার কতটুকু সংরক্ষিত ৪১৩ ; বাংলাদেশে এই অধিকারের বাস্তবতা ৪১৩ ; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও এই অনুচ্ছেদ ৪১৪ ; বাংলাদেশের আইন ও এই অনুচ্ছেদ ৪১৫ ; দণ্ডবিধি—ধারা ১৪১—১৪৬ ; ১৫৩-ক, ১৫৩-খ ৪১৮ ; এই অনুচ্ছেদ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তি ৪২০ ; ইসলাম ও এই অনুচ্ছেদ ৪২১ ; সারসংক্ষেপ ৪২২।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১ ৪২৩—৪৫৩

ভাষ্য ৪২৪ ; নিজ দেশ ৪২৪ ; সরকার ৪২৬ ; সরকারের রূপ ও প্রকৃতি ৪২৭ ; গণতন্ত্র : সরকারে জনগণের অংশগ্রহণ ৪২৮ ; সরকারে অংশগ্রহণ ঃ প্রত্যক্ষভাবে ৪২৯ ; প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ ৪৩০ ; প্রতিনিধিত্বের ইতিহাস ৪৩১ ; বাংলাদেশের সংবিধান ৪৩২ ; দ্বিতীয় ভাগ—সরকারি চাকুরি ৪৩৩ ; সরকারি চাকুরেদের গুরুত্ব ৪৩৩ ; উন্নয়নশীল দেশ ৪৩৪ ; বাংলাদেশের সংবিধান ৪৩৪ ; তৃতীয় ভাগ—জনগণের ইচ্ছা সরকারের ক্ষমতার ভিত্তি ৪৩৫ ; সর্বজনীন ও সমান ভোটাধিকার ৪৩৬ ; নির্বাচন : প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ৪৩৭ ; ভোটদান পদ্ধতি ৪৩৮ ; সর্বজনীন ভোটাধিকার ও নারী ৪৩৮ ; চতুর্থ ভাগ—এই অনুচ্ছেদ ও বাস্তবতা ৪৩৯ ; আফ্রিকা ৪৪৪ ; সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে ৪৪৫ ; গণতান্ত্রিক দেশে ৪৪৫ ; নির্বাচনে কারচুপি ৪৪৫ ; নিয়মিত ব্যবধানে নির্বাচন ৪৪৮ ; সামরিক শাসন ৪৪৮ ; বিভিন্ন দেশের সরকার ও জন প্রতিনিধিত্ব ৪৫০ ; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৪৫০ ; যুক্তরাজ্য ৪৫১ ; ভারত ৪৫১ ; রাশিয়া ৪৫১ ; এই অনুচ্ছেদ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তি ৪৫২ ; এই অনুচ্ছেদ ও ইসলাম ৪৫২ ; সারসংক্ষেপ ৪৫৩ ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২ ৪৫৪—৪৬৯

ভাষ্য ৪৫৪ ; সামাজিক নিরাপত্তা ৪৫৪ ; অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ৪৫৬ ; রাজনৈতিক নিরাপত্তা ৪৫৬ ; সাংস্কৃতিক নিরাপত্তা ৪৫৭ ; ব্যক্তির অর্থনৈতিক

www.pathagar.com

নিরাপত্তা ৪৫৭ ; বিনিয়োগের অধিকার ৪৫৮ ; ন্যায্য মজুরি পাবার অধিকার ৪৫৮ ; কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার অধিকার ৪৫৮ ; ব্যক্তির সামাজিক অধিকার ৪৫৯ ; জাতীয় প্রচেষ্টা ৪৬১ ; বাংলাদেশের সংবিধান ৪৬২ ; আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ৪৬২ ; ঋণ এবং অনুদান ৪৬৪ ; বিদেশী মূলধন বিনিয়োগ ৪৬৫ ; আন্তঃসরকার পণ্য চুক্তি ৪৬৬ ; বৈদেশিক সাহায্য ৪৬৬ ; প্রযুক্তি বিনিময় ৪৬৮ ; সারসংক্ষেপ ৪৬৯।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩ ৪৭০—৪৮৭

ভাষ্য ৪৭১ ; কাজ করার অধিকার ৪৭১ ; পছন্দমতো কাজ বেছে নেয়ার অধিকার ৪৭৩ ; ন্যায় ও অনুকূল পরিবেশে কাজ করার অধিকার ৪৭৪ ; বেকারত্ব থেকে রক্ষণলাভের অধিকার ৪৭৫ ; সমান কাজে সমান বেতন পাওয়ার অধিকার ৪৭৬ ; বেতন কিভাবে নির্ধারিত হয় ৪৭৬ ; বিভিন্ন পেশায় বেতনের হারের পার্থক্য ৪৭৭ ; শ্রমিক সংঘ ৪৭৮ ; ন্যায্য ও অনুকূল পারিশ্রমিকের অধিকার ৪৭৮ ; শ্রমিক সংঘের কাজ ৪৮০ ; বাংলাদেশের আইনে ট্রেড ইউনিয়ন ৪৮১ ; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ৪৮২ ; শ্রমিক শোষণ ৪৮২ ; আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা ৪৮৪ ; এই অনুচ্ছেদ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তি ৪৮৪ ; এই অনুচ্ছেদ ও ইসলাম ৪৮৫ ; সারসংক্ষেপ ৪৮৭।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪ ৪৮৮—৫০৩

ভাষ্য ৪৮৮ ; বিশ্রাম ৪৮৮ ; বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা ৪৮৯ ; অবসর বিনোদন ৪৯০ ; ছুটি এবং ছুটির প্রয়োজনীয়তা ৪৯১ ; বাংলাদেশের আইনে ছুটি ও অবকাশের অধিকার ৪৯১ ; ১৯৬৫ সালের কারখানা আইনের সংশ্লিষ্ট বিধান : ছুটি ও মজুরিসহ অবকাশ ৪৯৩ ; কাজের সময়ের যুক্তিসঙ্গত সীমা ও মে দিবস ৪৯৬ ; কাজের সময়ের যুক্তিসঙ্গত সীমা ও বাস্তবতা ৪৯৭ ; গৃহভৃত্য ও গৃহ পরিচারিকা ৪৯৮ ; আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (কনভেনশন—১, ধারা—১-৮) ৫০০ ; সারসংক্ষেপ ৫০৩।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫ ৫০৪—৫২৩

ভাষ্য ৫০৫ ; এক. খাদ্যের অধিকার ৫০৬ ; বিশ্বে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন ৫০৯ ; ইউরোপ ৫১০ ; এশিয়া ৫১০ ; আফ্রিকা ৫১০ ; উত্তর আমেরিকা ৫১১ ; দক্ষিণ আমেরিকা ৫১১ ; অস্ট্রেলিয়া ৫১১ ; দুই. বস্ত্রের অধিকার ৫১২ ; তিন. বাসস্থানের অধিকার ৫১৩ ; চার. চিকিৎসার অধিকার ৫১৫ ; বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ৫১৭ ; অক্ষমতা ৫১৯ ; বৈধব্য ও বার্ধক্য ৫২০ ; মাতৃত্ব ও শৈশব অবস্থায় বিশেষ যত্ন ও সহায়তালাভের অধিকার ৫২০ ; যত্ন ও সহায়তা প্রদানের উপায় ৫২১ ; শিশুর সামাজিক নিরাপত্তা ৫২২ ; এই অনুচ্ছেদ ও বাংলাদেশের সংবিধান ৫২৩ ; সারসংক্ষেপ ৫২৩।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬ ৫২৪—৫৪৫

ভাষ্য ৫২৫ ; শিক্ষালাভের অধিকার ৫২৫ ; শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ৫২৬ অবৈতনিক শিক্ষা ৫২৮ ; প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ৫৩০ ; কারিগরি ও

www.pathagar.com

বৃত্তিমূলক শিক্ষা ৫৩২ ; উচ্চতর শিক্ষা ৫৩৩ ; শিক্ষার উদ্দেশ্য ৫৩৪ ; ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ ৫৩৪ ; ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপাদান ৫৩৫ ; মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সুদৃঢ় করা ৫৩৬ ; মৌলিক স্বাধীকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সুদৃঢ় করা ৫৩৮ ; সমঝোতা, সহিষ্ণুতা ও বন্ধুত্ব উন্নয়ন ৫৩৮ ; শান্তিরক্ষার্থে জাতিসংঘের তৎপরতা বৃদ্ধি ৫৩৯ ; শিক্ষা পছন্দের অধিকার ৫৪১ ; বাংলাদেশের শিক্ষার হাল ৫৪২ ; এই অনুচ্ছেদ ও বাংলাদেশের সংবিধান ৫৪৪ ; এই অনুচ্ছেদ ও অন্যান্য সংবিধান ৫৪৪ ; সারসংক্ষেপ ৫৪৫।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭ ৫৪৬—৫৬৫

ভাষ্য ৫৪৬ ; সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অবাধে অংশগ্রহণের অধিকার ৫৪৬ ; সংস্কৃতি ৫৪৭ ; সাংস্কৃতিক জীবন ও কর্মকাণ্ড ৫৪৮ ; সাংস্কৃতিক জীবনে অংশগ্রহণের উপায় ৫৪৯ ; শিল্পকলা উপভোগের অধিকার ৫৫০ ; বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি এবং এর সুফলের অংশীদার হওয়ার অধিকার ৫৫২ ; সৃজনশীল কর্মের স্বার্থ সংরক্ষণের অধিকার ৫৫৩ ; সারসংক্ষেপ ৫৫৬।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮ ৫৫৭—৫৭৯

ভাষ্য ৫৫৭ ; মানবাধিকার কার্যকর করার অনুকূল পরিবেশ ৫৫৯ ; মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট জাতিসংঘের সংস্থা ৫৫৯ ; মানবাধিকার লংঘনের ব্যাপারে জাতিসংঘের পদক্ষেপ ৫৬২ ; গণহত্যা সম্পর্কে জাতিসংঘের ভূমিকা ৫৬২ ; বর্ণবৈষম্য প্রতিরোধকল্পে জাতিসংঘের পদক্ষেপ ৫৬৩ ; জাতিগত বৈষম্যবিরোধী কনভেনশন ৫৬৪ ; জাতিবিদ্বেষ বা অ্যাপারথেইড সম্পর্কে জাতিসংঘের দৃষ্টিভঙ্গি ৫৬৫ ; জাতিবিদ্বেষ সম্পর্কে জাতিসংঘের ভূমিকা ৫৬৫ ; শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় জাতিসংঘ ৫৬৭ ; স্বদেশহীন ব্যক্তিদের জন্য জাতিসংঘ ৫৬৭ ; উদ্বাস্তুদের সাহায্যার্থে জাতিসংঘ ৫৬৮ ; তথ্যের স্বাধীনতার অধিকার সম্পর্কে জাতিসংঘ ৫৬৮ ; ক্রীতদাস সম্পর্কে জাতিসংঘ ৫৬৯ ; শিশুদের অধিকার সম্পর্কে জাতিসংঘ ৫৭০ ; শিক্ষার অধিকার প্রসঙ্গে জাতিসংঘ ৫৭০ ; বন্দী ও কারারুদ্ধ ব্যক্তিদের অধিকার প্রসঙ্গে জাতিসংঘ ৫৭১ ; নির্যাতনের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ ৫৭১ ; নারী সমাজের অধিকার রক্ষার্থে জাতিসংঘ ৫৭২ ; মানবাধিকার কার্যকরকরণের প্রয়াস ৫৭৪ ; গণহত্যা সম্পর্কিত কনভেনশন ৫৭৫ ; দেশত্যাগী ও শরণার্থী সম্পর্কিত কনভেনশন ৫৭৬ ; নারী অধিকআর সংক্রান্ত কনভেনশন ;৫৭৬ ; বিবাহিতা মহিলাদের জাতীয়তা সম্পর্কিত কনভেনশন ৫৭৬ ; বিবাহে সম্মতিদান, ন্যূনতম বয়স ও বিবাহ নিবন্ধনকরণ সম্পর্কিত কনভেনশন ৫৭৭ ; দাসত্ব ও ক্রীতদাস প্রথা সম্পর্কিত কনভেনশন ৫৭৭ ; জবরদস্তি শ্রমের বিলুপ্তি সংক্রান্ত কনভেনশন ৫৭৭ ; যৌথ দর কষাকষি এজেন্ট সম্পর্কিত কনভেনশন ৫৭৮ ; চাকুরি ও পেশার ক্ষেত্রে বৈষম্য সংক্রান্ত কনভেনশন ৫৭৮ ; শিক্ষা ও শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যবিরোধী কনভেনশন ৫৭৮ ; সারসংক্ষেপ ৫৭৯।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯ ৫৮০—৬০৪

ভাষ্য ৫৮১ ; উপ অনুচ্ছেদ ক. অধিকার ও কর্তব্য ৫৮১ ; সমাজের প্রতি কর্তব্যাদি ৫৮২ ; ব্যক্তির সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব ৫৮৫ ; ব্যক্তির রাজনৈতিক কর্তব্য ৫৮৬ ; ব্যক্তির সাংস্কৃতিক কর্তব্য ৫৮৭ ; পরিবেশ সংরক্ষণে

www.pathagar.com

ব্যক্তির কর্তব্য ৫৮৭ ; বিশ্ব পরিবেশ ৫৮৮ ; দূষণমুক্ত পরিবেশ মানুষের প্রত্যাশা ৫৯১ ; অধিকার ও স্বাধীনতার সীমা ৫৯২ ; সীমাবদ্ধতা আরোপের উদ্দেশ্য ৫৯৪ ; নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা ৫৯৭ ; গণশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ৫৯৮ ; জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি ৫৯৮ ; জাতিসংঘের লক্ষ্য ৬০১ ; জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ৬০২ ; জাতিসংঘের নীতিসমূহ ৬০৩ ; সারসংক্ষেপ ৬০৪।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০ ৬০৫—৬১১

ভাষ্য ৬০৫ ; ব্যাখ্যা করার অধিকার কার ৬০৮ ; ব্যক্তি গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব ৬০৯ ; ব্যক্তি ও ব্যক্তির দায়িত্ব ৬০৯ ; গোষ্ঠী ও গোষ্ঠীর কর্তব্য এবং দায়িত্ব ৬০৯ ; রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব ৬১০ ; সারসংক্ষেপ ৬১১।

পরিশিষ্ট ৬১২—৬৫৬

পরিশিষ্ট—১

মানবাধিকার ও আজকের বিশ্ব ৬১২ ; এশিয়া ৬১৩ ; মায়ানমার ৬১৪ ; ভারত ৬১৫ ; উত্তর কোরিয়া ৬১৫ ; আফগানিস্তান ৬১৬ ; চিন ৬১৬ ; সিরিয়া ৬১৭ ; ইসরাইল ৬১৮ ; ইউরোপ : বসনিয়া ৬১৯ ; কসোভা ৬২০ ; জার্মান ৬২১ ; আফ্রিকা ৬২২ ; জিম্বাবুয়ে ৬২৩ ; মিশর ৬২৩ ; সোমালিয়া ৬২৩ ; আমেরিকা ৬২৪ ; নারী-নিপীড়ন ৬২৫।

পরিশিষ্ট—২

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ৬২৬ ; মৌলিক অধিকার ৬৩০।

পরিশিষ্ট—৩

গ্রন্থপঞ্জি ৬৩৮—৬৪০।

পরিশিষ্ট—৪

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ ৬৪১—৬৫৬।

www.pathagar.com

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র
(UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS)

প্রস্তাবনা

যেহেতু মানব পরিবারের সকল সদস্যের সহজাত মর্যাদা ও অবিচ্ছেদ্য অধিকারের স্বীকৃতি, স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও বিশ্বশান্তির ভিত্তি ;

যেহেতু মানবাধিকারের প্রতি অবজ্ঞা ও অবমাননার ফলে এমন সব বর্বরোচিত ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত হয়েছে, যেগুলো মানব জাতির বিবেককে দারুণভাবে আঘাত করেছে এবং সাধারণ মানুষের সর্বোচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা হিসেবে এমন এক বিশ্বের আগমনবার্তা ঘোষণা করা হয়েছে যেখানে সকল মানুষ বাক্‌স্বাধীনতা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা এবং ভয় ও অভাব থেকে মুক্তি ভোগ করবে ;

যেহেতু অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে মানুষকে যাতে সর্বশেষ উপায় হিসেবে বিদ্রোহের আশ্রয় গ্রহণ করতে না হয় সে জন্য আইনের অনুশাসন দ্বারা মানবাধিকার রক্ষা করা অপরিহার্য ;

যেহেতু জাতিসমূহের মধ্যে মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য এটা অবশ্যই প্রয়োজন ;

যেহেতু, জাতিসঙ্ঘের জনগোষ্ঠীসমূহ সনদের মাধ্যমে মৌলিক মানবাধিকার, মানবব্যক্তিত্বের মর্যাদা ও মূল্য এবং নারী ও পুরুষের সমানাধিকারের প্রতি তাদের বিশ্বাসের কথা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছে এবং বৃহত্তর মুক্ত পরিবেশে সামাজিক অগ্রগতি ও জীবনমানের উন্নতি সাধন করতে সংকল্পবদ্ধ হয়েছে ;

যেহেতু, সদস্যরাষ্ট্রসমূহ জাতিসংঘের সহযোগিতায় মানবাধিকার, মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সর্বজনীন শ্রদ্ধা এবং এগুলো প্রতিপালন ও এর উন্নতি বিধান করতে নিজেরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ;

যেহেতু, এই প্রতিশ্রুতির পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য এসব অধিকার ও স্বাধীনতা সম্পর্কে একটি সাধারণ সমঝোতার অত্যন্ত প্রয়োজন ;

সেহেতু, এখন,

www.pathagar.com

সাধারণ পরিষদ

মানবাধিকারের এই সর্বজনীন ঘোষণাকে সকল জনগোষ্ঠীর এবং সকল জাতির জন্য অভীষ্ট সাধারণ মান হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচার করছে, যাতে সকল সমাজে প্রতিটি ব্যক্তি ও প্রতিটি অংশ এই ঘোষণাকে সর্বদা মনে রেখে অধ্যাপনা ও শিক্ষার মাধ্যমে এসব অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি সম্মান বৃদ্ধি করতে কঠোরভাবে চেষ্টা করে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রগতিশীল কর্মব্যবস্থার মাধ্যমে সদস্য-রাষ্ট্রগুলোর জনগোষ্ঠীসমূহ এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসনাধীন ভূ-খণ্ডের জনগণের মধ্যে এসব অধিকার ও স্বাধীনতার সর্বজনীন ও কার্যকরী স্বীকৃতি ও প্রতিপালন নিশ্চিত করতে প্রয়াস পায়।

Universal Declaration of Human Rights

Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 217 A (111) of 10 December 1948

PREAMBLE

Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people,

Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should protected by the rule of law.

Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations.

www.pathagar.com

Whereas the people of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,

Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in cooperation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rihgts fundamental freedoms,

Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge.

Now, therefore,

The General Assembly,

Proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international,to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of teritories under their jurisdiction.

ভাষ্য

কেন মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র জারি করা হল, কি এর উদ্দেশ্য, এর প্রয়োজন কতটুকু সে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে প্রস্তাবনায়। প্রস্তাবনায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই ঘোষণার যৌক্তিকতা। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করার জন্য এই প্রস্তাবনার অবতারণা। তাই মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র হৃদয়ঙ্গম করতে হলে আমাদেরকে এই প্রস্তাবনা বুঝতে হবে।

www.pathagar.com

প্যারা ঃ এক

প্রস্তাবনার শুরুতেই বলা হয়েছে, স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও বিশ্বশান্তির ভিত্তি হচ্ছে মানব পরিবারের সকল সদস্যের সহজাত মর্যাদা ও অবিচ্ছেদ্য অধিকারের স্বীকৃতি। এই স্বীকৃতি নিশ্চিত করা হচ্ছে এই ঘোষণাপত্রের অন্যতম লক্ষ্য। এই বক্তব্যটি সুসম্পন্ন করার জন্য নিম্নবর্ণিত পাঁচটি বিষয়ে আলোচনা করা দরকার। বিষয়গুলো হচ্ছে ঃ

ক. স্বাধীনতা (freedom)

খ. ন্যায়বিচার (Justice)

গ. বিশ্বশান্তি (Peace in the world)

ঘ. মানুষের সহজাত মর্যাদা (Inherent dignity)

ঙ. মানুষের অবিচ্ছেদ্য অধিকার (Inalienable rights)

স্বাধীনতা

স্বাধীনতা বা Freedom শব্দের সমার্থক শব্দ হচ্ছে মুক্তি। ইংরেজি Liberty শব্দটিও একই অর্থ প্রকাশ করে। অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক এবং গুরুত্ববহ এই শব্দটি বিশ্লেষণ করতে বিস্তৃত পরিসর দরকার। আমরা শুধু প্রসঙ্গটি সুস্পষ্ট করার জন্য এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করবো।

মানুষের ইচ্ছেমত, মুক্তভাবে কোন কিছু করবার বা না করবার অবাধ অধিকারকে সাধারণভাবে স্বাধীনতা বলে। সে বিবেচনায় 'অধীনতামুক্ত অবস্থা'কে স্বাধীনতা বলা যায়। কিন্তু আইনবিদ্যায় এবং বাস্তবে 'অধীনতামুক্ত অবাধ অধিকার' ভোগকে স্বাধীনতা বলা হয় না। কারণ অধীনতামুক্ত অবস্থা এবং যা ইচ্ছে তাই করার ক্ষমতা স্বেচ্ছাচারিতারই নামান্তর। স্বেচ্ছাচারিতা এবং স্বাধীনতা এ দুটি বিষয় এক হতে পারে না। স্বেচ্ছাচারিতা হচ্ছে আইনহীন অরাজক অবস্থার নাম। এটা স্বাধীনতার সুফল থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে। নিয়ন্ত্রণহীন, অবাধ ও বন্ধনহীন মুক্ত অবস্থাকে যারা স্বাধীনতা বলেন তারা এই মহতি শব্দের বিকৃত ব্যাখ্যা করেন মাত্র।

আসলে স্বাধীনতা হচ্ছে, আইন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মুক্ত অবস্থায় জীবন যাপনের অধিকার। একজনের স্বাধীনতা অন্যজনের অধিকার দ্বারা সীমিত। মানুষ সমাজে বসবাস করে, এই সমাজ কাঠামোকে সুবিন্যস্ত রাখার জন্য প্রত্যেককেই আইন কানুন মেনে চলতে হয়। রাষ্ট্রে বিদ্যমান আইন মানুষের স্বাধীনতাকে হরণ করে না বরং আইন হচ্ছে স্বাধীনতা সংরক্ষণের সহায়ক। আইন বিবর্জিত ও নিয়ন্ত্রণবিহীন অবাধ স্বাধীনতা সভ্য সমাজের কাম্য নয়, হতে পারে না। স্বাধীনতার প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করলে এতে দুটি ভিন্নরূপ প্রতিভাত হয়ে ওঠে। প্রথমটি ইতিবাচক। অপরটি নেতিবাচক দিক। নেতিবাচক দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, অবাধ ও মুক্ত পরিবেশে

www.pathagar.com

নিয়ন্ত্রণবিহীনভাবে কাজ করার ক্ষমতাই স্বাধীনতা আর ইতিবাচক দিক থেকে বিবেচনা করলে বলতে হবে অপরের সমপরিমাণ স্বাধীনতা খর্ব না করে আইনানুযায়ী ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কার্য সম্পন্ন করার ক্ষমতা ও অধিকারই হচ্ছে স্বাধীনতা।

এ প্রসঙ্গে স্বাধীনতা সম্পর্কে অধ্যাপক বার্কারের (Barker) মতামতটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'প্রত্যেকের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা অপরের স্বাধীনতার প্রয়োজন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও সীমাবদ্ধ হওয়া জরুরি।' প্রকৃতপক্ষে মানব পরিবারের সকল সদস্যেরই—স্বাধীনতার দাবি রয়েছে এবং প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য স্বাধীনতা জরুরি—এই কথাটি মনে রাখলে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে এমন এক স্বাধীন অবস্থা যা সীমার মধ্যে অসীম।

প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা বলতে নিয়ন্ত্রণ বা বাধানিষেধের অনুপস্থিতি বুঝায় না ; বরং সকলের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য প্রত্যেকের কার্যাবলীর উপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা আবশ্যক। মানুষের কার্যাবলী ও আচরণের উপর খানিকটা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করলেই যে তার স্বাধীনতা থাকে না এমন নয় বরং দেখতে হবে এই নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য কি ? এবং এই নিয়ন্ত্রণ বিশেষ কারো স্বার্থ হাসিলের জন্য কি না সমাজের কল্যাণের জন্য ? বৃহত্তর মানবমণ্ডলীর কল্যাণ সাধন তথা সমাজের স্বার্থে সকল ব্যক্তির উপর সমভাবে যে বাধা নিষেধ আরোপ করা হয় তা স্বাধীনতার পরিপন্থি নয়। সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধনই স্বাধীনতার লক্ষ্য। বাধানিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ সর্বদা স্বাধীনতার প্রতিকূল নয়। অধ্যাপক লাস্কি (Laski) যেমন বলেছেন যে, "আমি যদি রাস্তার ডানদিক দিয়ে গাড়ি চালাতে আইনত বাধাপ্রাপ্ত হই, তাহলে আমার সৃজনশীল প্রতিভার কোন ক্ষতি হয় না। আইন যখন আমার সন্তানদের শিক্ষা প্রদান করতে আদেশ করে তখনও আমার স্বাধীনতা খর্ব হয় না।" তিনি বলেছেন, "স্বাধীনতা বলতে আমরা বুঝি যে সকল সামাজিক পরিবেশ যার উপর কোন বাধানিষেধ নেই এবং যা আধুনিক সভ্যতায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতার নিশ্চয়তাস্বরূপ।" তিনি আরো বলেছেন, "স্বাধীনতা বলতে আমি বুঝি সেই পরিবেশ যাতে মানুষ আত্মোন্নতি সাধনের যথেষ্ট সুযোগ ও সুবিধা পায় এবং সে পরিবেশ রক্ষার জন্য অদম্য প্রয়াস চালায়।" এ থেকে বোঝা যায় যে, মানুষের এবং মানব সমাজের কল্যাণের জন্য আইন আরোপিত বিধিনিষেধের মধ্যে জীবন যাপনের অবাধ অধিকার ও ক্ষমতাই স্বাধীনতা।

জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) তাঁর গ্রন্থ 'Essay on Liberty'তে স্বাধীনতার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে তিনি বলেছেন, "কেবল অন্যের অনিষ্ট করা থেকে নিবৃত্ত করবার ক্ষেত্রেই কোন সভ্য সমাজের সদস্যকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্বক কাজ করানো যায়। তার দৈনিক বা মানসিক উপকার হবে এই উদ্দেশ্যেও তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করানো উচিত নয়" । তার মতে, নিজের উপরে, নিজের দেহ ও মনের উপরে ব্যক্তিই সার্বভৌম। মিলের এই বক্তব্য থেকে ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়।

www.pathagar.com

ন্যায়বিচার (Justice)

দার্শনিক প্লেটোর মতে, মানুষ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত, উৎপাদক, যোদ্ধা ও দার্শনিক। উৎপাদকগণ উৎপাদনকর্মে নিযুক্ত থাকবেন। যোদ্ধারা দেশরক্ষা করবেন আর শাসন কার্য পরিচালনা করবেন দার্শনিকগণ। যে সমাজে এই তিনটি শ্রেণীকে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মে নিয়োগ করা হবে সেই সমাজ 'ন্যায়বিচার'পূর্ণ সমাজ। তিনি ন্যায়বিচারকে শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার উপায় হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু আধুনিককালে ন্যায়বিচারের অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন ও ব্যাপক।

আধুনিককালে ন্যায়বিচার বলতে বুঝায় আইন অনুযায়ী বিচারকর্ম সম্পাদন। সেই মতে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হচ্ছে ন্যায়বিচারের ভিত্তি। বিচার ব্যবস্থা হচ্ছে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার অঙ্গ। তাই স্বাভাবিকভাবে বিচারবিভাগের উপর প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রভাব থাকা স্বাভাবিক। অনেকে মনে করেন, বিচারপতি এবং বিচারালয় যেহেতু দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার অংশ সেহেতু রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত নয়। এই ধারণাতে যদিও কিছুটা সত্য নিহিত আছে তথাপি এ কথা বলা যায় যে, তত্ত্বগত দিক থেকে এবং বাস্তবে বিচার বিভাগ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান। আইন অনুযায়ী বিরোধ মীমাংসা, অপরাধের বা অভিযোগের বিচার, বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা, সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান, রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংরক্ষণ, নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ সর্বোপরি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা বিচার বিভাগের লক্ষ্য।

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা বিচার বিভাগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আদালতের সম্মুখে আনীত যে কোন বিরোধের নিষ্পত্তি করতে গিয়ে বিচারপতিদের বাস্তব ঘটনাবলী সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হয়। এর জন্য নথিপত্র সাক্ষ্যপ্রমাণ ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণ করা হয়। দেওয়ানি ও ফৌজদারি উভয় প্রকার মামলাতেই বিচারবিভাগ সত্যানুসন্ধানের মাধ্যমে অপরাধীর শাস্তি বিধান করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পবিত্র দায়িত্ব পালন করেন।

ন্যায়বিচার মানুষের চিরন্তন প্রত্যাশা। সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য দরকার 'দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন'। এই কাজটি সুসম্পন্ন করতে দরকার ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। ন্যায়বিচারের অনুপস্থিতি সমাজকে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে ঠেলে দেয়। সমাজ হয়ে ওঠে অশান্ত। এই অশান্ত অবস্থায় মানব জীবনের সুষ্ঠু বিকাশ সম্ভব নয়। ব্যক্তিজীবনের পূর্ণ বিকাশ ও সামাজিক অগ্রগতির স্বাভাবিক ধারা বজায় রাখতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা জরুরি।

বিশ্বশান্তি (Peace in the World)

সাধারণত যুদ্ধের বিপরীত পরিস্থিতিকেই আমরা শান্তি বলে অভিহিত করি। শান্তি মানব সমাজের চিরকালের প্রত্যাশা। মানুষ চায় এমন একটি পরিবেশ যেখানে যুদ্ধ বিগ্রহ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত,

www.pathagar.com

হানাহানি মারামারি নেই, যেখানে সাম্য, মৈত্রী, বন্ধুত্ব, প্রীতি ও সহনশীলতা এবং সহযোগিতার মহান আদর্শ অনুসৃত হয়। পৃথিবীই সৌরজগতের একমাত্র গ্রহ যেখানে প্রাণীকূলের বসবাস। আর প্রাণী বা জীবজগতে মানুষ শ্রেষ্ঠ। মানুষের বসবাসযোগ্য এই গ্রহটি মানুষেরই হীন কর্মকাণ্ডে প্রায়ই বসবাসের পক্ষে প্রতিকূল হয়ে পড়ে। শান্তি হচ্ছে মানুষের বসবাসের অনুকূল অবস্থা আর অশান্তিটা প্রতিকূল। যুদ্ধ-বিগ্রহ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মারামারি-হানাহানি , দ্বন্দ্ব-সংঘাত ইত্যাদির মত অশান্ত পরিবেশে বসবাস করা খুবই দুরূহ। জীবনের পক্ষে দুর্বিসহ এবং ক্লান্তিকর পরিবেশ থেকে মানুষ মুক্তি চায়, চায় নিষ্কৃতি। মানুষের এই চাওয়া চিরন্তন। কিন্তু মানুষের চাওয়ার মত করে পৃথিবীকে পাওয়া যায় না প্রায়শই। প্রায়শই অশান্তির কালো মেঘে ছেয়ে যায় দুনিয়া। বিধ্বস্ত হয় অর্থনীতি, বিপন্ন হয় জীবন। যুদ্ধ শুধু মানুষেরই নয়, বরং সমগ্র জীবজগতে ব্যাপক বিনাশ সাধন করে, ধ্বংস করে প্রকৃতির অবারিত সম্পদ। যুদ্ধ এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতি। এই বিভীষিকাময় পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের জন্য মানুষের আছে অন্তহীন সাধনা। মানব জাতির চেষ্টা রয়েছে যাতে যুদ্ধ না বাঁধে, বিশ্বে শান্তি বিরাজ করে। বিশ্বশান্তির প্রয়োজনীয়তা, শান্তি স্থাপন ও রক্ষার উপায়, বিশ্বশান্তির প্রতিবন্ধকতা এবং বিশ্বশান্তির বিপরীত অবস্থা সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

স্বার্থের সংঘাত, আণবিক মারণাস্ত্রের দ্রুত প্রসার, মতাদর্শগত লড়াই, উগ্র জাতীয়তাবাদ—এসবের কারণেই বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে, মানুষ শান্তির পায়রাকে ধরতে গিয়ে বারবার হোঁচট খাচ্ছে।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ও বিশ্ব ব্যবস্থা অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এই যে, যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসার। যুদ্ধের সমৃদ্ধ আয়োজন এবং যুদ্ধবিদ্যার ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত বিকাশের ফলেই সম্ভব হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশকে সামরিক প্রয়োজনে প্রয়োগের ফলে সামরিক প্রযুক্তির উত্তরোরোত্তর বিকাশ ঘটছে। যুদ্ধের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ শুধু যুদ্ধের ব্যাপকতাকেই বৃদ্ধি করে নি সেই সঙ্গে যুদ্ধকে আরো ভয়াবহ করে যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক ক্ষমতাকে আরো তীব্রতর করে তুলেছে। এই শতাব্দীতে এসে শুধু সামরিক ঘাঁটি আর রসদ নয় সেই সঙ্গে অসামরিক জনগণ, শস্যক্ষেত্র, শিল্পাঞ্চল, যানবাহন এমনকি হাসপাতাল পর্যন্ত যুদ্ধের লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। অসামরিক জনগণকে ধ্বংস করার জন্য বিষাক্ত গ্যাস, নাপাম বোমা, রাসায়নিক গ্যাস ইত্যাদি এখন যুদ্ধের ক্ষেত্রে অলিখিত স্বীকৃত পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে। সামরিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসার ও অপব্যবহার মানব জাতির মধ্যে ভীতি ও আতংকের সৃষ্টি করেছে।

উগ্র জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা এবং শাসককূলের স্বৈরাচারী ও আগ্রাসী দৃষ্টি মানব জাতির ইতিহাসকে কলুষিত করেছে। হিটলার, মুসোলিনি, ফ্রাঙ্কো প্রমুখ এর জ্বলন্ত উদাহরণ। মতাদর্শগত বিরোধও বিশ্বশান্তিকে বিপন্ন করেছে। রুশবিপ্লবের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

মতাদর্শগত বিরোধ ব্যাপক ও তীব্র আকার ধারণ করে। সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী ভাবধারার অনুসারী রাষ্ট্রসমূহ পরস্পরকে নিজেদের টিকে থাকার পক্ষে অন্তরায় মনে করে। ফলে বিভিন্ন দেশে তাদের মদদে ব্যাপক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে মানুষ যুদ্ধের সাথে সাথে রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে।

স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও বিশ্বশান্তি—এই তিনটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনে এই বিষয়গুলো অত্যন্ত জরুরি। স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও বিশ্বশান্তি না থাকলে মানুষের জীবনের স্থিতিশীলতা এবং সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, উন্নতি, সমৃদ্ধি এবং সামাজিক অগ্রগতির জন্য স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দুটি বিষয়ে স্বীকৃতি প্রদান অপরিহার্য।

১. মানুষের সহজাত মর্যাদার স্বীকৃতি

২. মানুষের অবিচ্ছেদ্য অধিকারের স্বীকৃতি

যে সমাজে মানুষের সহজাত মর্যাদা ও অবিচ্ছেদ্য অধিকারের স্বীকৃতি নেই সেই সমাজে স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও শান্তির আশা করা যায় না। এখানে সহজাত মর্যাদা ও অবিচ্ছেদ্য অধিকার সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করছি।

মানুষের সহজাত মর্যাদা (Inherent dignity) ঃ মানুষের মর্যাদা কি? এই প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে, মানুষ জীব জগতের শ্রেষ্ঠতম স্থানের অধিকারী। বিবেক-বুদ্ধি, চিন্তা, বাক্‌শক্তি ইত্যাদি থাকার কারণে মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা. আর সে কারণেই মানুষ সম্পর্কে বলা হয় যে, মানুষ বিবেকবান ও বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী, মানুষ চিন্তাভাবনা করতে পারে, মানুষ কথা বলতে পারে, মানুষ নিজের ভাব অন্যের মধ্যে সংক্রেমিত করতে পারে। মানুষের এই যোগ্যতা তার নিজের চেষ্টায় লব্ধ নয়। চিন্তা ভাবনা এবং কথা বলার মৌলিক যোগ্যতা মানুষ প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত। নিজের চেষ্টায় মানুষ এসব যোগ্যতার উৎকর্ষ সাধন করতে পারে কিন্তু মৌল ক্ষমতা তার নিজের তৈরি নয়। প্রকৃতি প্রদত্ত যে সব যোগ্যতা ও ক্ষমতা মানুষকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে, করেছে অপরাপর প্রাণী থেকে পৃথক সেগুলো মানুষের সহজাত। এসব সহজাত যোগ্যতা ও ক্ষমতা মানুষকে জীবজগতে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করেছে।

মানুষের মতই মগজ, হাত, পা, চোখ আছে বানর, গরিলা, শিম্পাঞ্জি, ওরাং ওটাং ইত্যাদির। কিন্তু মানুষের মতো কথা বলতে পারে না আর কেউ। কথা বলতে পারার গুরুত্ব অসাধারণ। কথার সাহায্যেই মানুষ নিজের চিন্তাভাবনা অপরের কাছে পেশ করতে পারে। এই ভাষাই হচ্ছে ভাব-ভাবনা আদান প্রদানের মাধ্যম। এর মাধ্যমে মানুষ যা যা শিখল বা জানল তা অন্যকে শেখাতে বা জানাতে পারে। কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি মানবেতর প্রাণী কথা বলতে পারে না। পারে না চিন্তা করতে বা অন্যের কাছে নিজের ভাব ও ভাবনা প্রকাশ করতে। এদের জানার পরিধি অত্যন্ত সামান্য। এরা নিজেদের খাদ্য, শত্রু, মিত্র আর আত্মরক্ষার কৌশল ছাড়া তেমন বেশি কিছু জানে

www.pathagar.com

না। এরা তাদের জানা বিষয়কে বংশানুক্রমে সঞ্চারিত করে বেশি বেশি করে নতুন জ্ঞান লাভ করতে পারে না। কিন্তু মানুষ এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। মানুষের স্মরণশক্তি আছে। মানুষ তার অতীতের সকল প্রজন্মের জ্ঞানকে ধারণ করে নতুন কৌশল, যন্ত্র, পন্থা আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করে। এবং তা ভাষার মাধ্যমে অন্যকে শিখিয়ে যেতে পারে। মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের অনেকগুলো কারণের মধ্যে এটাও একটি।

মানুষের কিছু কলাকৌশল, রীতিনীতি, মূল্যবোধ চিরায়ত। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে এগুলো মানুষ লালন করে আসছে। মানব প্রেম, সাম্যবোধ, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি মানুষের মধ্যেই রয়েছে। মানুষ যতই কাতর হোক ক্ষুধায় সে তার সন্তানকে ধরে খাবে না এমনকি অন্য মানুষকেও না। কিন্তু প্রাণীকূলের মধ্যে এমন অনেক প্রাণী আছে যারা নিজের সন্তানকে পর্যন্ত খেয়ে ফেলে। মানুষ নিজের দেশের জন্য জীবন দেয়, অনেক সময় প্রিয়জনের জীবন রক্ষার জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দেয়। এটা তার শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন।

প্রাণীকূলের মধ্যে শুধুমাত্র মানুষই একমাত্র ব্যতিক্রম যারা শুধু পেটপুরে খাবারের মধ্যেই তাদের জীবনের সার্থকতা খুঁজে পায় না। মানুষ পেটের ক্ষুধা নিবারণের সাথে সাথে তার মনের ক্ষুধা প্রশমনেরও পথ অন্বেষণ করে। মানুষ চায় সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির চর্চা করতে। জীবনকে এসবের দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করতে চায় মানুষ। আবেগ উচ্ছ্বাস, দুঃখবোধ ইত্যাদি মানুষের মধ্যেই প্রবল। অন্যান্য প্রাণীদের তুলনায় মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই। এই শ্রেষ্ঠত্ব মানুষের দেহ–মনের সমন্বয়ের কারণে। এই সব কারণে মানুষ একটা বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। মানুষের এই মর্যাদা হচ্ছে সহজাত। মানুষ হিসেবে জন্ম নেয়ার কারণেই সে এগুলো অর্জন করেছে বা লাভ করেছে। মানুষের যে চিরকালীন প্রত্যাশা, স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও বিশ্বশান্তি, তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুনিশ্চিত করতে হলে প্রথম শর্ত হচ্ছে মানব পরিবারের সকল সদস্যের সহজাত মর্যাদার স্বীকৃতি দিতে হবে। এই মর্যাদা মানুষ হিসেবে সকলেরই সমান ও অবিচ্ছেদ্য । মানুষের অবিচ্ছেদ্য অধিকার (Inalienable rights) মানুষের যে সব অধিকার হরণযোগ্য নয়, সে সব অধিকার থেকে মানুষকে পৃথক করা যায় না সেগুলো হচ্ছে তার অবিচ্ছেদ্য অধিকার। ইংরেজিত বলা হয় (inalienable rights)। প্রশ্ন হচ্ছে, এমন কি অধিকার মানুষের আছে যেগুলো থেকে মানুষকে পৃথক ভাবা যায় না, এবং এই অধিকারগুলো হরণ করলে কি এমন অসুবিধা হবে? এর জবাবে বলা যায়, মানুষের অধিকার আছে চিন্তা ভাবনা করার, কথা বলার। মানুষ তা পারে। কিন্তু কেউ যদি মানুষের চিন্তা ভাবনার এবং তা প্রকাশের অধিকার হরণ করে তাহলে মানুষ আর মানুষ থাকে না। কথা বলার অধিকার নেই এমন মানুষ আর ভাষাহীন পশুতে তেমন ফারাক নেই। তাই কথা বলার অধিকারটি মানুষের অবিচ্ছেদ্য অধিকার। কথা বলার অধিকারটি কেড়ে নিলে মানুষের মনুষ্যত্বকেই কেড়ে নেয়া হল। চিন্তা, বিবেক, মতামত প্রকাশ, ধর্মাচরণ এবং অভিব্যক্তির স্বাধীনতা একই রকমের।

www.pathagar.com

মানুষের আরো কিছু অধিকার আছে যেগুলো অবিচ্ছেদ্য। একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে যে, এসব অধিকার কেড়ে নেয়া হলে মানুষ এবং পশুতে তেমন কোন তফাৎ থাকে না। এতে মানুষ মানবেতর পর্যায়ে নেমে পড়ে এবং তার মানবিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। এই অধিকারগুলো মানুষের বিকাশের জন্য তো বটেই ন্যূনতম বেঁচে থাকার জন্যও জরুরি। এবং জরুরি মানবিক মর্যাদাকে সমুন্নত রাখার জন্য। মানুষের অবিচ্ছেদ্য অধিকারগুলোকে মৌলিক অধিকার হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়। মানুষের যে সকল অধিকারকে অবিচ্ছেদ্য মনে করা হয় নিম্নে তার কয়েকটির সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদান করা হলো ।

ক. জীবন যাপন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার

খ. চলাচল ও বসবাসের স্বাধীনতা

গ. বিবাহ ও পরিবার গঠনের অধিকার

ঘ. শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও মেলামেশার অধিকার

ঙ. সম্পত্তির মালিকানার অধিকার

চ. ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার

ছ. বিশ্রাম ও বিনোদনের অধিকার

জ. স্বাস্থ্যসম্মত ও কল্যাণকর জীবনযাপনের অধিকার

ঝ. শিক্ষা অর্জন ও সাংস্কৃতিক জীবনের অধিকার

ঞ. দাসত্ব থেকে মুক্তির অধিকার।

উপরে যে অধিকারগুলো বয়ান করা হলো সেগুলো এমন যে, তা না হলে মানুষের চলে না। এ জাতীয় অধিকার আরো আছে। এখানে উদাহরণ হিসেবে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করা হলো। মানুষের এসব অবিচ্ছেদ্য অধিকার তার সহজাত মর্যাদার পরিপূরক। এ অধিকারগুলোর স্বীকৃতি ও অনুসৃতি না থাকলে মানুষের সহজাত মর্যাদা বিপন্ন হবে। সুতরাং যে কারণে মানুষের সহজাত মর্যাদা স্বীকৃতি দিতে হয় সেই একই কারণে তার অবিচ্ছেদ্য অধিকারেরও স্বীকৃতি দরকার।

বস্তুত বিশ্বশান্তি, ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতা সমুন্নত রাখতে হলে সকল মানুষের সহজাত মর্যাদার স্বীকৃতি দিতে হবে, স্বীকৃতি দিতে হবে মানুষের অবিচ্ছেদ্য অধিকারের। এই উপলব্ধি মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র জারি করার পেছনে প্রথম প্রেরণা। সকল মানুষের সহজাত মর্যাদা ও অধিকারের স্বীকৃতির জন্যই এই ঘোষণাপত্র জারি করা হয়েছে।

উপরে যে অধিকারগুলো বয়ান করা হলো সেগুলো এমন যে, তা না হলে মানুষের চলে না। এ জাতীয় অধিকার আরো আছে। এখানে উদাহরণ হিসেবে মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করা হলো। মানুষের এসব অবিচ্ছেদ্য অধিকার তার সহজাত মর্যাদার পরিপূরক। এ অধিকারগুলোর স্বীকৃতি

www.pathagar.com

ও অনুসৃতি না থাকলে মানুষের সহজাত মর্যাদা বিপন্ন হবে। সুতরাং যে কারণে মানুষের সহজাত মর্যাদা স্বীকৃতি দিতে হয় সেই একই কারণে তার অবিচ্ছেদ্য অধিকারেরও স্বীকৃতি দরকার।

বস্তুত, বিশ্বশান্তি, ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতা সমুন্নত রাখতে হলে সকল মানুষের সহজাত মর্যাদার স্বীকৃতি দিতে হবে, স্বীকৃতি দিতে হবে মানুষের অবিচ্ছেদ্য অধিকারের। এই উপলব্ধি মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র জারি করার পেছনে প্রথম প্রেরণা। সকল মানুষের সহজাত মর্যাদা ও অধিকারের স্বীকৃতির জন্যই এই ঘোষণাপত্র জারি করা হয়েছে।

প্যারা ঃ দুই

প্রস্তাবনার দ্বিতীয় প্যারায় একটি উপলব্ধি ও একটি প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে। উপলব্ধি হচ্ছে এই যে, মানব জাতির বিবেককে দারুণভাবে আঘাত করেছে এমন কিছু বর্বরোচিত ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত হয়েছে বিশ্বে এবং এসব হওয়ার কারণ হচ্ছে মানবাধিকারের প্রতি অবজ্ঞা ও অবমাননা। প্রত্যয়টি হচ্ছে এই যে, সকল মানুষ বাক্‌স্বাধীনতা, বিশ্বাসের স্বাধীনতা, এবং ভয় ও অভাব থেকে মুক্তি ভোগ করবে এমন একটি বিশ্ব গড়ে তোলা। প্রথমাংশে একটি প্রতিকূল পৃথিবীর বয়ান রয়েছে যেখানে মানুষের বসবাস সত্যিই দুঃসাধ্য আর শেষাংশে একটি অনুকূল বসবাসযোগ্য শান্তিপূর্ণ পৃথিবী গড়ার কথা বলা হয়েছে। নিম্নে পরস্পর বিপরীতধর্মী দুটি বিষয় আলোচিত হচ্ছে। এর একটি হচ্ছে অনাকাঙ্ক্ষিত ও দুঃসহ অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত উপলব্ধি, বর্তমান এবং অনাগতকাল সম্পর্কে আশাবাদ হচ্ছে অপরটি। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র জারির আরো আগে ১৯৪৫ সালের ২৬শে জুন সানফ্রান্সিসকো শহরে যখন জাতিসংঘ সনদ গৃহীত হয় তখন সেই সনদের শুরুতেই বলা হয়, 'যে যুদ্ধ আমাদের জীবনকালে দুই দুইবার মানব জাতির জন্য অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশা আনয়ন করেছে সে যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে পরবর্তী বংশধরদেরকে রক্ষা করবার জন্য' জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মূলত জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ের উপলব্ধিই মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র জারিতে আরো সুস্পষ্ট এবং সুদৃঢ় হয়েছে। এই উপলব্ধির স্বরূপ সন্ধানের জন্য আমাদের ফিরে যেতে হবে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৯)

১৯১৪ সাল। ইউরোপের পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ। সন্দেহ অবিশ্বাস অস্ত্র প্রতিযোগিতা, উগ্রজাতীয়তাবাদ ইউরোপের প্রতিটি জাতিকে গ্রাস করলো। সার্বিয়া তার পশ্চিম অভিযানে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অস্ট্রিয়া বিরোধী প্রচারনায় জোরেসোরে মেতে উঠলো। জার্মানি ও ইংল্যান্ডের জনগণ পরস্পরের বিরুদ্ধে তাদের প্রচার মাধ্যমগুলোকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে লাগলো। এরই মধ্যে ১৯১৪ সালের ২৮শে জুন অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ও তার পত্নী বসনিয়ার রাজধানী

www.pathagar.com

সারাজেভো শহরে প্রকাশ্য রাজপথে জনৈক আততায়ীর হাতে নিহত হন। সেই আততায়ী ছিল অস্ট্রিয় নাগরিক কিন্তু জাতিতে সার্ব।

এই হত্যাকাণ্ড অস্ট্রিয়ার অভ্যন্তরে ভীষণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলো। অস্ট্রিয়া হত্যাকাণ্ডের জন্য সর্বোতভাবে সার্বিয়াকে দায়ী করলো এবং সার্বিয়াকে ৪৮ ঘন্টা সময় দিয়ে একটি চরমপত্র প্রদান করলো। যার দাবি ছিল, সার্বিয়াকে অস্ট্রিয়া বিরোধী সকল প্রচারণা বন্ধ করতে হবে, সকল গোপন সংগঠন দমন করতে হবে, সকল অস্ট্রিয়া বিরোধী সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীকে অপসারণ করতে হবে, এবং অস্ট্রিয়ার যুবরাজের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করার বিষয়ে সার্বিয়া অস্ট্রিয়ার অফিসারদের অন্তর্ভুক্ত করবে। সর্বশেষটি ছাড়া অন্যান্য সকল দাবি মেনে নিতে সার্বিয়া স্বীকৃত হল। কিন্তু তাতে অস্ট্রিয়া সন্তুষ্ট না হয়ে সার্বিয়ার সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করলো এবং সৈন্য সমাবেশের নির্দেশ দিল। জার্মানি এ কাজে অস্ট্রিয়াকে পূর্ণ সমর্থন জানালো এবং ২৮শে জুলাই অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরি সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। অন্যদিকে সার্বিয়ার প্রতি সমর্থন জানিয়ে রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও জার্মান সীমান্তে তার সৈন্য সমাবেশ ঘটাতে লাগলো।

জার্মানি ৩১শে জুলাই রাশিয়াকে বারো ঘন্টার ,মধ্যে সৈন্য সমাবেশ বন্ধের জন্য চরমপত্র প্রদান করে। রাশিয়া এর কোন উত্তর না দেয়ার ফলে ১লা আগস্ট জার্মানি যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং ৩রা আগস্ট ফ্রান্সের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করে জার্মানি। বলকান প্রশ্নে আগ্রহ না থাকার কারণে ইংল্যান্ড এতদিন চুপ করেই ছিল কিন্তু বেলজিয়ামের দীর্ঘদিনের নিরপেক্ষতাকে ভঙ্গ করে জার্মানি বেলজিয়াম সীমান্ত লংঘন করে সৈন্য প্রেরণ করলে ইংল্যান্ড ফ্রান্স ও রাশিয়ার পক্ষে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ৪ঠা আগস্ট। শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

সমগ্র ইউরোপ এবং এশিয়া, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকায় ইউরোপীয় উপনিবেশগুলো ; চিন, জাপান, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহ এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধ চললো জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, শহরে, জনপদে, গ্রামে, শস্যক্ষেত্রে সর্বত্র। প্রতিটি নারী পুরুষ এতে জড়িয়ে পড়লো। কোন না কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো তাদের প্রাণ ও সম্পদ। পুরুষরা গেল রণাঙ্গনে আর নারীরা তাদের শূন্যস্থান পূরণ করল মাঠে, কলকারখানায়, অফিসে। এই যুদ্ধ সাদা-কালো, ধনী-গরীব, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জীবনেই নিয়ে আসলো অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট। অন্তহীন দুর্ভোগের মধ্যে কাটলো মানবেতর দীর্ঘ চার বছর। দীর্ঘ চার বছর পর যুদ্ধ যখন সমাপ্ত হলো তখন যে উদ্দেশ্য নিয়ে যে আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তার কোন অর্থই খুঁজে পাওয়া গেল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য কে দায়ী—এ প্রশ্ন উঠলে ঐতিহাসিকরা জার্মানিকে প্রধানত দায়ী করে থাকেন। কিন্তু যুদ্ধের জন্য সমগ্র ইউরোপই দায়ী। প্রত্যেকের স্বার্থবোধ এতখানি প্রাধান্য পেয়েছিল যে, এই প্রবণতা পৃথিবীকে অনিবার্যরূপে একটি মহাযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিল। যার পরিণতি শেষ পর্যন্ত কি হতে পারে তা বোধ করি কেউ একবারও ভেবে দেখে নি।

www.pathagar.com

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপ করলে এর ব্যাপকতার খানিকটা ইঙ্গিত মিলে। ভয়াবহতা, নিষ্ঠুরতা, ও ক্ষয়-ক্ষতির বিচারে এ যুদ্ধ পৃথিবীতে ইতিপূর্বে সংঘটিত সব যুদ্ধের মাত্রাকে অতিক্রম করে গেছে। রণাঙ্গনে যারা মৃত্যু বরণ করেছে তাদের সংখ্যা ৮০ লক্ষ। আহতদের সংখ্যা দুই কোটি। তাছাড়া আরো অনেকে মৃত্যুবরণ করেছে অনাহারে, রোগে, অপুষ্টিতে। আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ডের হিসেব অনুসারে ১৯১৮ সালের ৩১শে মে পর্যন্ত যুদ্ধরত দেশগুলোর সামগ্রীক ব্যয় হয়েছে ৩৫ হাজার মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং। এক একটি দেশের ঋণের বোঝা বর্গাকারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু শুধু ঋণের পরিমাণ দিয়েই যুদ্ধরত দেশগুলোর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপ করা সম্ভব নয়। শত্রু অধিকৃত দেশগুলোতে অপরিমিত ক্ষয়ক্ষতি ও অবর্ণনীয় দুর্দশার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। উত্তর ফ্রান্স, বেলজিয়াম, উত্তর ইতালি ও পোল্যান্ডের অংশ বিশেষে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প কারখানা প্রথম থেকে নির্মাণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। শিল্পের সমস্ত কাঁচামাল ধ্বংস হয়। যন্ত্রপাতি যতদূর সম্ভব লুটে নেয়া হয়েছে আর বাকীগুলো ধ্বংস করা হয়েছে। বর্বরতার সকল সীমা অতিক্রম করলো যখন অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরি সার্বিয়া ছেড়ে চলে যায়। যুদ্ধক্ষেত্রের ধ্বংসলীলা, যুদ্ধরত সৈন্যদের বর্বরতা সাধারণ মানুষের অসহায়তা, তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া জাতীয় ঋণের বোঝা—এসবই পরবর্তীকালে মানুষকে ভাবতে শিখিয়েছে যুদ্ধের কালো দিক সম্পর্কে। মানুষ ভাবতে শুরু করেছে যে, যুদ্ধ ছাড়া সংকট এড়ানোর আর কোন উপায় আছে কি না ?

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা মানুষের উপর চিরস্থায়ী ছাপ রেখে গেছে। এই যুদ্ধের ব্যাপকতা মানুষকে ভাবতে শিখিয়েছে যে, যুদ্ধ কোন মধ্যযুগীয় খেলার মত আনন্দদায়ক ব্যাপার নয়। আধুনিক যুদ্ধ তার সব রকমের নিষ্ঠুরতা ও ভয়াবহতা নিয়ে নিজের স্বরূপ উন্মোচন করেছে। এখন যুদ্ধ মানে দিনের পর দিন রণাঙ্গনে ট্রেঞ্চের মধ্যে লুকিয়ে থাকা, কামানের গোলা ও শেলের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে দেহ লুটিয়ে পড়া, আগুন ও বোমার দ্বারা মাইলের পর মাইল ঝলসে যাওয়া, এখন যুদ্ধ মানে অন্ধকারাচ্ছন্ন শহর, সর্বদা বোমা পড়ার আতংকে হিম হয়ে থাকা, সামান্য কিছু খাদ্যের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা। যুদ্ধে এখন সকলকে অংশ নিতে হয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। সন্তানকে যুদ্ধে পাঠিয়ে মাকে অপেক্ষা করতে হয় তার মৃত্যু সংবাদ শোনার জন্য। স্বামীকে যুদ্ধে পাঠিয়ে স্ত্রীকে নিতে হয় দায়িত্ব সমাজ ও সংসারের, কাজ করতে হয় কারখানায় বা মাঠে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ভাগ্যক্রমে বেঁচে আসা সৈনিককে দেখতে হয় বোমার আঘাতে নিশ্চিহ্ন পরিবার, খুঁজতে হয় ধ্বংসস্তূপে স্বজনের হাড়গোড়। যুদ্ধ কারো জন্য কল্যাণ বয়ে আনে না, না বিজয়ীর না বিজিতের ; না মৃতের, না বেঁচে থাকা মানুষের। যুদ্ধ মানেই অনাহার। যুদ্ধ মানুষের মানবিক বোধকে ধ্বংস করে পাশবিকতাকেই জাগিয়ে তোলে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা পর্যন্ত কুড়ি বছর সময়কালকে ঠিক শান্তির সময় না বলে যুদ্ধ বিরতিই বলা ভাল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিভিন্ন ঘটনা বিশ্বকে আরেকটি ভয়াবহ যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষত শুকাবার আগেই পৃথিবী আরেকটি সর্বনাশা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ঐতিহাসিকদের মতে ভার্সাই সন্ধিতে মিত্রশক্তির প্রতিনিধিদের প্রতিহিংসা চরিতার্থের প্রবৃত্তি, স্বার্থপরতা ও রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা, যুদ্ধভীতি প্রদর্শনপূর্বক জার্মানির উপর চাপিয়ে দেয়া শর্ত এবং পরবর্তীকালে ইঙ্গ-ফরাসি অনৈক্য , ফরাসি জার্মানি বিরোধ বিভিন্ন দেশের ব্যাপক সমরায়োজন, হিটলার ও মুসোলিনির মত একনায়কের উত্থান এবং রাজ্যগ্রাসের অদম্য ইচ্ছা ইত্যাদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ।

এসব কারণে ১৯৩৯ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি জার্মানি কর্তৃক পোল্যান্ড আক্রমণের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় মহাসমরের যাত্রা শুরু। এর পর পোল্যান্ড, পশ্চিম ইউরোপ, আফ্রিকা ও নিকট প্রাচ্য, জাপান ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, রাশিয়া ও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৯৪৫ সালে পৃথিবীর বুকে যুদ্ধের অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন নিয়ে বিশেষ করে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমার ভয়াবহ ধ্বংসলীলা বহন করে মানব জাতি আবার শান্তি অন্বেষণে বুক বাঁধে। যুদ্ধ শেষ হয় বটে কিন্তু রেখে যায় এর ভয়ানক স্মৃতিচিহ্ন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুধু মাটিকেই ক্ষতবিক্ষত করে নি, টুকরো টুকরো করেছে মানুষের মনকেও। এই মহাসমর তছনছ করে দিয়ে গেছে বিশ্বসংসার।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিঃসন্দেহে অন্যান্য যুদ্ধের মতই বর্বরোচিত কাজ ছিল। যুদ্ধ কোন কালেই কোন মহৎ কর্ম ছিল না। যুদ্ধ জয়ের পর বিজয়ী সৈন্যদের বিভিন্ন খেতাব ও সম্মানসূচক উপাধি দেয়া হয় সত্য কিন্তু যুদ্ধ বিজিত বিজয়ী কাউকেই মহৎ কিছু দিতে পারে না। ছোট বড় যে কোন মাত্রার যুদ্ধ মানুষের মনে যে গ্লানি, তিক্ততা ও ক্ষতের সৃষ্টি করে যায় তা সারিয়ে তুলতে অনেক বেগ পেতে হয়। কিছু কিছু ক্ষত একেবারেই শুকোয় না। তাই দুটি বিশ্বযুদ্ধে যে বর্বরোচিত কার্যকলাপ সংঘটিত হল সেটি মানব জাতির বিবেককে দারুণভাবে আঘাত করেছে। সেই আঘাতে ক্ষতবিক্ষত মানুষ বুঝতে পেরেছে যে মানুষের অধিকারের প্রতি অবজ্ঞা ও অবমাননাই হচ্ছে এই বর্বরোচিত কর্মকাণ্ডের মূল কারণ।

বেঁচে থাকার অধিকার, স্বাভাবিক জীবন যাপনের অধিকার, নিষ্ঠুর আচরণের শিকার না হওয়ার অধিকার ইত্যাকার কতিপয় মানবাধিকার নিয়ে মানুষ আসে এই ভুবনে। এই সব অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে যুদ্ধ নামের কোন বর্বরোচিত নাটক পৃথিবীতে মঞ্চস্থ হতে পারে না। যুদ্ধ তখনই বাঁধে যখন কিছু কর্তৃত্বসম্পন্ন মানুষ, ক্ষমতাশালী মানুষ মানবাধিকারের প্রতি

www.pathagar.com

অবজ্ঞা প্রদর্শন করে এবং মানবাধিকারকে অবমাননা করে। তাদের এই হীন আচরণই মানুষের লাঞ্ছিত হওয়ার মূল কারণ।

মানবাধিকারের প্রতি অবজ্ঞা ও অবমাননাই যে যুদ্ধের মতো বর্বরোচিত কর্মকাণ্ডের কারণ মানব জাতির সেই উপলব্ধি জাগ্রত হয়েছে এবং সেটা প্রতিফলিত হয়েছে প্রস্তাবনার দ্বিতীয় প্যারায়। এই উপলব্ধির কারণে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বসংস্থা 'জাতিসংঘ'।

মানব সভ্যতার এক সংকটময় মুহূর্তে যুদ্ধ-বিধস্ত, আতংকগ্রস্ত এবং অসহায় মানুষের নিকট শান্তি, নিরাপত্তা ও অস্তিত্বের স্বপ্ন নিয়ে আবির্ভূত হয় জাতিসংঘ।

জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠায় এমন একটি প্রত্যয় ছিল যে, বিশ্বকে গড়ে তোলা হবে ঠিক তেমনিভাবে যেখানে সকল মানুষ বাকস্বাধীনতা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা ভোগ করবে এবং ভয় ও অভাব থেকে মুক্ত থাকবে।

বাক্‌স্বাধীনতা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা না থাকলে মানুষ সত্যিকার অর্থে মানুষের মত বাঁচতে পারে না। আর ভয়, অভাব ও দারিদ্র্য মানুষের স্বাভাবিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। ভয়-ভীতি আর অভাব-দারিদ্র্য থেকে মুক্তি মানব সভ্যতার অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য। তেমনি অপরিহার্য বাকস্বাধীনতা এবং বিশ্বাসের স্বাধীনতাও। মানুষের উক্ত অপরিহার্য প্রয়োজনসমূহ পূরণ করা হবে এমন একটি বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় মৌলিক মানবিক অধিকার, প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদা ও যোগ্যতা, নারী-পুরুষ এবং ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল জাতির সমানাধিকারের উপর আস্থার সৃষ্টির লক্ষ্যে। 'নতুন বিশ্বের' যে সুসংবাদ মানব জাতিকে শোনানো হয়েছে তা কার্যকর করার জন্য মানবাধিকারের বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করে তোলা দরকার। এই উপলব্ধি ও বিশ্বাস মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র প্রণয়ন ও জারির অন্যতম কারণ।

প্যারা ঃ তিন

মানুষ বিদ্রোহ করে, বিপ্লব করে, প্রতিরোধ করে, প্রচলিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়মের বিরুদ্ধে, অনিয়মের বিরুদ্ধে, অন্যায় অত্যাচার ও নিপীড়ন উৎপীড়নের বিরুদ্ধে। মানুষ বিদ্রোহ করে অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে, জালিমের বিরুদ্ধে। কিন্তু কখন মানুষ বিদ্রোহ করে? মানুষ তখনই বিদ্রোহ করে যখন স্বাভাবিকভাবে অন্যায়, অত্যাচার, অনিয়ম ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিকার পাওয়া যায় না। যখন আইনের অনুশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে না তখনই মানুষ বিদ্রোহ করে, বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয়। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে বিদ্রোহ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহ সরল স্বাভাবিক কোন পথ নয়। এটি সর্বশেষ উপায়। অত্যাচার ও উৎপীড়ন থেকে বাঁচার শেষ পথ।

www.pathagar.com

মানুষ যাতে এই চূড়ান্ত পথটি গ্রহণ করতে বাধ্য না হয়, যাতে বিদ্রোহের আশ্রয় গ্রহণ করতে না হয় সেজন্য আইনের অনুশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা দরকার। আইন যদি মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতাকে সুরক্ষা করে তাহলে মানুষ বিদ্রোহের পথে এগুবে না। পরিবর্তনের এবং প্রতিকারের পথকে রোধ করে বিদ্রোহের পথ খুলে দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয় কারণ সমঝোতার মাধ্যমে মানুষ যা নেয় কেড়ে নিলে তার চেয়ে ঢের বেশি নেয়, কখনো কখনো সবটাই নেয়।

তাই প্রস্তাবনায় তৃতীয় প্যারায় এই উপলব্ধি ব্যক্ত করা হচ্ছে যে, আইনের অনুশাসনের দ্বারা মানবাধিকার রক্ষা করতে হবে। এটা এজন্য অপরিহার্য যে, আইনের অনুশাসনের দ্বারা মানবাধিকার রক্ষা না করলে বঞ্চিত মানুষ, বিপন্ন মানুষ বিদ্রোহ করবে। আর যখনই সমাজে বিদ্রোহ দেখা দেবে তখন সর্বস্তরের মানুষের জীবনে দুর্ভোগ নেমে আসবে, যা শান্তিপ্রিয় মানুষের কাম্য নয়।

প্যারা ঃ চার

প্রস্তাবনার চতুর্থ প্যারায় মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপযোগিতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, জাতিসমূহের মধ্যে মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য এটা অবশ্যই দরকার।

সারাবিশ্বে এখন অনেকগুলো জাতীয় রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিদ্যমান। রাষ্ট্রসমূহ স্বাধীন ও সার্বভৌম কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। সর্বাধিক উন্নত দেশসমূহও কোন না কোনভাবে অন্য দেশের উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া বিশ্বের ভারসাম্যহীন উন্নয়ন মানবতার জন্য হুমকিস্বরূপ। অধিকন্তু বিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদে সকল মানুষের অধিকার রয়েছে। তাই জাতিসমূহের মধ্যে সহযোগিতা দরকার। আর সহযোগিতার জন্য দরকার বন্ধুত্ব ও মৈত্রী । বিশ্বশান্তি নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা, উন্নয়ন এবং মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধির জন্য জাতিসমূহের মধ্যে মৈত্রী অপরিহার্য। কিন্তু বিভিন্নজাতির মধ্যে মৈত্রী ও সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্কের উন্নয়ন অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

শাসকদের ক্ষমতার লিপ্সা, স্বার্থের সংঘাত, পদানত করে রাখার খায়েশ, সম্পদের অসম বন্টন, অপরের সম্পদ গ্রাস করার প্রবণতা ইত্যাদির কারণে বিরোধ ও সংঘাত লেগেই থাকে। তাছাড়া রয়েছে বিভিন্ন রকমের রাজনৈতিক ভুল বুঝাবুঝি। জাতীয় নেতৃত্বের অদক্ষতা এবং কূটনীতির গুণগত মানের অবনতিও মৈত্রীর পথে প্রধান প্রতিবন্ধক।

এমতাবস্থায় জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, মৈত্রীর সম্পর্ক উন্নয়ন করতে চাইলে সকল মানুষের সমঅধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। স্বার্থের সংঘাতে কারো অধিকার যাতে বিনষ্ট না হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। মৈত্রীর সম্পর্ক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে স্বাভাবিক, সুস্থ ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক তৈরি। এই সম্পর্ক তখনই প্রতিষ্ঠা পাবে যখন সকল

www.pathagar.com

মানুষের মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা হবে। তাই বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন ও মৈত্রীর বন্ধন সুদৃঢ় করার জন্য মানবাধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

প্যারা ঃ পাঁচ

জাতিসংঘ সনদ প্রণয়নের সময় এতে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ অর্থাৎ জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রবর্গ, এই মর্মে দৃঢ়বিশ্বাস ব্যক্ত করেছে যে, মৌলিক মানবাধিকার, মানব ব্যক্তিত্বের মর্যাদা এবং নারী-পুরুষ সমান। প্রত্যেকের রয়েছে সমানাধিকার। মৌলিক মানবাধিকার ও মানব ব্যক্তিত্বের মর্যাদা ও মূল্য সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। বস্তুত, সকল মানুষের মৌলিক মানবাধিকার সমান এবং প্রত্যেকেই জন্মগতভাবে সমমর্যাদার অধিকারী।

জাতিসংঘ সনদে মানব সমাজের অগ্রগতি সাধন ও জীবনমানের উন্নতি বিধানের জন্য সংকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। সামাজিক অগ্রগতি ও জীবন মানের উন্নয়ন করা হবে বৃহত্তর মুক্ত পরিবেশে। শৃঙ্খলিত মানুষ সুখী নয় তাই বন্দীত্বের মধ্যে প্রাচুর্যও মানুষের কাম্য নয়। মানুষ উন্নয়ন অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির সাথে স্বাধীনতা চায়। জাতিসংঘ সনদের মধ্যে বিভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠী, যারা এতে অংশগ্রহণ করেছে তারা ঘোষণা করেছে এবং দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে যে, বৃহত্তর মুক্ত পরিবেশ সমাজের অগ্রগতি ও জীবন মানের বিধান করা হবে। এই সংকল্প বা প্রত্যয় বাস্তবায়নের জন্য দরকার মানবাধিকার আরো সুস্পষ্ট করে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা এবং এসব মানবাধিকার যাতে প্রতিপালিত হয় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ।

প্যারা ঃ ছয়

মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সর্বজনীন শ্রদ্ধা এবং এগুলো প্রতিপালনের উন্নতি বিধান করতে কাউকে বাধ্য করা হয় নি। মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং মানুষের মর্যাদা ও অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জোর করে আদায় করা যায় না। এসব ক্ষেত্রে শ্রদ্ধাবোধ জাগাতে দরকার শিক্ষা, অনুপ্রেরণা ও প্রভাবিতকরণ। মানুষকে এ বিষয়টি বুঝাতে হবে যে, নিজের শ্রদ্ধা সম্মান রক্ষা করতে হলে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে, অন্যের মর্যাদা ও সম্মানের প্রতি অবজ্ঞা করা যাবে না। জাতিসংঘ সনদে অংশগ্রহণকারী সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে বাধ্য করা হয় নি বরং সকল সদস্য রাষ্ট্র নিজেরা স্বেচ্ছায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে যে, তারা মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে এবং এগুলো প্রতিফলনের উন্নতি বিধান করবে।

জাতিসমূহ যখন স্বেচ্ছায় কোন প্রতিশ্রুতি দেয় তখন স্বাভাবিকভাবেই এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দায়িত্ব বর্তায় তাদের উপর। প্রতিশ্রুতিকে কিভাবে সর্বোত্তম কার্যকর করা যায় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কর্মসচি নেয়া ও তার সফল বাস্তবায়নের দায়িত্বও বর্তায় জাতিসমূহের উপর।

www.pathagar.com

জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্রবর্গ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তারা মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সর্বজনীন শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও জাগ্রত করবেন এবং এই বিষয়টি প্রতিপালনের উন্নতি বিধান করবেন জাতিসংঘের সহযোগিতায়।

জাতিসমূহের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত উক্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য দরকার মানবাধিকারগুলো সুনির্দিষ্ট করা এবং এগুলোর অর্জনের আইনগত ভিত্তি তৈরি করা।

প্যারা ঃ সাত

মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করা এবং এগুলো প্রতিপালনের উন্নতি বিধানের যে প্রতিশ্রুতি জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্রসমূহ দিয়েছে সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য দরকার একটি সাধারণ সমঝোতা গড়ে তোলা। সমঝোতায় আসতে হবে মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতার বিষয়ে।

মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার বিষয়টি সর্বজনীন। দুনিয়ার সকল অঞ্চলের সকল অবস্থার সকল মানুষের জন্য এই অধিকার ও স্বাধীনতা সমান। কেউ তা পাবে আর কেউ পাবে না এমনটি হয় না। এই সর্বজনীন বিষয়টি যথাযথভাবে তখনই বাস্তবায়িত হতে পারে যখন দেখা যায় সকলেই এ ব্যাপারে একমত। মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতার ব্যাপারে সকলে একমত হলেই তা রক্ষা করতে পারে। আর তাই মানবাধিকারের বিষয়ে একটি সাধারণ সমঝোতা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। সাধারণ সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত না হলে মানবাধিকারের বিষয়টি সর্বজনীন হতে পারে না।

আনুষ্ঠানিক ঘোষণা

প্রস্তাবনায় বর্ণিত প্রয়োজন ও গুরুত্বের প্রেক্ষিতে সামগ্রিক দিক বিবেচনা করে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১০ই ডিসেম্বর ১৯৪৮ সালে তার সিদ্ধান্ত নং ২১৭ এ (১১১) দ্বারা এই ঘোষণাপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচার করেছে। এই ঘোষণাপত্রের শিরোনাম হচ্ছে, 'মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র'। এই ঘোষণা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচারের দুটি লক্ষ্য রয়েছে।

১. যাতে সকল সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি ও প্রতিটি অংশ এই ঘোষণার কথা সর্বদা মনে রেখে অধ্যাপনা ও শিক্ষার মাধ্যমে এসব অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি সম্মান বৃদ্ধি করতে কঠোরভাবে চেষ্টা করে।

২ যাতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রগতিশীল কর্মব্যবস্থার মাধ্যমে সদস্যরাষ্ট্রগুলোর জনগোষ্ঠীসমূহ এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসনাধীন ভূখণ্ডের জনগণের মধ্যে এসব অধিকার ও স্বাধীনতার সর্বজনীন ও কার্যকরী স্বীকৃতি ও প্রতিপালন নিশ্চিত করতে প্রয়াস পায়।

www.pathagar.com

এখানে যে দুটি লক্ষ্য অর্জনের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে প্রথমটি অর্জনের মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান আর দ্বিতীয়টি অর্জনের উপায় হচ্ছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রগতিশীল কর্মব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। এই দুটি লক্ষ্য এবং তা বাস্তবায়নের উপায় সম্পর্কে এবারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় বর্ণিত অধিকার ও স্বাধীনতা ব্যক্তিমানুষ এবং মানব সমাজের জন্য অত্যন্ত দরকারি বিষয়। এইসব অধিকার ও স্বাধীনতাবিহীন মানুষ পশুরও অধম। মানুষকে মানুষ হিসেবে সম্মান ও ইজ্জতের সাথে বেঁচে থাকতে হলে তার এসব অধিকার ও স্বাধীনতা দরকার হবে। এসবের অনুপস্থিতি মানব ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক বিকাশকে রুদ্ধ করবে। পানি ও আলো বাতাস উদ্ভিদ ও প্রানীর জীবনে যতখানি গুরুত্বপূর্ণ ঠিক ততখানি গুরুত্বপূর্ণ মানুষের জীবনে এসব অধিকার ও স্বাধীনতা। মানবাধিকার ছাড়া আধুনিক মানব সমাজের উন্নতি সমৃদ্ধি ও বিকাশ আশা করা যায় না।

মানবাধিকারে বর্ণিত অধিকার ও স্বাধীনতাকে কার্যকর করতে হলে এসবের প্রতি সম্মান বৃদ্ধি করতে হবে। মানবাধিকার তথা অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হলে সেটা মানুষের প্রতিই সম্মান প্রদর্শন করা হবে। আবার অন্যের অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি সম্মান দেখালে মানুষ এর প্রতিদান দেবে অর্থাৎ নিজের অধিকার এবং স্বাধীনতাও সম্মানের সাথে রক্ষিত হবে। এই বিষয়টি হচ্ছে পরস্পরের পরিপূরক। একক চেষ্টায়ই শুধু তাকে সংরক্ষণ করা যায় না, সম্মিলিত চেষ্টার মাধ্যমে কার্যকর করতে হয়।

মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি সম্মান বৃদ্ধি করতে হলে কঠোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। প্রতিকূল পরিবেশে মানবাধিকার প্রতিনিয়তই হুমকীর সম্মুখীন। এমতাবস্থায় সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি এবং কঠোর প্রচেষ্টা ছাড়া তা রক্ষিত হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে সহায়তা নিতে হবে শিক্ষা ও অধ্যাপনার। এর মাধ্যমে অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি সম্মান বৃদ্ধির চেষ্টা করা যায়।

শিক্ষা হচ্ছে মানুষকে প্রভাবিত করার সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম। মানুষ বিশেষ কোন চিন্তা, দর্শন বা আদর্শ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। জন্মের পর খাদ্য ও পুষ্টি যেমন মানুষের দৈহিক বিকাশে সহায়তা করে তেমনি শিক্ষা মানুষের মনের বিকাশ সাধন করে। নিজেকে, সমাজকে, সমাজে নিজের অবস্থানকে এবং সামাজিক মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কে মানুষ জানতে পারে শিক্ষার মাধ্যমে। শিক্ষা বলতে এখানে শুধু প্রতিষ্ঠান শিক্ষার কথা বলছি না। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তো রয়েছেই তার উপর রয়েছে যে কোন উপায়ে কোন কিছু জানা বা শেখা। চলতে, ফিরতে, দেখে দেখে মানুষ অনেক কিছুই শেখে, শেখে অন্যের আচরণ থেকেও। বিশেষত, শিশু শিক্ষার একটা বিরাট অংশ গ্রহণ করে পরিবারের সদস্যদের নিকট থেকে এবং পারিবারিক পরিবেশ থেকে। মানুষের শিক্ষার সূচনা হয় শৈশব থেকে আর তা অব্যাহত থাকে মৃত্যু অবধি। শিক্ষা মানুষ গড়ার উপায়। মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশের মাধ্যমে তাকে সমাজের উপযোগী করে গড়ে তোলে শিক্ষা।

www.pathagar.com

মানুষের অধিকার বৃদ্ধি করতে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। শিক্ষক অধ্যাপনার সময় আর কর্তৃপক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার সময় যদি মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি সম্মান বৃদ্ধির কথা মনে রাখেন তাহলে শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে সেভাবে মটিভেট করা সম্ভব। মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা, মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি সম্মানবোধ শিক্ষার্থীর মধ্যে জাগিয়ে তুলতে চাইলে শিক্ষার মাধ্যমে তা করা সম্ভব। শিক্ষার কারিকুলাম ও লক্ষ্য সে অনুযায়ী নির্ধারণ করলে মানুষের মনে মানবতাবোধ জাগ্রত হতে বাধ্য। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি হয় মানুষকে প্রকৃত অর্থে মানুষ করা, তাহলে কার সাধ্য তাকে রুখে।

শিক্ষার্থীর উপর শিক্ষকের প্রভাব অপরিসীম। শিক্ষক তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং তার আলোচনা ও বক্তব্যের মাধ্যমে ছাত্রকে প্রভাবিত করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে কোন কোন শিক্ষকের ক্ষমতা অসাধারণ। শিক্ষার্থীর মনে মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের চেতনা জাগিয়ে তুলতে শিক্ষক যদি সচেষ্ট হন তাহলে অন্য যে কোন উপায় থেকে তা হবে অধিক কার্যকর। মহৎ শিক্ষক ছাত্রের মনে মানবতাবোধ জাগাতে অবশ্যই সফল হবেন।

তাই মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে এই লক্ষ্যে প্রচার করা হয়েছে যে, সকল সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি ও প্রতিটি অংশ এই ঘোষণার কথা সর্বদা মনে রাখবে এবং অধ্যাপনা ও শিক্ষার মাধ্যমে এসব অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি সম্মান বৃদ্ধি করতে কঠোরভাবে চেষ্টা করবে। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মনে মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি সম্মানবোধ জাগিয়ে তুলতে পারলে মানবাধিকার রক্ষা অনেকাংশে সহজতর হবে।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে বর্ণিত অধিকার ও স্বাধীনতার সর্বজনীন স্বীকৃতি ও কার্যকর প্রতিপালনের লক্ষ্যে এই ঘোষণাপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচার করা হয়েছে। অধিকার ও স্বাধীনতার সর্বজনীন স্বীকৃতি ও কার্যকর প্রতিপালন নিশ্চিত করার দায়িত্ব জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের। এই ঘোষণাপত্র সকল সদস্যরাষ্ট্র স্বেচ্ছায় গ্রহণ ও প্রচার করেছে। অতএব, তাকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের দায়িত্বও তাদের। রাষ্ট্রসমূহ তাদের জনগোষ্ঠী এবং জনগণের মধ্যে এইসব অধিকার ও স্বাধীনতার সর্বজনীন স্বীকৃতি ও কার্যকর প্রতিপালন নিশ্চিত করবে। এর জন্য জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মব্যবস্থা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করবে এবং এই কর্মব্যবস্থা হবে প্রগতিশীল।

অশিক্ষা, দারিদ্র্য, পরিবেশ দূষণ, রোগ–ব্যধি ইত্যাদি মানবাধিকারের প্রতি মারাত্মক হুমকি। এসবকে নির্মূল করতে না পারলে মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতার কার্যকর প্রতিপালন সম্ভব নয়। তাই মানবাধিকারের ঘোষণা বাস্তবায়নের পথে যে সকল আর্থিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধক রয়েছে সেগুলো অপসারণের জন্য প্রগতিশীল কর্মব্যবস্থা নিতে হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এসব কর্মব্যবস্থার মাধ্যমে মানবাধিকার রক্ষার অনুকূল পরিবেশ গড়ে তেলা সম্ভব। এসব কর্মব্যবস্থার মধ্যে থাকতে পারে শিক্ষা বিস্তার, বেকারত্ব রোধ, চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধি, পরিবেশ সংরক্ষণ, আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন ইত্যাদি।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ ঃ ১

সকল মানুষ স্বাধীনভাবে এবং সমমর্যাদা ও সমান অধিকার নিয়ে জন্মে। তাদের উচিত বিচারবুদ্ধি ও বিবেকের অধিকার এবং ভ্রাতৃত্বের মনোভাব নিয়ে পরস্পরের সাথে আচরণ করা।

(Article : 1. All the human beings are born free and euqal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.)

ভাষ্য

আলোচ্য অনুচ্ছেদ মানুষ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, মানুষ জন্মগ্রহণ করে সমমর্যাদাবান ও সমঅধিকার নিয়ে স্বাধীনভাবে, এবং

মানুষ বিচার-বুদ্ধি ও বিবেকের অধিকারী। এবং

মানুষের উচিত ভ্রাতৃত্বের মনোভাব নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে আচরণ করা।

বিষয়গুলো ব্যাপক বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

মানব অধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার এই অনুচ্ছেদে জন্মগতভাবেই মানুষকে স্বাধীন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই ঘোষণা অনুসারে মানুষ জন্মগতভাবেই স্বাধীন।

মানুষের উদ্ভব ঃ জীবন জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হচ্ছে মানুষ। মানুষ সবচেয়ে বুদ্ধিমান এবং ফলে সবচেয়ে ক্ষমতাবান। গোটা পৃথিবীর উপর মানুষ রাজত্ব করছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষ এলো কোত্থেকে।

www.pathagar.com

বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন তার 'থিউরি অব ইভলিউশন' তথা ক্রমবিকাশ তত্ত্বে বলেছেন, ক্রমাগত পরিবর্তনের মাধ্যমে এক প্রাণি থেকে আরেক প্রাণিতে বিবর্তিত হতে হতে মানুষের উৎপত্তি বা আবির্ভাব হয়েছে।

মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে। তবে মানুষ যে সৃষ্টির সেরা জীব এবং জীবজগতের অন্যান্য প্রাণিও যে মানুষের অধীন এ বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই। সৃষ্টির এই সেরা জীব মানুষের ক্রমমিকাশ সম্পর্কে আমরা এবারে আলোচনা করব।

মানুষের ক্রমবিকাশ

কবে, কখন, কোথায় আদিমানবের জীবনের শুরু হয়েছে, শুরু হয়েছে আজকের কোটি কোটি মানুষের উৎসধারা, উপ্ত হয়েছে বর্তমান মানব সভ্যতার বিশাল বীজ তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে নৃবিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণায় আজ থেকে প্রায় চার লক্ষ বছর আগের এক ধরনের আদিম মানুষের সন্ধান পেয়েছেন। উত্তর চীনের পিকিং শহরের কাছাকাছি চৌকৌতিয়েন গুহায় এদের মাথার খুলি, পাথরের তৈরি অস্ত্রশস্ত্র এবং এদের শিকার করা অনেক জীবজন্তুর হাড়গোড় পাওয়া গেছে। অনুমান করা হয় যে এরা আগুনের ব্যবহার জানত। প্রথম প্রস্তর যুগের মানুষ পাথরের অস্ত্র তৈরির ব্যাপারে দক্ষতা অর্জন করে, এরা খাবার সংগ্রহ করত, উৎপাদন করতে জানত না। এরপর মধ্য প্রস্তর যুগে মানুষ পানির কিনারে, বসতি শুরু করে। নৌকার ব্যবহার, কুকুরকে বশ্যতা স্বীকার করানো এই সময়ের মানুষের কৃতিত্ব। এ সময় মানুষ মাছ শিকারেও দক্ষ হয়ে ওঠে। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ, নরওয়ে, সুইডেন আর বাল্টিক সাগরের কাছাকাছি উপকূলগুলোতে তখন মানুষের বসতি ছিল। প্রস্তর যুগের শেষদিকে প্যালেস্টাইন অঞ্চলের পাহাড়ে এবং অরণ্যে একধরনের মানুষের চিহ্ন পাওয়া যায় ; এরা শিকার এবং খানিকটা চাষবাসের দিকেও নজর দিয়েছিল। গহনা পরা, মৃত মানুষকে কবর দেয়ার ধারণাও তখন চালু হয়। প্রকৃতির সাথে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ আর সংগ্রাম করে করেই এই সময়ে মানুষ কোন রকমে টিকে ছিল। মানুষের ক্রমবিকাশের এই স্তরে মানবমননে মানবাধিকারের কোনো চেতনা জাগ্রত হয় নি।

এরপর মানুষ স্থিত হয় কৃষিজীবনে। এখন থেকে প্রায় দশ থেকে ছ'হাজার বছর আগে পশ্চিম এশিয়ার নানা অংশে প্রথম চাষীদের গ্রামগুলোর গোড়াপত্তন হয়েছিল। চাষবাস করার জন্য এক জায়গায় বসবাস করতে হয় মানুষকে। এক জায়গায় বসবাস করার সঙ্গে সঙ্গে সে কেবল প্রকৃতির দয়ার উপর নির্ভর করে রইল না। দেশ বিদেশে, দিগ্বিদিকে খাবারের সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরে না বেড়িয়ে মানুষ এক জায়গায় বসে বসে জন্তুজানোয়ার পোষ মানাতে, শস্য, মাংস, ফল-মূল, খাবার জিনিস রাখবার জন্য বাসনকোসন আর ঐসব জিনিস রাখা ও নিজেদের থাকার জন্য ঘর বাড়ি তৈরি করতেও শিখেছিল ঐ সময়ে। তখন থেকেই আস্তে আস্তে পাহাড়ের পাদদেশে আর নদীর অববাহিকায় গড়ে উঠতে শুরু করে মানব সভ্যতা।

www.pathagar.com

কৃষিজীবন থেকে মানুষ ক্রমশ নগর সভ্যতার দিকে এগিয়ে যায়। এ সময়ে শুরু হয় ব্রোঞ্জের ব্যবহার। তখনই পৃথিবীতে সুমেরিয় সভ্যতা, মিশরীয় সভ্যতার মত বিভিন্ন সভ্যতার স্পর্শে পৃথিবীর রূপ দ্রুত পাল্টাতে শুরু করে।

তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল বর্তমান ইরাকে তখন সুমেরীয় সভ্যতার সাক্ষী হিসেবে গড়ে উঠেছিল উর, এরিডু, উরুক, আক্কাদ, নিনেভ, লাগাশ, কিশ, নিপপুর, ব্যাবিলন প্রভৃতি শহর। পরবর্তীতে এগুলো হয় শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। এ সময় মানুষ শিক্ষা, ভাষা, ধর্ম, উপাসনালয়, শাসন, আইন-কানুন, ইমারত ইত্যাদির সাথে পরিচিত হয়।

লেখাপড়া ও বিদ্যাচর্চার ব্যাপারে তাদের মধ্যে বেশ আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। সুমেরীয় সভ্যতায় অনেক বড় বড় রাজা আর রাজবংশের উদ্ভব হয়েছিল। এদের অন্যতম হচ্ছে আক্কাদীয় সাম্রাজ্য। এরপর বেশ কয়েক'শ বছর অতিবাহিত হলে আরবীয় অঞ্চলে রাজা হাম্বুরাবি খুবই খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর সময়ই বাহ্যত আইনের সূচনা হয়। "অপরাধীর জন্য শাস্তি বিধান ছাড়াও তাঁর আইনে চাষী, চিকিৎসক, মধ্যবিত্ত, বিত্তবান, শ্রমিক, শিক্ষক ও সমাজের সমস্ত নরনারীর জন্য নিয়মকানুন বেঁধে দেয়া হয়েছিল। সুমেরীয় সভ্যতার প্রায় সমসাময়িক কালে মিশরের নীল নদের কোল ঘেঁষে আরেকটি সভ্যতা গড়ে ওঠে—যা মিশরীয় সভ্যতা নামে খ্যাত। গগণচুম্বী স্থাপত্যের নিদর্শনে আর চিত্রকলা ইত্যাদি দিয়ে মিশর পৃথিবীর ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে।

এরপর বিভিন্ন স্থানে আমেরীয় হিব্রু, ফিনিশীয়, ক্রীট প্রভৃতি সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশ হয়। এই সকল সভ্যতা মানুষকে একটি স্তর থেকে আরেকটি স্তরে উন্নীত করে। মানুষ ক্রমাগত চেষ্টা সাধনা আর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির প্রতিকূল অবস্থাকে জয় করে সভ্যতার বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। বস্তুত মানুষ প্রকৃতির সৃষ্টি আর সভ্যতা মানুষের সৃষ্টি। দীর্ঘ চেষ্টা সাধনা, চিন্তা গবেষণা আর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানুষ গড়ে তুলেছে তার নিজের জগত, নিজের সভ্যতা।

কৃষিজীবন থেকে মানুষ শিল্পী সংস্কৃতির যুগে পদার্পণ করে। শিল্পযুগেই মানবসভ্যতার অগ্রগতি হয় সর্বাধিক। এ যুগের শুরুতে মানুষের অগ্রযাত্রা প্রথমে পুঁজিবাদী ধারায় অগ্রসর হয়। বিংশ শতাব্দীতে এই অগ্রযাত্রা পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী এই দু'টি পরস্পর বিপরীত ধারায় অগ্রসর হয়ে শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে পুনরায় পুঁজিতান্ত্রিক বা মুক্তবাজার অর্থনীতির ধারায় অগ্রসর হচ্ছে।

সমাজতাত্ত্বিকদের মতে, আদিম সমাজ ছিল বৈষম্যহীন। মার্ক্সীয় পণ্ডিতগণ যাকে বলেছেন আদিম সাম্যবাদ। এরপর মানুষ যখন পশুপালনের যুগে পদার্পণ করে তখনই ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভব হয়। এবং সমাজে শ্রেণী বৈষম্য দেখা দেয়। তখন থেকেই দান, উপহার, লগ্নি, বন্ধকী ইত্যাদি অর্থনৈতিক কার্যধারা চলতে শুরু করে। যা ছিল বৈষম্যের উপায় বা উপাদান। পশুপালন বা যাযাবর জীবন থেকে কৃষি যুগে পদার্পন করলে বৈষম্য আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে

www.pathagar.com

এবং শিল্প যুগে তার চরম বিকাশ ঘটে। ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এই যে, এতে বৈষম্য বিদ্যমান থাকে। শিল্প বিপ্লবের ফলে ইউরোপে পুঁজিপতি এবং শ্রমিকের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি হয় আকাশ পাতাল। উনবিংশ শতাব্দীতে বৈষম্য থেকে পরিত্রাণের জন্য বিশ্বব্যাপী শ্রমিক আন্দোলন জোরদার হতে থাকে এবং এর ফলে এই শতাব্দীর শুরুতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ছিল বৈষম্যহীনতার এবং সমতার সংগ্রাম। কিন্তু শতাব্দীর শেষ দশকে এসে এই মতাদর্শ আবার অকার্যকর হয়ে পড়েছে তবে বৈষম্যের বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম থেমে যায় নি। এখনো সাম্যের জন্য মানুষের সংগ্রাম চলছে।

মানব স্বাধীনতা

শুরুতেই স্বাধীনতা সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীদের কথা উল্লেখ করা যাক। স্বাধীনতা প্রসঙ্গে জন স্টুয়ার্ট মিল বলেছেন, অপরের স্বাধীনতার উপর ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে হস্তক্ষেপ করা একটিমাত্র ক্ষেত্রে সমর্থনযোগ্য এবং তা হচ্ছে আত্মরক্ষা। কেবল অন্যের অনিষ্ট করা থেকে নিবৃত্ত করার জন্যই কোন সুসভ্য সমাজের সদস্যকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর প্রয়োগ সমর্থন করা যায়। তার শারীরিক বা মানসিক উপকার হবে এই অজুহাতে তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করানো উচিত নয়। তিনি বলেন, নিজের উপর, নিজের দেহ ও মনের উপর ব্যক্তির সার্বভৌমত্বই হচ্ছে স্বাধীনতা।

অধ্যাপক লাস্কি (Laski) বলেন, স্বাধীনতা বলতে আমি সেই পরিবেশের সাগ্রহ সংরক্ষণ বুঝি যা দ্বারা মানুষ তার শ্রেষ্ঠ সত্তা উপলব্ধি করার সুযোগ পায়। তিনি আরো বলেন, স্বাধীনতা বলতে আমি বুঝি সেই সকল সামাজিক অবস্থার উপর হতে বিধিনিষেধ অপসারণ যা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অপরিহার্য।

ঐতিহাসিক র‍্যামজে মুইর (ramsay Muir) বলেন, স্বাধীনতা বলতে আমি ব্যক্তিদের দ্বারা এবং জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়, ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতি স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত সংস্থা দ্বারা তাদের নিজেদের ভাবনা নিজে ভাববার এবং সেই অনুসারে কাজ করার ক্ষমতার সুনিশ্চিত উপভোগ বুঝি। তারা আইনের ছত্রচ্ছায়ায় বসে নিজ নিজ শক্তি নিজের অভিপ্রায় অনুসারে ব্যবহার করবে। এবং অন্যের অনুরূপ ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ করবে না।

শাব্দিকভাবে স্বাধীনতা বলতে স্ব-অধীনতা বুঝায়। এর অর্থ হচ্ছে যে, পরের বা বাইরের কোন শক্তির অধীনতা তাকে স্পর্শ করে না। কিন্তু নিয়ন্ত্রণহীন বা অবাধ স্বাধীনতা, যা স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর, তা স্বাধীনতা হিসেবে স্বীকৃত নয় ; কারণ তা সমাজে অচল বা অবাস্তব। সমাজে বাস করতে হলে নিজে যে সুবিধা চাই অন্যরাও যাতে সেই সুবিধা ভোগ করতে পারে সে বিষয়টি দেখতে হবে। প্রত্যেকেই যদি অবাধ ও সীমাহীন স্বাধীনতা চায় তাহলে একে ইচ্ছার সাথে অপরের ইচ্ছার বিরোধ বাধবে। এতে সমাজে 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি চালু হবে। এর ফলে

www.pathagar.com

সৃষ্ট স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে স্বাধীনতা থাকতে পারে না। স্বাধীনতা তাই নদীর স্রোতের মত অবাধ গতিতে প্রবাহিত হতে পারে না।

স্বাধীনতা বলতে, মানুষের সে সব অবাধ কাজকর্মকে বুঝায়, যা অন্যের অধিকার বা তদ্রূপ স্বাধীনতাকে খর্ব না করে সম্পন্ন করা সম্ভব। স্বাধীনতার এই অর্থে স্বাধীনতা ভোগ বা সংরক্ষণের জন্য সকলের কাজের উপরে আইনগত কতগুলো বাধা নিষেধ আরোপ করা আবশ্যক।

স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে স্বইচ্ছায় বা স্বেচ্ছায় নিজের অধীনে জীবন যাপন করা। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অধীন না হয়ে নিজের জীবনকে বিকশিত করার উম্মুক্ত সুযোগই স্বাধীনতা। সাধারণভাবে নিজের ইচ্ছামত কাজ করার সুযোগকেই স্বাধীনতা বলে। কিন্তু ইচ্ছা হলেই যা খুশী তাই করার অধিকার স্বাধীনতা নয়, এটা স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর। কারণ যা খুশী তাই করলে বা করতে চাইলে নিঃসন্দেহে অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হবে। নিজে স্বাধীনভাবে চলতে গিয়ে অন্যের স্বাধীনতায় ব্যাঘাত সৃষ্টির অধিকার কারো নেই। তাই স্বেচ্ছাচারিতা কে আমরা স্বাধীনতা বলতে পারি না এবং মানবিক অধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় যে স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে অন্যের স্বাধীন জীবন যাপনে বাধার সৃষ্টি না করে নিজের ইচ্ছামত জীবনযাপন করার অধিকার।

স্বাধীনতাহীনতা

মানুষের স্বাধীনতা কিভাবে খর্বিত হয় সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা দরকার। মানব জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, মানুষের স্বাধীনতা দুদিক থেকে খর্ব হয়। একটি হচ্ছে বিভিন্নভাবে ব্যক্তির স্বাধীনতা খর্বিত হওয়া। এতে ব্যক্তিকে তার স্বাধীন ও মুক্ত চালচলন, আচরণের বাধা সৃষ্টি করা হয়। অন্যটি হচ্ছে জাতির স্বাধীনতা খর্বিত হওয়া। এটা একটা জাতিকে অন্য জাতি কর্তৃক অবদমন করারই উপায়। ব্যক্তির স্বাধীনতা খর্ব হলে ব্যক্তির বিকাশ যেমন বাধাগ্রস্ত হয় তেমনি জাতীয় স্বাধীনতা খর্ব হলে জাতির উন্নতি অগ্রগতির পথ হয় রুদ্ধ। পরাধীনতা ব্যক্তির জীবনের জন্য যেমন কলংক তেমনি জাতির জীবনের জন্যও অভিশাপ। কিন্তু কতটুকু স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি বা পাচ্ছি?

একুশ শতকের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে আজকের মানব সভ্যতা। বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির নব নব অগ্রগতির দ্বারা এ যুগে মানুষ প্রকৃতির উপর তার নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ অর্জন করেছে। আধুনিক কৃৎকৌশলের প্রয়োগে উৎপাদনের সম্ভাবনা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অমিত সম্পদ সৃষ্টির ক্ষমতা এখন মানুষের হাতে, কিন্তু এই আধুনিক ও প্রাগ্রসর যুগের অধিকাংশ মানুষের জীবন যাপনের হাল হকিকত কেমন?

পিছিয়ে পড়া দুনিয়ার অধিবাসী হিসেবে আমরা প্রতিনিয়তই নিষ্ঠুর বাস্তবতার মুখোমুখি হচ্ছি। দরিদ্র দেশগুলোর শহরে শহরে পর্যটকদের গাড়ীর জানালায় এগিয়ে যাচ্ছে ভিখারীর শীর্ণ

www.pathagar.com

হ্যত। আমাদের শস্যময়ী গ্রামগুলো দুমুঠো অন্নের জন্য হাহাকার করছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের চারপাশে ক্ষুধা, অভাব, বঞ্চনা, আর দারিদ্র্যের অন্তহীন মিছিল। যৌবন না পেরোতেই জীবন ফৌত হয়ে যাচ্ছে কত সহস্র ফতুর চাষীর। শবমেহেরের মত জীবন কালেই মৃত্যুর নাম তিলক বহন করছে কত অভাগিনী। পেট পুরে খাবার নেই, মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই, লজ্জা নিবারণের কাপড় নেই, এমনিভাবে কত জীবন শব্দহীনভাবে নীরব প্রবাহমান আমাদের সমাজে। এটা শুধু বাংলাদেশের নয়, তৃতীয় দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষের এই অবস্থা। আফ্রিকার খরাপীড়িত সোমালিয়া হচ্ছে এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এমনিভাবে যে মানুষেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে এক আবর্জনার স্তূপ থেকে আরেক আবর্জনার স্তূপে তাদের জীবনে স্বাধীনতার স্বাদ কতটুকু? বর্তমান বিশ্বে প্রতিদিন পঞ্চাশ কোটি মানুষ রাত কাটায় ক্ষুধার যাতনা নিয়ে। আগামী দিনটিও তাদের জন্য কোন উজ্জ্বল সম্ভাবনা বহন করে না। দুমুঠো ভাতের স্বপ্ন তাদের জীবনের আর সব স্বপ্ন ও সাধকে ঢেকে দেয়। ন্যূনতম মানবিক চাহিদাটুকুও তাদের জীবনে নিশ্চিত নয়, সেই সব মানুষের জীবনে স্বাধীনতার আবেদন কতটুকু? অভাব আর দারিদ্র্য মানুষের স্বাধীনতাকে অর্থহীন করে তোলে একথা ঠিক—তথাপি মানুষ স্বাধীনতা চায়, স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকেত চায়। তাই আমরা মানুষকে দেখি—এরা নির্যাতিত, শোষিত, শৃঙ্খলিত, অবদমিত, বঞ্চিত কিন্তু কখনোই মুক্তির স্পৃহা হারানো পরাভূত মানুষ নয়। গভীর অন্ধকারের বুক থেকে জেগে উঠা মানুষের বৈশিষ্ট্য, চরম দুর্গতি মানুষের জীবনকে আচ্ছন্ন করলেও এরা কখনোই ধ্বংসকে মেনে নেয় নি। তাই বিংশ শতাব্দীতে আমরা দেখতে পাই সারা দুনিয়া জুড়ে ঘাত-প্রতিঘাতময় সংগ্রামশীল ঘটনাধারার নিরন্তর এক প্রবাহ। মানুষের স্বাধীনতা লাভের এই সংগ্রামী প্রচেষ্টায় বড় বড় বিজয়ের মাইল ফলক যেমন আছে, তেমনি আছে দুঃখজনক নানা পরাজয়, আছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা সাফল্য, আছে ছোট বড় অনেক আপোষ, আছে মহৎ কীর্তি, আছে ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতা। তবুও এগিয়ে চলছে মানুষের স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং আসছে স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা আন্দোলন

স্বাধীনতা আন্দোলন এবং স্বাধীনতা লাভের একটি ভিন্ন চিত্রের দিকে এবার মুখ ফেরাই। দেখা গেছে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই স্বাদেশিকতা, জাতীয়তাবাদী শক্তি মানুষের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন, বরণ করেছেন জেল-জুলুম, নির্যাতন; চরম নিপীড়নের মুখেও দাঁড়িয়েছিলেন অটলভাবে, স্বাধীনতা অর্জনের পর দেখা গেল এরা দেশ পরিচালনায় চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে, আক্রান্ত হয়েছেন নানা দুর্বলতা ও অবক্ষয়ে। তারা চালিত হয়েছেন অর্থনৈতিক স্বার্থবোধ দ্বারা, সমষ্টিস্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিস্বার্থ তাদের কাছে হয়েছে বড় এবং জাতীয় বিকাশের চেয়ে নিজের শ্রেণীর বিকাশই হয়েছে মুখ্য। ঔপনিবেশিক প্রভুত্বের বিনাশ হওয়ার পর দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণের ব্রত নিয়ে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে এই শ্রেণী নিজেদের ব্যক্তি বিকাশের সহজ স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। ঔপনিবেশিক

www.pathagar.com

প্রভুর বদলে তারা কায়েম করেছে স্বদেশী প্রভুদের রাজত্ব। ফলে যে স্বপ্ন নিয়ে স্বাধীনতার জন্য মানুষ লড়াই করেছিল সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয় নি। কারণ স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব স্বাধীনতার শ্লোগান তুলে জনগণকে সমবেত করে এবং অন্যসব প্রশ্ন ঠেলে দেয় ভবিষ্যত ঘটনাধারার উপর। যে স্বাধীন রাষ্ট্র তাদের কাম্য তার অর্থনৈতিক কর্মসূচী কিংবা তাদের কাঙ্ক্ষিত শাসনের চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে এরা কোন জবাব দিতে পারেনা কেননা স্বদেশের অর্থনীতি সম্পর্কে এরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সর্বদা দেশের অর্থনীতির পরিবর্তন হয়েছে তাদের জ্ঞানের সীমানার বাইরে। প্রত্যাশার তুলনায় প্রাপ্য খুবই স্বল্প হলেও স্বাধীনতাই মানুষের প্রত্যাশা, স্বাধীনতাই মানুষের কাম্য।

মানবিক অধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের আলোচ্য অনুচ্ছেদে প্রতিটি মানুষের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। স্বাধীনতা প্রতিটি মানুষের অধিকার। কোন অজুহাতেই এই অধিকার হরণ করা যায় না।

সমমর্যাদা

এবারে সমমর্যাদার বিষয়টি আলোচনা করা যাক। জন্মগতভাবে মানুষের মর্যাদা ও সম্মান সমান। জন্মের কারণে মানুষকে উত্তম-অধম, ইতর-ভদ্র পার্থক্য করা মানবিকতা বিরোধী। একটি মানবিক সমাজে সকল মানুষ ব্যক্তিগত মান মর্যাদা অর্জন ও তা সংরক্ষণের সমান সুযোগ পাবে। সেখানে জন্ম নয় বরং কর্মই সম্মান ও মর্যাদার মাপকাঠি হবে। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, অঞ্চল, গোষ্ঠী, জাতি ইত্যাদি ভেদে মানুষের মর্যাদার মধ্যে কোন পার্থক্য হতে পারে না। মানুষ যে বংশের, যে বর্ণেরই হোক না কেন তার আসল পরিচয়, সে মানুষ। মানুষ হিসাবে সে সম্মানের পাত্র এবং স্বকীয় মর্যাদায় আসীন।

কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস ভিন্নতর। সমাজবদ্ধ হওয়ার পর থেকেই মানুষের মধ্যে শুরু হয়েছে নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা। আর এই প্রতিযোগিতায় সবল তার আধিপত্য বিস্তার করেছে দুর্বলের উপর। মর্যাদা চলে এসেছে বাহু এবং বিত্তের অধীনে, অর্থ এবং শক্তির অনুকূলে। একসময় দেখা গেছে এবং এখনও দেখা যাচ্ছে যে, যাদের হাতে অর্থ-বিত্ত ও ক্ষমতা পুঞ্জিভূত মর্যাদা তাদেরই। সম্মানের অধিকারী তারাই। মানবিক অধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা মানুষের মান মর্যাদার পার্থক্যের মূলে কুঠারাঘাত করেছে।

মানুষের উৎস এক অথচ মানুষে মানুষে কত ভেদাভেদ। সমমর্যাদার বিষয়টি উপেক্ষিত সর্বত্র। শুধু রঙ কালো হওয়ার কারণে নিগ্রোরা নিগৃহীত, মর্যাদার বিচারে সাদারা তাদের চেয়ে অনেক উঁচুতে। "সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান" আমাদের দেশসহ ভারতবর্ষের এক শ্রেণীর মানুষের অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে বিবেচিত। বংশমর্যাদা, কৌলিন্য এসব এখনো মর্যাদার মাপকাঠি। সকল মানুষ সমমর্যাদার নয়—এটাই হচ্ছে আজকের পৃথিবীর বাস্তবতা। প্রভূ-ভৃত্য এক মর্যাদা

www.pathagar.com

পায় না। প্রভুর সামনে ভৃত্যের চেয়ারে বসা বরদাশত করা হয় না, অন্তত আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এটাই চোখে পড়ে বেশি। আমাদের দেশের কথাশিল্পী ও ন্যাট্যকারগণ অনেক গল্প উপন্যাস ও নাটকে এই অসমতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন তাদের লেখনি দ্বারা। একসময় এই অসমতা ছিল সামাজিকভাবে স্বীকৃত বিষয়। এরিস্টটলের মতে, প্রজ্ঞা ও প্রবৃত্তির অধিকারী হিসাবে মানুষ যথাক্রমে আত্মা ও দেহের অনুসারী। আত্মার অনুসারীগণ প্রভু আর দেহের অনুসারীগণ দাস। ফলে এরিস্টটলের মতেও মানুষ সমমর্যাদার অধিকারী নয়। দার্শনিক প্লেটোর মতে, প্রজ্ঞা, বিক্রম ও প্রবৃত্তির অধিকারী হিসাবে মানুষ প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত। এটা হচ্ছেন দার্শনিক, যোদ্ধা ও উৎপাদক। অতএব মানুষের মধ্যে সমমর্যাদার প্রশ্নই আসে না। কিন্তু কালের গতিতে তাদের এই মতবাদের উপযোগিতা হারিয়ে গেছে। এখন কোন যুক্তিতে মানুষকে অসমান, অসম মর্যাদার অধিকারী বলে পার পাওয়ার অবকাশ নেই।

সকল মানুষের সমমর্যাদার বিষয়টি মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তাবিদগণ, দার্শনিকগণ কর্তৃক স্বীকৃত হয়। প্রাক্ ইসলামি যুগের আরবে বংশ মর্যাদা, কৌলিন্য প্রথা বিশেষ বিশেষ গোত্রের প্রাধান্য, রক্তের আভিজাত্য যখন চরমে ছিল তখনই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মানুষের সমমর্যাদার কথা ঘোষণা দেন। এ প্রসঙ্গে কোরানে বলা হয়েছে, "হে মানবজাতি। আমি তোমাদের সকলকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি। পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন গোত্র ও বংশে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। আর তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অধিক মর্যাদাসম্পন্ন সে অধিক মুত্তাকী (খোদাভীরু)। —সূরা হুজরাত ঃ ১৩

মহানবী (দঃ) বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে মানুষকে সমমর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে বলেছেন, "কোন অনারবের উপর কোন আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, আর না আছে কোন আরবের উপর কোন অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব, কোন কালোর উপর কোন সাদার শ্রেষ্ঠত্ব নেই, আর না আছে সাদার উপর কোন কালেরা শ্রেষ্ঠত্ব—তাকওয়া (খোদাভীতি) ছাড়া।" মহানবী আরো বলেছেন, "তোমরা সবাই আদমের সন্তান (বংশধর) আর আদম (আঃ) মাটির তৈরি।" আর শুধু বাণীতেই নয়, বাস্তবেও মহানবী (দঃ) অনেক নিগৃহীত, দাস এবং বঞ্চিতকে উচ্চপদে সমাসীন করেছেন তাদের যোগ্যতার কারণে। প্রাক্ ইসলামি যুগের দাস বেলাল, জায়েদ বিন হারিস, উসামা বিন যায়েদ তৎকালীন সময়ের সম্ভ্রান্ত বংশীয় আবুবকর, ওমর, উসমানের মতই সমান মর্যাদা পেয়েছেন ইসলামি সমাজে।

আধুনিক কালে সমমর্যাদার বিষয়টি বিশ্বের সর্বত্র রাজনেতিক দার্শনিক, পণ্ডিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বীকৃত। এখন আর কেউ মানুষের মধ্যে অসমমর্যাদার ব্যাপারে যুক্তি প্রদর্শন করেন না। কিন্তু বাস্তবতা একটু ভিন্ন ধরনের। এখনও বিশ্বব্যাপী মানুষ সমমর্যাদা লাভ করে নি কার্যক্ষেত্রে। দক্ষিণ আফ্রিকার কালো মানুষেরা তাঁদের রাজনেতিক অধিকার পায় নি। খোদ আমেরিকাতেই শিক্ষা দীক্ষা, চাকরি, প্রশাসন, এমনকি বিয়ের ক্ষেত্রেও সাদা-কালো সমমর্যাদা লাভ করে নি। এশিয়ার দেশে দেশে যে গৃহভৃত্য প্রথা চালু আছে তা মানুষের সমমর্যাদার পথে অন্তরায়। এই প্রথা এতটা

www.pathagar.com

শিকড় গেড়ে বসে আছে যে, যারা সম অধিকার এবং সমমর্যাদার কথা বলেন তাদেরও বাস্তব জীবনে এই আদর্শের প্রতিফলন ঘটানো কঠিন হয়ে পড়েছে। আমাদের দেশে এখনো চাকুরি, বিয়ে ইত্যাদির সময় প্রার্থীর পরিবার সম্ভ্রান্ত কি না সে বিষয়ে আগে খোঁজ নেওয়া হয়। এই বিষয়টি সমমর্যাদার আদর্শের পথে বড় ও মূল বাধা। আমাদের দেশে মর্যাদার মাপকাঠি হিসাবে কখনো দেখা হয় ক্ষমতা আবার কখনো দেখা হয় অর্থসম্পদ। যার যত বেশি ক্ষমতা আছে, অথবা যার যত বেশি বিত্ত-বেসাত আছে তিনিই তত মর্যাদাবান। এই ব্যাপারটিও মানুষ হিসাবে মানুষের মর্যাদা এবং এক মানুষের সাথে অপর মানুষের সমমর্যাদার ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করছে। আক্ষরিক অর্থে শিক্ষিত এবং অনেক সার্টিফিকেট যারা অর্জন করেছেন তাদের মধ্যেও নিজেকে অধিক মর্যাদাবান ভাবার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে এমন আরো অনেক প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় এই শাশ্বত সত্য পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে যে, মানুষ সমমর্যাদা নিয়ে জন্মে। অতএব কোন যুক্তি বা অজুহাত তুলে মানুষে মানুষে পার্থক্য করা যাবে না। উত্তম অধম, আশরাফ, আতরাফ বলে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ করার কোন অবকাশ নেই।

সম অধিকার

এবারে আসা যাক সম অধিকারের প্রসঙ্গে। মানুষ—সে যে ধর্ম, বর্ণ গোষ্ঠীরই হোক, নারী হোক বা পুরুষ, যে জায়গায় জন্ম গ্রহণ করুক না কেন সকলেরই সমান অধিকার রয়েছে। মানুষের অনেক রকমের অধিকার আছে ; যেমন রাষ্ট্রীয় অধিকার ; এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ভোটাধিকার। চাকুরির অধিকার। গণঅধিকারের মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার, পরিবার সম্পর্কীয় অধিকার, সম্পত্তি সম্পর্কীয় অধিকার। ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকারের মধ্যে রয়েছে বাকস্বাধীনতার অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, জীবনরক্ষা ও ভ্রমণ স্বাধীনতার অধিকার। আইনে সমান ব্যবহারপ্রাপ্তির অধিকার, নিরপেক্ষ বিচার প্রাপ্তির অধিকার, সংঘ গঠনের অধিকার, গ্রেফতারের এবং কয়েদের ব্যাপারে রক্ষাকবচের অধিকার। পরিবার সম্পর্কীয় অধিকারের মধ্যে আছে বিবাহ সম্পর্কীয় অধিকার, অভিভাবক সম্পর্কীয় অধিকার। এই অধিকারগুলো প্রতিটি মানুষেরই রয়েছে। উপরে মানুষের যত রকমের অধিকার ও স্বাধীনতা সম্পর্কে বলা হয়েছে এই সব অধিকার প্রতিটি মানষেরই সমান। কোন মানুষকে ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, নারীপুরুষ, জন্মস্থান বা অন্য কোন কারণে তার প্রাপ্য অধিকারের হেরফের করা যাবে না। মানবিক অধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় প্রতিটি মানুষের সম অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে।

www.pathagar.com

বিচারবুদ্ধি ও বিবেক

মানবিক অধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের আলোচ্য অনুচ্ছেদে মানুষের দুটি মহৎ গুণের কথা বলা হয়েছে। গুণ দুটি হচ্ছে বিচারবুদ্ধি (Reason) এবং বিবেক (conscience)। বিচারবুদ্ধি এবং বিবেক মানবিক গুণ। মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণিকে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ও বিবেকবান বলা যায় না। কোন মানুষের মধ্যে যদি বিচারবুদ্ধি ও বিবেক না থাকে তাহলে সে মানবের অধম ধরে নিতে হবে। বিচারবুদ্ধি এবং বিবেক শব্দদ্বয় বিশ্লেষণ করা যাক।

বিচারবুদ্ধি হচ্ছে এমন এক মানসিক শক্তি যার মাধ্যমে মানুষ পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে প্রাপ্ত সূত্র থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে। কোন কিছুর যুক্তিযুক্ততা প্রমাণের জন্য যে মানসিক শক্তি দরকার সেটাই বিচারবুদ্ধি। বিচার মানুষকে ন্যায়সম্মত ও পক্ষপাতহীন আচরণে উদ্বুদ্ধ করে।

আমরা যে সমাজে বাস করি সেখানে বিভিন্ন বিষয়ে মানুষের মধ্যে প্রতিনিয়তই দ্বন্দ্ব সংঘাত চলছে, দ্বন্দ্ব সংঘাতমুখর এই পৃথিবীতে সুখে শান্তিতে থাকতে হলে চাই বিচারবুদ্ধি। বিচারবুদ্ধি দিয়ে যুক্তিতর্ক, পরীক্ষা নিরীক্ষা ও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মানুষ প্রকৃত সত্য অথবা কমপক্ষে সত্যের কাছাকাছি উপনীত হতে পারে। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এবং কোন কিছু প্রমাণের জন্য বিচারবুদ্ধি অপরিহার্য। বিচারবুদ্ধির মাধ্যমেই মানুষ একটি সমাজকে ন্যায়পরায়ণ, যুক্তিবাদী ও শান্তিপূর্ণভাবে গড়ে তোলে।

বিবেক হচ্ছে একটি মানবিক চেতনার নাম। এটা হচ্ছে নীতিবোধ ও নৈতিক চেতনা। যে চেতনা মানুষকে সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করে, অসৎকর্মে নিরুৎসাহিত করে তাই হচ্ছে বিবেক। বিবেক ভাল কাজের জন্য মনের মধ্যে আনন্দ এবং খারাপ কাজের জন্য অনুশোচনা জাগ্রত করে। এটি মানুষের একটি অপরিহার্য মহৎ গুণ। বিবেক হচ্ছে ন্যায়ের প্রতীক। তাই কোন ব্যক্তি যদি ন্যায়পরায়ণ হয় তাহলে তাকে বিবেকসম্পন্ন মানুষ বলে আর যে অসৎ প্রবণ হয় তাকে বলা হয় বিবেকবর্জিত মানুষ। সাধারণভাবে ধারণা করা হয় যে প্রত্যেক মানুষই বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন এবং বিবেকবান। যারা বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন নয় এবং যারা বিবেকবর্জিত তারা মানুষ নয়।

মানবিক অধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার প্রথম অনুচ্ছেদ মানুষকে সমমর্যাদা সমঅধিকারী স্বাধীন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ও বিবেকবান হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এবং সমগ্র মানবজাতির পক্ষ থেকে প্রত্যাশা করা হচ্ছে যে, প্রতিটি মানুষ ভ্রাতৃত্বের মনোভাব নিয়ে পরস্পরের সাথে আচরণ করবে। আলোচ্য অনুচ্ছেদের শেষ বক্তব্যটি বুঝতে হলে আমাদেরকে "মানুষের আচরণ" ও "ভ্রাতৃত্বের মনোভাব" এই দুটি বিষয় বিশ্লেষণ করতে হবে। মানুষের আচরণের পরিধি কতটুকু বিস্তৃত এবং ভ্রাতৃত্বের মনোভাব বলতে কি বুঝায় তা পরিস্কার হলেই এই অনুচ্ছেদের প্রকৃত আবেদন হৃদয়ঙ্গম করা যাবে।

www.pathagar.com

মানুষ সামাজিক জীব। তাই মানুষের আচরণ শুধু তার ব্যক্তিকে নিয়েই সীমিত নয়। সমাজবদ্ধ মানুষের একজনের আচরণ, একজনের তৎপরতা অন্যজনকে প্রভাবিত করে, আক্রান্ত করে, উজ্জীবিত করে, অনুপ্রাণিত করে। মানুষের চলন বলনসহ সকল ধরনের তৎপরতা তার আচরণের অন্তর্ভূক্ত। মানুষের যে আচরণ অন্যকে স্পর্শ করে না সেই আচরণ নিয়ে অন্য মানুষের কোন মাথাব্যথা নেই কিন্তু যা অন্যকে স্পর্শ করে বা প্রভাবিত করে সেই আচরণ কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে সর্বজনীন মানবাধিকার সনদে দিকনির্দেশনা রয়েছে।

মানুষের আচরণ বা তৎপরতা অনেক ব্যাপক বিস্তৃত। সমাজবদ্ধ মানুষ হিসাবে প্রত্যেকেরই কিছু সামাজিক তৎপরতা রয়েছে, রয়েছে কিছু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তৎপরতা। এসব কর্মকাণ্ডের বেশিরভাগই ব্যক্তিভিত্তিক নয়, বরং সমষ্টিভিত্তিক বা গণভিত্তিক। মানুষের যে আচরণ অপরকে স্পর্শ করে তা যদি বিচারবুদ্ধি ও বিবেকসম্পন্ন হয় তাহলে সমাজ শান্তিময় হয়। কিন্তু স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতার মত কতিপয় ত্রুটি মানুষের আচরণকে কলুষিত করে। ফলে মানুষের পারস্পরিক আচরণ হয়ে উঠে দুঃসহ, অসহনীয়। এই দুঃসহ অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য মানুষের উচিত ভ্রাতৃত্বের মনোভাব নিয়ে পরস্পরের প্রতি আচরণ করা।

সকল মানুষ বিচারবুদ্ধি ও বিবেকের অধিকারী। কিন্তু শিশু এবং বৃদ্ধের বিচারবুদ্ধি ও বিবেক প্রত্যাশা করা যায় না কারণ একটি নির্দিষ্ট বয়স না হওয়া পর্যন্ত শিশুর বিচারবুদ্ধি পূর্ণতা পায় না তেমনি অধিক বয়স হলে মানুষের বুদ্ধি লোপ পেতে থাকে। বাংলাদেশের আইনে এর প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়।

দণ্ডবিধির ৮২ নং ধারা অনুসারে সাত বৎসরের চাইতে কম বয়স্ক শিশুর কোন কার্যই অপরাধ নয়। ৮৩ নং ধারায় বলা হয়েছে, " সাত বৎসর অপেক্ষা বেশি কিন্তু বার বৎসর অপেক্ষা কম বয়সের এমন কোন শিশুর কোন কার্য অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইবে না, যে শিশু সংশ্লিষ্ট কার্যটি করার সময় তার প্রকৃতি ও ফলাফল বিচার করার পক্ষে পর্যাপ্ত বুদ্ধির পরিণতি লাভ করে নাই। ৮৪ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, "এমন কোন ব্যক্তির কোন কার্যই অপরাধ নয়, যে ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট কার্যটি করার সময় তাহার মনের অসুস্থতাবশত (unsoundness) কার্যটি যে অন্যায় অথবা আইন বিরুদ্ধ তাহা বুঝিতে অসমর্থ ছিল।"

উপরে বর্ণিত অবস্থা হচ্ছে সকল মানুষের বিচারবুদ্ধি ও বিবেকের অধিকারী হওয়ার ব্যতিক্রম। শিশু এবং বার্ধক্য বা অন্য কোন কারণে মারাত্মক অসুস্থ অবস্থায় বিচারবুদ্ধি ও বিবেক নাও থাকতে পারে। কিন্তু তাই বলে,সামগ্রিকভাবে মানুষকে বিচারবুদ্ধি ও বিবেকহীন বলা যাবে না।

www.pathagar.com

ভ্রাতৃত্ব

ভ্রাতৃত্ববোধ হচ্ছে একটা মানসিক অনুভূতি বা উপলব্ধির বিষয়। এটাকে ভ্রাতৃত্বসুলভ মনোভাব বলা যেতে পারে। সমধর্মীতা, সহমর্মীতা ভ্রাতৃত্বসুলভ মনোভাবেরই পরিচায়ক। মানুষ তার ভাইয়ের প্রতি সাধারণত উদার, আন্তরিক, সহৃদয় ব্যবহার করে থাকে। ভাইয়ের প্রতি ভাই হয় নিবেদিত, ত্যাগী। নিজের জীবন বিপন্ন হলেও ভাইয়ের জীবন রক্ষার জন্য মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে। ভাই খুবই আপনজন। নিতান্ত ব্যতিক্রম ছাড়া ভাইয়ের নিকট থেকে কেউ কষ্ট পায় না। ভাই ভাইয়ের প্রতি দুর্ব্যবহার, অন্যায় আচরণ করে না। সদাচার হচ্ছে ভ্রাতৃসুলভ আচরণ। তাই মানুষের প্রতি মানুষের আচরণ ভ্রাতৃসুলভ হোক মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় এটা প্রত্যাশা করা হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, ভ্রাতৃত্বসুলভ মনোভাব নিয়ে পারস্পরিক আচরণ করতে হবে—এই প্রত্যাশা কেন করা হলো? মানুষের মধ্যে যদি এই মনোভাব না থাকে তাহলে কি এমন ক্ষতি হবে?

জবাব অত্যন্ত সহজ। ভ্রাতৃত্ববোধ না থাকলে সমাজ অশান্তির স্থলে পরিণত হবে। মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ লেগেই থাকবে। ফলে হত্যা, লুণ্ঠন, দাঙ্গা, এসব অসহনীয় বিষয়গুলো হয়ে দাঁড়াবে নৈমিত্তিক ব্যাপার। নিজের প্রতি অন্যের সদাচরণ আশা করলে সকলকেই সকলের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধের মনোভাব নিয়ে আচরণ করতে হবে। এটা আইনের মাধ্যমে জাগানো যাবে না। নিজের চেষ্টায় জাগিয়ে তুলতে হবে।

ইসলাম ও এই অনুচ্ছেদ

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদে মানুষের জন্মগত স্বাধীনতা, সমমর্যাদা ও সমঅধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, বলা হয়েছে, মানুষ বিচারবুদ্ধি ও বিবেকের অধিকারী এবং মানুষকে ভ্রাতৃত্ববোধের মনোভাব নিয়ে পরস্পরের সাথে আচরণ করতে বলা হয়েছে। এই বিষয়ে ইসলামের সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার এই অনুচ্ছেদ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি আমরা এবারে আলোচনা করব।

এই অনুচ্ছেদের মৌলিক প্রশ্ন হচ্ছে মানুষের মর্যাদার বিষয়। শাসক, রাষ্ট্রনায়ক তথা ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ প্রায়শই বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে চলে যান। নিজের ক্ষমতা, এখতিয়ার এবং উপায় উপকরণের প্রাচুর্য দেখে প্রায়ই বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হন। তারা অনেক সময় নিজেদেরকে অতি উচ্চ মানবীয় সত্তা মনে করেন এবং ভাবেন নিজের কতিপয় উচ্চতর বৈশিষ্ট্য এবং গুণের জন্যই তিনি নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও শাসন দণ্ডের অধিকারী হয়েছেন। তাদের ধারণা, সাধারণ মানুষ কেবলমাত্র তাদের আনুগত্য করার জন্যই জন্ম নিয়েছে। এ জাতীয় ধারণা ও চিন্তা থেকেই ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ, রাজার ঐশ্বরিক অধিকার এসব ধারণার জন্ম হয়েছে। এভাবেই শাসক গোষ্ঠী নিজেকে আল্লাহর দূত হিসেবে ঘোষণা করে সাধারণ মানুষকে অপমাণ ও অবমাননার প্রয়াস পায়।

www.pathagar.com

কিন্তু ইসলাম মানবতার মর্যাদার উপর খুবই জোরালো ভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং এই পৃথিবীতে আল্লাহর পরই তাকে সর্বাধিক সম্মানিত ও মর্যাদাশীল ঘোষণা করেছে। আদি মানব হযরত আদম (আঃ) এর সৃষ্টির ঘটনায় পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, আল্লাহতায়ালা এই মাটির পুতুলের মধ্যে নিজের রূহ-প্রাণ সঞ্চার করেন এবং তাকে ফেরেস্তাদের দ্বারা সিজদা করিয়েছেন। কোরআনের প্রাসঙ্গিক আয়াতগুলো পেশ করা হলো ঃ

"যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করব তখন তোমরা সকলে তার সামনে সিজদানত হবে।" (১৫ঃ২৯)

"আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে।" (৯৫ঃ৪)

"আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, জলে ও স্থলে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি ; তাদেরকে উত্তম রিজিক দান করেছি, এবং আমার অসংখ্য সৃষ্টির উপর তাদেরকে উল্লেখযোগ্য শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।" (১৭ঃ৭০)

উপরে বর্ণিত আয়াতসমূহ থেকে মানুষের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়। আল্লাহ তার অন্যান্য সৃষ্টির উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছেন। এ প্রসঙ্গে কোরআনের বাণী হচ্ছে ঃ

"তোমরা কি দেখ না আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন ?" (৩১ঃ ২০)

এই যে শ্রেষ্ঠত্ব মর্যাদা ও মহত্ত্ব শুধু মানুষ হিসেবেই সে লাভ করেছে। এতে সাদা কালো আরব অনারব, প্রাচ্য-প্রতীচ্য, উঁচু নিচুর কোন পার্থক্য নেই, নেই কোন ভেদাভেদ। কেননা একই আত্মা থেকে সকলে সৃষ্ট, একই উৎস থেকে সকলে উৎসারিত। উপরে বর্ণিত আয়াতসমূহ থেকে আমরা পাই যে, মানুষ সৃষ্টিজগতের অন্যান্য সৃষ্টি থেকে শ্রেষ্ঠ কিন্তু মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, নেই পরস্পরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "হে মানব ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা থেকে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেন, যিনি তাদের দুইজন হতে বহু নরনারী ছড়িয়ে দেন ; এবং আল্লাহকে ভয় কর যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচ্ঞা কর, এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতি বন্ধন সম্পর্কে। আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখেন। (৪ঃ১)

"এবং আল্লাহ তোমাদের থেকেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল থেকে তোমাদের পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন। তবুও কি উহারা মিথ্যাতে বিশ্বাস করবে এবং উহারা কি আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করবে। (১৬ঃ৭২)

"হে মানুষ ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে। যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার।

www.pathagar.com

তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকি। আল্লাহ সবকিছুই জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।" (৪৯ : ১৩)

"তিনিই দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু, যিনি তার প্রতিটি সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন উত্তম রূপে, এবং কর্দম হতে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন । অতপর তার বংশ উৎপন্ন করেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হতে। পরে তিনি তাকে করেছেন সুঠাম এবং এতে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন তার নিকট হতে এবং তোমাদের দিয়েছেন কর্ণ চক্ষু ও অন্তঃকরণ, তোমরা অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (৩২ঃ৬–৯)

আলোচ্য আয়াতসমূহে মানব সৃষ্টি সম্পর্কে স্বয়ং এর স্রষ্টা যা বলেন তাতে মানুষের পারস্পরিক মর্যাদার মধ্যে কোন পার্থক্য করার উপায় নেই কারণ মানুষের উৎস ও উপাদান সম্পূর্ণ এক ও অভিন্ন। অতএব তারা সমমর্যাদাসম্পন্ন।

ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে,

"এবং তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর ; তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন। ফলে তার অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ তা থেকে তোমাদের রক্ষা করেছেন। এইরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য তার নিদর্শন স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার।" (৩ঃ১০৩)

"এই যে তোমাদের জাতি (ভ্রাতৃত্ব) তাতে ,একই জাতি, এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক। অতএব আমার ইবাদত কর।" (২১ঃ৯২)

"এবং তোমাদের এই যে জাতি, ইহা তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদিগের প্রতিপালক ; অতএব আমাকে ভয় কর।" (২৩ঃ৫২)

বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে রাসুল (দঃ) বলেন, "আরবরা অনারবদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়, অনারবরাও আরবদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। তোমরা সবাই আদমের সন্তান এবং আদমকে মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। নিশ্চয়ই সকল মুসলমান ভাই ভাই।"

বস্তুত, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর নবুয়ত জীবনের তেইশ বছরে মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করার প্রয়াস চালিয়েছেন। এবং এই প্রচেষ্টায় তিনি যথেষ্ট সফলও হয়েছেন। পরবর্তীকালে নিতান্ত ব্যতিক্রম ছাড়া তার অনুসারীদের মধ্যে গভীর ভ্রাতৃত্ববোধ লক্ষ্য করা যায়।

www.pathagar.com

এই অনুচ্ছেদ ও বাংলাদেশের সংবিধান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সমমর্যাদা ও বৈষম্যহীনতা এবং আইনের আশ্রয় লাভ সম্পর্কে বিধান রয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় ভাগের মৌলিক অধিকারে অন্তর্ভুক্ত এই বিধানগুলো হচ্ছে ঃ

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

(১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী, পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী–পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

(৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ নারী পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিকের কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

(৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

(১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।

(২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।

(৩) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই—

(ক)নাগরিকেদের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাহাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা হইতে,

(খ) কোন ধর্মীয় বা উপসম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠানে উক্ত ধর্মাবলম্বী বা উপসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষণের বিধান সম্বলিত যে কোন আইন কার্যকর করা হইতে,

www.pathagar.com

(গ) যে শ্রেণীর কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তাহা নারীর বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয় সেইরূপ যে-কোন শ্রেণীর নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হইতে

রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

সারসংক্ষেপ

মানবাধিকারের ঘোষণায় মূল বক্তব্য দুটি ঃ

(এক) সকল মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন এবং অধিকার ও মর্যাদায় সমান ;

(দুই) সকল মানুষই বিবেক ও যুক্তি সম্পন্ন।

প্রথম বক্তব্যটি বিবেচনার জন্য কিঞ্চিৎ ইতিহাসের আলোচনা প্রয়োজন। মধ্যযুগীয় সমাজে এই ধারণাটি অস্বীকৃত ছিল। সকল মানষই যে স্বাধীন এ ধারণা কিছু কিছু ক্ষেত্রে উচ্চারিত হলেও, বাস্তবায়নের পথে কোন প্রয়াস দেখা যায় নি। বরং উচচতর শক্তির নির্দেশ মেনে চলাই ছিল সেদিনের স্বীকৃত কর্তব্য। এই উচ্চতর শক্তির মধ্যে প্রধান ছিল ধর্ম। ধর্মের মধ্যে দুটি ভাগ, যথা (১) পুঁথিকেতাব এবং (২) এদের ভাষ্যকার । পুঁথির মধ্যে পড়ে বেদ বাইবেল প্রভৃতি এবং ভাষ্যকারদের মধ্যে পড়ে অবতার ও ঈশ্বরপুত্র প্রভৃতি। অন্য নিরীখে ধর্মকে আরো দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা ঃ আধ্যাত্মিক এবং ইহলৌকিক। আধ্যাত্মিক ভাগে পড়ে প্রার্থনা, পূজা ইত্যাদি আর ইহলৌকিক ভাগে পড়ে ধর্মীয় আইন। প্রথম ভাগ সম্পর্কে অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বিষয়ে মানবাধিকারের প্রবক্তাগণ কোন বিরূপ বাক্য উচ্চারণ করেন নি বরং এ বিষয়ে সকলের নিরঙ্কুশ অধিকার স্বীকার করেছেন কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রবক্তা বৃন্দ বলেন যে, প্রত্যেক মানুষ স্বাধীন এই অর্থে যে তারা এই ক্ষেত্রেও যুক্তি প্রয়োগ করতে পারবেন। ধর্মে নিশ্চয়ই যুক্তির স্থান আছে, কিন্তু যুক্তি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসের অধীন। বেদ বাইবেলে যে নির্দশাবলী আছে সেগুলি দুর্বল মানুষের বিচারের আয়ত্তের বাইরে। সেগুলো ব্যাখা করা যায় কিন্তু অবমাননা করা যায় না।

উচ্চতর শক্তির দ্বিতীয়টি হচ্ছে একতান্ত্রিকতা। এর অন্য নাম ফ্যাসিজম, কমিউনিজম বা উগ্র জাতীয়তাবাদ। এই আদর্শের সারকথা হচ্ছে জাতির বা সমাজের বা দেশের সামষ্টিক স্বার্থের কাছে ব্যক্তির বিবেক বুদ্ধি বিসর্জন। রুশো বলেছিলেন, ব্যক্তির জীবন আসলে সমষ্টির দান। সুতরাং গোষ্ঠী নির্দেশ দিলে ব্যক্তি নির্বিচারে নির্দেশ পালন করতে বাধ্য।

মানবাধিকারের প্রবক্তাবৃন্দ বলেন যে মানুষ এই উচ্চতর শক্তিগুলোর অধীন নয়। তাদের দৃষ্টির প্রতিটি ব্যক্তি অনন্য এবং অধিকারে ও মর্যাদায় সকলেই তুল্যমূল্য। প্রতিটি ব্যক্তির বিকাশের ফলে সমগ্র মানবজাতির জীবন সমৃদ্ধতর হয়। দেশের জন্য, সমাজের জন্য, জাতির জন্য মানুষ নয়, বরং মানুষের জন্য দেশ, সমাজ এবং জাতি, সকলই। মানুষ উপায় নয়, উদ্দেশ্য।

www.pathagar.com

এটি দবিরের পূর্ণ পরিচয় নয় যে সে বাংলাদেশী পুরুষ মুসলমান ডাক্তার, তার সম্যক পরিচয় এই যে সে মানুষ। বাংলাদেশের নামে, পুরুষত্বের নামে, ইসলামের নামে বা ডাক্তারির নামে সে তার সম্যক পরিচয়কে খর্বিত হতে দিতে পারে না।

এবার আসি মানবাধিকারের ঘোষণার দ্বিতীয় বক্তব্যের আলোচনায়। মানবাধিকারের প্রবক্তাগণের মতে, প্রত্যেক মানুষ যেহেতু বিবেক ও যুক্তিসম্পন্ন তাই জীবনের সর্বক্ষেত্রে যুক্তির প্রয়োগেই তার সার্থকতা। অভিযোগ করা হয় যে, ধর্ম এবং অন্যান্য উচ্চতর শক্তির নির্দেশ যদি নির্ভরযোগ্য না হয় তবে উচিত অনুচিত নির্ণয় হবে কিভাবে? এর উত্তরে মানবাধিকারের প্রবক্তাগণ বলেন, বিচিত্র এবং নিয়ত পরিবর্তনশীল অভিজ্ঞতার জগতে যুক্তির মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য নীতি বা মানদণ্ডের সন্ধান পাওয়া যায়। এবং তারই উপরে আইন-কানুন ও ঔচিত্য-অনৌচিত্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়। তবে তারা এ প্রসঙ্গে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন যে, এইভাবে আবিষ্কৃত নীতি চরম বা সনাতন নয়। পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এসব ক্ষেত্রে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে। মানবাধিকারবাদী ব্যবস্থায় কোন একটি মতবাদ বা বিধানকে শাশ্বত এবং সনাতন জ্ঞান করা হয় না বরং বলা হয় যে, চিন্তার পূর্ণ স্বাধীনতা সকল মানুষের থাকা উচিত। তারা তিনটি কারণে যুক্তিশীলতার স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠা দিতে চান। প্রত্যেক ব্যক্তি যে কোন মতবাদ পোষণ করতে পারেন কিন্তু তার মত যে অভ্রান্ত এমন দাবি করতে পারেন না; বিপরীত মতের মধ্যেও সত্য থাকা সম্ভব সুতরাং সেই মতকে দমন করা যাবে না। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক মানুষের অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ এবং সে কারণে তার সিদ্ধান্ত অসম্পূর্ণ। বিভিন্ন সিদ্ধান্তের সংঘর্ষে সত্য উদ্‌ঘাটিত হবার পথ পায়। তৃতীয়ত, কোন সিদ্ধান্ত যদি সত্যও হয় তবে সমালোচনার অভাবে সত্য একদিন সংস্কার হয়ে যায়।

মানবাধিকারের প্রবক্তাগণ মনে করেন যে, মানুষ মৌমাছি বা বাবুই পাখি নয়। মৌমাছির চাক এবং বাবুই পাখির বাসা অসাধারণ কুশলী শক্তির পরিচয় বহন করে কিন্তু সেই স্থাপত্য এক চুলও অগ্রসর হয় নি। তাদের সমাজে এফ. আর. খান জন্মেনি। প্রাণিরা পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আর মানুষ পরিবেশ বদলাতে পারে। সৃষ্টির সামর্থ্যে মানুষ জীবজগতে অনন্য এই সামর্থ্যের পূর্ণ বিকাশ মানবাধিকার ঘোষণার মূল আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা। এই বিকাশ ব্যক্তিকে বিলোপ করে সম্ভব নয় কারণ এই বিকাশের জন্য যে সাধনা প্রয়োজন তা করতে পারে ব্যক্তি।

দেশ থাকবে, সমাজ থাকবে, ধর্ম থাকবে। কিন্তু সেখানে থাকবে স্বতঃসিদ্ধভাবে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য। জ্ঞানের বিকাশ ছাড়া ব্যক্তির বিকাশ হতে পারে না। এবং জ্ঞানের উৎস হল জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসাই মানুষকে উচ্চ হতে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যাবে। যেখানে জিজ্ঞাসার অধিকার নেই সেখানে সৃষ্টির প্রেরণা দলিত।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ ঃ ২

যে কোন প্রকার পার্থক্য যথা গোষ্ঠী বা গোত্র, বর্ণ, নারীপুরুষ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্য মতবাদ, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য মর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেকেই ঘোষণাপত্রে বর্ণিত সকল অধিকার ও স্বাধিকারে স্বত্ববান।

অধিকন্তু, কোন ব্যক্তি যে দেশ বা অঞ্চলের অধিবাসী, তা স্বাধীন, অছিভুক্ত এলাকা, অস্বায়ত্তশাসিত অথবা অন্য যে কোন প্রকার সীমিত সার্বভৌমত্বের মধ্যে থাকুক না কেন, তার রাজনৈতিক, সীমানাগত ও আন্তর্জাতিক মর্যাদার ভিত্তিতে কোন পার্থক্য করা চলবে না।

(Article : 2. Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political jurisditional, or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.)

www.pathagar.com

ভাষ্য

এই অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তি মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে বর্ণিত সকল অধিকার ও স্বাধীনতায় স্বত্ববান।

নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের কারণে বা ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে কোন বৈষম্য থাকবে না,

(১) গোষ্ঠী (race)

(২) বর্ণ (colour)

(৩) নারী-পুরুষ (sex)

(৪) ভাষা (language)

(৫) ধর্ম (religion)

(৬) রাজনৈতিক বা অন্য কোন মতবাদ (political or other opinion)

(৭) জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি (national or social origin)

(৮) সম্পত্তি (property)

(৯) জন্ম (birth)

(১০) অন্য মর্যাদা (other status)।

এবার উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা দরকার। এ পর্যায়ে আমরা বিশ্লেষণ করে দেখবো যে এই বিষয়গুলো মানুষের জন্যে মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রে বর্ণিত অধিকার ও স্বাধীনতালাভে কিভাবে ব্যঘাত ঘটাতে পারে। এবং এসবের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে বিভেদ, বৈষম্য ও অসমতা কিভাবে সৃষ্টি হয়, আর এই সব বিভেদ, বৈষম্য ও অসমতা মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতাকে কিভাবে পদদলিত করে, বিপন্ন করে।

তাছাড়া, ব্যক্তি যে দেশ বা অঞ্চলের অধিবাসী, তা

(ক) স্বাধীন, অথবা

(খ) অছিভুক্ত এলাকা, বা

(গ) অস্বায়ত্বশাসিত, বা

(ঘ) অন্য কোন প্রকারে সীমিত সার্বভৌমত্বের অধিকারী হোক, তার—

(১) রাজনৈতিক মর্যাদা, বা

(২) সীমানাগত মর্যাদা, বা

(৩) আন্তর্জাতিক মর্যাদার ভিত্তিতে

www.pathagar.com

ব্যক্তির সেইসব অধিকার ও স্বাধীনতার স্বত্বে কোন রকম পার্থক্য করা যাবে না, যেগুলো মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

আলোচ্য অনুচ্ছেদে মানুষের সকল অধিকার ও স্বাধীনতা লাভের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সকল বৈষম্যকে প্রতিহত করার অঙ্গীকার। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় মানুষকে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সকল অধিকার প্রদান করেছে। যুগে যুগে মানুষের এসব অধিকার ও স্বাধীনতা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন অজুহাতে। স্বাধীনতা লাভের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে, এবং বৈষম্য প্রদর্শন করা হয়েছে অধিকার লাভের ক্ষেত্রে। এই বৈষম্যের উপাদান হিসেবে কাজ করেছে কখনো ধর্ম, কখনো জাতি, কখনো ভাষা, কখনো সম্পত্তি, কখনোবা অন্য কিছু। মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতালাভের ক্ষেত্রে জাতি, বর্ণ, ভাষা, ধর্ম, লিঙ্গ, রাজনৈতিক আদর্শ, জন্মস্থান ইত্যাদিকে অন্যায়ভাবে কাজে লাগানো হয়েছে যুগ যুগ ধরে। কিন্তু না, আলোচ্য অনুচ্ছেদ বলছে এসবের কোন অজুহাতেই মানুষ মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় বর্ণিত কোন অধিকার ও স্বাধীনতালাভে বৈষম্যের শিকার হতে পারে না। বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না কোন কারণেই মানুষের প্রতি।

মানবাধিকারসমূহ

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে মানুষের যেসব অধিকারের কথা বলা হয়েছে সেগুলো বিশ্লেষণ করলে নিম্নবর্ণিত অধিকারসমূহ পাওয়া যায় ঃ

১. জন্মগতভাবে সমমর্যাদা লাভের অধিকার ;

২. জীবনধারণের অধিকার ;

৩. স্বাধীনতার অধিকার ;

৪. ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার ;

৫. দাসত্বে না থাকার অধিকার ;

৬. নির্যাতিত না হওয়ার অধিকার ;

৭. নিষ্ঠুরতার শিকার না হওয়ার অধিকার ;

৮. অমানুষিক বা অবমাননাকর আচরণের শিকার না হওয়ার অধিকার ;

৯. নিষ্ঠুর শাস্তিভোগে বাধ্য না হওয়ার অধিকার ;

১০. আইনের সামনে ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভের অধিকার ;

১১. আইনের দ্বারা সমভাবে রক্ষিত হওয়ার অধিকার ;

১২. আদালতের মারফত কার্যকর প্রতিকার লাভের অধিকার ;

www.pathagar.com

১৩. গ্রেফতার,আটক বা নির্বাসনের ব্যাপারে রক্ষাকবচের অধিকার ;
১৪. নিরপেক্ষ ও স্বাধীন আদালতে বিচার প্রাপ্তির অধিকার ;
১৫. দোষি সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ বিবেচিত হওয়ার অধিকার ;
১৬. উপযুক্ত দণ্ডের অধিক শাস্তি না পাওয়ার অধিকার ;
১৭. ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার ;
১৮. পরিবার ও বসতবাড়ির নিরাপত্তার অধিকার ;
১৯. চিঠিপত্র ও যোগাযোগের গোপনীয়তার অধিকার ;
২০. সম্মান ও সুনাম রক্ষার অধিকার ;
২১. রাষ্ট্রের সীমানায় চলাচলের অধিকার ;
২২. বসতিস্থাপনের অধিকার ;
২৩. দেশত্যাগের অধিকার ;
২৪. স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের অধিকার ;
২৫. নির্যাতন এড়ানোর জন্য বিদেশে আশ্রয় প্রার্থনার অধিকার ;
২৬. আশ্রয় ভোগের অধিকার ;
২৭. জাতীয়তার অধিকার ;
২৮. জাতীয়তা পরিবর্তনের অধিকার ;
২৯. বিবাহ্ করার অধিকার ;
৩০. পরিবার গঠনের অধিকার ;
৩১. বিবাহ্ বিচ্ছেদের অধিকার ;
৩২. সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার ;
৩৩. সম্পত্তি থেকে স্বেচ্ছাচারমূলকভাবে বঞ্চিত না হওয়ার অধিকার ;
৩৪. চিন্তার স্বাধীনতার অধিকার ;
৩৫. বিবেকের স্বাধীনতার অধিকার ;
৩৬. ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার ;
৩৭. ধর্ম শিক্ষাদান, প্রচার, পালন ও উপাসনার অধিকার ;
৩৮. মতামত পোষণ ও প্রকাশের অধিকার ;
৩৯. সম্মিলিত হওয়ার অধিকার :

www.pathagar.com

৪০. সংঘভুক্ত হতে বাধ্য না হওয়ার অধিকার ;

৪১. নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার ;

৪২. সরকারি চাকুরিতে সমান সুযোগ লাভের অধিকার ;

৪৩. ভোট প্রদানের অধিকার ;

৪৪. সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার ;

৪৫. মর্যাদা ও অবাধে ব্যক্তিত্ব বিকাশের অধিকার ;

৪৬. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার ;

৪৭. অবাধে চাকুরি নির্বাচনের অধিকার ;

৪৮. কাজের জন্য ন্যায্য ও অনুকূল অবস্থা লাভের অধিকার ;

৪৯. বেকারত্ব থেকে রক্ষিত হওয়ার অধিকার ;

৫০. সমান কাজের জন্য সমান বেতন পাওয়ার অধিকার ;

৫১. ন্যায্য পারিশ্রমিক লাভের অধিকার ;

৫২. শ্রমিক ইউনিয়ন গঠনের অধিকার ;

৫৩. শ্রমিক ইউনিয়নে যোগদানের অধিকার ;

৫৪. বিশ্রাম ও অবসর বিনোদনের অধিকার ;

৫৫. যুক্তিসঙ্গত সীমা ও বেতনসহ নৈমিত্তিক ছুটিলাভের অধিকার ;

৫৬. খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসার অধিকার ;

৫৭. সামাজিক সেবামূলক কাজ লাভের অধিকার ;

৫৮. জীবনযাপনে অপারগতার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা লাভের অধিকার ;

৫৯. মাতৃত্ব ও শৈশবে বিশেষ যত্ন ও সহায়তা লাভের অধিকার ;

৬০. শিশুর অভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা ভোগের অধিকার ;

৬১. শিক্ষালাভের অধিকার ;

৬২. সন্তানের শিক্ষার বিষয় নির্ধারণে পিতামাতার অধিকার ;

৬৩. সাংস্কৃতিক জীবনে অবাধে অংশগ্রহণের অধিকার ;

৬৪. শিল্পকলা চর্চার অধিকার ;

৬৫. বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও সুফলের অংশীদার হওয়ার অধিকার ;

www.pathagar.com

মানবাধিকার-ঘোষণা-দলিলের অনুচ্ছেদ সংখ্যা ৩০। (ঘোষণার সংখ্যায়ন করা হয়েছে ইংরেজি Article দ্বারা। Article-এর বাংলা প্রতিশব্দ অনুচ্ছেদ। ধারা নয়) এই ৩০টা অনুচ্ছেদ ভেঙে আমি ৬৫টি করেছি। আরো ভাঙা যেত।

অনুচ্ছেদগুলি কংকালসদৃশ (skeletal) । এদের সাথে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণরূপ-মাংস যোগ করে নিলে তবেই এরা বুদ্ধিগম্য কলেবর পায়। পৃথিবীর আইনবিদগণ ও বিচারকবৃন্দ এই কাজটি করেছেন।

এবারে বৈষম্য প্রদর্শনের ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে আলোচনা করছি।

গোষ্ঠীগত (Race) পার্থক্য বা বৈষম্য ঃ

আলোচ্য অনুচ্ছেদের মূল ইংরেজিতে Race শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। race-এর অর্থ নরগোষ্ঠী বা নরবংশ বা গোত্র। race দ্বারা জাতি বুঝানো হয় না কারণ ইংরেজি nation শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে জাতি। জাতি গঠনের যে সব উপাদান কাজ করে তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে race, যেমন বাঙালি বা বাংলাদেশী হচ্ছে একটি জাতি আর মঙ্গোলিয়, এবং অস্ট্রেলিয় হচ্ছে এক একটি নরগোষ্ঠী। এই নরগোষ্ঠী বা race হচ্ছে মানবজাতির এমন একটি উপরিভাগ যার সদস্যদের মধ্যে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কতকগুলো সাধারণ দৈহিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে। মানুষ মূলত একই উৎস থেকে সৃষ্টি হলেও ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব, আবহাওয়া, জলবায়ু ও প্রাকৃতিক উপাদনের প্রভাব, প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, যৌন সম্পর্ক, জৈব বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ইত্যাদির কারণে বিভিন্ন নরগোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বর্তমানে পৃথিবীর বেশ কিছু নরগোষ্ঠীর অস্তিত্ব বিদ্যমান। যথা ঃ শ্বেতকায়, মঙ্গোলীয়, কৃষ্ণকায় এবং অস্ট্রেলীয় ইত্যাদি। এই সব নরগোষ্ঠীর মধ্যে মাথার আকৃতি, মুখাকৃতি, নাক, চোখ, ঠোঁট, কান, গায়ের রং, চুল, লোমকূপ, উচ্চতা, দৈহিক গড়ন ইত্যাদিতে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান।

মানুষকে নানাভাবে শ্রেণীবিভক্ত করা যায়। নরগোষ্ঠীগত বিভক্তি এর মধ্যে অন্যতম। এই শ্রেণী বিভাগের অর্থ এই নয় যে, মানুষের নরগোষ্ঠী একটি থেকে অন্যটি উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট। কেবল দৈহিক বা আকৃতিগত পার্থক্যই এই বিভাজনের লক্ষ্য। এই পার্থক্য বেআইনি বা বিধিবহির্ভূত নয়। তবে এর অপব্যবহার অন্যায়। নরগোষ্ঠীগত পার্থক্যের কারণে মানুষের অধিকার বা স্বাধীনতায় বৈষম্য করা যাবে না।

গোষ্ঠীগত বৈষম্য মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তোলে উগ্র জাতীয়তাবাদ। উনিশ শতকে জাগ্রত জাতীয়তাবাদী চেতনা ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ। ইউরোপে এই জাতীয়তাবাদী চেতনায় জাগ্রত হয়েছিল ফরাসি বিপ্লব এবং নেপোলিয়নের অভিযান। ১৮১৫ সালের ভিয়েনা সম্মেলন ইউরোপীয় জনগণের জাতীয়তাবাদী চেতনাকে কঠোরভাবে দমন করে। সমগ্র

www.pathagar.com

ইউরোপকে কয়েকটি বৃহৎশক্তির পদতলে নিক্ষেপ করে। পরবর্তী কয়েক দশক ধরে ইউরোপীয় জনগণকে সংগ্রাম করতে হয় ভিয়েনা সম্মেলনের ধারাগুলোকে বাতিল করার জন্য। এর ফলে বেলজিয়াম হল্যান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। নরওয়ে বিচ্ছিন্ন হয় সুইডেন থেকে। অটোমান তুর্কী সাম্রাজ্যের অধীনতা থেকে মুক্ত হয় গ্রিস, সার্বিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া। অস্ট্রিয়ার অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে ইতালি ইউরোপের মানচিত্রে আবির্ভূত হয় একটি স্বাধীন দেশরূপে।

উগ্র জাতীয়তাবাদ জার্মানিতে বিশ্ব রাজনীতির ধারণা বিস্তার করে। এর অবশ্যাম্ভাবী ফলরূপে জার্মানি একটি সমরবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। জার্মানি একত্রীকরণের মধ্য দিয়ে জার্মান জাতি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে এতখানি সচেতন হয়ে উঠে যে, শুধু ইউরোপেই নয়, বিশ্বে আধিপত্য স্থাপনের প্রচেষ্টায় সে বেপরোয়া হয়ে উঠে। গোষ্ঠীগত বৈষম্য এবং উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনায় জার্মানি নিজেকে অতৃপ্ত রাষ্ট্ররূপে প্রকাশ করে এবং প্রবল বাসনা তৃপ্তির জন্য যুদ্ধকে মহান কাজ বলে বিবেচনা করে। এক্ষেত্রে জার্মান দার্শনিক,ঐতিহাসিক, সমরনায়ক, রাষ্ট্রনায়করা ঐকমত্যের অধিকারী ছিলেন। ডারউইনের 'যোগ্যতমের টিকে থাকা' নীতিকে জার্মানরা এই অর্থে ব্যাখ্যা করলো যে,সকল অনুপযুক্ত গোষ্ঠীকে পরাজিত করে জার্মানরা যোগ্যতম হিসেবে টিকে থাকবে। এই দুরন্ত চেতনাই প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডব ডেকে আনে।

গোষ্ঠীগত পার্থক্য বা বৈষম্য ইংল্যান্ডেও অত্যন্ত প্রকট। এর অন্যতম নজির হচ্ছে বৃটেনের রাজতন্ত্র। ইংল্যান্ডে ১৪৮৫ সাল থেকে ১৬০৩ সাল পর্যন্ত টিউডর গোষ্ঠী রাজত্ব করে, ১৬০৩ থেকে ১৭১৪ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করে স্টুয়ার্ট বংশ, ১৭১৪ সাল থেকে হ্যানোভারিয়ান রাজবংশ রাজত্ব করেছে। এই যে রাজবংশগুলো রাজত্ব করেছে তাদের সাথে বৃটিশ প্রজা বা নাগরিকের মর্যাদার ক্ষেত্রে বিস্তর ফারাক রয়েছে। এই ফারাক অনেকটা গোষ্ঠীগত পার্থক্যের কারণেই হয়ে থাকে। তাছাড়া ইংল্যান্ডে বসবাসরত আইরিশ, স্কটিশ, আফ্রিকান, এশিয়ানদের সাথে ইংরেজদের মাঝে বৈষম্য প্রদর্শন করা হচ্ছে। ইংরেজ জাতির এক অংশ রক্ষণশীল তাই তারা রক্তের আভিজাত্য, গোষ্ঠীগত পার্থক্যকে অতিক্রম করতে পারে নি। এজন্য ইংল্যান্ডের বিভিন্ন শহরে কখনো কখনো বর্ণদাঙ্গা বা গোষ্ঠীগত কলহের কারণে ভয়াবহ বিভিন্ন রকম কাণ্ড ঘটে থাকে। গোষ্ঠীগত বৈষম্য বৃটেনের সমাজ ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় মানুষের যে সকল অধিকার ও স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে রেস তথা গোষ্ঠী বা গোত্রগত পার্থক্যের কারণে এতে বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না। বৈষম্যহীনতা মানুষের অধিকার।

প্রাক্ ইসলামি যুগের আরবেও রেসের বা গোত্রের কারণে মানুষের মধ্যে বৈষম্য প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু হযরত মুহম্মদ (সাঃ) গোত্র প্রথার ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাত করেন। গোত্রীয় বৈষম্য ইসলামে অস্বীকৃত হয়। ইসলামপূর্ব আরবে যে গোত্রীয় বৈষম্য ছিল ইসলামি বিধান

www.pathagar.com

তাকে প্রত্যাখান করে সকল মানুষকে একই আদমের সন্তান হিসেবে সমমর্যাদার বলে ঘোষণা করে।

বর্ণ (colour) বৈষম্য ঃ

বর্ণ ইংরেজি colour শব্দের বাংলো প্রতিশব্দ। বর্ণ race বা নরগোষ্ঠী গঠনের অন্যতম উপাদান। কোন নরগোষ্ঠীর অনেকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্যের একটি হচ্ছে তাদের রং। যেমন, মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠী প্রধানত বাদামি বর্ণের। বর্ণের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে বৈষম্য সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে এর নাম বর্ণবৈষম্যবাদ।

বর্ণবৈষম্যবাদ বলতে একটি ধারণাকে বুঝায় যেখানে মনে করা হয় যে, মানুষের যোগ্যতা, প্রজ্ঞা, মেধা এবং সাংস্কৃতিক পার্থক্যের মূলে দৈহিক কাঠামো বা বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্যই মূলত বেশি দায়ী। দৈহিক বা জৈবিক বিভিন্নতার কারণে কেউ বেশি এবং কেউ কম মেধার অধিকারী। একই কারণে সাংস্কৃতিক দিক থেকে কেউ কারো তুলনায় অধিকতর অগ্রগামী। এই ধারণাই বর্ণ বৈষম্যবাদের প্রেরণা।

উনবিংশ শতাব্দীতে মানবেতিহাসের বর্ণবাদী ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। এতে বলা হয় যে, ককেশীয় নগরোষ্ঠীই উচ্চ ও উৎকৃষ্ট নরগোষ্ঠী। অন্য সকলেই নিকৃষ্ট নরগোষ্ঠীর। বর্ণবাদীরা বলেন, সভ্যতার বিকাশে উৎকৃষ্ট নরগোষ্ঠীর অবদানই বেশি। কারণ তারা দৈহিক ও জৈবিক দিক থেকে উন্নত। নিকৃষ্টরা দৈহিক ও জৈবিক দিক থেকে যেমন অনুন্নত তেমনি সভ্যতার বিকাশে তাদের অবদানও কম।

কিন্তু বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ বর্ণবৈষম্যবাদ যুক্তির মানদণ্ডে টেকে না। কারণ শুধু বর্ণের পার্থক্যের কারণে কোন মানুষ উঁচু বা নীচু, মেধাসম্পন্ন বা মেধাহীন এমন হতে পারে না। অথাপি আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা, রোডেশিয়াসহ বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষ্ণকায়দের উপর বর্ণবাদী নির্যাতন চলছে সুপরিকল্পিতভাবে । মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বর্ণের ভিত্তিতে বৈষম্য প্রদর্শন করতে বারণ করা হয়েছে।

বর্ণভেদ শুধু সাদাকালো বৈষম্যই নয়। ভারতবর্ষের সমাজে এক ধরনের বর্ণ বৈষম্য চালু আছে, এটা রংএর পার্থক্য নয় বরং জন্ম বা বংশের পার্থক্যের কারণে হয়ে থাকে। ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজে চতুর্বর্ণ ভেদ বিদ্যমান ছিল। কিছুটা আজও আছে। যেমন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ব্রাহ্মণের ছেলে সর্বদা ব্রাহ্মণই হবে,অন্যদিকে শূদ্রের ঘরে চিরকাল শূদ্রই জন্ম নেবে। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিয়ে বা অন্যান্য সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ ছিল। আজো ভারতে নিম্নবর্ণের মানুষের অবস্থা অত্যন্ত করুণ। তাদের সামাজিকভাবে অত্যন্ত হেয় চোখে দেখা হয়। এরা যেন সমাজর উচ্ছিষ্ট বা গর্হিত কিছু। সকল বর্ণের মানুষের একত্রে বসে খাওয়াই শুধু অবৈধ নয় নিম্ন বর্ণের কেউ কিছু স্পর্শ করলে সেটা অপবিত্র, অশুচি, অশুদ্ধ হয়ে যায়।

www.pathagar.com

এমনিভাবে আমাদের এই উপমহাদেশে বর্ণবৈষম্যের মাধ্যমে মানুষকে নিপীড়ন করা হচ্ছে দীর্ঘদিন থেকে।

মুসলমানদের মধ্যে তত্ত্বগতভাবে বর্ণবৈষম্যের কোন স্থান নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। সকলে একই মানব পিতা—আদমের সন্তান। সেই সুবাদে সকলে ভাই ভাই। কিন্তু কার্যত, এই উপমহাদেশের মুসলিম সমাজেও আশরাফ-আতরাফ উচু-নীচু পার্থক্য বিদ্যমান। শুধু উচ্চবংশে জন্ম গ্রহণের কল্যাণে অনেকেই সমাজের অনেক বাড়তি সুবিধা নিয়ে থাকে। বংশমর্যাদা এবং কৌলিন্য প্রথা—যা অনৈসলামিক সমাজের বৈশিষ্ট্য তা মুসলমানদের গ্রাস করে ফেলেছে। ফলে এই উপমহাদেশে হিন্দু ও মুসলমান নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা অনেক সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত যা কার্যত তাদের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অধিকারকেও ক্ষুণ্ণ করছে। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় মানুষের যে অধিকার ও স্বাধীনতার বর্ণনা দেয়া হয়েছে বর্ণবৈষম্যের কারণে সেইসব স্বাধীনতা ও অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত না করার জন্য আলোচ্য অনুচ্ছেদে নির্দেশ রয়েছে।

বর্ণবৈষম্যের অন্যতম উদাহরণ হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা। সেখানে বর্ণবাদ, 'এ্যাপারথেড' বা 'পৃথকীকরণ' নামে সরকারিভাবে গৃহীত। এই নীতির ফলে কৃষ্ণাঙ্গদের চলাফেরা, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ব্যাপকভাবে খর্ব করা হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার মোট জনগোষ্ঠীর এক পঞ্চমাংশেরও কম শ্বেতাঙ্গ। তা সত্ত্বেও এ্যাপারথেড নীতির বলে শ্বেতাঙ্গরা সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গদের উপর তাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখছে।

১৯৪৮ সালে আইন করে বলা হলো আফ্রিকানদের মধ্যে পার্থক্য আছে এবং থাকবেই। আইনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে দেয়া হলো কৃষ্ণাঙ্গরা কোথায় থাকবে, কোথায় কাজকর্ম করবে, কোথায় লেখাপড়া ও চলাফেরা করবে। শ্বেতাঙ্গদের জন্যও তাদের কর্মস্থল এবং আবাসভূমি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। বলাবাহুল্য কৃষ্ণাঙ্গদের তুলনায় শ্বেতাঙ্গদের আবাসস্থল অনেকগুণ বেশি উন্নত। শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায়দের মধ্যে বিবাহ, প্রেম, যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কখনো তেমন বিবাহ, প্রেম বা বন্ধুত্ব হলে তা জোরপূর্বক ভেঙে দেয়া হয়। উভয় বর্ণের লোকদের বসার জন্য স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও পার্কে পৃথক আসনের ব্যবস্থা, যাতায়াতের জন্য পৃথক পরিবহণ, রেলের পৃথক টিকেট কাউন্টার, ইত্যাদি দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে রেখেছে। ১৯১২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার সকল বর্ণের মানুষের জন্য এক বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি নিয়ে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস গঠিত হয়। ১৯৬০ সালের ৩০শে মার্চ এ.এন.সি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং ১৫ হাজার কর্মীকে গ্রেফতার করে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। এখন অবস্থার খানিকটা উন্নতি হলেও বর্ণবৈষম্য দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আজো উৎখাত হয়নি। মৌলিক বিভাজন 'গ্রান্ড এ্যাপার্থেড' আজো বলবৎ আছে। জাতিসংঘ মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার বর্ণবাদবিরোধী বাণী দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস্তবায়নের জন্য সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

বর্ণবৈষম্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমাজ ব্যবস্থায়ও একটি মারাত্মক সমস্যা হয়ে আছে। আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠী শুধু কালো বর্ণের কারণে অন্য সকল যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সে দেশে সর্বত্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার থেকে বঞ্চিত। সম্প্রতি আমেরিকার লস এঞ্জেলস শহরে যে ভয়াবহ বর্ণদাঙ্গা সংঘটিত হল তা সেদেশের বর্ণবৈষম্যেরই পরিচায়ক।

বর্ণের ভিন্নতার কারণে বৈষম্যের শিকার না হওয়া প্রতিটি মানুষের অধিকার। মানুষ, সে যে বর্ণেরই হোক না কেন, মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় বর্ণিত প্রতিটি অধিকার ও স্বাধীনতায় তার সমান হক রয়েছে, এটা তার অধিকার। কোন অজুহাতেই এই অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা যাবে না।

নারী-পুরুষে (sex) বৈষম্য

'বিশ্বে যা কিছু মহান, চিরকল্যাণকর/অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।' কবি নজরুলের চোখে নারী এবং পুরুষের অবদান এই বিশ্বসংসারে সমান হলেও নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্য চিরন্তন। কখনো মাতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী শাসন করেছে পুরুষকে। আবার কখনো পিতৃতান্ত্রিক সমাজ পুরুষ শাসন করেছে নারীকে। নারী শাসনের চেয়ে পুরুষ শাসনই চলেছে ইতিহাসের দীর্ঘ অধ্যায় জুড়ে। ফলে পিতৃতন্ত্র প্রণয়ন করেছে বিপুল পরিমাণ আইন বা বিধিবিধান যা দ্বারা নারীদের পীড়ন করা হয়েছে। পুরুষ শাসিত সমাজে অনেক সময়ই নারীরা পুরুষের সমান অধিকার পায় নি। এমনকি গ্রিক সভ্যতার স্বর্ণযুগে এথেন্সের নারীরা নাগরিক ছিল না। প্রাচীন যুগে এবং মধ্য যুগে বিশ্বব্যাপী নারীদের অবস্থান ছিল অত্যন্ত নাজুক।

আধুনিককালে নারী পুরুষের সমান অধিকার আইনও সমাজস্বীকৃত। আন্তর্জাতিক সমান অধিকার আইনও সমাজ স্বীকৃত। আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের মতে, বর্তমানে পৃথিবীতে যে পরিমাণ শ্রম বিনিয়োগ করা হচ্ছে তার মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ শ্রমই নারীর। অথচ নারীরা আজও অবহেলিত। তাদের অধিকার ও স্বাধীনতা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। শুধু লিঙ্গভেদের কারণে নারীপুরুষের মধ্যে বিভেদ বৈষম্য সৃষ্টি করা মানবাধিকারের পরিপন্থি। তাই মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদ বলছে, মানুষের যত রকমের অধিকার আছে, স্বাধীনতা আছে, শুধু নারী বা পুরুষ হওয়ার কারণে সেই অধিকার থেকে বা সেই স্বাধীনতা থেকে তাকে বঞ্চিত করা যাবে না। ঘোষণা পত্রে বর্ণিত সকল অধিকার ও স্বাধীনতা নারীপুরুষ সকলেই সমভাবে ভোগ করবে। কোন অজুহাতে নারীকে বঞ্চিত করার অধিকার কারো নেই। বৈষম্যহীন অবস্থায় জীবন যাপন প্রত্যেকের অধিকার।

নারী পুরুষে বৈষম্য না করার প্রশ্ন যখনই আসে তখনই আমাদের সামনে ভেসে আসে নারী নির্যাতন, নারী নিপীড়ন ইত্যাদি বিষয়। একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে আজো

www.pathagar.com

বৈষম্যের শিকার হচ্ছে নারীরা। নারী পুরুষে বৈষম্য রোধ করতে হলে আমাদেরকে প্রথমেই চিহ্নিত করতে হবে কোন কোন ক্ষেত্রে নারীরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে সে ক্ষেত্রগুলিকে।

প্রথমত, রাজনৈতিক অধিকার বঞ্চিত নারীজাতি ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় পিছিয়ে পড়েছে অনেক আগেই। দীর্ঘদিন পর্যন্ত নাগরিক অধিকার না থাকার কারণে সরকার গঠন ও রাষ্ট্রপরিচালনায় তাদের যথাযথ ভূমিকা রাখার কোন সুযোগ ছিল না। আজও বিশ্ব রাজনীতিতে নারীর ভূমিকা ও অবস্থান অত্যন্ত নগণ্য। আমেরিকার স্বাধীনতা লাভের পর বিগত দু'শো বছরে কোন মার্কিন নারী রাষ্ট্রক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতে পৌছুতে পারে নি। তেমনি কথা চিন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিশ্বের রাজনেতিক নেতৃত্বের বর্তমান অবস্থার দিকে নজর দিলে দেখা যাবে যে জাতিকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এমন নারীর সংখ্যা হাতে গোনা কয়েকজন মাত্র। অতীতের বঞ্চনা তাদের এমনভাবে পিছনে ফেলে রেখেছে যে, বর্তমানে কোন বৈষম্য প্রদর্শন করা না হলেও তারা যতটা পেছনে পড়েছে সেখান থেকে উত্তরণ কঠিন। তারপরও রাজনৈতিক বৈষম্যের অবসান হয় নি। এখনো পৃথিবীর সর্বত্র নারী ভোটাধিকার লাভ করে নি। মধ্যপ্রাচ্যের যে সব দেশে সীমিত গণতন্ত্র চালু হয়েছে সে সব দেশেও নারীর ভোটাধিকার নেই। যে সব দেশে ভোটাধিকার আছে সেখানে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলে বিভিন্ন রকম সামাজিক কুসংস্কারের মোকাবেলা করতে হয় যা সাধারণত পুরুষদের ক্ষেত্রে করতে হয় না।

দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী বহুবিধ বৈষম্যের শিকার। পিতার সম্পত্তিতে নারীর অধিকার নেই, বা কম, তেমনি স্বামীর সম্পত্তিতেও। নার্সিং, পোষাক শিল্প ইত্যাদি পেশায় নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের তাদের শ্রমের মজুরি পুরুষের তুলনায় কম দেয়া হচ্ছে। দিবারাত্রি সর্বক্ষণিক গৃহকর্মে নিয়োজিত নারীর শ্রমের পুরোপুরি মূল্য দেয়া হচ্ছে না। তেমনি কৃষিকাজ ও কুটির শিল্পে নিয়োজিত নারীদের কাজের মজুরি উল্লেখযোগ্য নয় অধিকন্তু তাদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ইত্যাদির বিষয়ে যেটুকু নজর দেয়া দরকার তাও করা হচ্ছে না। মাতৃত্ব নারীর এক কঠিন সময়। মা হিসেবে নারী তার সন্তান জন্মদান এবং এর প্রতিপালনে যে পরিশ্রম করে, সময় প্রদান করে তার কোন আর্থিক মূল্য নেই। শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যার মত এই কঠিন কাজটি করার জন্য নারীর প্রতি কোন প্রকার বাড়তি সুবিধা প্রদান করা হয় না। কর্মক্ষেত্রেও নারী বৈষম্যের শিকার হয়। কেননা নারী হওয়ার কারণে অনেক কর্ম থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়। আমাদের দেশে অনেক প্রতিষ্ঠান এমনকি, কোন কোন ব্যাংক পর্যন্ত শুধু নারী হওয়ার কারণে চাকরি প্রদান করে না, এ বিষয়টি যদিও লিখিত কোন বিধান নয় তথাপি অলিখিতভাবে সেটা অনুসরণ করা হয়। এখনো পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী হিসেবে নারীকে চিহ্নিত করা হয় না। নারী উপার্জন করলেও সেটাকে অতিরিক্ত সুবিধা বলে বিবেচনা করা হয়। নারীর ব্যবসায় বাণিজ্য এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করা বা এগুলো পরিচালনার মত পরিবেশ অনেক দেশেই গড়ে উঠে নি। নারীর আর্থিক নিরাপত্তা আজও পুরুষ নির্ভর। স্বনির্ভর নারী,

www.pathagar.com

উপার্জনশীলা নারী, কর্মজীবী নারী এখনো সংখ্যায় নগণ্য। তাই আর্থিক ক্ষেত্রে নারীরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে।

তৃতীয়ত, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও নারীদের বৈষম্য করা হচ্ছে। দীর্ঘদিন থেকেই নারীরা ভোগের সামগ্রি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। রাজার হেরেম ও পানশালায় নাচনেওয়ালি না থাকলে তা অপূর্ণ থাকে। যেখানেই নগর সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়েছে সেখানেই গণিকালয় গড়ে উঠেছে আর এতে আশ্রয় পেয়েছে সভ্যতার অভিশাপে অভিশপ্ত নারীরা। ধর্ষণ নারীকে কলংকিত করে আর পুরুষকে অপকর্মের নায়কে পরিণত করে। সভ্যতার ভিত রচনা করতে নারী সর্বদাই পুরুষকে উৎসাহ দিয়েছে, অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। কিন্তু নারী তার অবদানের স্বীকৃতি পায়নি। মহান জাতি সৃষ্টির জন্য যে মহৎ মায়ের দরকার সে কথা সকলেই বলেন কিন্তু মহৎ মায়ের জন্য যে সব সুবিধা দরকার সেগুলো কার্যকর করতে কেউ যথার্থভাবে এগিয়ে আসে নি। বিবাহে নারীর অসম অবস্থান, তালাক, এবং যৌতুক নিয়ে নির্যাতনের শিকার হওয়া অনুন্নত দেশের নারীদের ললাটলিখনে পরিণত হয়েছে। সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, চারুকলা, সাহিত্য ও অন্যান্য সৃষ্টিশীল কাজে নারীদের সুযোগ সুবিধা পুরুষের সমান তো নয়ই বরং অনেকখানি কোণঠাসা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গৃহে নারীরা দাসি এবং বিনোদন উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পতিতাবৃত্তির মত একটি ঘৃণ্য পেশা, যা ব্যক্তি মালিকানার সূচনা থেকে শুরু হয়েছিল তা আজও উঠে যায় নি। অনেকের ধারণা পতিতাবৃত্তি উঠিয়ে দিলে সমাজ আরো কলুষিত হবে। আমাদের দেশেই হাজার হাজার মেয়ে আজো এই পেশায় নিয়োজিত। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, তাদের কষ্টোপার্জিত আয়ের একটা বিরাট অংশ লুটে নিচ্ছে দালাল, সর্দার, মালিক, গুণ্ডা, পুলিশ, মাসি তথা একশ্রেণী মধ্যস্বত্বভোগী লোক। এ ক্ষেত্রেও নারীরা বৈষম্যের শিকার। সামাজিক সুবিচার, যা প্রতিটি মানুষের সমভাবে পাওয়ার হক রয়েছে, নারী তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, অথচ এই বৈষম্যের উর্ধ্বে জীবন যাপন প্রত্যেক মানুষের অধিকার।

চতুর্থত নারী শুধু বৈষম্যের শিকারই নয়। তা থেকে আরেক ধাপ এগিয়ে, বঞ্চনা এবং নিপীড়নের অসহায় শিকার। মানব সভ্যতার ইতিহাস যদি পর্যালোচনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে নারী বিভিন্নভাবে নিপীড়িত হয়েছে।

আইনের ইতিহাসে নারীর অধিকার হরণের মত কিছু লজ্জাকর অধ্যায় আছে। আইন করে অধিকার হরণ করা হয়েছে নারীর। ১৮০৩ সালে রোমে ঘোষিত হয়েছে এ্যাবরশন বা ভ্রূণ বিনষ্ট নিষেধাজ্ঞা আইন। ১৮৩২ সালে প্রণীত হয়েছে নারীর ভোটাধিকার নিষিদ্ধ আইন। ১৮৫৭ সালে শ্রমজীবীদের সম্মেলনে মেয়েদের কাজ করার অধিকারের দাবি অগ্রাহ্য হয়ে পড়ে। ১৮৬৬ সালে ইংল্যান্ডে আইন পাশ হয় এই মর্মে যে, যেখানে নৌবাহিনী বা সেনাবাহিনী আছে সেখানে গণিকাদের ডাক্তারি পরীক্ষা করাতে হবে। ১৮৭০ সাল পর্যন্ত সম্পত্তিতে বিবাহিতা নারীদের অধিকার নিষিদ্ধ ছিল। ১৭৯৩ সালে নিষ্ঠুর ফরাসি আইনে বলা হয়েছিল, শিশুদের পিতৃপরিচয় খোঁজা যাবে না, মায়েদেরও প্রসবের পর দায়িত্ব নিতে হবে না। সরকারি শিশু

www.pathagar.com

আশ্রমে ওরা স্থান পাবে। এতে যত্নের অভাবে শিশুরা ধুকে ধুকে মারা যেত। তাই মায়েরা অযাচিত সন্তানকে ভ্রূণে হত্যা করাই শ্রেয় মনে করতো। এজন্য তাদেরকে চরম শাস্তি পেতে হতো।

সম অধিকার ও ভোটাধিকারের দাবিতে ইউরোপ আমেরিকার নারীদের তীব্র সংগ্রাম করতে হয়েছে ১৭৮৯ সাল থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত। ফরাসি বিপ্লবের সময় নারীরা সমান অংশগ্রহণ করেও সমঅধিকারের স্বীকৃতি পায় নি। নেপোলিয়ান কোড নামে পরিচিত ফরাসি আইনে নারীরা নাগরিক, পারিবারিক ও সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকে। পুরুষ যে কারণ দেখিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারতো নারীর সে অধিকার ছিল না।

আমাদের দেশের নারীদের অবস্থা ছিল আরো করুণ। ১৮২৯ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে সতীদাহ প্রথা বেআইনি ছিল না। ১৮৫৫ সালের পূর্বে বিধবা বিবাহের বিধান হিন্দু সমাজে ছিল না। ১৯৩৫ সালের আগে নারীদের ভোটাধিকার ছিল না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ভারতবর্ষের মেয়েরা নানা ধরনের লাঞ্ছনা ও অত্যাচার সহ্য করতো। এক ব্যক্তির বহু স্ত্রী গ্রহণ এবং বুড়ো বয়সেও বালিকাবধূ গ্রহণ চলতি সামাজিক প্রথা ছিল। এতে এক ব্যক্তির মৃত্যুর ফলে বালিকা অথবা যে কোন বয়সের নারীকে বিধবা হতে হতো। বিধবা হলেই শেষ নয়। সতী হিসেবে তাকে স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় জীবন্ত ঝাপ দিতে হত। একে বলা হত সতীদাহ। জীবনকালে যে মেয়েদের মানুষের মর্যাদা ছিল না মৃত্যুর সময় সে পেত সতীত্ব বা পূণ্যবতী খেতাব। বিধবা মেয়েদের পুনর্বিবাহ বা পরিবার ছেড়ে গেলে পারিবারিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হতে পারে এই আশঙ্কায় সতীদাহের মত একটি লোমহর্ষক নারী হত্যাকাণ্ড শুধু সামাজিক স্বীকৃতিই পায় নি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ছিল।

ভারতবর্ষে অবরোধ প্রথা কি হিন্দু, কি মুসলমান, ধর্ম নির্বিশেষে সকল নারীর জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। সতীত্ব, পতিব্রত্য, নারীত্বের মহিমা ইত্যাদিতে নারী সমাজকে বিভোর রেখে , ধর্মীয় অনুশাসনের নামে সমাজপতিদের চাপিয়ে দেয়া বিধি নিষেধে তাদের অষ্টেপৃষ্ঠে শৃঙ্খলিত করে রাখা হয়েছিল। বিয়ে, তালাক, অবরোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ধর্মের নামে বহু যথেচ্ছাচার আমাদের সমাজে চালু ছিল। এই সব যথেচ্ছাচার সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসনের নামে নারী নিপীড়নকে বাড়িয়ে তুলেছিল।

১৯৪৮ সালের ৮ নভেম্বর প্যারিসে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘে সামাজিক কমিটির সভায় সর্বপ্রথম 'বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ' সম্পর্কিত নরনারীর সমঅধিকারের নীতি গৃহীত হয়। কিন্তু তদানিন্তন পাকিস্তানে এই নীতি গ্রহণের পরিবর্তে মহিলাদের জন্য শিক্ষা সঙ্কোচনের সকল ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে। পাকিস্তানে তখনো শিশু বিবাহ, উভয়পক্ষের সম্মতিবিহীন বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদের পর নারীর মর্যাদা ও সম্পত্তির নিরাপত্তার অভাব বিদ্যমান ছিল। আনন্দ অনুষ্ঠান, গান, অভিনয় ইত্যাদি মুসলিম নারীদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল।

www.pathagar.com

১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে দেশের নারী সমাজের অবদান ছিল অনন্য। প্রায় ১৪ লক্ষ নারী বিভিন্নভাবে নির্যাতিত, নিগৃহীত এবং স্বামী-পুত্র-কন্যা বা অভিভাবক হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন, নিজেকে উৎসর্গ করেছেন দেশের জন্য। তাই স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন সংবিধানে নারীর সমঅধিকারের ধারা সংযোজিত হয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকারে ২৮ ও ২৯ অনুচ্ছেদে নারী পুরুষে বৈষম্য প্রদর্শনে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। ১৯৭২ সালে নারী পুনর্বাসন বোর্ড করে অসহায় মেয়েদের আশ্রয়দানের জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৩-৭৮ এর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারী সমাজের উন্নতির জন্য চাকুরি ক্ষেত্রে ১০ ভাগ কোটা মহিলাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়। সংসদে মহিলাদের জন্য ১০টি আসন সংরক্ষিত ছিল। বর্তমানে সংরক্ষিত আসনের পরিমাণ ৩০টি। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সময় মহিলা বিষয়ক উপদেষ্টার পদ ঘোষিত হয়। পরবর্তীতে মহিলা বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী এবং পরে পূর্ণ মন্ত্রী নিয়োগ করে 'মহিলা মন্ত্রণালয়' প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরে।

১৯৭৫ সালে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষের সম্মেলনে পরবর্তী ১০ বছরের জন্য জাতিসংঘ নারীদশক ঘোষণা করে। আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ ও নারী দশকের লক্ষ্য ছিল দেশে দেশে নির্যাতিত, অসহায়, অবহেলিত, পশ্চাৎপদ নারী সমাজের স্বার্থে সামাজিক, রাজনৈতিক, আইনগত ও অর্থনৈতিক সমঅধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা।

এ বিষয়ে আমাদের দেশের সরকারের প্রচেষ্টা খুব কার্যকরী নয়। সব খবর সংবাদপত্রের পাতায় আসে না, তবুও প্রায় প্রতিদিনই নারী হত্যা, নারী নির্যাতনের খবর আসছে। যৌতুক বা পারিবারিক কলহের কারণে স্বামীর হাতে স্ত্রী, ছেলের হাতে মা, দেবরের হাতে ভাবি, শ্বশুরের হাতে পুত্রবধূ, ভাইয়ের হাতে বোনের মৃত্যু, কুপ্রবৃত্তির লোক বা দুষ্কৃতিকারীর হাতে গৃহবধূর ইজ্জত ও সম্ভ্রমহানি, শোচনীয় মৃত্যু, ধর্ষণের পরে হত্যা, এমনি ধরনের অজস্র সংবাদ প্রায় প্রতিদিন আমাদের চোখে পড়ে। হৃদয়বিদারক, লোমহর্ষক, আসুরিক, মারাত্মক ইত্যাদি নানা বিশেষণে সংবাদ পরিবেশিত হলেও তা আমাদের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটায় না। আমরা খবর পড়ে তাৎক্ষণিকভাবে শিউরে উঠি, ভয়বিহ্বল হই কিন্তু পরক্ষণেই আবার স্বাভাবিক হয়ে যাই, যেন এসব জীবনেরই অঙ্গ, অতি স্বাভাবিক বিষয়। আমাদের দেশে নারী নিপীড়ন ও নির্যাতন মানবিকতার একেবারে সর্বনিম্নস্তরে নেমে এসেছে। নারীর সকল মর্যাদা অনেক ক্ষেত্রে এদেশে ধুলায় লুণ্ঠিত। কিন্তু মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় মানুষের যত অধিকার ও স্বাধীনতার বর্ণনা রয়েছে তাতে নারী ও পুরুষের স্বত্ব সমান। অধিকার ও স্বাধীনতার বিষয়ে নারী পুরুষে বৈষম্য করা যাবে না।

'নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত দলিল' জাতিসংঘের অধিবেশনের ১৮০ নং সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৭৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর গৃহীত ও ঘোষিত হয়। ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত এতে মাত্র ১৩টি রাষ্ট্র স্বাক্ষর প্রদান করে। জাতিসংঘ নারীদশক ও নারীবর্ষ অনুসারে বাংলাদেশ সরকার

www.pathagar.com

নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করলেও জাতিসংঘের উক্ত দলিলে স্বাক্ষর করে নি। অতপর বিভিন্ন নারী সংগঠনের চাপে দলিলের ২ ও ১৬ ধারা সম্পূর্ণ এবং ১৩-র ক ধারা বাদ দিয়ে স্বাক্ষর দান করে। উপেক্ষিত ধারাগুলোতে পারিবারিক সমান সুযোগ সুবিধা, বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদে সমঅধিকার, পতিতাবৃত্তি উচ্ছেদ-এর বিষয়ে আইন করার কথা বলা হয়েছে। জাতিসংঘ এবং বিভিন্ন মানবাধিকারের বাস্তবায়ন সংস্থা নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জোর দাবি জানিয়ে আসছে। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমাজ রাষ্ট্র ও আর্থিক কাঠামো এমনভাবে গড়ে উঠেছে যে, আইনের ছত্রছায়ায় অথবা বেআইনিভাবে নারীর প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা হয়েছে। প্রতিকূল সামাজিক অবস্থা অথবা অর্থনৈতিক দূরবস্থার কারণে বৈষম্য রোধ করা যাচ্ছে না। নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক দলিল বাস্তবায়িত করতে হলে নারী শিক্ষার প্রসার এবং নারী সমাজের আর্থিক অবস্থা উন্নত করতে হবে। তাদের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। তাহলেই তারা মানুষ হিসেবে তাদের সকল অধিকার ও স্বাধীনতাকে সমুন্নত রাখতে পারবে। তাদের প্রতি প্রদর্শিত বৈষম্যকে রোধ করতে পারবে।

সমাজ বদলাচ্ছে, বদলাচ্ছে মানুষের মন-মানসিকতা, রুচি ইত্যাদি। মানব জীবনকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে আইন তারও বদল হচ্ছে। নারী জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট আইনও অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

একসময় স্বামীর মৃত্যুর পর জীবন্ত স্ত্রীকে জোর করে আহুতি দেয়া হত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায়। এই বর্বর প্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন রাজা রামমোহন। তিনি লর্ড বেন্টিংককে সম্মত করিয়েছিলেন ১৮২৯ সালের ২৭ নং আইন বিধিবদ্ধ করাতে। এই আইন নারীকে সহমরণের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল বটে কিন্তু সারাজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করার নিয়ম তৈরি করে দিয়েছিল। বাল্যবিধবাদের বাধ্য করা হত পোষাকে-আশাকে, আহারে-বিহারে, শরীরে-মনে কঠোর সংযম পালন করতে। এরপর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আসলেন আরেক ধাপ এগিয়ে। তিনি বিধবাদের ব্যভিচারের আশংকা দেখিয়ে শাস্ত্র দ্বারা আঘাত করলেন শাস্ত্রকে। ১৮৫৬ সালে আইনের মাধ্যমে বিধবা বিবাহ বৈধ করা হয়। এরপর ১৮৯১ সালে এজ এট কনসেন্ট অ্যাক্ট দ্বারা বাল্যবিবাহ রোধ করা হয়। ১৯২৩ সালে আইন অসবর্ণ বিয়ে বৈধ ঘোষণা করে। ১৯২৯ সালে বিয়ের ক্ষেত্রে ছেলের বয়স ন্যূনপক্ষে আঠার আর মেয়ের বয়স পনর আইন কর্তৃক নির্ধারিত করা হয়। ১৯৪৬ সালে আইন স্ত্রীদের অধিকার দেয় বিশেষ বিশেষ কারণে স্বামী ত্যাগ করতে। ভারতে ১৯৪৯ সালে বিয়ের ক্ষেত্রে জাতি, বর্ণ, শ্রেণী, সম্প্রদায়ের সকল বাধা বৈষম্য দূর করে। ১৯৫৫ সালে আইন দ্বারা বিবাহের ক্ষেত্রে নতুন শর্তারোপ করা হয়েছে, এতে নারীরা আগের চেয়ে সমাজে অনেক বেশি সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। বস্তুত, সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে নারীর অবস্থার যে উন্নতি হচ্ছে এটা কারো করুণা প্রদর্শন নয় বরং এটা হচ্ছে প্রতিটি নারীর অধিকার, একান্ত পাওনা।

www.pathagar.com

ভাষাভিত্তিক (language) বৈষম্য

মনের ভাব প্রকাশের জন্য মানুষ ভাষা ব্যবহার করে। মানুষ মননশীল। সে ভাবে এবং তার ভাবনাকে অন্যের কাছে জানাতে চায়। মনের ভাব অন্যের কাছে প্রকাশের জন্যই ভাষার দরকার। মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাকযন্ত্রের মাধ্যমে এবং সহায়তায় মানুষ যে সব ধ্বনি বা আওয়াজের সৃষ্টি করে, তাই ভাষা। এ ধ্বনি এক এক জনগোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে এক একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে থাকে। যদিও সব মানুষ একই বাক প্রত্যঙ্গের সাহায্যে ধ্বনির সৃষ্টি করে। তবুও এক এক গোষ্ঠীর ভাষা শৃঙ্খলা ও ভাষা বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন হয়। দেশ, কাল ও পরিবেশ ভেদে ভাষার পার্থক্য ও পরিবর্তন ঘটে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থান করে মানুষ আপন মনোভাব প্রকাশের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বস্তু ও ভাবের জন্য বিভিন্ন ধ্বনির সাহায্যে শব্দের সৃষ্টি করেছে। সে সব শব্দ মূলত নির্দিষ্ট পরিবেশে মানুষের বস্তু ও ভাবের প্রতীক মাত্র। এ জন্যই আমরা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষার ব্যবহার দেখতে পাই। বর্তমান পৃথিবীতে আড়াই হাজারেরও উপর ভাষা আছে।

ভাষার এই যে পার্থক্য এর জন্য মানুষের অধিকারে কোন পার্থক্য হতে পারে কি? মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় মানুষের যে সকল অধিকার ও স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে, ভাষার পার্থক্যের কারণে এর মধ্যে কোন অসমতা করা যাবে না। যে ভাষাভাষী মানুষই হোক না কেন প্রত্যেকেরই এই সকল অধিকার ও স্বাধীনতালাভের নিশ্চয়তা রয়েছে। পৃথিবীতে সকল ভাষা সমভাবে সমৃদ্ধ নয়, আবার সকল ভাষা সকল সময় সকল স্থানে সমভাবে সমৃদ্ধ থাকবে না, থাকে না। তাই ভাষার সমৃদ্ধির অজুহাতে অন্য ভাষাভাষীকে তাদের অধিকার ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। মানবাধিকারের আলোচ্য অনুচ্ছেদে ভাষাভিত্তিক বৈষম্য সৃষ্টি থেকে বারণ করা হয়েছে।

ভাষাভিত্তিক বৈষম্যের শিকারে পরিণত হওয়ার ইতিহাস আমাদের দেশেই বিদ্যমান। ১৯৪৭ সালে ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়ে যখন স্বাধীনতা লাভ করে তখন পাকিস্তানের অধিবাসীদের ৫৬ শতাংশ মানুষের মাতৃভাষা ছিল বাংলা এবং ৪৪ শতাংশ মানুষ ছিল বিভিন্ন ভাষাভাষি। স্বাভাবিকভাবেই আশা করা হয়েছিল যে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা। কিন্তু তৎকালীন গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন যে, উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এটা ছিল সেই সময়কার পূর্বপাকিস্তানের অধিবাসীদের বঞ্চনার অন্যতম উদাহরণ। সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার পরও বাঙালীরা সংখ্যালঘুর অবস্থায় নিপতিত হয়। পাকিস্তানের উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের অধিকাংশই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের, সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের সংখ্যা ছিল নগণ্য, রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো সংখ্যালঘু জনগণের এলাকায়। এমনিভাবে ভাষাভিত্তিক বৈষম্যের শিকার হয় এদেশের মানুষ। কিন্তু এই বৈষম্যকে বরণ করে নি বাঙালি জাতি। কার্জন হলে ১৯৪৮ সালে জিন্নাহর প্রদত্ত

www.pathagar.com

বক্তব্যের বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গে ঐ সমাবেশেই প্রতিবাদ উত্থিত হয়েছিল। ১৯৫২ সালের শুরুতেই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন পুনরায় ঘোষণা করেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। অথচ মাত্র ৮ শতাংশ মানুষ ছিল উর্দু ভাষাভাষি। এই ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী প্রতিবাদ ও আন্দোলনের ঘোষণা দেয়া হয়। শাসক গোষ্ঠী ছাত্রদের সভা ও মিছিলের উপর ১৪৪ ধারা জারি করে শান্তিপূর্ণ মিছিলে গুলিবর্ষণ করে সরকার বেশ ক'জন তরুণের তাজা প্রাণ কেড়ে নেয়। রক্ত দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় ভাষার দাবি। ভাষা আন্দোলনের পথ ধরে আসে স্বাধীনতা। এমনিভাবে ভাষাভিত্তিক বৈষম্যের অবসানের প্রচেষ্টায় অবসান হয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের।

বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে মর্যাদা দিতে পশ্চিমাদের অস্বীকৃতির পেছনে অনেক দূরদর্শী পরিকল্পনা ছিল। তারা চেয়েছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে নিশ্চিহ্ন করার মাধ্যমে বাংলার ইতিহাস ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক চেতনাকে নির্মূল করতে। যাতে জাতি হিসেবে আমাদের যে স্বকীয়তা নিজস্বতা রয়েছে তা হারিয়ে আমরা যেন আদর্শ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে পড়ি।

অন্যদিকে বাঙালিদের মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি আদায় করা, পূর্ববাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতিকে সমনুন্নত রাখা, এবং ভাষা সংস্কৃতি রক্ষার মাধ্যমে আমাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তাকে সংরক্ষণ করা। কিন্তু ভাষার দাবিতে যখন রক্ত দিতে হল, দিতে হল রাজপথে আত্মাহুতি, তখনই এদেশবাসী অনুধাবন করল পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদের হাতে বাংলা ভাষাভাষীদের জানমাল ও ইজ্জতের কোন নিরাপত্তা আশা করা যায় না। ভাষা আন্দোলনের প্রভাবে ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের সংবিধানে যদিও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা স্থান পায় তথাপি এদেশে স্বাধিকারের দাবি জোরদার হতে থাকে। আমাদের ভিন্ন স্বার্থ , স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আর পৃথক বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেঁচে থাকার চেতনা জাগ্রত হয়। এই চেতনা হচ্ছে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবোধ।

ভাষা আন্দোলন যে ঐক্য, সংহতি ও বিপ্লবী চেতনার জন্ম দেয় তার ফলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয় আর যুক্তফ্রন্টের বিজয়, ১৯৬২ সালের আন্দোলন ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় এবং ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি সব কয়টি জাতীয় সঙ্কটে আমরা বিজয় লাভ করেছি। ভাষার লড়াই আমাদেরকে বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছে, উদ্বুদ্ধ করেছে। এটা ছিল বৈষম্যের বিরুদ্ধে সমঅধিকার লাভের সংগ্রাম।

www.pathagar.com

ধর্মীয় (religion) কারণে বৈষম্য

ধর্ম কি এ বিষয়ে একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। তবে সাধারণভাবে একথা মনে করা হয় যে, ব্যক্তিগতভাবে যে বিশ্বাস বা অবিশ্বাসকে ধারণ করে মানুষ কোন আচার মেনে চলে বা বর্জন করে এবং তাকে ধর্ম মনে করে সেটাই তার ধর্ম। মানবেতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষ বিভিন্ন বিশ্বাসকে ধারণ করেছে এবং সেই বিশ্বাসের অনুকূলে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা বা আচরণ অবলম্বন করেছে নিজেদের ধর্ম বলে। প্রায় প্রতিটি ধর্মের বিশ্বাস এবং আচার নিষ্ঠতার জন্য রয়েছে ধর্মগ্রন্থ। ধর্মগ্রন্থকে ঐশী বাণী বা ধর্ম প্রচারকদের বাণী বলা হয়। বর্তমানে পৃথিবীতে বহু ধর্ম চালু আছে। এর মধ্যে কিছু কিছু ধর্ম আছে, যেগুলো ব্যাপকভাবে পরিচিত। যেমন, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, ইহুদি ও ইসলাম। এ সকল ধর্মাবলম্বীরা সাড়া দুনিয়া জুড়ে অবস্থান করছে। যদিও ধর্মের মূল বক্তব্যই হচ্ছে মানব প্রেম তথা মানুষকে ভালবাসা। তারপরও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিরোধ-বিসম্বাদ, ঝগড়া, কলহ লেগেই আছে। পৃথিবীর ইতিহাসের অনেক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও দাঙ্গার পেছনে ধর্মীয় কারণ বিদ্যমান। আজও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সভ্যতার ইতিহাসকে কলংকিত করছে আর এর পেছনে কাজ করছে ধর্মীয় উন্মাদনা।

ধর্মবিশ্বাসের কারণে বৈষম্য প্রদর্শিত হয়। শুধুমাত্র ভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসের কারণে মানুষ অনেক সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয়। ধর্ম বিশ্বাসের কারণেই কেউ কিছুটা সুবিধাপ্রাপ্ত হয় আবার কারো প্রতি বৈরিতা প্রদর্শন করা হয়। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ধর্মীয় কারণে এই সনদে বর্ণিত সকল অধিকার ও স্বাধীনতা লাভে কোন মানুষের প্রতি কোন প্রকার বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না। ধর্ম একটি মহৎ ও মানবিক বিষয়। ধর্ম কখনো বৈষম্যের উপাদান বা হাতিয়ার হতে পারে না।

ধর্মভিত্তিক বিভেদ বৈষম্য ভারতবর্ষের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে। বৃটিশ ভারতে ১৯০৯ সালে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র ও পৃথক নির্বাচনের দাবি গৃহীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সরকারে মুসলমানদের অংশগ্রহণের ন্যূনতম সুযোগও ছিল না। ১৮৮৫ সালে জননেতা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে ভারতবাসীর প্রথম আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়। কিন্তু ক্ষমতাসীন বৃটিশ রাজ প্রতিনিধি এবং এদেশীয় হিন্দু নেতৃবৃন্দ কর্তৃক মুসলিম স্বার্থ উপেক্ষিত হওয়ার অভিযোগে ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহসহ অন্যান্য মুসলিম নেতাদের প্রচেষ্টায় ১৯০৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর গড়ে ওঠে মুসলিম লীগ। অখণ্ড ভারতের দশ কোটি মুসলমানের আশা আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নই এর লক্ষ্য বলে ঘোষণা করা হয়। ১৯৩০ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত ভারতীয় নেতৃবৃন্দের গোলটেবিল বৈঠক বর্জনের পর মুসলিম লীগ নেতা জিন্নাহ যে

www.pathagar.com

চৌদ্দদফা দাবি উত্থাপন করেন তাতে কেন্দ্রীয় আইন সভা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রীসভায় মুসলমানদের জন্য আসন বরাদ্দসহ মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের দাবি জানানো হয়।

বস্তুত বৃটিশ ভারতে মুসলমানরা শিক্ষা দীক্ষা, চাকুরি ব্যবসা প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই বঞ্চনার শিকার হয়। রাজনীতিতে মুসলমানদের অবস্থান ছিল একেবারেই শূন্যের কোঠায়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলমানরা সমভাবে অংশগ্রহণ করেও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ব্যবসা বাণিজ্য, চাকুরি, শিক্ষা, ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়, বৈষম্যের শিকার হয়। তাদের এই বৈষম্যের কারণ হচ্ছে ধর্মভিত্তিক অনৈক্য বা বৈপরীত্য। ধর্মভিত্তিক বৈষম্য মানবাধিকারের ঘোষণার পরিপন্থী।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত নামে একটি ধর্মীয় গোষ্ঠী রয়েছে, যাদের প্রধান ধর্মীয় গুরু হচ্ছেন মিরজা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী। এই গোষ্ঠীকে বিভিন্ন ইসলামি চিন্তাবিদগণ কাদিয়ানী হিসেবে আখ্যায়িত করেন। আহমদীয়াগণ নিজেদেরকে মুসলমান হিসাবে পরিচয় দেন। পাকিস্তানে কাদিয়ানীদের মুসলমান বলতে আইনে বারণ আছে এবং বাংলাদেশেও তাদের অমুসলমান ঘোষণা করার জন্য আন্দোলন করা হচ্ছে। আহমদীয়াগণ মুসলমান হিসেবে সকল সুযোগ সুবিধা লাভের দাবিদার কিন্তু তারা ছাড়া ইসলাম ধর্মের অন্যান্য অনুসারিগণ তাদেরকে মুসলমান হিসাবে অধিকার প্রদানের বিরোধী।

আইনসভা, চাকুরি বা অন্য কোন ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ধর্মাবলম্বীদের জন্য কোটা বা আসন সংরক্ষণ সাধারণভাবে ধর্মীয় বৈষম্যের পরিচায়ক। তবে কোন বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়, যারা ইতিমধ্যেই অনেক পিছিয়ে পড়েছে এবং বঞ্চিত হয়েছে তাদেরকে স্বাভাবিক সুযোগ সুবিধা ও অধিকার প্রদানের জন্য যদি কোটা নির্ধারণ করা হয় তাহলে তা বৈষম্য প্রদর্শন হবে না।

সাম্প্রদায়িক হানাহানির অন্যতম কারণ হচ্ছে ধর্মীয় বৈষম্য। বৈষম্য প্রদর্শনের জন্য ধর্মকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের কোন যৌক্তিক কারণ নেই। তাই প্রতিটি মানুষের ধর্মীয় কারণে বৈষম্যের শিকার না হওয়ার অধিকার রয়েছে।

রাজনৈতিক (Political) কারণে বৈষম্য

প্রাচীন গ্রিসেই রাজনৈতিক সংগঠন, রাষ্ট্রীয় ধারণার জন্ম। গ্রিসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর রাষ্ট্র যা City state বা পলিটি নামে পরিচিত ছিল। রাষ্ট্র চিন্তার ইতিহাসে গ্রিক দার্শনিক প্লেটো এবং এরিস্টটল শ্রেষ্ঠ স্থান দখল করে আছেন। প্রাচীন গ্রিসেই এপিকিউরিয়ানবাদ ও স্টোয়িকবাদের উন্মেষ ঘটে। এ সময়ে রোমে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন পলিবিয়াস, সিসেরো এবং সেনেকা। সেন্ট অগাস্টিনও প্রাচীন যুগের অন্যতম খ্রিস্টীয় রাজনৈতিক চিন্তাবিদ।

www.pathagar.com

মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তায় সম্রাট এবং পোপের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এই সময়কালের সর্বাপেক্ষা সফল দার্শনিক হচ্ছেন সেন্ট থমাস একুইনাস। সামন্তবাদ ছিল এ সময়ের শক্তিশালী সামাজিক প্রতিষ্ঠান। মধ্যযুগের রাজনীতিতে পোপ এবং রাষ্ট্রের দ্বন্দ্বে পোপ পরাজিত হন এবং মধ্যযুগের অবসান ঘটে। মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তায় আলফারাবী, ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ, ইবনে খালদুন প্রমুখ মুসলিম মনীষিগণ গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ প্রবর্তন করে তাদের অমূল্য অবদান রাখেন।

নিকালো মেকিয়াভেলি রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে আধুনিক যুগের সূত্রপাত করেন। এর পর টমাস হবস, জন লক, এডমণ্ড বার্ক, মন্টেস্কু, জ্যাঁ জ্যাক রুশো, জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ রাষ্ট্রচিন্তাবিদগণ আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাদের আদর্শ শুধু রাষ্ট্রচিন্তার জগতকেই সমৃদ্ধ করে নি, যুগে যুগে মানুষকেও অনুপ্রাণিত করেছে। আধুনিক যুগের সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও দার্শনিক হচ্ছেন কার্ল মার্কস। বিংশ শতাব্দীতে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে মার্কসীয় আদর্শে বিশ্বে ব্যাপকভিত্তিক বিপ্লব সাধিত হয়। প্রায় এক শতাব্দীকাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপের অনেক দেশে এই আদর্শ অনুসৃত হয়। এমনিভাবে রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে যুগে যুগে মানব সমাজ বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত হয়ে অগ্রগতি ও প্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

রাজনৈতিক আদর্শের কারণে মানুষের এই যে বিভিন্নমুখী ধারা তা মানুষকে বিচ্ছিন্ন করছে, বিভক্ত করছে বিভিন্ন দলে উপদলে। এক আদর্শের লোক অন্য আদর্শে বিশ্বাসীকে আপনার করে ভাবতে পারে না। ক্ষেত্রবিশেষে একজন আরেকজনকে শত্রু ভাবতে শুরু করে। এতে করে আদর্শিক পার্থক্য বা রাজনৈতিক ভিন্নমত অনেক সময় বঞ্চনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রাজনৈতিক ভিন্নমতের কারণে অনেক সময় মানবাধিকার হরণের ঘটনাও ঘটছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এবং ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসীদের জুলুম নির্যাতন ও নিপীড়ন, নির্বাসন ইত্যাদির মাধ্যমে অবদমন করার প্রয়াস চালানো হয়। কোথাও আবার ভিন্নমতাবলম্বীর রাজনৈতিক অধিকার হরণ করা হয়।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভিন্নমত, ভিন্নপথ থাকতে পারে। বিভিন্ন রকম রাজনৈতিক আদর্শের চর্চা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে মানুষের জন্য অধিকতর উপযোগী ও আদর্শ ব্যবস্থার উৎস বেরিয়ে আসবে। আদর্শিক মতপার্থক্যের কারণে যদি নিপীড়ন ও দলন নীতির শিকার হয় মানুষ তাহলে রাজনৈতিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হবে। এই বাধা সমাজ বিকাশের অন্তরায়।

মানবাধিকারের আলোচ্য অনুচ্ছেদ মানুষের স্বাধীনতা ও অধিকারের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে কোন রকম বৈষম্যমূলক আচরণ করতে নিষেধ করেছে। তদুপরি অন্য কোন আদর্শগত কারণে ও বৈষম্য প্রদর্শন করতে নিষেধ করেছে।

www.pathagar.com

এই অনুচ্ছেদে পরোক্ষভাবে বহুদল, বহুমত এবং বহু পথের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এটা মানুষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করার অন্যতম ব্যবস্থা।

রাজনৈতিক মতাদর্শগত পার্থক্য বা বৈপরীত্যের কারণে বৈষম্য প্রদর্শন এমনকি রাজনৈতিক নিপীড়নের ঘটনা এই সাম্প্রতিক কালেও বিরল নয়। যে সকল দেশে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে মার্কসবাদ অনুসৃত হচ্ছে সে সব দেশে সমাজতন্ত্রী নন এমন লোকজনকে ভিন্ন মতাবলম্বী হিসেবে চিহ্নিত করে নিপীড়ন চালানো হয়েছে। এ কারণে সাবেক পূর্ব জার্মানি থেকে অনেক লোক পালিয়ে পশ্চিম জার্মানিতে আশ্রয় নিয়েছিল। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বহিষ্কৃত হয়ে অথবা পালিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেছে অনেকেই আমেরিকায়। আলবেনিয়ার অনেক নাগরিক স্বেচ্ছায় নির্বাসনে গিয়েছে ইটালিতে। রুমানিয়া, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া, পোল্যান্ড, যুগোশ্লাভিয়া এবং সাবেক চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে অনেক রাজনৈতিক কর্মী ভিন্ন মতাবলম্বনের অভিযোগে নিপীড়নের শিকার হয়ে আশ্রয় নিয়েছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। যদি মত পোষণ এবং প্রকাশের স্বাধীনতা মৌলিক অধিকার হয় তাহলে এই জাতীয় রাজনৈতিক নিপীড়ন নিঃসন্দেহে মানবাধিকারের নীতিমালার পরিপন্থী। শুধু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কেন অনেক গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ এবং রাজা শাসিত দেশেও ভিন্ন রাজনৈতিক বিশ্বাস পোষণের কারণে বৈষম্যের ও নির্যাতনের শিকার হতে হয়। আলজিরিয়া, মিশর, সুদান প্রভৃতি দেশে ইসলামি মৌলবাদি সংগঠনের কর্মী, ইরাক, সিরিয়া প্রভৃতি দেশে বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মী, সৌদি আরব, কুয়েত, আমিরাত প্রভৃতি দেশে রাজতন্ত্রের সমালোচকদের উপর নিপীড়নের অভিযোগ আসছে প্রতিনিয়ত। এসব দেশে অগণিত মানুষ রাজনৈতিক আদর্শের ভিন্নতার করণে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে বলে মানবাধিকার বাস্তবায়নকারী সংগঠন অভিযোগ করছে।

জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তিগত বৈষম্য

জাতি হচ্ছে একই বংশোদ্ভূত জনসমষ্টি। আধুনিককালে অবশ্য একই বংশোদ্ভূত হওয়াকে জাতি গঠনের জন্য জরুরি মনে করা হয় না। এখন জাতি বলতে বুঝায় এমন একটি জনসমষ্টি যারা কতগুলো ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ। এবং সেই ঐক্যসূত্র এত প্রবল ও বাস্তব যে, তারা একত্রে বসবাস করতে চায়, বিচ্ছিন্ন হলে অসন্তুষ্ট হয় এবং তাদের সাথে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ নয় এরূপ কোন গোষ্ঠীর শাসন তারা সহ্য করে না। জাতি বলতে আমরা সেই জনসমষ্টিকে বুঝি যাদের মধ্যে ভাষাগত, ধর্মগত, কৃষ্টি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিগত এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঐক্য বিদ্যমান এবং যারা একই ভূখণ্ডে বসবাস করে।

জাতি সম্পর্কে উপরে বর্ণিত সংজ্ঞা থেকে এ কথাটি সুস্পষ্ট যে, প্রত্যেক জাতিরই একটি ঐক্য সূত্র রয়েছে। রয়েছে উৎস। যেসব উপাদান নিয়ে জাতি গড়ে উঠে সেই সব উপাদানই জাতির উৎস। ভিন্ন ভিন্ন জাতির উৎসও ভিন্ন। জাতি গঠনের পেছনে বংশগত ঐক্য অত্যন্ত

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বংশগত ঐক্য এক জাতি থেকে অন্য জাতিকে স্বতন্ত্র রাখতে সাহায্য কর। ভৌগোলিক ঐক্যবোধ ও মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করতে পারে যা ভিন্ন ভূখণ্ডের অধিবাসীদের থেকে তাদের স্বতন্ত্র বলে চালিয়ে দেয়। এমনিভাবে ভাষার ঐক্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতিগত ঐক্য, অভিন্ন ইতিহাস ঐতিহ্য ও রীতি নীতি জাতি গঠনে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। এসবই এক জাতি থেকে অন্য জাতিকে স্বতন্ত্র ধরনের বা প্রকৃতির মানুষ বলে চিহ্নিত করে। এই স্বাতন্ত্র্য দোষের কোন বিষয় নয় কিন্তু এটা যদি বৈষম্য প্রদর্শনের হাতিয়ার হয় তাহলেও আপত্তি। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় বলা হয়েছে জাতির উৎপত্তিগত কারণে মানুষের অধিকার ও কর্তব্যে কোন রকম বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না। তেমনিভাবে সামাজিক উৎপত্তি বা বংশের কারণেও বৈষম্য প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সম্পত্তিগত বৈষম্য

সম্পত্তি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সভ্যতার ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রণ করেছে সম্পত্তি। সম্পত্তির ধারণা এবং মালিকানার ধারণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর সাথে সমতা ও অসমতার বিষয়টি জড়িত। কবে কখন থেকে সম্পত্তি ও মালিকানার ধারণাটি মানুষের মনে উপ্ত হয়েছে তা সঠিকভাবে নিরূপণ করা কঠিন। তবে দেখো গেছে যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা অথবা সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণাই ধন বৈষম্যের কারণ বলে অনেকেই মনে করেন। এই ধারণা বা বিশ্বাসের কারণে মার্কসীয় সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্রের ধারা বিকাশ লাভ করে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। এই ধারা অনুসারে ব্যক্তিগত সম্পত্তিই যেহেতু ধনবৈষম্য ও শোষণের মূল কারণ অতএব ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে। হলোও তাই। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকেই আধুনিক সমাজতন্ত্র যাত্রা শুরু করলো, ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদের মধ্য দিয়ে এবং বিশ্ব মানচিত্রের একটা বিরাট অংশ জুড়ে এই চেতনা অনুসৃত হতে থাকে কিন্তু শোষণ বা বৈষম্য একেবারে নির্মূল হয়ে যায় নি। তাই শতাব্দীর শেষ দশকে এসে আবার তা অনেক দেশেই পরিত্যক্ত হলো।

সম্পত্তির বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃতিই এমন যে, এটা এর মালিক বা অধিকারীকে ক্ষমতাশালী করে তোলে। সম্পত্তি অর্জনের মাধ্যমে মানুষ সমাজে বিত্তশালী হতে পারে। আবার সম্পত্তি হারানোর ফলে মানুষ বিত্তহীন হয়ে পড়ে। যার সম্পত্তি আছে আর যার সম্পত্তি নেই তার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। সমাজের বিত্তবান লোকেরা স্বাভাবিক ভাবেই বিত্তহীনদের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজির মালিকেরা একচেটিয়া মুনাফা অর্জন করে অধিকতর সম্পত্তির মালিক হয়।

অবস্তুগত বা গুণগত সম্পত্তিও মানুষকে ক্ষমতাবান করে। মানুষের প্রতিভা তার সম্পত্তি। এই সম্পত্তি তাকে অন্য লোক থেকে স্বতন্ত্র হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে। সম্পত্তি একটি

www.pathagar.com

সমাজ স্বীকৃত ব্যবস্থা। সমাজ স্বীকৃত বলেই যারা সম্পত্তির মালিক তারা সম্পত্তিহীনের চেয়ে শক্তিশালী।

বস্তুগত সম্পত্তি হস্তান্তর হতে পারে। উত্তরাধিকারসূত্রে অথবা ক্রয়বিক্রয়, বিনিময়, দান ইত্যাদির মাধ্যমে একজনের সম্পত্তি অন্যজনের হাতে চলে যেতে পারে। এভাবেই সম্পত্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে ক্ষমতা হাত থেকে হাতে চলে যায়। সম্পত্তি বিভিন্ন রকম হতে পারে। সম্পত্তি যত প্রকারেরই হোক না কেন এবং সম্পত্তি মানুষকে যত ক্ষমতাশালী এবং ক্ষমতাহীনই করুক না কেন এর কারণে মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতায় বৈষম্য করা যাবে না।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার সমাজকে ধনী ও দরিদ্র এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে দেয়। অধিক পরিমাণ সম্পত্তির মালিকানা মানুষকে কর্মে নিরুৎসাহিত করে বলে অনেকে মনে করেন। অসম সম্পত্তির মালিকানা সমাজে শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও সংঘাত সৃষ্টিতে সহায়ক। তাই অনেকেই আশংকা প্রকাশ করেন যে, সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণায় যেসব অধিকার ও স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেসব অর্জনের ক্ষেত্রে সম্পত্তি বৈষম্য সৃষ্টি করতে পারে। আর এ জন্যই আলোচ্য অনুচ্ছেদে এই বিষয়ে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে ধনবৈষম্যের কারণে বা সম্পত্তির মালিকানার অসমতার কারণে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে বর্ণিত অধিকার ও স্বাধীনতা লাভে যেন কারো প্রতি বৈষম্য করা না হয়। এই অনুচ্ছেদ অনুসারে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেরই সমভাবে মানবাধিকারের ঘোষণায় বর্ণিত অধিকার ও স্বাধীনতা লাভের দাবি স্বীকৃত।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও মানুষের বিভিন্ন অধিকার অর্জনের ব্যাপারে সম্পত্তি বৈষম্যের সৃষ্টি করেছে। যেমন : এমন একটা সময় ছিল, যখন রাষ্ট্রের কর প্রদান না করলে ভোটাধিকার পাওয়া যেত না। কর দিত বিত্তবানরাই। গরিবের কর প্রদানের উপায় ছিল না। অতএব সেই সময় ধনীদের ভোটাধিকার ছিল, গরিবের ছিল না, এটা হচ্ছে ধনবৈষম্যের কারণে মানুষের অধিকারে হস্তক্ষেপের উদাহরণ। আমাদের দেশেও একসময় এই বিধান প্রচলিত ছিল। বর্তমানে অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে।

ধনবৈষম্য সারা পৃথিবী জুড়েই রয়েছে। কিভাবে এর হাত থেকে মানব জাতিকে পরিত্রাণ দেয়া যায় সে বিষয়ে চিন্তাভাবনা করবেন অর্থনীতিবিদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, ধনবৈষম্য আছে বলেই মানুষের মানবাধিকারের ক্ষেত্রে বৈষম্য করা হবে, এটা চলতে পারে না। এই সনদে মানুষের যত অধিকার ও স্বাধীনতা আছে, ধন সম্পদের অভাবের কারণে সে সব অধিকার ও স্বাধীনতা থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না। আবার বেশী সম্পদের মালিক হওয়ার কারণে কেউ বেশি স্বাধীনতা ভোগ করবে, বেশি অধিকার পাবে, তাও ঠিক নয়।

এবারে আমরা অনুচ্ছেদের শেষাংশ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করবো। এখানে বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি, যে দেশ বা অঞ্চলের অধিবাসী, সেই দেশ বা অঞ্চল

(ক) স্বাধীন, বা

www.pathagar.com

(খ) অছিভুক্ত এলাকা, বা

(গ) অস্বায়ত্তশাসিত, অথবা

(ঘ) অন্য কোন প্রকারে সীমিত সার্বভৌমত্বের অধিকারী সে দেশ বা অঞ্চলের,

(১) রাজনৈতিক মর্যাদা, বা

(২) সীমানাগত মর্যাদা, অথবা

(৩) আন্তর্জাতিক মর্যাদা ইত্যাদির ভিত্তিতে

সেই ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতায় পার্থক্য করা চলবে না।

এখন আমাদেরকে দেখতে হবে স্বাধীন দেশ, অছিভুক্ত এলাকা, অস্বায়ত্তশাসিত এবং সীমিত সার্বভৌমত্ব বলতে কি বুঝায়?

(ক) স্বাধীন দেশ ঃ সেই ভূখণ্ডকে স্বাধীন দেশ বা স্বাধীন রাষ্ট্র বলে যার জনগোষ্ঠী বাইরের অধীনতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং এরা নিজেরা সরকার গঠন করতে পারে। রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক, রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার সার্বভৌম ক্ষমতা চর্চা করেন। স্বাধীন রাষ্ট্র হচ্ছে এমন একটি রাজনৈতিক সংঘ যা সরকারের ঘোষিত আইন অনুসারে পরিচালিত হয়। স্বাধীন রাষ্ট্রের জনগণের পক্ষে সরকার আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষমতা রাখেন। সেই আইন অনুসারে রাষ্ট্রের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব সরকারের। অতএব স্বাধীন দেশ বলতে আমরা বুঝি সেই দেশ যে দেশে জনগণ নিজেদের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম এবং অন্য দেশের হস্তক্ষেপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

(খ) অছিভুক্ত এলাকা ঃ ১৯৫৪ সালে যখন জাতিসংঘের সনদ গৃহীত হয় তখন পৃথিবীর ২০০ মিলিয়ন মানুষ স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। নির্ভরশীল ভূখণ্ড হিসেবে অন্য রাষ্ট্রের দ্বারা শাসিত হত। সনদে এই সকল অঞ্চলের অধিবাসীদের স্বায়ত্তশাসন বা স্বাধীনতার লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া স্বায়ত্তশাসনহীন নির্ভরশীল অঞ্চলসমূহের শাসনের জন্যও সনদে কয়েকটি নীতি সংযোজন করা হয়েছে। কয়েকটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের বা অঞ্চলের জন্য সনদে যে ব্যবস্থা যুক্ত করা হয়েছে তা অছি ব্যবস্থা বলে পরিচিত। যে সব এলাকায় অছি ব্যবস্থা বিদ্যমান সেইসব এলাকা অছি এলাকা নামে পরিগণিত।

সনদের একাদশ অধ্যায়ের ৭৩–৭৪ নং ধারায় স্বায়ত্তশাসনহীন ভূখণ্ড বা অঞ্চলের প্রশাসন সম্পর্কিত ঘোষণা যুক্ত করা হয়েছে। যে সকল নীতির ভিত্তিতে ঐ সকল অঞ্চল শাসিত হবে ঐ সকল ধারায় তার উল্লেখ আছে। ঘোষণায় বলা হয়েছে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যে সব সদস্য ঐ ধরনের অঞ্চলে প্রশাসনিক দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে, তারা এই নীতির দ্বারা পরিচালিত হবে যে, ঐসব অঞ্চলের জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষাই হবে তাদের প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

www.pathagar.com

স্বায়ত্তশাসনের অধিকার থেকে বঞ্চিত অঞ্চলের প্রশাসন পরিচালনার ও তদারকের জন্য জাতিসংঘের সনদে আন্তর্জাতিক অছিব্যবস্থা গঠনের পরিকল্পনা ঘোষিত হয়েছে। জাতিসংঘ সনদ গৃহীত হওয়ার সময় যে সব অঞ্চল জাতিসংঘের ম্যান্ডেট ব্যবস্থার অধীনে ছিল, বিশ্বযুদ্ধের ফলে যে সব দেশ শত্রু ভাবাপন্ন দেশের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে এবং কোন দেশ স্বেচ্ছায় যে সব অঞ্চল অছি ব্যবস্থার অধীনস্থ করবে—সেই সব অঞ্চল অছিভুক্ত এলাকা। অছি অঞ্চলের অধিবাসীরাও সমভাবে স্বাধীনতা ও সমঅধিকার লাভ করবে।

(গ) **অস্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্র ঃ** অস্বায়ত্তশাসিত অর্থ হচ্ছে আপনার বশীভূত নয়। স্বদেশী বা স্বজাতীয়দের ছাড়া অন্যের দ্বারা শাসিত দেশ হচ্ছে অস্বায়ত্তশাসিত দেশ। অস্বায়ত্তশাসিত বলতে পরাধীন দেশকেই বুঝায়। এই জাতীয় দেশের নাগরিকদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার থাকে না। দেশ পরিচালনা, তথা সরকার গঠন ও পরিচালনায় নাগরিকদের কোন অধিকার থাকে না। ঔপনিবেশিক আমলে পৃথিবীর অনেক দেশই ছিল অস্বায়ত্তশাসিত। বিগত কয়েক দশকে এশিয়া আফ্রিকা ও ল্যাতিন আমেরিকার অনেক দেশ স্বাধীনতা লাভ করায় বর্তমানে বিশ্বমানচিত্রে অস্বায়ত্তশাসিত দেশের পরিমাণ কমে এসেছে। এক সময় অর্থাৎ আজ থেকে অর্ধ শতাব্দী আগে বৃটিশ ভারতের অধীন বর্তমান বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারত অস্বায়ত্তশাসিত ছিল। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা প্রদানের সময় পৃথিবীতে অনেক অস্বায়ত্তশাসিত দেশ ছিল। তাই আলোচ্য অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, অস্বায়ত্তশাসিত দেশের নাগরিকগণও মানবাধিকারের ঘোষণায় বর্ণিত অধিকার ও স্বাধীনতা সমভাবে ভোগ করবে। যে সব দেশ স্বাধীন নয়, অস্বায়ত্তশাসিত সে সব দেশের মানুষের অধিকার পদদলিত হয়, ঔপনিবেশিক শাসকগণ তাদের অধিকার হরণ করে। তাছাড়া রাজনেতিক স্বাধীনতা যা প্রত্যেক মানুষের মৌলিক অধিকার তাও থাকে না। তাই অস্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল বা দেশে মানুষের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হওয়ার আশংকা বেশি। এজন্য তাদের অধিকার ও স্বাধীনতাকে নিরাপত্তাকে প্রদানের জন্য আলোচ্য অনুচ্ছেদে এই বিধান রাখা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদ অনুসারে দেশ স্বাধীন অছিভুক্ত বা অস্বায়ত্তশাসিত হোক না কেন সে দেশের অধিবাসীর মানবাধিকারের ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না। এই অনুচ্ছেদ অনুসারে দেশ নির্বিশেষে মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা সমান।

দেশসমূহের মর্যাদাগত পার্থক্য

বিশ্বের সকল দেশ সমমর্যাদার বা সমান শক্তিশালী ও ক্ষমতাশালী নয়। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র সকলেই সমান হলেও এর মধ্যে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র পাঁচটি অধিক ক্ষমতা ও মর্যাদা ভোগ করে থাকে। তাছাড়া, সম্পদ, ভৌগোলিক অবস্থান, সামরিক শক্তি ইত্যাদির কারণেও অনেক দেশ অধিক শক্তি ও মর্যাদার অধিকারী। দারিদ্র্য এবং অন্যান্য

www.pathagar.com

বহুবিধ কারণে এমন কিছু দেশ আছে যাদের অবস্থান অন্যান্য দেশের নাগরিকদের নিকট অজ্ঞাতই রয়েছে।

সব দেশের রাজনৈতিক মর্যাদা এক নয়। কোন দেশ বিশ্ব রাজনীতিতে কতটুকু প্রভাব বিস্তার করতে পারে তার উপর নির্ভর করে সেই দেশের রাজনৈতিক মর্যাদা। অনুসৃত রাজনৈতিক আদর্শ, কূটনৈতিক তৎপরতার মান, জাতীয় নেতৃত্বের দক্ষতা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে সেই দেশের রাজনৈতিক মর্যাদা। সীমানাগত মর্যাদাও সকল দেশের একরকম নয়। দেশের আয়তন ক্ষুদ্র, বৃহৎ—দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, অবস্থানগত সামরিক গুরুত্ব ইত্যাদির উপর নির্ভর করে সীমানাগত মর্যাদা। আবার সব কিছু মিলিয়ে প্রতিটি দেশের একটি আন্তর্জাতিক মর্যাদা রয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সকল দেশের মর্যাদা সমান নয়। প্রশ্ন হচ্ছে বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক, সীমানাগত ও আন্তর্জাতিক মর্যাদার ক্ষেত্রে যে পার্থক্য রয়েছে তার ভিত্তিতে নাগরিকদের স্বাধীনতা ও অধিকারে কোন তারতম্য করা হবে কিনা।

আলোচ্য অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রের মর্যাদার সাথে মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতার কোন সম্পর্ক নেই। কারণ দেশ কাল পাত্রভেদে সকল মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতার দাবি সমান। দেশের মর্যাদার কারণে তাতে কোন পার্থক্য নেই।

বস্তুত মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার কেন্দ্রীয় বিষয় হচ্ছে মানুষ, মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা। মানুষকে মানুষের মত বেঁচে থাকার জন্য তার যে সব অধিকার ও স্বাধীনতা দরকার এই ঘোষণাপত্রে তা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

কিন্তু বাস্তব অবস্থা হচ্ছে এই যে, পৃথিবীর সকল মানুষের যোগ্যতা, ক্ষমতা এক নয়। মানুষ একজন থেকে আরেকজন কোন না কোনভাবে স্বতন্ত্র। তাছাড়া মানুষে মানুষে রয়েছে অসংখ্য পার্থক্য। বর্ণের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে পার্থক্য হয়েছে, ধর্মের ভিত্তিতে হয়েছে পার্থক্য। এমনিভাবে ভাষা, গোত্র, রাজনৈতিক আদর্শ, নারীপুরুষ, জন্মস্থান ইত্যাদি কতকিছুর ভিত্তিতে যে মানুষের মধ্যে পার্থক্য হয়েছে এর কোন ইয়ত্তা নেই। এ জাতীয় পার্থক্য অনাকাঙ্ক্ষিত বা অস্বাভাবিক কিছু নয়। পার্থক্য থাকতেই পারে। হয়তো থাকা দরকার। চেনাজানার জন্যও এক জন মানুষ থেকে অন্যজনের কিছুটা স্বাতন্ত্র, কিছুটা পার্থক্য থাকার প্রয়োজন আছে।

কিন্তু বিপদ হয় তখনই যখন এসব পার্থক্যের কারণে মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতায় বৈষম্য করা হয়। আলোচ্য অনুচ্ছেদ মানুষের স্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার করে না। কিন্তু কোন অজুহাতে মানুষের কোন অধিকার লাভের ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রদর্শনকে নিষেধ করা হয়েছে।

বিশ্ব মানচিত্রে যে সব রাষ্ট্র আছে তাদের সকলের মর্যাদা যদিও সমান নয় তথাপি রাষ্ট্রের মর্যাদার পার্থক্যের কারণে ও নাগরিকদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও অধিকার, যা মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় স্থান পেয়েছে, তা অর্জনে কোন প্রকার বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না। এটাই আলোচ্য অনুচ্ছেদের মর্মার্থ।

www.pathagar.com

বৈষম্যহীনতা আর অভিন্নতা এক নয়। মানুষে মানুষে অধিকারে এবং স্বাধীনতায় বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না, এর মানে এই নয় যে, মানুষ সকলেই অভিন্ন মর্যাদা, সুবিধা ও অধিকার ভোগ করবে। যেমন রাষ্ট্রে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগে কর্মচারীদের যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করা হয়। এতে বিভিন্ন ব্যক্তির দায়িত্ব, কর্তব্য, পদমর্যাদা সুযোগ সুবিধা এবং জবাবদিহিতার পার্থক্য করা হয়। এটা নিয়মানুবর্তিতা ও আনুগত্যের জন্য জরুরি। এখানে যদি সকলেই সমান নীতি প্রয়োগ করে বলা হয় যে কেউ কারো কাছে জবাবদিহি করবে না, কেউ কারো অধীন নয় তাহলে সমাজ চলবে না, রাষ্ট্র চলবে না। এক্ষেত্রে মানুষে মানুষে পার্থক্যকে বৈষম্যপ্রদর্শন হিসেবে বিবেচনা করব না ; বরং এটাকে মানবিক শৃঙ্খলাবোধ হিসেবে গণ্য করব, যা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জরুরি।

দ্বিতীয়ত, প্রকৃতিগতভাবে মানুষ অভিন্ন নয়। যোগ্যতা, সহনশীলতা, দক্ষতা, মেজাজ, দৃঢ়তা, কর্মস্পৃহা সকলের সমান নয়। অতএব সকল মানুষ কর্মক্ষেত্রে সমান তৎপরতা প্রদর্শন করবে, সমান সাফল্য লাভ করবে এটা আশা করা যায় না। সেক্ষেত্রে সবার সুযোগ, সুবিধা, মজুরি, মর্যাদা দায়িত্ব সমান হবে সেটা প্রত্যাশা করাও সঠিক হবে না। অসম পরিশ্রমের জন্য সম সুবিধার প্রবর্তনই বরং বৈষম্য প্রদর্শন। কেননা যোগ্যতা দক্ষতা শ্রম ইত্যাদির পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যদি সমসুবিধা দেয়া হয় তাহলে যারা যোগ্যতা, দক্ষতা ও শ্রমের ক্ষেত্রে অগ্রগামী তাদের অবিচার করা হবে। অতএব আমরা বলতে পারি যোগ্যতা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, তৎপরতা ইত্যাদির ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে যে শ্রেণী বিভাগ করাহয় তা এই অনুচ্ছেদের খেলাপ নয়।

তৃতীয়ত, মানুষের সামর্থ্যের পার্থক্যের কারণে তাদের মধ্যে কর্তব্য ও দায়িত্বের যে পার্থক্য করা হয় সেটাও এই এই অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন মনে করার সুযোগ নেই। কেননা কারো সামর্থ্যের বেশি দায়িত্ব অর্পণ যথার্থ নয়। যেমন আমাদের দেশে বিভিন্ন মাত্রায় আয়ের লোকের আয়কর বিভিন্ন। এটাকে বৈষম্য প্রদর্শন বলা যায় না। বরং এটাই হচ্ছে সুবিচার। বিভিন্ন মাত্রার আয়ের লোকের আয়কর ও আয়করের হার সমান হলে তাতে স্বল্প আয়ের লোকদের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা হবে।

চতুর্থত, নারী পুরুষের অধিকার সমান কিন্তু তাই বলে তারা অভিন্ন একথা বলা যায় না। একজন নারীর যে যোগ্যতা আছে একজন পুরুষেরও সেই যোগ্যতা আছে তা বলা যায় না। তেমনি পুরুষের সকল যোগ্যতা নারীর মধ্যে আছে বলা যাবে না। অতএব নারী পুরুষ একই কাজ করবেন একই সুবিধা পাবেন, একই দায়িত্ব কর্তব্য, কাজের ধরন ইত্যাদির মধ্যে শ্রেণী বিভাগ এই অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন নয় বরং যে কাজ নারী পুরুষ সকলেই করতে পারে সে ক্ষেত্রে শুধু নারী বা পুরুষ হওয়ার কারণে ভিন্নতা দেখানো বৈষম্যের শামিল।

পঞ্চমত, কোন অনগ্রসর জাতি, গোষ্ঠী, নারী বা শিশুদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে যদি বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয় তাহলে সেটাও এই

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদের পরিপন্থী হবে না। কেননা ইতোমধ্যে প্রদর্শিত বৈষম্যের কারণে অবহেলিত একটি বিশেষ শ্রেণীকে সুবিচার করার লক্ষ্যে আইনানুগভাবে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে। তবে সেটার কারণে অন্য কোন শ্রেণী যাতে বৈষম্যের শিকার না হয় সেটা খেয়াল করতে হবে।

বস্তুত, এই অনুচ্ছেদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের মধ্যে বিভিন্নভাবে সৃষ্ট বৈষম্যের অবসান। সকল মানুষকে অভিন্ন যোগ্যতা-মর্যাদা ও দায়িত্বের অধিকারী বিবেচনা করা এবং সকল মানুষকে একাকার করে ফেলা এর কাজ নয়। একই যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কোন বিশেষ অজুহাতে ভিন্ন নজরে দেখা, একই রকম দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার পরও অভিন্ন সুবিধা না দেয়াকে আমরা বলব বৈষম্য প্রদর্শন। আলোচ্য অনুচ্ছেদে কোন কিছুর ভিত্তিতে কোন অজুহাতে বৈষম্য প্রদর্শন করতে নিষেধ করেছে। কিন্তু সকল মানুষকে একাকার করতে বলে নি। শ্রেণীবিভাগ ও বৈষম্য এক নয়। একথা মনে রেখেই আলোচ্য অনুচ্ছেদকে আগাগোড়া বিশ্লেষণ করতে হবে। শ্রেণীবিন্যাস বা শ্রেণীবিভাগকে বৈষম্য প্রদর্শন মনে করা হয় না যদি এর ভিত্তি হয় যুক্তিসঙ্গত। খামখেয়ালি করা যাবে না, করলে তা যথার্থ হবে না। বৈষম্য প্রদর্শন করার অর্থ হচ্ছে আচরণে অসমতা প্রদর্শন করা, তাই মানুষের মধ্যে বিরাজমান অসমতা দূরীভূত করার লক্ষ্যে পরিচালিত শ্রেণীবিভাগ বৈষম্যমূলক আচরণের আওতাভুক্ত নয়। চূড়ান্ত কথা হচ্ছে যুক্তিসঙ্গত শ্রেণীবিভাগকে বৈষম্য বলা যাবে না।

এই অনুচ্ছেদ ও অন্যান্য অনুচ্ছেদ

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদে মানুষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা এবং বৈষম্য নিরসনের বিষয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এই সনদের আরো কিছু অনুচ্ছেদ আছে যেগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যেই প্রণীত ও গৃহীত হয়েছে। নিম্নে অনুচ্ছেদগুলো উল্লেখ করছি।

দাসত্ব সামাজিক বৈষম্য ও অসমতার নিদর্শন। তাই মানুষে মানুষে বৈষম্য অপনোদনের লক্ষ্যে দাসত্ব বিরোধী বক্তব্য ঘোষিত হয়েছে অনুচ্ছেদ—৪-এ। এতে বলা হয়েছে, 'কাউকে দাসত্বে আবদ্ধ রাখা চলবে না। সকল প্রকারের দাসত্ব ও ক্রীতদাস প্রথা রহিত হবে।'

আইনের সম্মুখে সকলের ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি না পাওয়া বৈষম্যমূলক আচরণ। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে ৬ নং অনুচ্ছেদে। সকলের ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে এতে বলা হয়েছে যে, 'প্রত্যেকেরই আইনের সম্মুখে সর্বত্র ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভের অধিকার আছে।'

সকলের প্রতি আইনের সমদৃষ্টি এবং সকলকে সমানভাবে রক্ষা করার জন্য আইন সচেষ্ট না হলে বৈষম্য অনিবার্য। তাই ৭ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'আইনের কাছে সকলেই সমান এবং কোনরূপ বৈষম্য ব্যতিরেকে সকলেরই আইনের দ্বারা সমভাবে রক্ষিত হওয়ার অধিকার

www.pathagar.com

রয়েছে। এই ঘোষণা লঙ্ঘনকারী কোনরূপ বৈষম্য বা এই ধরনের বৈষম্যের কোন উস্কানির বিরুদ্ধে সমভাবে রক্ষিত হওয়ার অধিকার সকলেরই আছে। '

অধিকার দায়িত্ব এবং ফৌজদারি অভিযোগ নিরূপণের ক্ষেত্রেও আদালতের সম আচরণ লাভ বৈষম্য নিরসনের জন্য অপরিহার্য। বৈষম্য নিরসনের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে ন্যায়বিচার লাভ। এই বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত রয়েছে ১০ নং অনুচ্ছেদে। এতে বলা হয়েছে, 'প্রত্যেক ব্যক্তি তার অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ এবং তার বিরুদ্ধে আনিত কোন অপরাধমূলক অভিযোগের ক্ষেত্রে পূর্ণ সমতার ভিত্তিতে স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষ বিচারালয় কর্তৃক ন্যায্য ও প্রকাশ্য শুনানি লাভের অধিকারী।'

বিবাহের ব্যাপারে বৈষম্যবিরোধী সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে, ১৬ নং অনুচ্ছেদে। এতে বলা হয়েছে,

(ক) গোত্র, জাতীয়তা, অথবা ধর্মের ভিত্তিতে কোনরূপ সীমাবদ্ধ ব্যতিরেকে, পূর্ণবয়স্ক সকল পুরুষ ও নারীর বিবাহ এবং পরিবার প্রতিষ্ঠা করার অধিকার রয়েছে। বিবাহে, বিবাহিত অবস্থায় এবং বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে নারী ও পুরুষ সমান অধিকার লাভের অধিকারী।

(খ) ভাবী দম্পতির অবাধ ও পূর্ণ সম্মতির ভিত্তিতেই কেবল বিবাহ বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হবে।

(গ) পরিবার হচ্ছে সমাজের স্বাভাবিক ও মৌলিক গোষ্ঠী একক, এবং তা সমাজ ও রাষ্ট্রের রক্ষণ লাভের অধিকারী।'

সরকার গঠন, সরকারি কাজে অংশগ্রহণ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে বৈষম্য নিরসনের প্রত্যয় ঘোষিত হয়েছে ২১ নং অনুচ্ছেদে। এতে বলা হয়েছে যে,

(ক) প্রত্যক্ষভাবে অথবা অবাধে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিজ দেশের সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

(খ) প্রত্যেকেরই নিজ দেশের সরকারি চাকুরিতে সমান প্রবেশাধিকার রয়েছে।

(গ) জনগণের ইচ্ছাই সরকারের ক্ষমতার ভিত্তি হবে ; এই ইচ্ছা সর্বজনীন ও সমান ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নিয়মিত ব্যবধানে এবং প্রকৃত নির্বাচন দ্বারা ব্যক্ত হবে ; গোপন ব্যালট অথবা অনুরূপ অবাধ ভোটদান পদ্ধতিতে এরূপ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।'

কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য থেকে রক্ষণের কথা বলা হয়েছে ২৩ নং অনুচ্ছেদে। এতে বলা হয়েছে,

(ক) প্রত্যেকেরই কাজ করার, নিজের ইচ্ছামত কাজ পছন্দ করার, ন্যায় ও অনুকূল অবস্থায় কাজ করার এবং বেকার অবস্থা থেকে রক্ষণলাভের অধিকার রয়েছে।

(খ) প্রত্যেক ব্যক্তির কোন রকম তারতম্য ছাড়াই, সমান কাজের জন্য সমান মজুরি লাভের অধিকার রয়েছে।

www.pathagar.com

(গ) কাজ করে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের ও তার পরিবার বর্গের পক্ষে মানুষের মর্যাদা রক্ষা করে জীবন ধারণের উপযুক্ত ন্যায়সঙ্গত পারিশ্রমিক পাওয়া এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহলে অন্য কোন উপায়ে সামাজিক সহায়তা লাভের অধিকার রয়েছে।

(ঘ) প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার ও তাতে যোগদানের অধিকার রয়েছে।'

বস্তুত জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষ বৈষম্যের শিকার হতে পারে। অসমতা এবং বৈষম্যে ভরপুর আমাদের সমাজে সমতা আনয়ন এবং বৈষম্য নিরসনের প্রয়াস মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। ২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে সেসব বিষয় যেগুলোর কোন একটির বা অনেকগুলোর ভিত্তিতে বৈষম্য করা যেতে পারে। এসবের ভিত্তিতে বৈষম্য প্রদর্শন করতে আলোচ্য অনুচ্ছেদ নিষেধ করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বৈষম্য হতে পারে সেসব ক্ষেত্র সম্পর্কে উপরে বর্ণিত বিভিন্ন অনুচ্ছেদে আলোচনা হয়েছে এবং ঐসব ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রদর্শনে নিষেধ করা হয়েছে।

ইসলাম ও বৈষম্যহীনতা

ইসলাম একটি সুন্দর জীবন-ব্যবস্থা। ইসলামের নবি হযরত মুহম্মদ (সাঃ) যখন ধর্ম প্রচার শুরু করেন তখন আরবের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় সকল ক্ষেত্রেই মানুষে মানুষে চরম বৈষম্য প্রদর্শন করা হতো।

সামাজিক জীবনে নারীর পুরুষের সমান অধিকার ছিল না। নারীর জন্মই ছিল তাদের কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত, তাই কন্যা সন্তানের জন্ম হলে তাকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো। নারী ছিল পণ্যের মতো। আরব সমাজে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। পণ্যদ্রব্যের মত দাসদাসিও হাটবাজারে বিক্রয় হতো। প্রভুরা তাদের খেয়ালখুশিমত অত্যাচার করত এবং কখনো কখনো দাসিদের উপপত্নী হিসেবে ব্যবহার করত।

হযরত মুহম্মদ (সাঃ) নারী পুরুষে বৈষম্য নির্মুলের জন্য নারীকে পুরুষের সমান অধিকার প্রদান করেন। বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনি বলেন, 'হে লোক সকল। নারীর উপর তোমাদের যেমন অধিকার আছে, তোমাদের উপর নারীরও তেমনি অধিকার আছে। তোমাদের দাসদাসিদের উপর সদয় ব্যবহার করিও। তাদেরকে নির্যাতন করবার কোন অধিকার তোমাদের নেই। নিজেরা যা খাও, যে বস্ত্র পরিধান কর, তাদেরকেও অনুরূপ খাদ্য ও বস্ত্র দেবে। তারা অপরাধ করলে ক্ষমা করবে এবং মুক্তিদান করবে। স্মরণ রেখ, তারাও আল্লাহর সৃষ্টি এবং তোমাদের মত মানুষ। এভাবে আল্লাহর নবী সামাজিকভাবে মানুষে মানুষে বৈষম্য

www.pathagar.com

দূর করার প্রয়াস চালিয়েছেন। এবং ইসলামি সমাজে আশরাফ আতরাফ, উঁচু–নীচু, ধনী–দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য করা হয় না। নামাজের জামাতে সকলের এক কাতারে দাঁড়ানো এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

অবস্থান, জন্মস্থান, বংশগত বৈষম্য ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মহানবী (সাঃ) তার বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন, 'জেনে রাখ, সমস্ত মুসলমান পরস্পরের ভাই এবং দুনিয়ার সমুদয় মুসলিম এক অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃসমাজ। বাসভূমি ও বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলমান সমপর্যায়ভুক্ত। আজ হতে বংশগত কৌলিন্য বিলুপ্ত হল। সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে কুলিন, যে স্বীয় কাজের দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে।

ইসলামের নবি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক। সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে যে বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন পৃথিবীর ইতিহাসে তার কোন নজির নেই। তিনি আভিজাত্যের গৌরব ও বংশমর্যাদার মূলে কুঠারাঘাত করেন, মানুষে মানুষে সকল প্রকার অসাম্য ও ভেদাভেদ দূর করেন এবং শুধু মানবতার ভিত্তিতে সমাজবন্ধন দৃঢ় করেন। খুনখারাবি, মদ্যপান, শিশুকন্যা হত্যা ও নারীর অপমানকর সকল প্রকার কাজকে তিনি দৃঢ়হস্তে বন্ধ করেন। তিনি ঘোষণা করন, 'সকল মানুষ সমান, মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট সেই ব্যক্তি যিনি আল্লাহর প্রতি সর্বাধিক অনুগত এবং মানবের সর্বাধিক কল্যাণকামী।' তিনি বলেন, 'গোলামকে আজাদি দানের চাইতে শ্রেষ্ঠতর কাজ আল্লাহর কাছে আর কিছুই নাই।'

বস্তুত ইসলামে মানুষে মানুষে বৈষম্য সৃষ্টির কোন সুযোগ নেই। সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব ইসলামের অন্যতম মৌলিক শিক্ষা, যা বৈষম্যের সম্পূর্ণ বিপরীত।

কোরআন শরীফ এবং রাসুল (দঃ) এর বাণীর ভিত্তিতে যে ইসলামি রাষ্ট্র গড়ে উঠে তার অভ্যন্তরে বসবাসকারী সকল মানুষ আইনের চোখে সমান মর্যাদা লাভ করেন। সামাজিক জীবনেও তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণের কোন মাপকাঠি নেই, একমাত্র তাকওয়া ছাড়া। রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে ইসলাম সমগ্র মানবজাতিকে এক সমতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। ঈমান ও ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তিতে মুসলমানদেরকে পরস্পর ভাই ভাই হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছে। কোরআনে বলা হয়েছে যে, 'নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই' (হুজরাত ঃ ১০)। রাসূলে করিম (দঃ) শুধু মুসলমানদেরই নয়, দুনিয়ার সকল মানুষকে পরস্পরের ভাই বলে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সকল মানুষ পরস্পর ভাই ভাই' (আবু দাউদ)।

ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সেখানে ধনী–গরীব, শাসক–শাসিত, আমির–ফকির, মনিব–গোলাম, মুসলিম–অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের বেলায় ইনসাফের ক্ষেত্রে সাম্যনীতি অনুসরণ করা হয়েছে। রাসুল (দঃ) বলেছেন, 'তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ এইজন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, তারা সাধারণ লোকদের ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী শাস্তি কার্যকর

www.pathagar.com

করত, কিন্তু বিশিষ্ট লোকদের কোন শাস্তি দিত না। সেই মহান সত্তার শপথ যার মুঠোয় আমার জীবন। যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও এরূপ করত তবে আমি তাঁরও হাত কাটতাম।' এ থেকেই বুঝা যায় সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে ইসলাম কতটুকু সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছে, প্রয়াস পেয়েছে বৈষম্য দূরিকরণের।

এই অনুচ্ছেদ ও বাংলাদেশের সংবিধান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮ ও ২৯ অনুচ্ছেদ মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তাই অনুচ্ছেদ দুটি নিম্নে পরিবেশিত হল।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

(১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী, পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

(২) রাষ্ট্র গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

(৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী, পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

(৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

(১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।

(২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের অযোগ্য হইবেন না, কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।

(৩) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই

(ক) নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাহাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা হইতে,

www.pathagar.com

(খ) কোন ধর্মীয় বা উপসম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠানে উক্ত ধর্মাবলম্বী বা উপসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষণের বিধান-সম্বলিত যে কোন আইন কার্যকর করা হইতে,

(গ) যে শ্রেণীর কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তাহা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয়, সেইরূপ যে কোন শ্রেণীর নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হইতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

অনুচ্ছেদ দু'টির ব্যাখ্যা মৎপ্রণীত 'সংবিধানের ভাষ্য' থেকে নিম্নে পরিবেশিত হল।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

ব্যাখ্যা
প্রথম দফা

(১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

অনুচ্ছেদের এই দফা বৈষম্য বিরোধী। অনুচ্ছেদের এই দফা সর্বপ্রকার বৈষম্যের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। রাজনৈতিক, দেওয়ানি বা সামাজিক বা অন্য সর্বপ্রকারের বৈষম্য এই দফা দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে। কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ বা সম্প্রদায়ভিত্তিক নির্বাচন করা হইলে তাহা এই বিধান দ্বারা বাতিল ঘোষিত হইবে।

বৈষম্য

বৈষম্য শব্দের অর্থ আচরণের অসমতা। কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে বৈষম্য প্রদর্শন নিষিদ্ধ ; অন্য কারণে বৈষম্য নিষিদ্ধ নহে।[১]

ধর্ম

৪১ অনুচ্ছেদে প্রত্যেক নাগরিকের ধর্মীয় স্বাধীনতার বিধান রহিয়াছে। আলোচ্য অনুচ্ছেদে ধর্মীয় কারণে সর্বপ্রকার বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। একটি বিশেষ ধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণে কোন নাগরিক যেমন কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না, তেমনি কোন বিশেষ সুবিধাও পাইবেন না।

www.pathagar.com

কোন বিশেষ ধর্মের লোক বা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতী কলহপ্রিয়, এই অজুহাতে সেই ধর্ম বা সম্প্রদায়ের লোকদের উপর বিশেষ শাস্তির ব্যবস্থা অবৈধ।

গোষ্ঠী

আমাদের দেশে গোষ্ঠীগত কারণে বৈষম্য কচিৎ দৃষ্ট হয়।

গোষ্ঠী বলিতে সেই মানবমণ্ডলীকে বোঝায় যাঁহারা পুরুষানুক্রমে উত্তরাধিকারী সূত্রে একটি বিশেষ আকৃতি-প্রকৃতি বহন করেন। পণ্ডিতগণের মতে চুলের রং, গাত্রবর্ণ, মাথার আকৃতি, শরীরের গঠন এবং মুখাবয়ব প্রভৃতি দ্বারা গোত্র নির্ণীত হয়। বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সমাবেশে দেখা যায়। গোষ্ঠীগত কারণে তাহাদের প্রতি অসম আচরণ এই অনুচ্ছেদে নিষিদ্ধ।

বর্ণ

বর্ণ শব্দটি এখানে সাধারণভাবে আমরা যাহাকে জাতি বলি, সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। হিন্দুসমাজে পূর্বে চতুর্বর্ণ বিভাগ বিদ্যমান ছিল, যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। মুসলমান সমাজেও যে একেবারে বর্ণবিভাগ নাই, তাহা নহে। বর্ণের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা যুগ যুগ ধরিয়া একই অপরিবর্তিত রূপ বহন করে। ব্রাহ্মণের পুত্র চিরকালই ব্রাহ্মণ হয়।

বর্ণভেদের কারণে সামাজিক ক্ষেত্রে অনেক বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সর্বপ্রকার বর্ণবৈষম্য নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

নারী-পুরুষ ভেদ

লিঙ্গ বৈষম্যের জন্য সাধারণভাবে কোন প্রকার বৈষম্য প্রদর্শন অবৈধ। কিন্তু এই অনুচ্ছেদের ৪ দফায় নারী, শিশু এবং অনগ্রসর নাগরিকদের জন্য বিশেষ বিধানের ব্যবস্থা সুরক্ষিত হইয়াছে। এই কারণে নিম্নবর্ণিত আইনসমূহ সংবিধানানুগ।

(১) দণ্ডবিধি আইনের ৪৯৭ ধারা ; এই ধারা জিনার ব্যাপারে নারীকে সহায়ক বলা হয় না।[২]

(২) দণ্ডবিধি আইনের ৩৫৪ ধারা ; এই ধারায় শুধুমাত্র নারীর শ্লীলতার রক্ষণ ব্যবস্থা রহিয়াছে।[৩]

(৩) ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের ৪৮৮ ধারা ; এই ধারায় স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যবস্থা রহিয়াছে।[৪]

www.pathagar.com

জন্মস্থান

জন্মস্থানের কারণে বৈষম্যমূলক আইন বা বিধি সংবিধান বহির্ভূত।

জন্মস্থান এবং বাসস্থান এক কথা নয়। বাসস্থানের কারণে যদি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়, তবে তাহা সংবিধান বহির্ভূত হইবে না।[১]

দ্বিতীয় দফা

রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

প্রথম দফায় বলা হইয়াছে যে, লিঙ্গভেদের জন্য বৈষম্য অসিদ্ধ ; এই ঘোষণা নারী-সমাজের পক্ষে রক্ষাকবচ স্বরূপ। বর্তমান দফা নারী জাতিকে পুরুষের সহিত সমান অধিকার দিয়াছে। প্রথম দফা বৈষম্যবিরোধী আর দ্বিতীয় দফা অধিকার প্রদায়ী। এই দফার প্রতিপাদ্য বিষয় ঃ নারী সমান অধিকার পাইবে—

(১) পুরুষের সাথে,

(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনে।

রাষ্ট্রীয় অধিকারের মধ্যে আসে—

(১) ভোটাধিকার এবং

(২) চাকুরির অধিকার।

গণ অধিকারের মধ্যে আসে—

(১) ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার,

(২) পরিবার সম্পর্কীয় অধিকার,

(৩) সম্পত্তি সম্পর্কীয় অধিকার।

ব্যক্তিস্বাধীনতার মধ্যে আসে—

১. বাক্ স্বাধীনতার অধিকার,

২. ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার,

৩. জীবন রক্ষা ও ভ্রমণ স্বাধীনতার অধিকার,

৪. আইনে সমান ব্যবহার প্রাপ্তির অধিকার,

৫. নিরপেক্ষ বিচার প্রাপ্তির অধিকার,

www.pathagar.com

৬. সমান সুযোগ লাভের অধিকার,

৭. সংঘ গঠনের অধিকার,

৮. পেশা গ্রহণের অধিকার এবং

৯. গ্রেফতারের এবং কয়েদের ব্যাপারে রক্ষাকবচের অধিকার।

পরিবার সম্পর্কীয় অধিকারের মধ্যে আসে—

১. বিবাহ সম্পর্কীয় অধিকার, এবং

২. সন্তান সম্পর্কীয় অধিকার, এবং

৩. অভিভাবক সম্পর্কীয় অধিকার।

তৃতীয় দফা

এই দফায় ঘোষণা করা হইয়াছে যে, নাগরিকগণ (ক) জনসাধারণের বিনোদন স্থান বা সাধারণের বিশ্রামের স্থানে যাইতে পারিবেন এবং (খ) তাহারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হইতে পারিবেন। নাগরিকগণের এই দুইটি (ক এবং খ) অধিকার ধর্ম প্রভৃতির কারণে অধীন করা যাইবে না,

(ক) কোন অক্ষমতার, বা

(খ) বাধ্যবাধকতার, বা

(গ) বাধার, বা

(ঘ) শর্তের।

প্রথম দফায় রাষ্ট্রকে বৈষম্যমূলক আচরণ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। কিন্তু বর্তমান দফায় রাষ্ট্র এবং অন্যান্য সকলের নিম্নবর্ণিত পাঁচ কারণে বৈষম্যমূলক আচরণ করিতে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

১. ধর্ম

২. গোষ্ঠী

৩. বর্ণ

৪. নারী-পুরুষভেদ

৫. জন্মস্থান।

এই নিষেধাজ্ঞা তিনটা স্থানে প্রযোজ্য—

(১) জনসাধারণের বিনোদন স্থানে প্রবেশ

(২) জনসাধারণের বিশ্রাম স্থানে প্রবেশ, এবং

(৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি।

www.pathagar.com

জনসাধারণের বিনোদন স্থান

সাধারণভাবে সিনেমা, থিয়েটার, সার্কাস প্রভৃতি প্রদর্শনের স্থান, খেলা-ধূলার মাঠ, নাট্যমঞ্চ, আর্ট গ্যালারী, গণনৃত্যের আসর, মেলা, এগজিবিশন, স্টেডিয়াম প্রভৃতিকে বিনোদন স্থান বলা যায়।

আমার মতে হোটেল প্রভৃতিকে এই সংজ্ঞায় ফেলা যায়।

জনসাধারণের বিশ্রাম স্থান

শহরের পার্ক, উদ্যান, ময়দান প্রভৃতি এই সংজ্ঞার আওতায় আসে। কলিকাতা ময়দানকে জনসাধারণের বিশ্রাম স্থান বলিয়া গণ্য করা হয়।[১]

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বলিতে সমগ্র দেশের সকল প্রকারের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল, পলিটেকনিক, ডাক্তারি, ব্যবসায়বিদ্যা, এ্যাকাউন্টেন্সি প্রভৃতি যাবতীয় প্রতিষ্ঠান এই সংজ্ঞার আওতায় আসে।

উপরে বর্ণিত তিনটি স্থানে প্রবেশ ও ভর্তির ব্যাপারে ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, শিক্ষা, জন্মস্থান কোন বাধা বা অক্ষমতা সৃষ্টি করিবে না কিন্তু অন্য কারণে বাধা আসিতে পারে এবং সেইরূপ বাধা সংবিধান অসিদ্ধ ঘোষণা করে না। ভর্তির ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ নীতিমালা প্রণয়ন করিতে পারে না। ফলে কর্তৃপক্ষ বা সরকার নীতির ভিত্তিতে ভর্তি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

চতুর্থ দফা

এই দফায় একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ঘোষণা করা হইয়াছে। সাধারণভাবে নারী-পুরুষভেদে কিংবা জন্মস্থানের কারণে বিষম আচরণ সংবিধানে নিষিদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু এই দফায় ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, প্রয়োজনবোধে নারী শিশু এবং অনগ্রসর নাগরিকদের জন্য রাষ্ট্র বিশেষ বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবেন। যানবাহনে নারীদের জন্য বিশেষ আসনের ব্যবস্থা, গর্ভকালে এবং প্রসবোত্তর সময়ে মাতাদের জন্য বিশেষ সুবিধা, অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য বিশেষ বৃত্তি প্রভৃতি এই দফার সংবিধানানুগ ঘোষণা করা হইয়াছে।

---

www.pathagar.com

নারী

তুলনামূলকভাবে শরীরের গঠনে নারীজাতি স্বভাবতই দুর্বল। পুরুষের সহিত তাহাদের কর্মক্ষেত্রেরও বিভিন্নতা আছে। গৃহপরিচালনা এবং শিশু পালন এই দুই যুগ্ম দায়িত্ব প্রতিপালনের জন্য প্রায়ই তাহারা অন্তঃপুরিকা।

এই সমস্ত কারণে নারীজাতির জন্য বিশেষ সুবিধামূলক আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে।

শিশু

বয়সের কারণে শিশুশ্রেণী স্বভাবতই নিতান্ত দুর্বল। তাহাদের পক্ষ সমর্থনের তেমন কোন প্রতিনিধিও নাই। শুধু শিশুশ্রেণীর জন্য আইন প্রণয়ন তাই শুধু আইনসিদ্ধ নয়, যুক্তিযুক্ত।

অনগ্রসর অংশ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য বিশেষ বিধান করা যাইতে পারে। নাগরিকদের মধ্যে কাহারা অনগ্রসর তাহা নির্ণয় করা অতি দুরূহ ব্যাপার। তবে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, অর্থ এবং শিক্ষায় যাহারা পশ্চাদবর্তী তাহারাই অনগ্রসর।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই দফায় বর্ণিত বিশেষ সুবিধা ২৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সমব্যবহারের নীতি এবং এই অনুচ্ছেদের প্রথম দফায় বর্ণিত বৈষম্যবিরোধ নীতির অধীন। এই দফায় বলা হইয়াছে যে, নারী, শিশু এবং অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য বিশেষ আইন প্রণয়ন করা চলিবে। 'বিশেষ' কথাটি মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিতে হইবে। বিশেষ সুবিধা দিতে গিয়া সকলের অধিকার হরণ করা যায় না। মেডিকেল কলেজে বা ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে শতকরা ৯০টি আসন নির্দিষ্ট করিয়া রাখা এই দফায় সিদ্ধ নহে। যাহারা দুর্বল, যাহারা অশক্ত, যাহারা অনগ্রসর, সমাজের ও দেশের বৃহত্তম কল্যাণের জন্য তাহারা কিছু বিশেষ সুবিধা পাইতে পারে বটে, কিন্তু সেই সুবিধা যদি এমন সর্বগ্রাসী হয় যে তাহাতে সকলের জন্য সামগ্রিক বঞ্চনার অভিশাপ নামিয়া আসে, তবে যে আইন দ্বারা তাহা করা হয়, সেই আইন এই দফায় সিদ্ধ গণ্য করা যায় না।

এই অনুচ্ছেদের চতুর্থ দফায় নারীদের অনুকূলে রাষ্ট্রকে বিশেষ বিধান প্রণয়নের অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে।

www.pathagar.com

সাধারণ আলোচনা

সংবিধানের এই অনুচ্ছেদে ৪টি মৌলিক অধিকারের কথা বলা হইয়াছে। এই চারটি অধিকার চারটি দফায় বিধৃত।

১ম দফায় বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না। কোন নাগরিকের প্রতি কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী, পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে।

আমাদের সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্র বলিতে সংসদ, সরকার ও সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ অন্তর্ভুক্ত। এই দফায় স্পষ্টভাবে বৈষম্য প্রদর্শন না করিতে সংসদ, সরকার ও সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের উপর হুকুম দেওয়া হইয়াছে।

বৈষম্য বলিতে বিভিন্ন আচরণ বোঝায়। কিছু দিবার বা লইবার বেলায় একজনের সঙ্গে এক রকম আর অন্যজনের সঙ্গে আরেকরকম, ইহাকেই বলে বৈষম্য। নাগরিকগণের যে অধিকার আছে তাহা পূরণের ব্যাপারে বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। এই অধিকারগুলি মোটামুটিভাবে চার প্রকারের হইতে পারে ঃ

(ক) রাজনৈতিক অধিকার ঃ ইহার মধ্যে পড়ে ভোট দানের অধিকার। নির্বাচিত হইবার অধিকার, সরকারি কাজের সমালোচনার অধিকার প্রভৃতি।

(খ) পৌর অধিকার ঃ এই অধিকারের মধ্যে পড়ে জীবনের অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার, পরিবার গঠনের অধিকার প্রভৃতি।

(গ) সামাজিক অধিকার ঃ এই অধিকারের মধ্যে পড়ে শিক্ষার অধিকার, ধর্মের অধিকার প্রভৃতি। এবং

(ঘ) অর্থনৈতিক অধিকার ঃ এই অধিকারের মধ্যে পড়ে কর্মের অধিকার, পরিশ্রমের অধিকার, অবকাশের অধিকার প্রভৃতি।

এই সব অধিকার, বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রদর্শন নিষিদ্ধ।

এই নিষেধ পাঁচটি কারণে প্রযুক্ত হয়, তাহার মধ্যে ধর্মই প্রথম। ধর্মের কারণে কোন নাগরিককে কোন বিশেষ অনুগ্রহ বা নিগ্রহ প্রদর্শন করা যাইবে না, করা যাইবে না উপকৃত বা বঞ্চিত কোনভাবে।

মহেন্দ্রগঞ্জ এলাকায় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপ হওয়ায় সেখানে পিটুনি কর ধার্য করা হইল এবং সেই কর ধার্যের আদেশে বলা হইল যে ঐ এলাকার খ্রিষ্টানগণ যেহেতু নিরীহ তাই তাহাদের এই কর দিতে হইবে না। এই প্রকার আদেশ অবৈধ। মানুষ শান্তিপ্রিয় কি অশান্তিপ্রিয় তাহা তাহার ধর্মবিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল নহে।

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন একই কারণে সংবিধান বহির্ভূত।

দ্বিতীয় কারণ হইতেছে গোষ্ঠী। গোষ্ঠীর বিভিন্নতা আমাদের দেশে বিরল। চাকমা, মগ, কুকি প্রভৃতিকে বোধ হয় উপজাতীয় গোষ্ঠী বলা যাইতে পারে। ইহাদের উপর বৈষম্য নিষিদ্ধ।

www.pathagar.com

তৃতীয় কারণ হইতেছে বর্ণ। বর্ণ বিভেদ আমাদের দেশে প্রবল নহে। হিন্দুদের মধ্যে একদিন চার বর্ণ ছিল। পরবর্তীকালে তাহারা বহু জাতিতে পরিণত হয়। বর্তমানে এই বিভিন্নতা ক্ষীয়মান। মুসলমানদের মধ্যে নীলরক্তের দাবি দেখা যায় বটে কিন্তু তাহা খুব দুর্বল। বর্ণের কারণে বৈষম্য নিষিদ্ধ।

চতুর্থ কারণ হইতেছে নারী–পুরুষ ভেদ। মহিলাদের পুলিশের চাকুরি দেওয়া হইবে না এই প্রকার আদেশ সংবিধান বহির্ভূত। লিঙ্গভেদে বৈষম্য প্রদর্শন নিষিদ্ধ।

পঞ্চম কারণ হইতেছে জন্মস্থান। উত্তরবঙ্গের মানুষ দক্ষিণবঙ্গে ব্যবসা করিতে পারিবে না এই প্রকার বিধান সংবিধান বহির্ভূত। তবে জন্মস্থান এবং বাসস্থান এক নহে। বাসস্থানের কারণে বৈষম্য সিদ্ধ।

এই অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় দফায় বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্র গণজীবনের সর্বস্তরে নারীপুরুষের সমানাধিকার পাইবে।

২৭ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান। ঐ অধিকার নারী–পুরুষ সকলের উপর সমভাবে প্রযোজ্য।

এই অনুচ্ছেদে ১ম দফায় বলা হইয়াছে যে নারী পুরুষভেদে কোন বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না। আবার এই দফায় বলা হইতেছে যে নারী পুরুষ সমানাধিকার লাভ করিবে। ইহাকে দ্বিরুক্তি বলা চলে না। এই দফায় রাষ্ট্র ও গণজীবনের সকল স্তরের কথা বলা হইয়াছে।

পুরুষের সাথে নারী বা নারীর সাথে পুরুষের শক্তি, মেধা ও মেজাজের তারতম্য আছে কিনা, সে প্রশ্নে যাইবার অধিকার সংবিধান রাখে নাই। সংবিধানের এই ঘোষণা স্তব্ধ করিয়া দিয়াছে সেই দাবিকে যাহাতে পুরুষের সাথে নারীর সমকক্ষতা প্রশ্নযুক্ত ছিল। এই ঘোষণা স্পষ্ট করিয়াছে যে মানব জীবনে সার্থকতার জন্য নারী ও পুরুষের সমান চাহিদা বিদ্যমান।

তবে বাংলাদেশের আইন পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে নারী ও পুরুষ যে এক (Identical) নয় তাহার স্বীকৃতি বহু স্থানে আছে। বাড়ির পুরুষের উপর সমন জারি করিলে দেওয়ানি কার্যবিধির ৫ আদেশের ১৫ নিয়মে সকলের উপর জারি ধরা হয়। দণ্ডবিধিতে স্ত্রীর দখলকে স্বামীর দখল গণ্য করা যায়। বিবাহের বয়সের ব্যাপারে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে তারতম্য আছে। এইসব বৈষম্য অবৈধ নহে।

তৃতীয় দফায় বলা হইয়াছে যে, জনসাধারণের কোন বিশ্রাম বা বিনোদনের স্থানে প্রবেশের কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যাপারে ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী–পুরুষভেদ বা বাসস্থানের ব্যাপারে কোন বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

জনসাধারণের বিনোদনের স্থান বলিতে বোঝায় সিনেমা হল, রঙ্গমঞ্চ, সার্কাস, খেলার মাঠ, আর্ট গ্যালারি, মেলা, স্টেডিয়াম, ক্লাব ইত্যাদি।

www.pathagar.com

জনসাধারণের বিশ্রামের স্থান বলিতে বোঝায় পার্ক, উদ্যান, ময়দান প্রভৃতি। এখানে নিষেধটি প্রযোজ্য শুধু জনসাধারণের বিনোদন বা বিশ্রামের স্থান সম্পর্কে। কাহারও যদি নিজস্ব জলসাঘর বা নাচঘর থাকে সেক্ষেত্রে এই বৈষম্যহীনতার অধিকার প্রযুক্ত হইবে না।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলিতে সকল প্রকার শিক্ষাসংস্থাকে বোঝায়। সরকারি হউক আর বেসরকারি হউক সকল ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য।

বৈষম্যহীনতার এই যে অধিকার ইহা শুধু মাত্র এই ৫টি কারণের মধ্যে নিবদ্ধ। এই ৫টি কারণের বাহিরে যদি অন্য কারণে কাহারো উপর বৈষম্য প্রদর্শন করা হয় তাহা হইলে তাহা অবৈধ হইবে না।

এই অনুচ্ছেদের শেষ দফাটি নির্দেশ করিতেছে ঃ

(ক) নারী শিশু ও দেশের অনগ্রসর সম্প্রদায়—এই তিন শ্রেণীর মানবকূলের অবস্থান, পরিস্থিতিগতভাবে এবং সম্ভবত প্রকৃতিগতভাবে, কিঞ্চিৎ নিম্ন পর্যায়ের। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের অবস্থান যে ভূমিতে, এদের অবস্থান তাহার নীচে।

(খ) নারী, শিশু ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের এই অবস্থানগত নিম্নত্বের কারণ সহজেই অনুমেয়, বয়সের হ্রস্বতার এবং লেখাপড়ায় পশ্চাদপদতার জন্য এই অবস্থা।

এই পরিস্থিতিতে সংবিধান নির্দেশ দিতেছে যে, বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিয়া এই নিম্নতর পর্যায়ের তিনটি শ্রেণীকে অন্য সকলের সাথে সমান করিতে হইবে। বিশেষ সুযোগ সুবিধাকে আপাতদৃষ্টিতে বৈষম্যমূলক মনে হইলে এইগুলির চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হুইতেছে সমতা আনয়ন।

বিশেষ বিধান প্রণয়ন ও প্রয়োগের অর্থ এই যে, রাষ্ট্র ইহাদের জন্য সংরক্ষণের নীতি গ্রহণ করিতে পারিবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, সরকারি চাকুরিতে, সরকারি সম্পদ বিতরণে ইহাদের জন্য আলাদা করিয়া কোটার ব্যবস্থা করা যাইবে। মেডিকেল কলেজে, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সময় ইহাদের জন্য পৃথক কোটা রিজার্ভ রাখা যাইবে।

এই প্রসঙ্গে দুইটি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করিতে হয় ঃ

১. সমতাই মৌলিক অধিকার নিশ্চিন্তির মূল লক্ষ্য। বিশেষ সুবিধা দিতে দিতে এমন অবস্থায় রাষ্ট্রকে নেওয়া যাইবে না যেখানে সেই মূল সমতার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

২ বিশেষ বিধান প্রণয়নের এখতিয়ার রাষ্ট্রকে দেওয়া হইয়াছে ; এই এখতিয়ারটি অনুমতিমূলক, বাধ্যতামূলক নয়।

৩। বিশেষ আইন প্রণয়ন এবং আইনের বিধান বহির্ভূতভাবে নারী বা শিশুর প্রতি অনুগ্রহ দেখানো বৈধ নহে।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

ব্যাখ্যা

প্রথম দফা

এই দফায় এই নিশ্চয়তা দান করা হইয়াছে যে, প্রজাতন্ত্রের অধীনে নিয়োগ অথবা পদলাভের জন্য সকল প্রার্থীরই সমান সুবিধা থাকিবে। অবশ্য ইহাতে এই গ্যারান্টি দেওয়া নাই যে, কেবল প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকিলেই অনুরূপ প্রার্থীদের সকলেই চাকুরিতে বহাল হইতে পারিবেন। ইহা নির্ভর করিবে নিযুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যায় পদ খালি থাকা বা না থাকার উপরে। একটি মাত্র পদের জন্য যদি দুইজন প্রার্থীর যোগ্যতা পরস্পর সমান হয়, তবে সেক্ষেত্রে যে কোন একজনকে নিযুক্ত করিবার এখতিয়ার থাকিবে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের এবং এই এখতিয়ার কোনো প্রকারেই ক্ষুন্ন করা যাইবে না। সংবিধানের নবম ভাগের প্রথম পরিচ্ছেদের ১৩৩ হইতে ১৩৬ অনুচ্ছেদগুলিতে কর্মের প্রকৃতি, কর্মের জন্য লোক নিয়োগ, তাহাদের সময়সীমা, অপসারণ, বরখাস্ত প্রভৃতি বিষয়ে বিশদভাবে বলা আছে। বিভিন্ন কর্মের জন্য লোক নিয়োগের দায়িত্ব সম্পর্কে কর্মকমিশনের কার্যাবলি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে সংবিধানের নবম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ১৩৭ হইতে ১৪১ অনুচ্ছেদগুলিতে।

লোক নিয়োগের কাজটি স্বভাবতই জটিল। কারণ ইহাতে প্রার্থীগণের বুদ্ধি, মেধা, স্বাস্থ্য, ব্যক্তিত্ব , চরিত্র প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় বিবেচনা করিতে হয়। এই বিষয়গুলির আবার তারতম্য নিরূপণ করিতে হয় কর্মের প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া। কাজেই ইহা একান্ত অপরিহার্য যে, সকল প্রার্থীর মধ্য হইতে সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তিকে বাছাই করার জন্য নিয়োগ কর্তৃপক্ষের নিখুঁত চয়ন-ক্ষমতা এবং নিরপেক্ষ বিচার ক্ষমতা অবশ্যই থাকিতে হইবে। অর্থাৎ নিয়োগ-কর্তৃপক্ষ হইবেন সর্বোচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন এবং সেই সঙ্গে সর্বাপেক্ষা উন্নত নৈতিক ও মানসিক শক্তির অধিকারী। সুতরাং সরকারি কর্মকমিশনের সদস্যদের নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারকে বেশি না হইলেও ঠিক ততখানি সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে, যতখানি করা হয় সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতিগণের নিয়োগের ক্ষেত্রে। জনগণের কল্যাণ এবং স্বদেশের সেবায় দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদেরকে নিয়োজিত করার সদিচ্ছাই সরকারি কর্মকমিশনের সদস্যবর্গের একমাত্র লক্ষ্য হইতে হইবে। এবং তাহারা সর্বপ্রকার রাজনৈতিক, ধর্মীয় অথবা সামাজিক সকল ঘাত-সংঘাত হইতে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রাখিবেন ; যাহাতে তাহাদের যথার্থ ও নিরপেক্ষ নিয়োগের কাজ কোনো প্রকারেই প্রভাবান্বিত হইয়া না পড়ে।

সম্পদ হিসাবে দেশের প্রতিটি নাগরিক দেশের অর্থ অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, এবং সে কারণেই যোগ্যতম ব্যক্তিকে কর্ম নিয়োগ করার মানেই হইতেছে দেশের যথার্থ স্বার্থকে গুরুত্ব দেওয়া। যোগ্যতম মেধাবান ব্যক্তিই অধিকতর কার্য সম্পাদনে সক্ষম হয় আর অধিকতর কার্য ও উৎপাদনের অর্থই হইতেছে দেশের সম্পদের বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে ঘৃণা-বিদ্বেষের কারণে কিংবা

www.pathagar.com

কুসংস্কারবশত অথবা ব্যক্তি–স্বার্থের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া যোগ্যতম ব্যক্তিদিগকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করিয়া দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর লোকদের নিয়োগ করা, আর নিজেদের সম্পদকে নিঃশেষ করিয়া ফেলা একই কথা। সুতরাং কর্মক্ষেত্রে নিয়োগপ্রার্থী, জাতি–বর্ণ–ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের সমান সুযোগ থাকিবে। এই নীতির মধ্যে এ কথাও নিহিত রহিয়াছে যে, দেশের স্বার্থের প্রতি খেয়াল রাখিয়াই যোগ্যতম ব্যক্তিদিগকে দেশের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনের নিমিত্তে কর্মে নিয়োগ করিতে হইবে।

২৯ নং অনুচ্ছেদের (১) দফায় 'প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ' দফাটির সঙ্গে 'পদলাভ' কথাটি ব্যবহারের মধ্য দিয়া এ কথাই বলা হইয়াছে যে, দফাটি কেবল বেতনভোগী ব্যক্তিদেরই বেলাই প্রযোজ্য নয়, অবৈতনিক কর্মচারী অথবা চুক্তিভিত্তিক কিছুদিনের কর্ম, সরকারি কাজের জন্য টেন্ডার প্রভৃতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ইহা ছাড়া, ঐ সকল কর্মও ইহার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে, যেগুলি অনুরূপ কোনো অফিসের ক্যাটেগরি বা শ্রেণীর আওতায় পড়ে না। বাংলাদেশ সৈন্য বিভাগ যেমন সকলের জন্যই সমভাবে উন্মুক্ত ; তেমনি সরকারি কর্মসমূহও বাংলাদেশে সেনাবাহিনীসহ সকলের জন্যই উন্মুক্ত থাকিবে। তথাকথিত যোদ্ধা জাতি বা গোত্র হইতে সেনাবাহিনীতে লোক ভর্তি করিবার পুরাতন রীতি বাতিল করিয়া দিয়া এখন বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য সৈন্য বিভাগে ভর্তি হইবার পূর্ণ সুযোগ দান করা হইয়াছে।

যে সকল কর্মে লোক নিয়োগের বেলায় সরাসরি নতুন নিয়োগ এবং প্রমোশন এই উভয় পন্থাই অবলম্বন করিয়া উভয় ক্যাটেগরি হইতে সমান সমান অর্থাৎ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ করিয়া কর্মচারী দেওয়া হয় এবং আবর্তন পদ্ধতির (rotational system) মাধ্যমে সিনিয়রিটি বা জ্যেষ্ঠত্ব নিরূপিত হয় সে সকল ক্ষেত্রেও কাহারো সুবিধার সমতা ক্ষুণ্ন হইবে না। এই নীতিই মানা হইয়াছে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টে। মহামান্য আদালত বলিয়াছেন যে, যেক্ষেত্রে সরাসরি নিয়োগ এবং প্রমোশনের মাধ্যমে সমান অনুপাতে কার্যে লোক নিয়োগ করা হয়, সে ক্ষেত্রে আবর্তন পদ্ধতিতে জ্যেষ্ঠত্ব নির্ধারিত করা অপরাধজনক নহে। তবে এই আবর্তন পদ্ধতি কেবল সেইখানেই প্রযোজ্য হইবে, যেখানে সরাসরি নিয়োগ ও প্রমোশন এই উভয় পদ্ধতিতে লোক নিয়োগ করা হয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে একটি মাত্র পথ অবলম্বন করিয়া লোক নিয়োগ করা হয় সে ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠত্ব অবশ্যই নিযুক্তির তারিখের উপরে ভিত্তি করিয়া নির্ধারণ করিতে হইবে।

২৯ নং অনুচ্ছেদে দেওয়া গ্যারান্টির দরুন প্রজাতন্ত্রের গ্রহণ বা পছন্দ করার অধিকার ক্ষুণ্ন হইবে না। সরকার বিভাগীয় প্রমোশন কমিটিসমূহের সাহায্যে উচ্চতর কেডারগুলিতে (cadre) নিয়োগের জন্য লোক পছন্দ করিলে সমতার নীতির বরখেলাফ হইবে না।

দ্বিতীয় দফা

প্রথম দফায় যাহা সাধারণভাবে বলা হইয়াছে, এই দফায় তাহা বিশেষভাবে বলা হইয়াছে।

www.pathagar.com

যে কারণে নাগরিক পদলাভের অযোগ্য বা বৈষম্যের শিকার হইবেন না সেই কারণ—

১. ধর্ম, বা

২. গোষ্ঠী, বা

৩. বর্ণ, বা

৪. নারী পুরুষভেদ, বা

৫. জন্মস্থান।

সুতরাং অন্য কারণে বৈষম্য বা পদলাভের অযোগ্যতা ঘোষিত হইতে পারে।

হরিজনগণ শতকরা ১৯ ভাগ, মুসলমানগণ শতকরা ৫ ভাগ, খ্রিষ্টানগণ ৬ ভাগ, অনুন্নত হিন্দু ১০ ভাগ, অব্রাহ্মণ হিন্দু ৩২ ভাগ, এবং ব্রাহ্মণগণ ১১ ভাগ চাকুরি পাইবে। এই প্রকার সরকারি হুকুম এই অনুচ্ছেদের পরিপন্থী।[১]

তৃতীয় ক দফা

দেশের নাগরিকগণ সমানভাবে অগ্রসর নহেন, তাঁহাদের মধ্যে অনগ্রসর অংশ আছে. প্রজাতন্ত্রের কার্যে অনগ্রসরতার কারণে তাঁহারা সংখ্যানুপাতিকভাবে অনেক কম থাকিবার সম্ভাবনা আছে। তাঁহারা যাহাতে দেশের সরকারি পদে উপযুক্ত স্থান পান, সরকার তাঁহাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন। সেই বিশেষ ব্যবস্থার জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন করিবার অধিকার এই দফায় প্রদত্ত হইয়াছে।

অনগ্রসর অংশ

অনগ্রসর অংশ বলিতে কি বুঝা যাইবে, তাহা সংবিধানে ব্যাখ্যা করা হয় নাই।

রাষ্ট্র নাগরিকগণের যে অংশকে অনগ্রসর মনে করিবেন, তাহারাই অনগ্রসর বলিয়া চিহ্নিত হইবেন।

তৃতীয় খ দফা

বাংলাদেশে বহু প্রকারের ধর্মীয় এবং সম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান। মুসলমানগণ দরগাহ বা মসজিদ, হিন্দুদের মন্দির মঠ বা আশ্রম, খ্রিষ্টানদের গির্জা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বলা যায়। মুসলমানদের মধ্যে শিয়া, সুন্নি এবং আহলে হাদিস সম্প্রদায় আছে. বড় বড় শহরে

www.pathagar.com

তাহাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। আহমদিয়গণকে মুসলমানদের একটি উপসম্প্রদায়রূপে গণ্য করা যায়, তাহাদেরও নিজস্ব সম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠান আছে।

ইহা স্বাভাবিক যে প্রতিষ্ঠানটি যে ধর্মের বা সম্প্রদায়ের , সেখানে সেই ধর্মের বা সম্প্রদায়ের লোক নিয়োগ হইবে ; অন্যথায় গণ্ডগোল এবং শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা বিদ্যমান। হিন্দুর মঠে মুসলমান মঠাধ্যক্ষ বা মুসলমানের দরগা শরিফে হিন্দু মোতয়াল্লি হওয়া উচিত নয়। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের চাকুরিতে নিয়োগ লাভের সমান সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে না। এই দফায় ধর্মীয় ও সম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠানে স্ব স্ব ধর্মের এবং সম্প্রদায়ের লোকের নিয়োগ লাভের বিধান করিবার ক্ষমতা সরকারকে প্রদত্ত হইয়াছে।

তৃতীয় গ দফা

দ্বিতীয় দফায় বলা হইয়াছে যে, নারী-পুরুষভেদ নিয়োগ ব্যাপারে লাভের বৈষম্য সৃষ্টি করিবে না। ইহাই সাধারণ নিয়ম, এই দফায় তাহার ব্যতিক্রমের বিধান করা হইয়াছে।

নারীর প্রকৃতি এক রকম এবং পুরুষের অন্য রকম। এমন কাজ আছে যাহা শুধু নারীগণই করিতে পারেন। পুরুষ সেখানে উপযোগী নহেন। নার্সিং প্রভৃতি এই প্রকার কর্মের অন্তর্ভুক্ত। আবার এমন অনেক কাজ আছে যাহা পুরুষেরাই ভালো করিতে পারেন, নারীগণ তাহাতে অনুপযোগী।

প্রকৃতির বিভিন্নতার জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ ভেদে পুরুষ বা নারীর জন্য পদসংরক্ষণ বাঞ্ছনীয়।

সাধারণ আলোচনা

এই অনুচ্ছেদের ৩টি দফায় কতিপয় মৌলিক অধিকারের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। প্রথম দফায় বলা হইয়াছে যে সকল নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে অর্থাৎ বাংলাদেশের সরকারি কর্মে নিয়োগ লাভ করিবার ক্ষেত্রে বা সরকারি পদ লাভের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ পাইবে। সংক্ষিপ্তভাবে বলিতে গেলে ইহার মর্মার্থ এই যে সরকারি চাকুরির বেলায় যোগ্যতাই হইবে নিয়োগ বা পদোন্নতির একমাত্র মাপকাঠি। এই ব্যাপারে তদবির চলিবে না, চলিবেনা মামার জোর। বিবাহ করিলে শ্বশুর চাকুরির ব্যবস্থা করিবেন বা উচ্চপদে চাচা, মামা, খালু বা শ্বশুর থাকিলে পদোন্নতি সহজতর হইবে, এই জাতীয় ধারণার বিরুদ্ধে এই মৌলিক অধিকার ঘোষণা দিয়াছে।

প্রসঙ্গত নিবেদন করি, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় অনেক উচ্চ পর্যায়ের মানুষকে বলিতে শুনিয়াছি, আমি অমুককে চাকুরি দিয়াছি, অমুককে প্রমোশন দিয়াছি। এই অহঙ্কার যে কত গর্হিত তাহা বুঝাইয়া বলিবার অপেক্ষা রাখে না।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের সরকারি কর্ম বলিতে কি বোঝায় তাহা সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে। প্রজাতন্ত্রের কর্ম বলিতে অসামরিক বা সামরিক ক্ষমতায় বাংলাদেশ সরকার সংক্রান্ত যে-কোন কর্ম, চাকুরি বা পদ বোঝায়। এতদ্ব্যতীত আইন যাহাকে প্রজাতন্ত্রের কর্ম বলিয়া ঘোষণা করে তাহাও ইহার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ৩টি ক্ষেত্রে এই সমতার নীতি প্রযোজ্য হয় ঃ

১. সামরিক চাকুরি অর্থাৎ সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর চাকুরি।

২. বেসামরিক চাকুরি এবং

৩. সরকারি কর্ম বলিয়া ঘোষিত অন্য চাকুরি।

এখানে উল্লেখ্য যে সরকারি চাকুরি বা পদ তাহা সে যে প্রকারেই হউক না কেন, এই নীতির অন্তর্ভুক্ত। সরকারি চাকুরি বা পদ বেতনযুক্ত হইতে পারে বা অবৈতনিক হইতে পারে, স্বাভাবিক দৈর্ঘ্যের হইতে পারে আবার স্বল্পকালের হইতে পারে, চুক্তিভিত্তিক হইতে পারে বা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে হইতে পারে, সর্বক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য।

সরকারি কর্ম বলিতে কি বোঝায় তাহা দেখিয়া লইলাম, এইবার দেখি কাহারা এই সমান সুযোগের দাবি করিতে পারে। এই অধিকারটি শুধু বাংলাদেশের নাগরিকগণ দাবি করিতে পারেন। যাহারা বিদেশী তাহারা এই অধিকার দাবি করিতে পারেন না। তবে বিদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিক এই অধিকার দাবি করিতে পারেন না যে তাহাদের দাবিকে উপেক্ষা করিয়া একজন নিম্নমানের বাংলাদেশীকে একটি সরকারি চাকুরি দেওয়া হইয়াছে।

সরকারি কর্ম বা পদ বলিতে কি বোঝায় তাহা দেখা হইয়াছে, তৎপর কাহারা এই সমতার অধিকার দাবি করিতে পারেন তাহার বর্ণনা দেওয়া হইল, এখন দেখা যাক এই নীতির প্রসার বা বিস্তার কতটুকু। এই প্রসঙ্গ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে এই প্রসঙ্গে একটি মৌলিক বিষয়ের কথা বলিতে হয়।

বাংলাদেশের বড় সম্পদ ইহার মানুষ। এই মানুষের কর্মশক্তি ব্যবহৃত হইবার একটি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র হইতেছে সরকারি চাকুরি। অন্যদিকে সরকারি পদ সৃষ্টি হইয়াছে দেশকে সুপরিচালনা করিবার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত সেবা পরিবেশনের জন্য। সরকারি কর্মচারীগণ অতি গুরুত্বপূর্ণ কর্মে লিপ্ত।

তাহাদের ভ্রান্তি বা অবহেলা দেশকে সর্বনাশের দিকে ঠেলিয়া দিতে পারে। এই পরিস্থিতিতে যে ব্যক্তি যে কর্মের পক্ষে অনুপযুক্ত সেই কর্মে তাহাকে নিয়োগ করিলে বা সঠিক গুণাগুণের ভিত্তি বিবেচনা না করিয়া কর্মে নিয়োগ প্রভৃতির কাজ করিলে তাহা দেশের জন্য মহা অকল্যাণ বহিয়া আনিতে পারে। এই জাতীয় নিয়োগের প্রতিক্রিয়া বৎসরের পর বৎসর চলিতে থাকে। একজন নিম্নমানের বা অলস লোককে চাকুরি দিলে সমগ্র দেশ তাহার কুফল ভোগ করে। বলা বাহুল্য, চাকুরি হইতে অপসারণ খুব কঠিন কাজ।

নিয়োগ এবং পদ লাভ এই অধিকারের আওতাভুক্ত এবং সেই কারণে সরকারি কাজের প্রতি স্তরে ইহার প্রয়োগ নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। সুযোগের সমতার এই অধিকার চাকুরিতে নিয়োগ বা

www.pathagar.com

পদলাভের প্রাক্কাল হইতে চাকুরি সমাপ্তির উত্তরকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। চাকুরিতে নিয়োগের জন্য দরখাস্ত আহ্বান, চাকুরির শর্তাবলী নির্ধারণ, বেতন নির্ধারণ, বেতন বৃদ্ধি, পদোন্নতি, চাকুরির বয়সসীমা, পেনশন, অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা প্রভৃতি বিষয়ের প্রত্যেকটিতে এই সমতার অধিকার দাবি করা যায়। এই স্তরগুলির কোন একটির ক্ষেত্রে যদি সমতার সুযোগ অস্বীকার করিয়া রুল বা বিধি প্রণয়ন করা হয় তবে সেই রুল বা বিধি সংবিধান বহির্ভূত বলিয়া গণ্য হইবে। সংবিধানের ১৩৩ হইতে ১৩৬ অনুচ্ছেদে এই বিষয়ে আরও কিছু বিধান বিধৃত।

সরকারি চাকুরিতে নিয়োগ, পদোন্নতি প্রভৃতি কর্ম সরকার প্রণীত রুল বা বিধি অনুযায়ী হইয়া থাকে। এই সব বিধি বা রুল প্রণয়নের ব্যাপারে সরকারের পূর্ণ অধিকার আছে। তবে সেই রুল বা বিধি মৌলিক অধিকারের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে পারিবে না। যেখানে রুল বা বিধি নাই, সেখানে রুল বা বিধি না থাকার কারণে এই অনুচ্ছেদে বিধৃত মৌলিক অধিকার ভঙ্গ করা যাইবে না।

এখানে আরও কয়েকটি কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন। সকল কর্মের প্রকৃতি এক রকম নয়। যে কাজের প্রকৃতি যে রকম, সেই কাজের যোগ্যতা সেই রকম।

যাহারা মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পদ প্রার্থী তাহাদের নিকট স্নাতকোত্তর ডিগ্রি চাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যাহারা প্রশাসনে চাকুরি চাহিতেছেন তাহাদের জন্য স্নাতক পর্যায়ের ডিগ্রি যথেষ্ট বিবেচনা করা যাইতে পারে। চল্লিশ দশকের প্রথমদিকে একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। তখন সার্কেল অফিসারের চাকুরিতে তফসিলভুক্ত হিন্দু সম্প্রদায় ও মুসলমানদের জন্য পৃথক কোটা ছিল। সেই কোটাতে তাহারা চাকুরি পাইতেছিল। তখন একটি অভিযোগ শোনা যায় যে কোটার কারণে চাকুরির মান নামিয়া যাইতেছে। খুব ভাল উচ্চ বর্ণের হিন্দু ছেলেরা সাম্প্রদায়িক কোটার কারণে সার্কেল অফিসার হইতে পারিতেছে না। এই বিষয়ে শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক একটি নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সেই নিবন্ধে তিনি জোর দিয়া বলিয়াছিলেন যে, চাকুরির প্রকৃতির সহিত দক্ষতার প্রকৃতি সামঞ্জস্যপূর্ণ হইল কিনা তাহা পরীক্ষা করা আবশ্যক এবং সেই আবশ্যকীয় পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, তফসিলভুক্ত হিন্দু ও মুসলমান কৃষকের ছেলেরা হিন্দু ভদ্র লোকদের ছেলেদের তুলনায় অনেক বেশি দক্ষ। সার্কেল অফিসারের কাজে শেক্সপীয়রের নাটক বা শেলীর কবিতার মর্ম উদ্ধার করার প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন গ্রাম বাংলার মাঠ-ঘাট সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ জ্ঞান।

সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ অবৈধ নয় এবং শ্রেণী বিভাগ করিতে হইলে এক শ্রেণীর সহিত অন্য শ্রেণীর বিভিন্নতা আসিয়া যায়। এই বিভিন্নতাও অসিদ্ধ নয়। নিয়োগ, পদোন্নতি, বেতন, প্রান্তিক সুবিধা, অবসর, পেনশন প্রভৃতির ব্যাপারে শ্রেণীবিভেদ বা বিভিন্নতা থাকিতে পারে। কিন্তু একই কর্মচারীদের মধ্যে বৈষম্য অবৈধ। আরেকটি বড় নীতি এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে বিভাজন যুক্তিযুক্ত হইতে হইবে।

www.pathagar.com

এবার দ্বিতীয় দফা বিবেচনা করা যাইতেছে। সরকারি কাজে নিয়োগ বা পদলাভের ক্ষেত্রে ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি অযোগ্যতা আরোপ বা বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।

সৌভাগ্যবশত বাংলাদেশ একটি দুর্লভ বিশিষ্টতার অধিকারী। এই বিশিষ্টতা হইতেছে তাহার স্বাভাবিক বৈষম্যহীনতা। প্রতিবেশী ভারতের দিকে তাকাইলে দেখা যায়, প্রকৃতিগতভাবে সেখানে বিভিন্নতা প্রায় অন্তহীন। ভাষা অর্ধশতাধিক, প্রদেশের সংখ্যা বিশের অধিক, ধর্মও ডজনের বেশি। গোষ্ঠী বা বর্ণগতভাবে বৈষম্য সেখানে প্রখর। কিন্তু বাংলাদেশের ভাষা এক, প্রদেশ নেই, ধর্ম ও গোষ্ঠী তেমন ভিন্ন নয়।

তবুও সংবিধান হুঁশিয়ার প্রদান করিয়াছে বৈষম্যের বিরুদ্ধে। প্রত্যক্ষভাবে হোক আর পরোক্ষভাবে হোক সরকারি চাকুরি লাভের ব্যাপারে ধর্ম বা লিঙ্গের বা সংবিধানে বর্ণিত অন্য কোন কারণে বৈষম্য দেখাইলে তাহা অবৈধ হইবে।

এই প্রসঙ্গে জানিয়া রাখা প্রয়োজন যে বৈষম্যহীনতার অধিকার এবং নিয়োগ লাভের সমতার অধিকার সকল দক্ষ ও যোগ্য প্রার্থীকে চাকুরি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দিতে পারে না। যেখানে ১০টি পদ শূন্য কিন্তু যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা শতাধিক সেখানে ঐ শতাধিকের ভীড় হইতে ১০ জনকে বাছিয়া লইবার পূর্ণ অধিকার নিয়োগ কর্তৃপক্ষকে দিতেই হয়, এই বাছাইয়ের বেলায় ধর্ম প্রভৃতির বিষয় নিয়োগ কর্তৃপক্ষ বিবেচনার মধ্যে আনিবে না, ইহাই সংবিধানের নির্দেশ। তাহারা যদি এইসব বিষয় বিবেচনার মধ্যে আনিয়া ফেলেন এবং উহা যদি প্রমাণ করা যায় তবে নিয়োগ কর্তৃপক্ষের সেই কাজ সংবিধান বহির্ভূত বলিয়া গণ্য হইবে।

এইবার শেষ দফাটির দিকে মনোযোগ দেওয়া যায়। এই দফায় আবার তিনটি উপদফা আছে। প্রথম দফায় বলা হইয়াছে যে বাংলাদেশের অনগ্রসর অংশকে সরকারি কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব দেওয়ার জন্য তাহাদের অনুকূলে রাষ্ট্র বিশেষ বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর মানুষ সমানভাবে অগ্রসর নয়। যাহারা অনগ্রসর তাহারা সরকারি চাকুরি পান না, ফলে সরকারি কর্মে তাহাদিগকে প্রায়ই দেখা যায় না। রাষ্ট্র তাহাদের জন্য কোটার ব্যবস্থা করিতে পারে। মেয়েদের জন্য কোটা, উপজাতীয়দের জন্য কোটা এই জাতীয় বৈষম্য নয়। শিক্ষাগতভাবে, অর্থগতভাবে অঞ্চলগতভাবে অনগ্রসর হইতে পারে বাংলাদেশের মানুষ এবং এই অনগ্রসরতার কারণে তাহারা সরকারি কর্মে অনুপস্থিত থাকিতে পারেন। তাহাদের টানিয়া তুলিবার জন্য সংবিধান এই ব্যবস্থা করিয়াছে।

জীবনযুদ্ধে দীর্ঘকাল দৌড়াইতে দৌড়াইতে যাহারা ক্ষিপ্রগতি হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের সহিত পাল্লায় অচতুর স্বাভাবিক মানুষ না পারিবার কথা। পাল্লা বা প্রতিযোগিতার সময় এই স্বাভাবিক মানুষকে কিছু সুবিধা দিতে হয় ফলে তাহারা সমতার পর্যায়ে আসিতে পারে।

www.pathagar.com

তবে এই কোটা রিজার্ভ বা সুবিধা দেওয়ার সময় মূল নীতি হইতে লক্ষচ্যুত হইলে তাহা অবৈধ হইবে। মূল নীতি হইতেছে সমতা এবং কোটা রিজার্ভের ব্যবস্থা হইতেছে একটি ব্যতিক্রম। সমতার মূল নীতিটি একেবারে নস্যাৎ করিয়া ব্যতিক্রমী ব্যবস্থা অবলম্বন করা সিদ্ধ নয়। সরকারি কর্মে দক্ষতা নষ্ট হইয়া যায় এমন আইন ও নিয়ম অবৈধ। এই উপমহাদেশের উচ্চ আদালত বলিয়াছে যে, শতকরা ৫০ ভাগের বেশি পদ রিজার্ভ করা সঙ্গত নয়। এই উপদফা কাহারা অনগ্রসর তাহা বলিয়া দেয় নাই। উহা নির্ধারণের ভার সংবিধান সরকারের উপর ন্যস্ত করিয়াছে।

দ্বিতীয় উপদফায় বলা হইয়াছে যে ধর্মীয় বা উপসম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠানে নিজ নিজ ধর্মাবলম্বন সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষণ করা যাইবে। বাংলাদেশে ইসলামি ফাউন্ডেশন আছে, আছে হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট। এই সব প্রতিষ্ঠান সরকারি অর্থে বা সাহায্যে পরিচালিত কিন্তু তবুও এই সব প্রতিষ্ঠান সম্প্রদায়ভিত্তিক । তাই এইগুলিতে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের নিয়োগ অধিকার দেওয়া যায় না।

শেষ উপদফায় বলা হইয়াছে যে কর্মের প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া তদুপযোগী পদ পুরুষ ও নারীর জন্য সংরক্ষণ করা যাইবে। আমরা দেখিয়াছি যে নারী পুরুষ ভেদে রাষ্ট্র কোন বৈষম্য প্রদর্শন করিতে পারিবে না এবং রাষ্ট্র ও গণজীবনে নারী পুরুষের সমান অধিকার পাইবে এবং নারী পুরুষভেদে সরকারি চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রদর্শন করা যাইবে না। সবশেষে এই উপদফা বলিয়া দিল যে, প্রকৃতিগতভাবে উপযোগিতার কারণে নারী পুরুষের জন্যে পদ সংরক্ষণ বৈধ। গর্ভবতী জননীদের প্রসব কর্মে সহায়তার জন্য নারী ধাত্রীই নিঃসন্দেহে উপযোগী ; ঐ কর্মে পুরুষ সেবক বা সহায়ক উপযোগী নন। এই কাজ শুধু নারীদের জন্য সংরক্ষণ করা যায়।

প্রতিরক্ষা বাহিনীর পদাতিক সৈন্য শ্রেণীতে বোধ হয় পুরুষেরাই উপযোগী ; ঐ কর্ম পুরুষদের জন্য সংরক্ষণ করা যায়।

এই অনুচ্ছেদের আলোচনা শেষ হইবার সাথে সাথে ধর্মীয় কারণে বৈষম্যহীনতার অধিকার আলোচনা শেষ হইল। সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে মূলনীতি আলোচনা করিবার সময় দেখিয়াছি যে, আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাস বাংলাদেশের যাবতীয় কাজের ভিত্তি ঘোষণা করা হইয়াছে। কিন্তু সংবিধানের তৃতীয়ভাগে অর্থাৎ মৌলিক অধিকারভাগে ঐ জাতীয় কোন সংশোধন আনা হয় নাই। বৈষম্যহীনতার সকল অনুচ্ছেদ অক্ষতভাবে সংবিধানে বিরাজ করিতেছে। ফলে আল্লাহর প্রতি আস্থাভাজনদের জন্য বিশেষ কোন সুবিধার দাবি বাংলাদেশীদের অধিকার বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

নারীর অধিকার

সংবিধানে নারী জাতির জন্য সে সব বিধান আছে, তাহা এবং তৎসংশ্লিষ্ট কিছু আইন এখানে একত্রিত করিয়া দিলাম।

www.pathagar.com

সংবিধানের ১০ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে ঃ জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

১৫ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে ঃ রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত মানের দৃঢ় উন্নতি সাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায় ঃ

(ক) বৈধব্য প্রভৃতি আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার।

১৮(২) অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে ঃ গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

এই যে ঘোষণাগুলির কথা বলা হইল ইহারা আমাদের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিরূপে গৃহীত। এই গুলি নিম্নে বর্ণিত চারটি কাজে ব্যবহার হইবে—

(ক)বাংলাদেশ পরিচালনার মূলসূত্র হইবে,

(খ) আইন প্রণয়নকালে রাষ্ট্র তাহা প্রয়োগ করিবে,

(গ) সংবিধান ও অন্যান্য আইনের ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে নির্দেশক হইবে,

এবং

(ঘ) রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কার্যের ভিত্তি হইবে।

কিন্তু ইহারা আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য হইবে না।

বিধানগুলি হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে সংবিধান-প্রণেতাবৃন্দ পরবর্তীকালের জন্য উত্তরসূরিদের কাছে নারী জাতির মর্যাদা সংরক্ষণ এবং তাহাদের সার্বিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য বিপুল প্রত্যাশার ঘোষণা দিয়াছেন।

মানব জীবনের সর্বস্তরে ও সর্ব কর্মে তাহারা শরিক হইতে পারিবে, সংবিধান এমন নিশ্চিতি দিবার আহ্বান জানাইয়াছে। এই আহ্বান নিষ্ফল হইতে দিবার অর্থ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির উপর অশ্রদ্ধা পোষণ করা।

এবার দেখা যাক মৌলিক অধিকারের অধ্যায়। মৌলিক অধিকারগুলি অবশ্য প্রতিপালনীয়, অর্থাৎ এগুলি প্রতিপালিত না হইলে প্রতিকার পাওয়া যায়।

সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান। বাংলাদেশের নারী সম্প্রদায় যদি পূর্ণ নাগরিক বলিয়া স্বীকৃত হন তবে তাহারা নিঃসন্দেহে পুরুষের সহিত সমান। তবে বাংলাদেশের নারীকে যদি কেহ পূর্ণ নাগরিকত্ব দিতে অস্বীকার করেন তাহা হইলে তাহারা এই সমতার অধিকার হইতে নারী জাতিকে বঞ্চিত করিতে পারেন। কিন্তু তাহাদের

www.pathagar.com

দুর্ভাগ্য এই যে, সংবিধানের ৬ অনুচ্ছেদে বলিয়াছে যে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং বাংলাদেশের আইন নারী জাতিকে পুরুষ জাতির মতো পূর্ণ নাগরিকত্ব দিয়াছে।

আইনের দৃষ্টিতে সমতার এই যে অধিকার ইহা নারীকে পুরুষের সহিত সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু সংবিধান এইখানে থামিয়া থাকে নাই। ২৮ অনুচ্ছেদে বলিয়াছে যে, নারী-পুরুষ ভেদের কারণে রাষ্ট্র কোন নাগরিকের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না এবং রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সম অধিকার লাভ করিবেন এবং নারী পুরুষ ভেদের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন ও বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোন অক্ষমতা কোন বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীনে করা যাইবে না এবং নারীর অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা যাইবে।

এই অনুচ্ছেদে জীবনের প্রতিস্তরে নারী পুরুষ-এর সমান অধিকারের ঘোষণা দিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে সকল প্রকার বৈষম্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। জীবনে কোন স্তরে নারী যাহাতে কোন বৈষম্যের শিকার না হয় সেই কারণে বিশেষ বিশেষ এলাকা চিহ্নিত করিয়া সেইখানেও সমতার অধিকার ঘোষণা করা হইয়াছে।

২৯ অনুচ্ছেদে সরকারি নিয়োগ লাভে সকল নাগরিকের সুযোগের সমতার অধিকার ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে। এবং বলা হইয়াছে যে, নারী-পুরুষ ভেদের কারণে এইক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না এবং আরও বলা হইয়াছে যে বিশেষ প্রকৃতির কারণে নারী বা পুরুষের জন্য বিশেষ বিশেষ পদ সংরক্ষণ করা যাইবে।

৬৫(৩) অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, সংসদে মহিলাদের জন্য ৩০ টি আসন সংরক্ষিত থাকিবে।

আমার মতে সংবিধানের বিধানাবলি বাংলাদেশের নারী জাতির মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত ও সংরক্ষিত করিয়াছে। তবে বাংলাদেশের নারী সম্প্রদায় যে এই সকল অধিকার পূর্ণভাবে পাইতেছে এমন কথা বলা যায় না।

এখন এই সব অধিকারের আলোকে বাংলাদেশে নারী সম্প্রদায়ের জন্য কি কি আইন বর্তমান তাহা দেখা যাইতে পারে। দেওয়ানি কার্যবিধিতে মহিলাদের জন্য কিছু বিশেষ সুবিধার বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিধির ৫৬ ধারায় বলা হইয়াছে যে, টাকা আদায়ের ডিক্রি জারিতে কোন মহিলাকে গ্রেফতার বা আটক করা যাইবে না। এই বিধির ২১ আদেশের ৩২ নিয়মে বলা হইয়াছে যে, কোন মহিলাকে তাহার স্বামীর অধিকারে ফিরিয়া যাইবার আদেশ হইলে এবং তিনি তাহা অমান্য করিলেও তাহাকে গ্রেফতার করা যাইবে না। ১৩২ ধারায় বলা হইয়াছে পর্দানশীন স্ত্রীলোককে আদালতে হাজির হইতে বাধ্য করা যাইবে না। কোন ঘরে নারী থাকিলে সেই ঘরে প্রবেশের পূর্বে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। তাহার গহনা—যাহা তিনি তাহার ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী সর্বদা পরিধান করেন তাহা ক্রোক করা যাইবে না (৬০ ধারা দ্রষ্টব্য)।

www.pathagar.com

ফৌজদারি কার্যবিধিতে নারীর কিছু বিশেষ সুবিধার বিধান দেখা যায়। তাহার দেহ তল্লাশি করিতে হইলে সকল প্রকার আদব বজায় রাখিতে এবং তাহা কোন স্ত্রীলোক দ্বারা করাইতে হইবে (৫২ ধারা)।

দণ্ডবিধিতে নারীর শালীনতা ও মর্যাদার প্রতি অশোভন ইঙ্গিত করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। এই বিধিতে আরও বলা হওয়াছে যে, কোন স্ত্রীলোক যদি তাহার স্বামীর বিনা অনুমতি বা সমর্থনে অন্য পুরুষের সহিত মিলিত হয় তবে ঐ পুরুষটির সাজা হইবে, তাহার নয়।

কারখানা আইনে বলা হইয়াছে যে, কোন মহিলাকেই দিনের বেলা ছাড়া অন্য সময় কাজ করিতে দেওয়া যাইবে না এবং তাহাদের বাচ্চাদের রাখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাংলাদেশের শ্রম আইনে বলা হইয়াছে যে, মাতৃকল্যাণ ছুটি হিসাবে গর্ভবতী মহিলা প্রসবের আগে ছয় সপ্তাহ এবং পরে ছয় সপ্তাহ এই বারো সপ্তাহ বেতনসহ ছুটি পাইবেন।

নারী নির্যাতন (নিবৃত্তিমূলক শাস্তি অধ্যাদেশ) ১৯৮৩ সালে জারি হইয়াছে। এই অধ্যাদেশে নারী নির্যাতনকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। ১৯৮০ সালে যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন দ্বারা যৌতুক গ্রহণ বা দাবিকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

শিশু বিবাহ নিরোধ আইনে ১৮ বৎসরের কম বয়স্ক মেয়েকে বিবাহ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

এবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক ব্যক্তিগত আইনের উপরে। ইসলামি আইনের সকল বয়ঃপ্রাপ্তা নারীর বিবাহের অধিকার আছে ; ইহাই ইমাম আবু হানিফার অভিমত। নাবালিকা মেয়ের বিবাহ তাঁহার অভিভাবক দিতে পারেন তবে বর্তমানে বাল্যবিবাহ শাস্তিযোগ্য অপরাধ। হিন্দু আইনে সাধারণভাবে নারীর বিবাহের অধিকার নাই, তাহাকে তাহার অভিভাবক বিবাহ দেন। ইসলামি আইনে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে, কারণে বা অকারণে ; বর্তমান আইনে এই অধিকারকে বিলম্বিত করা যায়, ব্যর্থ করা যায় না। স্ত্রীও বিবাহ বিচ্ছেদ করিতে পারেন কিন্তু তাহা খুব কঠিন কাজ। হিন্দু আইনে তালাকের বিধান নাই। হিন্দু আইনে পুরুষের পক্ষে বহু-বিবাহ বেআইনী নয়। ইসলামি আইনে ইহা সীমিত ও বর্তমানে ইহা বাধাগ্রস্ত। হিন্দু আইনের নারীর উত্তরাধিকার প্রায় অস্বীকৃত এবং ইসলামি আইনে ইহা পুরুষের অর্ধেক মাত্র।

এখানে প্রশ্ন হইতেছে এই যে, সংবিধান নারী ও পুরুষের মধ্যে যে সমতার বিধান দিয়াছে এবং যে বৈষম্যহীনতার নির্দেশ দিয়াছে এবং নারী সম্প্রদায়ের যে বিশেষ সুবিধাজনক আইন করিবার নির্দেশ দিয়াছে, সেই সবগুলি কি আইনের মাধ্যমে পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হইয়াছে? বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার প্রভৃতি প্রশ্নে কিছু অসমতা আপাত প্রতীয়মান ; কিন্তু আমি নিবেদন করিতে পারি যে, যতটুকু আইনে দেওয়া আছে ততটুকু কি মহিলারা পাইতেছেন? সর্বাগ্রে যে আইন বাংলাদেশে জারি আছে তাহা পূর্ণ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া উচিত। নূতন আইন দাবি

www.pathagar.com

করিবার পূর্বে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ যাচাই করা উচিত ; যেগুলি আছে সেইগুলিই যদি অলস হইয়া কেতাবে পড়িয়া থাকে তবে নূতন আইন করিয়া কেতাবের কলেবর বৃদ্ধি করিবার কোন হেতু আছে কি?

তবুও এসব বিষয়ে গবেষণা হওয়া উচিত, হওয়া উচিত উপযুক্ত কমিশন।

এই অনুচ্ছেদ ও নজির

গোষ্ঠীগত বৈষম্য প্রসঙ্গে ঃ

১৮৯০ সালে LOUISIANA আইনে বলা হয় যে, রেলে শ্বেতবর্ণের এবং কৃষ্ণবর্ণের যাত্রীদের জন্য পৃথক আসনের ব্যবস্থা থাকবে তবে এই পৃথক কোচ সমমর্যাদার হবে। PLESSY এই আইনের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে দরখাস্ত করেন। এই কেইসে সিদ্ধান্ত হয় যে, আলোচ্য আইনে কোন বৈষম্য প্রদর্শন করা হয় নি। শ্বেতকায় এবং কৃষ্ণকায় লোকদের জন্য ট্রেনের কামরায় যে আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেগুলি সমমানের। সুতরাং এতে কোন বৈষম্য প্রমাণিত হয় না।

PLESSY -এর কেসের এই সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয় এবং পরবর্তী নজিরসমূহে বলা হয় সকল পার্থক্যই বৈষম্যমূলক। সুতরাং এগুলি অবৈধ।

ব্রাউন কেসটি PLESSY -এর সিদ্ধান্তকে আমূল উল্টিয়ে দেয়। কতিপয় নিগ্রো বালকশ্বেতাঙ্গ বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার চাইলে তাদের বঞ্চিত করা হয়। এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে Federal district court-এ নিগ্রো বালকগুলির পক্ষে মামলা করা হয়। ঐ কোর্ট PLESSY -র কেস অনুসরণে মামলাগুলি খারিজ করে দেয়। এর বিরুদ্ধে আপিল করা হয় এবং সেই আপিলে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ঃ

এ কথা সত্য যে বিল্ডিং, কারিকুলাম শিক্ষকদের যোগ্যতা এবং বেতন ও অন্যান্য সকল বিষয়ে শ্বেতাঙ্গ স্কুল এবং নিগ্রো স্কুল একই মান ও স্তর সম্পন্ন। কিন্তু দেখবার বিষয় এই যে গোষ্ঠী বা বর্ণের ভিত্তিতে স্কুলের পার্থক্যের প্রতিক্রিয়া কি? বর্তমানে সরকারের প্রধান দায়িত্ব সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং শিক্ষার মাধ্যমে নাগরিকদের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত করা এবং এই ভাবে পরবর্তী জীবনে প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জন করা। শিক্ষা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে এর পরিবেশনের ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকা উচিত নয়। কৃষ্ণাঙ্গদের যদি শ্বেতাঙ্গদের থেকে পৃথক রাখা হয় তাহলে গোষ্ঠীগত কারণে তাদের মনে হীনমন্যতাবোধের উদ্ভব হওয়া স্বাভাবিক। কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্ররা মনে করতে পারে যে তারা বোধ হয় শ্বেতাঙ্গদের চাইতে নিম্নস্তরের। এই হীনমন্যতাবোধ তাদের শিক্ষার অগ্রগতিকে ব্যাহত করতে পারে। পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তা সে অবকাঠামো প্রভৃতি ক্ষেত্রে যতই সমতা ভিত্তিক হউক না কেন আইনের দৃষ্টিতে অসমান।

ব্রাউনের কেস ১৯৪৪ সালে নিষ্পত্তি করা হয়। পরবর্তীকালে ব্রাউনের কেস সমর্থিত হয়।

www.pathagar.com

একটি ভারতীয় কেস–এ একটি আদেশকে ঘিরে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত দেয়া হয়।

রাজস্থানের একটি এলাকায় জনসাধারণের খরচে একটি পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলার আদেশ দেয়া হয়। এই আদেশে বলা হয় যে স্থানীয় হরিজন ও মুসলমানদেরকে কোন খরচ দিতে হবে না কারণ তারা সবসময়ই শান্তিপূর্ণ থাকে এবং আইন মানে। রাজস্থানের হাইকোর্ট বলেন যে, এই আদেশ সংবিধানের পরিপন্থী। এই জাতি এবং সম্প্রদায়ের সকল মানুষের উপর একটি লেবেল এঁটে অন্যদের পৃথক করে রাখা যায় না।

লিঙ্গভেদ -প্রসঙ্গে

OKLAHOMA State–এ একটি আইনে বিয়ার (Bear) বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয় ২১ বছরের নিচের বয়সের পুরুষকে এবং ১৮ বছরের নিচের নারীর কাছে। Craigএর বয়স ২১ বছরের নিচে ছিল। Whitner নামক একটি মহিলা তার কাছে বিয়ার বিক্রয় করে। এখানে এই কেসে প্রশ্ন উঠে, লিঙ্গভেদের কারণে এই আইন অসাংবিধানিক কিনা? এই কেসে সিদ্ধান্ত হয় যে আইনটি মন্দ। বিচারপতি Stevens বলেন যে এই আইনটি আপত্তিজনক এই কারণে যে নারী, পুরুষভেদ মানুষের ইচ্ছাকৃত নয়, দৈব এবং এতে বৈষম্য করা উচিত নয়। নারী পুরুষকে যে সবসময় একই দৃষ্টিতে দেখতে হবে এমন বলা যায় না, তবে এই ক্ষেত্রে এই বৈষম্য সমর্থনযোগ্য নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি রাজ্যে একটি সম্প্রদায় বহু বিবাহকে তাদের একটি ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করত। ঐ রাজ্যে বহুবিবাহ দেশীয় আইনে নিষিদ্ধ ছিল। ঐ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তিকে বহুবিবাহের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হলে তিনি ধর্মীয় স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেন। আদালত এই সিদ্ধান্ত দেন যে, স্রষ্টার সাথে মানুষের সম্পর্কের ব্যাপারে ধর্মীয় স্বাধীনতা মৌলিক কিন্তু মানবিক নৈতিকতার ব্যাপারে এ অধিকার অবাধ নয়। সে কারণে বহুবিবাহ নিষেধ আইন বৈধ। (Reynolds U.S.)

বোম্বাইয়ের একটি কেসে বহুবিবাহ নিষেধ আইনকে অবৈধ বলে হাইকোর্ট ঘোষণা করে। এখানে ধর্মীয় স্বাধীনতার দোহাই টেকে নি। (39 AIR 84)। বোম্বাই হাইকোর্টে আরেকটি কেসে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয় যে, এক ব্যক্তিকে জাতিচ্যুত করার ব্যাপারে বোম্বাই–এর আইন বৈধ। মহামান্য আদালত বলেন, ধর্মীয় বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করা যায় না কিন্তু ধর্মীয় আচরণে যায়। ধর্মীয় আচরণ সম্পর্কে আইন বৈধ। (40 AIR 183)/

ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট একটি কেসে বলেন, ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চয়ই একটি মৌলিক অধিকার এবং এই অধিকার হরণ করবার অধিকার সংসদের নাই। কিন্তু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির ব্যাপারে সংসদ আইন প্রণয়ন করতে পারে। ধর্মীয় আচরণের সাথে যদি কোন অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং রাজনৈতিক বিষয় জড়িত থাকে তবে ঐ ধর্মীয় আচরণের নিয়ন্ত্রণমূলক আইন সংসদ জারি করতে পারে। (17 SCT 335)

www.pathagar.com

এই অনুচ্ছেদ ও অন্যান্য সংবিধান

The Constitution of India : Article 15.

(1) The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.

(2) No cityzen shall, on grounds only of religion, race caste, sex, place of birth or any of them, be subject to any disability, liability, restriction or condition with ragard to -

(a) access to shops, public restaurants, hotels and places of public entertainment ; or

(b) The use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of State funds or dedicated to the use of the general public.

(3) Nothing in this article shall prevent the State from making any special provision for women and children.

(4) Nothing in this article or in caluse (2) of Article 29 shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled castes and the scheduled Tribes.

The Constitution of the U.S.A.

Section 1. of the 19th Amendment (1920) to the constitution of the United States says :

'The right of the citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any State on account of sex.

The 15th Amendment (1870) Section 1. again, lays down :

www.pathagar.com

'The right of the citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any State on acount of race, colour, or previous condition of servitude.'

The constitution of Switzerland : Article 60.

'Every Canton is bound to accord to citizens of the other Confederated States the same treatment as its own citizens in regard to legislation and judicial proceedings.'

Article 4, again says :

"In Switzerland there are no subjects nor any privileges of rank, birth, person or family.

The Constitution of the U.S.S.R. Article 122.

" Women in the U.S.S.R. are accorded equal rights with men in all spheres of economic, governmental cultural, political and other public activity. "

Article 123, again says :

"Equally of rights of citizens of the U.S.S.R irrespective of their nationality or race, in all spheres of economic, governmental, cultural and other public activity, is an indefeasible law.

Any direct or indirect restriction of the rights of, or, conversely, the establishment of any direct or indirect privileges for, citizens on account of their race or nationality as well as any advocacy of racial or national exclusiveness or hatred and contempt is punishable by law."

The Constitution of Australia. Article 117.

"A subject of the Queen, resident in any State, shall not be subject in any other State to any disability or discrimination which would not be equally applicable to him if he were a subject of the Queen resident in such other State."

www.pathagar.com

The Constitution of Japan : Article 14.

" ... there shall be no discrimination in political, economic or social relations because of race, creed, sex, social status of family origin."

The constitution of West Germany (Former)

Article . 3 (3) in 1948 declares :

"No one shall be prejudiced or previleges because of his sex, descent, race, language, homeland, origin, faith or his religious and political opinions."

বৈষম্য দূরীকরণের প্রয়াস

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় আলোচ্য অনুচ্ছেদে সকল ক্ষেত্রে বৈষম্য অবসানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। বৈষম্যের অন্যতম উপাদান হচ্ছে জাতিগত পার্থক্য। এই পার্থক্য নির্মূলের লক্ষ্যে সকল প্রকার জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন গৃহীত হয়েছে। নিম্নে তা পরিবেশিত হলো ঃ

সকল প্রকার জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন

(International Convention on the Examination of All Forms of Racial Discrimnation)

পটভূমি

সাম্যের নীতি মানবিক অধিকারের অন্যতম মূল স্তম্ভ। যে-কোন রকমের বৈষম্যমূলক আচরণ কেবল বক্তিতে ব্যক্তিতে নয়, বরং বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও অশান্তির সৃষ্টি করে। জাতিসঙ্ঘের সনদ মানুষের সহজাত মর্যাদা ও সমান অধিকারের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ১৯৪৮ সালের 'মানবিক অধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা' জাত, বর্ণ, জাতীয়তা নির্বিশেষে সকলের সমান মর্যাদা ও অধিকার স্বীকার করেছে ১৯৬৩ সালের ২০শে নভেম্বরের ১৯০৪ (১৮) নম্বর সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবের মাধ্যমে জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ সকল প্রকার জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ সম্পর্কে একটি বিস্তারিত 'ঘোষণা' জারি করেন। এই ঘোষণাটিকে 'সকল প্রকার জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন-এর অগ্রদূত বলা যেতে পারে।

www.pathagar.com

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের 'মানবিক অধিকার কমিশন' উহার 'বৈষম্য নিরোধ ও সংখ্যালঘুদের সংরক্ষণ সংক্রান্ত উপ-কমিশন' (Sub-Commision on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities)-এর সাহায্যে এই কনভেনশনটির খসড়া প্রস্তুত করে। ১৯৬৫ সালের ২১শে ডিসেম্বরের ২১০৬ (২০) নম্বর সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবের ক্রোড়পত্র হিসাবে সাধারণ পরিষদ এই কনভেনশনটি গ্রহণ করে। ১৯৬৬ সালের ৭ই মার্চ নিউইয়র্কে কনভেনশনটি গ্রহণ করে। ১৯৬৬ সালের ৭ই মার্চ নিউইয়র্কে কনভেনশনটি স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এটা ৭২টি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। এবং ৪৬টিরও বেশি রাষ্ট্র এর পক্ষভুক্ত হয়েছে (দ্রষ্টব্য : Brownlie : Basic Documents in International Law, 1972, P. 190)।

এই কনভেনশনটি মানবিক অধিকারের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। এতে ব্যক্তিগত অধিকারের নীতি ও সমষ্টিগত অধিকারের নীতির মধ্যে সামঞ্জস্য ঘটেছে। উল্লেখ্য যে, এই কনভেনশনের পক্ষরাষ্ট্রসমূহ সকল প্রকার জাতিগত বৈষম্যের নিন্দা করেছে এবং তা দূর করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে, কিন্তু জাতিগত বৈষম্য দূর করার জন্য বাধ্যতামূলক কোন ব্যবস্থা নেই। রোডেশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুসৃত বর্ণ বৈষম্যের নীতি এই কনভেনশন তথা জাতিসংঘ সনদের প্রতি উলঙ্গ অবজ্ঞার পরিচয় বহন করে।

পূর্ণ বিবরণ

২১০৬ (২০) নম্বর সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব

ক

সাধারণ পরিষদ

জাতিসংঘের পৃষ্ঠপোষকতায় সকল প্রকার জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ সম্পর্কে একটি আন্তর্জাতিক কনভেনশন গ্রহণ করা উচিত বিবেচনা করে,

অনুরূপ কনভেনশন সকল প্রকার জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে এবং উহা যথাসম্ভব শীঘ্র রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও অনুসমর্থিত হওয়া উচিত এবং এর বিধানাবলি অবিলম্বে কার্যকরী করা উচিত—সে সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে ;

কনভেনশনটির মূল বিবরণ বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হওয়া উচিত তাও বিবেচনা করে,

(১) বর্তমান সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবটির সহিত সংযুক্ত 'সকল প্রকার জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশনটি' গ্রহণ করছে, এবং তা স্বাক্ষরদান ও অনুসমর্থনের জন্য উন্মুক্ত করছে ;

(২) কনভেনশনটির ১৭ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত রাষ্ট্রসমূহকে অবিলম্বে কনভেনশনটিতে স্বাক্ষরদান এবং তা অনুসমর্থন করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছে ;

www.pathagar.com

(৩) বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকার এবং বেসরকারি সংগঠনকে তথ্য সরবরাহের সকল উপযুক্ত বাহনসহ তাদের আয়ত্তাধীন প্রতিটি মাধ্যমের সাহায্যে কনভেনশনটির পূর্ণ বিবরণ যথাসম্ভব ব্যাপক ভিত্তিতে প্রচার করার আহ্বান জানাচ্ছে;

(৪) মহাসচিবকে কনভেনশনটির দ্রুত ও ব্যাপক প্রচার নিশ্চিত করতে এবং সে উদ্দেশ্যে এর পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ ও বিতরণ করতে অনুরোধ জানাচ্ছে;

(৫) মহাসচিবকে কনভেনশনটি অনুসমর্থনের অবস্থা সম্পর্কে সাধারণ পরিষদের নিকট রিপোর্ট প্রদান করার জন্য অনুরোধ করছে। সাধারণ পরিষদ এর ভবিষ্যৎ অধিবেশনগুলিতে আলোচ্যসূচির স্বতন্ত্র বিষয়রূপে অনুরূপ রিপোর্ট বিচার-বিবেচনা করবে।

ক্রোড়পত্র

'সকল প্রকার জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন'

এই কনভেনশনের পক্ষরাষ্ট্রসমূহ,

জাতিসঙ্ঘের সনদ সকল মানব প্রাণীর সহজাত মর্যাদা ও সমতার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং সকল সদস্য রাষ্ট্র জাতিসংঘের অন্যতম লক্ষ্য—বংশ, নারী-পুরুষ, ভাষা অথবা ধর্ম নির্বিশেষে সকলের মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সম্মান এবং এই অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতিপালন বৃদ্ধি ও উৎসাহিতকরণ—অর্জনের জন্য জাতিসংঘের সহযোগিতায় যৌথ এবং পৃথক পৃথক কর্মপন্থা গ্রহণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এটা বিবেচনা করে;

'মানবিক অধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা' স্বীকার করেছে যে, সকল মানুষ স্বাধীন এবং সমান মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে এবং কোনরূপ ভেদাভেদ ব্যতিরেকে এবং বিশেষ করে বংশ, বর্ণ অথবা জাতিগত উদ্ভব নির্বিশেষে, প্রত্যেককে উক্ত ঘোষণায় বর্ণিত সকল অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগের অধিকারী, তা বিবেচনা করে;

সকল মানুষ আইনের সম্মুখে সমান এবং যে-কোন প্রকার বৈষম্যের বিরুদ্ধে ও বৈষম্যকরণের উস্কানির বিরুদ্ধে আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী, বিবেচনা করে;

জাতিসংঘ যে-কোন রকমের এবং যে-কোন স্থানে বিদ্যমান ঔপনিবেশবাদ ও উহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার পৃথকীকরণ ও বৈষম্যমূলক কার্যকলাপের নিন্দা করেছে এবং ১৯৬০ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখের 'ঔপনিবেশিক শাসনাধীন দেশ ও জনগোষ্ঠীসমূহকে স্বাধীনতাদান সংক্রান্ত ঘোষণা' (সাধারণ পরিষদের ১৫১৪ (১৫) নম্বর সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব) সেগুলির দ্রুত ও শর্তহীন অবসানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার ও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে বিবেচনা করে;

১৯৬৩ সালের ২০শে নভেম্বর তারিখে গৃহীত 'সকল প্রকার জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত জাতিসংঘের ঘোষণা' (সাধারণ পরিষদের ১৯০৪ (১৮) নম্বর সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব) সারা বিশ্বে

www.pathagar.com

সকল রকমের জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণের এবং মানব ব্যক্তিত্বের মর্যাদা সম্পর্কে বোঝাপড়া ও উহার প্রতি সম্মান নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয়তা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা বিবেচনা করে ;

জাতিগত পার্থক্যের (racial differentiation) ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠত্বের মতবাদ (doctrine of superiority) বিজ্ঞানগতভাবে ভ্রান্ত, নৈতিকতার দিক থেকে নিন্দনীয়, সমাজের পক্ষে অন্যায় ও বিপজ্জনক, এবং তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক দিক থেকে কোনখানেই জাতিগত বৈষম্যের কোন যৌক্তিকতা নেই একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে,

জাত, বর্ণ অথবা কৃষ্টিগত উদ্ভবের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ও শান্তিপূর্ণ সম্পর্কের পথে একটি প্রতিবন্ধক এবং তা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তার হানি করে, এমন কি একই রাষ্ট্রে বসবাসকারী প্রতিবেশীদের মধ্যে ঐক্য বিনষ্ট করতে পারে তাহা পুনর্ঘোষণা করে ;

জাতিগত প্রতিবন্ধকতার বিদ্যমানতা যে-কোন মানব সমাজে আদর্শ বিরোধী, তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে ;

বিশ্বের কোন কোন এলাকায় দৃশমান জাতিগত বৈষম্যের অভিব্যক্তি এবং জাতি-ভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব ও ঘৃণা যেমন : বর্ণ-বৈষম্য (apartheid), পৃথকীকরণ (segregation) বা বিচ্ছিন্নকরণ (separation) ইত্যাদির ভিত্তিতে অনুসৃত নীতির কারণে শঙ্কিত হয়ে ;

সকল রকমের জাতিগত বৈষম্য দ্রুত দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিভিন্ন জাতের মধ্যে সমঝোতা বৃদ্ধি ও সকল প্রকার জাতিভিত্তিক পার্থক্য ও প্রভেদমুক্ত একটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে, জাতবাদী মতাদর্শ (racist doctrine) এবং কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বাধাদান ও সংগ্রাম করিতে দৃঢ়-সংকল্প হয়ে ;

১৯৫৮ সালে 'আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা' কর্তৃক গৃহীত 'নিয়োগ ও পেশার ক্ষেত্রে বৈষম্য সম্পর্কিত কনভেনশন' (convention concerning Discrimination in respect of Employment and Occupation) এবং ১৯৬০ সালে জাতিসংঘের 'শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা' (UNESCO)কর্তৃক গৃহীত 'শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্যের বিরুদ্ধে কনভেনশন' (Convention against Discrimination in Education)-এর কথা মনে রেখে ;

'সকল প্রকার জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত জাতিসঙ্ঘের ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত নীতিসমূহের বাস্তবায়ন এবং সে উদ্দেশ্যে দ্রুততম বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করার মানসে ;

নিম্নলিখিত বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে :

প্রথম ভাগ

অনুচ্ছেদ ঃ ১

(১) এই কনভেনশনে 'জাতিগত বৈষম্য' বলিতে বোঝায়—জাত, বর্ণ, বংশ (descent)

www.pathagar.com

অথবা জাতিগত বা কৃষ্টিগত উদ্ভবের ভিত্তিতে যে–কোন ভেদাভেদ, বহিষ্করণ, বাধানিষেধ অথবা অগ্রাধিকার, যার উদ্দেশ্য বা ফলাফল হচ্ছে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতি অথবা গণজীবনের অন্য যে কোন ক্ষেত্রে সমতার ভিত্তিতে মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার স্বীকৃতি, উপভোগ অথবা প্রয়োগ নাকচ বা খর্ব করা।

(২) কোন পক্ষরাষ্ট্র কর্তৃক এর নাগরিক ও অনাগরিকদের মধ্যে ভেদাভেদ, বহিষ্করণ, বাধানিষেধ আরোপ অথবা অগ্রাধিকারদান–এর ক্ষেত্রে এই কনভেনশন প্রযোজ্য হবে না।

(৩) এই কনভেনশনের কোন কিছুরই এমন ব্যাখ্যা প্রদান করা চলিবে না যাহা পক্ষরাষ্ট্রগুলোর জাতীয়তা, নাগরিকতা অথবা দেশীয়করণ (naturalisation) সম্পর্কিত আইনের বিধানাবলিকে কোনভাবে ক্ষুন্ন করে, যদি না অনুরূপ বিধানাবলি কোন বিশেষ জাতীয় গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রভেদমূলক হয়।

(৪) কেবল কোন নির্দিষ্ট জাত (race) বা কৃষ্টিগত গোষ্ঠী (ethnic group) অথবা ব্যক্তিবর্গের পর্যাপ্ত অগ্রগতি সাধনের উদ্দেশ্যে, তাদের জন্য মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার সমান উপভোগ অথবা প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ জাতিগত বৈষম্য বলে গণ্য হবে না ; তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ ব্যবস্থাসমূহ এমন হবে না যার ফলে বিভিন্ন জাতগত গোষ্ঠীর (racial groups) ভিন্ন ভিন্ন অধিকার রক্ষণ করা হয়, এবং যে উদ্দেশ্যে উক্ত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে সেই উদ্দেশ্য সাধনের পর সেইগুলি আর চালু রাখা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

(১) পক্ষরাষ্ট্রসমূহ জাতিগত বৈষম্যের নিন্দা করে এবং সকল প্রকার উপযুক্ত উপায়ে এবং অবিলম্বে, সকল রকমের জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ ও সকল জাতের মধ্যে সমঝোতা বৃদ্ধির নীতি অনুসরণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ; এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে :

(ক) প্রত্যেক পক্ষরাষ্ট্র অঙ্গীকার করছে যে, তা কোন ব্যক্তি, ব্যক্তিসমষ্টি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জাতিগত বৈষম্যমূলক কোন কাজ বা অভ্যাসে প্রবৃত্ত হবে না, এবং যাতে জাতীয় ও স্থানীয় সকল সরকারি কর্তৃপক্ষ ও সরকারি প্রতিষ্ঠান এই দায়িত্বের সাথে সঙ্গতি বজায় রেখে কাজ করে তা নিশ্চিত করবে ;

(খ) প্রত্যেক পক্ষরাষ্ট্র প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে, তা কোন ব্যক্তি কিংবা সংগঠন কর্তৃক জাতিগত বৈষম্য প্রবর্তন, সংরক্ষণ বা সমর্থন করবে না ;

(গ) প্রত্যেক পক্ষরাষ্ট্র সরকারি, জাতীয় ও স্থানীয় নীতিসমূহ পর্যালোচনা এবং জাতিগত বৈষম্যের সৃষ্টি করতে পারে অথবা কোন স্থানে বিদ্যমান জাতিগত বৈষম্য চিরস্থায়ী করতে পারে

www.pathagar.com

এমন কোন আইন এবং বিধি-নিয়ম সংশোধন, রাহিত অথবা বাতিল করার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ;

(ঘ) প্রত্যেক পক্ষরাষ্ট্র পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজন হলে, আইন প্রণয়নসহ সকল যথোপযুক্ত উপায়ে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সংগঠন কর্তৃক জাতিগত বৈষম্যকরণ নিষিদ্ধ করবে এবং এর অবসান ঘটাবে ;

(ঙ) প্রত্যেক পক্ষরাষ্ট্র অঙ্গীকার করছে যে তা যথোপযুক্ত একত্রীকরণমূলক (integrationist) বহুজাতি সংগঠন ও আন্দোলন এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে বাধাসমূহ দূরীকরণের উপায়গুলোকে উৎসাহিত করবে এবং জাতিগত বিভেদ জোরদার করতে পারে এমন যে-কোন জিনিস নিরুৎসাহিত করবে।

(২) পক্ষরাষ্ট্রসমূহ, পরিস্থিতি অনুযায়ী সে রূপ প্রয়োজন হলে, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কোন বিশেষ জাতগত গোষ্ঠী এবং অনুরূপ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গকে মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাপূর্ণ ও সমানভাবে ভোগের নিশ্চয়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে, তাদের পর্যাপ্ত উন্নয়ন ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করবার জন্য বিশেষ এবং বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অনুরূপ ব্যবস্থার ফলশ্রুতি হিসাবে, যে উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে সেই উদ্রেশ্য বাস্তবায়নের পর, বিভিন্ন জাতগত গোষ্ঠীর জন্য অসম বা ভিন্ন ভিন্ন অধিকার চালু রাখা যাবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

পক্ষরাষ্ট্রসমূহ বিশেষভাবে জাতিগত পৃথকীকরণ (racial segregation) এবং বর্ণ-বৈষম্যের (apartheid) নিন্দা করে এবং তাদের এখতিয়ারাধীন অঞ্চলসমূহে এই ধরনের সকল কার্যাভ্যাসকে বাধাপ্রদান, নিষিদ্ধ এবং উচ্ছেদ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

পক্ষরাষ্ট্রসমূহ কোন বিশেষ জাত বা বর্ণগত অথবা কৃষ্টিগত জনগোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠত্বের নীতি বা তত্ত্বভিত্তিক সকল প্রচারণা এবং সকল সংগঠন অথবা, কোন প্রকারের জাতিগত ঘৃণা বা বিভেদ সমর্থন বা উৎসাহিত করে এমন কোন প্রচারণা অথবা সংগঠনের নিন্দা করে এবং অনুরূপ বিভেদমূলক কাজ বা কাজের প্ররোচনা অবসানের উদ্দেশ্যে আশু এবং যথার্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য, 'মানবিক অধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা'র অন্তর্ভুক্ত অধিকারসমূহের প্রতি যথাবিহিত সম্মান সহকারে, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ;

(ক) জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব অথবা ঘৃণা ভিত্তিক সকল প্রচারণা, জাতিগত বৈষম্যের প্ররোচনাদান এবং কোন জাত অথবা ভিন্ন বর্ণ বা কৃষ্টিগত জনগোষ্ঠীর সদস্যদের বিরুদ্ধে পরিচালিত কোন

www.pathagar.com

হিংসাত্মক কার্য অথবা অনুরূপ কার্যে প্ররোচনা দান, এবং জাতবাদী (racist) কার্যকলাপে অর্থ সাহায্যসহ যে-কোন সাহায্যদান ব্যবস্থাকে আইনের দ্বারা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করবে ;

(খ) যে-সকল সংগঠন এবং সংগঠিত ও অন্যান্য প্রচারণামূলক কার্যকলাপ জাতিগত বৈষম্য বৃদ্ধি করে অথবা প্ররোচিত করে সেইগুলিকে বেআইনি ঘোষণা ও নিষিদ্ধ করবে, এবং অনুরূপ সংগঠন বা কার্যকলাপে অংশগ্রহণ আইনের দ্বারা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করবে ;

(গ) জাতীয় অথবা স্থানীয় কোন সরকারি কর্তৃপক্ষ অথবা সরকারি প্রতিষ্ঠানকে জাতিগত বৈষম্য উৎসাহিত অথবা প্ররোচিত করার অনুমতি দেবে না।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

এই কনভেনশনের ২ অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ মৌলিক দায়িত্বসমূহ পালনার্থে পক্ষরাষ্ট্রসমূহ সকল রকমের জাতিগত বৈষম্য নিষিদ্ধ ও দূরীকরণের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে এবং জাত, বর্ণ অথবা জাতীয় বা কৃষ্টিগত উদ্ভব নির্বিশেষে প্রত্যেকের আইনের সম্মুখে সমতার অধিকার এবং বিশেষভাবে নিম্নলিখিত অধিকারসমূহ উপভোগের ক্ষেত্রে প্রত্যেকর সমান অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদানের অঙ্গীকার করছে ঃ

(ক) আদালতসমূহ (tribunals) এবং বিচারকার্যে নিয়োজিত অন্যান্য সকল সংস্থার নিকট সম-আচরণ লাভের অধিকার ;

(খ) ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার এবং সরকারি কর্মচারী অথবা কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত হিংস্রতা (violence) অথবা দৈহিক ক্ষতিসাধনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের নিকট হতে সংরক্ষণ লাভের অধিকার ;

(গ) রাজনৈতিক অধিকার, বিশেষ করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অধিকার, অর্থাৎ সর্বজনীন ও সমান ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ভোটদান ও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার, সরকার ও যে-কোন স্তরে সরকারি কাজকর্ম পরিচালনায় অংশগ্রহণ এবং সরকারি চাকুরিতে প্রবেশের সমান অধিকার ;

(ঘ) অন্যান্য পৌর অধিকার, বিশেষত,

১. রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে স্বাধীনভাবে চলাফেরা এবং বসবাস করার অধিকার ;

২. নিজ দেশসহ যে-কোন দেশ ত্যাগ এবং নিজের দেশে প্রত্যাবর্তনের অধিকার ;

৩. জাতীয়তার (নাগরিকতার) অধিকার ;

৪. বিবাহ করার এবং নিজ নিজ স্বামী বা স্ত্রীর নির্বাচনের অধিকার ;

৫. এককভাবে অথবা অন্যান্যের সহিত যৌথভাবে সম্পত্তির মালিকানার অধিকার ;

www.pathagar.com

৬. উত্তরাধিকারের অধিকার ;

৭. চিন্তা, বিবেক ও ধর্ম–এর স্বাধীনতার অধিকার ;

৮. মতামত ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার ;

৯. শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হওয়ার এবং সংগঠনের স্বাধীনতার অধিকার ;

(ঙ) অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার, বিশেষত,

১. কাজ করার অধিকার, স্বাধীনভাবে পেশা বা চাকুরি নির্বাচন করার অধিকার, কর্মের ন্যায়সঙ্গত ও সুবিধাজনক শর্তের অধিকার, বেকারত্বের বিরুদ্ধে রক্ষণ ও সমান কাজের জন্য সমান বেতনের অধিকার এবং ন্যায়সঙ্গত সুবিধাজনক পারিশ্রমিক লাভের অধিকার ;

২. শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন ও তাতে যোগদানের অধিকার ;

৩. বাসস্থানের অধিকার ;

৪. জনস্বাস্থ্য, চিকিৎসা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং সমাজসেবার অধিকার ;

৫. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অধিকার ;

৬. সাংস্কৃতিক কার্যকলাপে সমানভাবে অংশগ্রহণের অধিকার ;

(চ) সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট কোন স্থান অথবা সেবা যেমন ঃ পরিবহণ, হোটেল, রেস্তোঁরা, কফিখানা, নাট্যশালা এবং পার্কে প্রবেশলাভের অধিকার।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

পক্ষরাষ্ট্রসমূহ, যথাযোগ্য জাতীয় ট্রাইবুনাল এবং অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, উহাদের এখতিয়ারাধীন প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই কনভেনশন অমান্য করে তার মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহ লঙ্ঘন করে এইরূপ জাতিগত বৈষম্যমূলক যে–কোন কাজের বিরুদ্ধে কার্যকরী রক্ষণ এবং প্রতিকারের নিশ্চয়তা দান করবে, এবং অনুরূপ বৈষম্যের ফলে তিনি কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকলে তার জন্য অনুরূপ ট্রাইব্যুনালের নিকট ন্যায়সঙ্গত ও পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ বা সন্তুষ্টিবিধান দাবি করার অধিকার নিশ্চিত করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

পক্ষরাষ্ট্রসমূহ অঙ্গীকার করছে যে, জাতিগত বৈষম্যের সৃষ্টি করে এমন কোন সংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উদ্দেশ্যে, বিভিন্ন জাতি এবং জাতগত অথবা গোষ্ঠীর মধ্যে সহনশীলতা ও মৈত্রী বর্ধনের উদ্দেশ্যে, এবং 'জাতিসংঘ সনদ' , 'মানবিক অধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা', 'সকল প্রকার জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত জাতিসঙ্ঘের ঘোষণা' এবং এই কনভেনশনটি প্রচারের জন্য,

www.pathagar.com

বিশেষভাবে অধ্যাপনা (teaching), শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও তথ্যের ক্ষেত্রে, তারা আশু এবং কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

দ্বিতীয় ভাগ

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

(১) একটি 'জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত কমিটি' (Committee on the Elimination of Racial Discrimination) (ইহার পর কেবল 'কমিটি' বলে উল্লিখিত) প্রতিষ্ঠিত হবে। কমিটি পক্ষরাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক তাদের নাগরিকদের মধ্য হতে নির্বাচিত উচ্চ নৈতিক মর্যাদাবান এবং স্বীকৃত নিরপেক্ষতাসম্পন্ন ১৮ জন বিশেষজ্ঞ সমবায়ে গঠিত হবে। ন্যায়সঙ্গত ভৌগোলিক বণ্টন এবং বিভিন্ন প্রকার সভ্যতা ও প্রধান প্রধান আইন-পদ্ধতির প্রতিনিধিত্বের বিষয় বিবেচনা করে কমিটির সদস্যদিগকে নির্বাচন করতে হবে এবং তাঁরা ব্যক্তিগত মর্যাদায় কাজ করবেন।

(২) কমিটির সদস্যগণ পক্ষরাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিদের তালিকার মধ্য হতে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন। প্রত্যেক পক্ষরাষ্ট্র তার নাগরিকদের মধ্য হতে একজন করে ব্যক্তি মনোনীত করবে।

(৩) কনভেনশনটি বলবৎ হওয়ার তারিখের ছয় মাস পর প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রত্যেক নির্বাচনের ন্যূনতম তিনমাস পূর্বে জাতিসঙ্ঘের মহাসচিব পক্ষরাষ্ট্রসমূহকে তাদের মনোনীত ব্যক্তিদের নাম দুই মাসের মধ্যে দাখিল করার আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি পত্র দিবেন। অনুরূপভাবে মনোনিত সকল ব্যক্তির নাম বর্ণনানুক্রমে সাজিয়ে এবং মনোনয়নকারী পক্ষরাষ্ট্রের উল্লেখ সহকারে মহাসচিব একটি তালিকা প্রস্তুত করবেন এবং সেই তালিকা পক্ষরাষ্ট্রসূহের নিকট পেশ করবেন।

(৪) জাতিসঙ্ঘের সদর দফতরে মহাসচিব কর্তৃক আহূত পক্ষরাষ্ট্রসমূহের বৈঠকে কমিটির সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বৈঠকের কোরামের জন্য পক্ষরাষ্ট্রসমূহের দুই-তৃতীয়াংশের প্রয়োজন হবে এবং সেই বৈঠকে যে-সব মনোনীত ব্যক্তি সর্বাধিক সংখ্যক এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী পক্ষরাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পাবেন তাঁরা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হবেন।

(৫) (ক) কমিটির সদস্যগণ চার বৎসর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হবেন। তবে প্রথম নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে নয় জনের কার্যকাল দুই বৎসর পর সমাপ্ত হবে ; প্রথম নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই কমিটির চেয়ারম্যান উক্ত নয়জন সদস্যকে লটারির মাধ্যমে বাছাই করবেন।

www.pathagar.com

(খ) কোন পক্ষরাষ্ট্রের বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্য হিসাবে কাজ করতে ক্ষান্ত হওয়ার ফলে আকস্মিক শূন্যতা দেখা দিলে তা পূরণের জন্য উক্ত পক্ষরাষ্ট্র তার নাগরিকদের মধ্য হতে অপর একজন বিশেষজ্ঞকে কমিটির সদস্য হিসাবে নিয়োগ করবে ; অনুরূপ নিয়োগ কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষ।

(৬) কমিটির সদস্যগণ কমিটির কাজে বহাল থাকাকালে পক্ষরাষ্ট্রসমূহ তাঁদের (সদস্যদের) ব্যয়-বহনের জন্য দায়ী থাকবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

(১) পক্ষরাষ্ট্রসমূহ অঙ্গীকার করছে যে, তারা কমিটির বিবেচনার জন্য, এই কনভেনশনটির বিধানাবলি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে যে সব আইন প্রণয়নমূলক, বিচার বিভাগীয়, প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সেইসব ব্যবস্থা সম্পর্কে জাতিসংঘের মহাসচিবের নিকট রিপোর্ট প্রদান করবে। (ক) কনভেনশনটি বলবৎ হওয়ার এক বৎসরের মধ্যে, এবং (খ) তার পর প্রতি দুই বৎসর অন্তর এবং কমিটি যখন রিপোর্ট প্রদানের জন্য অনুরোধ করবে তখন, সংশ্লিষ্ট পক্ষরাষ্ট্রসমূহ অনুরূপ রিপোর্ট প্রদান করবে। পক্ষরাষ্ট্রগুলির নিকট হতে আরও তথ্য জানার জন্য কমিটি তাদেরকে অনুরোধ করতে পারে।

(২) কমিটি মহাসচিবের মাধ্যমে জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের নিকট উহার কার্যকলাপ সম্পর্কে বাৎসরিক রিপোর্ট প্রদান করবে এবং পক্ষপ্রস্তাব ও সুপারিশ করতে পারে। অনুরূপ প্রস্তাব ও সুপারিশগুলি এবং সেই সম্পর্কে পক্ষরাষ্ট্রসমূহের কোন মন্তব্য থাকলে সেগুলি সাধারণ পরিষদের নিকট রিপোর্ট করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

(১) কমিটি এর নিজস্ব কার্য-প্রণালীবিধি গ্রহণ করবে।

(২) কমিটি এর কর্মকর্তাদেরকে দুই বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত করবে।

(৩) জাতিসঙ্ঘের মহাসচিব কমিটির সচিবালয়ের ব্যবস্থা করবেন।

(৪) কমিটির বৈঠকসমূহ সাধারণত জাতিসংঘের সদর দফতরে অনুষ্ঠিত হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

(১) কোন পক্ষরাষ্ট্র যদি মনে করে যে, অপর কোন পক্ষরাষ্ট্র কনভেনশনের বিধানাবলি কার্যকরী করছে না, তবে উক্ত বিষয়টি কমিটির দৃষ্টিগোচর করতে পারে। তখন কমিটি সেই

www.pathagar.com

অভিযোগটি সংশ্লিষ্ট পক্ষরাষ্ট্রের নিকট প্রেরণ করবে। গ্রহণকারী রাষ্ট্র, তিনমাসের মধ্যে, বিষয়টি পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করে এবং উক্ত রাষ্ট্র কর্তৃক কোন প্রতিকার-ব্যবস্থা গৃহীত হয়ে থাকলে তা উল্লেখ করে একটি লিখিত কৈফিয়ত বা বিবৃতি কমিটির নিকট দাখিল করবে।

(২) বিষয়টি যদি গ্রাহকরাষ্ট্র কর্তৃক প্রথম অভিযোগ প্রাপ্তির ছয় মাসের মধ্যে, উভয় পক্ষের সন্তুষ্টি অনুযায়ী দ্বি-পাক্ষিক আলাপ-আলোচনা অথবা উহাদের নিকট লভ্য অন্য কোন পদ্ধতির মাধ্যমে নিষ্পত্তি না হয় তবে রাষ্ট্রদ্বয়ের যে-কোন একটি কমিটি ও অপর রাষ্ট্রটিকে বিজ্ঞপ্তি প্রদানের মাধ্যমে বিষয়টি কমিটির নিকট পুনরায় উত্থাপন করতে পারবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (২) পরিচ্ছেদ অনুযায়ী কমিটির নিকট কোন বিষয় উত্থাপন করা হলে, সেই বিষয়ে লভ্য সকল আভ্যন্তরীণ প্রতিকার ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ এবং সেইগুলি নিঃশেষ করা হয়েছে, সেই সম্পর্কে হবার পর, সাধারণভাবে স্বীকৃত আন্তর্জাতিক আইনের নীতিসমূহ অনুসারে, কমিটি বিষয়টি বিবেচনা করবে। কিন্তু যে-ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিকার ব্যবস্থার প্রয়োগ অযৌক্তিকভাবে দীর্ঘায়িত করা হইবে সেই ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।

(৪) কমিটি এর নিকট পেশকৃত যে-কোন বিষয়ে অন্য যে-কোন প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সরবরাহ করার জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষরাষ্ট্রগুলিকে আহ্বান জানাতে পারে।

(৫) এই অনুচ্ছেদের অধীনে উত্থিত কোন বিষয় কমিটি কর্তৃক বিবেচনাকালে কমিটির কার্য-ধারার ভোটাধিকার ব্যতীত অংশগ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষরাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার থাকবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

(১) ক. কমিটি কর্তৃক সকল প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করার পর কমিটির সভাপতি একটি অস্থায়ী 'আপোষ কমিশন' (ইহার পর হতে শুধু 'কমিশন' বলে উল্লিখিত) নিয়োগ করবেন। এই কমিশন কমিটির সদস্যদের মধ্যে হতে অথবা কমিটির সদস্য নন এমন পাঁচ ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত হবে। বিবাদমান পক্ষগুলির সর্বসম্মতিক্রমে কমিশনের সদস্যগণ নিযুক্ত হবেন, এবং এই কনভেনশনের প্রতি সম্মানের ভিত্তিতে বিষয়টি বন্ধুত্বপূর্ণ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের জন্য কমিশনের শুভ প্রয়াস লভ্য করতে হবে।

খ. যদি বিবাদমান পক্ষরাষ্ট্র, তিন মাসের মধ্যে, কমিশনের পূর্ণাঙ্গ অথবা আংশিক গঠন সম্পর্কে মতৈক্য পৌঁছতে ব্যর্থ হয় তবে কমিশনের যে সংখ্যক সদস্য সম্পর্কে রাষ্ট্রগুলি একমত হবে না সেই সংখ্যক সদস্যকে, কমিটির তার নিজ সদস্যদের মধ্য হতে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচিত করবে।

(২) কমিশনের সদস্যগণ ব্যক্তিগত মর্যাদায় কাজ করবেন। তাঁরা বিবাদমান কোন পক্ষরাষ্ট্রের অথবা এই কনভেনশনের পক্ষ নয় এমন কোন রাষ্ট্রের নাগরিক হবেন না।

www.pathagar.com

(৩) কমিশন এর সভাপতি নির্বাচন করবে এবং নিজস্ব কার্যপ্রণালী বিধি গ্রহণ করবে।

(৪) কমিশনের বৈঠকসমূহ সাধারণত জাতিসঙ্ঘের সদর সফতরে অথবা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন সুবিধাজনক স্থানে অনুষ্ঠিত হবে।

(৫) পক্ষরাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বিবাদের ফলে যখনই কমিশন গঠিত হবে তখন এই কনভেনশনের ১০ অনুচ্ছেদের (৩) পরিচ্ছেদ যে সচিবালয়ের ব্যবস্থা রয়েছে সেই সচিবালয়ে কমিশনকে সেবাদান করবে।

(৬) জাতিসঙ্ঘের মহাসচিব কর্তৃক নিরূপিত হিসাব অনুযায়ী বিবাদমান পক্ষরাষ্ট্রগুলি কমিশনের সদস্যবৃন্দ বাবদ সকল ব্যয় সমান অংশে বহন করবে।

(৭) এই অনুচ্ছেদের (৬) পরিচ্ছেদ অনুসারে বিবাদমান পক্ষরাষ্ট্রগুলি কর্তৃক অর্থপরিশোধ করার পূর্বে, প্রয়োজন হলে, কমিশনের সদস্যদের ব্যয় বাবদ অর্থ প্রদানের জন্য মহাসচিবকে ক্ষমতা প্রদান করা হবে।

(৮) কমিটি কর্তৃক সংগৃহিত ও যাচাইকৃত তথ্যাদি কমিশনের লভ্য করতে হবে, এবং কমিশন সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলিকে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সরবরাহের জন্য আহ্বান করতে পারবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

(১) বিষয়টি বিচার-বিবেচনা করে কমিশন একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করবে এবং তা কমিটির সভাপতির নিকট পেশ করবে। উক্ত রিপোর্টে বিভিন্ন পক্ষের মধ্যকার বিবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় প্রশ্ন সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং বিবাদটির বন্ধুত্বপূর্ণ নিষ্পত্তির জন্য কমিশনের বিবেচনা অনুসারে উপযুক্ত সুপারিশসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(২) কমিটির সভাপতি বিবাদমান প্রত্যেক পক্ষরাষ্ট্রের নিকট কমিশনের রিপোর্ট প্রেরণ করবেন। এইসব রাষ্ট্র কমিশনের রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত সুপারিশসমূহ গ্রহণ করে কিনা তা তিন মাসের মধ্যে কমিটির সভাপতিকে জানাবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদের নির্ধারিত সময়ের পর কমিটির সভাপতি কমিশনের রিপোর্টটি এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষরাষ্ট্রগুলির ঘোষণাসমূহ (মতামত) এই কনভেনশনের অন্যান্য পক্ষরাষ্ট্রের নিকট প্রেরণ করবেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

(১) কোন পক্ষরাষ্ট্র যে-কোন সময় এই মর্মে স্বীকারোক্তি ঘোষণা করতে পারে যে, তা তার এখতিয়ারাধীন কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি নিজ রাষ্ট্র কর্তৃক এই কনভেনশনে উল্লিখিত কোন অধিকার লঙ্ঘনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে দাবি করলে তাঁর বা তাদের নিকট হতে যোগাযোগপত্র (অভিযোগ) গ্রহণ ও বিচার-বিবেচনা করার ক্ষমতা কমিটির আছে। যে পক্ষরাষ্ট্র

www.pathagar.com

অনুরূপ ঘোষণা প্রদান করে নাই সেই রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত কোন যোগাযোগপত্র কমিটি গ্রহণ করবে না।

(২) কোন পক্ষরাষ্ট্র এই অনুচ্ছেদের (১) পরিচ্ছেদের বিধান অনুসারে ঘোষণা প্রদান করে থাকলে তা তার জাতীয় আইন কাঠামোর অধীনে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা বা চিহ্নিত করতে পারে। অনুরূপ সংস্থা উক্ত রাষ্ট্রের এখ্তিয়ারাধীন যে ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিসমষ্টি দাবি করবে যে এই কনভেনশনে বর্ণিত কোন অধিকার নিজ রাষ্ট্র কর্তৃক লঙ্ঘনের ফলে তিনি বা তাঁরা এ-সম্পর্কে লভ্য অন্য সকল স্থানীয় প্রতিকার ব্যবস্থা নিঃশেষ করেছেন তাঁর বা তাদের নিকট হতে আবেদন গ্রহণ ও তা বিবেচনা করতে পারবে।

(৩) সংশ্লিষ্ট পক্ষরাষ্ট্ররাষ্ট্রসমূহ এই অনুচ্ছেদের (১) পরিচ্ছেদ অনুসারে প্রদত্ত কোন ঘোষণা এবং এই অনুচ্ছেদের (২) পরিচ্ছেদ অনুসারে প্রতিষ্ঠিত অথবা চিহ্নিত সংস্থার নাম জাতিসঙ্ঘের মহাসচিবের নিকট পেশ করবে, এবং মহাসচিব সেইগুলির প্রতিলিপি পক্ষরাষ্ট্রসমূহের নিকট প্রেরণ করবেন। মহাসচিবের নিকট দেয় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যে-কোন সময় অনুরূপ ঘোষণা প্রত্যাহার করা যেতে পারে ; কিন্তু অনুরূপ কোন প্রত্যাহার কমিটির বিবেচনাধীন যোগাযোগসমূহকে কোনরূপে প্রভাবিত করবে না।

(৪) এই অনুচ্ছেদের (২) পরিচ্ছেদ অনুসারে প্রতিষ্ঠিত অথবা চিহ্নিত সংস্থা [প্রাপ্ত] আবেদনসমূহের একটি নিবন্ধপত্র রাখবে এবং তার সত্যায়িত অনুলিপি যথাযোগ্য সূত্রের (channel) মাধ্যমে মহাসচিবের নিকট প্রতি বছর দাখিল করবে ; তবে এই শর্তে যে, তার বিষয়বস্তু সাধারণ্যে প্রকাশ করা হবে না।

(৫) এই অনুচ্ছেদের (২) পরিচ্ছেদ অনুসারে প্রতিষ্ঠিত অথবা চিহ্নিত সংস্থার নিকট হতে সন্তোষজনক সমাধান না পাওয়া গেলে, আবেদনকারী ছয় মাসের মধ্যে বিষয়টি কমিটিকে জানাতে পারবে।

(৬) (ক) কমিটি তার নিকট পেশকৃত যে-কোন অভিযোগ সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের, অর্থাৎ এই কনভেনশনের কোনবিধান লঙ্ঘন করেছে বলে যে-রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে সেই রাষ্ট্রের দৃষ্টিগোচর করবে ; কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির [যাঁরা অভিযোগ করেছেন] স্পষ্ট সম্মতি ব্যতীত তাঁদের পরিচয় প্রকাশ করা যাবে না। কমিটি কোন বেনামি যোগাযোগ (অভিযোগ) গ্রহণ করবে না ;

(খ) গ্রাহকরাষ্ট্র (যে রাষ্ট্র কমিটির নিকট হতে অভিযোগ সম্পর্কে পত্র পেয়েছে) বিষয়টি পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করে এবং সে বিষয়ে উক্ত রাষ্ট্র কোন প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকলে তা উল্লেখ করে তিন মাসের মধ্যে একটি লিখিত কৈফিয়ৎ বা বিবৃতি কমিটির নিকট দাখিল করবে।

(৭) (ক) কমিটি সংশ্লিষ্ট পক্ষরাষ্ট্র এবং আবেদনকারীর নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে অভিযোগসমূহ বিচার বিবেচনা করবে। কমিটি কোন আবেদনকারীর নিকট হতে প্রাপ্ত কোন

www.pathagar.com

অভিযোগ বিবেচনা করবে না, যদি না তা নিশ্চিত হয় যে, আবেদনকারী সকল লভ্য অভ্যন্তরীণ প্রতিকার ব্যবস্থা নিঃশেষ করেছেন। কিন্তু যেখানে এই প্রতিকার ব্যবস্থা প্রয়োগ অযৌক্তিকভাবে দীর্ঘায়িত করা হয় সেখানে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।

(খ) নিজের কোন পরামর্শ অথবা সুপারিশ থাকলে কমিটি তা সংশ্লিষ্ট পক্ষরাষ্ট্র এবং আবেদনকারীর নিকট প্রেরণ করবে।

(৮) কমিটি তার বাৎসরিক রিপোর্টে অনুরূপ অভিযোগসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং, যেখানে প্রযোজ্য, সংশ্লিষ্ট পক্ষরাষ্ট্রগুলির কৈফিয়ৎ বা বিবৃতি এবং তার নিজের পরামর্শ ও সুপারিশসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করবে।

(৯) এই কনভেনশনের অন্যূন দশটি পক্ষরাষ্ট্র এই অনুচ্ছেদের (১) পরিচ্ছেদ অনুসারে ঘোষণা প্রদানের মাধ্যমে বাধ্যতা স্বীকার করলে কমিটি এই অনুচ্ছেদে বিধিবদ্ধ কার্যাবলী সম্পাদনের অধিকার লাভ করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

(১) ১৯৬০ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে গৃহিত সাধারণ পরিষদের ১৫১৪ (১৫) নম্বর সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত 'ঔপনিবেশিক শাসনাধীন দেশ ও জনগোষ্ঠীসমূহকে স্বাধীনতাদান সংক্রান্ত ঘোষণা'র লক্ষ্যসমূহ অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত এই কনভেনশনের বিধানাবলী, অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিল অথবা জাতিসঙ্ঘ ও উহার বিশেষায়িত সংস্থাসমূহ কর্তৃক এইসব জনগোষ্ঠীকে প্রদত্ত আবেদন করবার অধিকারকে, সীমিত করবে না।

(২) (ক) এই কনভেনশনের ৮ অনুচ্ছেদের (১) পরিচ্ছেদের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কমিটি, জাতিসংঘের যে সব সংস্থা অছি অঞ্চল ও অস্বয়াত্তশাসিত অঞ্চল এবং অন্যান্য যেসব অঞ্চলের ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদের ১৫১৪ (১৫) নম্বর সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব প্রযোজ্য সেইসব অঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট হতে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ বিবেচনা করতে যেয়ে এই কনভেনশনের নীতি ও লক্ষ্যসমূহের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত বিষয়াবলী নিয়ে কারবার করে, সেইসব সংস্থার নিকট হতে এই কনভেনশনের অন্তর্ভুক্ত বিষয়াবলী (যে-সব বিষয় উক্ত সংস্থাগুলির বিবেচনাধীন রয়েছে) সম্পর্কিত আবেদনসমূহের প্রতিলিপি গ্রহণ করবে এবং উক্ত সংস্থাগুলির নিকট এইসব আবেদন সম্পর্কে নিজের মতামত ও সুপারিশ পেশ করবে।

(খ) কমিটি, জাতিসংঘের যথোপযুক্ত সংস্থাগুলির নিকট হতে, এই পরিচ্ছেদের (ক) উপ-পরিচ্ছেদে উল্লিখিত অঞ্চলসমূহে সংশ্লিষ্ট শাসন কর্তৃপক্ষ এই কনভেনশনের নীতি ও লক্ষ্যসমূহের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত যেসব আইন প্রণয়নমূলক, বিচার বিভাগীয়, প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যবস্থা প্রয়োগ করেছে সেসব ব্যবস্থা সম্পর্কিত রিপোর্টের প্রতিলিপি গ্রহণ করবে, এবং তার নিজ অভিমত প্রকাশ ও সুপারিশ পেশ করবে।

(৩) কমিটি, সাধারণ পরিষদের নিকট তার বাৎসরিক রিপোর্টে, জাতিসঙ্ঘের বিভিন্ন সংস্থার

www.pathagar.com

(২) ২৭তম অনুসমর্থনপত্র কিংবা যোগদানপত্র জমাদানের পর যেসব রাষ্ট্র এই কনভেনশনটি অনুসমর্থন করবে কিংবা তাতে যোগদান করবে সেইসব রাষ্ট্রের প্রত্যেকের জন্য নিজ নিজ অনুসমর্থনপত্র বা যোগদানপত্র জমাদানের তারিখের পর ৩০তম দিবসে এই কনভেনশনটি কার্যকর হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

(১) কোন রাষ্ট্র এই কনভেনশনটি অনুসমর্থন বা এতে যোগদানের সময় কোন শর্ত–সংরক্ষণ করলে জাতিসঙ্ঘের মহাসচিব তা গ্রহণ করবেন এবং এই কনভেনশনের পক্ষ অথবা পক্ষ হতে পারে এইরূপ সকল রাষ্ট্রের মধ্যে উহা প্রচার করবেন। অনুরূপ শর্ত সংরক্ষণের ব্যাপারে কোনরাষ্ট্রের আপত্তি থাকলে [মহাসচিবের নিকট হতে) যোগদানপত্র প্রাপ্তির তারিখ হতে নব্বই দিনের মধ্যে সেই রাষ্ট্র মহাসচিবকে জানাবেন যে, তা সেই শর্ত–সংরক্ষণ স্বীকার করে না।

(২) এই কনভেনশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সহিত অসামঞ্জস্য এবং এই কনভেনশনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কোন সংস্থার কার্য পরিচালনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে এমন কোন শর্ত–সংরক্ষণ মঞ্জুর করা চলবে না। এই কনভেনশনের অন্যূন দুই–তৃতীয়াংশ পক্ষরাষ্ট্র যদি কোন শর্ত–সংরক্ষণের ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করে তবে উহা অসামঞ্জস্য বা বিঘ্নসৃষ্টিকারী বলে বিবেচিত হবে।

(৩) মহাসচিবের নিকট সেই মর্মে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যে–কোন সময় [উপরোক্ত] শর্তসমূহ প্রত্যাহার করা যেতে পারে। মহাসচিব যে তারিখে অনুরূপ বিজ্ঞপ্তি পাবেন সেই তারিখ হতে তা (প্রত্যাহার) কার্যকরী হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

কোন রাষ্ট্র জাতিসংঘের মহাসচিবের নিকট লিখিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই কনভেনশনটি বর্জন করতে পারে। মহাসচিব কর্তৃক অনুরূপ বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ হতে এক বৎসর পর বর্জন কার্যকরী হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

এই কনভেনশনের ব্যাখ্যা অথবা প্রয়োগ সম্পর্কে দুই বা ততোধিক পক্ষরাষ্ট্রের মধ্যেকার কোন বিরোধ, আলাপ–আলোচনা অথবা এই কনভেনশনে স্পষ্টভাবে বিধিবদ্ধ অন্য কোন পদ্ধতির মাধ্যমে নিষ্পত্তি না হলে এবং বিবাদমান পক্ষসমূহ মীমাংসার অন্য কোন পন্থা অবলম্বনের ব্যাপারে একমত না হলে, যে–কোন একটি পক্ষের অনুরোধক্রমে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে সিদ্ধান্তের জন্য পেশ করতে হবে।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

(১) যে-কোন পক্ষরাষ্ট্র যে-কোন সময় জাতিসংঘের মহাসচিবের উদ্দেশ্যে লিখিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই কনভেনশনটি সংশোধনের জন্য অনুরোধ করতে পারে।

(২) অনুরূপ অনুরোধ সম্বন্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন কি-না সে সম্পর্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

জাতিসঙ্ঘের মহাসচিব এই কনভেনশনের ১৭ অনুচ্ছেদের (১) পরিচ্ছেদে উল্লিখিত সকল রাষ্ট্রকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে জানাবেন ঃ

(ক) ১৭ ও ১৮ অনুচ্ছেদের অধীনে, স্বাক্ষরদান, অনুসমর্থন ও যোগদান;

(খ) ১৯ অনুচ্ছেদের অধীনে এই কনভেনশনটি বলবৎ হওয়ার তারিখ;

(গ) ১৪, ২০ ও ২৩ অনুচ্ছেদের অধীনে প্রাপ্ত যোগাযোগপত্র ও ঘোষণাসমূহ;

(ঘ) ২১ অনুচ্ছেদের অধীনে বর্জনমূলক ঘোষণাসমূহ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

(১) এই কনভেনশনটি—যার চিনা, ইংরেজি, ফরাসি, রুশ ও স্পেনীয় ভাষার বচন সমানভাবে নির্ভরযোগ্য, জাতিসংঘের সেরেস্তায় জমা থাকবে।

(২) জাতিসংঘের মহাসচিব এই কনভেনশনের ১৭ অনুচ্ছেদের (১) পরিচ্ছেদে বর্ণিত যে-কোন পদের সকল রাষ্ট্রের নিকট এই কনভেনশনের সত্যায়িত প্রতিলিপি প্রেরণ করবেন।

খ

সাধারণ পরিষদ

১৯৬০ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখের ১৫১৪ (১৫) নম্বর সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত 'ঔপনিবেশিক শাসনাধীন দেশ ও জনগোষ্ঠীসমূহকে স্বাধীনতাদান সংক্রান্ত ঘোষণার কথা স্মরণ করে;

১৯৬১ সালের ২৭শে নভেম্বর তারিখের ১৬৫৪ (১৬) নম্বর যে সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের দ্বারা 'ঔপনিবেশিক শাসনাধীন দেশ ও জনগোষ্ঠীসমূহকে স্বাধীনতাদান সংক্রান্ত ঘোষণা বাস্তবায়নজনিত পরিস্থিতি সম্পর্কিত বিশেষ কমিটি' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—যে কমিটির কাজ হলো ঘোষণাটির প্রয়োগ পর্যালোচনা করা এবং তার আয়ত্তাধীন সকল উপায়ে ঘোষণাটির প্রয়োগ পর্যালোচনা করা এবং

www.pathagar.com

নিকট হতে প্রাপ্ত আবেদন ও রিপোর্টসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং উক্ত আবেদন ও রিপোর্টসমূহের (কমিটির) অভিমত ও সুপারিশসমূহ অন্তর্ভুক্ত করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

এই কনভেনশনের বিবাদ বা অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিধানাবলী জাতিসংঘ ও তার বিশেষায়িত সংস্থাসমূহের সাংবিধানিক দলিলপত্রে অথবা তাদের দ্বারা গৃহীত কনভেনশন বিধিবদ্ধ (জাতিগত) বৈষম্য সম্পর্কিত বিরোধ বা অভিযোগ নিষ্পত্তির অন্যান্য পদ্ধতিকে ব্যাহত করবে না, এবং এই বিধানাবলি পক্ষরাষ্ট্রগুলোকে তাদের মধ্যে বলবৎ কোন সাধারণ অথবা বিশেষ আন্তর্জাতিক চুক্তির অধীনে বিবাদ মীমাংসার অন্য কোন পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা হতে বিরত করবে না।

তৃতীয় ভাগ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

(১) এই চুক্তিটি জাতিসংঘের যে-কোন সদস্য-রাষ্ট্র অথবা এর বিশেষায়িত সংস্থাসমূহের সদস্য, আন্তর্জাতিক আদালতের সংবিধির যে-কোন পক্ষরাষ্ট্র এবং বর্তমান চুক্তিটির পক্ষ হওয়ার জন্য জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক আমন্ত্রিত অন্য যে-কোন রাষ্ট্রের স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত।

(২) এই চুক্তিটি অনুসমর্থন-সাপেক্ষ। অনুসমর্থনপত্রসমূহ জাতিসংঘের মহাসচিবের নিকট জমা দিতে হবে।

(১) অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

(১) এই কনভেনশনের ১৭ অনুচ্ছেদের (১) পরিচ্ছেদে উল্লিখিত যে কোন রাষ্ট্রের যোগদানের জন্য এই কনভেনশনটি উন্মুক্ত থাকবে।

(২) জাতিসংঘের মহাসচিবের নিকট যোগদানপত্র জমাদানের মাধ্যমে এই কনভেনশন যোগদান কার্যকরী হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

(১) জাতিসংঘের মহাসচিবের নিকট ২৭তম অনুসমর্থনপত্র কিংবা যোগদানপত্র জমাদানের তারিখের পর ৩০তম দিবসে এই কনভেনশটি বলবৎ হবে।

www.pathagar.com

তার আয়ত্তাধীন সকল উপায়ে ঘোষণাটির বিধানাবলির কার্যকর করা—সেই সিদ্ধান্ত-প্রস্তাবের কথা মনে রেখে ;

উপরে উল্লিখিত ২১০৬ ক (২০) নম্বর সিদ্ধান্ত–প্রস্তাবের সহিত সংযুক্ত 'সকল প্রকার জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন'-এর ১৫ অনুচ্ছেদের কথা মনে রেখে ;

সাধারণ পরিষদ ঔপনিবেশিক শাসনাধীন দেশসমূহের জনসাধারণের নিকট হতে আবেদন গ্রহণ ও পরীক্ষা করার জন্য অন্যান্য সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে তা স্মরণ করে ;

'সকল প্রকার জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন' দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ কমিটি' এবং ঔপনিবেশিক শাসনাধীন দেশসমূহের জনসাধারণের নিকট হতে আবেদন গ্রহণ ও পরীক্ষা করার দায়িত্বে নিয়োজিত জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে নিবিড় সহযোগিতা এই 'কনভেনশন' এবং 'ঔপনিবেশিক শাসনাধীন দেশ ও জনগোষ্ঠীসমূহকে স্বাধীনতাদান সংক্রান্ত ঘোষণা' উভয়েরই লক্ষ্যসমূহ অর্জন সহজসাধ্য করবে, এই সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে ;

সকল রকমের জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ মৌলিক মানবিক অধিকারসমূহের বাস্তবায়ন এবং মানব ব্যক্তিত্বের মর্যাদা ও মূল্যের নিশ্চয়তার জন্য অত্যাবশ্যক এবং জাতিসংঘ সনদের অধীনে একটি অগ্রগণ্য দায়িত্ব, এই কথা স্বীকার করে ;

(১) মহাসচিবকে, 'জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ কমিটি'র নিকট নির্দিষ্ট সময় অন্তর অথবা তার অনুরোধ মতো, 'সকল প্রকার জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশনে'র ১৫ অনুচ্ছেদের সাথে প্রাসঙ্গিক যে–সকল তথ্য তার নিকট থাকবে সেই সকল তথ্য প্রদানের আহ্বান জানাচ্ছে ;

(২) 'ঔপনিবেশিক শাসনাধীন দেশ ও জনগোষ্ঠীসমূহকে স্বাধীনতাদানের বাস্তবায়নজনিত পরিস্থিতি সম্পর্কিত বিশেষ কমিটি' এবং ঔপনিবেশিক শাসনাধীন দেশসমূহের জনসাধারণের নিকট হতে আবেদন গ্রহণ ও পরীক্ষা করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থাসমূহকে অনুরোধ করছে যে তারা যেন জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ কমিটির নিকট নির্দিষ্ট সময় অন্তর অথবা তার অনুরোধমতো, এই কনভেনশনের সাথে প্রাসঙ্গিক জনগোষ্ঠীসমূহের নিকট হতে প্রাপ্ত আবেদনসমূহের প্রতিলিপি এর (কমিটির) মন্তব্য ও সুপারিশের জন্য প্রেরণ করে ;

(৩) উপরোক্ত (২) পরিচ্ছেদে উল্লিখিত সংস্থাসমূহকে অনুরোধ করছে যে, তারা যেন সাধারণ পরিষদের নিকট তাদের বাৎসরিক রিপোর্টে বর্তমান সিদ্ধান্ত–প্রস্তাবের শর্তাবলীর অধীনে গৃহিত ব্যবস্থাসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করে।

আবুল ফজল হক–এর আন্তর্জাতিক আইনের মূল দলিল গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

www.pathagar.com

সার সংক্ষেপ

মানাবাধিকার ঘোষণার প্রথম অনুচ্ছেদের মূল বক্তব্য দুটি ঃ (১) জন্মগতভাবে মানুষ স্বাধীন এবং সমমর্যাদা সম্পন্ন এবং (২) তারা বিবেক ও বুদ্ধিসম্পন্ন। এই বক্তব্য দু'টি সকল মানবাধিকারের মূল ভিত্তি। যেহেতু জন্মগতভাবে স্বাধীন এবং সমমর্যাদাসম্পন্ন সেহেতু স্বাধীনতা ও সমতা তাদের সহজাত ও অবিচ্ছেদ্য অধিকার। দ্বিতীয়ত, যেহেতু মানুষ যুক্তি ও বিবেক নিয়ে জন্মেছে সেহেতু তারা, যে সব প্রাণীর এই গুণগুলি নেই, সেইসব প্রাণী থেকে পৃথক ; সেই কারণে এই অধিকারগুলোও তাদের সহজাত এবং অবিচ্ছেদ্য।

মানবাধিকার ঘোষণার ৩ থেকে ২১ অনুচ্ছেদে সকল মানুষের পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এই অধিকারসমূহের মধ্যে আছে জীবন, স্বাধীনতা, নিরাপত্তা, দাসত্বহীনতা, অবমাননাকর শাস্তি থেকে নিরাপত্তা, আইনের সমক্ষে সমতা, বিচার, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, জাতীয়তা, বিবাহ, সম্পত্তি, বাক্‌স্বাধীনতা, সমাবেশ, সরকারে অংশগ্রহণ এবং সরকারি চাকুরিতে প্রবেশের অধিকার।

মানবাধিকার ঘোষণার ২২ থেকে ২৭ অনুচ্ছেদে ঘোষিত হয়েছে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার। শেষ ৩টি অনুচ্ছেদ আছে মানবাধিকারের পূর্ণতা ও সীমায়নের অধিকার।

এই যে অধিকারগুলোর কথা বলা হলো, এগুলোর ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য করা যাবে না, সেই ঘোষণাই দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮ নং অনুচ্ছেদে এই বৈষম্যহীনতার নীতি গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে ৫টি কারণে বৈষম্য নিষিদ্ধ। সেগুলো হচ্ছে, (১) ধর্ম, (২) গোষ্ঠী, (৩) বর্ণ, (৪) নারী-পুরুষভেদ এবং (৫) জন্মস্থান। মানবাধিকার ঘোষণার এই অনুচ্ছেদে এ পাঁচটি তো আছেই এবং আছে আরো পাঁচটি। সেগুলো হচ্ছে—(১) ভাষা, (২) রাজনৈতিক বা অন্য কোন মতবাদ (৩) জাতীয় বা সমাজিক উৎপত্তি (৪) সম্পত্তি এবং (৫) অন্য মর্যাদা। এই অনুচ্ছেদে আরো বলা হয়েছে যে, স্বাধীন দেশের মানুষ নয় এমন ব্যক্তিও এই বৈষম্যহীনতার অধিকার পাবেন।

বৈষম্যহীনতা বলতে, অধিকার বন্টনের ও সীমায়নের ব্যাপারে একজনের সঙ্গে একরকম আর অন্যরকম না করাকে বোঝায়। অধিকার প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে, তা সে আইনের দ্বারাই হোক আর নির্বাহী নির্দেশের দ্বারাই হোক, মানুষের মধ্যে বৈষম্য নিষিদ্ধ।

ধর্মের কারণে পৃথিবীতে বৈষম্যের শিকার, বিংশ শতাব্দীর দ্বার প্রান্তে এসেও, অনিঃশেষিত। ইসরাইল, নেপাল, পাকিস্তান প্রভৃতি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র, সেইসব দেশে রাষ্ট্রধর্ম বহির্ভূত ব্যক্তিদের উপর বৈষম্য প্রদর্শন অস্বাভাবিক নয়। শুধুমাত্র ধর্মবিশ্বাসের কারণে এক সম্প্রদায়ের মানুষ কর্তৃক অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ লাঞ্ছিত হওয়ার উদাহরণও বিরল নয়। আলজিরিয়ার মৌলবাদিগণ এবং পাকিস্তানে কাদিয়ানিগণ বোধ হয় বৈষম্যের শিকার। গোষ্ঠী ও বর্ণের কারণে দক্ষিণ আফ্রিকা

www.pathagar.com

রক্তাক্ত। লিঙ্গভেদের বৈষম্য প্রশমনের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলেও এই বৈষম্য অপ্রকট নয়। জন্মের কারণে, একটি বিশেষ গোত্র বা পরিবারে জন্ম হওয়ার কারণে বৈষম্য আজো জগৎজোড়া। এইসব বৈষম্যের বিরুদ্ধে সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা সোচ্চার এবং উচ্চকণ্ঠ।

বৈষম্য এবং পার্থক্য এক নয়। মানুষে মানুষে পার্থক্য আছে এবং সে পার্থক্য এসেছে প্রকৃতি থেকে। প্রকৃতিদত্ত সে পার্থক্য অস্বীকার করা যায় না। নারী ও পুরুষ সমান কিন্তু অভিন্ন নয়। (equal but not identical) শিশু এবং যুবক অধিকারে সমান কিন্তু শক্তিতে ভিন্ন। বার্ট্রান্ড রাসেল এবং গোবিন্দচন্দ্র দেব দার্শনিক কিন্তু তাদের স্তরভেদ আছে। এই স্তরভেদের স্বীকৃতি বৈষম্য নয়।

মানুষ মানুষই। স্বাধীন দেশের মানুষের সাথে পরাধীন দেশের মানুষের কোন তফাৎ নেই। কোন স্থানে মানুষ জন্মাবে তার উপরে মানুষের হাত নেই। বাংলাদেশের মতো স্বাধীন দেশে, হংকং-এর মতো বৃটিশ উপনিবেশে কিংবা ইসরাইল অধিকৃত গাজায় যারা জন্মগ্রহণ করছে তারা নিজের ইচ্ছায় ঐ সব দেশে জন্মায় নি। ঐ সব স্থানে জন্মগ্রহণের জন্য তাদের কোন বৈষম্যের শিকার হওয়া উচিত নয়। ঐসব স্থানে জন্মের কারণে বৈষম্যের শিকার হওয়ার মতো কোন অপরাধ তারা করে নি। পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানুষের স্রষ্টা এক ও অভিন্ন তাই কোন অধিকারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার বৈষম্য স্রষ্টার সৃষ্টির মর্যাদার প্রতি অবমাননা করা।

পরাধীন দেশে যাদের জন্ম, পরাধীনতার কারণেই সেখানকার মানুষ মানবাধিকার ভোগ করতে পারে না। মানবাধিকারের এই ঘোষণা পরাধীন দেশের পরাধীন মানুষের এই কলংককে ধিক্কার দেয়।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার এই অনুচ্ছেদে যে বৈষম্যহীনতার অধিকার ঘোষিত হয়েছে তা বিশ্বের প্রায় সকল দেশের লিখিত সংবিধানে গৃহীত হয়েছে। সুতরাং বৈষম্যহীনতা যেমন একটি মানবাধিকার তেমনি সংবিধানে ঘোষিত মৌলিক অধিকারও বটে।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা যেহেতু বিশ্বের প্রায় সকল দেশ অনুমোদন করেছে তাই দাবি করা যায় এই ঘোষণাগুলি আন্তর্জাতিক আইনের সূত্ররূপ আবশ্যিকভাবে গৃহীত ও প্রতিপালিত হবে। তবুও মানবাধিকারের সাথে মৌলিক অধিকারের পার্থক্য থেকেই যায়। মৌলিক অধিকার ভঙ্গ হলে আইনের আশ্রয় নেয়া যায়, কিন্তু মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার যেগুলো দেশের মৌলিক অধিকারের সদৃশ বা তুল্য নয়, সেগুলো ভঙ্গ হলে আইনের আশ্রয় দুর্লভ।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

প্রত্যেকের জীবন, স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে।

(Article 3. Everyone has the right to life, liberty and security of person.)

ভাষ্য

জীবনের অধিকার

মানুষের জন্মের পর তার সামনে একটি অনিবার্য সত্য অপেক্ষা করে, সেটি হচ্ছে মৃত্যু। 'জন্মিলে মরিতে হইবে'—এই চিরসত্যকে অস্বীকার করা যাবে না। মানুষ, সে ধনী কি গরীব, মনিব কি ভৃত্য, মালিক কি শ্রমিক, রাজা কি প্রজা, যেই হোক মৃত্যুর স্বাদ তাকে গ্রহণ করতেই হবে। কোন মানুষই ঠিক কতদিন বেঁচে থাকবে তার কোন নিশ্চিত গ্যারান্টি নেই। বিজ্ঞান অনেক অসাধ্য সাধন করেছে, কিন্তু মানুষের মৃত্যুকে রোধ করতে পারে নি। চিকিৎসাবিজ্ঞানের অভাবিত উন্নতি বিবিধ রকমের মহামারিকে রোধ করেছে, অনেক মারাত্মক রোগ প্রতিরোধ করেছে, কিন্তু তারপরও মৃত্যু মানুষের জন্য অবধারিত। যে কোন সময় যে কোন মানুষ মরে যেতে পারে, কারণে অকারণে মরতে পারে।

মানুষের এই যে মৃত্যু, যা খুব স্বাভাবিক এবং অনিবার্য তা যদি স্বাভাবিকভাবেই হয়, তাহলে বেঁচে থাকা মানুষেরা সেটাকে গ্রহণ করে সহজভাবে। অতি কাছের লোক যারা, যারা সেই মৃত ব্যক্তির আপনজন তারা তাৎক্ষণিকভাবে কিছুটা বিহ্বল হয়ে পড়লেও ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, জীবনের পথে এগিয়ে চলে, কারো জন্য আটকায় না কেউ। এমনিভাবে হাজার হাজার বছর ধরে এই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে অসংখ্য মানুষের আগমন আর নির্গমন ঘটছে। জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই খেলা চলে আসছে। অনাদিকাল থেকে এবং সম্ভবত অনন্তকাল পর্যন্ত চলবে। তাই একটি বিষয়ে দুনিয়ার তাবৎ মানুষ একমত, সেটা হচ্ছে, 'মানুষ মরণশীল।'

www.pathagar.com

'মানুষ মরণশীল' সকল মানুষই মৃত্যুবরণ করবে একথা সকলে একবাক্যে মেনে নিলেও যখন কোন মানুষ অস্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করে, যখন কাউকে মেরে ফেলা হয়, তখন সেটাকে সহজভাবে গ্রহণ করা হয় না। মৃত্যু অনাকাঙ্ক্ষিত এবং দুঃখজনক। তাই কাউকে তার স্বাভাবিক জীবন থেকে বঞ্চিত করা অপরাধ। আইন প্রতিটি মানুষের স্বাভাবিক জীবন ধারণের নিশ্চয়তা বিধান করে। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের আলোচ্য এই অনুচ্ছেদে 'প্রত্যেকের জীবন ধারণের' অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

স্বাধীনতার অধিকার

এই অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হচ্ছে 'স্বাধীনতার অধিকার।'

মানুষ জন্ম নেয় স্বাধীন সত্তা নিয়ে। কিন্তু যুগে যুগে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য স্বাধীন মানুষের ঘাড়ে জুড়ে দেয় পরাধীনতার নির্মম জোয়াল। এই পরাধীনতা মানুষের জীবনের স্বাভাবিক বিকাশকে করেছে বাধাগ্রস্ত। পরাধীনতা হচ্ছে মানব জীবনের জন্য সবচেয়ে বড় অভিশাপ। দু'বেলা খাবারের নিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও কোন বুভূক্ষ কারাবাসকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে না।

আদিম যুগে মানুষ যখন বনে জঙ্গলে বাস করতো তখনো সে ছিল নিতান্তই স্বাধীন। মুক্ত বিহঙ্গ যেমন নীলাকাশের বুকে পরম আনন্দে ডানা মেলে উড়ে বেড়ায় তেমনি মানুষও নদীর তীরে, বনে-জঙ্গলে অথবা গুহায় পরম আনন্দে মনের সুখে ভোগ করতো তার স্বাধীনতা। কিন্তু ক্রমেই মানুষ যখন বাড়তে থাকলো তখন সবল আধিপত্য বিস্তার করলো দুর্বলের উপর। সম্পদ এবং ক্ষমতা কুক্ষিগত হতে লাগলো কতিপয় মানুষের হাতে, আর শক্তিশালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিজের বা নিজেদের প্রভুত্ব খাটিয়ে হরণ করলো দুর্বলের অধিকার। এভাবেই যখন মানুষের জন্মগত স্বাধীনত থেকে মানুষকে বঞ্চিত করলো মানুষ নামের কতিপয় সুবিধাভোগী স্বার্থান্বেষী নিপীড়ক, উৎপীড়ক লোক, তখন শুরু হলো স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম। ব্যক্তিগত এবং জাতিগত স্বাধীনতা হরণের অপচেষ্টা আর তাকে পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম চলতে লাগলো যুগপৎভাবে। সভ্যতার বিকাশের ফলে মানুষ অর্জন করলো মুক্ত পরিবেশ, নির্বিঘ্নে, নিরাপদে জীবন যাপনের সভ্যতাসম্মত নীতিমালা। বিগত দু'তিন শতাব্দী ধরে মানব সমাজ সভ্যতার একটা মাত্রায় উন্নীত হতে শুরু করে। এবং এই সময়ে পৃথিবীর দেশে দেশে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি একটা সাধারণ স্বীকৃতি আসতে শুরু করে। উনবিংশ শতাব্দীতে এসে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারকে সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করা হয়। তাই এই অধিকার মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় স্থান পেয়েছে।

www.pathagar.com

ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার

তৃতীয় যে বিষয়টির প্রতি এই অনুচ্ছেদে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেটি হচ্ছে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার।

কারাগার মানুষের কাছে যেমন অসহনীয়, তেমনি অসহনীয় পলাতক জীবন। কারাজীবনে থাকে না স্বাধীনতা, আর পলাতক জীবনে থাকে না নিরাপত্তা। আতংক, অনিরাপত্তাবোধ কারাবাসের চেয়েও কষ্টকর। প্রত্যেক মানুষই তার জীবনের নিরাপত্তা চায় ; নিরাপত্তা চায় পরিবারের, সন্তানের, সম্পত্তির এবং সম্মান ও মর্যাদার। নিরাপত্তাহীনতা যদি তাড়া করে বেড়ায় সর্বক্ষণ তাহলে জীবন হয়ে ওঠে অসহনীয়। জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ হয় বাধাগ্রস্ত।

মানুষের জীবন, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার মূলনীতি এখন আর দর্শনের পুস্তকে বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধ নয়, এখন এগুলো জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অনুমোদিত, সমর্থিত ও স্বীকৃত অধিকার। কোন মানুষ যতক্ষণ অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করবে, আইন লঙ্ঘন না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে জীবন যাপন করার জন্মগত অধিকারে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা থেকে আলোচ্য অনুচ্ছেদে এই তিনটি অধিকার তথা—জীবন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। পৃথিবীকে মানুষের নিরাপদ আবাস হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এই অধিকারের প্রতি বিশ্ববাসির কার্যকর স্বীকৃতি ও মান্যতা অর্জনের জোর প্রচেষ্টা চালানো দরকার।

এই অনুচ্ছেদ ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের অনুচ্ছেদ-৩ এর প্রতিফলন ঘটেছে বাংলাদেশের সংবিধানের 'মৌলিক অধিকার' শীর্ষক তৃতীয় ভাগের অনুচ্ছেদ ৩২-এ। এতে বলা হয়েছে, 'আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।'

বাংলাদেশের সংবিধানের এই অনুচ্ছেদে জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার বর্ণিত হয়েছে। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অন্য কারো জীবন বা স্বাধীনতা বিপন্ন করতে পারে না, জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হ্রাস, খর্ব বা বিনষ্ট করবার অধিকার আছে একমাত্র আইনের।

আইন বলতে এখানে সংসদীয় আইনকে বোঝানো হয়েছে। সংবিধান কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সংসদ যে আইন প্রণয়ন করবেন সে আইনের দ্বারা ব্যক্তির জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করা যায়। সংসদ অন্য কাউকে যদি আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করেন এবং প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কোন অধীন সংস্থা যদি আইন প্রণয়ন করেন তবে সে আইনের দ্বারা এই অনুচ্ছেদের রক্ষাকবচ নষ্ট করা যাবে না। পূর্বতন সংবিধানের নজীর বর্তমানে গ্রাহ্য নাও হতে পারে।

www.pathagar.com

জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার ব্যাপারে সংবিধান সংসদকে চরম ক্ষমতা দিয়েছে, আদালতকে নয়। নির্বাহি বিভাগের ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কীয় আতিশয্যের বিরুদ্ধে এই অনুচ্ছেদ রক্ষাকবচ প্রদান করেছে। সংসদীয় ক্ষমতা এর দ্বারা ক্ষুণ্ন হয় নি।

বাংলাদেশের সংবিধানের আলোচ্য অনুচ্ছেদে প্রদত্ত অধিকারের মধ্যে দু'টি অর্থ নিহিত আছে। একটি হাঁ সূচক এবং অপরটি না বাচক। হাঁ বাচক অর্থে এই অধিকার ঘোষণা দিয়েছে যে, আইনের মাধ্যমে মানুষকে জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যায়।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি পরিষ্কার করা যাক। সংবিধান বলছে, দবির তার জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ব্যাপারে মৌলিক অধিকার লাভ করবেন। দবিরকে কেহ মেরে ফেলবে না বা ঘরে আটকে রাখবে না, এটা তার অধিকার। যে মুহূর্তে অধিকারের কথা আসল, সে মুহূর্তে কর্তব্যের কথা এসে পড়ল। অধিকার ও কর্তব্য পরস্পরের পরিপূরক। এখানে দবিরের জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার বিপরিতে তার কর্তব্য হচ্ছে সে কাউকে মেরে ফেলবে না, কাউকে আটকে রাখবে না। দবির যদি সাবেতকে মেরে ফেলে তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড পেতে হবে। তাকে জীবন থেকে বঞ্চিত করা হবে। দবির যদি সাবেতকে আটকে রাখে তবে তাকে কারাদণ্ড দেয়া হবে। ফলে তাকে ব্যক্তিস্বাধীনতাহীন জীবন যাপন করতে হবে।

এই উদাহরণ থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, কর্তব্য পালন না করলে অধিকারের দাবি অর্থহীন ও অযৌক্তিক হয়ে পড়ে। আইন আরোপিত বিধিমালা লঙ্ঘন করলেও কর্তব্য পালন না করলে তাকে শাস্তি দিবার বিধান আইনে রয়েছে।

বিষয়টিকে একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখা যেতে পারে। সংবিধান মানব জীবনকে মহাপবিত্র বলে ঘোষণা করেছে। সে কারণে একদিকে যেমন জন্ম থেকে জীবনের যে প্রসারিত প্রবাহ, তাকে অবিরাম অক্ষুণ্নভাবে বহমান রাখার অধিকার স্বাভাবিক মানুষের জন্য মৌলিক। অন্যদিকে যে সব মানুষ অসংযত অজুহাতে, অযৌক্তিকভাবে অন্য মানুষের জীবন হরণ করে, সমাজ জীবন থেকে তাকে অপসারণ আইনের বিধান। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই নরহত্যার অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে।

বাংলাদেশে মৃত্যুদণ্ড

প্রসঙ্গত উল্লেখ যে, বাংলাদেশের দণ্ডবিধিতে ছয়টি অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে ঃ

১. রাষ্ট্রদ্রোহিতা ;

২. মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া ;

৩. খুন ;

www.pathagar.com

৪. নাবালক বা উম্মাদের আত্মহত্যায় সহায়তা ;

৫. যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির নরহত্যার প্রমাণ ;

৬. নরহত্যার সাথে ডাকাতি।

বিস্ফোরক দ্রব্য বা এসিড নিক্ষেপ বা যৌতুকের জন্য বধূ হত্যা প্রভৃতির জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান করা হয়েছে।

যেমন জীবন তেমন স্বাধীনতা। যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মানুষে পেয়েছে প্রকৃতির নিকট হতে, সেগুলো ব্যবহারের সুযোগ লাভ এবং ব্যবহারে বাধা না পাওয়ার অধিকার তার স্বাভাবিক জীবন পরিচালনার অঙ্গ। তাই এই অধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে গণ্য। কিন্তু যে অন্যের ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করে, আইন তার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করার নির্দেশ দেয়।

জীবনের নিরাপত্তা

একটু অন্যভাবে বিষয়টিকে দেখা যায়। সভ্য সমাজে স্বাধীন মানুষরূপে বাঁচতে হলে প্রয়োজন জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার নিশ্চয়তা। এজন্য দরকার সামাজিক নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা। এর অর্থ হচ্ছে অন্যের দ্বারা বাধাগ্রস্ত না হওয়া। যে সকল মানুষ অন্যের জীবনের বা ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করে তার জীবন ও স্বাধীনতা আইন দ্বারা খর্ব করা হলে সমাজে শৃঙ্খলা আসে। দবির ও সাবেত এই দুজনের স্বাধীনতার মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হলে আইন তার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।

এবারে আমরা এই বিষয়টির না-বোধক বা নেতিবাচক দিকটি বিশ্লেষণ করি। কোন মানুষের জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা নষ্ট করতে হলে তা আইনের মাধ্যমে করতে হবে। নিম্নপদস্থ কর্মচারী বেয়াদবি করলে ক্ষুব্ধ হয়ে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা কর্মচারী তাকে হাজতে পাঠিয়ে দিলেন, এরূপ কাজ অবৈধ। প্রকৃত কথা হচ্ছে জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করা বৈধ, কিন্তু তা করতে হবে আইনের মাধ্যমে। প্রধান মন্ত্রী, সচিব, পুলিশের ইনস্‌পেক্টর জেনারেল এমনকি রাষ্ট্রপতিও কোন মানুষকে জেলে পাঠিয়ে দিতে পারেন না, ফাঁসির হুকুম দিতে পারেন না।

কোন ব্যক্তির জীবন ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করতে হলে যে আইনের মাধ্যমে তা করতে হয়, সেই আইন সংবিধান প্রদত্ত সীমার অন্তর্গত হতে হবে। সংসদ এই মর্মে একটি আইন পাস করল যে, যে ব্যক্তি সরকারের কাজকে মন্দ বলবে তার ছয় মাসের জেল হবে এবং সে আইনানুযায়ী একজনকে গ্রেফতার করা হলো, এই কর্মটি আইনানুযায়ী হলেও যেহেতু আইনটি সংবিধান সম্মত নয় সেহেতু তা অবৈধ।

যদি কোন রুল বা বিধি বলে কারো ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খর্ব করতে চাওয়া হয় তবে সে রুলটি আইনানুগ হতে হবে। রুলের মধ্যে যদি এমন কিছু থাকে যা মূল আইন বহির্ভূত তবে সে রুল

www.pathagar.com

কার্যকর নয়। উপমহাদেশের উচ্চ আদালতসমূহ বলেছে যে, যে আসামির পলায়ন করবার আশংকা নেই তাকে হাতকড়া বা হ্যান্ডকাপ পরানো অন্যায়। শুধু তাই নয়, যে আইন বা রুল বলে কারো ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে সেই আইন বা রুলের ব্যাখ্যা উদার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

যে কার্যবিধির মাধ্যমে কোন ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করা হয় সেই কার্যবিধি আইন ও বিবেক সম্মত হবে এটাই সকলের কাম্য। কোন অভিযোগে কাউকে গ্রেফতার করতে হলে তাকে নোটিশ দিতে হয়। সাক্ষ্য প্রমাণ হয়ে গেলে তার শেষ বক্তব্য শুনতে হয়। এই সকল বিধান কার্যবিধিতে থাকা আবশ্যক। সর্বোপরি আইন প্রয়োগের বেলায় সততা থাকতে হবে, বিচার নিরপেক্ষ হবে, বিচার মুক্ত আদালতে হবে, জনতার চাপ, প্রেসার ও ক্ষমতার প্রভাব থেকে বিচারককে মুক্ত থাকতে হবে। এবং বিচার্য বিষয়ে কোন বিচারকের স্বার্থ থাকবে না।

জীবন ও ব্যক্তির স্বাধীনতার সংরক্ষণের অধিকার এই অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু। জীবন বলতে কোন রকমে বেঁচে থাকা নয়। যেসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে মানব দেহ গঠিত এবং যে সকল ব্যক্তি নিয়ে মানুষের সুখের পৃথিবী তার সবগুলো মিলেই জীবন। এসবের অধিকারই জীবনের অধিকার। তাই বলে জীবিকার অধিকার আর জীবনের অধিকার এক নয়।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলতে স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার, অবরুদ্ধ না হওয়ার অধিকার, শাস্তি না পাওয়ার অধিকার, গ্রেফতার না হওয়ার অধিকার ইত্যাদিকে বোঝায়।

বঞ্চনা

এবারে দেখা যাক বঞ্চনা বলতে কি বোঝায়? সাধারণভাবে হরণ করাকে বঞ্চনা বলে। কোন ব্যক্তির জীবন বা স্বাধীনতার হানি ঘটানোর জন্য সুনির্দিষ্ট আইন থাকা প্রয়োজন। পরিস্থিতি বিস্ফোরন্মুখ এবং তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে অনর্থ ঘটে যেতে পারে এই অজুহাতে মানুষের স্বাধীনতা হরণ করা যায় না। এখানে আইন বলতে সংসদীয় আইন, অধ্যাদেশ এবং বিধান, প্রবিধান প্রভৃতি বোঝায়। ন্যায় বিচারের নামে এর বহির্ভূত কোন কিছু করা সিদ্ধ নয়। আইন বলে নি কিন্তু বিবেক বলছে এ জাতীয় যুক্তি দেখিয়ে মানুষের স্বাধীনতা হরণ করা যায় না।

একটি লোক কাহিনীর কথা বলি। মেষশাবক এসেছে নদীতে পানি খেতে। কাছাকাছি খানিকটা উজানে পানি খাচ্ছিল এক নেকড়ে। নরম পুষ্ট মেষ শাবককে দেখে নেকড়ের ভীষণ লোভ হল। সে শাবকটিকে বলল, 'তুই পানি ঘোলা করছিস্ কেন?' শাবকটি কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'পানির স্রোততো ভাটির দিকে যাচ্ছে। আপনার এদিকে নয়, তাছাড়া আমি আস্তে আস্তে খাচ্ছি, পানি ঘোলা করছি না, আপনি মিছামিছি রাগ করছেন।' নেকড়ে চিৎকার করে বলল, 'তুই না করে থাকলে তোর বাপ করেছিল।' এই বলে নেকড়ে শাবকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

www.pathagar.com

এরূপ ঘটনা আমাদের সমাজে বিরল নয়। মিথ্যা অজুহাতে গ্রেফতার এবং দলাদলির কারণে মামলা হামেশাই হচ্ছে। এগুলি সংবিধান ও আইন বিরোধী।

বাংলাদেশের দণ্ডবিধিতে জীবন রক্ষা ও নিরাপত্তার অধিকার ভঙ্গকারির শাস্তির বিধান রয়েছে। দণ্ডবিধির ষোড়শ পরিচ্ছেদ মানবদেহ সংক্রান্ত এবং জীবন ক্ষুণ্নকারি অপরাধ সংক্রান্ত দণ্ডের বিধান দিয়েছে। খুন, আঘাত, গর্ভপাত, প্রভৃতি কর্মের জন্য শাস্তির বিধান এই পরিচ্ছেদে রয়েছে। প্রাসঙ্গিক বিধায় মৎপ্রণীত 'দণ্ডবিধির ভাষ্য' থেকে মানবদেহ সংক্রান্ত ও জীবন ক্ষুণ্নকারি অপরাধ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদের সারসংক্ষেপ এখানে পরিবেশিত হল।

মানবদেহ সংক্রান্ত অপরাধসমূহ ঃ

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদে এইসকল অপরাধ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাদিগকে নিম্নলিখিত শ্রেণীসমূহে বিভক্ত করা যায় ঃ

১. দণ্ডার্হ নরহত্যা, খুন, খুন বলিয়া গণ্য নহে এইরূপ দণ্ডার্হ নরহত্যা এবং বেপরোয়া বা তাচ্ছিল্যপূর্ণ কাজ দ্বারা নরহত্যা;

২. আত্মহত্যা;

৩. গর্ভপাতকরণ;

৪. আঘাত;

৫. অবৈধ বাধা ও অবৈধ অবরোধ;

৬. অপরাধমূলক বল প্রয়োগ ও আক্রমণ;

৭. মনুষ্যহরণ ও নারী বা শিশু হরণ;

৮. দাসত্ব ও জবরদস্তিমূলক শ্রম;

৯. নারী ধর্ষণ;

১০. অস্বাভাবিক অপরাধসমূহ;

১১. ঠগ।

দণ্ডার্হ নরহত্যা ও খুন

২৯৯ ধারায় দণ্ডার্হ নরহত্যা এবং ৩০০ ধারায় খুন সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি বর্ণিত কোন কাজের সাহায্যে কাহারও মৃত্যু ঘটায় দণ্ডার্হ নরহত্যার অপরাধ অনুষ্ঠান করে বলিয়া গণ্য হইবে ঃ

(১) মৃত্যু ঘটাইবার উদ্দেশ্যে কৃত কাজ;

www.pathagar.com

(২) মৃত্যু ঘটাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে এইরূপ দৈহিক জখম ঘটাইবার উদ্দেশ্যে কৃত কাজ ; অথবা

(৩) মৃত্যু ঘটাইতে পারে এমন সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া জানিয়া কৃত কাজ। প্রথম দফাদ্বয়ের যে কোনটির অধীনে অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকিলে তজ্জন্য শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা দশ বৎসরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড ; আর তৃতীয়দফার অধীনে দশ বৎসরের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড ; আর তৃতীয় দফার অধীনে দশ বৎসরের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ড (ধারা ৩০৪)।

যে ব্যক্তি নিম্নরূপ কোন কাজের সাহায্যে কাহারও মৃত্যু ঘটায়, সে খুনের অপরাধ অনুষ্ঠান করে বলিয়া গণ্য হইবে ;

(১) মৃত্যু ঘটাইবার উদ্দেশ্যে কৃত কাজ ;

(২) এইরূপ দৈহিক জখম করিবার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত কাজ, যাহা যে ব্যক্তির ক্ষতিসাধন করা হয়, তাহার মৃত্যু ঘটাইতে পারে বলিয়া অপরাধকারীর জানা থাকে ;

(৩) দৈহিক জখম করিবার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত কাজ, কিন্তু অভীষ্ট দৈহিক জখমটি প্রকৃতির স্বাভাবিক অবস্থায় মৃত্যু ঘটাইবার জন্য যথেষ্ট নহে ; অথবা

(৪) যে কাজের সম্পাদনকারী ব্যক্তি অবগত থাকে যে, ইহা এত আসন্ন বিপজ্জনক যে, ইহা খুব সম্ভবত মৃত্যু ঘটাইবে, অথবা এইরূপ দৈহিক জখম ঘটাইবে যাহা মৃত্যু ঘটাইতে পারে।

খুনের অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড (ধারা ৩০২)। যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি কর্তৃক অনুষ্ঠিত খুনের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড (ধারা ৩০৩)।

কোন অপরাধ দণ্ডার্হ নরহত্যার সংজ্ঞায় না পড়িয়া খুন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না ; কিন্তু খুন না হইয়াও উহা দণ্ডার্হ নরহত্যা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। হত্যা করিবার বা মৃত্যুর সম্ভাবনাপূর্ণ দৈহিক জখম করিবার উদ্দেশ্যে অথবা খুন সম্ভবত মৃত্যুই হইবে উহার অনিবার্য পরিণতি—ইহা জানা থাকা সত্ত্বেও কৃত সকল হত্যাকাণ্ড আপাতদৃষ্টিতে খুন বলিয়া গণ্য হইবে না—দণ্ডার্হ নরহত্যা বলিয়া গণ্য হইবে। সেখানে 'মৃত্যু ঘটাইবার উদ্দেশ্যে' কাজটি করা হয় নাই, সেখানে দণ্ডার্হ নরহত্যা ও খুনের মধ্যকার পার্থক্য কেবল মৃত্যুর সম্ভাবনার পরিমাণের উপর নির্ভর করে। যখন অপরাধকারীর এইরূপ জানা থাকে যে, তাহার কাজের সম্ভাব্য পরিণতি মৃত্যু হইতে পারে, তখন উক্ত অপরাধ দণ্ডার্হ নরহত্যা। আর যখন এইরূপ জানা থাকে যে, তাহার কাজের পরিণতিতে মৃত্যুর অত্যন্ত সম্ভাবনা রহিয়াছে তখন তাহা খুন।

কোন ব্যক্তির কল্পনা-শক্তি বা ভাবাবেগের উপর প্রতিফলিত কথার ফলাফল দ্বারা মৃত্যু সংঘটিত হইলে তাহা দণ্ডার্হ নরহত্যা বলিয়া গণ্য হইবে। কেহ যদি কোন অপরাধ অনুষ্ঠানে নিয়োজিত থাকিয়া সম্পূর্ণ দুর্ঘটনাবশত কাহারও মৃত্যু ঘটায় তবে সে উক্ত অপরাধেরই শাস্তি ভোগ করিবে : দুর্ঘটনাবশত মৃত্যুর জন্য কোন অতিরিক্ত শাস্তি ভোগ করিতে হইবে না। দণ্ডার্হ নরহত্যার

www.pathagar.com

জন্য মৃত্যু ঘটাইবার উদ্দেশ্যে জ্ঞান বা সম্ভাব্যতা থাকিবার প্রয়োজন। ইহার কোনটির অবর্তমানে যদি কাহারও মৃত্যু ঘটে তবে তাহা আঘাত বা গুরুতর আঘাতের অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে ; যেমন—প্লীহা রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে লাথি দ্বারা মৃত্যু ঘটান।

যে ব্যক্তি ব্যাধি বা দৈহিক বৈকল্যে ভুগিতেছে এইরূপ অপর কোন ব্যক্তিকে দৈহিক জখম করে এবং তদ্দ্বারা উক্ত ব্যক্তির মৃত্যু ত্বরান্বিত করে, সে নরহত্যার অপরাধে দোষী (ব্যাখ্যা ১)। অনুরূপভাবে, যেই ক্ষেত্রে দৈহিক জখমের ফলে মৃত্যু ঘটে সেইক্ষেত্রে যেই ব্যক্তি উক্ত জখম করে সেই ব্যক্তি এই অপরাধে দোষী হইবে, যদিও যথাযথ প্রতিকার ও নিপুণ চিকিৎসার আশ্রয় লইলে মৃত্যু নিরারণ করা যাইত (ব্যাখ্যা ২) । মাতৃগর্ভস্থ শিশুর মৃত্যুর ঘটানো নরহত্যা নহে। কিন্তু কোন জীবন্ত শিশুর মৃত্যু ঘটানো নরহত্যা বলিয়া গণ্য হইবে, যদি উক্ত শিশুর কোন অংশ প্রসূত হইয়া থাকে, যদিও শিশুটি শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ বা সম্পূর্ণরূপে জন্মগ্রহণ না করিয়া থাকে (ব্যাখা ৩)।

অপরাধকারীর আক্রমণের ভয়ে মৃত ব্যক্তির স্বেচ্ছাকৃত কাজের ফলে তাহার মৃত্যু ঘটিলে এই অপরাধ অনুষ্ঠিত হইবে। উদাহরণস্বরূপ চার-পাঁচ জন লোক যদি কাহাকেও ঘিরিয়া হুমকি প্রদর্শন করিয়া তাহার জীবন বিপন্ন করিবে বলিয়া তাহার মনে বিশ্বাস জন্মায়, এবং ফলে সে উঁচু স্থান হইতে নিচে লাফাইয়া পড়িয়া মৃত্যুবরণ করে, তবে হুমকিদানকারী ব্যক্তি খুনের অপরাধে দোষী হইবে।

ঘটনাক্রমে যাহাকে জখম করিবার উদ্দেশ্য ছিল তাহার জখম না হইয়া অন্য ব্যক্তির হইলেও অপরাধকারীর দায়িত্বে কোনরূপ তারতম্য হইবে না (ধারা ৩০১)।

ব্যতিক্রম ঃ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে দণ্ডার্হ নরহত্যা খুন বলিয়া গণ্য নহে ঃ

১। **উত্তেজনা ঃ** গুরুতর ও আকস্মিক উত্তেজনার ফলে অপরাধকারী আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারাইয়া কাহারও মৃত্যু ঘটাইলে দণ্ডার্হ নরহত্যা খুন বলিয়া গণ্য হইবে না, তবে শর্ত এই যে, উক্ত উত্তেজনা—

(ক) কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিবার বা তাহার কোন ক্ষতি সাধন করিবার অজুহাত হিসাবে অপরাধকারী কর্তৃক যাচ্ঞা করা বা স্বেচ্ছাকৃতভাবে উদ্দীপ্ত করা হইলে চলিবে না,

(খ) আইন পালনার্থ কৃত কোন কার্য দ্বারা বা কোন সরকারি কর্মচারী কর্তৃক তাহার আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে প্রদত্ত হইলে চলিবে না ;

(গ) ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকারের আইনানুগ প্রয়োগের ব্যাপারে কৃত কোন কার্য দ্বারা প্রদত্ত হইলে চলিবে না।

গালাগালি হইতে সৃষ্ট উত্তেজনা গুরুতর বলিয়া বিবেচিত স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতাও উত্তেজনার একটি সাধারণ কারণ।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আঘাত ঃ যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তির (১) দৈহিক যন্ত্রণা (২) পীড়া বা (৩) বৈকল্য ঘটায়, সেই ব্যক্তি আঘাত দান করে বলিয়া গণ্য হইবে (ধারা ৩১৯)।

যে ব্যক্তি (ক) কোন কাজের সাহায্যে কোন ব্যক্তিকে আঘাত করিবার উদ্দেশ্যে বা (খ) তদ্দ্বারা তাহার কোন ব্যক্তিকে আঘাত করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া অনুরূপ কাজ সম্পাদন করে এবং তদ্দ্বারা কোন ব্যক্তিকে আঘাত দান করে বলিয়া গণ্য, সেই ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত দান করে বলিয়া গণ্য হইবে (ধারা ৩২১)।

যে সকল কাজ আঘাত বলিয়া গণ্য হইবে তাহা আক্রমণরূপেও গণ্য হইতে পারে। কিন্তু আক্রমণ নহে এমন অনেক কাজ দ্বারাও আঘাত সংঘটিত হইতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তি খাদ্যে বিষ মিশাইয়া উহা অপরের টেবিলের উপর রাখে অথবা যে ঘাসের উপর দিয়া কেহ হাঁটিতে অভ্যস্ত, সেই ঘাসের মধ্যে যে ব্যক্তি ছুরি লুকাইয়া রাখে অথবা যে ব্যক্তি অপরকে ফেলিবার জন্য রাস্তায় কূয়া খোঁড়ে, সেই ব্যক্তি আঘাত দানের অপরাধে দোষী, আক্রমণের অপরাধে দোষী নহে।

গুরুতর আঘাত ঃ নিম্নোক্ত শ্রেণীর আঘাতসমূহই কেবল গুরুতর বলিয়া পরিগণিত ঃ

১. পুরুষত্বহীনকরণ।

২. স্থায়ীভাবে দুই চোখের যে কোনটির দৃষ্টিশক্তি রহিতকরণ।

৩. স্থায়ীভাবে দুই কর্ণের যে কোনটির শ্রুতিশক্তি রহিতকরণ।

৪. যে কোন অঙ্গ বা গ্রন্থির অনিষ্টকরণ।

৫. যে কোন অঙ্গ বা গ্রন্থির কর্মশক্তিসমূহের বিনাশ বা স্থায়ী ক্ষতি সাধনকরণ।

৬. মস্তক বা মুখমণ্ডলের স্থায়ী বিকৃতিকরণ।

৭. হাড় বা দণ্ড ভঙ্গ বা গ্রন্থিচ্যুতকরণ।

৮. যে আঘাত জীবন বিপন্ন করে বা আঘাতপ্রাপ্তব্যক্তিকে বিশ দিন মেয়াদের জন্য তীব্র দৈহিক যন্ত্রণা দান করে বা তাহাকে তাহার সাধারণ পেশা অনুসরণ করিতে অসমর্থ করে (ধারা ৩২০)।

গুরুতর আঘাতদানের উদ্দেশ্যে বা গুরুতর হইতে পারে জানিয়া স্বেচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত দানকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাতদান করা বলে (ধারা ৩২২)।

নিম্নলিখিত অপরাধসমূহ দুইটি অপরাধের মারাত্মক রূপ ঃ

(১) গুলি ছোঁড়ার, ছুরিকাঘাত করিবার বা কর্তন করিবার যে কোন যন্ত্র অথবা অন্য যে কোন যন্ত্র যাহার ব্যবহারে মৃত্যু ঘটাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে অথবা অগ্নি বা উত্তপ্ত বস্তু অথবা বিষ অথবা

www.pathagar.com

কোন বিস্ফোরক দ্রব্য অথবা কোন প্রাণীর সাহায্যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত (ধারা ৩২৪) বা গুরুতর আঘাত দান করা (ধারা ৩২৬)।

(২) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা যে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিতে স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে সেই ব্যক্তি হইলে বলপূর্বক কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানত ছিনাইয়া লইবার অথবা তাহাকে কোন অবৈধ কাজ বা কোন অপরাধ অনুষ্ঠান সুগম করিয়া দিতে পারে এইরূপ কোন কাজ করিতে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত (ধারা ৩২৭) বা গুরুতর আঘাত প্রদান করা (ধারা ৩২৯)।

(৩) কোন অপরাধ অনুষ্ঠান বা অপরাধ অনুষ্ঠানের পথ সুগম করিবার উদ্দেশ্যে বিষ অথবা কোন প্রকার সংজ্ঞা বিলোপকারী, প্রমত্তদায়ক বা ক্ষতিকর ঔষধ প্রয়োগ করিবার আঘাত দান করা (৩২৮)।

(৪) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা যে ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিতে স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে, সেই ব্যক্তি হইতে বলপূর্বক কোন অপরাধের অনুসন্ধান দিতে পারে—এইরূপ কোন স্বীকারোক্তি বা তথ্য আদায় করিবার উদ্দেশ্যে অথবা কোন সম্পত্তি ফেরত দানের বা কোন দাবি মিটাইবার জন্য তাহাকে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত (ধারা ৩৩০) বা গুরুতর আঘাত প্রদান করা (ধারা ৩৩১)।

কোন সরকারি কর্মচারীকে তাহার কর্তব্য পালনকালে অথবা তাহার কর্তব্য পালন নিরস্ত করিবার বা বাধা দান করিবার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত (ধারা ৩৩২) বা গুরুতর আঘাত প্রদান করা (ধারা ৩৩৩)।

গুরুতর বা আকস্মিক উত্তেজনাবশত আঘাত বা গুরুতর আঘাত প্রদান কঠোরভাবে দণ্ডনীয় নহে (ধারা৩৩৪ ও ৩৩৫)। মনুষ্য জীবন বা অন্যান্য লোকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিপন্নকারী বেপরোয়া বা তাচ্ছিল্যপূর্ণ কাজ প্রকৃতপক্ষে কোন ক্ষতি সাধিত না হইলেও দণ্ডনীয় (ধারা ৩৩৬), এবং উহার ফলে যদি আঘাত বা গুরুতর আঘাত প্রদান করা হয়, তাহা হইলে দণ্ড অধিকতর কঠোর হইবে (ধারা ৩৩৭ ও ৩৩৮)।

অবৈধ বাধা

কোন ব্যক্তিকে (১) তাহার যেদিকে গমনের অধিকার রহিয়াছে (২) সেই দিকে গমনে নিরস্ত করিবার জন্য (৩) স্বেচ্ছাকৃতভাবে বাধা প্রদানকে অবৈধ বাধা বলে (ধারা ৩৩৯)

কোন ব্যক্তিকে সে যখন যেখানে আইনসম্মতরূপে যাইতে পারে, উহাতে কিঞ্চিৎ বেআইনি বাধাদানও দণ্ডনীয়।

www.pathagar.com

অবৈধ অবরোধ

কোন ব্যক্তিকে (১) কোন নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ এলাকার বাহিরে গমনে নিরস্ত করিবার জন্য (২) অবৈধভাবে বাধানদানকে অবৈধ অবরোধ বলে (ধারা ৩৪০)।

অবৈধ অবরোধ এক প্রকারের অবৈধ বাধা। অবৈধ বাধা, কোন লোককে সে যেখানে থাকিতে চায়, সেখান হইতে বাহিরে রাখে। অবৈধ অবরোধ কোন লোককে, এমন সীমানার মধ্যে রাখে যেখান হইতে সে বাহিরে যাইতে চায় এবং যাইবার অধিকার থাকে।

অবৈধ অবরোধের ক্ষেত্রে পুরাপুরি বাধা থাকিতে হইবে, আংশিক বাধা হইলে চলিবে না। কেহ যদি অপর কাহারও কোন পথের এক নির্দিষ্ট দিকে বাধা দান করে এবং সে সেখানে আছে সেখানে থাকিতে দেয় অথবা অপর কোন দিকে সে ইচ্ছা করিলে যাইতে পারে, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে অবৈধ অবরোধ করা হয় না। দৈহিক শক্তি বা প্রকৃত সংঘর্ষ ব্যতীত নৈতিক শক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে অবরোধ যথেষ্ট ; বিদ্বেষ থাকিবার প্রয়োজন নাই। অবরোধের মেয়াদ দণ্ডের ব্যাপার ব্যতীত অপ্রাসঙ্গিক।

নিম্নবর্ণিত অপরাধসমূহ এই অপরাধের মারাত্মক রূপ ঃ

(১) তিন বা ততোধিক দিনের জন্য অবৈধ অবরোধ (ধারা ৩৪৩)।

(২) দশ বা ততোধিক দিনের জন্য অবৈধ অবরোধ (ধারা ৩৩৪)।

(৩) যে ব্যক্তির মুক্তিকল্পে রিট ইস্যু করা হইয়াছে, তাহার অবৈধ অবরোধ (ধারা ৩৪৫)।

(৪) কোন ব্যক্তিকে গোপনে অবৈধভাবে অবরোধ করা, যাহাতে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ পায় যেন অবরুদ্ধ ব্যক্তির প্রতি স্বার্থ সমন্বিত কোন ব্যক্তি বা কোন সরকারি কর্মচারী সেই ব্যক্তির অবরোধের কথা জানিতে না পারে (৩৪৬)।

(৫) বলপূর্বক সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানত ছিনাইয়া লইবার কিংবা অবৈধ কাজ করিতে বা কোন অপরাধ অনুষ্ঠান সুগম করিতে পারে এইরূপ কোন তথ্য প্রকাশ করিতে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে অবরোধ করা (ধারা ৩৪৭)।

(৬) বলপূর্বক কোন অপরাধের অনুসন্ধান দিতে পারে—এইরূপ কোন অপরাধ স্বীকারোক্তি বা তথ্য আদায় করিবার উদ্দেশ্যে, কিংবা কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানত প্রত্যর্পণ করিতে বা করাইতে অথবা কোন দাবি বা চাহিদা মিটাইতে কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে অবরোধ করা (ধারা ৩৪৮)।

বলপ্রয়োগ

কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির প্রতি বলপ্রয়োগ করে বলিয়া গণ্য হইবে।

(১) যদি সে উক্ত অপর ব্যক্তিকে গতিশীল করায় বা তাহার গতি পরিবর্তন করায় বা তাহার গতি রোধ করায়, কিংবা

www.pathagar.com

(২) যদি সে কোন বস্তুকে এইরূপে গতিশীল করায় বা তাহার গতি পরিবর্তন করায় বা গতি রোধ করায় যে উক্ত বস্তু (ক) উক্ত অপর ব্যক্তির শরীরের যে কোন অংশ বা (খ) উক্ত অপর ব্যক্তি কর্তৃক পরিহিত বা বাহিত অন্য কিছুর সংস্পর্শে আসে, যাহাতে অনুরূপ সংস্পর্শে উক্ত অপর ব্যক্তির অনুভূতিকে প্রভাবিত করে, তবে শর্ত এই যে, সে উহা নিম্নলিখিত তিন প্রকারের যে কোন প্রকারে করিবে—

(১) তাহার নিজ দৈহিক শক্তিতে।

(২) যে কোন বস্তুর এইরূপ ব্যবস্থাপনা করিয়া যাহাতে উক্ত ব্যক্তির বা অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে অধিকতর কোন কাজ ব্যতিরেকেই উক্ত গতি অথবা উক্ত গতির পরিবর্তন বা বিরতি সাধিত হয়।

(৩) যে কোন প্রাণিকে চলিতে, উহার গতি পরিবর্তন করিতে বা চলা হইতে, বিরতি হইতে প্রবৃত্ত করিয়া (ধারা ৩৪৯)।

অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ

কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির প্রতি 'অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ' করে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি সে—

(১) কোন অপরাধ অনুষ্ঠান করণার্থ,

(২) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে,

(৩) উক্ত ব্যক্তির প্রতি বলপ্রয়োগ করে, কিংবা

(৪) অনুরূপ বলপ্রয়োগের সাহায্যে যে ব্যক্তির প্রতি বলপ্রয়োগ করা হয়, সেই ব্যক্তির ক্ষতি, ভীতি বা বিরক্তি সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে, অথবা সেই ব্যক্তির ক্ষতি, ভীতি বা বিরক্তি সৃষ্টি করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে তাহার প্রতি বলপ্রয়োগ করে (ধারা ৩৫০)।

আক্রমণ

কোন ব্যক্তি 'আক্রমণ' করে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি সে—

(১) এইরূপ উদ্দেশ্যে বা এইরূপ জানিয়া,

(২) কোন প্রকার অঙ্গভঙ্গি করে বা প্রস্তুতি লয়,

(৩) যাহাতে উক্ত অঙ্গভঙ্গি বা প্রস্তুতি উপস্থিতি কোন ব্যক্তির মনে এমন আশঙ্কা জাগাইবে যে,

(৪) অঙ্গভঙ্গিকারী বা প্রস্তুতি গ্রহণকারী ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তির প্রতি বলপ্রয়োগের উদ্যোগ করিতেছে (ধারা ৩৫১)।

www.pathagar.com

অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ অপেক্ষা স্বল্পতর কোন কিছুর নাম আক্রমণ। প্রত্যেক অপরাধমূলক বলপ্রয়োগের মধ্যে আক্রমণ নিহিত আছে। শুধু মুখের কথাই আক্রমণ বলিয়া গণ্য হয় না। তবে কোন ব্যক্তির মুখের কথা তাহার অঙ্গভঙ্গি প্রস্তুতিকে এইরূপ অর্থপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে যে উক্ত অঙ্গভঙ্গি বা প্রস্তুতি আক্রমণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে (ব্যাখ্যা)।

গুরুতর উত্তেজনার মুখে আক্রমণ বা অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ কঠোরভাবে দণ্ডনীয় নহে। উক্ত উত্তেজনা স্বেচ্ছাকৃতভাবে উদ্দীপ্ত করা হইলে চলিবে না, অথবা উহা আইন পালনার্থ কৃত কোন কার্য দ্বারা বা কোন সহকারি কর্মচারী কর্তৃক অনুরূপ কর্মচারীর আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে হইতে পারিবে না, অথবা উহা ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা অধিকারের আইনানুগ প্রয়োগের ব্যাপারে কৃত কোন কার্যদ্বারা প্রদত্ত হইবে না।

'আক্রমণ' ও 'মারামারি'র মধ্যকার পার্থক্য

(১) 'আক্রমণ' যে কোনস্থানে সংঘটিত হইতে পারে, কিন্তু 'মারামারি' অবশ্যই সরকারি জায়গায় হইতে হইবে।

(২) 'আক্রমণ' ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে অপরাধ বলিয়া গণ্য, কিন্তু 'মারামারি' জন-শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়।

নিম্নলিখিত অপরাধসমূহ 'আক্রমণ' ও 'অপরাধমূলক বলপ্রয়োগের' 'মারাত্মক' রূপ ?

(১) সরকারি কর্মচারীকে তাহার কর্তব্য পালনে বাধা দানের নিমিত্ত আক্রমণ ও অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ (ধারা ৩৫৩)।

(২) কোন নারীর শালীনতা নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে আক্রমণ ও তৎপ্রতি অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ (ধারা ৩৫৪)।

(৩) গুরুতর উত্তেজনার ফলে ব্যতীত, প্রকারান্তরে কোন ব্যক্তিকে অপমান করিবার উদ্দেশ্যে আক্রমণ বা অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ (ধারা ৩৫৫)।

(৪) কোন ব্যক্তি কর্তৃক বাহিত সম্পত্তি চুরি করিবার উদ্যোগে আক্রমণকারী অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ (ধারা ৩৫৬)।

(৫) কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে অবরোধ করিবার উদ্যোগে আক্রমণ বা অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ (৩৫৭)।

অন্যান্য দেশের সংবিধানে

Burma : Article 16.

"No person shall be deprived of his personal liberty, nor his dwelling entered, nor his property confiscated, save in accordance with law."

www.pathagar.com

India : Article 21.

"No person shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law.

United State of America, 5th Amendment,

"No person shall be deprived of life, liberty or property, without due process of law."

Eire : Article 40 (4)

"No person shall be deprived of life or liberty, nor shall any other criminal penalty be emposed, except according to procedure established by law."

মানবিক অধিকার সংক্রান্ত ইউরোপীয় কনভেনশন

মানুষের জীবন স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার রক্ষার জোরদার প্রয়াস বিশ্বব্যাপী অব্যাহত রয়েছে। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের অনুচ্ছেদ-৩ এর প্রতিফলন ঘটেছে মানবিক অধিকার সংক্রান্ত ইউরোপীয় কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ২ এবং অনুচ্ছেদ ৫ এ।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

(১) প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের অধিকার আইনের দ্বারা রক্ষিত হবে। কোন অপরাধের জন্য আইনের দ্বারা অনুরূপ শাস্তির (মৃত্যুদণ্ড) বিধান করা হলে সে অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ার কারণে কোন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত প্রাণদণ্ডের আদেশ কার্যকরীকরণ ব্যতীত, কোন ব্যক্তিকে তার জীবন থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে বঞ্চিত করা যাবে না।

(২) যদি নিম্নলিখিত কোন কারণে অপরিহার্য পরিমাণে বল প্রয়োগের ফলে কোন ব্যক্তি তার জীবন থেকে বঞ্চিত হয় তবে তা এই অনুচ্ছেদের পরিপন্থী বলে বিবেচিত হবে না ঃ

(ক) কোন ব্যক্তিকে বেআইনি হিংস্রতা থেকে রক্ষা করা;

(খ) কোন ব্যক্তির আইনসম্মত গ্রেফতার কার্যকরী করা অথবা আইনসম্মতভাবে আটক কোন ব্যক্তির পলায়ন নিরোধ করা;

(গ) কোন দাঙ্গা বা বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে আইনসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

www.pathagar.com

(১) প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার আছে।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহ এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত কার্যপদ্ধতি ব্যতীত কাউকেও তার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না :

(ক) উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ার পর কোন ব্যক্তির আইন সম্মত আটক ;

(খ) কোন আদালতের আইন সম্মত নির্দেশ অমান্য করার কারণে অথবা আইনের দ্বারা নির্ধারিত কোন দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করবার উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির আইন সম্মত গ্রেফতার অথবা আটক;

(গ) কোন ব্যক্তি কোন অপরাধ করেছে বলে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ থাকলে তাকে আইন সম্মত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সম্মুখে হাজির করার উদ্দেশ্যে, অথবা যখন তাকে কোন অপরাধ সংঘটন করা হতে বিরত রাখা কিংবা কোন অপরাধ সংঘটনের পর পলায়ন করতে না দেয়ার জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে অত্যাবশ্যক বলে বিবেচিত হয় তখন তার আইন সংগত গ্রেফতার বা আটক ;

(ঘ) শিক্ষা সমন্ধীয় তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্য আইনসম্মত আদেশ অনুসারে কোন নাবালকের আটক, অথবা তাকে কোন আইনানুগ কর্তৃপক্ষের সম্মুখে হাজির করবার জন্য তার আইনসম্মত আটক;

(ঙ) সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার রোধের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির আইন সম্মত আটক, অথবা অপ্রকৃতিস্থ, মদাসক্ত বা নেশাগ্রস্থ অথবা ভবঘুরে ব্যক্তিদের আইনসম্মত আটক;

(চ) কোন ব্যক্তিকে দেশে বেআইনিভাবে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখার জন্য, অথবা যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে দ্বীপান্তর অথবা বহিঃসমর্পণের (extradition) উদ্দেশ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে সে ব্যক্তির আইনসম্মত গ্রেফতার অথবা আটক।

(২) গ্রেফতারকৃত প্রত্যেক ব্যক্তিকে অবিলম্বে, যে ব্যক্তি যে ভাষা বোঝে সেই ভাষায়, গ্রেফতারের কারণ এবং তার বিরুদ্ধ যে কোন অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (১) (গ) পরিচ্ছেদের বিধানাবলি অনুসারে গ্রেফতাকৃত বা আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে সত্বর কোন বিচারক অথবা আইনের দ্বারা বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা প্রয়োগের কর্তৃত্ব প্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার সম্মুখে হাজির করতে হবে এবং তার যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে, বিচার পাওয়ার অথবা বিচার সম্পন্ন হওয়া সাপেক্ষে, মুক্তিলাভের অধিকার থাকবে। অনুরূপ মুক্তি বিচারের জন্য হাজির হওয়ার নিশ্চয়তার শর্ত সাপেক্ষ হতে পারে।

(৪) গ্রেফতার অথবা আটকের ফলে কোন ব্যক্তি তার স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত হলে তিনি (আইনগত) কার্যধারা গ্রহণ করতে পারেন ; এই কার্যধারার মাধ্যমে কোন আদালত কর্তৃক তার

www.pathagar.com

আটকের বৈধতা সম্পর্কে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে এবং যদি আটক আইন সম্মত না হয় তবে তার মুক্তির আদেশ দেয়া হবে।

(৫) এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলি লঙ্ঘন করে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার বা আটক করার ফলে তিনি যদি ক্ষতিগ্রস্থ হন তবে তার ক্ষতিপূরণ লাভের বলবৎ যোগ্য অধিকার থাকবে।

জীবন স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ঃ বর্তমান পরিস্থিতি

জাতিসংঘের মানবিক অধিকার কমিশনের প্রতিবেদন অনুসারে আজও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে মানুষের জীবন ও স্বাধীনতা হরণ করা হচ্ছে। ব্যক্তির নিরাপত্তা আজো নিশ্চিত হয় নি। গোষ্ঠীগত কোন্দল, রাজনেতিক বিরোধ, আদর্শিক দ্বন্দ্ব, বর্ণ বিভেদ ইত্যাদি নানা কারণে হত্যা, খুন, গুম, স্বাভাবিক বিচার বহির্ভূত প্রাণদণ্ড, কারাগারে নির্যাতন, জেলহত্যা, গৃহবন্দি ও পণবন্দি করা নিপীড়ন এসব অব্যাহত আছে। নির্যাতনের মাত্রা যত বাড়ছে মানুষ তত সচেতন হচ্ছে, মানবাধিকারের দাবি তত জোরালো হচ্ছে। আধুনিক কালে মানবাধিকার সবচেয়ে বেশি লঙ্ঘিত হয়েছে শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক। সামরিক স্বৈরাচার একদলীয় সরকার এবং বর্ণবাদী শাসকরা অতি তুচ্ছ ও সাধারণ কারণে মানুষের অধিকার হরণ করেছে, মানুষের জীবনকে হরণ করেছে। কিন্তু মানুষও বসে নেই। বিশ্বব্যাপী মানবিক অধিকার রক্ষার জন্য বিভিন্ন সংস্থা সংগঠন জোর তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। মানবিক অধিকার সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলা এবং মানবাধিকারের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য এই সব সংস্থা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছে। এমনকি বর্তমানে মৃত্যুদণ্ড রহিতকরণের বিরুদ্ধেও জনমত গড়ে উঠছে।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল তার প্রচারপত্রে বলছে প্রাণদণ্ড দিয়ে হত্যার শাস্তি হয় না, এটাও একটি হত্যাকাণ্ড। প্রাণদণ্ড দেয়া উচিত কি উচিত নয় এ বিষয়ে বিতর্ক আছে এবং থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু জীবনের অধিকারের দাবিটি আজ কতটা জোরদার হয়েছে তা উপলব্ধির জন্য আমরা এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মৃত্যুদণ্ডবিরোধী বক্তব্যটি পরিবেশন করছি।

এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল মনে করে, মৃত্যুদণ্ড মানবিক মানের লঙ্ঘন। কারণ ঃ

সকল আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণা, সন্ধি ও চুক্তিতে প্রতিটি মানুষের 'বেঁচে থাকার অধিকারের কথা, ব্যক্তি নিরাপত্তার কথা ও স্বাধীনতার কথা' সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করা হয়েছে।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের স্বীকৃত অভিমত এই যে, যে সকল দেশে আইনের বলে প্রাণদণ্ড দেয়া হয়ে থাকে, সে সব দেশে তা তুলে দিতে হবে এবং যে সব অপরাধের কারণে এই দণ্ড দেয়া হয়ে থাকে। সে গুলো ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনার উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে।

www.pathagar.com

১৯৪৮ সাল থেকে জাতিসংঘ ও অন্যান্য মানব কল্যাণমুখী সংস্থার গৃহীত আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের মানদণ্ড সকল ধরনের 'নিষ্ঠুর অমানবিক বা অপমানজনক আচরণ বা শাস্তি প্রদান' নিষিদ্ধ করেছে।

এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল প্রাণদণ্ড রহিত করতে চায় এ কারণে যে, এই শাস্তি মানবিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

কোন সরকার বন্দিদের প্রাণদণ্ড প্রদানের যে কারণই দেখাক না কেন বা যে পদ্ধতিতেই প্রাণদণ্ড কার্যকর করা হোক না কেন, প্রাণদণ্ডকে মানবাধিকারের প্রসঙ্গ থেকে আলাদা করা যায় না। তেমনি প্রাণদণ্ড রহিতকরণের আন্দোলনকে মানবাধিকার আদায়ের আন্দোলন থেকে পৃথক করা যায় না।

প্রাণদণ্ডের ভয়ে অপরাধ সংঘটন বা রাজনৈতিক হাঙ্গামা কমেছে, এমন নজীর কোথাও দেখা যায় নি। এই প্রাণদণ্ড সামঞ্জস্যহীনভাবে দরিদ্র সাধারণ এবং বর্ণগত বা জাতিগত সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে কাজে লাগানো হয়েছে। অনেক সময় রাজনৈতিক নির্যাতনের হাতিয়ার হিসেবে একে ব্যবহার করা হয়েছে এবং যথেচ্ছ ও প্রতিকারহীনভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে। প্রতিকারহীন শাস্তির দরুন আদৌ কোন অপরাধের সাথে জড়িত নয় এমন নির্দোষ ব্যক্তিকেও অনিবার্যভাবেই ফাঁসিতে ঝুলতে হয়। এ কাজ মৌলিক মানবিক অধিকারের পরিপন্থী। যে উদ্দেশ্যর কথাই বলা হোক না কেন, প্রাণদণ্ডের মতো নির্মম শাস্তি প্রদানের পক্ষে যে কোন সরকার যে সাফাই গেয়ে যাক না কেন এটা মানবাধিকারের মূল ধারণার বিরোধী। মানবাধিকারের যথার্থ তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, সমাজকে রক্ষা করতে হলে কতগুলো কাজ কিছুতেই করা চলবে না, কেননা সেই কাজগুলো সমাজ সংরক্ষণের পরিপন্থী। ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘ মৃত্যুদণ্ড ও নরহত্যা সংক্রান্ত এক গবেষণামূলক জরিপ চালায়। জরিপের পর জাতিসংঘ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অপেক্ষা প্রাণদণ্ড অধিকতর নিবর্তনমূলক প্রভাব ফেলতে পারে—এই কথার কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ মেলেনি এবং অদূর ভবিষ্যতেও পাবার সম্ভাবনা কম। সামগ্রিকভাবে নিবর্তনমূলক প্রাণদণ্ডের অনুমানটিই অমূলক।

কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিরা মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের আরও অপরাধ সংঘটন করা থেকে তাদের নিবৃত্ত রাখতে সক্ষম হলেও মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তিরা যে অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত, প্রকৃত পক্ষে তারা সেই অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছে কিনা তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা দুষ্কর। প্রণিধানযোগ্য যে, মৃত্যুদণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে বিচার বিভাগীয় ভুলের যে আশংকা থেকে যায়, তা কখনো সংশোধন হয় না। অবশ্য কারাদণ্ডও একজন অভিযুক্তকে অক্ষম করে দেয়।

প্রাণদণ্ডের পক্ষে যখন প্রতিশোধ গ্রহণের অজুহাতে দেখানো হয় তখন ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা প্রতিহিংসা চরিতার্থকরণের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। এহেন লক্ষ্যের কথা মেনে নিয়েও বলা যায় যে, মৃত্যুদণ্ড প্রদানের দ্বারা সঠিক ফললাভ সম্ভব হয় না। কোন ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় এ

www.pathagar.com

যাবৎ কোন কোন আসামির প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত এবং কাদের বেঁচে থাকা উচিত—তা সকল ক্ষেত্রে অভ্রান্তভাবে নির্ধারণের ক্ষমতা দেখাতে পারে নি।

প্রাণদণ্ডের ব্যাপারে বাস্তবে যা ঘটে তা হচ্ছে, কাকে মারা হবে বা কাকে রেহাই দেয়া হবে—তা শুধু অপরাধের মাত্রার উপরই নির্ভরশীল নয়, বরং বিবাদীর জাতিগত ও সামাজিক পরিচয়, আর্থিক অবস্থা এবং রাজনৈতিক মতাদর্শ ও প্রভাব বিস্তার করে।

মনে রাখতে হবে যে, সকল ধরনের ফৌজদারি বিচারই এসব বৈষম্য এবং ভ্রান্তির শিকার হতে পারে। এজাহার থেকে শুরু করে শুনানি, শাস্তি প্রদান এবং সম্ভাব্য ক্ষমা প্রদর্শন অর্থাৎ বিচারের প্রতিটি পর্যায়েই বিচক্ষণতা, ক্ষমতার অবাধ প্রয়োগ এবং জনমতের চাপের মতো বিভিন্ন মানবিয় রীতির উপর নির্ভর করে।

কাকে বাঁচাতে হবে এবং কার প্রাণদণ্ড হবে তা চূড়ান্তভাবে এমন সব উপাদান দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে থাকে, যার সাথে দোষ কিংবা গুণের কোন সম্পর্ক নেই। ভ্রান্তি ভুল বোঝাবুঝি, আইনের বিভিন্নরকম ব্যাখ্যা অথবা কৌশুলী, বিচারপতি বা জুরি সদস্যদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এ ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। পুলিশ বিচার বিভাগ বা একজন বিচারকের কোন কৌশলগত ভুল ধরা পড়লে শাস্তি প্রদানের রায়ই বাতিল হয়ে যেতে পারে। তেমনিভাবে আসামীর পক্ষে কৌশুলীর দক্ষতার অভাব অথবা উপযুক্ত সাক্ষিসাবুদ হাজির করতে বা প্রমাণ উপস্থাপনে বিলম্ব হলে আসামী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে যেতে পারে।

বিচারের ফলাফল নির্ধারণে দক্ষ আইনজীবী যোগাড় করার সামর্থ্য যেখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেখানেজাতি, ধর্ম, শ্রেণী ও দারিদ্র্যের প্রশ্ন ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে থাকে। বিত্তশালী ও প্রভাবশালী মহলের সাথে জড়িত ব্যক্তি বা শক্তিশালী জাতিগত ও ধর্মীয় গ্রুপের সদস্যদের মৃত্যুণ্ডে দণ্ডিত হবার সম্ভাবনা কম। এমনকি গরীব সাধারণ মানুষ, বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমর্থক এবং জনপ্রিয় নয় এমন জাতিগত ও ধর্মীয় গ্রুপের সদস্যদের অপরাধের চেয়ে গুরুতর অপরাধ করেও তাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবার সম্ভাবনা কম থাকে। গুরুতর অপরাধ সংক্রান্ত মামলায় যে কোন কারণই হোক বিচার বিভাগীয় ভুলের আশংকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দেখা দিতে পারে। কারণ প্রাণদণ্ড হচ্ছে প্রতিকারহীন চরম শাস্তি। আর প্রতিকারহীন বলেই প্রাণদণ্ড অপর সকল ধরনের শাস্তি অপেক্ষা গুণগতভাবে ভিন্ন তাৎপর্য বহন করে। এটা একবার কার্যকর হলে তা আর সংশোধন করা যায় না। প্রাণদণ্ড আধুনিক দণ্ড বিজ্ঞানের ধারণারও পরিপন্থী। কারণ, অপরাধীর পুনর্বাসন সম্ভব, এই ধারণার উপরই আধুনিক দণ্ড বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। যে সব দেশে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নেই, সরকারদ্রোহী যেখানে রাষ্ট্রদ্রোহীর শামিল সেখানে রাজনৈতিক ভিন্ন মতাবলম্বীদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়ে থাকে। সে সব দেশের প্রতি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় এই রেওয়াজ কতখানি অসংশোধনীয় কতখানি মর্মান্তিক এবং পীড়াদায়ক।

www.pathagar.com

জীবন নিয়ে যাদের বিচার, তাদেরকে অবশ্যই সতর্কতার সাথে ন্যায়বিচার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দিতে হবে। কিন্তু যখন ন্যায়বিচারের স্বীকৃত মানকে অগ্রাহ্য করে বা এড়িয়ে গিয়ে প্রাণদণ্ডাদেশ দেয়া হয় তখন তা হয় রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহারের নামান্তর। আর এহেন পরিস্থিতিতে নির্দোষ ব্যক্তিদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবার আশংকা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

সকল প্রাণদণ্ডাদেশের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সর্বজনস্বীকৃত ন্যায়বিচার লাভের রক্ষাকবচ থাকা সত্ত্বেও পক্ষপাতদুষ্ট বিচারে হাজার হাজার বন্দিকে চরম দণ্ড দেয়া হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে মামলার শুনানির কাজটি করা হয়েছে নীরবে, গোপনে। কোন কোন বিবাদীর জন্য নামমাত্র আইনগত প্রতিনিধিত্বের সুযোগ রাখা হলেও সর্বক্ষেত্রে এ সুযোগ রাখা হয় নি। আর এমন সব বিচারকের এজলাসে তাদের তথাকথিত বিচারানুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়েছে সেখানে বিচারক একদিকে যেমন ছিলেন না উপযুক্ত, অন্যদিকে তেমনি ছিলেন না স্বাধীন। বিবাদিকে কৈফিয়ত প্রদানের তেমন সময় না দিয়েই বিচারানুষ্ঠানের কাজ ত্বরান্বিত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি প্রদানের বিরুদ্ধে উচ্চতর কর্তৃপক্ষ সমীপে আবেদন জানানোর অধিকার থেকেও বিবাদীদের বঞ্চিত করা হয়েছে। কোন সামরিক অভ্যুত্থানের পর সাবেক সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের এবং ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের প্রায়শই প্রাণদণ্ডাদেশ দেয়া হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সাধারণত তাড়াহুড়া করে বিচার করা হয়। কিন্তু তাদের জন্য রাখা হয় না ন্যায়বিচার লাভের নিরাপত্তা বা নিশ্চয়তা। অনেক সময় পূর্ববর্তী সময় থেকে কার্যকর দেখিয়ে দ্রুত বলবৎ করা সাংবিধানিক আইন দ্বারাও এসব ব্যক্তিকে চরম দণ্ড দেয়া হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে মানবাধিকার আন্দোলন গড়ে উঠেছে। তাই এতদিনে প্রাণদণ্ডাদেশ রহিতকরণের পক্ষে জনমতও জোরদার হয়েছে। গত দশকে গড়ে দেড় বছরে কমপক্ষে একটি দেশ সাধারণ অপরাধ বা সকল ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে প্রাণদণ্ডাদেশের বিধান বিলোপ করেছে।

অনেক সরকারই স্বীকার করে যে, প্রাণদণ্ড মানবাধিকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। খোদ জাতিসংঘ প্রাণদণ্ড বিলোপের কথা ঘোষণা করেছে। বর্তমানে ৩৫টি দেশ সকল ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে প্রাণদণ্ডাদেশ রহিত করেছে। অপর ১৮টি দেশ যুদ্ধাপরাধের মতো বিশেষ গুরুতর অপরাধ ব্যতীত সকল অপরাধের প্রাণদণ্ডাদেশ রহিত করেছে। অন্য ২৭টি দেশ ও অঞ্চল এখন আর কোন অপরাধীকে ফাঁসী দিচ্ছে না। এমনিভাবে প্রায় ৮০টি দেশ অর্থাৎ বিশ্বের দেশসমূহের প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ বিধি বা রীতি বলে প্রাণদণ্ডাদেশ রহিত করেছে।

যে সব দেশ এখনও প্রাণদণ্ড প্রদানের প্রথা বজায় রেখেছে এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল তাদের সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে ঃ

—অবিলম্বে সকল প্রাণদণ্ড রহিত কর ;

www.pathagar.com

—প্রদত্ত সকল প্রাণদণ্ডাদেশ রহিত কর ;

—আইন করে প্রাণ দণ্ডাদেশ বিলোপ করা।

আন্তর্জাতিভাবে স্বীকৃত মানবাধিকারের মানদণ্ড যে সব সরকার এখনও প্রাণদণ্ডাদেশ বিলোপ সম্পূর্ণ করে নি, তাদের সকলকে নিশ্চিত করতে হবে যে,

—প্রাণদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত প্রত্যেক বন্দিকে ন্যায়বিচার লাভের সকল সুযোগ সুবিধা থাকবে,

—প্রাণদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত প্রত্যেককে উচ্চতর আদালতে আপীল করার আইনগত অধিকার দিতে হবে,

—প্রাণদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত প্রত্যেককে শাস্তি মওকুফের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা বা শাস্তি কমানোর আবেদন করার অধিকার দিতে হবে ;

—অপরাধ সংঘটনের সময় যাদের বয়স ১৮ বছরের কম, তাদেরকে প্রাণদণ্ড দেয়া যাবে না।

—সুস্থ মস্তিষ্ক নয় এমন ব্যক্তিদের প্রাণদণ্ড দেয়া যাবে না,

—অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ তথা প্রাণঘাতি বা অন্য কোন চরম পরিণতির অপরাধ ব্যতীত প্রাণদণ্ড দেয়া যাবে না।

এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ঐ সকল পদক্ষেপকে স্বাগত জানায়, যে পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হলে অনেক প্রাণদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত কারাবন্দিকে বাঁচানো সম্ভব হতো না এবং যে পদক্ষেপগুলো বিশ্বব্যাপী মৃত্যুদণ্ড রহিতকরণ লক্ষ্যস্থলকে আরো নিকটে আনে। ঐ সব পদক্ষেপগুলো হচ্ছে ঃ

—প্রাণদণ্ডাদেশের ক্ষেত্রে ক্ষমতার ব্যবহারকে সম্প্রসারণ করা,

—মৃত্যুদণ্ডমূলক অপরাধের পরিধি ক্রমান্বয়ে সংকোচন করা,

—মৃত্যুদণ্ডের বিষয়টি পর্যালোচনা করার জন্য কমিশন বা ঐ ধরনের কমিটি গঠন করা;

—মৃত্যুদণ্ড রহিতকরণের এই প্রয়াস থেকে একটি কথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বিশ্ববাসী আজ জীবনের মতো গুরুত্বপূর্ণ মানবিক অধিকারের ব্যাপারে খুবই সচেতন। একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গড়ে তুলতে হলে মানুষের জীবনের অধিকার সম্পর্কে সকলকে সচেতন হতে হবে, শ্রদ্ধাশীল হতে হবে মানবজীবনের প্রতি। মানুষের জীবন নিরাপত্তা মানুষকেই প্রদান করতে হবে। তবেই জীবন, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

এই অনুচ্ছেদ ও ইসলাম

ইসলামি শরীয়তে ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। মানব জীবনকে সম্মানের বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং একজন মানুষের জীবন হরণকে সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে হত্যার সমতূল্য বলে গণ্য করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে বলা

www.pathagar.com

হয়েছে, 'নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ব্যতিরেকে কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন পৃথিবীর সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে হত্যা করল,আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন পৃথিবীর সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে প্রাণে রক্ষা করল।' (সূরা মায়েদা ঃ আয়াত ৩২)। 'আল্লাহ যে প্রাণকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা কর না।' (সূরা বানী ইসরাইল ঃ আয়াত ৩৩) । 'এবং কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম, যেখানে সে স্থায়ি হবে এবং তার প্রতি আল্লাহর গজব ও অভিসম্পাৎ এবং তিনি তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।' (সূরা নিসা ঃ আয়াত ৯৩।

'দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা কর না। আমিই তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা করি এবং বিশেষত তাদেরও' (সূরা আনআম ঃ আয়াত ১৫১)। 'যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল' (সূরা তাকবীর ঃ আয়াত ৮–৯)।

'তোমরা আত্মহত্যা করো না।' (সূরা নিসা – ২৯।)

কোরআন মজীদের উল্লেখিত আয়াতসমূহ থেকে এই বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে অনুধাবন করা যায় যে, মানবজীবন অত্যন্ত মূল্যবান ও পবিত্র। কোন অজুহাতেই মানুষের জীবন হরণ করা যাবে না। ইসলাম মানব জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে।

মানব জীবনের নিরাপত্তা সম্পর্কে মহানবীর মূল্যবান বাণীসমূহ নিম্নে পেশ করছি ঃ

বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী (দঃ) দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'হে লোকসকল, তোমাদের জানমাল ও ইজ্জত আবরুর উপর হস্তক্ষেপ তোমাদের উপর হারাম করা হলো। তোমাদের আজকের এই দিন, এই মাস (জিলহজ্জ) এবং এই শহর (মক্কা) যেমন পবিত্র ও সম্মানিত অনুরূপ উপরোক্ত জিনিসগুলোও সম্মানিত ও পবিত্র। সাবধান আমার পরে তোমরা পরস্পরের হন্তা হয়ে কাফেরদের দলভুক্ত হয়ে যেও না যেন।' 'জাহেলীযুগের যাবতীয় হত্যা রহিত হলো। প্রথমেই যে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ আমি রহিত করলাম তা হচ্ছে আমার বংশের রাবিয়া ইবনে হারিস এবং শিশু সন্তান হত্যার প্রতিশোধ, যাকে বনি হুযাইলের লোকেরা হত্যা করেছিল। আজ আমি তা ক্ষমা করে দিলাম। 'কোন মুসলিম ব্যক্তির নিহত হওয়ার তুলনায় সমগ্র পৃথিবীর পতন আল্লাহর দৃষ্টিতে অতি তুচ্ছ ব্যাপার।'। 'যে ব্যক্তি কোন যিম্মীকে হত্যা করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত (বেহেশত) হারাম করে দিবেন।'

এমনিভাবে মহানবী (দঃ) মানুষের জীবনের নিরাপত্তা তাগিদ দিয়েছেন। মানুষের প্রাণহরণ করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। বস্তুত ইসলামি জীবনাদর্শ মানবতার জয়গানে মুখরিত। ইসলামি শরীয়তের দৃষ্টিতে হত্যা মহাপাপ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

www.pathagar.com

সার সংক্ষেপ

কবি বলেছেন, 'মানব জীবন সার/এমন পাবে না আর'। ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় মানুষকে বলা হয়েছে সৃষ্টির সেরা জীব—'আশরাফুল মাখলুকাত'। সনাতন ধর্মে মানুষকে বলা হয়েছে 'নর নারায়ণ'। নিঃসন্দেহে মানুষের জীবন একটি অমূল্য ধন। জীবনের অধিকার তাই একটি মূল্যবান মানবাধিকার।

মাতৃগর্ভে স্থিতি থেকে শুরু করে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সময়কে মানুষের জীবনকাল বলা যায়। এই সময়ের জন্য মানুষের বেঁচে থাকার অধিকারের নামই জীবনের অধিকার। প্রত্যেক মানুষের অধিকার আছে কোন ব্যক্তি দ্বারা আহত বা নিহত না হবার। অধিকার আছে স্বাভাবিকভাবে জীবন বিপন্নকারী কোন কিছুর ভয়ে সন্ত্রস্থ না থাকার। বাংলাদেশের সংবিধানের এই অনুচ্ছেদে এই অধিকারকে মৌলিক ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশের দণ্ডবিধিতে কি কি পরিস্থিতিতে বা কোন কোন অবস্থায় মানুষের জীবনের উপর আঘাত করা যায় তার কথা বলা হয়েছে। খুন, রাষ্ট্রদ্রোহীতা এবং নরহত্যার সাথে ডাকাতির অভিযোগ প্রমাণিত হলে বাংলাদেশের মানুষের জীবন হরণ করা যায়।

দ্বিতীয় যে অধিকারটি একইভাবে মূল্যবান সেটি হচ্ছে স্বাধীনতা। স্বাধীনতা শব্দটির অর্থ ব্যাপক। প্রথমত, স্বাধীন ব্যক্তির অর্থ স্বাধীন দেশের মানুষ। যে ব্যক্তি স্বাধীন দেশের অধিবাসী নয় সে আপন দেশে পরবাসী। পরের ইচ্ছায় তার জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। স্বাধীন দেশের মানুষ হলেই যে সে স্বাধীন হবে এমন গ্যারান্টিও নেই। সুতরাং দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতার অর্থ শুধু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নয় অন্য সকল প্রকার অধীনতা থেকে মুক্তি। এই অধীনতাগুলি নানা প্রকারের হতে পারে।

(ক) অর্থনৈতিক অধীনতা এমন একটি বন্ধন যা মানুষকে স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণে নির্মমভাবে বঞ্চিত করে। পৃথিবীর অনেক উন্নয়নশীল দেশ উন্নত দেশের অর্থবিষয়ক নির্দেশে কাজ করতে বাধ্য হয়। তাছাড়া দেশের দরিদ্র নিরন্নমানুষ আর্থিক দীনতার কারণে স্বাধীন জীবনের স্বাদ পায় না।

(খ) সামাজিক স্বাধীনতা ঃ সমাজের এমন অনেক অবস্থা বা আদেশ নিষেধ থাকতে পারে যেগুলোর উৎস হয়তো কল্যাণকর কিন্তু বর্তমানে সেগুলো অন্ধ সংস্কার। এই অন্ধ সংস্কারের অধীনতাও একটি বড় অভিশাপ। যারা এর বশ্য তারা স্বাধীনতার স্বাদ পায় না।

(গ) সাংস্কৃতিক অধীনতা ঃ তথাকথিত উন্নততর সভ্যতার আগ্রাসনে অনেক লোকজ ঐতিহ্য আজ, দেশে দেশে অপসৃয়মান। যে দেশের যা সংস্কৃতি সে দেশের মানুষ অন্য সংস্কৃতির অধীন হলে তার স্বকীয়তা ক্ষুণ্ন হয়।

সব শেষে এই প্রসঙ্গে যেটি আলোচ্য সেটি হচ্ছে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার। যে মানুষ স্বাধীন, রাষ্ট্রীয়ভাবে আর্থিকভাবে সামাজিকভাবে এং সাংস্কৃতিকভাবে সে মানুষের স্বাধীনতার

www.pathagar.com

মরীচিকা হয়ে যায় যদি তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা না থাকে। নিজের ঘরে, রাস্তাঘাটে, শিক্ষায়তনে, কর্মস্থলে, বিশ্রাম বা বিনোদনের আগারে নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এসব স্থানে নিরাপত্তা না থাকলে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের সংবিধানে এই অধিকারের অপ্রত্যক্ষ ঘোষণা আছে। জীবনের অধিকার বলতে সেখানে নিরাপত্তার অধিকারও বোঝানো হয়েছে। বাংলাদেশের আইনেও মানুষের নিরাপত্তার ব্যবস্থা রয়েছে। বাংলাদেশের দণ্ডবিধিতে মানবদেহে আঘাতকারীকে শাস্তি দেয়ার বিধান রয়েছে।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

কোন ব্যক্তিকে দাসত্বে অথবা গোলামিতে আবদ্ধ রাখা চলবে না; সকল প্রকার ক্রীতদাস প্রথা ও দাস ব্যবসায় নিষিদ্ধ থাকবে।

(Article 4. No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.)

ভাষ্য

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের আলোচ্য অনুচ্ছেদটি বিশ্লেষণ ও অনুধাবন করতে হলে আমাদেরকে প্রথমেই দেখতে হবে দাস বলতে কি বোঝায়।

দাস

সাধারণ অর্থে দাস হচ্ছে অধীন বা অনুগত ব্যক্তি। আমরা যে দাসের কথা আলোচনা করবো সেটা শুধু অধীন ও অনুগতই নয় বরং অর্থের বিনিময়ে অথবা অন্য কোন উপায়ে যার স্বাধীনতা, স্বকীয়তা হরণ করা হয়েছে। শ্রম প্রদান, উপার্জন, ভোগ ও বিশ্রামের ব্যাপারে যার নিজের কোন ইচ্ছা বা মতামত কার্যকরী হয় না সেই ব্যক্তি দাস। গোলাম, দাসি, বাদি ইত্যাদি হচ্ছে এর সমার্থক শব্দ। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক , সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপক পরিবর্তন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্রম বিকশিত হয়ে মানব সমাজ আজকের স্তরে উন্নীত হয়েছে। আধুনিক মানুষের মন, মেজাজ রুচি আদর্শ আজ অনেক উন্নত স্তরে উন্নীত হয়েছে, কিন্তু সব সময়ই এমন অবস্থা ছিল না। সামাজিক জীবনে মানুষ যখন তার দুর্বলতা অসহায়তা ও অজ্ঞতার সীমাবদ্ধতা অতিক্রমের সামর্থ অর্জন করে নি, যখন পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যের পূর্ণ উপলব্ধিতে পৌছতে সক্ষম হয় নি, যখন আইন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের হুকুমের অন্তর্গত ছিল, যখন শক্তিশালী ব্যক্তির ইচ্ছাই ছিল জীবনের নীতি ও আচরণের নির্ধারক। মানব জাতির মধ্যে স্বভাবজাত অনিবার্য

www.pathagar.com

সামাজিক দৈহিক ও মানসিক অসাম্য অবিচ্ছেদ্য ভাবে দাসপ্রথার জন্ম দিয়েছে। সেই থেকে একটি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, যা উৎকৃষ্ট ব্যক্তিদের নিকৃষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপর, সবলকে দুর্বলের উপর কর্তৃত্ব দিয়েছে। যার পরিণতিতে সমাজে দেখা দিল দাসত্ব ও প্রভূত্ব অর্থাৎ দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার, দরিদ্র্যের উপর ধনীর শোষণ, শাসিতের উপর শাসকের নিপীড়ন।

যেহেতু আইন ছিল শক্তিমানের নির্দেশ, সেহেতু শক্তিমান পুরুষের কাছে ঋণী ও দুর্বল ব্যক্তির আদেশ পালন আইন তৈরি হল। দাস প্রথা প্রমাণ করে যে সমাজ ব্যবস্থার এক স্তরে বহুসংখ্যক মানুষের শ্রমের উপর জীবন যাপন করে একশ্রেণীর পরশ্রমভোগী ক্ষমতাশালী মানুষ। দাসদের শ্রমকে পুঁজি খাটিয়ে তারা মুনাফা লুটে, তাদের শ্রমকে শোষণ করে তারা সমাজে প্রভূত্ব বিস্তার করে। দাসত্বের একটি সুন্দর চিত্র অংকেন করেছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রাশিয়ার চিঠি' গ্রন্থে।

'চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন, তাদের মানুষ হওয়ার সময় নেই, দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সবচেয়ে কম খেয়ে, কম পড়ে, কম শিখে বাকি সকলের পরিচর্যা করে। সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা উপবাসে মরে। জীবনযাত্রার জন্য যত কিছুর সুযোগ সুবিধা সবকিছু থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।'

পরাধীনতার গ্লানি আর নিজের ব্যক্তিসত্তা বিসর্জন দিয়ে যাদের জীবন প্রভুর পদতলে সমর্পিত থাকে সে সকল দুর্ভাগা বঞ্চিত মানুষকে দাস বা ক্রীতদাস হিসেবে আখ্যায়ত করা যায়। ঐতিহাসিক স্যার হেনরী মেইন তাঁর এন্‌সিয়েন্ট ল' গ্রন্থে বলেছেন, 'নিজের আরাম-আয়াসের জন্য অন্য ব্যক্তির দৈহিক শক্তি ব্যবহারের সকল ইচ্ছা নিঃসন্দেহে দাস প্রথার ভিত্তি এবং তা মনুষ্য স্বভাবের মতই পুরাতন।' হব হাউস দাসকে এমন এক ব্যক্তি হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন, যে প্রচলিত আইন ও প্রথা অনুসারে অন্যের সম্পত্তি বলে গণ্য। চরম অবস্থায় তার কোন অধিকার নেই, মানসিক কোন পরিচয় নেই, সে একটি পণ্য দ্রব্যের মতো যা ক্রয় বিক্রয় করা যায় এবং যার উপর ক্রেতার অবাধ কর্তৃত্ব ও অধিকার থাকে। সমাজবিজ্ঞানী জিসবার্ট বলেন, মনস্তাত্বিক দিক দিয়ে দাসত্ব প্রথা মানুষের দুটি প্রবণতার ফল। একটি হচ্ছে অপর মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তারের প্রবণতা; আর অন্যটি হল অপরের স্বার্থের বিনিময়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধির প্রবণতা। এরিষ্টটলের মতে দাসপ্রথা প্রকৃতির শ্বাশ্বত নীতিরই ফল। এটি আদেশ ও আনুগত্যের সমন্বয়। এরিষ্টটল দাসকে জীবন্ত সম্পত্তি হিসাবে আখ্যায়িত করেন। এরিষ্টটলের মতে, কিছু লোক প্রজ্ঞার অধিকারি এবং এ প্রজ্ঞার বলে তারা শুধু আদেশ প্রদানের যোগ্যতা রাখে আর বেশির ভাগ লোক দৈহিক বলে শক্তিমান। তারা শুধু কায়িক পরিশ্রম করতেই সক্ষম। প্রজ্ঞার অভাবের কারণে তারা আদেশ প্রদান করতে পারে না। প্রজ্ঞাবানদের আদেশ মান্য করাই হচ্ছে তাদের যোগ্যতা। প্রথম শ্রেণির লোকেরা যুক্তি বা আত্মার প্রতিনিধি, এরা প্রভূ। দ্বিতীয় শ্রেণির লোকেরা লালসা বা দেহের

www.pathagar.com

প্রতিনিধি, এরা দাস। এরিস্টটলের মতে, উভয় শ্রেণীর লোকের কল্যাণেই এই দাস প্রথা যুক্তিসঙ্গত ও অপরিহার্য।

বস্তুত দাসপ্রথা হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা যা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সমাজে প্রচলিত ছিল। এই ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এতে অর্থ, বিত্ত ও ক্ষমতার মালিক একশ্রেণীর মানুষের হাতে কুক্ষিগত থাকে । অন্য মানুষের জীবন, স্বাধীনতা, শক্তি, সামর্থ্য প্রভৃতি। এক পক্ষ হচ্ছেন প্রভু, অন্য পক্ষ হচ্ছেন দাস। দাসদের ব্যক্তিস্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার, কর্মের স্বাধীনতা ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। দাসরা প্রভুর ইচ্ছায় ও খেয়াল খুশীমত জীবিকা নির্বাহ করবে। প্রভুর নির্দেশ পালনই হবে দাসের জীবনের একমাত্র ব্রত। দাসরা পণ্য সামগ্রির মতই ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য। মানবেতর প্রাণী, কি তার চেয়েও অধম বিবেচনা করা হয় দাস দাসীকে। মানব ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্য ও কলঙ্কজনক ঘটনা হচ্চে দাস প্রথা। দাস প্রথা যতটা কলঙ্কজনক তার চেয়েও জঘন্য এবং রোমহর্ষক ব্যবস্থা হচ্ছে দাস ব্যবসা। মানুষ, যাকে বলা হয় আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা জীব, তাকে ব্যবসার পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা ; এটা কল্পনারও অতীত। অথচ এই ব্যবস্থাটাই চলেছে দীর্ঘদিনব্যাপী।

দাসপ্রথার উদ্ভব

মানব ইতিহাসের মতই প্রাচীন দাস প্রথার ইতিহাস। দাসপ্রথার প্রচলন মানুষের অস্তিত্বের সমসাময়িক। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক সমাজেই কমবেশি দাসপ্রথার প্রচলন ছিল। অবশ্য দাসদের প্রতি ব্যবহার, নির্যাতন ও নির্মমতার মাত্রা সকল পর্যায়ে এক রকম ছিল না এবং এর ধরণও অভিন্ন ছিল না। সমাজের বর্বর অবস্থায় এর বীজ বিকশিত হয়েছিল। এবং জড়বাদী সভ্যতার চরম উৎকর্ষ সাধনের সময় যখন এর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে বলে ধারণা করা হয়েছিল তখনও তা বহাল তবিয়তেই ছিল এবং আজকের দিনে বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের পরেও দাসপ্রথা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাদের সমাজে আছে।

যে সকল জাতির আইন, প্রথা ও সামাজিক নিয়মকানুন আধুনিক বিশ্বে অনুসৃত হচ্ছে সেই রোমান, গ্রিক, ইহুদি, জার্মান ও আরব জাতির মধ্যে ভূমিদাস ও গৃহভৃত্য প্রথা প্রচলিত ছিল এবং তারা এই প্রথাকে স্বীকৃতিও দিয়েছিল।

হিব্রু জাতির মধ্যে দু'ধরনের দাসপ্রথা প্রচলন ছিল। অপরাধের শাস্তি বা ঋণ পরিশোধের জন্য যে সব ইসরাইলিকে দাসে পরিণত করা হত তাদের অবস্থা বিদেশী দাসদের চেয়ে উত্তম ছিল। ইসরাইলি দাসগণ ছ'বছর সেবা প্রদানের পর ইচ্ছে করলে মুক্তিলাভ করতে পারেত। অতর্কিত আক্রমণ, যুদ্ধ, লুণ্ঠন বা ক্রয়ের মাধ্যমে যে সব বিদেশীকে ইসরাইলিরা দাসে পরিণত করত তাদের অবস্থা ছিল অপ্রশমিত দুঃখকষ্টের। ভূমিদাস ও গৃহভৃত্য ছিল যুগপৎ ঘৃণিত ও অবহেলিত। তারা মানবেতর জীবন যাপন করত।

www.pathagar.com

প্রাচীন গ্রিক সমাজের বিশেষত্ব দাস প্রথা। গ্রিকদের পূর্বে আর কোন সমাজে দাসপ্রথা সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে নি। গ্রিক নগর রাষ্ট্রগুলো গড়ে উঠেছিল দাসদের শ্রমের উপর ভিত্তি করে। শারীরিক শ্রমজড়িত কর্মছাড়া অন্য কোন কাজের জন্য প্রকৃতিগত ভাবেই কিছু লোক অনুপযুক্ত এই ধারার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত গ্রিসীয় দাসপ্রথা অধিকতর উৎপাদন ও সম্পদ স্ফীতির জন্য গড়ে তোলা হয়েছিল। প্রাচীন গ্রিসের প্রতিটি নগর রাষ্ট্রই ছিল মূলত দাসপ্রথা ভিত্তিক।

খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে গ্রিক সভ্যতার চূড়ান্ত বিকাশের সময় দাস ব্যবসা চরম রূপ নেয়। অপরাধী ব্যক্তি এবং যুদ্ধবন্দিদের দাস হিসেবে বিক্রি করা হত। সামন্ত সমাজে জমিদাররা তাদের মধ্যকার যুদ্ধে দাসদের কাজে লাগাত। পাথর বহন করে নগর পত্তন এবং খনিতে কাজ করত দাসরা। আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা ছিল দাস ব্যবসার কেন্দ্র। সমাজে এক শ্রেণির লোক দাস ব্যবসা করত এরা এক দেশ থেকে অন্য দেশে নিয়ে দাসদের বিক্রি করত।

দুর্বিষহ ছিল দাসদের জীবন। বাধ্যতামূলক ছিল কঠিন পরিশ্রম আর অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট সহ্য করা ছিল নৈমিত্তিক বিষয়। দাসরা কোন কোন ক্ষেত্রে পশুর চেয়েও নিম্নমানের জীবন নির্বাহ করত। তাদের শ্রম, কষ্ট আর ত্যাগের উপর গড়ে উঠেছে গ্রিক, রোমান সভ্যতা। পশুর মতো ভাষাহীনভাবে তারা শুধু কাজ করেই যেত। প্রতিবাদ, বিদ্রোহ, দাবি উত্থাপনের কোন সুযোগ ছিল না তাদের।

প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন রকম দাসপ্রথা চালু ছিল। একটি শ্রেণি ছিল যারা গৃহ দাস দাসি হিসেবে নিযুক্ত থাকতো। রাজার অন্তঃপুরে হেরেমের অধিবাসীদের জন্য নপুংসক ক্রীতদাসের ব্যবস্থা থাকত। দাসদের মধ্যে কেউ শুধু কায়িক শ্রম প্রদান করতো আবার কেউ প্রভূর সঙ্গদান বা চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করতো। রাজা বাদশাগণ ভারতের বাইরে তুর্কিস্থান এবং চিন থেকে দাস ক্রয় করতো। ভারতে মুসলিম সুলতানদের অনেক ক্রীতদাস পুত্রস্নেহে প্রতিপালিত হয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত সুলতানের পদ অলঙ্কৃত করেছেন। কুতুবউদ্দিন আইবক, ইলতুতমিশ এবং গিয়াসউদ্দিন বলবন ক্রীতদাস থেকে সুলতানের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছিলেন। আমরা যে দাসের কথা আলোচনা করছি এদের অবস্থা সেটা থেকে একটু ভিন্নপ্রকৃতির ছিল।

ব্রিটিশ আমলেও ভারতবর্ষে দাস প্রথার প্রচলন ছিল । সমাজের নীচুস্তরের লোকেরা জমিদারদের দাসত্বের শৃঙ্খলে বাধা পড়ে। বোঝা বহন, দাড় টানা, কৃষি কাজ করা এসব ছিল দাসদের প্রাত্যহিক কাজ। প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষের গ্রাম পর্যায়ে এক ধরনের গৃহকেন্দ্রিক দাসপ্রথার জন্ম হয়। গৃহভৃত্য নামে পরিচিত এসব দাসের উপর নির্যাতনের মাত্রাও ছিল মারাত্মক। এই প্রথা আজও ভারতবর্ষে দু'একস্থানে টিকে আছে। চরিত্র এবং মাত্রা খানিকটা পরিবর্তন হলেও গৃহভৃত্য প্রথা টিকে আছে। আজো পত্রপত্রিকায় গৃহস্বামী বা গৃহকর্ত্রী দ্বারা কাজের লোকের নির্যাতনের খবর আসে প্রতিনিয়ত।

www.pathagar.com

দাস প্রথা অমানবিক কেন?

মানুষ জন্মায় মানুষ হিসেবে। স্বাধীন, মুক্ত চিন্তা ও বৃত্তির স্বাধীনতা নিয়ে। একটি কল্যাণকর, সহযোগিতামূলক পরিবেশে বেড়ে উঠার প্রত্যাশা নিয়ে মানুষের জীবনের সূচনা হয়। জীবনের জন্য, জীবিকার জন্য কাজ করার দরকার। তাই মানুষকে কাজ করতেই হবে কিন্তু সকল মানুষ একই কাজের উপযুক্ত হয় না, সকলের মন মেজাজ একরকম নয়। প্রত্যেক মানুষই তার মনের মতো কাজ করতে চায়। মনের মতো কাজ চাইলেই পাওয়া যায় না, তার পরও মানুষকে তার নিজের ইচ্ছেমত পছন্দ করার অধিকার দিতে হয়। কাউকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজে খাটানো মানবিকতা বিরুদ্ধ। দাসপ্রথার মধ্যে এসব অমানবিক বিষয়গুলো রয়েছে বলেই দাসপ্রথা ও দাস ব্যবসা অমানবিক প্রথা।

প্রথমত, চির স্বাধীনতা ও মুক্তি আকাঙ্ক্ষা মানুষের গলায় দাসপ্রথা পরাধীনতার শৃঙ্খল পরিয়ে দেয়। মানুষের স্বাধীনতা হরণ একটি অমানবিক কাজ। দাস প্রথা যেহেতু মানুষের স্বাধীনতাকে হরণ করে, তাই এটাকে অমানবিক প্রথা না বলে উপায় নেই।

দ্বিতীয়ত, সাধারণভাবে দাসদের নিকট থেকে যে পরিমাণ শ্রম নেয়া হয় এবং তাদের প্রতি যে নিষ্ঠুর আচরণ করা হয় সেটাকে কোনভাবেই মানবিক আচরণ বলা যায় না। তাই আমরা দাস প্রথাকে অমানবিক প্রথা হিসেবে চিহ্নিত করি।

তৃতীয়ত, দাস ব্যবসায় যা কিনা পণ্য কেনা বেচার মতো, অথচ মানুষকে পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা। এটাকে ভোগের সামগ্রি হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত নয়। গরু, ছাগল, মহিষের মতো পশু যেভাবে বেচাকেনা হয় মানুষকে সেভাবে ক্রয় বিক্রয় করা মানবিক হতে পারে না। পশুর মতো বেচাকেনা হয় বলে দাস প্রথা অমানবিক।

চতুর্থত, শ্রমিকের নিকট থেকে শ্রম নিয়ে মজুরি না দেওয়াটা সম্পূর্ণ অমানবিক কাজ। তেমনি শ্রমিককে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিপদজনক ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে খাটানো মানবিকতা বর্জিত কাজ। দাসপ্রথায় এসবই চরমভাবে অনুসৃত হয়। তাই এই প্রথা অমানবিক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

সর্বোপরি মানবজাতি সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার মহান মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায় দাসপ্রথা এর পথে একটি মারাত্মক প্রতিবন্ধক। দাস প্রথা ও দাস ব্যবসা অব্যাহত থাকলে মানুষের স্বাধীনতা থাকতে পারে না, প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না সাম্য ও মৈত্রী। জুলুম, নির্যাতন, নিস্পেষণকে নির্মূল করতে হলে দাসপ্রথার মতো অমানবিক আচরণ ও ব্যবস্থা নির্মূল করতে হবে । মানুষের মধ্যে যে যোগ্যতা ও প্রতিভা আছে তাকে যথাযথভাবে বিকশিত হওয়ার প্রকৃত সুযোগ প্রদানের জন্য দাসপ্রথাকে নির্মূল করতে হবে। এই অমানবিক প্রথাকে উচ্ছেদ করতে হবে।

www.pathagar.com

দাসপ্রথা ও বর্তমান বিশ্ব

সভ্যতা অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। মানুষ অর্জন করেছে অনেক কিছু। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ পৃথিবীর রূপ পাল্টে দিয়েছে। যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক অগ্রগতি মানুষকে পরস্পরের অনেক কাছে এনে দিয়েছে। রোগ-শোক, মহামারি, অনাহার প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদিতে বিপন্ন মানুষের জন্য দ্রুত এগিয়ে আসে মানুষের হাত। অসহায় মানুষজনকে উদ্ধারের জন্য ঝাপিয়ে পড়ে মানুষ। নির্যাতিত মানুষের অধিকারের জন্য চিৎকার করে ওঠে এই মানুষ। বিপদে আপদে মানুষই মানুষের সাহায্যকারী। এই যে মানুষ, যার মধ্যে এত বেশি মানবিক বোধ, এত বেশি দরদ মানুষের জন্য, সে কখনো কখনো হয়ে ওঠে ভীষণ স্বৈরাচারী। আর তাই অত্যাচারী, নিপীড়ক, খুনি, শোষক—এসব বাজে বিশেষণ মানুষেরই।

অস্তগামী বিশ শতকের শেষ দশকে দাঁড়িয়ে আমরা যখন মানবতার জয়ধ্বনি তুলছি তখনও পৃথিবীর লোকচক্ষুর অন্তরালে দাসপ্রথা বহুদেশে বিদ্যমান। আগে যেভাবে মানুষ বিক্রি করা হতো হাটে বাজারে এখন হয়তো ঠিক তেমনটি হয় না। কিন্তু একজন দাসকে যে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করতে হতো অনেক লোক এখনও এই অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের স্বীকার। দারিদ্র্যের অসহনীয় নিষ্পেষণে স্নেহের সন্তান বিক্রি, দীর্ঘমেয়াদী ঋণের দলিলে আবদ্ধ মানুষের লাঞ্ছনা, বাধ্যতামূলক পতিতাবৃত্তি দাসত্বেরই নামান্তর।

উপনিবেশিকতার এক জঘন্য অভিশাপ হিসেবে দাসপ্রথা আজো আছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে নারীর অবস্থা তো আজো দাসির মতো। আফ্রিকা এবং দক্ষিণ এশিয়ার নারীরা অধিকাংশে পরোক্ষ দাসত্ব থেকে মুক্তি পায় নি। অনেক দেশে এমনকি পশ্চিমের উন্নত দুনিয়ায়ও চাপের মুখে বা অসুবিধায় ফেলে নারীদের পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা হচ্ছে। বর্তমানে বহুদেশে ব্যাপক মুনাফা লাভ এবং বিপুল পরিমাণ কালো টাকা অর্জনের জন্য নারীদেহকে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এখনও অনেক দেশে অনির্ধারিত সময়ের জন্য কাজ করার চুক্তি করা হয়। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে মানুষ টাকা কর্জ নেয় এবং এই মর্মে চুক্তি করে টাকা শোধ না হওয়া পযন্তি তার কাজ করে যাবে। বছরের পর বছর চলে যায়, টাকা শোধ হয় না, ফলে মানুষকে দাসের মতো কাজ করেই যেতে হয়। এটাকে দলিল-সৃষ্ট দাসত্ব বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছোট ছোট মেয়েদের জোর করে কাজে খাটানো হচ্ছে। তাদের কাজের পরিবেশ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। আমাদের দেশেও সীমাহীন দারিদ্র এবং ক্ষুধার তাড়নার সুযোগ নিয়ে পোশাক শিল্পে ছোট ছোট মেয়েদের নামমাত্র মজুরি দিয়ে দীর্ঘ সময় কাজ করানো হচ্ছে। অনভিপ্রেত অবস্থার চাপে পড়ে নিজেকে অথবা নিজের সন্তানদেরকে কোন কঠিন শ্রমের কাজে বাধ্য করাকেও একরকম দাসত্ব বলা যেতে পারে। যেখানে মুক্ত মানসিকতার অভাব, যেখানে

www.pathagar.com

অসংগত বাধ্যবাধকতা সেখানেই আমরা দাসত্বপ্রথার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। অতএব পদ্ধতির বদল হলেও দাসত্ব প্রথা আজো আছে এই সমাজে।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় মানুষকে দাসত্বে অথবা গোলামিতে আবদ্ধ রাখা অসিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়েছে। ক্রীতদাস প্রথা ও দাস-ব্যবসায়কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

মানবিক অধিকার সংক্রান্ত ইউরোপীয় কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ৪-এ বলা হয়েছে 'কোন ব্যক্তিকে দাসত্বে (slavery) বশ্যতায় (servitude) আবদ্ধ করা চলিবে না।'

কাউকে দাসত্বে রাখা যাবে না, কেউ রাখলে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কারণ দাসত্বে রাখা আইনসিদ্ধ নয়। কিন্তু অবস্থার চাপে পড়ে, আর্থিক সংকট আর দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে স্বেচ্ছায় যখন কেউ দাসত্বকে বরণ করে নেয় তখন তাকে কি করে মুক্ত করা হবে? গৃহভৃত্য হিসেবে, ঋণের দায়ে অথবা অবস্থার চাপে যারা প্রচ্ছন্নভাবে দাসত্বের শিকলে আবদ্ধ তাদের মুক্তি আসবে কিভাবে? হাজার বছরের লালিত প্রথা, যা আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে আছে তাকে এত দ্রুত মুছে ফেলা সহজ নয়। তাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দাসত্বের শিকলে আবদ্ধ মানুষকে মানবিক অধিকার প্রদান করতে হলে ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত করতে হবে। শুধু আইন নয়, সহানুভূতিশীল জনমত এবং সচেতন নাগরিকদের সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তোলার মাধ্যমেই এই মানবিক অধিকারটি রক্ষা করা যেতে পারে।

এই অনুচ্ছেদ ও ইসলাম

আলোচ্য অনুচ্ছেদের মূল বিষয় হচ্ছে দাসত্ব, দাস প্রথা ও দাস ব্যবসা নির্মূল করা। দাসত্ব বাতিল, দাসপ্রথা উচ্ছেদ এবং দাস ব্যবসা নির্মূল করার জন্য ইসলামের ভূমিকা পর্যলোচনা করতে হলে আমাদেরকে ইসলামপূর্ব যুগে আরবের দাসপ্রথা সম্পর্কে আলোকপাত করতে হবে। প্রাক ইসলামিক যুগ, ইতিহাসে যা আইয়ামে জাহেলিয়া বা অন্ধকার যুগ হিসাবে পরিচিত, তা ছিল এক বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত সমাজের প্রতিচ্ছবি। সেই যুগের সামাজিক অবক্ষয় এবং পশ্চাদপদতার অন্যতম উদাহরণ হচ্ছে দাসপ্রথা। দাসপ্রথা ছিল আরবদের সামাজিক ইতিহাসের এক কলঙ্কিত দিক। দাস প্রথা এবং দাস ব্যবসা তখন অপ্রতিহত গতিতে অব্যাহত ছিল এবং এর ফলে বিপুল সংখ্যক মানুষ মানবেতর, কখনো কখনো পশুর চেয়েও নিম্নস্তরের জীবন অতিবাহিত করতো। প্রভুদের ক্ষমতা দাসদের জীবন থেকে মৃত্যু অবধি কার্যকর ছিল। প্রভুর অনুমতিক্রমে দাসদাসি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারতো। কিন্তু তাদের সন্তানসন্ততি স্বাভাবিকভাবেই প্রভুর মালিকানায় চলে যেতো। দাসিরা উপপত্নী হিসেবে ব্যবহৃত হতো। দাসদাসিরা ছিল বিক্রয়যোগ্য পণ্য। প্রকাশ্যে হাটেবাজারে তাদেরকে পশুর মতো বেচাকেনা করা হতো। যুদ্ধবন্দিদের দাস হিসেবে বিক্রয় করা হতো। এই অবস্থা আরব উপদ্বীপে হঠাৎ করে একদিনে গড়ে ওঠে নি বরং হাজার বছর ধরে চলতে চলতে

www.pathagar.com

দাসপ্রথা আরবে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছিল। এমনি নাজুক অবস্থায় আকস্মিকভাবে একটি নিষেধাজ্ঞা জারি করে দাসপ্রথা নির্মূল করা সম্ভব ছিল না তাই একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়ায় ইসলাম দাসপ্রথা নির্মূলের প্রয়াস চালিয়েছে।

যুদ্ধ ছিল দাসত্বের অন্যতম উৎস। যুদ্ধ বিপুল পরিমাণ স্বাধীন মানুষকে দাসত্বের নিগড়ে বন্দি করতো। তাই ইসলাম অন্যায় যুদ্ধ নিষিদ্ধ করে। শুধু তাই নয় । চাপিয়ে দেয়া বিভিন্ন যুদ্ধে শত্রুপক্ষের যারা বন্দি হয়েছে সে সব বন্দিদেরকে মুসলমান শিশুদের শিক্ষাদান অথবা অন্য কোন সহজ শর্তে মুক্তিদানের ব্যবস্থা করেছে। এতে করে দাসের ক্রমবর্ধমান হার কমতে থাকে।

ইসলামের নবি হযরত মুহম্মদ (দঃ) এর ব্যক্তিজীবন ছিল দাস প্রথার বিরুদ্ধে একটি প্রচণ্ড বিদ্রোহ। নবুয়ত প্রাপ্তির পনর বছর আগেই তিনি যখন আরবের ধনাঢ্য মহিলা খাদিজাকে বিয়ে করেন তখন স্ত্রীর বিপুল পরিমাণ ধন সম্পদ ও দাসদাসির তিনি মালিক হন। এর পর তিনি সম্পদের সিংহভাগ দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করেন আর সকল দাসদাসিকে আযাদি দান করেন।

যায়েদ বিন হারিস নামে এক গোলাম থেকে যায় হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর কাছে। কিছুদিন পর উক্ত যায়েদের পিতা এবং পিতৃব্য মক্কায় এসে যায়েদকে অর্থের বিনিময়ে মুক্ত করার প্রস্তাব দেন। মুহম্মদ (দঃ) বলেন, যায়েদ মুক্ত, সে ইচ্ছা করলে তাদের সাথে যেতে পারে, এজন্য কোন বিনিময়ের প্রয়োজন নেই। কিন্তু যায়েদ তাঁদের সঙ্গে যেতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে এবং সে জানায় বর্তমানে তার পূর্বতন অবস্থা থেকে সে ভাল আছে। অতঃপর হযরত মুহম্মদ (দঃ) তার চাচাতো বোন জয়নব বিন যাহেস-এর সঙ্গে যায়েদ বিন হারিসের বিয়ে সম্পন্ন করেন। যদিও এই বিয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয় নি এবং তারা উভয়ে পৃথক হয়ে যান তথাপি যায়েদ আজীবন রাসুলের অন্যতম নিবেদিত প্রাণ অনুসারী ছিলেন। অবশেষে তিনি আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণ করেন। অতঃপর যায়েদের পুত্র উসামা এবং উসামার পুত্র আবদুল্লাহও পিতা পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শাহাদাত বরণ করেন। উল্লেখ্য ক্রীতদাস যায়েদ মুহাম্মদ (দঃ)-এর নিকট থেকে পুত্রতুল্য স্নেহলাভ করেছিলেন।

হযরত মুহাম্মদ (দঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে 'তোমরা যা খাবে তাদেরকেও তাই খেতে দেবে এবং তোমরা যা পরবে তাদেরকেও তাই পরতে দেবে' এই নির্দেশ দিয়ে এবং 'মনে রেখো তারাও তোমাদের মতো মানুষ' এই তাগিদ দিয়ে ক্রীতদাসকে শুধু সামাজিক মর্যাদাই দেন নি সেই সঙ্গে প্রকারান্তরে দাস প্রথার মূলেই কুঠারাগাত করেছেন। ইসলামের নবি নিজে দাসের প্রতি যে আচরণ করেছেন এবং অন্যদেরকে যে রকম আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন সেটা দাসকে দাসের স্তর থেকে আপন ভাইয়ের স্তরে উন্নীত করে।

ইসলামে দাসপ্রথা নিষিদ্ধ ছিল না কিন্তু দাসদের প্রতি অমানবিক আচরণ প্রদর্শনে কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিল। তদুপতি ইসলাম দাসদের যোগ্যতা অনুসারে সমাজের অনেক উচ্চ আসনে

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠিত করেছে। দাসের নেতৃত্বে অনেক মনিব মালিককে পরিচালিত হতে দেখা গেছে। ক্রীতদাস বেলাল ছিলেন ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন। যায়েদ বিন হারিসের নেতৃত্বে পবিত্র কোরআন সংকলিত হয় এবং তিনি রাসুলের জীবদ্দশায় তাঁর ব্যক্তিগত সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। উসামা বিন যায়েদ সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর খেলাফত কালে। এমনিভাবে ইসলামের ইতিহাসে অনেক ক্রীতদাস শুধু সমাজে সম্মানজনক স্থানেই অধিষ্ঠিত ছিলেন না বরং তাদের উন্নত মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতা ও নিষ্ঠা দিয়ে ইসলামের ইতিহাসকে আরো গৌরবোজ্জ্বল করেছেন। ইসলাম দাসদেরকে অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়ে পণ্যদ্রব্যের স্তর থেকে আশরাফুল মাখলুকাত মানুষের স্তরে উন্নীত করেছে।

দাসত্ব, ক্রীতদাস প্রথা, জবরদস্তি শ্রম এবং এ-ধরনের আচার প্রথা সম্পর্কিত বিধি—

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিকভাবে অনুভূত হতে থাকে যে, এ ধরনের দাসপ্রথার অবলুপ্তি হওয়া প্রয়োজন। মানবেতর এসব প্রথার বিলোপসাধনের জন্য বিশ্ববিবেক সচেতন হয়ে উঠতে থাকে। ফলে যতই দিন যেতে লাগল, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সংস্থা গঠিত হয়ে এসব কুপ্রথার বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত সংগঠিত হতে থাকে।

লীগ অব নেশনস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ১৯২৬ সালে দাস প্রথা উচ্ছেদ কনভেনশন প্রণীত হয়। এই কনভেনশনের দ্বারা চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রসমূহ দাস-ব্যবসা বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ এবং যত দ্রুত সম্ভব সব ধরনের দাস ব্যবসা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ।

জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই বিশ্বসংস্থার উদ্যোগে দাসপ্রথা, দাস ব্যবসা এবং এসব সম্পর্কিত সমস্ত ধরনের প্রতিষ্ঠিত রীতি ও প্রথা সম্পূর্ণ উচ্ছেদের জন্য অতিরিক্ত কনভেনশন ১৯৫০ সালে গৃহিত এবং ১৯৫৭ সাল থেকে বলবৎ হয়েছে। এই কনভেনশনের মাধ্যমেই পক্ষভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ যে, যত দ্রুত সম্ভব ক্রমে ক্রমে তারা অন্যান্য আপত্তিকর প্রথা যেমন ঋণবদ্ধতা ও ভূমিদাসত্ব ধরনের প্রথা সম্পূর্ণ উচ্ছেদের জন্য ব্যবস্থাগ্রহণ করবে।

এই অনুচ্ছেদ ও বাংলাদেশের আইন

বাংলাদেশের আইন অনুসারে দাসত্ব ও দাস ব্যবসা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। দণ্ডবিধির ৩৭০ ও ৩৭১ ধারায় এ সম্পর্কে বিধি রয়েছে। নিম্নে এই ধারাগুলো উল্লেখ করছিঃ

ধারা ৩৭০। দাসরূপে কোন ব্যক্তিকে ক্রয় বা হস্তান্তর করা। —যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে দাসরূপে, আমদানি, রপ্তানি, অপসারণ, ক্রয়-বিক্রয় বা হস্তান্তর করে কিংবা কোন ব্যক্তিকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাসরূপে গ্রহণ, হস্তগত বা আটক করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ সাতবৎসর পর্যন্ত হইতে পারে—দণ্ডিত হইবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

www.pathagar.com

ধারা ৩৭১। অভ্যাসগতভাবে দাসব্যবসা পরিচালনা করা। —যে ব্যক্তি অভ্যাসগতভাবে দাস আমদানি, রপ্তানি, অপসারণ, ক্রয়, বিক্রয় বা বেচা-কেনা করে বা দাসের কারবার করে, সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা যে কোন বর্ণনার অনূর্ধ্বে দশ বৎসর মেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডনিয় হইবে।

সারসংক্ষেপ

দাসপ্রথা মানবতার কলঙ্ক। ইসলাম বলে, সকল মানুষই আল্লাহর খলিফা। সনাতন ধর্মে বলা হয়েছে, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। যীশু বলেন, তোমার প্রতিবেশিকে নিজের মতই ভালবাস। এসব কথার সারমর্ম এই যে, মানুষকে প্রভূ এবং দাস এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা একান্তই অন্যায়। তবুও বিশ্বের দেশে দেশে এই অন্যায় প্রথা একদিন প্রবলভাবে বিরাজমান ছিল। বলা হয় মিশরের পিরামিড এবং রোমান সভ্যতা দাস শ্রমের ফসল। সুখের কথা, চিহ্নিত রূপে, স্বীকৃত রূপে বা আইনসম্মত রূপে বিশ্বের কোথাও আজ আর দাসপ্রথা নেই।

আইনের চোখে না থাকলেও বস্তুত নানা আকারে, আকৃতি ও প্রকৃতিতে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দাস প্রথা আজো পৃথিবীতে টিকে আছে। এবং সেই কারণেই মানবাধিকারের ঘোষণার একটি অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, 'দাসত্ব প্রথা নিষিদ্ধ করা হলো।'

সারা জীবনের জন্য বা বংশপরম্পরায় যে মানুষ বা মনুষ্যশ্রেণী অন্যের গোলামি করে তারা ক্রীতদাস। তা না হলে নিয়ম শৃঙ্খলহীনভাবে ক্রমাগত অন্যের ন্যায় অন্যায় আদেশ নির্দেশ পালন করতে যারা বাধ্য হয় তারাও গোলাম।

বাংলোদেশে তো বটেই পৃথিবীর অনেক দরিদ্র দেশে অর্থের বিনিময়ে পুত্র কন্যা বিক্রয়ের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশ থেকে দারিদ্র্য-পীড়িত অসহায় শিশু ও নারী অনেক লোভী আদম বেপারির মাধ্যমে বিদেশে পাচার হয়ে অবশেষে ধনী পরিবারে বিক্রি হয়ে যায়। নামে না হলেও আসলে এরা দাস দাসি।

ধর্মগতভাবেও কোন কোন স্থানে এক শ্রেণীর মানুষকে এমন নিম্নশ্রেণীর বলে চিহ্নিত করা হয় যাদের একমাত্র কর্তব্য উচ্চবর্ণের মানুষদের সেবা করা। এই বিবেকহীন বর্ণাশ্রম প্রথা বিলুপ্তির পথে হলেও এখনো অপসারিত হয় নি।

একদিন ছিল যখন যুদ্ধ বন্দিদের দাসরূপে গণ্য করা হতো। বিখ্যাত উপন্যাস এবং ছবি 'Roots' স্পষ্টভাবে ইতিহাসের এক কলংকজনক অধ্যায় উদঘাটন করে দেখিয়েছে যে, এক যুগে শ্বেতকায় মানুষেরা কৃষ্ণকায় মানুষদের জোর করে ধরে নিয়ে জাহাজে ভরতো এবং সমুদ্র পাড়ি দিয়ে নিজ দেশে এনে দাস বানাতো। ইউরোপের আদি ইতিহাসে হাটে বাজারে, দাসদাসি কেনাবেচা হতো।

সভ্যতার ক্রম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের স্বতন্ত্র মানবিক মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে এবং মানুষ সেই মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে চলেছে।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ : ৫

কোন ব্যক্তিকে পীড়ন অথবা নিষ্ঠুর বা অমানবিক বা অপমানজনক আচরণ অথবা শাস্তির বিষয়বস্তুতে পরিণত করা যাবে না।

(Article :5. No one shall be subjucted to torture or to cruel, inhuman or degrating treatment or punishment.)

ভাষ্য

মানবিক অধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদ মানুষকে পাঁচটি বিশেষ অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি থেকে নিরাপত্তা প্রদান করেছে। সেই অনাকঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি বা অবস্থাগুলো হচ্ছে :

১. পীড়ন;

২. নিষ্ঠুরতা;

৩. অমানবিক আচরণ;

৪. অপমানজনক আচরণ;

৫. নিষ্ঠুর অমানবিক ও অপমানজনকশাস্তির শিকার।

উপরোক্ত পাঁচটি অবস্থা থেকে নিরাপত্তা লাভ করা প্রতিটি মানুষের মানবিক অধিকার। কিন্তু কেন? এই অবস্থাগুলো কি, কেন এবং কিভাবে সৃষ্টি হয়? এসবের মধ্যে তা বিশ্লেষণ করা দরকার। মানবিক অধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় এই বিষয়গুলো কেন স্থান পেল তা খতিয়ে দেখার জন্যই এই বিশ্লেষণ।

www.pathagar.com

নিপীড়ন (torture)

প্রথমেই আমরা দেখি নিপীড়ন বলতে কি বোঝায়। সাধারণভাবে নিপীড়ন হচ্ছে অসহনীয় রকমের দৈহিক বা মানসিক যন্ত্রণা। প্রহার, বধ, প্রতিহিংসা, মানসিক বা দৈহিক যাতনা এসবই নিপীড়নের আওতায় পড়ে।

নিপীড়ন অনেক রকম হতে পারে ঃ

প্রথমত, রাজনৈতিক নিপীড়নের কথাই ধরা যাক। শুধু মতাদর্শগত ভিন্নতা, পথের বৈপরিত্যের কারণে অথবা উপযুক্ত ও ন্যায্য পাওনার দাবি করার কারণে বিশ্বব্যাপী আজো অসংখ্য মানুষ নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। অধিকৃত পশ্চিম তীর ও গাজা এলাকার আরব যুবকদেরকে ইজরাইলের ভাষায় 'সন্ত্রাসবাদী' সংগঠন পিএলও'র সঙ্গে যোগাযোগ থাকার কথিত অভিযোগে ধরে নিয়ে চরম শারীরিক নির্যাতনের কাহিনী বিশ্ববাসীর নিকট সুবিদিত। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ শাসক কর্তৃক কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিকদের শুধু আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সদস্য হওয়ার অপরাধে প্রচণ্ড শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সাথে অথবা শাসকের সাথে ভিন্নমতের কারণে রুশ শাসক স্টালিনের আমলে অসংখ্য সোভিয়েত নাগরিককে সাইবেরিয়ার দাস শিবিরে পাঠিয়ে প্রচণ্ড দৈহিক নির্যাতনের কাহিনী এখন কিংবদন্তির মতো। এমনিভাবে হাইতি, উগাণ্ডা, সিরিয়া, ইরাক, পেরু, এঙ্গোলা, মোজাম্বিক, ভারতসহ পৃথিবীর অনেক দেশে রাজনেতিক প্রতিপক্ষের উপর শারীরিক নির্যাতন চালানো হচ্ছে। এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিবেদনে প্রতিবছরই অসংখ্য দেশে নিপীড়ন কোন কোন ক্ষেত্রে এতই মারাত্মক যে নিপিড়িতকে ধুকে ধুকে মৃত্যুর কোলে ঢ়লে পড়তে হয়। দেখা গেছে যে, যে সব দেশে গণতন্ত্র এখনো সত্যিকার অর্থে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি অথবা হয় নি, যেখানে সামরিক স্বৈরাচার, একদলীয় শাসন, রাজতন্ত্র ইত্যাদি চালু আছে সেসব দেশেই রাজনৈতিক কারণে নিপীড়নের মাত্রা বেশি। সাম্প্রতিক কালের কিছু রাজনৈতিক নিপীড়নের উদাহরণ হচ্ছে ইথিউপিয়া সরকার কর্তৃক ইরিত্রিয় মুক্তিকামী গেরিলাদের উপর নির্যাতন, ফিলিপিনো সামরিক বাহিনী কর্তৃক মরো ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের মুক্তিকামী জনতার উপর নির্যাতন, মায়ানমার-এর সামরিক জান্তা কর্তৃক নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়িনী অং সান সূকীসহ বার্মার গণতন্ত্রকামী জনতার উপর নির্যাতন, আলজেরিয়ার সামরিক বাহিনীর মদদপুষ্ট সরকার কর্তৃক সে দেশে মৌলবাদী মুসলিম নেতৃবৃন্দের উপর নির্যাতন, দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ কর্তৃক কৃষ্ণকায়দের উপর নির্যাতন, ইসরাইলি কর্তৃক আরবদের উপর নির্যাতন। এমনিতরো আরো কত নিপীড়নের ইতিহাস আছে। নিপিড়িতদের আর্তচিৎকার হয়তো আকাশ বাতাস ভারী করছে। জিন্দানখানায় কত বন্দি হয়তো মৃত্যুর প্রহর গুনছে, আমাদের কানে এসে পৌছতে পারছে না জালিমের অর্গল ভেদ করে। এসব নিপিড়িত মানুষের কি অপরাধ জানতে চাইলে হয়তো দেখা যাবে যে তেমন কিছুই নেই, তবুও এরা অপরাধী।

www.pathagar.com

অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনেতিক প্রতিপক্ষকে দমন করার জন্য 'রাষ্ট্রদ্রোহের' অভিযোগ আনা হয়। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেও দেখা যাবে প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে 'সরকার দ্রোহ'। ক্ষমতাসীন সরকার বা শাসকের সমালোচনা, জনগণের অধিকারের দাবি বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনই এসব মানুষের অপরাধ। এ ক্ষেত্রে সরকার এবং রাষ্ট্রকে একাকার করে নিয়ে সরকারের সমালোচনাকে রাষ্ট্রদ্রোহীতা হিসেবে আখ্যায়িত করে নির্যাতন চালানো হয়।

রাজনৈতিক নির্যাতনের মাত্রা হয় অত্যন্ত বেশি। যেহেতু শাসক গোষ্ঠীর হাতে সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকে, পুলিশ বাহিনী, সামরিক বাহিনী, কারাগার, সমরাস্ত্র ইত্যাদি সবই তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে সেহেতু কঠিন এবং পীড়াদায়ক শাস্তি প্রদানে তাদের জুড়ি মেলা ভার। যে সব শাসক নিপীড়ন চালিয়ে থাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের চরিত্র হয় নির্মম, কঠোর, হিংস্র। অত্যাচারী অমানবিকতা হয় তাদের বিশেষন। বর্তমানকালে বিশ্বে যত রকমের নির্যাতন হয় তার মধ্যে বোধ করি সংখ্যার এবং মাত্রায় বা পরিমাণে এবং ভয়াবহতায় রাজনৈতিক নির্যাতনই বেশি।

মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য যে সব মৌল অধিকার অত্যন্ত জরুরি সে সব অধিকারের চর্চা করতে গিয়েই মানুষ রাজনৈতিক নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। যেমন কথা বলার স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা, চলাফেরার স্বাধীনতা, পেশা ও বৃত্তির স্বাধীনতা, আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার ইত্যাদি রাজনৈতিক নিপীড়নের মাধ্যমে হরণ করা হয়। তাই রাজনৈতিক নিপীড়ন অমানবিক কাজ।

দ্বিতীয়ত, সামাজিক নিপীড়নের বিষয়টি যদি বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, এর পরিমাণ নিমর্মতা এবং ভয়াবহতাও কম নয়। গৃহভৃত্য বা ঘরের কাজের ছেলে মেয়ের উপর নির্যাতন, স্বামী কর্তৃক স্ত্রী নির্যাতন, শ্বশুর শ্বাশুড়ি কর্তৃক বধূ নির্যাতন, মালিক বা মালিকের অনুগত কর্তৃক শ্রমিক নির্যাতন, জোতদার কর্তৃক কৃষক নির্যাতন ইত্যাদির পরিমাণও ব্যাপক। এই নির্যাতন সর্বত্র না হলেও ক্ষেত্র বিশেষে অত্যন্ত ভয়াবহ ও মর্মান্তিক। এসব নির্যাতনের শিকার হয়ে মৃত্যুর ঘটনাও একেবারে স্বল্প নয়। যারা সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে নিপিড়িত হয় তাদের পক্ষে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। সামাজিক নিপীড়ন সুস্থ সমাজ বিকাশের অন্তরায়। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার আচ্ছন্ন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতেই সামাজিক নিপীড়নের মাত্রা বেশি। অভাব দারিদ্র্য এবং নানাবিধ সংকট মানুষকে নিপীড়নের শিকারে পরিণত করে। অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তারের প্রবণতা, ক্ষমতা কুক্ষিগত করার মনোভাব মানুষের মধ্যে হিংসা দ্বেষ, হিংস্রতা জাগিয়ে তোলে। এসবই নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে বেইজিং থেকে এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, চিনে অপরাধ বিরোধী উপর্যুপরি অভিযানের ফলে গত দশকে সে দেশের কয়েদিদের উপর নির্যাতন আরো ব্যাপক ও নির্মম আকার ধারণ করে। কয়েদিদের উপর নির্যাতন চালানো

www.pathagar.com

জন্য যে সব পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তার মধ্যে কয়েকটি ছিল—বন্দুকের বাট দিয়ে আঘাত, অস্বস্তিকর অবস্থায় শৃঙ্খলিত রাখা, ক্ষুদ্র অন্ধকার সেলে আটক রাখা, ঘুমোতে না দেওয়া এবং প্রচণ্ড শীত বা গরমের মধ্যে রাখা। এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলছে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য কয়েদিদের উপর পুলিশি নির্যাতন চিনের অনেক কারাগারেই একটি নিয়মিত ব্যাপারে হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হয় তাদের বেশির ভাগই অশিক্ষিত বা গরীব কয়েদি। ১৯৮৯ সালে তিয়ানম্যান স্কোয়ারে গণতন্ত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের উপর নির্যাতন চালানো হয়। সাম্প্রতিক কালে সার্ব মিলিশিয়াদের হাতে সাবেক যুগোশ্লাভিয়ায় মুসলিম ও ক্রোয়েশিয় হাজার হাজার মানুষ চরম নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো সার্বীয় বাহিনীর আচরণকে মানবতার বিরুদ্ধে চরম অপরাধ বলে উল্লেখ করেছে। ১৯৯২ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী গুয়াতেমালার রিগোবার্তা মেঞ্চু (৩৩) এর সেদেশে সামরিক বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে নির্যাতিত হয়ে নিহত হন তার পরিবারের সদস্যরা। নিপীড়নের এমন কাহিনী আরো কত রয়েছে, হয়তো আরো কত সৃষ্টি হবে।

রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডও এক ধরনের রাজনৈতিক নিপীড়ন। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে আইনসম্মত নয় এমনভাবে যুগে যুগে অনেক মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। সম্ভবত রাজনৈতিক তৎপরতা শুরুর সাথে সাথেই রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডও শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক নিপীড়ন ও নিষ্ঠুরতার উদাহরণ এমন কিছু হত্যাকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে পেশ করছি।

১৬৬০ সালে বিচ্ছিন্নতাবাদী রোমান ক্যাথলিক কর্তৃক রাজা চতুর্থ হেনরি হত্যা, ১৭৯৩ সালে চ্যাবলোড কর্ডি কর্তৃক ফরাসি বিপ্লবী জিন পল ম্যারোট হত্যা, ১৮৬৫ সালে জন উইলফিস বুথ কর্তৃক আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন হত্যা, ১৮৮১ সালে রাশিয়ার দ্বিতীয় জার আলোকজাণ্ডার হত্যা, ১৯১৪ সালে অস্ট্রিয়ার আর্চ ডিউক ফ্রাঙ্ক ফার্ডিনাণ্ড হত্যা যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করেছিল, ১৯৪০ সালে স্ট্যালিনের নির্দেশে রুশ বিপ্লবী ট্রটস্কি হত্যা—এসবই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপূর্ব রাজনৈতিক নিষ্ঠুরতার উদাহরণ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ববাসী জাতিসংঘের মাধ্যমে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা প্রদানের পরও পৃথিবীর দেশে দেশে নিষ্ঠুরভাবে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটেই যাচ্ছে। ১৯৪৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া কয়েকটি নিষ্ঠুর রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বয়ান নিম্নে দেয়া হচ্ছে।

১৯৪৮ : নাথুরাম গডসে কর্তৃক ভারতের অবিসংবাদিত নেতা মহাত্মা গান্ধী হত্যা। ১৯৫১ : জনৈক তরুণ কর্তৃক জর্ডানের বাদশাহ আবদুল্লাহ হত্যা। ১৯৫৯ : উগ্রবাদী বৌদ্ধ ভিক্ষুর হাতে শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী সলোমন বন্দরনায়েক নিহত হন। ১৯৬১ : এলিজাবেথ ডিলে কাটাগিজ সৈন্য কর্তৃক মধ্য আফ্রিকান রাষ্ট্র কঙ্গোর সাবেক প্রধানমন্ত্রী প্যাট্রিক লুবুম্বা নিহত হন। ১৯৬১ : অজ্ঞাত গুপ্ত ঘাতকের হাতে প্রাণ হারান ডমিনিকান প্রজাতন্ত্রের এক নায়ক রাফায়েল ট্রুজিলো। ১৯৬৩ :

www.pathagar.com

গুপ্তঘাতক হারডে অসওয়াল্ড হত্যা করে আমেরিকার তরুণ প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডিকে। ১৯৬৬ : পার্লামেন্ট সংবাদবাহক কর্তৃক নিহত হন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী হেনড্রিক ভাবওয়ার্ড। ১৯৬৮ : শ্বেতাঙ্গ গুপ্তঘাতক জেমস আলরে কর্তৃক নিহত হন আমেরিকার কৃষ্ণকায়দের অধিকার আন্দোলনের নেতা মার্টিন লুথার কিং। ১৯৬৯ : নাইরোবিতে হত্যা করা হয় কেনিয়ার মন্ত্রী মবুমাকে। ১৯৭৩ : মাদ্রিদে বোমা বিস্ফোরণে নিহত হন স্প্যানিশ প্রধানমন্ত্রী লুইস ক্যারোবা রানকো। ১৯৭৫ : ভ্রাতুষ্পুত্রের হাতে নিহত হন সৌদি আরবের বাদশাহ্ ফয়সল। ১৯৭৫ : বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হন ঘাতকের আঘাতে। একই সালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিহত হন চার জাতীয় নেতা। ১৯৭৬ : ওয়াশিংটনে গাড়ি বোমায় নিহত হন চিলির সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ওরল্যাণ্ড লেটেলিয়ার। ১৯৭৭ : মধ্য লেবাননে অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে নিহত হন দ্রুজ নেতা কামাল জুলমাত। ১৯৭৯ : ভারতের সর্বশেষ বৃটিশ বড়লাট মাউন্টব্যাটন আইরিশ উপকূলে আইরিশ গেরিলাদের পেতে রাখা বোমায় নিহত হন। গোয়েন্দা প্রধানের হাতে নিহত হন দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট পার্ক চুংহি। ১৯৮১ : কতিপয় উচ্চাভিলাষী সামরিক অফিসারের হাতে চট্টগ্রামে নিহত হন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। তেহরানে একই সঙ্গে বোমা বিস্ফোরণে নিহত হন ইরানের প্রেসিডেন্ট আলি রাজাই, প্রধানমন্ত্রী জাভেদ বাহানোর, প্রধান বিচারপতি আয়াতুল্লাহ বেহেশতি এবং বেশ ক'জন মন্ত্রী ও সাংসদ। কায়রোতে সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হন মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত। ১৯৮২ : বৈরুতে বোমা বিস্ফোরণে নিহত হন লেবাননের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বশির জামায়েল। ১৯৮৩ : ম্যানিলা বিমানবন্দরে বন্দুকধারীদের গুলিতে নিহত হন ফিলিপাইনের বিরোধী দলনেতা একুইনো। ১৯৮৪ : শিখ দেহরক্ষিদের গুলিতে নিহত হন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি। ১৯৮৬ ঃ স্টকহোমে অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে নিহত হন সুইডিস প্রধানমন্ত্রী ওলফ পামে। ১৯৮৭ : বোমা বিস্ফোরণে নিহত হন লেবাননের প্রধানমন্ত্রী রশিদ কারামি। ১৯৮৮ : তিউনিসে ইসরাইলি ঘাতক কর্তৃক নিহত হন প্যালেস্টাইনি কমাণ্ডো প্রধান আবু জিয়াদ। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক নিহত হন বিমানে বোমা বিস্ফারণে। ১৯৮৯ : বোগোটার রাজপথে কলম্বোর প্রেসিডেন্ট লুইস কার্লোস পালান নিহত হন বন্দুকধারীদের হাতে। ১৯৮৯ : বৈরুতে বোমা বিস্ফোরণে লেবাননের প্রেসিডেন্ট বেনে মুয়াদ নিহত হন। ১৯৯০ : বন্দুকধারীদের গুলিতে মিশরের স্পীকার রিফাত মাহজীন নিহত হন কায়রোয়। ১৯৯১ : সন্ত্রাসীদের আত্মঘাতী বোমা হামলায় নিহত হন ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজিব গান্ধী। ১৯৯৩ : আত্মঘাতী বোমা হামলায় নিহত হন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট রানা সিংগে প্রেমাদাসা। এই হত্যাকাণ্ডগুলো হচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর তৎপরতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই নিষ্ঠুরতা শুধু ব্যক্তির বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয়নি, ক্ষেত্র বিশেষে এক একটি জাতির বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে শুধু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দই নিষ্ঠুরতার শিকার হন নি, তাদের সাথে সহকর্মী, আত্মীয় স্বজন, দেহরক্ষীসহ আরো অনেকেই নিষ্ঠুর ঘটনার শিকার হয়েছেন। তাই রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডকে আমরা বলতে পারি মানবতার প্রতি নিষ্ঠুতার প্রদর্শন।

www.pathagar.com

এক একটি রাজনেতিক হত্যাকাণ্ডের সময় এক একটি জাতি চরম সংকটের মধ্যে পতিত হয়েছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা, নেতৃত্বের শূন্যতা জাতিকে গ্রাস করেছে। নিষ্ঠুরভাবে এক বা একাধিক ব্যক্তির জীবন হরণ অগণিত মানুষের জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছে। তৃতীয় বিশ্বেই এই নিষ্ঠুরতার মাত্রা বেশি।

বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আমলে রক্ষীবাহিনী কর্তৃক নির্যাতনের কাহিনী নিষ্ঠুরতা ও অমানবিকতার অন্যতম দৃষ্টান্ত। তেমনি অভিযোগ রয়েছে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আমলে অনেকগুলো ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থান প্রয়াসের উদ্যোক্তাদের নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে হত্যার।

নারী নিপীড়ন, নারী নির্যাতন

কবি নজরুল বলেছিলেন—

'বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।'

কিন্তু আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (ILO) বলছে যে, মানব সভ্যতা গড়ে তুলতে যে শ্রম দিচ্ছে মানুষ, তার দুই তৃতীয়াংশই নারীর। এই নারী সমাজ নিপিড়িত হচ্ছে, নির্যাতিত হচ্ছে দুনিয়াজোড়া। যুদ্ধের সময় এবং শান্তির সময় সর্বাবস্থায় সর্বত্রই নারীরা নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। আমাদের দেশে নারীরা জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি বিভিন্ন বয়সে বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হচ্ছে। শৈশব থেকেই নির্যাতনের শুরু। অতপর বিয়ে, মাতৃত্ব, বৈবাহিক জীবনের সকল ক্ষেত্রেই কম বেশি নির্যাতন অব্যাহত থাকে। হত্যা, ধর্ষণ , অপহরণ, সম্পত্তি-কলহ, তালাক, বহুবিবাহ ইত্যাদি কত রকমের নির্যাতন চালু নারীর উপর তার কোন ইয়ত্তা নেই। মা, বোন, কন্যা, স্ত্রী ইত্যাদি কোন অবস্থাতেই নারী নিপীড়নমুক্ত নয়।

বিভিন্ন কারণে আমাদের দেশে নারী নিপীড়নের মাত্রা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্পদের স্বল্পতা, যুবকদের বেকারত্ব, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, নৈতিক অবক্ষয়, ধর্মীয় গোড়ামি ও কুসংস্কার ইত্যাদি নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ। বস্তুত আমাদের দেশের সমাজ কাঠামোই এমন যা, নারী নির্যাতন বা নারী নিপীড়নকে কঠোর হাতে রোধ করতে পারে না।

নারী যৌন নিপীড়নেরও শিকার হচ্ছে বিশ্বব্যাপী। নারী পুরুষ পরস্পরের পরিপূরক। পুরুষ বা নারীবিহীন সমাজ অকল্পনীয় ও অসম্ভব। অতএব নারীর জন্য পুরুষ যেমন অপরিহার্য তেমনি পুরুষের জন্য নারী। নারীপুরুষের স্বাভাবিক ও নিয়মমাফিক সম্পর্ক প্রত্যাশিত ও অপরিহার্য। পুরুষ ও নারীর যৌন সম্পর্কও স্বাভাবিক। কিন্তু এই স্বাভাবিকতাকে অতিক্রম করে নারী দেশে দেশে পুরুষ কর্তৃক যৌন নিপীড়নের শিকারে পরিণত হচ্ছে। স্কুল, কলেজ, রাস্তাঘাট, দোকান, সিনেমাহল, গ্রাম, গঞ্জ, শহর, বন্দর সর্বত্রই মেয়েরা যৌনপীড়নের শিকার। শিস দেয়া, উত্যক্ত করা

www.pathagar.com

থেকে শুরু করে এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ, ধর্ষণ করতে না পেরে ছুরিকাঘাত, ধর্ষণের পর হত্যা ইত্যাদি যৌন পীড়নের প্রকৃষ্ট সাক্ষি। পতিতাবৃত্তিও যৌন নিপীড়নেরই অন্যতম উদাহরণ।

শুধু প্রাচ্যে নয় পাশ্চাত্যেও, শুধু দরিদ্র দেশে নয় ধনী দেশেও নারীরা যৌন পীড়নের শিকার হচ্ছে। এটা সামাজিক অর্থনৈতিক কারণের পাশাপাশি রাজনৈতিক কারণেও হয়ে থাকে। সাম্প্রতিককালে বসনিয়া হারজেগোভিনার মুসলিম নারীরা যে যৌন পীড়নের শিকার হচ্ছে তা অতীতের যে কোন যৌনপীড়নের চেয়ে অধিক ভয়াবহ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নাজি বাহিনীর নিপীড়নের মাত্রাকেও তা হার মানিয়েছে। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদ এ জাতীয় নিপীড়নের অবসানের জন্যই ঘোষিত হয়েছে।

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশ সরকার যে সব আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, তা হচ্ছে—

(১) যৌতুক প্রথা নিষিদ্ধকরণ আইন,

(২) নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে নিবর্তনমূলক অধ্যাদেশ,

(৩) বাল্যবিবাহ বন্ধের অধ্যাদেশ,

(৪) পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ।

সরকার কর্তৃক এই সব প্রয়োগকৃত আইন সংগঠিত অপরাধের শাস্তি বিধান করে সত্য কিন্তু নারী নিপীড়ন বা নারী নির্যাতন রোধের জন্য এসবই যথার্থ বা যথেষ্ট নয়।

যুদ্ধের সময় নারীরাই বেশি নির্যাতনের শিকার হয়। ১৯৭১ সালে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী এবং তাদের এ দেশীয় দোসরদের হাতে কি পরিমাণ নারী ধর্ষিতা বা লাঞ্ছিতা হয়েছে তার কোন হিসেব নিকেশ নেই। তদুপরি তাদের পুনর্বাসিত করার পদ্ধতিটাও নিপীড়নমূলক। এই নিপীড়ন শারীরিক নয় বরং মানসিক। কারণ স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধকালে ধর্ষিতা নারীদের 'বীরাঙ্গনা' উপাধি দিয়ে সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। সম্প্রতি ক্রোয়েশিয়ার লক্ষ লক্ষ মুসলিম নারী সার্বিয়দের হাতে নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এই নির্যাতনের মাত্রা অমানবিক, নজিরবিহীন ও হৃদয়বিদারক।

মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতন

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস যেমন দীর্ঘ তেমনি দীর্ঘ আমাদের ত্যাগের ইতিহাস। তেমনি ভয়াবহ আমাদের উপর বয়ে যাওয়া নির্যাতনের কাহিনী। এ জাতির উপর বোধকরি সবচেয়ে বেশি নির্যাতন চলেছে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত। মুক্তিযুদ্ধের এই নয় মাসে জাতির উপর যে নজিরবিহীন নির্যাতন চালানো হয়েছে তা ইতিহাসে বিরল। ঘরদোর জ্বালিয়ে দিয়ে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করে, জীবিতদের ঘরদোর থেকে বহিস্কার করে

www.pathagar.com

বিবাহিত, অবিবাহিত নারীদের ধর্ষণ করে, কারাগারে আটকে রেখে নির্যাতন চালানো হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে নির্যাতন ও নিপীড়নের মর্মন্তুদ কাহিনী বিভিন্ন পুস্তক, পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে এর বয়ান দেয়া সম্ভব নয়। শুধু এটুকু বলা যায় যে, এদেশের ইতিহাসে ইতিপূর্বেকার সকল নির্যাতনের মাত্রাকে ছাড়িয়ে গেছে মুক্তিযুদ্ধকালীন নির্যাতন। আজো বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়াগায় গণকবর অবিষ্কার হচ্ছে সেখানে পাওয়া যাচ্ছে অসংখ্য মানুষের মাথার খুলি আর হাড়-গোড়, কঙ্কাল।

২৫শে মার্চের কালো রাতেই পাক বাহিনীর লক্ষ্য ছিল এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা, উপনেতা, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র-শিক্ষকদের হত্যা করা। এবং ই.পি.আর , পুলিশ বাহিনী, সংবাদপত্র ও সংবাদসংস্থাগুলো ধ্বংস সাধন করা। জনগণের মনে ব্যাপক ত্রাসের সৃষ্টি করে বাঙালিদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করার জন্য পাঞ্জাবিরা প্রথম রাতেই ঢাকা শহরে তিন ব্যাটেলিয়ান সৈন্য নামায়। এরা ট্যাংক, বোমাসহ সকল প্রকার আধুনিক সমরাস্ত্র ব্যবহার করে। হত্যা, লুণ্ঠন ও ঘরে অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে এরা কায়েম করে ত্রাসের রাজত্ব। শুধু তাই নয়, এরা গ্রাম অবরোধ করে। ভীত সন্ত্রস্ত গ্রামবাসীদের মধ্যে যারা পারে পালাতে থাকে আর যারা পালাতে পারে নি তারা ধরা পড়ে, নিহত হয়। হানাদাররা নারী ধর্ষণ করে, বালিকা ও তরুণীদর ধরে নিয়ে যায় সেনা ছাউনিতে। হাজার নিরস্ত্র কৃষককে গুলি করে অথবা বেয়নেটের খোঁচায় ক্ষতবিক্ষত করে হত্যা করা হয়। শিশুদের শূন্যে ছুঁড়ে ফেলে এরা উল্লাস প্রকাশ করেছে। সভ্যতার ইতিহাসে নজিরবিহীন এই নির্যাতন।

নিষ্ঠুর আচরণ (Cruel treatment)

মানবিক অধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের অনুচ্ছেদ ৫ (পাঁচ) মানুষকে নিষ্ঠুর আচরণ থেকে নিরাপত্তা প্রদান করে। প্রশ্ন হচ্ছে নিষ্ঠুরতা কি? সাধারণভাবে নির্দয়, নির্মম, কঠোর, কঠিন, ক্রুর ও নৃশংস আচরণকে আমরা নিষ্ঠুর আচরণ বলে অভিহিত করি। নিষ্ঠুরতা একটি অমানবিক কাজ। যে সকল কাজের মাধ্যমে নির্দয়তা, নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পায় সে সকল কাজ বা আচরণকে আমরা নিষ্ঠুর বলতে পারি।

যে সব দেশে মৃত্যুদণ্ড চালু আছে , সে সব দেশে আইনের মাধ্যমে উপযুক্ত বিচারালয় যখন কোন মানুষকে তার কৃত অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে, সে সব দেশেরও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার সময় নিষ্ঠুর আচরণ করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ রয়েছে। আইন প্রয়োগ করার জন্যও নিষ্ঠুর আচরণ করা বা নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করার কোন সুযোগ নেই।

নিষ্ঠুর আচরণ হচ্ছে নির্যাতনের চরম মাত্রা। প্রেমে ব্যর্থ হয়ে প্রেমিকার শরীরে এসিড নিক্ষেপ, কাজের মেয়ের গায়ে জ্বলন্ত কিছু চেপে ধরা বা গরম পানি ঢেলে দেয়া, চুরির অভিযোগে ধরে গণপিটুনি দেয়া, চোখ উপড়ে ফেলা, গৃহে আগুন দেওয়া, শরীরে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে

www.pathagar.com

দেওয়া ইত্যাদি হচ্ছে নিষ্ঠুরতার কতিপয় উদাহরণ। এ ছাড়াও আমাদের সমাজে নানা রকমের নিষ্ঠুর আচরণ চলছে।

ইতিহাসে কিছু রোমহর্ষক নিষ্ঠুরতার বর্ণনা পাওয়া যায়, যেগুলো শুনলে শ্রোতার গা শিউরে ওঠে। এসবের অনেকগুলোর অবলম্বনে পরবর্তীকালে সৃষ্টি হয়েছে অনেক মুল্যবান সাড়া জাগানো উপন্যাস। কারবালার ঐতিহাসিক নিষ্ঠুর ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত হয়ে মীর মোশাররফ হোসেনের অমর সৃষ্টি বিষাদ সিন্ধু। সিমারের নিষ্ঠুর আচরণের কাহিনী আজো মানুষকে ব্যথাতুর করে তোলে। ইউরোপর বিভিন্ন যুদ্ধের পর যুদ্ধবন্দিদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের কাহিনী অগণিত। সিন্ধু বিজেতা আরব সেনাপতি মোহাম্মদ বিন কাশিমকে জীবিত অবস্থায় কাঁচা চামড়ার বস্তাবন্দি করে তৎকালিন খলিফার দরবারে প্রেরণের কথিত কাহিনী নিষ্ঠুরতার এক ভয়ংকর চিত্র। ইসলামপূর্ব আরবে কন্যা সন্তান হলে জীবন্ত সমাহিত করার ঘটনা ইতিহাসে উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষে সহমরণ বা সতীদাহ প্রথা এই বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত সদর্পে প্রচলিত ছিল, এবং আছে। বেত্রাগাত, পাথর নিক্ষেপ, শূলে চড়িয়ে বা ফাঁসিতে মৃত্যুদণ্ড অনেকগুলো নিষ্ঠুর শাস্তির কয়েকটি। নিষ্ঠুর শাস্তির ক্ষেত্রে নিষ্ঠুরতা অবলম্বনের যৌক্তিকতা নিয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে। মানুষই বিবিধ রকমের নিষ্ঠুতার উদ্ভাবক আবার মানুষই এর বিরুদ্ধে ক্রমশ প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। কারণ যিনি নিষ্ঠুর আচরণ করছেন, সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে তিনিও নিষ্ঠুরতার শিকারে পরিণত হতে পারেন।

সভ্য সমাজের কিছু রাজনৈতিক নিষ্ঠুরতার উদাহরণ দিচ্ছি এবার

১৩ই এপ্রিল ১৯১৯ সাল। পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগ। ইতিহাসের বিখ্যাত জালিয়ানওয়ালাবাগে সেদিন বৈশাখী মেলায় মিলিত হয়েছিল হাজার হাজার মানুষ। শিশু–কিশোর যুবা–বৃদ্ধ সর্বস্তরের মানুষ জমায়েত হয়েছিল সেখানে। বিশাল মাঠে প্রবেশ এবং বের হওয়ার একটি মাত্র রাস্তা ছিল। সেই রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করে ইংরেজ সেনাপতি ডায়ারের বাহিনী। তারা বিনা উস্কানীতে নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে হত্যা করে নিরীহ জনতাকে। ভীত সন্ত্রস্থ জনতা প্রাণ বাঁচাবার বহু চেষ্টা করেছে কিন্তু ডায়ারের বাহিনীর হাত থেকে তারা কোন অবস্থাতেই মুক্তি পায় নি। গুলিবর্ষণ, বেয়নেটের খোঁচা আর পাথর চাপা দিয়ে ডায়ার হত্যা করেছে অসংখ্য অগণিত মানুষকে। পনেরো মিনিট পর্যন্ত একটি মাঠের মধ্যে আটকে রেখে পালানোর সকল পথ বন্ধ করে অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণের মধ্য দিয়ে নিষ্ঠুরতার চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সুসভ্য জাতি বলে পরিচিত ইংরেজদের প্রতিভূ জেনারেল ডায়ার। এই উপমহাদেশে ইংরেজদের নিষ্ঠুরতার আরো অনকে নজির আছে। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের পর ইংরেজরা অসংখ্য ভারতীয়কে বিনা অপরাধে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে।

www.pathagar.com

দীর্ঘদিন ধরে ইসরাইলি নিষ্ঠুরতার স্বাক্ষর বয়ে বেড়াচ্ছে রক্তাক্ত ফিলিস্তিন। ১৯৪৮ সালের ৯ই এপ্রিল ইসরাইলিরা আক্রমন করেছিল জেরুজালেমের নিকটবর্তী ক্ষুদ্র গ্রাম দেইন ইয়াসিন। তারা হাতবোমা ছুঁড়ে মারত ঘরের ভেতর, তরুণীদেরকে ধরে নিয়ে গেল ধর্ষনের উদ্দেশ্যে। নিরীহ নিরপরাধ ঘুমন্ত গ্রামবাসীদের উপর ইসরাইলি বর্বরতার পরদিন আন্তর্জাতিক রেডক্রস প্রতিনিধি ২৫৪টি মৃতদেহ দেখতে পান এবং দেখতে পান ৯ জন মহিলার অগ্নিদগ্ধ দেহাবশেষ। ১৯৫৩ সালে ১৪ই অক্টোবর রাত ৯টা ত্রিশ মিনিটে আরেক গ্রাম 'কিবিয়াহ' আক্রান্ত হয় ইসরাইলিদের দ্বারা। অবিরাম ইসরাইলিদের মর্টারের গোলাবর্ষণে ধ্বংস হয় গ্রাম নিহত হয় নারী শিশুসহ গ্রামবাসি। ১৯৫৫ সালের ২৩শে অক্টোবর ইসরাইলি জল্লাদরা হানা দেয় কাকরে কাশিম গ্রামে। তাদের মেশিন গানের গুলিবর্ষণে নিহত হয় ৫১ জন ফিলিস্তিনি আর আহত হয় আরো অনেকে। ১৯৫৬ সালে গাজায় ৪৮০ জন, রাকাহ-তে ৩০০ জন্য , খান ইউনিসে ৯৫০ জন আরবকে হত্যা করে ইসরাইলিরা। ৪০ জন ফিলিস্তিনী ছাত্রকে ধরে নিয়ে হত্যা করে তাদের লাশ বিরাট গর্তে মাটি চাপা দেয়। এমনি ধরনের ইসরাইলি নিষ্ঠুরতার কত ঘটনা কত কাহিনী রয়েছে তার বর্ণনা করলে সেটিই একটি বিরাট গ্রন্থ হয়ে উঠবে।

আমাদের দেশের সামাজিক অবস্থা যদি পর্যালোচনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, নিষ্ঠুরতা এই সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে আছে। পত্রিকার পাতা উল্টোলেই নিষ্ঠুরতার ছবি চোখে পড়ে। এসবের মধ্যে রয়েছে জোরপূর্বক কিশোরী ধর্ষন, এসিড নিক্ষেপ, কাজের মেয়ের গায়ে গরম পানি নিক্ষেপ, গৃহবধূ খুন ইত্যাদি। এদেশের সমাজের এসব অসঙ্গতি ও নিষ্ঠুরতার চিত্র ফুটে উঠেছে খ্যাতিমান কথাশিল্পীদের রচনায়। জহির রায়হানের সংশপ্তক উপন্যাসের হুরমতির কপালে জ্বলন্ত পয়সা চেপে ধরা অত্যন্ত ভয়াবহ একটি নিষ্ঠুরতার উদাহরণ। এমনিভাবে গ্রাম্য বিচার সালিশে কত নিরীহ নিরপরাধ মানুষ যে শাস্তির শিকার হচ্ছে তার হিসাব দেবে কে। এমনি করে সংশপ্তকের রমজান আর ফেলুর মতো কত রমজান, ফেলু চক্র যে মানুষের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করে উল্লাসে ফেটে পড়ে প্রতিদিন মানবতাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাচ্ছে। আজো গ্রাম বাংলার বিচারের নামে ক্ষমতাবানরা অসহায় অশিক্ষিত মানুষের প্রতি অবর্ণনীয় নিষ্ঠুর আচরণ করছে। বিভিন্ন সংস্থার গবেষকদের প্রতিবেদনে প্রায়ই এর উল্লেখ পাওয়া যায়। অশিক্ষিত অজ্ঞ, ক্ষমতাহীন, দুর্বল দরিদ্র মানুষ প্রায়ই নিষ্ঠুরতার শিকার হয়। নিষ্ঠুরতা যেন এদের ললাট লিখন।

ভারত উপমহাদেশের নারী সমাজ স্মরণাতীত কাল থেকে এক নজিরবিহীন নিষ্ঠুরতার শিকার। ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সকল দিক থেকেই নারীদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করা হচ্ছে। স্বামীর সাথে জীবন্ত অবস্থায় জ্বলন্ত চিতায় ঝাপ দিয়ে এবং অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে স্বীয় সতীত্বের প্রমাণ দেয়ার মতো নিষ্ঠুর নিয়ম এই ভারত উপমহাদেশে দীর্ঘদিন পর্যন্ত প্রবল প্রতিপত্তির সাথে টিকে ছিল সামাজিক রীতি ও ধর্মীয় অনুশাসন হিসেবে। সামাজিক রীতি অনুসারে বিধবা কিশোরীদেরকে আজীবন বৈধব্য বরণ করে চলতে হতো। সতীদাহ প্রথা গেছে, চালু হয়েছে বিধবা বিবাহ প্রথা। কিন্তু তাই বলে নিষ্ঠুরতা কি একেবারেই

www.pathagar.com

অপসৃত হয়েছে, হয়নি। আজো বিভিন্ন অজুহাতে, বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় নারীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করা হচ্ছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলে নূরজাহান নামের এক মহিলাকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করার মতো নিষ্ঠুরতা এবং নৃশংসতাও ঘটেছে। এমনিভাবে কত নূরজাহানের কপাল ভাঙছে তার হিসেব দেবে কে? ১৯৮৫ সালের ১০ই এপ্রিল টানবাজার পতিতালয়ে নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল শবমেহের। এমনি কত শবমেহের আমাদের সভ্য সমাজ থেকে প্রতিদিন পরপারে পাড়ি জমাচ্ছে অথবা মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর জীবন বয়ে বেড়াচ্ছে তার হিসেবে আমাদের অজ্ঞাত।

ক্ষণিকের আনন্দ, বেপরোয়া আবেগ বা মুহূর্তের ভুল যে অনাকাঙ্ক্ষিত মানব শিশুর পৃথিবীতে পদার্পণের কারণ হয়ে দাঁড়ায় সেই শিশুকে ডাস্টবিনে ফেলে দেয়া নিষ্ঠুরতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আরব মুল্লুকে, শুনেছি আজও প্রচলিত আছে, উটের দৌড় প্রতিযোগিতায় কিশোরদের আরোহী করা হয় এবং এই কিশোররা দৌড়ের এক পর্যায়ে উটের পিঠ থেকে পড়ে পায়ে পিষ্ঠ হয়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। নিষ্ঠুরতার এটা আরেকটা উদাহরণ।

১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে ভারতে উগ্র হিন্দু মৌলবাদীদের দ্বারা বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক'জন মানুষকে ধরে গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বোম্বাই শহরে, নিষ্ঠুরতা আর কাকে বলে। শ্রীলঙ্কার জাফনা উপদ্বীপে তামিল টাইগার্স ইলমের দ্বারা সিংহলি নাগরিকদের হত্যা, নির্যাতন নিষ্ঠুরতাকেও হার মানায়।

এই আধুনিক পৃথিবীতেও নিষ্ঠুর ঘটনা বিরল নয়। প্রতিদিনের পত্রিকায় চোখ বুলালেই ভেসে ওঠে দেশ বিদেশের এমন অসংখ্য খবর—যা নিষ্ঠুরতা, নির্মমতা নির্দয়তা এবং নৃশংসতার এক একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা মানুষকে মানুষের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ না করতে এবং নিষ্ঠুর আচরণের শিকারে পরিণত না করতে বলেছে।

অমানবিক আচরণ (inhuman treatment)

মানবিক অধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদ তৃতীয় যে বিষয়টি থেকে মানুষকে নিরাপত্তা প্রদান করে সেটি হচ্ছে অমানবিক আচরণ। প্রশ্ন আসতে পারে যে অমানবিক আচরণ কি। সাধারণভাবে আমরা মানুষের পক্ষে যা সম্ভবপর নয় এবং মানুষের জন্য যা উপযুক্ত নয় তাকে অমানবিক কাজ বলতে পারি।

যে কাজ মানুষ করতে পারে না, মানুষের পক্ষে করা সম্ভবপর নয়, সে কাজ করতে যদি মানুষকে বাধ্য করা হয় তাহলে সেটা হবে অমানবিক আচরণ। যেমন রেলকলের ঘানি টানা মানুষের কর্ম নয়, তেমনি মানুষের কাজ নয় জমিতে লাঙ্গল টানা। এসব কাজ করতে কোন মানুষ যখন বাধ্য হয় তখনই তার উপর অমানবিক আচরণ করা হয়।

www.pathagar.com

মানুষের মুখে গ্রাস কেড়ে নেওয়া মানুষের পক্ষে উপযুক্ত কাজ নয়। যদি কেউ এই কাজটি করে তবে তা হবে অমানবিক আচরণ। যিনি নিজে অন্যের প্রতি অমানুষিক আচরণ করেন তিনি নিজেও তার নিজের প্রতি অন্যের অমানুষিক আচরণ বরদাশত করেন না। মানুষের সমাজে মানুষের কাছ থেকে মানুষ আশা করে মানবিক কাজ। হিংসা যেমন প্রতিহিংসার জন্ম দেয় তেমনি অমানবিক কাজ অমানবিক কাজের জন্ম দেয়। মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ যত কম হবে, অমানবিক আচরণ তত বেশি হবে। একটি সুস্থ সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল প্রকার অমানবিক আচরণ থেকে মানুষকে রক্ষার জন্য মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় এই রক্ষাকবচ রয়েছে।

মানহানিকর আচরণ (degrading treatment)

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় মানুষকে অপমানজনক, মানহানিকর আচরণ থেকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে। মানহানি বলতে আমরা বুঝি পদমর্যাদা, শ্রেণী, সম্মান, মূল্য, অবস্থা, চরিত্রের উৎকর্ষ প্রভৃতি হ্রাস করা । মানহানীর বিষয়টি কিঞ্চিত বিশ্লেষণ করা দরকার।

নিন্দাবাদর মাধ্যমে সুনাম নষ্ট করা বা ক্ষুণ্ন করাকে মানহানি বলে। সুতরাং মানহানিকে বুঝতে হলে সুনামের পরিচয় জানতে হবে।

আইনের চোখে সুনাম হচ্ছে একটি সম্পত্তি। আপনার এক টুকরা জমি আছে, এটা আপনার সম্পত্তি এ ছাড়াও আপনার আরেকটি সম্পত্তি আছে সেটা হচ্ছে আপনার সুনাম। আপনি চোর, বাটপার, টাউট, সন্ত্রাসী, ঠগ, মাস্তান, লম্পট, মিথ্যুক এসবের কিছু নন। লোকে আপনাকে ভাল বলে জানে। লোকের এই জানাকেই বলে সুনাম। সুনাম আপনার সম্পত্তি। জমি হচ্ছে কর্পোরাল বা দেহি সম্পত্তি আর সুনাম হচ্ছে ইনকর্পোরাল বা বিদেহি সম্পত্তি। সুনাম যে কত বড় সম্পদ তা শেক্সপীয়রের একটি উক্তি থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, প্রত্যেক মানুষের কাছে তার সুনামই হল বড় ঐশ্বর্য; যে আমাদের টাকা কড়ি কেড়ে নেয় সে আমাদের কিছুই নিতে পারে না। কারণ টাকার নিজের কোন মূল্য নেই। আজ সে তোমার কাল সে আমার আবার পরশু দিন আরেকজনের হবে। কিন্তু যে আমার সুনাম কেড়ে নেয়, সে আমার যথাসর্বস্বই কেড়ে নেয়। তাতে সে ধনী হয় না বটে, কিন্তু আমাকে একেবারে নিঃস্ব করে দেয়।

শুধু চরিত্রই সুনামের বিষয়বস্তু নয়। চরিত্র ছাড়াও আরো অনেক কিছু আছে যা সুনামের বিষয় হতে পারে। যেমন, যে মহিলা চরম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও শুধুমাত্র মনোবল ও দৃঢ়তার মাধ্যমে তার সন্তানদের মানুষ করে তুলতে সক্ষম বা সফল হন তার সুনাম হয় দক্ষতা ও পরিশ্রমের। এমনিভাবে পেশার ক্ষেত্রে সততা, যোগ্যতা ও দক্ষতা, সেবা পরায়নতা, ব্যবহার, নৈপুণ্য ইত্যাদির সুনাম থাকে। বিত্তবানের যেমন সুনাম থাকতে পারে, তেমনি বিত্তহীনেরও সুনাম থাকতে পারে এবং থাকে। যার দুর্নাম নেই তারই সুনাম আছে ধরে নিতে হবে। কারণ আইনে

www.pathagar.com

যতক্ষণ পর্যন্ত কারো অপরাধ প্রমাণিত না হয় ততক্ষণ তাকে সৎ ও নিরপরাধ মনে করে। দুটি কারণে আইন সাধারণভাবে মানুষকে সৎ মনে করে। প্রথমত দেশে যখন চুরি ডাকাতি বেড়ে যায় তখনও সমাজের এক শতাংশ মানুষ চুরি ডাকাতির সাথে যুক্ত থাকে না। আবার অপরাধীর মধ্যে কুপ্রবৃত্তির তুলনায় সুপ্রবৃত্তির পরিমাণই বেশি। দ্বিতীয়ত, অপরাধ প্রমাণ করা যায় কিন্তু নিরপরাধ প্রমাণ করা যায় না। সাধারণত আমরা ধরে নেই সকলেরই সুনাম আছে। কেউ যদি কোন মানুষকে খারাপ বলতে চায় তবে তার সুস্পষ্ট কারণ ও প্রমাণ থাকতে হবে।

কারো সুনাম নষ্ট করার জন্য কিছু লেখা, বলা বা করা নিন্দাবাদমূলক কাজ। এই নিন্দাবাদ মানুষের মান মর্যাদা হানী করে। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদ মানহানিকর আচরণ থেকে মানুষকে নিরাপত্তা প্রদান করেছে।

নিষ্ঠুর, অমানবিক ও অপমানজনক শাস্তির শিকারে পরিণত করা

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা মানুষকে নিষ্ঠুর, অমানবিক ও অপমানজনক শাস্তির শিকারে পরিণত হওয়া থেকে নিরাপত্তা প্রদান করে। শাস্তি বা দণ্ড প্রদান করা হয় অপরাধীকে। অপরাধ সংগঠনের জন্য এটা তার প্রাপ্য। বিচারক দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী ঘটনা পর্যালোচনা, বাদী বিবাদীর বক্তব্য এবং সাক্ষির দেয়া সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করে অপরাধীর অপরাধ প্রমাণিত হতে শাস্তির মাত্রা নির্ধারণ করে তা ঘোষণা দেন। কোন কোন ক্ষেত্রে অপরাধীকে বিশেষ কারণে ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়।

আবার এমন ঘটনাও ঘটে যে, কোন ব্যক্তি অপরাধ না করে অনেক সময় শাস্তি পেয়ে যায়। সম্প্রতি একটি দৈনিকের পাতায় দেখলাম ১২ বছরের এক কিশোরকে অপরাধীর সাথে নামের মিলের কারণে ধরে এনে শাস্তি দেওয়া হয় এবং ১২ বছর কারাবাসের পর সম্প্রতি সেই ভুল ধরা পড়ে পত্রিকার একটি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে। নিরপরাধ এই কিশোরকে অহেতুক শাস্তির শিকারে পরিণত করে তার জীবনের মূল্যবান ১২টি বছরই শুধু কেড়ে নেওয়া হয় নি সেই সঙ্গে তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে জীবনকে গড়ে তোলার সুযোগ থেকে এবং সমাজ সম্পর্কে তার মনে একটি নেতিবাচক ধারণা স্থায়ীভাবে পুঁতে দেয়া হয়েছে। তেমনি বাবার হাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া একটি মেয়েকে রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে নিরাপত্তার জন্য কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, সেখানে সে ১০ বছর ধরে অবস্থান করছে বিভিন্ন ধরনের অপরাধীদের সাথে। মেয়েটিকে তার অভিভাবকের কাছে ফেরত পাঠানোর বা অন্য কোথাও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে জেলে পুরো রাখা তাকে শাস্তির শিকারে পরিণত করার নামান্তর। এ জাতীয় কাজ চরমভাবে মানবতা বিরোধী কাজ বলে গণ্য।

আধুনিক কালে শাস্তি প্রদানের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সংশোধন করা। যে অপরাধী, তাকে অপরাধমূলক কাজ থেকে নিবৃত্ত করা এবং অন্যদেরকেও এই কাজে নিরুৎসাহিত করার জন্য

www.pathagar.com

আইন শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। মৃত্যুদণ্ডের মতো চরম শাস্তি মানবিক অধিকার বিরোধী কিনা সে বিষয়ে যদিও ভিন্নমত রয়েছে তথাপি পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য রাখার জন্য অপরাধের শাস্তির বিধান রাখার ব্যাপারে সকলেই একমত পোষণ করেন। কিন্তু কথা হচ্ছে যারা নিরপরাধ, অপরাধী নয়, তারা কেন শাস্তি পাবে। সমাজে কিছু ক্ষমতাবান অপরাধী আছে যারা নিজেরা অপরাধ করে অন্যের উপর এর দায় আরোপ করে। ফলে নিরীহ নিরপরাধ মানুষ অপরাধ না করেও শাস্তির শিকারে পরিণত হয়। এর একটি মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এই যে, নিরপরাধ মানুষ যদি অপরাধ না করেও শাস্তি ভোগ করে তাহলে সে শাস্তিভোগের পর মনের দিক থেকে বেপরোয়া হয়ে উঠবে এবং অপরাধ করতে ভয় পাবে না বা ভয় পায় না। তাছাড়া যে অপরাধ করে নি তার উপর অপরাধের দায় আরোপ করাও এক ধরনের অপরাধ। নিরপরাধ মানুষকে অপরাধী চিহ্নিত করে শাস্তির শিকারে পরিণত করা অমানবিক কাজ।

নিরপরাধ মানুষ যাতে শাস্তির শিকারে পরিণত নাহয় সে জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও বিচার বিভাগকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। এজন্য প্রকৃত অপরাধীকে যথাযথ শাস্তি প্রদান করাও জরুরি। কোন দেশের নাগরিক যদি আইনের আশ্রয় লাভে ব্যর্থ হয় তাহলে সেদেশে শাস্তির শিকারে পরিণত হওয়া থেকে নিরাপত্তা লাভ দুরুহ হয়ে ওঠে।

আলোচ্য অনুচ্ছেদ ও ইসলাম

ইসলামে মানুষের মর্যাদা সর্বোচ্চ। আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে মানুষ সকলেই সম্মান ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। মানুষের প্রতি অমানবিক আচরণ করতে , নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করতে, নির্যাতন করতে ইসলাম বারণ করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ নিরপেক্ষ ও সম আচরণ লাভের অধিকারী। অতএব কোন মানুষ নিজের প্রতি যে আচরণ কামনা করে না, অন্যের প্রতি সেই আচরণ ইসলাম সমর্থন করে না। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, কোন মানুষই সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় নিজের প্রতি নিষ্ঠুর অমানবিক নির্যাতন কামনা করে না আর তাই অন্যের প্রতি এই জাতীয় আচরণ প্রত্যাশিত নয়।

পবিত্র কোরানে বলা হয়েছে, 'তোমাদিগের সন্তানদিগকে দারিদ্র্য ভয়ে হত্যা করিও না। উহাদিগকে ও তোমাদিগকে আমিই রিযক্ দিয়া থাকি। উহাদিগকে হত্যা করা মহাপাপ।' (১৭ ঃ ৩১)

আল্লাহ যাহার হত্যা নিষিদ্ধ করিয়াছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাহাকে হত্যা করিও না। কেহ অন্যায়ভাবে নিহত হইলে তাহার উত্তরাধিকারীকে তো আমি উহা প্রতিকারের অধিকার দিয়াছি। কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে। সে তো সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেই।' (১৭ ঃ ৩৩) এই আয়াতে প্রতিকারের অধিকার বলতে কিসাস তথা রক্তের বদলা বোঝানো হয়েছে। কিন্তু আইনগতভাবে কাউকে হত্যা করতেও বাড়াবাড়ি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

কোরানে বলা হয়েছে , 'পুরুষ কিংবা নারী চুরি করিলে তাহাদের হস্তচ্ছেদন কর ; ইহা উহাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর নির্ধারিত আদর্শ দণ্ড; আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'। (৫ঃ৩৮) কিন্তু পরের আয়াতেই আবার বলা হয়েছে, 'কিন্তু সীমালঙ্ঘন করার পর কেহ তওবা করিলে ও নিজেকে সংশোধন করিলে আল্লাহ তাহার প্রতি ক্ষমা পরায়ন হইবেন ; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (৫ঃ৩৯)

উপরে বর্ণিত আয়াতসমূহ থেকে বোঝা যায় যে ইসলাম মানুষকে মানুষের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করতে নিষেধ করেছে; বারণ করেছে।

যারা নিষ্ঠুরতা, অমানবিক আচরণ ও পীড়াদায়ক ব্যবহার করে তারা জালেম। জালেমের কাজ হচ্ছে জুলুম করা। আল্লাহ এবং তাঁর নবী জালেমদের পছন্দ করেন না। কোরানে বলা হয়েছে জালেমদেরকে আল্লাহ্ সৎপথ প্রদর্শন করেন না। জুলুমের বিপরীত হচ্ছে দয়া, রহম। এটা আল্লাহর অন্যতম গুণবাচক নাম। মহান আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু। তিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রতি দয়াবান, জুলুম করা তার কাজ নয়। অতএব মানুষ মানুষের প্রতি নিষ্ঠুর অমানবিক আচরণ করবে। এটাও আল্লাহর পছন্দ নয়।

সারসংক্ষেপ

সারা সভ্য বিশ্ব একটি প্রত্যয়কে স্বতঃসিদ্ধরূপে মেনে নিয়েছে। সেটি হচ্ছে এই যে, মানুষ আসলে ভাল। এই সত্য স্বীকৃত হলেও যে দৃশ্য বাস্তবে প্রতীয়মান তাতে অসৎ মানুষের সংখ্যা কম নয়। এই পরিস্থিতিতে বলা হয় যে, আসলে মানুষ ভাল হলেও পরিবেশের কারণেও পরিস্থিতির মোকাবেলায় খারাপ হয়ে যায়। এই খারাপ হয়ে যাওয়াটা একটি ব্যাধি। এই ব্যাধিকে উৎপাটন করতে হলে পরিবেশ এবং পরিস্থিতি উন্নত করতে হয়। উদরাময় থেকে মানুষকে বাঁচাতে বিশুদ্ধ পানি যেমন প্রয়োজন, মন্দ ও অসৎ মানুষকে সৎ করতে হলে তাই সততা নষ্টকারী পরিবেশ ও পরিস্থিতির মূলোৎপাটন প্রয়োজন।

এতসব বলার পরেও অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, কিছু মানুষ সহজে ভাল হবার নয়। এইসব মানুষের উপর প্রয়োগের জন্য একটি প্রবচন বাংলাদেশ বহুল প্রচলিত— 'সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না'। অতএব, কোন কোন ক্ষেত্রে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হয় নইলে সমাজ রক্ষা করা যায় না। শাস্তি হচ্ছে একটি ব্যতিক্রমি বিধান এবং ব্যতিক্রমি ক্ষেত্রেই এর প্রয়োগ।

যেহেতু শাস্তি একটি ব্যতিক্রমি বিধান সেহেতু স্বভাবতই এই দাবি করা যায় যে, প্রয়োগের ক্ষেত্রে এটি মমতাহীন হবে না।

www.pathagar.com

পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয়—এই প্রবচনটি বহু পুরাতন। সুতরাং পাপীর সাথে আচরণে কোনরকম নিষ্ঠুরতা বাঞ্ছনীয় নয়। অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে নির্মমতা তাই অমানবিক। শাস্তিকে তাই হতে হবে অনিষ্ঠুর ও মানবিক।

সন্তান অবাধ্য হলে ক্ষেত্র বিশেষে মাতা তাকে দৈহিক শাস্তি দিতে পারে কিন্তু সবসময়ই সে শাস্তির পিছনে থাকে বেদনাভরা অশ্রু। মায়ের প্রহার প্রসঙ্গে কবি বলেন,

যদি বা প্রহার করে

বিরলে নয়ন ঝরে

মনের সন্তাপ আর কিছুতে না যায়।

কিছু কিছু মানুষ আছে, পীড়নে যাদের আনন্দ। এরা সমাজের কলংক। পীড়ন অথবা নিষ্ঠুর আচরণের মধ্যে পৈশাচিক আনন্দ লাভের সকল প্রয়াসকে মানবাধিকার নিষিদ্ধ করেছে।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

আইনের সমক্ষে প্রত্যেকেরই সর্বত্র ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভের অধিকার রয়েছে।

(Article : 6. Everyone has the right to recognation everywhere as a person before the law.)

ভাষ্য

আলোচ্য অনুচ্ছেদে প্রত্যেকেরই আইনের সমক্ষে ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। বিষয়টিকে সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে ব্যক্তি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নিতে হবে।

ব্যক্তির পরিচয়

আইনবিদ্যার আলোচনায় দেখা গেছে, ব্যক্তিকে যে মানুষ হতেই হবে এমনটি আবশ্যক নয়। যেমন কর্পোরেশন। কর্পোরেশন মানুষ নয়, প্রতিষ্ঠান । কিন্তু এর দায়িত্ব কর্তব্য এবং অধিকার আছে, আইনের সামনে তাকে কখনো কখনো জবাবদিহি করতে হয়, তাই কর্পোরেশন ব্যক্তি পদবাচ্য তেমনি হিন্দু আইন অনুসারে হিন্দুদের দেব-দেবীর মূর্তি ব্যক্তি হিসাবে স্বীকৃত। কর্পোরেশন, মূর্তি ইত্যাদি যদিও মানুষ নয় তথাপি তাদের ব্যক্তিত্ব আছে। ব্যক্তিত্ব শব্দটি মানবতা শব্দ থেকে আরো ব্যাপক। তাই মানুষের বাইরেও ব্যক্তি আছে, থাকা স্বাভাবিক।

আলোচ্য অনুচ্ছেদ অনুসারে অন্যান্যদের ব্যক্তিত্বের বিষয়টি আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। তবে মানুষ সকলেই এক একজন ব্যক্তি। প্রত্যেক মানুষের আইনের সামনে ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভের অধিকার আছে—এ কথাটিই মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদের মূল বক্তব্য।

অধ্যাপক স্যামন্ডের (Salmond) মতে, ব্যক্তি তাকেই বলে, যে অধিকার অর্জন ও দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম। যার এ সামর্থ্য আছে, সে মানুষ হোক বা না হোক, সে ব্যক্তি। যার অধিকার নেই বা

www.pathagar.com

দায়িত্ব কর্তব্য নেই সে মানুষ হলেও ব্যক্তি নয়। যে ভিত্তি বা ধারণার উপর অধিকার এবং কর্তব্য আরোপিত হয় তাই ব্যক্তিত্ব। এরই ভিত্তিতে ব্যক্তি বিচার বিভাগীয় তাৎপর্য এবং সামাজিক ও আইনানুগ স্বীকৃতি লাভ করে। স্যামন্ডের বক্তব্য অনুসারে মানুষের যদিও ব্যক্তি না হওয়ার অর্থাৎ ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি না পাওয়ার আশংকা রয়েছে তথাপি মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদ বলেছে প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তি হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার বিষয়টি হচ্ছে তার অধিকার।

মানুষই একমাত্র আইনগত ব্যক্তি। পশু স্বাভাবিক বা আইনগত কোন অর্থেই ব্যক্তি পদবাচ্য নয়। এরা কেবল বস্তু। এদের উপর আইনানুগ অধিকার ও কর্তব্যের প্রয়োগ চলে, এরা অধিকার ও কর্তব্যের কর্তা নয়। পশু যদিও কাজ করতে সক্ষম তথাপি এদের কাজ, না আইনানুগ, না আইন বহির্ভূত। এরা অনুমোদন বা নিষেধের যথার্থ আওতাভুক্ত হিসেবে আইন দ্বারা স্বীকৃত নয়। পশু আইনগত অধিকার অর্জন ও দায়িত্ব পালনে অক্ষম। আইন মানুষের জন্য তৈরি। এই আইন মানুষ ও পশুর মধ্যে কোন সংঘ বা বন্ধনের বাধ্যবাধকতার স্বীকৃতি প্রদান করে না। যদি নৈতিক দিক থেকে এদের কতিপয় অধিকার আছে তথাপি তা বিধিবদ্ধ কোন আইন দ্বারা স্বীকৃত নয়। যদি পশু কোন ক্ষতি করে তবে এ ক্ষতির জন্য দায়ী পশুর মালিক, পশু নয়।

ব্যক্তির ব্যাপ্তি

জন্মের দ্বারা অস্তিত্ব লাভের মধ্য দিয়ে মানুষের ব্যক্তিত্বের সূত্রপাত হয় আর সমাপ্ত হয় মৃত্যুতে। আইনের দৃষ্টিতে মৃত মানুষ ব্যক্তি পদবাচ্য নয়। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্তি মানুষ তার ব্যক্তিত্ব ত্যাগ করে, ব্যক্তিত্ব হারায়। অধিকার ও দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করে। স্বার্থ না থাকার কারণে তাদের কোন অধিকার নেই। অধিকার অর্পণ ব্যতীত মৃতের জীবদ্দশার সকল আকাঙ্ক্ষা, স্বার্থ ইত্যাদিকে আইন অনুমোদন করে, মর্যাদা প্রদান করে। তিনটি ক্ষেত্রে ব্যক্তি অধিকার তার মৃত্যুর পর পর্যন্ত ব্যাপ্ত। সেগুলো হচ্ছে দেহ, সুনাম বা খ্যাতি এবং স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিলি-বন্দোবস্তের অধিকার। কোন জীবিত মানুষ তার মৃতদেহের প্রতি কি আচরণ করা হবে তা নির্দেশ করতে আগ্রহী বা অনুরাগি হয়। তাই মৃতের শবদেহ সম্পর্কে তার উইলে নির্দেশিত বক্তব্য বর্তমানে কার্যকরী হয়। বিধিবদ্ধ আইন অঙ্গের ব্যবচ্ছেদের মতো অমর্যাদাকর কাজ থেকে নিজের শবদেহকে রক্ষার ক্ষমতা প্রত্যেক ব্যক্তিকে দিয়েছে। ফৌজদারি আইন প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর পর স্বাভাবিক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নিশ্চয়তা বিধান করে। এবং সমাধিক্ষেত্রে সন্ত্রাস অপরাধমূলক কাজ বলে গণ্য হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মৃতের খ্যাতি বা অবদান ফৌজদারি আইনে নিরাপত্তা লাভ করে। মৃতের সম্পর্কে মানহানীকর রচনা, যা জীবিত অবস্থায় ব্যক্তির স্বার্থে আঘাত হানতে পারত তা অপরাধমূলক কাজ হিসেবে শাস্তিযোগ্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দায়ভার সেই মৃত ব্যক্তির নয় বরং তার বংশধরগণের। মৃত্যুর বহু বছর পরও মানুষ তার জীবদ্দশায় রেখে যাওয়া

www.pathagar.com

সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবহার নির্ধারণ করতে সক্ষম। জীবিত লোকের আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য মৃতের আশা আকাঙ্ক্ষা উত্তরাধিকার আইন অনুমোদন করে। অধিকন্তু উপহার বা দাতব্য হিসেবে বন্টনের জন্য যা কিছু উইল করে যাবেন তা সম্মানজনক বিবেচনা করে এবং তার রেখে যাওয়া প্রমাণপত্রের ভিত্তিতে ইচ্ছেমত প্রয়োগ করে।

মৃত ব্যক্তি সব সময় বা সাধারণভাবে আইনানুগ ব্যক্তিত্বের অধিকারি না হলেও অজাত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যাপারটি একটু অন্যরকম। কোন মানুষের পক্ষে জন্মের পূর্বেই ব্যক্তিত্ব লাভে, সম্পত্তি অর্জনে আইনে কোন বাধা নেই। এই অর্জন নির্ভর করবে সে আদৌ জন্ম গ্রহণ করবে কিনা তার উপর। কোন মানুষ তার স্ত্রী এবং সেই স্ত্রীর গর্ভে যে শিশু জন্মাবে তার অনুকূলে সম্পত্তি প্রদান করতে পারে। সে যদি উইল না করেই মারা যায় সে ক্ষেত্রে তার নিজস্ব আইন অনুযায়ী তার অজাত সন্তান তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও কিছু নিয়মকানুন আরোপ করা হয়। যেমন, কোন ব্যক্তি তার শতবর্ষ পরের কাল্পনিক উত্তরপুরুষদের মধ্যে সম্পদ বন্টনের নির্দেশ জারি করতে পারেন না। মায়ের গর্ভে থাকা শিশুকে বিভিন্ন কারণে ধরে নেওয়া হয় যে সে জন্মগ্রহণ করেছে। তাদের জন্মের স্পষ্ট প্রত্যাশার কারণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের প্রতি আইনের ছাড় রয়েছে। অজাত ব্যক্তি কতটুকু পরিমাণ ব্যক্তিত্ব ও সম্পত্তির মালিকানা অর্জন করার অধিকারী সে বিষয়টি আজও খানিকটা অমীমাংসিত রয়ে গেছে। ইংল্যান্ডে লর্ড ক্যাম্পবেল এর এ্যাক্ট–এ বলা হয়েছে যে, অন্যায়ভাবে পিতা নিহত হলে পিতার মৃত্যুর পর জাত শিশু তার পিতার মৃত্যুর কারণে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার যোগ্য। ইচ্ছাকৃত অথবা অসাবধানতার কারণে গর্ভে থাকা অবস্থায় আঘাত পেয়ে যদি শিশু জন্মের পর মারা যায় তাহলে এটা নরহত্যা বিবেচিত হবে। এবং ঐ মহিলার উপর দণ্ড কার্যকর শিশুর জন্ম পর্যন্ত স্থগিত রাখতে হবে। অজাত ব্যক্তির অধিকার জীবিত অবস্থায় তার যে যে অধিকার থাকতে পারে, তার মতই তবে তা জন্মের শর্ত সাপেক্ষ। সে যে জন্মাবে এই প্রত্যাশার মাধ্যমে তার উপর আইনানুগ ব্যক্তিত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু সে জীবন ধারণ না করলে, জীবিতের স্থান দখল না করলে এই ব্যক্তিত্ব বাতিল হয়ে যায়। গর্ভপাত এবং সন্তান ধ্বংসে অপরাধ কিন্তু এটা হত্যা বিবেচিত হবে না যদি শিশুটি জীবিতাবস্থায় জন্মগ্রহণ না করে। পিত্যার মৃত্যুর পর জাত সন্তান উত্তরাধিকারি হতে পারে কিন্তু সে যদি গর্ভাবস্থায় মারা যায় তাহলে তার উত্তরাধিকার বলবৎ হয় না। অবশ্য যদি মৃত্যুর ঘন্টা খানেক পরে শিশু মারা যায়, যার জন্ম হয়েছে তার পিতার মৃত্যুর পর, তার ক্ষেত্রে ভিন্ন বিধান রয়েছে। তার মাধ্যমে অন্য জীবিত ব্যক্তি উত্তরাধিকারী হতে পারেন। কোন ট্রাস্টের প্রাপক বা অংশীদার যদি কোন অজাত ব্যক্তি হন তাহলে তার পক্ষে আদালতের অনুমোদন ছাড়া উক্ত ট্রাস্টে কোন পরিবর্তন আনা যাবে না।

সময় এবং স্থান ভেদে ব্যক্তি এবং ব্যক্তিত্ব শব্দ দুটি বিভিন্নভাবে মূল্যায়িত হয়েছে। একই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত প্রতিষ্ঠান সংস্থা, দল, কোন দেশে আইনসিদ্ধ ব্যক্তির মর্যাদা পেয়েছে আবার কোথাও পায় নি। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা ও ধারণার পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু এতো

www.pathagar.com

হচ্ছে প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও দলের ব্যক্তি পদবাচ্যতা নিয়ে সমস্যা। মানুষের তো ব্যক্তি স্বীকৃতি লাভের ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকার কথা নয়, কিন্তু আছে, বাস্তবে আছে। মানুষের মধ্যে যারা দাস হিসেবে পরিগণিত তারা এখনো ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে নি। এ ছাড়াও বর্ণবৈষম্যের শিকার যে সকল মানব সন্তান তারাও সর্বত্র আইনের চোখে ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে নি।

ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতির অধিকার

তাই মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষনার আলোচ্য অনুচ্ছেদ বলছে, প্রতিটি মানুষের আইনের সামনে সর্বত্র ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভের অধিকার রয়েছে। কাউকে দাসত্বের অজুহাতে, নারী হিসেবে জন্ম নেওয়ার কারণে, অথবা অন্য কোন অজুহাতে ব্যক্তিত্ব থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। প্রত্যেকেই আইনের সামনে ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। একজন ব্যক্তি, ব্যক্তি হিসেবে আইনের কাছে যে সব অধিকার পায় এবং ব্যক্তির যে সব কর্তব্য থাকে, প্রত্যেকেরই তেমনটি থাকবে। কোন মানুষ যদি ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি না পায় তাহলে তাকে পশুরও অধম গণ্য করা হয়। মানুষের আইনের সামনে ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া তার মানবিক অধিকার। এই অধিকার ছাড়া মানুষের জীবন অর্থহীন।

মানুষ যখন আইনের সামনে ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পেত না,যখন তার ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি ছিল না, তখনও তার কর্তব্যের দায়ভার ছিল। যেমন : দাস ও নারীরা যখন মানুষ হওয়া সত্ত্বেও ছিল পণ্যের মতো, তখনও তাদেরকে অপরাধ করলে দণ্ড পেতে হত। দণ্ড ভোগের ব্যাপারে কোন ছাড় ছিল না বরং একটু বেশিই জুটতো কপালে কিন্তু কোনরূপ অধিকার ছিল না। অথচ অধিকারের গ্যারান্টি না থাকলে কর্তব্যের দায়ভাগ ভোগ করা অত্যন্ত অবিবেচনাপ্রসূত কাজ। এই অবিবেচনাপ্রসূত অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য প্রতিটি ব্যক্তি ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি দরকার। আইনের সামনে মানুষ ব্যক্তি পদমর্যাদায় দাঁড়াতে পারলে তার যেমন কর্তব্যের দায়ভার থাকবে তেমনি থাকবে অধিকারের নিশ্চয়তা। এটা ন্যায়বিচার এবং বিচারের ক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠারও পূর্বশর্ত। ব্যক্তি যখন আইনের সামনে ব্যক্তি হিসেবে পরিপূর্ণ মর্যাদা পাবে তখন আইনের অসম প্রয়োগের আশংকা দূরিভূত হবে, মানুষে মানুষে বৈষম্য ও ভেদাভেদ হ্রাস পাবে। বিচারের বাণী নিরবে নিভৃতে কাঁদবে না। আইনের সামনে ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভের অধিকারটি যেমন সকলের তেমনি তা থাকবে সর্বত্র। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অধিকার থাকবে আবার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এর স্বীকৃতি থাকবে না এটা হতে হতে পারে না।

তাই আলোচ্য অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, আইনের সমক্ষে প্রত্যেকেরই সর্বত্র ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভের অধিকার রয়েছে।

www.pathagar.com

ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতির ইতিহাস

আইনের দৃষ্টিতে প্রত্যেকের সর্বত্র ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতির বিষয়টি আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদেরকে মানুষের ইতিহাস খানিকটা ঘাটতে হবে। আজ আধুনিক যুগে আমরা যে মানবতার জয়গান গাই সেটা মানব ইতিহাসের সকল পর্যায়ে ছিল না। মানুষে মানুষে প্রভেদ ছিল, সকলের মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি ছিল না। দাস ও নারী মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি পেত না। তাই এভাবে আমরা মানুষের ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করবো।

সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, 'মানব সমাজ এক ও অভিন্ন। এক সময় ইউরোপের উপনিবেশবাদী পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবীগণ প্রচার করতেন যে, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার কৃষ্ণ ও পীতকায় মানুষেরা শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে নিম্নপর্যায়ের মানুষ। আধুনিক বিজ্ঞান অভ্রান্তভাবে প্রমাণ করেছে যে, পৃথিবীর সব দেশের মানুষই একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। আধুনিক কালে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সব সুশিক্ষিত ইতিহাসবিদ পণ্ডিত দার্শনিকগণ বিশ্বাস করেন যে, সমগ্র মানব সমাজ এক ও অখণ্ড। এবং এই ধারণাও ক্রমশ বিস্তার লাভ করেছে যে, মানব সমাজের ইতিহাস এক অখণ্ড ও অবিভাজ্য।

আধুনিক মানব সমাজের উৎপত্তি হয়েছিল একটা মাত্র উৎস থেকে। আদিম এ মানুষদের সংস্কৃতি ছিল পুরাতন পাথর যুগের শিকারী সমাজের সংস্কৃতি। এ যুগে মানুষ তার সামাজিক কার্যকলাপের মাধ্যমে নিজেদের দেহের পরিবর্তন ঘটিয়ে সুসম্পূর্ণ মানব দেহের উদয় ঘটিয়েছিল, আধুনিক পৃথিবীর সবক'টি জাতির প্রত্যেকটি মানুষ, সে সুপরিণত মানবদেহেরই উত্তরাধিকার বহণ করছে মাত্র।

আদিম শিকারী মানুষ, যে সমাজ সংগঠন এবং বস্তুগত ও ভাবগত সংস্কৃতি সৃজন করেছিল তার অনেক উপাদান আজকের পৃথিবীর সব ক'টি জাতির ও সমাজের মূল ভিত্তিরূপে কাজ করেছে। আদিম মানুষ যে ভাষার উদ্ভাবন ঘটিয়েছিল, সে ভাষা ও চিন্তাক্ষমতা, তার উদ্ভাবিত প্রেম প্রীতি ভালবাসা প্রভৃতি মানবিক গুণাবলি এবং নানাবিধ সামাজিক আচরণ ইত্যাদি আজকের দিনের সব মানব গোষ্ঠীর সামাজিক মূল ভিত্তিরূপে বিরাজ করছে। আজকের পৃথিবীর সব মানুষ ও জাতি এ অচ্ছেদ্য যোগসূত্র ও বন্ধনে আবদ্ধ।

আদিম শিকারী সমাজের মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে ক্রমশ সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারপর দশ হাজার বছর আগে, যখন পশ্চিম এশিয়াতে কৃষিভিত্তিক সমাজের উৎপত্তি ঘটেছিল, তখন সে সংস্কৃতিও সারা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করেছিল। এই দুই সমাজের সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্নভাবে সমাজের বিকাশ ঘটেছিল। কিন্তু এ সকল মানব সমাজ কখনো সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল না। ছয় সাত হাজার বছর আগে যখন মিশর ও ব্যাবিলনের ব্রোঞ্জযুগের নগর সভ্যতার উদয় ঘটেছিল তখন ক্রমশ তার প্রভাবে ও অনুকরণে পশ্চিম এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্নস্থানে এবং সিন্ধু অববাহিকায়, চিন, ভূমধ্যসাগরের ক্রিটে

www.pathagar.com

ব্রোঞ্জ যুগের বিভিন্ন অঞ্চলের নানাবিধ আবিষ্কার, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার প্রভৃতি সুযোগ ও প্রভাব লাভ করার ফলে হিট্টাইট বা লোহার আবিষ্কার করেছিল।, ফিনিশিয়রা বর্ণমালা আবিষ্কার করেছিল, এবং লিডীয়রা মুদ্রা আবিষ্কার করেছিল। এসবের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল লৌহযুগের উন্নত সভ্যতা।

এ সভ্যতার নানা বস্তুগত আবিষ্কার, উপকরণ ও চিন্তাধারা আবার পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে বিস্তার লাভ করেছে। আবার মধ্যযুগে চিন, ভারতবর্ষে যেসব আবিষ্কার ঘটেছে তার ভিত্তিতে ইউরোপে ধনতান্ত্রিক সমাজের উদয় ঘটেছিল। মানুষের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে এটা স্পষ্ট দেখা যায় যে, সব যুগেই এক জাতি অপর জাতির কাছ থেকে বা বৃহত্তর মানব সমাজের কাছ থেকে বস্তুগত ও ভাবগত সম্পদ ও উপকরণ সংগ্রহ করে নিজেদের পরিপুষ্টি সাধন করেছে। এবং মানবসমাজের অগ্রগতিতে সহায়তা করেছে। মানুষের ইতিহাস বলতে আমরা তাই মানবসমাজের অখণ্ড ইতিহাসকেই বুঝি।

আবার মানবসমাজ অবিভাজ্য একথা যেমন সত্য, মানব সমাজ খণ্ড খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন, সেকথাও সমান সত্য। পৃথিবীর সব মানুষ মূলত এক হলেও, তারা বিভিন্ন জাতিসত্তায় ও দেশে বিভক্ত। মানুষের ইতিহাস মূর্ত হয়েছে, বাস্তবায়িত হয়েছে ভিন্নভিন্ন জাতির ও দেশের পরিসরে। তাই মানুষের ইতিহাস বলতে ভিন্নভিন্ন জাতির খণ্ডিত ইতিহাসেরই সমষ্টিকে বোঝায়।

মানব ইতিহাসের সকল স্তরে মানুষ সকলেই মানুষ হিসাবে সমমর্যাদার অধিকারী ছিল না।যখন আইন কানুন, শাসন, রাষ্ট্র, বিচার ইত্যাদি ছিল না তখনকার মানুষের সমমর্যাদার কথা তো কল্পনাই করা যায় না। গ্রিক নগর রাষ্ট্রের কথা আলোচনা করলে দেখা যাবে সেখানেও অসমতা ছিল, সেখানে সকল মানুষ সমান ছিল না। ৮০০ থেকে ৬০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে গ্রিকরা ভূমধ্যসাগরের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে উপনিবেশ স্থাপনে উদ্যোগি হয়েছিল। এই উপনিবেশ প্রতিষ্ঠাতা নগর রাষ্ট্রের অধীন কোন রাষ্ট্র হত না। প্রত্যেকটি উপনিবেশেরই নিজস্ব সংবিধান, নাগরিকত্ব আইন, আদালত ও মুদ্রা ব্যবস্থা ছিল। বস্তুত প্রতিটি নূতন উপনিবেশ ছিল একটি নতুন রাষ্ট্র। নগররাষ্ট্রের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জমির অভাব দেখা দেয়ায় প্রধানত গ্রিকরা নতুন উপনিবেশ স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিল। এ ছাড়া ব্যবসা বাণিজ্য বিস্তারের বা প্রসারের জন্যও তারা নতুন উপনিবেশ স্থাপন করতো। এভাবেই ইজিয়ান ও কৃষ্ণসাগরের সমগ্র উপকূলে আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল, ইতালি, সিসিলি ও স্পেণ এবং ইজিয়ান ও ভূমধ্যসাগরের বিভিন্ন দ্বীপে অসংখ্য গ্রিক নগর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নতুন জায়গায় উপনিবেশ স্থাপনের সময় গ্রিকরা দলবেধে নৌকায় করে কৃষক, কারিগর, বণিক, পূজারি নিয়ে যেত এবং উন্নত ধরনের লোহার অস্ত্রাদির সাহায্যে স্থানীয় অধিবাসীদের পরাস্ত করে প্রয়োজনীয় ভূমি দখল করতো। গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিশ, এরিষ্টটল প্রমুখ চিন্তাবিদগণও দাস প্রথার সমর্থক ছিলেন। এসব দাসদের মানুষ হিসেবে নাগরিকদের মতো স্বীকৃতি ছিল না। গ্রিসের অন্যান্য নাগরিকের যে অধিকার স্বাধীনতা ছিল দাসের তেমনটি ছিল না, ছিল না নারীরও। ফলে আধুনিক সভ্যতার আলোকবর্তিকা বহনকারী

www.pathagar.com

গ্রিক দর্শন, আইন ও রাষ্ট্রে সকল মানুষের দৃষ্টিতে সমান মর্যাদা আশা করা যায় নি। গ্রিসের নগর রাষ্ট্রের খুব স্বল্প সংখ্যক মানুষই আইনের সমক্ষে ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পেত এবং এদের বলা হতো নাগরিক।

গ্রিক সভ্যতায় অবক্ষয় দেখা দিলে রোমানরা মেসিডোনিয়া ও গ্রিক দখল করে দাস শ্রমের উপর ভিত্তি করে এক বিশাল রোমান সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। গ্রিসের দাস, কৃষক ও মধ্যবিত্তসহ অনেকেই রোমানদের দাসে পরিণত হয়। রোমে যুদ্ধবন্দিরা দাসে পরিণত হতো। জন্মসূত্রে দাসীর গর্ভের সন্তান দাস দাসীতে পরিণত হতো। রোমান আইন অনুসারে চুরি করার অপরাধে স্বাধীন নাগরিকও শাস্তি হিসেবে দাসে পরিণত হতো। কর ফাঁকি দিতে বা সৈন্য বাহিনীতে যোগদান করা থেকে বিরত থাকার উদ্দেশ্যে আদমশুমারিতে নাম অন্তর্ভুক্ত না করার অপরাধে কেউবা দাসে পরিণত হতো। ঋণ পরিশোধ না করার অপরাধে এবং মুক্তিপ্রাপ্ত দাস মালিকের কাছে কৃতজ্ঞতা দেখাতে ব্যর্থ হলেও দাসে পরিণত হতো। একজন মুক্ত মানুষ দাসে পরিণত হলে তার আইনগত ও সামাজিক মর্যাদার অনেক অবনতি ঘটতো। রোমান আইনে দাসকে বস্তু ও মানুষ হিসেবে গণ্য করা হতো। দাসের নিজের কোন অধিকার ছিল না। কিন্তু অন্যের অধিকারের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। জুলিয়াস সিজার এক ঘণ্টায় ৬৩,০০০ যুদ্ধবন্দিকে দাস হিসেবে বিক্রি করেছিল। জমিতে কাজ করার জন্য শ্রমিক দাসের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। তাদের অবস্থা ছিল অবর্ণনীয় ও অমানবিক। প্রাচীন জগতে তারা ছিল যন্ত্রস্বরূপ। গৃহদাসদের অবস্থাও ভাল ছিল না। মুক্তিপ্রাপ্ত দাসদের মর্যাদা স্বাধীন নাগরিকের মর্যাদার তুলনায় ছিল নিম্নমানের। যেমন মুক্তিপ্রাপ্ত দাস সিনেট সদস্য হতে পারত না। মুক্তিপ্রাপ্ত দাস তার প্রাক্তন মালিককে আজীবন শ্রদ্ধা করতে বাধ্য ছিল। এই বর্ণনা থেকে নিশ্চয়ই অনুধাবন করা যায় যে, রোমে সকল মানুষের আইনের সম্মুখে ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতির অধিকার ছিল না।

শুধু গ্রিসে এবং রোমেই নয়, মিসরিয় সভ্যতাকে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, নগর সভ্যতা উদয়ের পর সিরিয়াকে বাদ দিয়ে সমগ্র মিসর সাম্রাজ্যের অধীনস্থ অঞ্চলের জনসংখ্যা ছিল সত্তর লক্ষ। মিসরিয় সাম্রাজ্যের মানুষ ছিল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। দাস এবং স্বাধীন মানুষ। স্বাধীন মানুষের মধ্যেও আবার শ্রেণীভেদ ছিল। সবচেয়ে উপরে ছিল রাজকীয় পরিবারের স্থান, তার নিচে ছিল পুরোহিত এবং অভিজাত শ্রেণী। তাদের নিচে স্থান ছিল লিপিকার, বণিক, কারিগর এবং অবস্থাপন্ন কৃষকের। তারও নীচ ছিল ভূমিদাস এবং দরিদ্র কৃষকের। এই বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের মধ্যে ছিল পর্বত প্রমান বৈষম্য। ইতিহাসবিদদের মতে, গ্রিস রোমান ও মিসরিয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল দাসদের দ্বারাই। মানুষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যুগে যুগে এমনিভাবে মানুষ মানুষকে ক্রয় বিক্রয় করেছে পণ্যের মতো। ফলে দাস এবং নারী প্রকৃতপক্ষে মানুষের মর্যাদা পায় নি। অধিকার ও মর্যাদার ক্ষেত্রে তারা সবসময়ই পিছিয়ে ছিল। স্বাধীন মানুষ, যারা ছিল নাগরিক, তাদের তৈরি আইনের সামনে দাসদের ব্যক্তি হিসাবে ব্যক্তি মর্যাদা ছিল না তেমনি নারীদের ব্যক্তিত্ব বা মর্যাদা ছিল অকল্পনীয়। সামাজিক বিবর্তন ও পরিবর্তনের ধাপেধাপে

www.pathagar.com

অনেকটা অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। আজ মানুষ মানুষের মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু সবাই কি পেয়েছে? বস্তুত আজো পৃথিবীর সকল মানুষ সত্যিকার অর্থে মানুষের মর্যাদা পায় নি। আইনের চোখে সর্বত্র সকল মানুষ আজো সমাজ মর্যাদা পাচ্ছে না।

আইনের সপক্ষে ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি

আইনের সমক্ষে সকলেই ব্যক্তি। তাহলে অন্যের সমক্ষে কি? এ প্রশ্নটি স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়। আইন বলতে রাষ্ট্রের বিধিবদ্ধ নিয়ম বোঝায়। রাষ্ট্রের বিধিবদ্ধ আইনের সমক্ষে সকলেই ব্যক্তি কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে কি মানুষ ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃত নয়? যেমন সমাজ। সমাজের চোখে সকলেই কি সমাজ ব্যক্তি?

সমাজে মানুষে মানুষে বৈষম্য বিরাজমান। ভারতীয় সমাজে মুসলমানদের মধ্যে আশরাফ ও আতরাফ এই পার্থক্য বিদ্যমান। মুসলমানদের মধ্যে তত্ত্বগতভাবে বৈষম্য না থাকলেও বাস্তবে এই বৈষম্য বিরাজমান। আশরাফের চোখে সমাজের আতরাফ মানুষ সমান নয়। হিন্দু সমাজে বর্ণভেদ প্রথা বিদ্যমান। ব্রাহ্মণ ও শূদ্র সমাজের চোখে সমান নয়। সমাজের চোখে সকল মানুষ সমান নয়; বৈষম্য ছিল, আজো আছে। তবে আশাপ্রদ বিষয় হচ্ছে এই যে, সমাজের মানুষে মানুষে বিরাজমান বৈষম্য ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে।

আর্থিক কারণে মানুষের মধ্যে বৈষম্য আছে। বিত্তবান ও বিত্তহীন মানুষ সমাজে সমমর্যাদা পায় না। ধনী লোকেরা অর্থের মাধ্যমে সমাজের সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করে। বিত্তবৈভবের কারণে তারা সমাজের অপরাপর মানুষের চেয়ে বেশি ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি প্রদর্শন করে, মর্যাদা ভোগ করে। আইনের চোখে সকল মানুষ সমান এবং ব্যক্তি পদবাচ্য হলেও সমাজে সেটি আজ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত নয়। তাই বাস্তবে সমাজের সম্মুখে সকলে সর্বত্র ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পায় নি।

সারসংক্ষেপ

প্রত্যেকেই আইনের সম্মুখে এবং সর্বত্র একজন ব্যক্তি। বাক্যটি ক্ষুদ্র হলেও এর ব্যঞ্জনা বিশাল। যে মুহূর্তে ঘোষণা দেওয়া হয় যে, মানুষ আইনে স্বীকৃত একজন ব্যক্তি, সেই মুহূর্তে স্বাভাবিকভাবে স্বীকৃতি আসে তার সকল অধিকারের উপর। ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃত মানুষ স্বাধীন। যার স্বাধীনতা অস্বীকৃত সে পূর্ণ মানুষ নয়। ব্যক্তি বলতে তাই স্বাধীন মানুষ বোঝায়।

যে মুহূর্তে বলছি যে, মানুষটি ব্যক্তি সেই মুহূর্তে তার মর্যাদার স্বীকৃতি দিচ্ছি। যে বান্দা ও বান্দী তাদের মর্যাদা নেই। আহারে-বিহারে, আয়াসে-আরামে, ভোগে-উপভোগে তারা উচ্চ বর্গীয় হতে পারে কিন্তু তবুও যেহেতু তারা মর্যাদাহীন তাই তারা ব্যক্তি নয়। ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতির অপর নাম মর্যাদার স্বীকৃতি।

www.pathagar.com

মানুষের মধ্যে শ্রেণীভেদ হতে পারে; হতে পারে একজন নিয়োগকর্তা এবং আরেকজন নিয়োজিত। কিন্তু তাদের মধ্যের সম্পর্ককে হতে হবে নির্ধারিত, আইনের দ্বারা, বিধির দ্বারা বা প্রথা দ্বারা। আইন নীতি বা বিধি বহির্ভূত হুকুমবর্দারী দাসত্বেরই শামিল।

কবি বলেন,

শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

কবি ব্যক্তিকে মানুষ হিসেবে এখানে চিহ্নিত করেছেন। মানবাধিকার ঘোষণার মূল কেন্দ্রে আছে ব্যক্তি। সেই ব্যক্তিকে ঘিরেই সব কিছু আবর্তিত। মানুষের জন্য সব কিছু, কোন কিছুর জন্য মানুষ নয়। ঈশ্বরের জন্য মানুষ নয়, রাষ্ট্রের জন্য মানুষ নয়, দেশের জন্য মানুষ নয়, এমনকি পরিবারের জন্য মানুষ নয়; এগুলো মানবাধিকার ঘোষণার কেন্দ্রীয় প্রত্যয়। যে ধর্ম, দেশ বা পরিবার মানুষের ব্যক্তিত্বকে আচ্ছন্ন করে সেই ধর্ম, রাষ্ট্র, দেশ বা পরিবার টিকে থাকবার দাবি করতে পারে না। ব্যক্তির কল্যাণের জন্যই এসবের সৃষ্টি এবং ব্যক্তির কল্যাণের জন্যই এসবকে টিকে থাকতে হবে।

সমগ্র বিশ্বে নানা অজুহাতে আজ মানুষের ব্যক্তিত্ব পদদলিত হচ্ছে। অর্থ, শক্তি এমন কি মেধার শ্রেষ্ঠত্বের অজুহাতে মানুষের ব্যক্তিত্বের উপর আঘাত হানা হচ্ছে। এই সকল আঘাতের বিরুদ্ধে মানবাধিকার ঘোষণার এই অনুচ্ছেদ সরব।

মানুষ নিঃসন্দেহে সামাজিক জীব। কিন্তু এই সামাজিক জীব হবার কারণে তার উপর কিছু অন্যায় দাবি করা হয়। বলা হয়, সমাজ ব্যতীত ব্যক্তির কোন সত্তা নেই, ব্যক্তি সমাজের অংশ মাত্র; সমাজ একটি সত্তা এবং ব্যক্তি সেই সত্তার একটি অংশ। সমাজই লক্ষ্য এবং ব্যক্তি উপলক্ষ্য; সমাজের উন্নয়নের জন্য ব্যক্তি উপায় মাত্র। এই ধারণাগুলি ভুল।

আসলে মানুষ একটি অখণ্ড এবং সমগ্র সত্তা। মানুষ বা ব্যক্তি নিজের মধ্যে পরিপূর্ন। সে অপর কোন পূর্ণের উপাদান বা পরিপূরক নয়। একথা সত্য যে, পারিপার্শ্বিককে আশ্রয় করে মানুষ বিকশিত হয় কিন্তু মানুষ পারিপার্শ্বিককে নিয়ন্ত্রণ করে, পারিপার্শ্বিককে অতিক্রম করবার জন্য মানুষ সমাজ সংস্কার করে।

দেশের স্বার্থে, সমাজের স্বার্থে, রাষ্ট্রের স্বার্থে, দলের স্বার্থে, ধর্মের স্বার্থে ব্যক্তিকে খর্ব করার নামই শোষণ। সেই শোষণ হতে মুক্ত হবার যে অধিকার তারই নাম ব্যক্তিসত্তার অধিকার এবং এটি একটি মানবাধিকার।

ব্যক্তি কোন উদ্দেশ্য নয়, নয় কোন উপায়। মানুষের মধ্যেই মানুষের পরিণতি। পূর্ণ পরিণত একক ব্যক্তি রূপে চিহ্নিত হবার অধিকারের ঘোষণা এই অনুচ্ছেদের মূল বক্তব্য।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

আইনের কাছে সকলেই সমান এবং কোনরূপ বৈষম্য ব্যতিরেকে সকলেরই আইনের দ্বারা সমভাবে রক্ষিত হওয়ার অধিকার রয়েছে। এই ঘোষণা লঙ্ঘণকারী কোনরূপ বৈষম্য বা এই ধরনের বৈষম্যের কোন উস্কানির বিরুদ্ধে সমভাবে রক্ষিত হওয়ার অধিকার সকলেরই আছে। (Article : 7. All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.)

ভাষ্য

'আইনের চোখে সকলেই সমান'—এই হচ্ছে আলোচ্য অনুচ্ছেদের মূল বক্তব্য। যে সমাজে আইনের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত সেখানেই সকল ব্যক্তি আইনের চোখে সমান বিবেচিত হতে পারে। আইনের চোখে সকলেই সমান এবং কোনরূপ বৈষম্য ছাড়াই সকলের আইনের দ্বারা সমভাবে রক্ষিত হওয়ার অধিকারটি তখনই বাস্তবায়িত হতে পারে যখন আইন হবে সুস্পষ্ট এবং আইনের শাসন হবে সুপ্রতিষ্ঠিত।

আলোচ্য অনুচ্ছেদটি সঠিকভাবে বুঝে নিতে হলে আমাদেরকে আইন ও আইনের শাসন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নিতে হবে।

আইন

আইন শব্দটিকে ব্যাপক ও সংকীর্ণ উভয় অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আইনকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবন গড়ে তোলার জন্য মানুষকে কতকগুলো সামাজিক বিধি নিষেধ মেনে চলতে হয়। এই বিধি নিষেধগুলিই সামাজিক আইন।

www.pathagar.com

আবার সুসভ্য জীব হিসেবে মানুষ ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, কল্যাণ-অকল্যাণ, সৎ-অসৎ প্রভৃতির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে সমাজ জীবনকে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজন কতগুলো নিয়ম কানুনের, যেগুলোর সাহায্যে মানুষের আচার আচরণের সঙ্গে সামাজিক উদ্দেশ্যের সমন্বয় সাধন করা হয়। এগুলোকে বলে নৈতিক আইন। এছাড়া প্রাকৃতিক ঘটনাবলির মধ্যে যে কার্যকারণ থাকে, তার কতগুলো নিয়ম থাকে। এগুলোকে বলে প্রাকৃতিক আইন। কিন্তু এসব আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। সামাজিক নৈতিক বা প্রাকৃতিক আইন মানার জন্য কাউকে বাধ্য করা হয় না। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদ যে আইনের সামনে সকলকেই সমান বলছে, সে আইন সংকীর্ণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। রাষ্ট্র মানুষের বাহ্যিক আচার আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য যে নিয়ম কানুন তৈরি করে সেগুলোই রাষ্ট্রীয় আইন। রাষ্ট্রীয় আইন ভঙ্গ করলে আইন ভঙ্গকারীকে দৈহিক শাস্তি পেতে হয়। বা অন্য প্রকার ভোগান্তির শিকার হতে হয়। কারণ রাষ্ট্রীয় আইনের প্রধান রক্ষাকর্তা হলো সার্বভৌম শক্তির আধার রাষ্ট্র। যে আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও নাগরিক, নাগরিক ও নাগরিক-সম্পর্ক, অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব নির্ধারিত হয়, যে আইন মানতে নাগরিক বাধ্য আলোচ্য অনুচ্ছেদে আমরা সেই আইনের কথাই বলছি। অবশ্য এই আইনেরও কোন সর্বসম্মত সংজ্ঞা দেয়া কঠিন। নিম্নে আইনের কয়েকটি সংজ্ঞা দেওয়া হলো ঃ

হবস, বোঁদা, হল্যান্ড, অস্টিন প্রমুখ বিশ্লেষণমূলক মতবাদে বিশ্বাসী চিন্তাবিদগণ আইনকে সার্বভৌম শক্তির আদেশ বলে বর্ণনা করেছেন। অস্টিনের মতে, আইন হলো নিম্নতমের প্রতি উর্ধ্বতনের আদেশ। হল্যান্ডের মতে, রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃত্ব কর্তৃক মানুষের বাহ্যিক আচার আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী সাধারণ নিয়মই হল আইন। কিন্তু জার্মান আইনবিদ স্যাভিনি (Saivigny), হেনরি মেইন (Henry Maine,) ক্লার্ক (Clark) প্রমুখ ঐতিহাসিক মতবাদে বিশ্বাসী আইনবিদগণের মতে, প্রত্যেক দেশেই সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি লোকাচার প্রভৃতি প্রচলিত থাকে। এগুলো কালক্রমে আইনের মর্যাদা লাভ করে। সুতরাং কোনভাবেই আইনকে সার্বভৌম শক্তির আদেশ বলে মেনে নেওয়া যায় না। স্যাভিনির মতে, আইন তৈরি করা রাষ্ট্রের কাজ নয়। আইনের যথার্থ উপলব্ধি ও তার প্রয়োগ করাই হল রাষ্ট্রের কাজ। আবার ক্রেবে (Krabbe), ড্যুগুই (Duguit) প্রমুখ আইনবিদদের মতে, বিভিন্ন সামাজিক কারণ ও সামাজিক প্রভাবের ফলে আইনের সৃষ্টি। তাদের মতে, আইনের মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজের কল্যাণ সাধন। আইন সার্বভৌম শক্তির নির্দেশ কিংবা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত সামাজিক প্রথা—আর এজন্যই আইন মানতে হবে একথা তারা বিশ্বাস করেন না। তাদের মতে, আইন সমাজের কল্যাণ সাধন করে বলেই আইনকে মানুষ মান্য করে।

আইনের বৈশিষ্ট্য হল (ক) আইন বিধিবদ্ধ নির্দেশমালা বা বিধানাবলি, (খ) আইন কেবল মানুষের বাহ্যিক আচার আচরণকেই নিয়ন্ত্রণ করে, (গ) আইনের বিধানগুলো সুনির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট ও সর্বজনীন, (ঘ) আইন কার্যকরী করা হল সার্বভৌম শক্তি কাজ, (ঙ) আইন ভঙ্গ করলে

www.pathagar.com

আইন ভঙ্গকারীকে অবশ্যই তার প্রতিফল বা শাস্তি পেতে হবে, (চ) আইনের স্থান সবকিছুর ঊর্ধ্বে।

উপরে যে আইনের কথা বলা হল, সে আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান। এ কথার অর্থ হচ্ছে কোন ব্যক্তি আইনের দৃষ্টিতে বিশেষ সুবিধা পাওয়ার অধিকারী নন। সকলেই সমান আইনগত সুবিধা পাবেন। আইন কারো প্রতি বন্ধু ; কারো প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন হবে না। প্রতিটি মানুষ সম অবস্থায় আইনের সমান আশ্রয় পাবে। এই হচ্ছে আইনের চোখে সমতা। অবশ্য আইনের চোখে সকলে সমান একথার অর্থ এই নয় যে দুনিয়ার তাবৎ মানুষের জন্য এক আইন। বিভিন্ন এলাকার মানুষের ইতিহাস ঐতিহ্য, রীতি-প্রথা, ধর্মবিশ্বাস, রাজনৈতিক চেতনা ইত্যাদি পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন এলাকার মানুষের জন্য আইনও বিভিন্ন। আইনের ভিন্নতা অস্বাভাবিক নয়। বরং যে আইন যে সমাজ বা শ্রেণির মানুষের জন্য, সেই আইন সেই সমাজের সকল মানুষের উপর সমভাবে প্রযোজ্য হবে। আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে কারো প্রতি কঠোরতা কারো প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করা হবে না।

আইনের শাসন

আইনের শাসন কথা অনেক ব্যাপক। এর মধ্যে কয়েকটি প্রত্যয় নিহিত রয়েছে।

প্রথমত, আইনের শাসন মানে মানুষের শাসনের বিপরীত। মানুষের আদেশ নয়, আইনের আদেশই হচ্ছে একমাত্র প্রতিপালনীয়। কোন ব্যক্তির আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা নেই, যদি না সে আদেশ দেবার কর্তৃত্ব আইনের দ্বারা বর্ণিত ও প্রদত্ত হয়। প্রসঙ্গত বাংলার নবাবী আমলের একটি গল্প উল্লেখ করছি।

জলসা ঘরে তরুণী নর্তকি বাজনার তালে তালে নাচছে, নাচের তালে তালে তরঙ্গায়িত হচ্ছে পূর্ণযৌবনা দেহ। মগ্ন হয়ে নাচ উপভোগ করছেন নবাব এবং তার সভাসদবৃন্দ। অকস্মাৎ জলসা ঘরের এক প্রান্তে এক যুবক উঠে দাঁড়ালো এবং চিৎকার করে বললো, 'থাম নর্তকি। তোমার নাচের ছন্দে কিছুটা ভুল হচ্ছে।' ঘটনার আকস্মিকতায় সকলেই স্তব্ধ হয়ে গেলো এবং ভীষণ বিরক্ত হল। রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে নবাব আদেশ করলেন, 'এই বেতমিজকে আমি মৃত্যুদণ্ড দিলাম এবং আগামীকাল অপরাহ্নে তাকে শূলে চড়ানো হবে।' পরদিন সকালে নর্তকী নবাবের অনুমতি নিয়ে তার কক্ষে প্রবেশ করে জোড়করে নিবেদন করল, 'জাহাপনা আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন। গতরাতে যে অসীম সাহসী যুবক আমার নৃত্যে বাধা দিয়েছিল, তার অসামান্য বিচার শক্তিতে আমি মুগ্ধ হয়েছি। সত্যিই আমার নৃত্যের একটি সূক্ষ্ম ভুল হয়েছিল।' শোনামাত্র নবাব আদেশ দিলেন, 'যুবকের মৃত্যুদণ্ড রহিত করা হল, তৎপরিবর্তে তাকে ৫ খানা স্বর্ণমুদ্রা ইনাম দেওয়া হোক।'

www.pathagar.com

গল্পে যে কাণ্ডটির কথা বলা হল এটা ব্যক্তির শাসন, আইনের শাসন নয়। কথায় কথায় মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া, শূলে চড়ানো, যখন যাকে খুশি ইনাম দেওয়া, বকশিস দেওয়া আইনের শাসন নয়, এগুলো স্বৈরাচারের রীতি। বস্তুত ব্যক্তি যত বড়ই হোক, যত উচ্চপদেই আসীন হোক, যত ক্ষমতাবানই হোক তার কোন ক্ষমতা নেই, ক্ষমতা আছে কেবল আইনের। সর্বাবস্থায় মানুষ দাবি করতে পারবে যে, সে একমাত্র আইনের শাসন ছাড়া আর কোন শাসন মানবে না। যিনি আইন প্রয়োগ করেন তিনিও মানুষ—একথা সত্যি এবং সে কারণে আইনের শাসনকে মানুষের শাসন বলে ভুল হতে পারে। কিন্তু প্রকৃত কথা হচ্ছে এই যে, আইন প্রয়োগকারী কোন ব্যক্তি আইনের চৌহদ্দির বাইরে যেতে পারেন না, গেলে সেটা আর আইনের শাসন থাকে না।

দ্বিতীয়ত, আইন বলতে বুঝায় বৈধ আইন। খামখেয়ালি আইনকে আইন বলা যায় না। আইনকে অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের সৃষ্ট এবং মৌলিক অধিকারানুগ হতে হবে। যিনি যে সময় যেভাবে আইন জারি করার অধিকার রাখেন, তিনিই কেবল সেই সময় সেভাবে আইন জারি করতে পারেন। সংসদ চলাকালে রাষ্ট্রপতির জারি করা অধ্যাদেশ বৈধ আইন নয়। আবার সংসদ বা রাষ্ট্রপতি যদি এমন কোন আইন প্রণয়ন করেন যা সংবিধানে বর্ণিত কোন মৌলিক অধিকার খর্ব করে তাহলে সেটা বৈধ আইন নয়।

তৃতীয়ত, আইনের শাসন বলতে বৈধ আইনের বৈধ প্রয়োগ এবং আইন বৈধ কিনা বা তার প্রয়োগ বৈধ কিনা তা দেখবার সংস্থা থাকা বুঝায়। নির্বাহী কর্তৃত্ব যদি আইনের সীমা অতিক্রম করে, তবে সেই বাড়াবাড়ি থেকে মানুষকে রক্ষা করবার জন্য সুষ্ঠু স্বাধীন নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা থাকা চাই। এই বাড়াবাড়ি রোধ করার জন্য বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা থাকা চাই। নতুবা আইনের শাসন অর্থহীন হয়ে পড়ে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আপনাকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে পাঠালেন। আপনার অনুমান বিরোধী দলীয় রাজনীতি করেন বলেই আপনাকে হাজতে পাঠানো হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা না থাকলে, আইনের আশ্রয় লাভের মৌলিক অধিকারের কোন অর্থ থাকে না। যে দেশে বিচার বিভাগ শক্তিধর নয়, যে দেশে বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়, যেদেশে বিচার বিভাগীয় নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয় না সেদেশে মৌলিক অধিকার ও আইনের শাসন দুটিই অর্থহীন।

চতুর্থত, আইনের শাসন বলতে আইনের সৎ ও সাধু প্রয়োগ বুঝায়। যে আইনের প্রয়োগ যেখানে হবার নয়, সে আইন সেখানে প্রয়োগ করা কিংবা হিংসা বা বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে আইন প্রয়োগ করাকে আইনের শাসন বলা চলে না। অসৎ উদ্দেশ্য ও কুপ্রয়োগে সু-আইনও মানুষের অকল্যাণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আইনের কুপ্রয়োগ হলে আইনের শাসন অর্থহীন হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

আইনের শাসনের প্রয়োজনীয়তা

আইন এবং আইনের শাসন দরকার হয়, মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য। সমাজবদ্ধ মানুষ প্রায়শই আক্রান্ত হয় একে অপরের দ্বারা। এতে কোন কোন মানুষের স্বার্থ, অধিকার বিপন্ন হয়, হক নষ্ট হয়। কোন কোন মানুষ নিজের স্বাধীনতা ভোগ করতে গিয়ে অপরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে বসে, নিজের অধিকার ভোগ করতে গিয়ে অন্যের অধিকার খর্ব করে। মানুষের এই সীমালঙ্ঘনের ঘটনা থেকে বিপর্যয় শুরু হয়। সত্যমিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, কল্যাণ-অকল্যাণ সম্পর্কে মানুষের ধারণা সাধারণত সকলের এক হলেও ব্যক্তি মানুষ নিজে যখন মিথ্যা বলে, অন্যায় করে, অকল্যাণের দিকে ধাবিত হয়, তখন তার কাজ অন্যের শান্তিকে বিঘ্নিত করে। সমাজের বা রাষ্ট্রের স্বাভাবিক নিয়ম শৃঙ্খলা নষ্ট হলে, জীবনে বিপর্যয় নেমে আসলে, অন্যের দ্বারা জীবন সম্পদ মান মর্যাদা আক্রান্ত হলে, আইন মানুষকে তা থেকে রক্ষা করে। দেশে প্রচলিত আইনের বিচারে কারো মৃত্যুদণ্ড তার প্রাণনাশ হয়। কিন্তু এতে যদি কেউ মনে করেন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া, প্রাণ হরণ করা আইনের কাজ তাহলে ঠিক হবে না। কারণ শাস্তি দেওয়া, মৃত্যুদণ্ড দেওয়া, প্রাণ নেওয়াই আইনের কাজ নয়। আইনের কাজ হচ্ছে মানুষকে রক্ষা করা, সমূহ বিপদের হাত থেকে উদ্ধার করাই আইনের কাজ। তাই যখন কোন মানুষের আচরণ অপরাপর মানুষের জীবন নাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তখন আইন নিরপরাধ মানুষের স্বার্থে, তাকে রক্ষার জন্য অপরাধীকে শাস্তিপ্রদান করে। তাই আমরা আইনকে মানুষের রক্ষাকবচ মনে করতে পারি।

মানুষকে রক্ষা করার জন্য সে আইন সে আইন মানুষের দিকে তাকাবে সমদৃষ্টিতে। আইনের চোখ থেকে কারো উপর অগ্নিবৃষ্টি বর্ষিত হবে না, আবার তা কারো উপর কোমল হবে না। আইন সবাইকে দেখবে মানুষ হিসেবে। ধনী কি গরীব, সাদা কি কালো, হিন্দু কি মুসলমান, নারী কি পুরুষ, বাঙ্গালি কি অবাঙ্গালি সকলেই আইনের চোখে সমান। সমান অপরাধের জন্য সমান শাস্তি পেতে হবে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-গরীব ইত্যাদির ভিন্নতার কারণে অপরাধের শাস্তির ক্ষেত্রে ভিন্নতা হবে না। সকলের জন্য সমান আইন নয় বরং অভিন্ন আইন অভিন্ন সকলের উপর সমভাবে কার্যকরী হবে। আইনের আচরণ সকলের প্রতি হবে সমান।

মানুষ আইনের আশ্রয় চায়। যখনই মানুষ আক্রান্ত হয় অন্যের দ্বারা, মানুষের জান মাল, ইজ্জত, আব্রু বিপন্ন হয় অথবা হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তখনই মানুষ দ্বারস্থ হয় আইনের। আইন মানুষের রক্ষাকবচ, আইন মানুষের আশ্রয়স্থল। যখন মানুষ আইনের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হবে, অথবা আইন যখন মানুষকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হবে, তখনই আইনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ। মানুষের অধিকার আছে আইন দ্বারা সংরক্ষিত হওয়ার এবং এই অধিকার প্রত্যেকেরই সমান। আইন দ্বারা মানুষ সকলে সমভাবে সংরক্ষিত হবে এবং এ ক্ষেত্রে কোনরূপ বৈষম্যের শিকার হবে না। বৈষম্যের শিকার না হওয়াও তার অধিকার। আইন প্রয়োগের

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে কোন রকম বৈষম্য করা হলে মানুষের এই অধিকারটি বিপন্ন হবে এবং মানুষ আইন দ্বারা সমানভাবে রক্ষিত হবে না।

বৈষম্য ও বৈষম্যের উস্কানির বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতার দলিল। এই দলিলে চিহ্নিত ও ঘোষিত হয়েছে মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতার কথা। এই স্বাধীনতা ও অধিকার সকলের সমান। সকলে সমভাবে ভোগ করবে স্বাধীনতা, সকলে সমভাবে লাভ করবে তার অধিকার।

যে কোন রকম বৈষম্য প্রদর্শন এই ঘোষণা লঙ্ঘন করতে পারে। এই ঘোষণা লঙ্ঘন করার মানে হচ্ছে মানুষের কোন না কোন অধিকার ও স্বাধীনতা খর্ব হওয়া। যদি এমন কোন বৈষম্য প্রদর্শন করা হয় বা বৈষম্য প্রদর্শনের জন্য উস্কানি দেওয়া হয়, যে বৈষম্যের কারণে ঘোষণাপত্র লঙ্ঘিত হতে পারে, তাহলে এর বিরুদ্ধও সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার সকলের আছে।

কোন রকমের বৈষম্য বা বৈষম্যের উস্কানির বিরুদ্ধ আইন হচ্ছে মানুষের রক্ষাকবচ। আইন মানুষকে বৈষম্যের হাত থেকে রক্ষা করবে। বৈষম্য ও বৈষম্যের উস্কানির বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করতে মানুষ আইনের আশ্রয় চাইবে। আইন মানুষকে রক্ষা করবে। এ ক্ষেত্রেও আইন দ্বারা সমভাবে রক্ষিত হবে মানুষ। বৈষম্য থেকে আইন কোন মানুষকে রক্ষা করবে, আবার কোন মানুষকে করবে না—এটা হয় না। মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে আইন অসম আচরণ করতে পারে না, করলে সেটা হবে মানবাধিকারের মারাত্মক লঙ্ঘন।

এই অনুচ্ছেদ ও ইসলাম

এই অনুচ্ছেদের মূল বক্তব্য হচ্ছে আইনের চোখে সকলেই সমান। মানুষকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে আইন বৈষম্য প্রদর্শন করবে না এবং কোনরূপ বৈষম্য বা বৈষম্যের উস্কানির বিরুদ্ধেও আইন মানুষকে সমভাবে রক্ষা করবে।

এ বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যা করার শুরুতেই আমি একটি ঘটনা উল্লেখ করতে চাই। মদিনার সম্ভ্রান্ত এক পরিবারের জনৈক মহিলাকে একবার চুরির দায়ে আটক করা হলো। এ ব্যাপারে মহিলার বংশ পরিচয় ও পারিবারিক ঐতিহ্যের কথা বর্ণনা করে রাসূলে করিম (দঃ)-এর নিকট মহিলার অব্যাহতির জন্য সুপারিশ করা হলো। হজরত মুহাম্মদ (দঃ) এর যে উত্তর দিয়েছিলেন তা হচ্ছে,

'তোমাদের পূর্বেকার জাতিসমূহকে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন—কারণ, তাহারা অপরাধের জন্য সাধারণ মানুষকে শাস্তি দিয়াছে এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গকে তাহাদের অপরাধের শাস্তি

www.pathagar.com

হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছে, আমি তাহার নামে শপথ নিতেছি, যাহার হাতে আমার জীবন-মরণ, যদি মোহাম্মদের কন্যা ফাতেমাও এই অপরাধে লিপ্ত থাকিত তাহা হইলে আমি তাহারও হাত কর্তন করিবার নির্দেশ দিতাম।'

রাসূলে করিম (দঃ) এর উক্ত বাণী থেকে এ কথা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে আইনের সম্মুখে সকলেই সমান। আইন কাউকেও বিশেষ সুবিধা দেবে না এবং কারো প্রতি বৈরিতা পোষণ করবে না। যে কেউ অপরাধ করলে আইনের মাধ্যমে তাকে শাস্তি পেতে হবে, অবশ্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন অপরাধ সংগঠিত হলে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অপরাধীকে ক্ষমা করলে সেটা ভিন্ন কথা। ইসলামি আইন যে সকলকে সমভাবে রক্ষা করে তার একটি প্রমাণ হচ্ছে বিদায় হজ্জে রাসূলের শেষ ভাষণ। আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে রাসূলে করিম (দঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন,

'একজন আরব একজন অনারব ব্যক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। একজন অনারব ব্যক্তিও আরেকজন আরব ব্যক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। তোমরা সকলেই একই আদমের সন্তান এবং আদম মৃত্তিকার তৈরি। বাস্তবিকই সকল মুসলমান ভাই ভাই।'

হজরত মুহাম্মদ (দঃ) উক্ত বাণী থেকে স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামে আইনের চোখে মানুষের মধ্যে অসমতা করার কোন উপায় নেই। ইসলাম আইনের দৃষ্টিতে পূর্ণাঙ্গ সাম্যের অধিকার দেয়। ইসলামের আইনের কোন অবস্থাতেই ধর্ম, বর্ণ বা গোত্র ভিত্তিতে বিভিন্নতার অবকাশ নেই। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম আদল বা ন্যায় পরায়নতার উপর গুরুত্বারোপ করেছে। কোরআনের সুরা নিসায় বলা হয়েছে, 'তোমরা যখন মানুষের মাঝে বিচার কার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়নতার সাথে করবে।' সূরা সা'দ-এ বলা হয়েছে, 'হে দাউদ, আমরা তোমাকে পৃথিবীতে খলিফা বানিয়েছি । অতএব, তুমি লোকদের মধ্যে ন্যায়পরায়নতার সাথে রাজত্ব কর এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ কর না। কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে।' মহানবি (দঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিনে লোকদের মধ্যে ন্যায় পরায়ণ শাসকই আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় এবং আমার সর্বাপেক্ষা নিকটে উপবেশনকারী হবে। পক্ষান্তরে কিয়ামতের দিন সবচেয়ে ঘৃণিত এবং সর্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তিতে পতিত হবে অত্যাচারী শাসক।'

বস্তুত, আইনের দৃষ্টিতে সমতা এবং আইনের সুশাসন ইসলামের মূল লক্ষ্য। ইসলামি আইনে মানুষের মধ্যে অসমতা করার কোন সুযোগ নেই। মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদ ইসলামের সাথে সংগতিপূর্ণ।

এই অনুচ্ছেদ ও বাংলাদেশের সংবিধান

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদের সংগে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭ নং ও ৩১ নং অনুচ্ছেদের সামঞ্জস্য রয়েছে। নিম্নে তা পরিবেশিত হল।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ —২৭ : সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

অনুচ্ছেদে—৩১ : আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইন অনুযায়ী ও কেবল আইন অনুযায়ী ব্যবহার লাভ; যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষত আইন অনুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।

এই অনুচ্ছেদ ও অন্যান্য সংবিধান

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদের প্রতিফলন ঘটেছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবিধানে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারাগুলো পরিবেশিত হলো ।

Indian Constitution : Article No. 14

"The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India."

Constition of Eire—Section 40 (1) 1937

" All citizens shall as human persons, be held equal before the law. This shall not be held to mean that the State shall not in its enactments have due regard to differences of capacity physical and moral, and of social funtion."

Constitution of West Germany (formar) 1948. Article No. 3 (1)

"All men shall be equal before the law."

সারসংক্ষেপ

আইনের শাসন এই অনুচ্ছেদের মূল কথা। আইনের সম্মুখে সকলেই সমান ; আইন মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ করে না।

www.pathagar.com

কিন্তু দেখতে হবে আইনটি আইনানুগ কিনা। দবির স্বাধীন, তার অর্থ এই যে, সে কেবল তার নিজের অধীন। যে আইন সে নিজে করবে, বা যে আইনের পেছনে তার সমর্থন বা অনুমোদন আছে, সে আইনই তার কাছে আইনানুগ আইন। তারই নির্বাচিত যখন তার জন্য আইন প্রণয়ন করেন, তখন সে আইন তারই আইন হয়ে যায়। বিধিবদ্ধ হলেও সব আইন গ্রহণীয় হয় না।

যে আইন দেশের সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থি, সে আইন বাতিল অর্থাৎ সে আইন আইনই নয়। যে আইন মানবাধিকারের পরিপন্থি সেই আইনকে সঙ্গত আইন বলতে বিবেকে বাধে।

কিন্তু আইন ভাল হলেও যে তা সার্থক হয় এমন নয়। যে আইনের প্রয়োগ পক্ষপাতহীন সে আইনের প্রয়োগই সার্থক। কর্মকর্তার জন্য এক আইন, কর্মচারীর জন্য অন্য আইন যেমন খারাপ, তেমনি প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বিভেদ করাও খারাপ। চুরি করলে হাত কাটা যদি আইন হয় তাহলে এর জন্য নবিদুহিতাও রেহাই পায় না।

বিক্ষুব্ধ মানুষ আইনের আশ্রয় পেতে চায়। আইনের আশ্রয় লাভের ক্ষেত্রে সকল মানুষের অধিকার এক ও অভিন্ন। আইনের সম্মুখে এবং আইনের আশ্রয়লাভের অধিকারের ক্ষেত্রে মানুষের সম অধিকারের যে ঘোষণা এই অনুচ্ছেদ দিয়েছে, সেখানে বৈষম্যহীনতার দাবি অপ্রতিহত। আইনের সম্মুখে বা আইনের আশ্রয়লাভের ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য বা বৈষম্যের উস্কানি দেয়া এই অনুচ্ছেদে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটা সত্য যে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ আজো দূর হয় নি। এবং এই ভেদাভেদের সমর্থনকারী কণ্ঠ একেবারে নিরব নয়। নানা অজুহাতে এই ভেদাভেদকে সমর্থন করা হয়। শক্তির অসমতা, অর্থের অসমতা, বিদ্যার অসমতা, মেধার অসমতা, এইসবের ভিত্তিতে বৈষম্যের দাবি করা হয়। এই অনুচ্ছেদ এ ধরনের দাবির তীব্র প্রতিবাদ করছে। তবে এখানে একটি প্রাসঙ্গিক কথা বলতে হয়, 'আইনের সম্মুখে সকলেই সমান' এর অর্থ এই যে, সকলের জন্য সমান আইন। ধনী শিল্পপতিকে আয়কর দিতে হয়, বিত্তহীন কৃষককে দিতে হয় না। আয়কর আইন অসম হলেও মানবাধিকার বহির্ভূত নয়। পুরুষের দেহ তল্লাশিতে অন্য কোন পুরুষের উপস্থিতি আবশ্যক নয় কিন্তু নারীর দেহ তল্লাশিতে এটি আবশ্যক। এই বৈষম্য দোষাবহ নয়।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

যে সকল কার্যাদির ফলে সংবিধান বা আইন কর্তৃক প্রদত্ত মৌলিক অধিকারসমূহ লঙ্ঘিত হয় সে সবের জন্য উপযুক্ত জাতীয়-বিচার-আদালতের মাধ্যমে কার্যকর প্রতিকার লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

(Article : 8. Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted by the constitution or by law.)

ভাষ্য

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদ, মানুষের আপন আপন দেশের সংবিধানে বিধৃত মৌলিক অধিকারসমূহের রক্ষাকবচ। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি স্বাধীন, সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ সংবিধান বা আইন দ্বারা সংরক্ষিত। কোন কাজের বা কর্মবিরতির দ্বারা নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ যদি লঙ্ঘিত হয়, তাহলে জাতীয় পর্যায়ের উপযুক্ত বিচার আদালতের মাধ্যমে মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিকার লাভের অধিকারের কথা এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদ যথার্থভাবে অনুধাবন করতে হলে মৌলিক অধিকার কাকে বলে এবং কি কি সে বিষয়ে আলোকপাত করা দরকার।

মৌলিক অধিকার

মৌলিক অধিকার বলতে সেই সব জন্মগত অবিচ্ছেদ্য অধিকারকে বুঝায়, যে সব অধিকারে মানুষ তার আপন সত্তার পূর্ণ বিকাশের জন্য এবং তার স্বকীয় আদর্শ বাস্তবায়নের পথে অবাধ কার্যক্রম গ্রহণ করতে পার এবং এই সব সহজাত ও অর্জিত ক্ষমতার পূর্ণ ও অবাধ ব্যবহার করতে পারে।

www.pathagar.com

মৌলিক অধিকারের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের সর্বপ্রকার নিরাপত্তা ও সমতার নিশ্চয়তা বিধানের সঙ্গে সুষ্ঠু বাধা নিষেধের মাধ্যমে তাদেরকে কর্তব্যপরায়ণ ভাল মানুষ করে তোলা। মানব প্রকৃতির মধ্যে কিছু সহজাত বৃত্তি আছে। এগুলো নিয়েই মানুষ জন্মেছে। এই বৃত্তিগুলো স্বাভাবিক, অপরিহার্য ও চিরন্তন। মানুষ চিন্তাভাবনা করতে পারে, কথা বলতে পারে, গাইতে পারে, এগুলো মানুষের সহজাত গুণ, এই বৃত্তিগুলো মানুষের কৃত্রিম সৃষ্টি নয়। এগুলো যেহেতু প্রকৃতির সৃষ্টি, তাই সেগুলো নষ্ট করলে প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়া হয়। এই বৃত্তিগুলো সংরক্ষণ ও বিকাশ মানুষের অবিচ্ছিন্ন অধিকার। এই সব অধিকার খর্ব হলে মানুষের মনুষ্যত্ব খর্ব হতে বাধ্য। আর একটি দিক হচ্ছে এই যে, মানুষের যুক্তিবাদিতার বোধ আছে। এই বোধ মানুষ জন্ম থেকে পেয়ে থাকে, পরবর্তীতে তা আরো বিকশিত হয়। এই বোধ সংরক্ষণও মানুষের মৌলিক অধিকার।

মানুষের এই যে বৃত্তিগুলো, যা রাষ্ট্রের জন্মের আগেও ছিল, রাষ্ট্র খর্ব করতে পারে না। যে সব অধিকার খর্ব করা মনুষত্বের পরিপন্থি, সেগুলোর উপর রাষ্ট্র হাত দিতে পারে না। রাষ্ট্রকে পর্যন্ত রুখবার এই যে অধিকার, একেই বলে মৌলিক অধিকার। কোন যুক্তি বা অজুহাতে মানুষের মৌলিক অধিকার সংকুচিত, বাতিল বা রদ করা যায় না। এই অধিকারসমূহ মানুষের অস্তিত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট।

যেসব দেশে লিখিত সংবিধান আছে, সেই সমস্ত দেশে কতিপয় অধিকার সংবিধানে বর্ণিত থাকে এবং সংবিধানে ঘোষণা দেওয়া হয় যে, ঐসব অধিকার সাধারণভাবে অপরিবর্তনীয় ও মৌলিক। সংবিধানে বা আইনে যে সব অধিকার অলঙ্ঘনীয় ও অপরিবর্তনীয় এবং মৌলিক হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয় এবং দেশের সাধারণ আইনের মত যা সংশোধন, বাতিল, পরিবর্তন বা রদ করা যায় না, আইনের দৃষ্টিতে তাকে মৌলিক অধিকার বলে।

আইনসভা দেশের সাধারণ আইন পরিবর্তন, রদ বা সংশোধন করতে পারে এবং এরূপ পরিবর্তন রদ বা সংশোধনের মাধ্যমে মানুষের সাধারণ অধিকার হরণ করা যেতে পারে কিন্তু এর মাধ্যমে মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ করা যায় না। মৌলিক অধিকারের বিষয়ে কোন রদবদলের প্রয়োজন হলে সংবিধান পরিবর্তন করতে হয়।

মৌলিক অধিকার সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনা করলে দেখা যাবে যে অধিকার চার ধরনের।

এক : যা মানুষ অন্যের নিকট থেকে বা রাষ্ট্রের নিকট থেকে আইনসঙ্গতভাবে দাবি করতে পারে, তাকে বলা হয় অধিকার। আপনার স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার আছে, এর অর্থ হচ্ছে এই যে, কারো দ্বারা আপনি বাধাপ্রাপ্ত হবেন না। হলে তার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করতে পারবেন। রাষ্ট্র আপনাকে বাধা দিতে পারবে না, ব্যক্তিও আপনাকে বাধা দিবে না। এই যে দাবি এর নাম অধিকার এটা সমাজ, রাষ্ট্র এবং অপরাপর ব্যক্তির কাছে ব্যক্তির পাওনা। বস্তুত অধিকার হচ্ছে এক ধরনের পাওনা।

www.pathagar.com

দুই : অধিকার এক প্রকারের স্বাধীনতা। কবিতা লিখার গান গাইবার অধিকার আপনার আছে। এর অর্থ হচ্ছে আপনি ইচ্ছা করলে কবিতা লিখতে বা গান গাইতে পারেন। বস্তুত অধিকার হচ্ছে এক ধরনের স্বাধীনতা।

তিন : কখনো কখনো অধিকারের অপর নাম ক্ষমতা। একজন মুসলমান পুরুষ তার মৃতা স্ত্রীর বোনকে বিয়ে করতে পারে, এটা তার পাওয়া নয়, স্বাধীনতাও নয়। এটা হচ্ছে এক ধরনের ক্ষমতা, যা অধিকারের পর্যায়ভুক্ত।

চার : অধিকার এক ধরনের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা। গুরুতর অপরাধ করলে পুলিশ গ্রেফতার করতে পারে। কিন্তু সরকারি কর্মচারী কার্যোপলক্ষে অনুরূপ গুরুতর অপরাধ করলে পুলিশ ঐ কর্মচারীকে উর্ধ্বতন কর্মচারীর অনুমতি ব্যতিরেকে গ্রেফতার করতে পারে না। এই নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হচ্ছে এক ধরনের অধিকার।

মানুষের যে সকল পাওনা বা দাবি, যে সকল স্বাধীনতা, যে সব ক্ষমতা এবং যে সকল নিরাপত্তা, কোন অজুহাতে লঙ্ঘন করা যায় না, সে সকল দাবি, স্বাধীনতা, ক্ষমতা ও নিরাপত্তা মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। মৌলিক অধিকার মানবজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

কোন কোন অধিকার মৌলিক

মানুষের অনেকগুলো অধিকারই মৌলিক। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবিধান ও আইনে যে সব অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ।

এক: সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। কোন ব্যক্তি আইনের দৃষ্টিতে বিশেষ সুবিধা পাওয়ার অধিকারী নয়। সকল নাগরিক সম অবস্থায় আইনের সমান আশ্রয় পাবে।

দুই : রাষ্ট্র কোন কারণে নাগরিকদের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করবে না। ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ, গোষ্ঠী, জন্মস্থান ইত্যাদি কারণে নাগরিকগণ বৈষম্যের শিকার হবে না। প্রত্যেক নাগরিকের বৈষম্যহীন ও সমতাভিত্তিক আচরণ লাভের অধিকার আছে।

তিন : রাষ্ট্রের কাজে অংশগ্রহণের সমান সুযোগ লাভের অধিকারটিও মৌলিক। রাষ্ট্রের সকল নাগরিক রাষ্ট্রীয় কার্যে তাদের যোগ্যতা অনুসারে অংশ নেওয়ার অধিকার পাবে এ ক্ষেত্রে কোন রকমের বৈষম্য প্রদর্শন করা হবে না।

চার : বেআইনিভাবে জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতায় কোন রকম হস্তক্ষেপ থেকে নিজেকে রক্ষা করার অধিকার প্রত্যেকের মৌলিক অধিকার। কাউকেই আইন অনুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

পাঁচ : বেআইনিভাবে গ্রেফতার বা কারাদণ্ড থেকে নিরাপদ থাকার অধিকার প্রত্যেকের মৌলিক অধিকার। কোন অপরাধে অভিযুক্ত না হলে এবং আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত না হলে কাউকে আটক রাখা যাবে না।

www.pathagar.com

ছয় : কাউকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শ্রম প্রদানে বাধ্য করা যায় না। জবরদস্তি শ্রম আইনের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। বেআইনিভাবে ইচ্ছার বিরুদ্ধে শ্রম প্রদান করা থেকে আত্মরক্ষার আধিকারটি মৌলিক অধিকার।

সাত : আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালতে প্রকাশ্য ও দ্রুত বিচারলাভের অধিকার প্রত্যেকের মৌলিক অধিকার। বিনা অপরাধে শাস্তি এবং একই অপরাধে দুইবার শাস্তি না পাবার অধিকারটিও মৌলিক।

আট : নিষ্ঠুর, অমানুসিক, যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে আত্মরক্ষার অধিকারটিও মৌলিক। আইন অনুযায়ী নির্ধারিত শাস্তির অতিরিক্ত শাস্তিভোগে কাউকে বাধ্য করা যায় না। যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে নিজেকে রক্ষার অধিকার মৌলিক।

নয় : জনস্বার্থে আইন আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে দেশের সর্বত্র অবাধে চলাফেরা, দেশের যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতিস্থাপন, দেশত্যাগ ও পুনঃপ্রবেশ প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

দশ : জনশৃঙ্খলা ও জনস্বার্থে আইন দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হওয়ার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার।

এগার : জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইন দ্বারা আরোপিত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে যুক্তিসঙ্গত সমিতি ও সংঘ গঠন করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত।

বার : চিন্তা , বিবেক ও বাক্‌স্বাধীনতা, ভাবপ্রকাশ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রায় প্রতিটি দেশেই মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এক্ষেত্রে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধের কথা বলা হয়।

তের : আইনসঙ্গত ও যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোন পেশাবৃত্তি, ব্যবসায়, কারবার করার স্বাধীনতা প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক অধিকার হিসেবে বিবেচিত। যোগ্যতা থাকলে ও বেআইনি না হলে এ ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করা যাবে না।

চৌদ্দ : আইন জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন, প্রচার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষণ, ব্যবস্থাপনার অধিকার এবং অন্য ধর্মের শিক্ষা গ্রহণ ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ না করার অধিকারটি মৌলিক।

পনের : আইন দ্বারা আরোপিত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি ব্যবস্থা করবার অধিকার প্রত্যেকের মৌলিক অধিকার হিসেবে প্রায় প্রত্যেক দেশেই স্বীকৃত হয়েছে।

www.pathagar.com

ষোল : আইন দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের প্রবেশ, তল্লাশি ও আটক থেকে নিজ গৃহে নিরাপত্তা এবং চিঠিপত্র ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনতা লাভের অধিকার প্রত্যেকের মৌলিক অধিকার।

উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো বিভিন্নভাবে বিভিন্ন দেশের সংবিধানে অথবা আইনে মৌলিক অধিকার হিসেবে গৃহীত হয়েছে। মৌলিক অধিকার বলবৎ করা এবং মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য আইনও প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিটি দেশের সংবিধান হচ্ছে, সে দেশের মূল আইন। আর সংবিধানের মূল বিষয় হচ্ছে মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত বিধান।

বিধি মোতাবেক মৌলিক অধিকার হচ্ছে অলঙ্ঘনীয় অধিকার কিন্তু যদি কোন কারণে কারো দ্বারা এটা লঙ্ঘিত হয়, তাহলে যে কাজের মাধ্যমে লঙ্ঘিত হবে তার জন্য প্রতিকার লাভের অধিকার রয়েছে। অধিকার রয়েছে সেই জাতীয় বিচার আদালতের মাধ্যমে প্রতিকার লাভের, যার আইনগত ক্ষমতা রয়েছে।

এই অনুচ্ছেদের লক্ষ্য হচ্ছে মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করা। কোন কারণে মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

এই অনুচ্ছেদ ও অন্যান্য সংবিধান

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদের সাথে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবিধানের সামঞ্জস্য রয়েছে। নিম্নে তা পরিবেশিত হল।

Constitution of India. Article No. 13

(1) All Laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this Constitution, in so far as they are inconsistent with the provisions of this part, shall, to the extent of such inconsistency, be void.

(2) The State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part and any law made in contravantion of this clause shall, to the extent of the contravention, be void.

(3) In this article, unless the context otherwise requires :

(a) "Law" includes any Ordinance, order, bye-law, rule, regulation, notification, custom or usage having in the territory of India the force of law;

(b) "Laws in force" includes laws passed or made by a legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this constitution and not previously repealed,

www.pathagar.com

notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular areas.

Constitution of Eire Section 15 (4)

(1) The Oireachtas shall not evact any law which is in any respect repugnant to this constitution or any provision thereof;

(2) Every law enacted by the Oireachtas which is in any respect repugnant to this constitution or to any provision thereof shall, but to the extent only of such repugnancy, be involved.

Constitution of Japan Article no. 98

This constitution shall be the supreme law of the State and no public law or ordinance and no Imperial rescript or other act of government, or part thereof, contrary to the provisions thereof, shall have legal force or validity.

Constitution of West Germany (1949) Article No. 1(3)

"The following basic rights shall be binding as directly valid law on legislation, administration, Judiciary."

হেবিয়াস কর্পাস জাতীয় নির্দেশদানের ক্ষমতা

(১) হাইকোর্ট বিভাগ যখনই উপযুক্ত মনে করেন, তখন নির্দেশ দিতে পারেন যে—

(ক) উহার ফৌজদারি আপিল অধিক্ষেত্রের সীমার মধ্যে অবস্থানকারী কোন ব্যক্তি সম্পর্কে আইন অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য তাহাকে আদালতে হাজির করা হউক।

(খ) উপরোক্ত সীমার মধ্যে সরকারি বা বেসরকারি হেফাজতে বেআইনিভাবে বা অযথা আটক কোন ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়া হউক;

(গ) আদালতের বিবেচনা বা তদানীন্তন কোন বিষয়ে সাক্ষি হিসাবে জবানবন্দি দেওয়ার জন্য উপরোক্ত সীমার মধ্যে অবস্থিত কোন কারাগারে আটক কোন বন্দিকে আদালতে হাজির করা হউক;

(ঘ) কোন কোর্ট মার্শাল বা কমিশনারের বিবেচনাধীন কোন বিষয় বিচারের জন্য বা সাক্ষি দেওয়ার জন্য উক্তরূপে আটক কোন বন্দিকে উক্ত কোর্ট মার্শাল বা কমিশনারের নিকট হাজির করা হউক;

www.pathagar.com

(ঙ) উপরোক্ত সীমার মধ্যে অবস্থানকারী কোন বন্দিকে বিচারের উদ্দেশ্যে এক হেফাজত হইতে অন্য হেফাজতে অপসারণ করা হউক ; এবং

(চ) (বাতিল)

(২) এই ধারা অনুসারে মামলার পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সুপ্রীমকোর্ট বিভিন্নসময়ে বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারেন।

(৩) এই ধারার কোন বিধান বর্তমানে বলবৎ কোন নিবর্তনমূলক আটক বিধান অনুসারে আটক ব্যক্তিদের প্রতি প্রযোজ্য নহে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বিধৃত মৌলিক অধিকারসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

আইনের দৃষ্টিতে সমতা ঃ

আইনের দৃষ্টিতে সমতা একটি মূল্যবান মৌলিক অধিকার। আইনের দৃষ্টিতে সমতা শীর্ষক অভিব্যক্তির মধ্যে দুটি মৌলিক অধিকারের ঘোষণা বিদ্যমান।

প্রথমটা এই যে, সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান। দ্বিতীয় ঘোষণাটা এই যে, সকল নাগরিক আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান, এই ঘোষণার মর্ম এই যে, কোন ব্যক্তি আইনের দৃষ্টিতে বিশেষ সুবিধা পাওয়ার অধিকারী নয়।

'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান '.এবং' 'সকল নাগরিকের জন্য আইন' এই দুটি বাক্য সমার্থক নয়। সংবিধানে এমন কোন বিধান নেই যাতে বলা হয়েছে যে, সকল মানুষের জন্য সমান আইন হবে।

আলোচ্য মৌলিক অধিকারের প্রথম অংশটি বিশ্লেষণ করলে নিম্নবর্ণিত দুটি সূত্র পাওয়া যায় ।

(১) এই বিধানে বলা হয় নি যে, দেশের সমস্ত আইন সকলের উপর প্রযোজ্য হবে। বলা হয় নি যে, সকল নাগরিক একই প্রকারের দায়িত্বের আওতায় আসবে।

(২) নাগরিকের মৌলিক অধিকার তার জন্ম, ধর্ম, সমাজ অথবা বাসস্থানের দ্বারা ইতর বিশেষ হবে না। সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এই বিধানের অর্থ এই যে, যে-আইন যে-শ্রেণির জন্য প্রণীত, সেই আইন সমভাবে সেই শ্রেণির সকলের জন্য প্রযোজ্য হবে। আইন প্রণয়নের বেলায় মানুষে মানুষে প্রভেদ থাকবে না—এই বিধানের উদ্দেশ্য নয়।

হিন্দুদের জন্য বিবাহ এবং উত্তরাধিকারের প্রশ্নে একরকম আইন ও মুসলমানদের জন্য বিবাহ এবং উত্তরাধিকার প্রশ্নে অন্যরূপ আইন, একটি বিশেষ অনুন্নত এলাকার জন্য একরূপ আইন। অন্যস্থানের জন্য অন্যরূপ আইন। আইনের এই অসমতা আলোচ্য বিধানে অস্বীকৃত হয় নি। স্বাভাবিক কারণে এক মানুষ অন্য মানুষ থেকে জ্ঞানে, গুণে এবং অবস্থায় ভিন্ন। তাই সকল মানুষের উপর সর্বদা একই আইন প্রযোজ্য নয়।

www.pathagar.com

সকল নাগরিক আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী : এই ঘোষণা বা বিধানের মর্মকথা এই যে, সকল নাগরিক সম অবস্থায় আইনের কাছে সমান আশ্রয় পাবে। নাগরিকগণকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করে তাদের প্রত্যেক শ্রেণিকে ভিন্ন আইনের আওতায় আনা অন্যায় নয়। শ্রেণিবিন্যাস আলোচ্য বিধানের পরিপন্থি নয়। যদি দেখা যায় যে, শ্রেণিবিন্যাসের মূলে যুক্তি এবং কারণ বিদ্যমান, তবে তা অসিদ্ধ নয়।

এই বিধান বিশ্লেষণ করে নিম্নবর্ণিত সূত্রসমূহ অবধারণ করা গিয়েছে:

(১) যখন কোন আইন সংসদ কর্তৃক প্রণীত হয়, তখন ধরে নিতে হয় যে, আইনটি সংবিধানুগ, কারণ সংসদের সদস্যবৃন্দ সম্যক অবস্থার সাথে পরিচিত এবং সেই কারণে কোন শ্রেনীর জন্য তারা যে পৃথক ব্যবস্থা করেছেন তা অবস্থার দাবিতে করেছেন।

(২) উপরের বর্ণিত ধারণা নস্যাৎ হয়ে যায় যদি দেখা যায় যে, এই বিশেষ আইনটির মূলে যথোপযুক্ত অবস্থা নেই।

(৩) যেহেতু মানুষ প্রকৃতিতে, সাধনার সিদ্ধিতে এবং অবস্থা বৈগুণ্যে অভিন্ন নয়, সেহেতু বিভিন্ন শ্রেণির নাগরিকদের জন্য আইনের বিভিন্ন ব্যবস্থা অন্যায় নয়।

(৪) নাগরিকদের মধ্যে যুক্তিযুক্ত কারণে শ্রেণিবিভাগ করবার অধিকার রাষ্ট্রের আছে।

(৫) প্রত্যেক শ্রেণিবিন্যাসই কিছু কিছু অসমতা আনয়ন করে। কিন্তু তৎকারণে কোন আইন বাতিল গণ্য করা যায় না।

(৬) যদি কোন আইন কোন একটি বিশেষ শ্রেণির সত্যের প্রতি সমান আচরণ করে থাকে তবে যেহেতু সেই আইন সকলের উপর প্রযোজ্য নয়, এই কারণে বাতিলযোগ্য হয় না।

(৭) শ্রেণিবিন্যাস অনুমোদন যোগ্য বটে কিন্তু তার ভিত্তিমূলে যথেষ্ট যুক্তি থাকা চাই। খামখেয়ালি করে নাগরিকগণের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করলে তা সিদ্ধ হবে।

ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্যমূলক ব্যবহার না পাওয়া বর্তমান যুগে একটা বিশেষ ফলপ্রদ মৌলিক অধিকার : কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ , নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবেন না।

এই অধিকারটা বৈষম্য বিরোধী—এই অধিকার সর্বপ্রকার বৈষম্যের মূলে কুঠারাঘাত করেছে। রাজনৈতিক, দেওয়ানি, সামাজিক বা অন্য সর্বপ্রকারের বৈষম্য এই অধিকার দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কোনো প্রকার সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ বা সম্প্রদায়ভিত্তিক নির্বাচন করা হলে তা এই বিধান দ্বারা বাতিল ঘোষিত হতে পারে। বৈষম্য শব্দের অর্থ আচরণের অসমতা। কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে বৈষম্য প্রদর্শন নিষিদ্ধ নয়। সংবিধানে প্রত্যেক নাগরিকের ধর্মীয় স্বাধীনতার বিধান রয়েছে। আবার ধর্মীয় কারণে সর্বপ্রকার বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। একটি বিশেষ ধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণে কোন নাগরিক যেমন কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবেন না, তেমনি কোন বিশেষ সুবিধাও পাবেন না। কোন বিশেষ ধর্মের লোক বা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতী কলহপ্রিয় এই অজুহাতে সেই ধর্ম বা

www.pathagar.com

সম্প্রদায়ের লোকদের উপর বিশেষ শাস্তির ব্যবস্থা অবৈধ। আমাদের দেশে গোষ্ঠীগত কারণে বৈষম্য ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়।

গোষ্ঠী বলতে সেই মানব মণ্ডলীকে বুঝায়, যারা পুরুষানুক্রমে উত্তরাধিকারী সূত্রে একটি বিশেষ আকৃতি-প্রকৃতি বহন করে। পণ্ডিতগণের মতে, চুলের রং, গাত্রবর্ণ, মাথার আকৃতি, শরীরের গঠন এবং মুখাবয়ব প্রভৃতি দ্বারা গোত্র নির্ণীত হয়। বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সমাবেশ দেখা যায়। গোষ্ঠীগত কারণে তাদের প্রতি অসম আচরণ নিষিদ্ধ।

বর্ণ শব্দটি এখানে সাধারণভাবে আমরা যাকে জাতি বলি, সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হিন্দু সমাজে পূর্বে চতুর্বর্ন বিদ্যমান ছিল, যথা—ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও শূদ্র। মুসলমান সমাজে যে একেবারে বর্ণবিভাগ নাই তা নয়। বর্ণের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা যুগ যুগ ধরে একই অপরিবর্তিত রূপ বহন করে। ব্রাহ্মণের পুত্র চিরকালই ব্রাহ্মণ হয়।

বর্ণভেদের কারণে সামাজিক ক্ষেত্রে অনেক বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সর্বপ্রকার বর্ণ বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

লিঙ্গ বৈষম্যের জন্য সাধারণভাবে কোন প্রকার বৈষম্য প্রদর্শন অবৈধ। কিন্তু নারী, শিশু এবং অনগ্রসর নাগরিকদের জন্য বিশেষ বিধানের ব্যবস্থা সুরক্ষিত হয়েছে।

সরকারি নিয়োগ লাভের সুযোগের সমতার দাবিও একটা মৌলিক অধিকার

সংবিধানে নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে যে, প্রজাতন্ত্রের অধীনে নিয়োগ অথবা পদ লাভের জন্য সকল প্রার্থীরই সমান সুবিধা থাকবে। অবশ্য এতে এই গ্যারান্টি দেওয়া নেই যে, কেবল প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকলেই অনুরূপ প্রার্থীদের সকলেই চাকুরিতে বহাল হতে পারবেন। এটা নির্ভর করবে নিযুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যায় পদ থাকা বা না থাকার উপরে। একটিমাত্র পদের জন্য যদি দুইজন প্রার্থীর যোগ্যতা সমান হয়, তবে সে ক্ষেত্রে যে কোন একজনকে নিযুক্ত করবার এখতিয়ার থাকবে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের এবং এই এখতিয়ার কোন প্রকারেই ক্ষুণ্ন করা যাবে না।

আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার সকল নাগরিকের জন্য মৌলিক : এই অধিকার ঘোষণার দ্বারা আইনের শাসনের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে, সকল নাগরিক আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। অর্থাৎ আইনের আশ্রয়ের ব্যাপারে বৈষম্য নিষিদ্ধ। বর্তমান অধিকার দ্বারা আইনের আশ্রয় লাভ এবং আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভ সকলের অবিচ্ছেদ্য অধিকার বলে স্বীকৃত হয়েছে। এই অধিকারকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম ভাগে আইনের আশ্রয় লাভের এবং আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। দ্বিতীয়ভাগে জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম ও সম্পত্তি হানিকর সর্বপ্রকার ব্যবস্থাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যদি তা আইনের মাধ্যমে না হয়। আলোচ্য মৌলিক অধিকারটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ এবং লাভ লোকসান

www.pathagar.com

সম্পর্কে আইন দ্বারা ব্যবস্থাগ্রহণ করবার নিরঙ্কুশ এবং পূর্ণ দায়িত্ব সংসদের উপর ন্যস্ত হয়েছে। সংসদ এই সমস্ত ব্যাপারে যে কোনরূপ আইন করলে তাতে বাধা দেবার কেউ নেই। সংবিধানে বর্ণিত এই মৌলিক অধিকার দ্বারা স্পষ্ট হয়েছে যে, নির্বাহী বিভাগ ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম এবং সম্পত্তির ব্যাপারে আইনের মাধ্যম ছাড়া কিছুই করতে পারবেন না ।

ইংরেজিতে একটা বহুল ব্যবহৃত প্রবচন আছে, যার নাম আইনের শাসন।

১. এই অভিব্যক্তির একটা অর্থ এই যে মানুষের জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম এবং সম্পত্তির ব্যাপারে কারো কোন প্রকার ব্যক্তিগত এখতিয়ার নাই। বিচারের মাধ্যমে আইন প্রয়োগ করে মানুষকে ফাঁসি দেওয়া যেতে পারে, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা যেতে পারে। কিন্তু আইন না প্রয়োগ করে কিছুই করা যায় না। খেয়াল হলে দেশের কেউ অন্য একজনকে প্রকাশ্য সভায় শাস্তির হুকুম দিলেন, একরকম হতে পারবে না। চলাফেরার স্বাধীনতা সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। এই অধিকারে ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার থাকবে।

(ক) বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা করার,

(খ) বাংলাদেশের যে কোন স্থানে বসবাস করার,

(গ) বাংলাদেশের যে কোন স্থানে বসতি স্থাপন করার,

(ঘ) বাংলাদেশ ত্যাগ করার;

(ঙ) বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করার।

তবে এই স্বাধীনতা আইন দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধের অধীন, কিন্তু সেই বাধানিষেধ জনস্বার্থে হওয়া প্রয়োজন। এই অধিকার যে উদ্দেশ্যে প্রদত্ত তা এই যে, সমগ্র বাংলাদেশ প্রত্যেক বাংলাদেশীর মাতৃভূমি। দেশের যে অংশে তার জন্ম হোক না কেন সমগ্র দেশের প্রতি ইঞ্চি ভূমি বা জলভাগ তার স্বাধীন বিহার ক্ষেত্র বা কর্মভূমি হতে পারে। এই অধিকারকে জনস্বার্থের যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধের আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা নিষিদ্ধ করা যায়। যেহেতু এই অনুচ্ছেদে চলাফেরার স্বাধীনতার বিধান রয়েছে সেহেতু যারা দুশ্চরিত্রের লোক তাদের পশ্চাতে , তাদের চলাফেরাকে বাধা না দিয়ে গোয়েন্দা লাগানো অন্যায় নয় বরং এই শ্রেণির আইন আলোচ্য অধিকারের পরিপন্থি নয়। ব্যক্তিগত স্পর্শকাতরতাকে হেফাজত করবার জন্য এই অধিকার ব্যবহার করা চলে না।

কোন দাগি ব্যক্তির বাড়িতে পুলিশ প্রবেশ করবার এবং তল্লাশি চালাবার অধিকার যে আইনে দেয়, তা এই অধিকারের প্রতিকূল নয়। জনস্বার্থ শব্দটি অতি বৃহৎ ব্যাপক অর্থ বহন করে। আভ্যন্তরীন শান্তি-শৃঙ্খলা, জনসাধারণের নৈতিকতা, আর্থিক ও সামাজিক সমস্যা প্রভৃতি কারণে বাধানিষেধ আরোপ করে যে সমস্ত আইন প্রণীত হয় সেগুলোকে যে জনস্বার্থে করা হয়েছে এমন বলা যায় । বাধানিষেধ আরোপকারী কতকগুলি আইনের উদাহরন দেওয়া যাক।

www.pathagar.com

(ক) প্লেগ প্রভৃতি সংক্রামক রোগের প্রসার বন্ধ করবার জন্য চলাফেরার স্বাধীনতাকে আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা যায়। সংক্রামক রোগে আক্রান্ত রোগীদের সাধারণ পরিবহণে যাতায়াতকে আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ করা যায়। সুস্থ মানুষকে যে এলাকায় সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে, সেই এলাকায় চলাফেরা নিয়ন্ত্রিত ও নিষিদ্ধ করা যায়। সংরক্ষিত এলাকায়, যথা—দুর্গ, পুরাকীর্তি প্রভৃতিতে যাতায়াত নিষিদ্ধ করা যায়। যারা বিপজ্জনক চরিত্রের মানুষ একটি বিশেষ এলাকা থেকে তাদেরকে সরানো সংবিধানের এই অধিকারের পরিপন্থি নয়। দাগী, দুষ্কৃতিকারীদের চলাফেরার স্বাধীনতাকে আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যারা দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বা শ্রেণির মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করে তাদের চলাফেরাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

অবশ্য যে বাধা নিষেধ আরোপ করা হয় তা যুক্তিসঙ্গত হওয়া চাই। গুণ্ডাকে বহিষ্কার করবার জন্য আইন করবার সময় যদি গুণ্ডার যথাযথ সংজ্ঞা না দেওয়া হয় তবে তা যুক্তিসঙ্গত হবে না এবং সেই আইন এই অধিকারের পরিপন্থি হবার কারণে বাতিল হবে। যে আইন দ্বারা বাধা নিষেধ আরোপ করা হয় সেই আইনের কার্যবিধি যদি সুবিচারের নীতি বহির্ভূত হয় তবে সেই আইনকে সমর্থন করা যাবে না। চলাফেরার স্বাধীনতার উপর বাধা নিষেধকারী আইনের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ জানাবার বিধান থাকতে হবে।

এই ঘোষণা প্রত্যেক নাগরিককে বাংলাদেশের প্রতি ইঞ্চি ভূ-ভাগে বসবাস করবার এবং বসতি স্থাপন করবার অধিকার দেয়। সমগ্র বাংলাদেশ তার মাতৃভূমি। সুতরাং সর্বস্থানে বসবাস করবার অধিকার তার আছে। কিন্তু এই স্বাধীনতা ও যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধের অধীন। যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ অবশ্যই জনস্বার্থের প্রয়োজন হতে হবে।

নিম্নে বর্ণিত বাধা নিষেধ জনস্বার্থে যুক্তিসঙ্গত বলে পরিগণিত হয়েছে ঃ

(ক) বারবণিতাদের একটি বিশেষ এলাকায় বসবাস করতে বাধ্য করা যায় ;

(খ) বারবণিতাদের একটি বিশেষ স্থান থেকে সরিয়ে দেওয়া যায় ।

বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের রয়েছে। কিন্তু এই অধিকার জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধের অধীন। অবশ্য দেশের বাইরে যাবার এবং দেশে পুনঃপ্রবেশ করবার ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণমূলক আইন করা যায়। স্মরণ রাখতে হবে, এই অধিকার শুধু নাগরিকগণের প্রাপ্য বিদেশীর নহে।

সমাবেশের স্বাধীনতা সকল নাগরিকের জন্য মৌলিক সংবিধানের ঘোষণার মাধ্যমে প্রত্যেক নাগরিক এই অধিকার লাভ করেছেন ।

প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার আছে ঃ

(ক) শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হবার, এবং

(খ) জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করবার।

কিন্তু এই অধিকার জন শৃঙ্খলা ও জন স্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধের অধীন।

www.pathagar.com

জনশৃঙ্খলার স্বার্থে। শব্দদুটি বহু ব্যবহৃত। সুতরাং এই শব্দদ্বয়ের বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

দাঙ্গা হাঙ্গামার উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো কার্যে অগ্রসর হওয়া, অন্যের স্বাধীনতাকে ব্যাহত করতে পারে এমন কার্য করা প্রভৃতি নিশ্চয়ই জনশৃঙ্খলার পরিপন্থি। সুতরাং এগুলিকে দমন করবার উদ্দেশ্যে নাগরিকের স্বাধীনতার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা যায়। রাস্তাঘাটে কিংবা সরকারি স্থানে জনসমাবেশ করা কিংবা শোভাযাত্রা করা আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত করা যায়। এগুলিও জনশৃঙ্খলার স্বার্থের আওতায় আসে। সমবেত হবার অধিকার নিরঙ্কুশ নয়। শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় শুধু সমবেত হওয়াযায়। জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করবার অধিকার একই প্রকার শর্তের অধীন। অবশ্য জনস্বার্থের ও জনশৃঙ্খলার কারণে এই অধিকারকে সীমিত করা যায়।

চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্‌স্বাধীনতা সভ্যদেশের সকল নাগরিকের একটা বহুল বাঞ্ছিত অধিকার। আমাদের সংবিধানে এই স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়েছে।

বাক্ স্বাধীনতা ঃ মুক্ত ও অবাধ আলোচনা বাক্ স্বাধীনতার অন্তর্গত এবং এই আলোচনার পরিধি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে কথা বলার স্বাধীনতা এই স্বাধীনতার অন্তর্গত।

ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা ঃ এই স্বাধীনতার এলাকা এবং পরিধি বাক্-স্বাধীনতার এলাকা ও পরিধি থেকে বহুগুণ বৃহৎ। ধ্বনি, লেখনী, চিত্র, অভিনয়, ভঙ্গিমা, ব্যানার, ফেষ্টুন অথবা এই শ্রেণির অন্য মাধ্যম দ্বারা ভাব প্রকাশ এই স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত। ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা বলতে শুধু নিজের ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতাকেই বোঝায় না, অন্যের ভাব প্রকাশের স্বাধীনতাকেও বোঝায়।

ভাবপ্রকাশের মধ্যে ভাবপ্রচার অন্তর্ভুক্ত। প্রচারিত না হলে ভাব প্রকাশ মূল্যহীন হয়ে পড়ে। রেডিও, সিনেমা, গ্রামোফোন, লাউড স্পিকার প্রভৃতিতে ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতা ঃ এই স্বাধীনতার অর্থ লিখবার এবং তা প্রকাশ করবার স্বাধীনতা। বস্তুত বাক্‌স্বাধীনতা এবং ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রকাশিত হবার পূর্বে ভাবপ্রকাশকে বাধাদান সাধারণ অবস্থায় অসিদ্ধ। স্বাধীন মানুষের মনে যে ভাবরাজি সর্বদা উত্থিত হয় স্বেচ্ছায় সে তা জনসমক্ষে উপস্থাপিত করতে পারে। একে নিষিদ্ধ করা এই স্বাধীনতাকে নিষিদ্ধ করবার শামিল। প্রকাশিত হবার পর কিছু অন্যায় হয়ে থাকলে প্রকাশকই দায়ী।

প্রচারের স্বাধীনতা ও সম্পাদনা বিভাগে স্বাধীনতা সংঘাত— ক্ষেত্রের স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত।

www.pathagar.com

বিজ্ঞাপন, লিফলেট, প্রচারপত্র প্রকাশ করাও এই স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত। তবে এই স্বাধীনতা কতিপয় সীমার অধীন।

(ক) বাক্ স্বাধীনতার প্রথম সীমা ঃ আদালত বা বিচার বা বিচারক সম্পর্কীয় উক্তিতে বিন্দুমাত্র অবমাননা প্রকাশ শাস্তির যোগ্য। বিচারকগণ অপাপবিদ্ধ অথবা বিচ্যুতিবিহীন মহামানব বা নরাবতার নন। কিন্তু তবুও মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের উদ্দেশ্যে বিচারের ব্যাপারে বিচারককে সমালোচনার উর্ধ্বে রাখা হয়েছে। বিচারকগণ বিচারকার্যের সময় যদি একটা নির্ভয়তার আশ্রয় উপলব্ধি না করেন, যদি তিনি বিত্তশালী এবং প্রতিষ্ঠাবান লোকের বিরূপ সমালোচনার আশঙ্কায় কম্পিত থাকেন, তবে তার সিদ্ধান্ত প্রভাব-নিরপেক্ষ হতে পারে না। বিচারককে তাই সমালোচনার উর্ধ্বে রাখা একটা বাঞ্ছনীয় রীতি। সব দেশেই কোনো বিচারককে ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান করা কিংবা তার কাজে বাধা প্রদান করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কোনো মোকদ্দমার ফলাফল সম্পর্কে বিচারককে প্রভাবান্বিত করার কোনো চেষ্টা করা , বিচারকের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে ইঙ্গিত করা, বিচারকের ন্যায্য আদেশ ও নিষেধ প্রতিপালন না করা প্রভৃতিও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এবং দণ্ডবিধির ২২৮ ধারা আদালত অবমাননা সম্পর্কীয় আইনের ধারক।

(খ) বাক্ স্বাধীনতার দ্বিতীয় সীমা ঃ যে উক্তিতে অন্যের অপযশ হয়, সেই অপযশ সৃষ্টিকারী লিখিত বা মৌখিক প্রকাশ বা উক্তি শাস্তির যোগ্য, অন্য কথায় বাক্স্বাধীনতা অন্যের অপযশ কীর্তনের অধিকার দেয় না।

(গ) বাক্-স্বাধীনতার তৃতীয় সীমা ঃ বাক্-স্বাধীনতা মানুষকে অশ্লীল হবার অধিকার দেয় না। যে উক্তি, যে সাহিত্য বা যে চিত্র মানুষের কামরিপুকে উদ্দীপ্ত বা উজ্জীবিত করে তা প্রকাশের অধিকার সভ্যসমাজে অস্বীকৃত। শ্লীল এবং অশ্লীলের মাঝখানে যে সীমারেখা টানা হয়েছে যুগে যুগে তা পরিবর্তিত এবং বিবর্তিত হয়েছে। সেই সীমারেখা অতীব জটিল এবং সূক্ষ্ম। আইন দর্শনের সূত্র এই যে, যা মানুষকে কলুষিত করে তাই অশ্লীল। কিন্তু কোনটা মানব-মন কলুষিত আর কোনটা করে না সে প্রশ্ন অতি দুরূহ, এক সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত।

(ঘ) বাক্-স্বাধীনতার চতুর্থ সীমা ঃ রাষ্ট্রদ্রোহীতামূলক মৌখিক এবং লিখিত সমস্ত উক্তি আইনের দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সে-সব উক্তি মানুষের মনে রাষ্ট্রের প্রতি হিংসা বা ক্রোধকে উদ্দীপ্ত করে, সে সমস্ত উক্তি পর্যন্ত বাক্-স্বাধীনতার সীমা পৌঁছায় না। এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য যে, কোন বিশেষ দলের সরকারকে সমালোচনা রাষ্ট্রদ্রোহিতার পর্যায়ভুক্ত নয়। যে উক্তিগুলি নাগরিকবর্গের মনে ঘৃণার উদ্রেক করে রাষ্ট্রের ধ্বংসের কাজে উৎসাহিত করে, সে সমস্ত উক্তি রাষ্ট্রদ্রোহিতার পর্যায়ভুক্ত। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা এবং রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ন রাখবার

www.pathagar.com

প্রয়োজনে প্রত্যেকটি রাষ্ট ন্যায়ত এবং স্বভাবত এই দাবি করতে পারে যে, রাষ্ট্রের সমস্ত নর-নারী রাষ্ট্রের প্রতি এবং রাষ্ট্রীয় সংবিধানের প্রতি অনুগত থাকবে। রাষ্ট্র সে সরকার দ্বারা পরিচালিত হয় সেই সরকারের গৃহীত নীতি এবং পদ্ধতি কখনই সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। কিন্তু যে সমস্ত উক্তি রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে আঘাত করে, কোনদিনই সেগুলি সমর্থিত হতে পারে না। কোন উক্তি রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক আর কোন্‌টা নয়, সেটা নির্ভর করে বক্তার মনের ভাবের উপর এবং যাদের সামনে সেটি প্রকাশিত হচ্ছে তাদের মানসিক অবস্থার উপর এবং সর্বশেষে স্থান ও কালের উপর।

(ঙ) **বাক্‌-স্বাধীনতার পঞ্চম সীমা ঃ** শান্তিভঙ্গমূলক কোন লিখিত বা মৌখিক উক্তি আইনের দৃষ্টিতে অমার্জনীয়। দেশে এবং সমাজে শান্তি অক্ষুণ্ন রাখার দায়িত্ব সরকারের, তাই এই দায়িত্বের পরিপন্থি কোনো কার্যকে সরকার বরদাস্ত করে না। যদি কোন ব্যক্তি এমন কোন কিছু বলেন বা লিখেন বা অন্যভাবে প্রকাশ করেন, যার দ্বারা দেশের বিভিন্ন সমাজ এবং শ্রেণির মধ্যে ঘৃণার ও হিংসার উদ্রেক হয় তবে তিনি আইনের দৃষ্টিতে অপরাধী। কোন অলি আল্লাহ্‌, পীর, ফকির বা দরবেশের বিরুদ্ধে, কোন ধর্ম বা ধর্মীয় নেতার বিরুদ্ধে, কোন জাতি বা পেশার বিরুদ্ধে অসভ্য উক্তি সমর্থনযোগ্য নয়। বলা বাহুল্য, সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ন্যায্য আলোচনা কিংবা কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীর সৃষ্টিমূলক রচনা প্রভৃতিতে প্রাসঙ্গিক উক্তিসমূহ সীমাহীনভাবে অশোভন না হলে আপত্তিজনক হয় না।

রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে গণতান্ত্রিক সমাজে বাক্‌স্বাধীনতা অতি প্রয়াজনীয় হলেও সেখানে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা প্রশ্ন বিদ্যমান, সেখানে এই স্বাধীনতা নিশ্চয়ই নিয়ন্ত্রণযোগ্য।

নিরাপত্তা শব্দের আভিধানিক অর্থ আপদহীনতা। রাষ্ট্রকে বিপদ থেকে মুক্ত রাখার স্বার্থকে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা স্বার্থ বলা যায়। এর একটি আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক দিক আছে।

সমাজতন্ত্রের প্রচার রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা স্বার্থের পরিপন্থি নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, আমাদের সংবিধান নিজস্বভাবে একপ্রকার সমাজতন্ত্রের উদ্‌গাতা। মেহনতি জনতার বিপ্লব প্রচার করা ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রতিকূল নয়। যদি সেই বিপ্লব সশস্ত্র না হয়।

(চ) **বাক্‌ স্বাধীনতার ষষ্ঠ সীমা ঃ** বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নষ্টকারী কোন কিছু সমর্থনীয় নয়। বিদেশী গণ্যমান্যলোকের সম্বন্ধে কদর্য উক্তি করা, যে রাষ্ট্র আমাদের রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুভাবাপন্ন, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্ররোচনা দেওয়া প্রভৃতি আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করা যায়।

www.pathagar.com

পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা

পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা একটি মৌলিক অধিকার। প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার আছে যে কোন পেশা গ্রহণ করার, যে কোনো বৃত্তি গ্রহণ করার, যে কোনো কারবার এবং যে কোন ব্যবসা পরিচালনা করার।

কিন্তু এই পেশা, বৃত্তি, কারবার বা ব্যবসায়কে হতে হবে আইনসঙ্গত এবং যিনি এতে লিপ্ত হবেন তার থাকতে হবে আইন নির্ধারিত (যদি নির্ধারিত হয়ে থাকে) যোগ্যতা। সর্বোপরি এই অধিকার আইনের দ্বারা বাধা নিষেধের অধীন।

এই বিধানে অধিকার নয়, বরং স্বাধীনতা প্রদত্ত হয়েছে নিজের ইচ্ছামত পেশা বা বৃত্তি বেছে নেয়ার। আইনের দ্বারা এই ইচ্ছামূলক পেশা গ্রহণকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়। পেশা সাধারণত ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত। ওকালতি, ডাক্তারি প্রভৃতি পেশার অন্তর্গত।

লাভের জন্য যে আদান প্রদান করা হয়, তাকে পেশার চাইতে বরং ব্যবসায় বলা ভাল। যিনি লেখেন লেখা তাঁর পেশা, যিনি প্রকাশ করেন প্রকাশনা তার ব্যবসায়। পেশাকে আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যায়, প্রভৃতি তার উদাহরণ—

ছাত্রের অধ্যয়নকে বৃত্তি বলা যায় না কিন্তু শিক্ষকের কর্মকে বৃত্তি বলা যায়। লাভ করবার উদ্দেশ্যে কিন্তু লাভ করবার ঝুঁকি নিয়ে যে আদান-প্রদান, ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তা কারবারের অন্তর্ভুক্ত। ব্যবসায় শব্দটি অতি ব্যাপক। জীবন ধারনের জন্য সংসার পরিচালনার জন্য, উন্নতির জন্য মানুষ যে- বৃত্তি অবলম্বন করে আনন্দের জন্য নয়, তাকে ব্যবসায় বলা যায়।

বাধানিষেধের আলোচনা

বাধা নিষেধ তিন প্রকারের হতে পারে ঃ

(ক) পেশা, বৃত্তি, কারবার এবং ব্যবসায়, যেটাই কোনো নাগরিক গ্রহণ বা পরিচালনা করতে চান তা সর্বপ্রথমে আইনসঙ্গত হতে হবে। বালিকা ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসায়, ভেজাল দ্রব্যের কারবার প্রভৃতিকে কিছুতেই আইনসঙ্গত বলা যায় না। ঐ শ্রেণির কারবার পরিচালনার অধিকার কারও নেই।

(খ) বিশেষ পেশা, বৃত্তি, কারবার এবং ব্যবসায় গ্রহণ ও পরিচালনের পূর্বশর্ত হিসেবে বিশেষ যোগ্যতার বিধান আইনের মাধ্যমে করা যেতে পারে। ডাক্তারি পাশ না করে কাউকেও চিকিৎসা কার্য করতে দেওয়া হবে না, এরূপ আইন বৈধ।

(গ) রাষ্ট্র বা সরকার যে কোনো বাধানিষেধ আরোপ করতে পারেন, কিন্তু তা করতে হবে আইনের দ্বারা। সংবিধানে আইন শব্দটি ব্যাপকতম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আইন বলতে বুঝায় সংসদীয় আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ, বিধি-প্রবিধান, উপআইন, বিজ্ঞপ্তি অন্যান্য আইনগত দলিল এবং প্রথা।

www.pathagar.com

ধর্মীয় স্বাধীনতা

ধর্মীয় স্বাধীনতা বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য সংবিধান প্রদত্ত একটি মৌলিক অধিকার। প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার রয়েছে, যে কোনো ধর্ম অবলম্বন করবার, পালন করা এবং প্রচার করবার। প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের অধিকার রয়েছে নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করবার, রক্ষণ করবার এবং ব্যবস্থাপনা করবার। কিন্তু বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে , এই মৌলিক অধিকার স্বনির্ভর বা স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। এরা অধীন আইনের , জনশৃঙ্খলার ও নৈতিকতার। লক্ষ্য করলে স্পষ্টতই দৃষ্ট হবে যে, ধর্মের ব্যাপারে সংবিধান আইন প্রণয়নকারী সংস্থাসমূহকে ব্যাপক ক্ষমতা দিয়েছে।

চলাফেরার স্বাধীনতাকে, সমাবেশের স্বাধীনতাকে, সংগঠনের স্বাধীনতাকে, বাক্-স্বাধীনতাকে এবং গৃহে নিরাপদ থাকার ও চিঠিপত্রের স্বাধীনতাকে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তি সঙ্গত বাধা নিষেধের অধীন করা হয়েছে। এই সমস্ত স্বাধীনতাকে বিশেষ বিশেষ কারণে যুক্তিসঙ্গত বাধা প্রদান করবার ক্ষমতা রাষ্ট্রকে দেওয়া হয়েছে। চলাফেরার স্বাধীনতা, জনস্বার্থে সমাবেশের স্বাধীনতা, জনশৃঙ্খলা বা জনস্বার্থের স্বার্থে সংগঠনের স্বাধীনতা, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে, বাক্-স্বাধীনতা ও গৃহ নিরাপত্তার স্বাধীনতা, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা, শালীনতা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিগত বাধা নিষেধের অধীন। অন্য কোনো স্বার্থে যুক্তিগত বাধা প্রদান অসিদ্ধ। বাধা নিষেধ এই সমস্ত ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত হতে হবে। এই সমস্ত মৌলিক অধিকার খর্ব করতে হলে উপরে বর্ণিত বিশেষ স্বার্থে তা করতে হবে। যদি ঐ বিশেষ স্বার্থ প্রদর্শন না করা যায়, কিংবা যদি বাধা নিষেধ অযৌক্তিক হয়, তবে সেই আইন সংবিধান বহির্ভূত হবে।

পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতাকে এবং সম্পত্তির অধিকারকে আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধের অধীন করা হয়েছে। এই দুটি ক্ষেত্রে বাধা নিষেধ আরোপ করতে কোনো স্বার্থের উল্লেখ অপ্রয়োজনীয়। জনস্বার্থ বা শৃঙ্খলা প্রভৃতি কোনো কারণ আইন প্রণয়নকারী সংস্থাকে প্রদর্শন করতে সংবিধান বাধ্য করে না। দ্বিতীয়ত বাধা নিষেধকে যুক্তিসঙ্গত হতে হবে এমন বিধানও দুই ক্ষেত্রে নেই।

বর্তমান ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নে তাদের অধিকার অধিক বিস্তৃত। ধর্মীয় স্বাধীনতা আইনের অধীন। আইন যেমন নিষেধ করতে পারে, আবার আদেশ করতেও পারে। অন্যান্য ক্ষেত্রে আইনকে ব্যবহার করা যায় শুধু নিষেধ করতে, কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে নিষেধ করবার ক্ষমতা তো আইনে আছে। অন্যবিধ ক্ষমতাও তার থাকবে। ধর্মীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আইন করবার সময় কোনো স্বার্থের উল্লেখ করতে হবে না। বাধানিষেধের বিধান দিতে গিয়ে যুক্তিযুক্তভাবে প্রশ্ন বিচার করতে হবে না, এবং শুধু নিষেধাত্মক বিধানের মধ্যে আইনকে সঙ্কুচিত রাখতে হবে না। এ স্বাধীনতা শুধু বাংলাদেশের নাগরিক অর্থাৎ বাংলাদেশীদের বেলায় প্রযোজ্য বিদেশীর জন্য নয়। যে কোনো ধর্ম গ্রহণ করা ও ধর্মান্তরিত হওয়া এই স্বাধীনতার অন্তর্গত। বাক্যে এবং

www.pathagar.com

ব্যবহারে ধর্মের অনুসারিতা জ্ঞাপন করা ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। যে সমস্ত আচার অনুষ্ঠান ধর্মের অঙ্গ তা বিনা বাধায় পালন করার স্বাধীনতা সকল নাগরিকের আছে। এই অনুষ্ঠান একক বা দলগতভাবে হতে পারে। নামাজ, রোজা, জুমার নামাজ, পূজা, সর্বজনীন পূজা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। ধর্ম অবলম্বন বলতে সেই স্বাধীনতা বুঝায়, যা নাগরিক প্রকাশ্যে বলতে পারেন। ধর্ম পালন বলতে সেই স্বাধীনতা বুঝায় যা তার অন্তরের বিশ্বাসকে বাইরের কাজে ও কথায় প্রকাশ করবার অধিকার দেয়। নাগরিক যা বিশ্বাস করেন, সেই ধর্মীয় বিশ্বাসকে তিনি প্রচার করতে পারেন। প্রচার করার অর্থ জবরদস্তি করা নয়। প্রচারের মধ্যে প্রভাব ও প্ররোচনার ভার জাগ্রত করবার প্রচেষ্টাকে ধর্ম প্রচার বলা যায়।

সংবিধানে ধর্মের সংজ্ঞা নেই। আমার মনে হয়, জনসাধারণ যাকে ধর্ম বলে গ্রহণ করেছেন ধর্মের সাংবিধানিক অর্থ তাই-ই। নিজের ধর্মানুসারে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করার অধিকার প্রত্যেক সম্প্রদায় এবং উপসম্প্রদায়ের আছে। কিন্তু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি বৈষয়িক দিক আছে। সেখানে এই স্বাধীনতা প্রযোজ্য নয়। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যাপারে আইন করবার অধিকার রাষ্ট্রের আছে। এই প্রতিষ্ঠানের হিসাব পরীক্ষা করানো কিংবা হিসাব রাখার ব্যাপারে বিধি প্রণয়ন করা অসিদ্ধ নয়।

ধর্মীয় স্বাধীনতা আইনের অধীন। আইনের সংজ্ঞা সংবিধানে প্রদত্ত হয়েছে এবং তা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আইন করবার পূর্ণ ক্ষমতা সংসদের আছে। তবে একটা বিশেষ বিষয় এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য।

দণ্ডবিধি ফৌজদারি কার্যবিধি প্রভৃতি জনশৃঙ্খলা সম্পর্কে যে সব বিধান প্রদান করেছে, ধর্মের নামে ঐগুলি ভঙ্গ করা যাবে না। শিশু বলিদান ধর্মীয় বিধান হলেও তা বেআইনি। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তায় ধর্মীয় আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ধর্মের নামে সন্ন্যাসির উলঙ্গ ভ্রমণ সমর্থনযোগ্য নয়। মন্দিরে দেবদাসী প্রতিপালন করা নৈতিকতার পরিপন্থি বিধায় নিষিদ্ধ হতে পারে। নৈতিকতার মানদণ্ড বড় অস্থির এবং বিচরণশীল। যুগে যুগে দেশে দেশে এই মানদণ্ড হয়ে চলেছে। পঞ্চাশ বছর পূর্বে অভিজাত মুসলিম মহিলা বিনা বোরখায় বাইরে আগমন করাকে নৈতিকতার ব্যত্যয় মনে করতেন। আধুনিক কালে যুবক যুবতিগণের অবাধ বিহার সমর্থিত না হলেও এ ক্ষেত্রে নৈতিকতার মানদণ্ড ঔদার্যের সাথে মুক্তজীবন যাপনের দিকে ঝুঁকেছে।

সম্পত্তি বিষয়ে অধিকার

সম্পত্তি বিষয়ে সংবিধান নাগরিককে মৌলিক অধিকার দিয়েছে। প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার আছে সম্পত্তি অর্জন করা, ধারণ করা, হস্তান্তর করা এবং অন্যভাবে বিলিব্যবস্থা করার। তবে এই অধিকার আইনের দ্বারা বাধানিষেধের অধীন।

www.pathagar.com

সম্পত্তি অর্জন ও ধারণের অধিকার নিরঙ্কুশ হতে পারে না। সমাজে বাস করতে হলে কোনো অধিকারই বাধাহীনভাবে পাওয়া যায় না। দেশের ও দশের স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্য করে অধিকার ভোগ করেতে হয়। অন্যের পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে, অন্যের ক্ষতি হতে পারে, এমনভাবে সম্পত্তি ধারণ বা ভোগ করা চলে না। আইন দ্বারা নাগরিকের সম্পত্তির উপর বাধানিষেধ আরোপ করা যায়। সংবিধানে এমন কথা নেই যে আইনকে যুক্তিসঙ্গত হতে হবে, সুতরাং সম্পত্তি অধিকার যদি আইন খর্ব করে তবে একথা বলা যাবে না যে, আইন অত্যন্ত কড়া বা নিষ্ঠুর বা অযৌক্তিক বা অন্যায্য। সংবিধানে অন্য অনেক বিধানে যুক্তিসঙ্গত শব্দটির ব্যবহার আছে এই বিধানে নেই। সংবিধানে সম্পত্তির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। সম্পত্তি বলতে অস্থাবর, বস্তুগত ও নিবস্তুগত সকল প্রকার সম্পত্তি। বাণিজ্যিক ও শিল্পগত উদ্যোগ এবং অনুরূপ সম্পত্তি বা উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোন স্বত্ব অন্তর্ভূক্ত।

যেহেতু সম্পত্তির অধিকার আইনের মাধ্যম ছাড়া বাধাপ্রপ্ত হবে না। তাই কোনো নির্বাহী হুকুম দ্বারা এই অধিকারকে খর্ব, হ্রাস বা বিনষ্ট করা যায় না। যখন সম্পত্তির স্বত্বস্বামিত্ব হতে চ্যুত হয়ে অন্যজনে বর্তায়, তখনই দ্বিতীয় জন সম্পত্তি অর্জন করে। ক্রয়, দান, মিরাস প্রভৃতি দ্বারা এবং আদালতে নিলাম, ডিক্রি প্রভৃতির মাধ্যমে সম্পত্তি অর্জিত হয়।

নিজের ইচ্ছামত আইনসঙ্গতভাবে সম্পত্তি ভোগ করা এবং ব্যবহার করাকে সম্পত্তি ধারণ করা বলে। সম্পত্তির উপর কর ধার্য সম্পত্তি ধারণের পরিপন্থি নয়। বিষাক্ত ঔষধ, মদ, আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতি সম্পর্কে বিশেষ নিয়ন্ত্রণমূলক আইন করা যায়। আমদানি ও রপ্তানি বিশেষ আইন দ্বারা নিষিদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করা যায়। ইমারত প্রভৃতি নির্মাণ করবার ব্যাপারে বিধি প্রণয়ন করে পৌরসভা বা টাউন প্লানিং সংস্থাসমূহ শহরের জনস্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য রক্ষার জন্য নাগরিকদের জমি ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। কর সম্পর্কীয় আইন প্রণয়ন করে ভাড়াটিয়াদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বাড়ির মালিকের অধিকার বাধা নিষেধের আওতায় আনা যায়। একশত বা পঞ্চাশ বিঘার বেশি জমি কেউ রাখতে পারবে না। বর্গাদারকে কেউ উৎখাত করতে পারবে না প্রভৃতি আইন সংবিধানসিদ্ধ।

আইনের মাধ্যম ব্যতীত অর্থাৎ আইন জারি করে কোনো সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ত বা দখল করা যাবে না। রাষ্ট্র যখন কোনো সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করতে চাইবেন বা রাষ্ট্রায়ত্ত করতে চাইবেন বা দখল করতে চাইবেন তখন তৎপূর্বে রাষ্ট্রকে আইন প্রণয়ন করে নিতে হবে।

দ্বিতীয়ত যে স্থানে নির্বাহী বিভাগকে সম্পত্তি গ্রহণ করবার অধিকার প্রদত্ত হয়েছে, সে স্থলে, সে কার্যবিধির বিধান করা হয়েছে, তা নির্বাহী বিভাগ অনুসরণ না করলে গ্রহণ অবৈধ হবে। আইনের কর্তৃত্বে সম্পত্তি সরকার কর্তৃক গৃহীত হলে তার বিরুদ্ধ কোনো অভিযোগ চলে না।

www.pathagar.com

রাষ্ট্র নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন এবং হস্তান্তর প্রভৃতির জন্য কিংবা সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ত এবং দখল করবার জন্য আইন প্রণয়ন করে তবে সেই আইনে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এবং তার নির্ধারনের ব্যবস্থা থাকতেই হবে, কিংবা ক্ষতিপূরণ নির্ণয়ের নীতি ও পদ্ধতি থাকতে হবে।

নবর্তনমূলক আটক

বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকারের অধ্যায়ে নিবর্তনমূলক আটকের আইন বিধৃত। উপমহাদেশের সংবিধানের ইতিহাসে এই ব্যবস্থা নতুন নয়। ১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্রে, বর্তমান ভারতীয় সংবিধানে, ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালের পাকিস্তানের সংবিধানে অনুরূপ ব্যবস্থা বর্তমান ছিলো। নিবর্তনমূলক আটক রাষ্ট্রীয় জীবনে স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যবহার করা হয় না। অন্তত করবার কথা নয়। যারা অপরাধ করেছেন তারা তজ্জন্য শাস্তি পাবেন। এটাই আইনের বিধান। যারা অপরাধ এখনও করে উঠতে পারেন নি কিন্তু পূর্ণভাবে প্রয়াস গ্রহণ করেছেন তাদের বিরূদ্ধেই নিবর্তনমূলক আটকের হাতিয়ার ব্যবহার করার কথা। এই হাতিয়ার ব্যবহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে, সরকারের মতে, অপরাধজনক এবং দুষ্কৃতিমূলক এবং ধ্বংসাত্মক দুষ্কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে দেশকে সম্পূর্ণভাবে সর্বনাশের মধ্যে ঠেলে দেবার পূর্বেই তার বেগকে প্রশমিত করা।

নিবর্তনমূলক আটকের বিধান যে, আইন করা হয় তাকে প্রতিকারমূলক আইন বলে। বস্তুত এ ব্যবস্থা প্রতিকারের জন্য গৃহীত হওয়া উচিত। প্রতিশোধ বা শাস্তির জন্য নয়। অপরাধ তাকে বলে, যা আইনে নিষিদ্ধ। চোরাকারবারি, স্মাগলিং, হাইজ্যাক, ছিনতাই, দেশোদ্রোহিতা, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার প্রভৃতি নিঃসন্দেহে অপরাধজনক কার্য। সরকার যখন মনে করেন যে, কোনো ব্যক্তি বা কোনো দল যখন তাদের মতে অপরাধজনক কাজের পথে অগ্রসর হয়েছে এবং সেই অপরাধকে প্রতিহত না করলে দেশের উপর অনিবার্য দুর্দিন নেমে আসবে তখন প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা হিসাবে সরকার ঐ সমস্ত ব্যক্তি বা দলের সভ্যকে আটক রাখতে পারেন। সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ, যে কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে আইনসঙ্গত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে বা বেআইনি উপায়ে কোনো ব্যক্তিকে পুনরায় আটক রাখা হয়নি বলে, যাতে উক্ত বিভাগের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হতে পারে, সে জন্য প্রহরায় আটক ব্যক্তিকে হাইকোর্ট বিভাগের সম্মুখে আনয়নের নির্দেশ প্রদান করতে পারেন। অর্থাৎ আটককৃত ব্যক্তিকে আইনসঙ্গতভাবে আটক করা হয়েছে কিনা, এটা হাইকোর্ট বিভাগ পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। হাইকোর্ট বিভাগ দেখতে পারেন, আটককৃত ব্যক্তিকে আটকাদেশ দানের কারণ জ্ঞাপন করা হয়েছে কিনা? যথাশীঘ্র করা হয়েছে কিনা? উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রকাশের জন্য সুযোগ দেওয়া হয়েছে কিনা? যথাসত্বর সম্ভব উক্ত সুযোগ দেওয়া হয়েছে কিনা? অথবা তথ্যাদি প্রকাশে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়েছে কিনা? তবে গ্রেফতারকারী বা আটককারী

www.pathagar.com

কর্তৃপক্ষ আটককৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে আটকের প্রয়োজনীয়তা বা ন্যায়ানুগতা সম্বন্ধে যে অভিমতে পৌঁছেছেন, তা হাইকোর্ট বিভাগের বিচার্য নয়, উক্ত অভিমতের ন্যায্যতা বা পর্যাপ্ততা সম্বন্ধে হাইকোর্ট বিভাগ এখতিয়ারহীন।

বাংলাদেশের সংবিধান সরকারকে নিবর্তনমূলক গ্রেফতার এবং প্রহরায় সাময়িকভাবে আটক করবার আইন প্রণয়নের অধিকার দিয়েছে। সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থি বলে নিবর্তনমূলক আটক প্রভৃতি আইন যাতে বাতিল বলে গণ্য না হতে পারে সেজন্য এই ব্যবস্থা সংবিধানে রাখা হয়েছে। এই ব্যবস্থা সংবিধানে থাকার ফলে নিবর্তনমূলক আটক আইন আর সংবিধান বহির্ভূত গণ্য হবে না। তবে এই প্রকার আইন করবার সময়ে এই আইনে, যে সমস্ত রক্ষাককবচ রাখার নির্দেশ এই বিধানে দিয়েছে তা অবশ্যই প্রতিপালন করতে হবে। অন্যথায় আইন কার্যকরী হবে না।

এই বিধানে উপদেষ্টা পর্ষদ গঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উপদেষ্টা পর্ষদের উপর সংবিধান মাত্র একটি দায়িত্ব অর্পণ করেছে। সেই দায়িত্ব হচ্ছে, সমস্ত অবস্থা বিবেচনা ও পর্যবেক্ষণ. করে পর্ষদ সরকারের নিকট এই উপদেশ দিবেন যে, তাদের মতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আটক রাখা চলতে পারে কিনা। তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ছয়মাসের উর্ধ্বকাল আটক রাখবেন বা মুক্তি দিবেন। পর্ষদের রিপোর্ট উপদেশমূলক।

নিবর্তনমূলক আটক আইনে সরকার ইচ্ছা করলে প্রয়োজনবোধে কোন ব্যক্তিকে ৬ মাস আটক রাখতে পারেন। তবে এই সময়ের মধ্যেও সরকারকে কিছু কিছু কর্তব্য পালন করতে হবে। যে-আইন ৬ মাসের অধিককাল আটক রাখার ব্যবস্থা করবে, সেই আইনে একটি উপদেষ্টা পর্ষদ গঠনের বিধান থাকবে। সেই উপদেষ্টা পর্ষদ গঠিত হবে তিনজন ব্যক্তি নিয়ে। এ তিনজনের মধ্যে দুজন হবেন এমন ব্যক্তি যারা সুপ্রীম কোর্টের বিচারক রয়েছেন বা ছিলেন বা উক্ত পদে নিয়োগ লাভের যোগ্যতা রাখেন। বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক সুপ্রীম কোর্টে দশ বৎসর এ্যাডভোকেট থাকলে কিংবা বাংলাদেশে দশ বছর বিচার বিভাগীয় পদে বিচারকের ক্ষমতা নির্বাহ করে থাকলে, তিনি সুপ্রীমকোর্টের বিচারকপদ লাভের যোগ্য হবেন। পর্ষদের তৃতীয় ব্যক্তি হবেন প্রবীণ সরকারি কর্মচারী। প্রবীণতার কোন সংজ্ঞা বিধানে নেই। তবে উপ-সচিব বা তার সম মর্যাদা সম্পন্ন কর্মচারী থেকে উর্ধ্বতন কর্মচারীগণকে প্রবীন বলে ধরা হয়। এই পর্ষদ আটক ব্যক্তিকে বক্তব্য পেশ করবার সুযোগ দিবেন এবং তারপর তারা সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করবেন।

সার সংক্ষেপ

কিছু কিছু অধিকার আছে, যেগুলি একান্তই মৌলিক। মৌলিক বলতে মূলের সাথে সংযুক্ত বুঝায়। মনুষ্যত্বই মানবের মূল। মূল ধরে নাড়া দিলেই মহীরূহ ভূলুণ্ঠিত হয়। যে সব বিশিষ্টতা

www.pathagar.com

নিয়ে মানব জাতি মনুষ্যত্বের দাবি করতে পারে, সেই বৈশিষ্ট্যগুলি মানুষের মূল। এগুলোকে খর্ব বা ধ্বংস করার অর্থ মানবের মনুষ্যত্বকে খর্ব বা ধ্বংস করা। জীবনের অধিকার, ভাব প্রকাশের অধিকার, চলাফেরার অধিকার প্রভৃতি এই অধিকারের পর্যায়ে পড়ে। অধিকারগুলি তাই মৌলিক।

. মৌলিক ছাড়াও অন্য অধিকার মানুষের থাকতে পারে। দবির টাকা নিয়েছে সাবেতের কাছ থেকে। দবিরের অধিকার আছে সাবেতের কাছ থেকে টাকা ফেরত পাবার। এই অধিকার মৌলিক নয়, দ্বিপাক্ষিক।

মৌলিক অধিকারগুলির কিছু কিছু আজ পর্যন্ত লিখিত হয়নি। সেগুলি এতই স্বাভাবিক যে মনুষ্যত্ব থেকে সেগুলি বিচ্ছিন্ন করা যায় না। মৌলিক অধিকার না বলে এগুলোকে স্বভাবজ অধিকার বলা যায়।

মৌলিক অধিকার বিধৃত থাকে সংবিধানে। বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকারের বর্ণনা আছে। সংবিধানে বর্ণিত এইসব মৌলিক অধিকারের পরিপন্থি সকল আইন ও কর্মধারা বাতিল বলে গণ্য হয়।

আবার কিছু কিছু মৌলিক অধিকার দেশের সাধারণ আইনে বিধৃত থাকে। ইংল্যাণ্ডে কোনো লিখিত সংবিধান নেই; সেখানে সাধারণ আইনের মধ্যেই মৌলিক অধিকারের বিধান পাওয়া যায়। আমাদের দেশের ফৌজদারি কার্যবিধিতে হেবিয়াস কর্পাসের বিধান আছে।

মৌলিক অধিকার, তা সে যেখানেই থাকুক না কেন, তখনই মূল্য বহন করে যখন তা লঙ্ঘনের প্রতিকারের ব্যবস্থা পর্যাপ্ত এবং অটুট থাকে। আদালতের মাধ্যমে অধিকার ভঙ্গের প্রতিকার পাওয়া গেলেই তবে মৌলিক অধিকার সার্থকতা পায়।

কথায় বলে, কাজির গরু কেতাবে আছে, গোয়ালে নেই। আইনের মধ্যে ভাল ভাল কথা আছে। আছে আদর্শের চাকচিক্য; কিন্তু বাস্তবে তার কোন প্রয়োগ নেই; এই অবস্থা সত্যিই শোচনীয়।

এই অনুচ্ছেদ ঘোষণা দিয়েছে মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের প্রতিকার পাওয়ার অধিকার সকলের আছে।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

কাউকে খেয়াল খুশিমত গ্রেফতার, আটক অথবা নির্বাসন করা যাবে না।
(Article : 9. No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.)

ভাষ্য

আলোচ্য অনুচ্ছেদ মানুষকে তিনটি বিশেষ অবস্থা থেকে নিরাপত্তা প্রদান করেছে। তিনটি অবস্থা হচ্ছে ঃ

১. গ্রেফতার

২. আটক

৩. নির্বাসন।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদ অনুসারে কোন ব্যক্তিকে বিধিবহির্ভূতভাবে গ্রেফতার আটক ও নির্বাসন করা যাবে না। কথাটি একটু ঘুরিয়ে বললে এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, যে কোন ব্যক্তিকে বিধিবদ্ধ আইন অনুসারে গ্রেফতার, আটক ও নির্বাসন করা যাবে।

এই অনুচ্ছেদ যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে আমাদেরকে প্রথমেই গ্রেফতার, আটক ও নির্বাসন শব্দত্রয় বিশ্লেষণ করতে হবে। এই শব্দ তিনটি যথাযথভাবে বুঝতে পারলেই আমাদের পক্ষে আলোচ্য অনুচ্ছেদের আবেদন উপলব্ধি করা সহজ হবে।

গ্রেফতার (Arrest)

গ্রেফতার শব্দের অর্থ ধরা বা পাকড়াও। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে একজন আরেকজনকে ধরলে বা পাকড়াও করলেও কি গ্রেফতার করা হবে? স্কুল পালানো ছেলে ধরে আনা হলো, দুষ্ট ছেলে পাড়া মাতিয়ে বেড়াচ্ছিল, বাবা তাকে ধরে আনলেন, শিশুটি লাফালাফি করছিল, পড়ে হাত-পা ভাঙতে পারে বলে মা পাকড়াও করলেন। এসব কি গ্রেফতার করা বুঝায়? নিশ্চয়ই না, অথচ সবই ধরার বা পাকড়াও করার বিষয়। তাহলে গ্রেফতার কি—এ প্রশ্ন থেকেই যায়।

www.pathagar.com

গ্রেফতার বলতে সাধারণত আইন বলে আটক করা বুঝায়। শুধুমাত্র, আইন বলে আটক'কে যদি গ্রেফতার বলা হয়, তাহলে এটা স্বাভাবিকভাবেই বিধিবদ্ধ আইন অনুসারে হয়ে থাকে। অতএব তা থেকে রক্ষণ লাভের প্রশ্ন আসে কেন? এই প্রশ্নও দেখা দিতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে গ্রেফতার বুঝানোর জন্য ইংরেজী arrest এবং বাংলা গ্রেফতার শব্দই উপযুক্ত। গ্রেফতার শব্দটি আরবি থেকে বাংলায় এসেছে। গ্রেফতার কথাটির কোন সর্বজনীন সংজ্ঞা নেই। বিভিন্ন দেশের আইনে বিভিন্নভাবে এর পদ্ধতি, নিয়ম-কানুন ও সীমা নির্দেশ করা হয়েছে। বাংলাদেশে ফৌজদারি কার্যবিধির পঞ্চম অধ্যায়ে ৪৬ ধারা পর্যন্ত গ্রেফতার সম্পর্কে পদ্ধতি বা নিয়মকানুন বর্ণনা করা হয়েছে। পুলিশ অফিসার ওয়ারেন্ট বলে অথবা অনেক ক্ষেত্রে ওয়ারেন্ট ছাড়াই কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে পারেন। সাধারণ মানুষও কোন অপরাধীকে বিশেষ ক্ষেত্রে গ্রেফতার করতে পারেন। ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে কোন অপরাধ সংগঠিত হলে তিনি নিজেই গ্রেফতার করতে পারেন অথবা গ্রেফতার করবার নির্দেশ দিতে পারেন।

আটক (detention)

আটক শব্দের অর্থ হচ্ছে অবরুদ্ধ, আবদ্ধ, অমুক্ত ইত্যাদি। ইংরেজি detention শব্দের অর্থ আটকিয়ে রাখা, বিলম্ব করানো। এই উপমহাদেশে detention বলতে বুঝায় রাজনৈতিক কারণে বিনা বিচারে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্দিত্ব, আটক তথা নিবর্তনমূলক আটক।

উপমহাদেশের শাসনতন্ত্রের ইতিহাসে এই ব্যবস্থা নতুন নয়। ১৯৩৫ সালের সংবিধানে, বর্তমান ভারতীয় সংবিধানে, ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালের পাকিস্তানের সংবিধানে detention এর বিধান রয়েছে।

নিবর্তনমূলক আটক রাষ্ট্রীয় জীবনের স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যবহার করা হয় না। অন্তত হওয়ার কথা নয়। যারা অপরাধ করেছেন, তাঁরা অপরাধ করার জন্য শাস্তি পাবেন। এটা আইনের বিধান। কিন্তু যারা অপরাধ করেন নি, কিন্তু অপরাধ সংগঠনের পূর্ণ প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছেন তাদের দমনের জন্য নিবর্তনমূলক আইনকে হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করা হয়। সরকারের মতে, এই হাতিয়ার ব্যবহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে অপরাধজনক, দুষ্কৃতিমূলক ও ধ্বংসাত্মক কাজের মাধ্যমে দেশকে চরম সর্বনাশের মুখে ঠেলে দেয়ার পূর্বেই তাকে কঠিন হস্তে দমন করা।

নিবর্তনমূলক আটকের বিধান যে আইনে করা হয় তাকে প্রতিরোধমূলক আইন বলে। বস্তুত এই ব্যবস্থা প্রতিরোধের জন্য গৃহীত হয়, প্রতিশোধ বা শাস্তির জন্য নয়।

আইনে যা নিষিদ্ধ তাই অপরাধ। চোরাকারবার, ছিনতাই, দেশদ্রোহিতা, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো অপরাধ। সরকার যদি মনে করেন কোন ব্যক্তি এইসব অপরাধমূলক কাজের পথে অগ্রসর হচ্ছে তাহলে দেশকে অনিবার্য দুর্দিনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য প্রতিরোধমূলক

www.pathagar.com

ব্যবস্থা হিসেবে ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিবর্তনমূলক আটক আদেশ দিয়ে তাকে আটক রাখতে পারেন।

নির্বাসন (exile)

নির্বাসন বলতে সাধারণত স্বদেশভূমি থেকে বহিষ্কার বা কোন শাস্তিযোগ্য স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া বুঝায়। শাস্তির বিধান হিসেবে এটা খুবই প্রাচীন। প্রাচীনকালে অপরাধীকে নির্বাসন দেওয়ার প্রথা অনেক দেশেই প্রচলিত ছিল। বৃটিশরা অপরাধীদেরকে আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় তাদের উপনিবেশগুলোতে প্রেরণ করত। ফ্রান্সও তার উপনিবেশগুলোতে অপরাধীদের নির্বাসন দিয়েছে। সাধারণত পলায়নপর অপরাধী, রাজনৈতিক অপরাধী এবং সংশোধনের অযোগ্য অপরাধীদের নির্বাসনে দেওয়া হতো। ভারতবর্ষে এই প্রথাটি দ্বীপান্তর এবং কালাপানিতে নিক্ষেপন নামে পরিচিত ছিল। এই ধরনের শাস্তির উদ্দেশ্য ছিল অপরাধীদের মৃত্যু না ঘটিয়ে তাদেরকে সমাজ থেকে চিরতরে বহিষ্কার করা।

এই প্রথা আজ প্রায় অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে। তবে ভিন্নভাবে এখন প্রথাটি দেখা যায়। বিশ্বব্যাপী বর্তমানে যে উদ্বাস্তু সমস্যা, তা নির্বাসনের নতুন সংস্করণ মাত্র। কেননা চরম নির্যাতন ও নিপীড়নের কারণে মানুষ যখন স্বদেশ বসবাস করতে পারে না তখনই দেশ ত্যগ করে উদ্বাস্তু হয়। নির্বাসন হচ্ছে জোর করে বের করে দেওয়া আর উদ্বাস্তু হচ্ছে বের হতে বাধ্য করা।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদ বলছে, কোন ব্যক্তিকেই বিধিবহির্ভূত ভাবে নির্বাসনে পাঠানো যাবে না। একটি অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে এই অনুচ্ছেদ বিদ্রোহ করছে এবং মানবাধিকার রক্ষার জন্য নির্বাসন প্রথা প্রতিরোধের আহ্বান জানাচ্ছে। নির্বাসনে না যাওয়া মানুষের অধিকার।

খেয়াল খুশিমত গ্রেফতার, আটক ও নির্বাসন

গ্রেফতার, আটক ও নির্বাসন যদি বিধিবদ্ধ আইন অনুসারে হয় তাহলে এ বিষয়ে কোন আপত্তি কারো থাকে না, থাকা সঙ্গত নয় কিন্তু যখনই খেয়াল খুশিমত কাউকে গ্রেফতার করা হয়, আটক অথবা নির্বাসন করা হয়, তখনই তা হয় মানবাধিকারের পরিপন্থি।

প্রতিটি মানুষেরই স্বেচ্ছাচারমূলকভাবে গ্রেফতার আটক অথবা নির্বাসন থেকে আত্মরক্ষার অধিকার রয়েছে। কিন্তু বিশ্বের দেশে দেশে আজ এই অধিকার থেকে মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে, বিপন্ন হচ্ছে মানুষের নিরাপত্তা। বিশেষ করে আফ্রিকা, এশিয়া, লাতিন আমেরিকার দেশসমূহে মানুষের এই নিরাপত্তা ব্যাপকহারে লঙ্ঘিত হচ্ছে। যে সব দেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিদ্যমান, সেসব দেশেই ভিন্ন মতাবলম্বী, রাজনৈতিক নেতা কর্মীদেরকে ক্ষমতাসীন সরকার কর্তৃক স্বেচ্ছাচারমূলকভাবে গ্রেফতার, আটক এবং নির্বাসনের ঘটনা ঘটে।

www.pathagar.com

এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বেশির ভাগ দেশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দীর্ঘকাল সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের অধীন ছিল। বেশির ভাগ দেশই অর্থনৈতিক কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক দিক থেকে অনুন্নত ও পশ্চাদপদ। সামরিক শাসন, সামরিক অসামরিক স্বৈরাচার, অগণতান্ত্রিক সরকার, পুতুল সরকার, তদুপরি অর্থনৈতিক বৈষম্য, শোষণ ও তীব্র বেকার সমস্যা এই সব দেশের রাজনৈতিক অবস্থাকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে। যার ফলে রাজনৈতিক মতবিরোধ, দ্বন্দ্ব, উত্তেজনা লেগেই থাকে। সংগত কারণেই পারস্পরিক সহনশীলতা, সহমর্মিতা এবং অন্যের মতামতকে শ্রদ্ধা জানানোর মত পরিবেশ এসব দেশে খুবই কম। তাই রাজনৈতিক হানাহানি দ্বন্দ্ব সংঘাত, দলননীতি, দমন পীড়ন এসব বিষয় তৃতীয় দুনিয়ার মানুষের ললাট লিখনে পরিণত হয়েছে।

এশিয়া মহাদেশের দিকে তাকালে দেখা যাবে, এখানে খুব সামান্যই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিরাজমান। ভারত, মায়ানমার, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ফিলিপাইন, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, আফগানিস্তান, সৌদি আরব, কুয়েত, ইরাক, চিন প্রভৃতি দেশে রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বীদের রাজনৈতিক কারণে গ্রেফতার, বিনাবিচারে আটক, নির্বাসন ইত্যাদি ঘটনা অহরহই ঘটছে। ভারতের কাশ্মির, পাঞ্জাব, আসামে বিনাবিচারে আটক, পুলিশী নির্যাতন ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সঙ্ঘও সোচ্চার। সম্প্রতি কাশ্মিরে সেনাবাহিনী কর্তৃক পুলিশ নির্যাতনের অভিযোগ পর্যন্ত উঠেছে। পাকিস্তানে রাজনৈতিক ভিন্নমতের কারণে বিনাবিচারে আটকের ঘটনাও অসংখ্য। মায়ানমার–এর সামরিক সরকার সে দেশের শান কারেন ও আরাকানিদের পাকড়াও, আটক, নির্যাতন করে। অবশেষে আরাকানিদের দেশত্যাগেও বাধ্য করেছে। বাংলাদেশের মায়ানমার সীমান্তের বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবিরে বর্তমানে লক্ষাধিক মায়ানমারী আশ্রয় গ্রহণ করেছে। শ্রীলঙ্কায় তামিল বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ও সশস্ত্র সংগ্রামের কারণে সে দেশে তামিল সিংহলি জাতিগত সংঘাত লেগেই আছে। প্রায়শই সেখানে নাগরিকদের রাজনৈতিক অপরাধের সন্দেহে বিনা বিচারে আটক করে রাখা হয়। ফিলিপাইনে সাবেক শাসকের বিধবা পত্নী ইমেলদা মার্কোসের সমর্থক, কমিউনিস্ট এবং মরো ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের সদস্যদের রাজনৈতিক হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। সৌদি আরবে রাজনৈতিক তৎপরতারই সুযোগ নেই। সম্প্রতি সেখানে মানবাধিকার আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে ৪০০ নাগরিককে আটক করা হয়েছে। গত দুই দশক থেকে আফগানিস্তানে ক্ষমতা দখলের লড়াই চলছে। এরই মধ্যে কাবুলের মসনদের দৃশ্যপট পরিবর্তন হয়েছে অনেকবার। যখনই যে ক্ষমতায় এসেছে তখনই সে তার প্রতিপক্ষের রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেফতার, আটক করেছে। অনেকে দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়েছে, হয়েছে উদ্বাস্তু। মরো মুসলিম মৌলবাদি সংগঠন 'ইসলামি ব্রাদারহুডে'র সদস্যরা গ্রেফতার হচ্ছে । কারাগারে বিনা বিচারে আটক আছে অসংখ্য। বিচারের নামে প্রহসনেরও সম্মুখীন হচ্ছে তারা। চিনে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করতে গিয়ে তিয়েনআনমেন স্কোয়ারে সমবেত ছাত্রদের বিনাবিচারে

www.pathagar.com

আটক রাখা হয়েছে; স্বেচ্ছাচারমূলকভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের উপর প্রচণ্ড পুলিশী নির্যাতন চালানো হয়েছে। ইরাক ও সিরিয়ায় চলছে একদলীয় শাসন। শাসকগোষ্ঠী সেখানে কঠোর হস্তে দমন করে রেখেছে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে, তাই গ্রেফতার ও আটক সেখানকার নৈমিত্তিক ঘটনা। লাউস, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়ায়ও গ্রেফতার আটক নির্বাসনের ঘটনা কম ঘটেনি। রাজনৈতিক দলননীতির আতঙ্কে হাজার হাজার ভিয়েতনামির দেশ ত্যাগের ঘটনা আজো মানব হৃদয়কে নাড়া দেয়।

আফ্রিকা মহাদেশের অবস্থা আরো শোচনীয়। আলজেরিয়া, লিবিয়া, শাদ, ইথিওপিয়া, সোমালিয়া, মোজাম্বিক, নামিবিয়া, কেনিয়া, উগান্ডা, লাইবেরিয়া, তিউনিসিয়া, ঘানা, ক্যামেরুন, সেনেগাল, মরক্কো, আইভরিকোস্ট, জাম্বিয়া, বতসয়ানা, এঙ্গোলা, সুদান প্রভৃতি দেশে সত্যিকার অর্থে গণতন্ত্র ও আইনের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে আফ্রিকায় মাত্র ৩টি দেশ স্বাধীন ছিল। এরপর জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রভাবে আফ্রিকার দেশে দেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সূর্য উদিত হয় কিন্তু অধিকাংশ দেশই নামে স্বাধীন, প্রকৃতপক্ষে উপনিবেশবাদের হাতের পুতুলরূপে থেকে যায়। এরপর শুরু হয় গোত্রীয় স্বার্থ ও উপজাতীয় দ্বন্দ্ব এবং সাম্প্রদায়িক হানাহানি, যা থেকে আজো তারা রেহাই পায় নি। গোড়া থেকেই নয়া উপনিবেশবাদী চক্রান্ত আফ্রিকাকে রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেই রেখেছে। বিভিন্ন দেশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে, গোত্রীয় ও বর্ণদাঙ্গা উস্কে দিয়ে এবং রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের সৃষ্টি করে নয়া উপনিবেশবাদ আফ্রিকায় তার শোষণ ও আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা করছে। আফ্রিকার উপনিবেশিক শাসন সম্পর্কে কেনিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের শীর্ষ নেতা জোমো কেনিয়াত্তার একটি বিখ্যাত উক্তি হচ্ছে 'মিশনারিরা যখন এদেশে আসে তখন আফ্রিকানরা দেশের মালিক, মিশনারিরা বাইবেলের । তারা আমাদেরকে চক্ষু মুদে প্রার্থনা করতে শিখালো। যখন আমরা চোখ খুললাম দেশ তাদের হাতে, আমাদের হাতে শুধুই বাইবেল।' এর পর যদিও স্বাধীনতা সংগ্রামের ঢেউ আফ্রিকার দেশগুলোতে আঘাত করেছিল তথাপি স্বাধীনতার স্বাদ তারা সঠিকভাবে উপভোগ করতে পারে নি।

বর্ণবাদি শাসনের বিরুদ্ধে নামিবিয় জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা ও সমস্যার কথা তুলে ধরার জন্য জাতীয় মুক্তি আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকার গণসংস্থা সোয়াপো। নামিবিয়ার উইন্ডহোকে সংগঠনের রাজনৈতিক শাখার যে কার্যালয়টি ছিল, ক্রমাগত হয়রানি ও নিপীড়নের মুখে ১৯৭৯ সালে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯১২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার সকল বর্ণের মানুষের জন্য এক বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি নিয়ে গঠিত হয় আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস (এ এন সি)। ১৯৫২ সালে শ্বেতাঙ্গ সরকারের পৃথকীকরণ নীতির বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলনে এ এন সি'র প্রায় ৮ হাজার স্বেচ্ছাসেবক গ্রেফতার হয়। এই দু'টি সংঠেনের নেতা কর্মীরা রাজনৈতিক কারণে গ্রেফতার এবং বিনা বিচারে আটক থেকেছেন অনেক দিন।

www.pathagar.com

এ এন সি'র নেতা নেলসন ম্যাণ্ডেলা তার জীবনের দীর্ঘ ৩০ বছর কাটিয়েছেন জেলে। এ এন সি এবং সোয়াপো নেতৃবৃন্দের উপর জেল জুলুমের কাহিনী এখন কিংবদন্তির মত। পর্তুগালের উপনিবেশ এঙ্গোলায় গ্রেফতার ও আটকের শিকার হয় পপুলার মুভমেন্ট ফর দ্য লিবারেশন অব এঙ্গোলা; ন্যাশনাল ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অব এঙ্গোলা এবং ন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দ্য টোটাল ইণ্ডিপেনডেন্স অব এঙ্গোলা প্রভৃতি সংগঠনের সদস্যরা। শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে আফ্রিকার মানুষ যে সমঝোতার মধ্যে বসবাস করে আসছিল উপনিবেশিক শাসকদের ভাগ কর ও শাসন করো নীতি তাদের মধ্যে হানাহানির সূত্রপাত ঘটায়। ভাগাভাগির পদ্ধতিটা ছিল এতই ব্যাপক ও গভীর যে, এর ফলে এই কালো মানুষেরা, কালো মানুষকেই তাদের শত্রু মনে করেছে। তারা এখন পরস্পরের বিরুদ্ধে লিপ্ত। এর জন্যই আফ্রিকার রাজনীতির গগনে কালো মেঘ। এর জন্য প্রায় প্রতিটি দেশে ক্ষমতাসীন দল সরকারি ক্ষমতার আনুকূল্যে তার প্রতিপক্ষকে খেয়ালখুশি মতো গ্রেফতার ও আটক করেছে। অনেকেই দেশত্যাগে বাধ্য হচ্ছে। বিশ্বের মোট শরণার্থীর প্রায় অর্ধেক আফ্রিকা মহাদেশে। অধিকাংশই রাজনৈতিক নিপীড়নের কারণে দেশ ত্যাগে বাধ্য হচ্ছে। বস্তুত মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন হচ্ছে অন্যান্য অঞ্চলের মত আফ্রিকা মহাদেশেও ।

লাতিন আমেরিকার অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, তা গত তিন দশক ধরে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে এই অঞ্চল ঔপনিবেশিক ও আধা ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। বর্তমানে ঐ অঞ্চলে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদ এবং নয়া উপনিবেশিক কৌশল ও চক্রান্তের বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে। লাতিন আমেরিকার রাজনৈতিক সমস্যার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদপুষ্ট একনায়কতান্ত্রিক শাসন, জাতীয় ঐক্যসাধন, সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবহীন গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা, সাম্রাজ্যবাদ হস্তক্ষেপ ও দখলদারি প্রতিরোধ ইত্যাদি প্রধান। ১৯৫৪ সালে গুয়াতেমালার সংবিধান সম্মত সরকার উচ্ছেদ, ১৯৫৯ সালে কিউবায় বৈপ্লবিক সরকার উচ্ছেদের চক্রান্ত, ১৯৬৫ সালে ডমিনিকান প্রজাতন্ত্রে মার্কিন নৌবাহিনীর হস্তক্ষেপ, ১৯৭৩ সালে চিলিতে আলেন্দে সরকারের পতন, এসব লাতিন আমেরিকার রাজনীতিতে নয়া উপনিবেশিক হস্তক্ষেপের প্রমান। নিকারাগুয়ার কন্ট্রাদের সামরিক প্রশিক্ষণ ও সাহায্যদান, কিউবার প্রতিবিপ্লবীদের আশ্রয় ও সাহায্য দান ইত্যাদির মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেখানকার রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েছে। তারপরও সেখানকার জনগণ তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে দু'দশক পরে বলিভিয়ায় সামরিক শাসনের অবসান হয়, ১৯৮৩ সালে অবসান হয় আর্জেন্টিনার ৭ বছরের সেনা রাজত্ব, ১৯৮৫ সালে ব্রাজিলের ২০ বছরের সামরিক শাসনের পর্ব সমাপ্ত হয়। হাইতিতে দুভ্যালিয়ের-এর স্বৈরাচারী একনায়কতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটে। ১৯৮৬ সালে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে সামরিক শাসনাধীন উরুগুয়ের কমপক্ষে ৪ লাখ লোক দেশ ত্যাগ করে।

www.pathagar.com

বিশ্ব রাজনীতি বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং গণবিচ্ছিন্ন সরকার ও হানাহানির যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পরিবেশিত হল তা থেকে একটা বিষয় সুস্পষ্ট যে, অধিকাংশ দেশেই রাজনেতিক কারণে মানুষকে গ্রেফতার করা হয়, আটক করা হয়, নির্বাসন করা হয় অথবা অত্যধিক নিপীড়নের কারণে অনেকে দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়। স্বাভাবিক নিয়মে দেশের প্রচলিত আইনের অধীনে যে কেহ গ্রেফতার হতে পারে, আটক থাকতে পারে। প্রতিটি দেশের আইনে গ্রেফতার ও আটক সম্পর্কে বিধান রয়েছে। বিধিবদ্ধ আইন মোতাবেক গ্রেফতার ও আটক মানবাধিকার ঘোষণার পরিপন্থি নয়। কিন্তু যখনই তা হবে কারো খেয়ালখুশির কারণে তখনই সেটা হবে মানবাধিকারের ঘোষণার খেলাপ।

সাধারণত রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই এই স্বেচ্ছাচারী ঘটনা ঘটে। বিশেষত, সামরিক, স্বৈরাচারী সরকার, ক্ষমতাসীন দল তাদের রাজনৈতিক শত্রু বা প্রতিপক্ষকে খেয়াল খুশিমত গ্রেফতার করে জেলে পুরে রাখে। এতে নিরপরাধ মানুষও অন্যায় শাস্তিভোগ করে। অপরাধের জন্য শাস্তি হতে পারে, কিন্তু অপরাধ না করেও শুধু রাজনৈতিক কারণে প্রতিপক্ষকে শাস্তি দেওয়া মানবাধিকারের পরিপন্থি। মানুষকে এই অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যই আলোচ্য অনুচ্ছেদে কাউকে খেয়াল খুশিমত গ্রেফতার, আটক অথবা নির্বাসন করতে নিষেধ করা হয়েছে।

আলোচ্য অনুচ্ছেদ ও ইসলাম

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেক মানুষই জন্মগতভাবে স্বাধীন এবং এই স্বাধীনতা আল্লাহ কর্তৃক দেয় নিশ্চয়তা। যেখানে কোন রকম জোর জবরদস্তি ইসলামি রাষ্ট্রে সম্ভব নয়। ইসলামে এরকম নীতি অবলম্বন করা হয় যে, কোন উপযুক্ত আদালতে আইনানুযায়ী দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে কারাদণ্ড দেওয়া যায় না। কোন ব্যক্তিকে কেবল সন্দেহের বশে কারাদণ্ড দেওয়া, বিনা বিচারে ছলচাতুরির মাধ্যমে নিরাপত্তা বন্দি করে রাখা ইসলাম সমর্থন করে না। হাদিসে আছে একবার রাসুলে করীম (দঃ) মসজিদে খুৎবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় একজন দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল কোন অপরাধের জন্য আমার প্রতিবেশিদের গ্রেফতার করা হয়েছে? রাসুলুল্লাহ (দঃ) লোকটির প্রশ্ন শুনেও স্থিরভাবে বক্তৃতাই দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটি পুনরায় দাঁড়িয়ে হুজুরের প্রতি একই প্রশ্ন উত্থাপন করলেন কিন্তু এরপরও তিনি তার বক্তৃতা দিয়েই যাচ্ছিলেন। লোকটি তৃতীয় বারের মত উঠে আবারো একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন। ঘটনাক্রমে যে পুলিশ অফিসার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট লোকদের বন্দি করা হয় তিনিও রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি যে পর্যন্ত না বন্দি করার কোনো কারণ অবহিত করতে পারেন এবং সতর্কতামূলকভাবে এ সম্পর্কে ইসলামি আইনের দৃষ্টিতে স্পষ্ট ধারণা দিতে পারেন, সেই পর্যন্ত নিশ্চুপই ছিলেন। এর পর রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এই বলে রায়

www.pathagar.com

দিলেন যে, বন্দি লোকদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হোক।

এটা প্রশাসনের জন্য অস্বাভাবিক নয় যে, প্রশাসনিক গোপনীয়তা জনতার সম্মুখে প্রকাশ করা যাবে না। কিন্তু, তবু অফিসারের দায়িত্ব ছিলো, উপস্থিত জনতার সামনে দাঁড়িয়ে তাদেরকে এই বলে অবহিত করানো যে, অভিযোগ সম্পর্কে প্রশাসন খুবই সতর্ক কিন্তু তাই বলে তা জনতার সম্মুখে প্রকাশ করা যাবে না। প্রশাসনের উপযুক্ত ও যথার্থ কারণ থাকতে পারে—লোকটিকে আটক রাখার। উত্তরদানে তার ব্যর্থতা এটাই প্রমাণ করে যে, বন্দিরা সবই নির্দোষ। পবিত্র কোরান শরীফে সুরা নিসায় বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদিগকে এই বিষয়ের আদেশ করিতেছেন যে, হকদারকে তাহাদের হক পৌছাইয়া দাও এবং সেই বিষয়ের ও যে যখন মানুষের বিবাদ মীমাংসা কর তখন ন্যায়ের সহিত মীমাংসা করিবে।'

একদা খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, 'একমাত্র ন্যায়বিচারের তাগিদ ব্যতিত ইসলামে কাহাকেও বন্দি করার ব্যবস্থা নেই।' এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বিচার মানেই হচ্ছে, আইনের উপযুক্ত পদ্ধতি, যাতে প্রশাসন, কর্তৃক সংক্ষিপ্ত বিচার পরিচালনা করে প্রকারান্তরে বিচারের নামে প্রহসনের সৃষ্টি করার কোনই অবকাশ নেই। কোন অভিযোগে কাহাকেও গ্রেফতার করে উপযুক্ত আদালতে আইনের দৃষ্টিতে দোষী প্রমাণ না করা পর্যন্ত অথবা তার বিরুদ্ধে আনিত প্রমাণ না করা পর্যন্ত অথবা তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের বিপক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থনের অনুমতি ব্যতিরেকে দণ্ডিত করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। রুদ্ধদ্বার কক্ষে বন্দির বিচার করার ধারণা ইসলামে নেই বরং সব ধরনের বিচার কার্যই অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনসহ পূর্ণাঙ্গ সুযোগ সুবিধার সংরক্ষণ সাপেক্ষে প্রকাশ্য আদালতেই হতে হবে।

আলোচ্য অনুচ্ছেদ ও বাংলাদেশের সংবিধান

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদের সঙ্গে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৩ নং অনুচ্ছেদের সামঞ্জস্য রয়েছে। নিম্নে তা পরিবেশিত হল :

(১) গ্রেফতারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেফতারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

(২) গ্রেফতারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেফতারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে (গ্রেফতারের স্থান হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাহাকে তদতিরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (১) ও (২) দফার কোন কিছুই সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, (ক) যিনি বর্তমান সময়ের জন্য বিদেশী শত্রু; অথবা (খ) যাহাকে নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীনে গ্রেফতার করা হইয়াছে বা আটক করা হইয়াছে।

www.pathagar.com

(৪) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান সংবলিত কোন আইন কোন ব্যক্তিকে ছয় মাসের অধিককাল আটক রাখিবার ক্ষমতা প্রদান করিবে না, যদি সুপ্রিম কোর্টের বিচারক রহিয়াছেন বা ছিলেন কিংবা সুপ্রিম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্যতা রাখেন, এইরূপ দুইজন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্ম নিযুক্ত একজন প্রবীণ কর্মচারী সমন্বয়ে গঠিত কোন উপদেষ্টা পর্ষদ উক্ত ছয় মাস অতিবাহিত হইবার পূর্বে তাহাকে উপস্থিত হইয়া বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগ দানের পর রিপোর্ট প্রদান না রাখিয়া থাকেন যে, পর্ষদের মতে উক্ত ব্যক্তিকে তদতিরিক্তকাল আটক রাখিবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে।

(৫) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান সংবলিত কোন আইনের অধীন প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে আটক করা হইলে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ তাহাকে যথাসম্ভব শীঘ্র আদেশ প্রদানের কারণ জ্ঞাপন করিবেন। এবং উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রকাশের জন্য তাহাকে যত সত্বর সম্ভব সুযোগ দান করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, আদেশদানকারী কতৃপক্ষের বিবেচনায় তথ্যাদি প্রকাশ জনস্বার্থ বিরোধী বলিয়া মনে হইলে অনুরূপ কর্তৃপক্ষ তাহা প্রকাশ্যে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবেন।

(৬) উপদেষ্টা পর্ষদ কর্তৃক এই এই অনুচ্ছেদের (৪) দফার অধীন তদন্তের জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা

গ্রেফতার শব্দটি এখানে সীমিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত গ্রেফতারের অর্থ হচ্ছে, আটক ব্যক্তি নির্বাহী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ধৃত হয়েছে এবং ধৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ রয়েছে।

এই অনুচ্ছেদে গ্রেফতার ও আটক সম্বন্ধে চারটি রক্ষামূলক ব্যবস্থার বিধান রয়েছে।

(ক) ধৃত ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র তার গ্রেফতারের কারণ জানাতে হবে। এই কারণের বর্ণনা এমন হতে হবে যে, ধৃত ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সম্পর্কে সম্যক ধারণা করতে পারেন। শুধুমাত্র আইনের ধারা বর্ণনাই যথেষ্ট হবে না।

(খ) ধৃত ব্যক্তি আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করবার এবং তার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন করানোর অধিকার পাবেন। উকিল শুধু উপস্থিত থাকলেই চলবে না আসামিকে সমর্থন করবার পূর্ণ সুযোগ থাকা চাই।

(গ) গ্রেফতারকৃত এবং আটক ব্যক্তিকে আনয়নের সময় ব্যতিরেকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে হাজির করতে হবে। আটককৃত ব্যক্তির কাছে ম্যাজিস্ট্রেটের যাওয়া এই অনুচ্ছেদের বক্তব্য নয়। তা না হলে আটক করা অবৈধ হবে।

www.pathagar.com

(ঘ) আদালতের আদেশ ব্যতীত আটককৃত ব্যক্তিকে আটক রাখা যাবে না। যদি কোন আইন বর্তমানে বা ভবিষ্যতে এই চারটি রক্ষাকবচ অবমাননা করে তবে সেই আইন বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৩ নং অনুচ্ছেদের পরিপন্থি হবে।

জরুরি অবস্থায় এই অধিকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের নবম–ক ভাগে জরুরি বিধানাবলী সন্নিবেশিত হয়েছে। এতে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিধান রয়েছে। জরুরি অবস্থা কার্যকর করাকালে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার স্থগিত করার বিধান রয়েছে। মৌলিক অধিকার স্থগিত থাকলে সংবিধানের ৩৩ নং অনুচ্ছেদ স্বাভাবিকভাবেই অকার্যকর হয়ে যায়। তখন আলোচ্য মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়। নিম্নে সংবিধানে বর্ণিত জরুরি বিধানাবলী পরিবেশিত হল :

জরুরি অবস্থা ঘোষণা

১৪১ ক। (১) রাষ্ট্রপতির নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এমন জরুরি অবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহাতে যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশ বা উহার যে কোন অংশের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখীন, তা হইলে তিনি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করিতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ ঘোষণার বৈধতার জন্য ঘোষণার পূর্বেই প্রধানমন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষর প্রয়োজন হইবে।

(২) জরুরি অবস্থার ঘোষণা

(ক) পরবর্তী কোন ঘোষণার দ্বারা প্রত্যাহার করা যাইবে ;

(খ) সংসদে উপস্থাপিত হইবে ;

(গ) একশত কুড়ি দিন অতিবাহিত হইবার পূর্বে সংসদের প্রস্তাব দ্বারা অনুমোদিত না হইলে উক্ত সময়ের অবসানে কার্যকর থাকিবে না ;

তবে শর্ত থাকে যে, যদি সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় অনুরূপ কোন ঘোষণা জারি করা হয় কিংবা এই দফার (গ) উপদফায় বর্ণিত একশত কুড়ি দিনের মধ্যে সংসদ ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে তাহা পুনর্গঠিত হইবার পর সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে ত্রিশ দিন অতিবাহিত হইবার পূর্বে ঘোষণাটি অনুমোদন করিয়া সংসদে প্রস্তাব গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ত্রিশ দিনের অবসানে অনুরূপ ঘোষণা কার্যকর থাকিবে না।

(৩) যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের বিপদ আসন্ন বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে প্রকৃত যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগ সংঘটিত হইবার পূর্বে তিনি অনুরূপ যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য

www.pathagar.com

বাংলাদেশ বা উহার যে কোন অংশের নিরাপত্তা বিপন্ন বলিয়া জরুরি অবস্থা ঘোষণা করিতে পারিবেন।

১৪১ খ। এই সংবিধানের তৃতীয় ভাগের অন্তর্গত বিধানাবলীর কারণে রাষ্ট্র যে আইন প্রণয়ন করিতে ও নির্বাহী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সক্ষম নহেন, জরুরি অবস্থা ঘোষণার কার্যকরতাকালে এই সংবিধানের ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০ ও ৪২ অনুচ্ছেদসমূহের কোন কিছুই সেইরূপ আইন প্রণয়ন ও নির্বাহী ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কিত রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করিবে না ; তবে অনুরূপভাবে প্রণীত কোন আইনের কতৃত্বে যাহা করা হইয়াছে বা করা হয় নাই, তাহা ব্যতীত অনুরূপ আইন যে পরিমাণে কর্তৃত্বহীন, জরুরি অবস্থার ঘোষণা অকার্যকর হইবার অব্যবহিত পরে তাহা সেই পরিমাণে অকার্যকর হইবে।

১৪১ গ। (১) জরুরি অবস্থা ঘোষণা কার্যকর করাকালে প্রধানমন্ত্রীর লিখিত পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা ঘোষণা করিতে পারিবেন যে, আদেশে উল্লেখিত এবং সংবিধানের তৃতীয় ভাগের অন্তর্গত মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎকরণের জন্য আদালতে মামলা রুজু করিবার অধিকার এবং আদেশে অনুরূপভাবে উল্লেখিত কোন অধিকার বলবৎকরণের জন্য কোন আদালতে বিচারাধীন সকল মামলা জরুরি অবস্থা ঘোষণার কার্যকরকালে কিংবা উক্ত আদেশের দ্বারা নির্ধারিত স্বল্পতর কালের জন্য স্থগিত থাকিবে।

(২) সমগ্র বাংলাদেশ বা উহার যে কোন অংশে এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত আদেশ প্রযোজ্য হইতে পারিবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত প্রত্যেক আদেশ যথাসম্ভব শীঘ্র সংসদে উপস্থাপিত হইবে।

উপরে বর্ণিত সংবিধানের জরুরি বিধানাবীর আওতায় এদেশে একাধিকবার জরুরি আইন জারি হয়েছে। জরুরি আইন জারির কারণে সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকার যেমন বিঘ্নিত হয়েছে তেমনি লঙ্ঘিত হয়েছে মানবাধিকারও। ১৯৭৫ সালের সংবিধানে আমূল পরিবর্তন এনে যখন দেশে একদলীয় শাসন কায়েম করা হয় তখন মৌলিক অধিকার স্থগিত করা হয়। একই বছর যখন দেশে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের মাধ্যমে সামরিক শাসন কায়েম হয় তখনও মৌলিক অধিকার স্থগিত ছিল। তৃতীয় দফা মৌলিক অধিকার স্থগিত হয় ১৯৮২ সালে, দেশে সামরিক শাসন কায়েমের মধ্য দিয়ে। বস্তুত জরুরি অবস্থা বলবৎ থাকাকালীন অবস্থায় মৌলিক অধিকার কার্যকর থাকে না।

বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪

বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ তাই স্বাভাবিকভাবেই এর সকল নাগরিক স্বাধীন। কিন্তু সেই স্বাধীনতা অবাধ হতে পারে না, পারা উচিত নয়। স্বাধীনতা অবাধ হলে শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়।

www.pathagar.com

সুতরাং প্রয়োজনবোধে স্বাধীনতাকে খর্ব করতে হয়। গ্রেফতার হচ্ছে একটি মাধ্যম, যার দ্বারা স্বাধীনতা খর্ব হতে পারে। কিন্তু মানুষ গ্রেফতার হবে কেন? সে যখন অপরাধ করেছে বলে অভিযোগ করা হয়, তাকে অপরাধে জড়িত বলে সন্দেহ করা হয় বা তাকে যখন অপরাধে লিপ্ত অবস্থায় দেখা যায়, তখন তাকে গ্রেফতার করা হয় বা গ্রেফতার করা যায়।

ম্যাজিস্ট্রেট কোন ব্যক্তিকে যে কোন প্রকার অপরাধ করতে দেখলে তাকে গ্রেফতার করতে পারে। পুলিশ কোন ব্যক্তিকে গুরুতর অপরাধ করতে দেখলে, গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হলে বা সন্দেহভাজন হলে তাকে গ্রেফতার করতে পারে। সাধারণ মানুষও গ্রেফতার করতে পারে, সে যদি দেখতে পারে সামনে কেউ গুরুতর অপরাধ করছে। ফৌজদারি কার্যবিধিতেও এসব বিষয়ের বিধান প্রদত্ত হয়েছে। কোন ব্যক্তিকে আটক করে তার নিজস্ব গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করলেও গ্রেফতার হয়ে যায়। গ্রেফতার করার জন্য হ্যাণ্ডকাফ পরানোর প্রয়োজন নেই। গ্রেফতারের সাথে সাথে গ্রেফতার কৃত ব্যক্তির অনুকূলে কতিপয় মৌলিক অধিকারের উদ্ভব হয়। অধিকারগুলো হচ্ছে গ্রেফতারের কারণ জানার, আইনজীবীর সাথে পরামর্শ ও তার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের, ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করার এবং ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিজের বক্তব্য পেশ করার। এই অধিকারগুলো গ্রেফতারকৃত প্রতিটি ব্যক্তির থাকে। নিবর্তনমূলক আইনে এই মৌলিক অধিকারগুলো খর্ব হয়।

বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ একটি নিবর্তনমূলক আইন। এতে নিবর্তনমূলক আটকের ব্যবস্থা আছে। নিবর্তনমূলক আটক বলতে বিনা বিচারে আটক বুঝায়। সংবিধান এ জাতীয় আটকের বিধান সংবলিত আইন প্রণয়ন ও জারি করবার অধিকার সংসদকে দিয়েছে। বাংলাদেশের মূল সংবিধানে বিনা বিচারে আটক করবার আইনের কোন বিধান ছিল না পরবর্তীকালে এই বিধান যখন সংযোজিত হয় তখন সম্ভবত তৎকালীন সরকার মনে করেছিলেন যে, সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশকে রক্ষা করতে হলে এরূপ আইন আবশ্যক। অন্যাথায় গোপন বেআইনি তৎপরতা রোধ করার আর কোন উপায় থাকবে না।

বাংলাদেশে বিশেষ ক্ষমতা আইন নামক এই আইনটি ১৯৭৪ সালে জারি করা হয়। এতে বিনা বিচারে আটক রাখবার বিধান বিদ্যমান। এই আইনে বিনা বিচারে কোন ব্যক্তিকে ছয় মাস আটক রাখা যায়; তার অধিককাল মেয়াদের জন্য আটক রাখতে হলে কর্তৃপক্ষের উপদেষ্টা পরিষদের নিকট যেতে হবে। উপদেষ্টা পরিষদ আটককৃত ব্যক্তিকে বক্তব্য প্রদানের সুযোগ প্রদান করিবেন এবং অতিরিক্তকাল আটক রাখবার কারণ আছে কিনা তৎসম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করবেন।

বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ বাংলাদেশে মানবাধিকার বিরোধী একটি কালো আইন হিসাবে সমালোচিত হয়ে আসছে। এই আইন দেশের নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের যেমন পরিপন্থি তেমনি মানবাধিকারেরও পরিপন্থি। এই আইন বাতিলের জন্য বিভিন্ন মহল থেকে বারবার দাবি উঠেছে কিন্তু আইনটি আজো রয়েই গেছে।

www.pathagar.com

এই অনুচ্ছেদ ও অন্যান্য সংবিধান ঃ

The Constitution of India. Article No. 22

(1) No person who is arrested shall be detained in custody without being informed, as soon as may be, of the grounds for such arrest nor shall he be denied the right to consult, and to be defended by, a legal practitioner of his choice.

(2) Every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of twenty four hours of such arrest excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of a magistrate.

(3) Nothing in clauses (1) and (2) shall apply (a) to any person who for the time being is an enemy alien; or (b) to any person who is arrested or detained under any law providing for preventive detention.

(4) No law providing for preventive detention shall authorise the detention of a person for a longer period then three months unless-- (a) An Advisory Board consisting of persons who are , or have been, or are qualified to be appointed as judges of a High Court has reported before the expiration of the said period of three months that there is in its opinion sufficient cause for such detention provided that nothing in this sub clause shall authorise the detention of any person beyond the maximum period prescribed by any law made by Parliament under sub clause (b) of clause (7) ; or

(b) Such person is detained in accordance with the provisions of any law made by Parliament under sub-clause (a) and (b) of clause (7).

(5) When any person is detained in persuance of an order made under any law providing for preventive detention, the authority making the order shall as soon as may be, communicate to such person the grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order.

www.pathagar.com

(6) Nothing in clause (5) shall require the authority making any such order as is referred to in that clause to disclose facts which such authority considers to be against the public interest to disclose.

(7) Parliament may by law prescribe---

(a) the circumstances under which, and the class or classes of cases in which, a person may be detained for a period longer then three months under any law providing for preventive detention without obtaining the opinion of an Advisory Board in accordance with the provisions of sub-clause (a) of clause (4) (b) the maximum period for which any person may in any class or classes of cases be detained under any law providing for preventive detention ; and

(c) the procedure to be followed by an Advisory board in an inquiry under sub-clause (a) fo Clause (4).

The Constitution of Japan. Article No. 34.

"No person shall be arrested or detained without being at once informed of the charged against him or without the immediate previlage or councel; nor shall be detained without adequate cause ; and upon demand of any person such cause must be immediately shown in upon court in his presence and the presence of his councel."

Article no. 37 further provides--

"At all times the accused shall have the assistance of competent counsel who shall if the accused is unable to secure the same by his own efforts, be assigned to his use by the State."

The Constitution of U.S.A. (The 6th Amendment)

In all criminal prosecutions the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, and to be informed for the nature and cause of the accusation, to the confronted with the witness against him; to blave compulsory process for obtaining witesses in his favour, and to have the assistance of counsel for his defence."

www.pathagar.com

"Where there are special circumstances showing that otherwise the defendant would not enjoy that fair notice and adequate hearing which constitute the foundation of due process of law in the trial of any criminal charge."

Where the gravity of the crime and other factors--such as the age and education of the defendant the conduct of the court or the prosecuting officals, and the complicated nature of the offence charged and the possible defences thereto render criminal proceedings without counsel so apt to result in injustice as to be fundamentally unfair. ... the accused must have legal assistance under the Amendment whether he pleads guilty or elects to stand trial, whether he requests counsel or not. Only a waiver of counsel understandingly made, justifies trial without counsel.

এই অনুচ্ছেদ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তি মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছদের সাথে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তির সামঞ্জস্য রয়েছে। নিম্নে সেগুলো পরিবেশিত হলো :

পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে আন্তর্জাতিক চুক্তির অনুচ্ছেদ : ৯

(১) প্রত্যেকের স্বাধীনতা এবং দৈহিক নিরাপত্তার অধিকার আছে। কাউকে স্বেচ্ছাচারমূলকভাবে আটক অথবা গ্রেফতার করা যাবে না। আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট কারণ ও আইনানুগ পদ্ধতি ব্যতীত কাহাকেও তাঁর স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

(২) কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হলে, গ্রেফতারের সময় তাকে গ্রেফতারের কারণ জ্ঞাপন করতে হবে ; এবং তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে তাকে অবিলম্বে অবহিত করতে হবে।

(৩) ফৌজদারি অপরাধের দায়ে গ্রেফতারকৃত অথবা আটক কোন ব্যক্তিকে অবিলম্বে কোন বিচারক কিংবা আইনের দ্বারা বিচার ক্ষমতা প্রয়োগের কর্তৃত্বপ্রাপ্ত অন্য কোন কর্মকর্তার সম্মুখে হাজির করতে হবে, এবং অনুরূপ ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে বিচার অথবা মুক্তি পাবার অধিকারী। এটা সাধারণ নিয়ম বলে ধরে নিতে হবে যে, বিচারাধীন ব্যক্তিকে প্রহরায় আটক রাখতে হবে কিন্তু কারো মুক্তি বিচার সংক্রান্ত কার্যধারার, অন্য যে কোন পর্যায়ে বিচারের জন্য এবং প্রয়োজন হলে, আদালতের রায় কার্যকরী করার জন্য হাজিরা দানের নিশ্চয়তার শর্ত সাপেক্ষে হতে পারে।

(৪) গ্রেফতার অথবা আটকের ফলে কোন ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হলে আদালতে কার্যধারা গ্রহণ করবার অধিকার তার থাকবে, যাতে আদালত অবিলম্বে তার আটকের বৈধতা

www.pathagar.com

সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং উক্ত আটক আইনবিরুদ্ধ হলে তার মুক্তির আদেশ দিতে পারেন। (৫) কোন ব্যক্তি অন্যায় গ্রেফতার অথবা আটকের শিকার হলে ক্ষতিপূরণ লাভের বলবৎযোগ্য অধিকার তার থাকবে।

অনুচ্ছেদ : ১০

(১) স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত সকল ব্যক্তির প্রতি মানবোচিত এবং মানব ব্যক্তিত্বের সহজাত মর্যাদার প্রতি সম্মানসুলভ আচরণ করতে হবে।

(২) (ক) ব্যতিক্রমধর্মী পরিস্থিতি ছাড়া সকল ক্ষেত্রে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরকে (accused) দণ্ডিত অপরাধী (convicted) ব্যক্তিগণ হইতে পৃথক রাখতে হবে। এবং নিরপরাধ হিসেবে তাদের সঙ্গে পৃথক আচরণ করতে হবে।

(খ) অভিযুক্ত তরুণদেরকে প্রাপ্তবয়স্কদের থেকে পৃথক রাখতে হবে এবং তাদের যথাসম্ভব দ্রুত বিচার করতে হবে।

(৩) কয়েদীদের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা থাকবে এবং অনুরূপ ব্যবস্থার অত্যাবশ্যকীয় লক্ষ্য হবে কয়েদীদের সংশোধন ও সমাজে পুনর্বাসিত করা। তরুণ অপরাধীদের প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধী থেকে পৃথক রাখতে হবে এবং তাদের বয়স ও আইনগত মর্যাদার ভিত্তিতে তাদের সাথে উপযুক্ত আচরণ করতে হবে।

মানবাধিকার সংক্রান্ত ইউরোপীয় কনভেনশন :

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

(২) গ্রেফতারকৃত প্রত্যেক ব্যক্তিকে অবিলম্বে, যে ব্যক্তি যে ভাষা বুঝে সে ভাষায়, গ্রেফতারের কারণ এবং তার বিরুদ্ধে যে কোন অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (১) (গ) পরিচ্ছেদের বিধানাবলী অনুসারে গ্রেফতারকৃত বা আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে সত্বর কোন বিচারক অথবা আইনের দ্বারা বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা প্রয়োগের কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার সম্মুখে হাজির করতে হবে। এবং তার, যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে, বিচার পাবার অথবা বিচার সম্পন্ন হওয়া সাপেক্ষে মুক্তি লাভের অধিকার থাকবে। অনুরূপ মুক্তি বিচারের জন্য হাজির হওয়ার নিশ্চয়তার শর্ত সাপেক্ষ হতে পারে।

(৪) গ্রেফতার অথবা আটকের ফলে কোন ব্যক্তি তার স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত হলে তিনি (আইনগত) কার্যধারা গ্রহণ করতে পারেন। এই কার্যধারা মাধ্যমে কোন আদালত কর্তৃক তার আটকের বৈধতা সম্পর্কে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে এবং যদি আটক আইনসম্মত না হয় তবে তার মুক্তির আদেশ দেওয়া হবে।

(৫) এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী লঙ্ঘন করে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার বা আটক করার ফলে তিনি যদি ক্ষতিগ্রস্ত হন তবে তার ক্ষতিপূরণ লাভের বলবৎযোগ্য অধিকার থাকবে।

www.pathagar.com

অভিযোগবিহীন আটক

বাংলাদেশের যে সকল রাজনীতিক, সাংবাদিক জেলে গিয়েছেন কারণে অকারণে, তারা জেল থেকে ফিরে তাদের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন। তাদের অনেকের বর্ণনা থকেই একটা বিষয় সুস্পষ্ট যে, কিছু মানুষ জেলখানার মধ্যে বন্দি জীবন যাপন করছেন যে, এদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ নেই। এ সম্পর্কে ইত্তেফাকের সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের ১৯৭৭ সালের ২১ শে মার্চ ইত্তেফাকে 'আমি যেভাবে দেখেছি' শিরোনামে লেখা থেকে কিঞ্চিৎ পরিবেশন করছি—

'জেলখানায় গিয়ে স্বচক্ষেও দেখেছি, সেখানে এমন অনেক লোক বন্দি হিসেবে রয়েছেন—যাঁদের বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নেই। একমাত্র আটক আদেশের ফলে তারা জেলখানার মাসের পর মাস বন্দিজীবন যাপন করছেন। ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্ন বাদ দিলেও আমাদের মত দরিদ্র দেশে সমর্থ, উপার্জনক্ষম পুরুষের অভাবে একটি পরিবারের উপরে যে কি দুর্যোগ ও দুর্দশা নেমে আসতে পারে, তা কারো অজানা থাকার কথা নয়। অথচ শুধু বর্তমান আমলেই নয়, সেই শেখ সাহেবের আমল থেকেই অনেকে এইভাবে আটক রয়েছেন।

একটি স্বাধীন দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিনাবিচারে আটক রাখার ফলে সৃষ্ট এই সঙ্কট কোন ক্রমেই উপেক্ষার বিষয় হতে পারে না। কারণ স্বাধীন দেশের প্রতিটি শিশু পরিবার ও নাগরিকের প্রতি সমাজ ও রাষ্ট্রের একটা দায়িত্ব রয়ে গেছে। সত্য, বর্তমান সরকার ইতিমধ্যেই অনেক বন্দিকে মুক্তি দিয়েছেন, কিন্তু যারা এখনও মুক্তি পান নি, তাদের মুক্তির বিষয়টিও ন্যায় বিচারের খাতিরে সরকারের সহানুভূতিতে পাবার দাবি রাখে। দেশের বিভিন্ন কারাগারে বিনাবিচারে যারা আটক আছেন, তারা সকলেই যে সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য সত্যিকার অর্থে বিপজ্জনক, একথা আমি বিশ্বাস করি না। নীতিগতভাবেই বিনাবিচারে কাউকে আটক রাখার বিরোধী। তবে, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে যদি কাউকে কখনো বিনা বিচারে আটকের প্রয়োজন একান্তই দেখা দেয় তাহলেও আমার মতে, ক্ষমতার অপব্যবহার রোধের স্বার্থেই সে ধরনের সকল সিদ্ধান্ত উচ্চ পর্যায়ে হওয়া দরকার।

এ ছাড়াও অভিযুক্ত অনেকে দীর্ঘদিন ধরে জেলে আছেন—যাঁদের সময়মত বিচার হলে তারা যদি সাজাও পেতেন তাহলে বিচারাধীন অবস্থায় যতদিন থাকতে হচ্ছে তার বহুপূর্বে মুক্ত জীবনে ফিরে আসতে পারতেন। তাই বিচারাধীন এই সব বন্দির দ্রুত বিচারের প্রশ্নটিও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সকল ক্ষেত্রে চার্জশীট দিয়ে মামলা শুরু করার কাজ কেন বিলম্বিত হচ্ছে তার রহস্যও উন্মোচিত হওয়া উচিত।'

ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন উপরের কথাগুলো লিখেছিলেন ১৯৭৭ সালে। এরই মধ্যে পনর বছর অতিবাহিত হয়েছে কিন্তু এই অবস্থার তেমন হেরফের হয় নি। সম্প্রতি পত্রিকার খবরে প্রকাশিত হয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের জাল চিঠিতে এক ব্যক্তিকে দুই মাস

www.pathagar.com

বিনাবিচারে আটক থাকতে হয়েছে। বস্তুত বাংলাদেশে বিনাবিচারে আটকের ঘটনা বর্তমানে একেবারে অনুল্লেখযোগ্য নয়।

সারসংক্ষেপ

জন্মগতভাবে মানুষ যে স্বাধীন এবং সে কারণে তার যে অধিকার আছে যথেচ্ছ বিহারের, এগুলি মানবাধিকারের মূল কথা। এই ধূলিময় পৃথিবীতে তার জন্ম এবং এর আকাশে বাতাসে তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস এবং সবশেষে এখানেই তার জীবনের সমাপ্তি। তাই মানুষের আসা এই যে, তার এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে সে কোন স্বৈরাচারীর স্বেচ্ছাচারমূলক বাধা নিষেধের অধীন হবে না। প্রত্যেক মানুষের তাই অধিকার আছে গ্রেফতার না হওয়ার, আটক না পড়ার এবং নির্বাসনে না যাবার। অবশ্য আইনে বিধান আছে এইসব ব্যবস্থা গ্রহণের ; আইন ছাড়া কোন ব্যক্তিকে এইসব ব্যবস্থার শিকারে পরিণত করা যায় না।

শক্তিমানের দ্বারা দুর্বল আটক হয়, হতে পারে। দলীয় কারণে মানুষ গ্রেফতার হতে পারে, তবে এই পরিস্থিতি যাতে না হয়, সে জন্যই মানবাধিকারের এই ঘোষণা।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

প্রত্যেক ব্যক্তি, তার অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ এবং তার বিরুদ্ধে আনীত কোন অপরাধমূলক অভিযোগ-এর ক্ষেত্রে, পূর্ণ সমতার ভিত্তিতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারালয় কর্তৃক ন্যায্য ও প্রকাশ্য শুনানী লাভের অধিকার।

(Article : 10. Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.)

ভাষ্য

আলোচ্য অনুচ্ছেদের মূল বক্তব্য হচ্ছে :

(১) ব্যক্তির অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে,

(২) আনিত অপরাধমূলক অভিযোগের ক্ষেত্রে,

(৩) পূর্ণ সমতার ভিত্তিতে,

(৪) স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারালয়ে,

(৫) ন্যায্য ও প্রকাশ্য শুনানী লাভের অধিকার।

আমাদেরকে আলোচনা করতে হবে

১. ব্যক্তির অধিকার ও কর্তব্য কি?

২. অপরাধমূলক অভিযোগ কি?

৩. পূর্ণ সমতা বলতে কি বুঝায়?

৪. স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষ বিচারালয়ের বৈশিষ্ট্য।

৫. ন্যায্য ও প্রকাশ্য শুনানী কাকে বলে?

১. ব্যক্তির অধিকার ও কর্তব্য :

www.pathagar.com

ব্যক্তির অধিকারের বর্ণনা আছে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার অনুচ্ছেদ ১ থেকে ২৮ পর্যন্ত। এ সব অধিকার—

পৌর অধিকার

রাজনৈতিক অধিকার

অর্থনৈতিক অধিকার

সামাজিক অধিকার ও

সাংস্কৃতিক অধিকার

এই কয়টি ভাগে বিভক্ত করা যায়। এই অধিকারগুলোর কোনটিই নিরঙ্কুশ বা অসীম নয়। তদুপরি একজনের স্বাধীনতা আরেকজনের স্বাধীনতা দ্বারা, একজনের অধিকার আরেকজনের অধিকার দ্বারা সীমিত। প্রতিটি অনুচ্ছেদের মানুষের অধিকারের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা রয়েছে। তাই অধিকার সম্পর্কে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করছি না।

ব্যক্তির কর্তব্য সম্পর্কে বয়ান রয়েছে ২৯ অনুচ্ছেদে। এসব কর্তব্যাদি—

সামাজিক কর্তব্য

অর্থনৈতিক কর্তব্য

নৈতিক কর্তব্য

রাজনৈতিক কর্তব্য

সাংস্কৃতির কর্তব্য

এই কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়। যেহেতু ২৯ অনুচ্ছেদে ব্যক্তির কর্তব্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে সেহেতু এখানে কর্তব্য সম্পর্কেও আলোচনা দীর্ঘায়িত করছি না।

উল্লেখ্য যে মানুষের অধিকার যেমন নিরঙ্কুশ নয়, কর্তব্যও তেমনি সীমাহীন নয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তির অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণের প্রশ্ন আসে। ব্যক্তির অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে পূর্ণ সমতার ভিত্তিতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারালয় কর্তৃক ন্যায্য ও প্রকাশ্য শুনানী লাভের অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে।

অপরাধমূলক অভিযোগ

অপরাধমূলক অভিযোগ (Criminal Charge) ব্যক্তির বিরুদ্ধে আসতে পারে। অপরাধ করলে তো আসবেই, না করলেও আসতে পারে। আমরা সমাজে বসবাস করছি। এই সমাজে প্রতিনিয়তই অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। অতএব সমাজের সদস্য হিসেবে কারো না কারো বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ আসবে। আইনের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে অভিযোগ পেশ করা হবে, অভিযোগের যথার্থতা বিবেচনা করা হবে, অভিযোগ প্রমাণিত হবে, প্রমাণিত হলে অপরাধীর শাস্তি তথা দণ্ড হবে।

www.pathagar.com

কারো বিরুদ্ধে অপরাধমূলক অভিযোগ উত্থাপিত হলে সেক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির একটি অধিকার থাকে। সেটি হচ্ছে পূর্ণ সমতার ভিত্তিতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারালয় কর্তৃক ন্যায্য ও প্রকাশ্য শুনানী লাভের অধিকার।

পূর্ণ সমতার ভিত্তিতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারালয় ন্যায্য ও প্রকাশ্য শুনানী ইত্যাদি সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব। অপরাধমূলক অভিযোগ সম্পর্কে এবারে আলোচনা করছি।

অপরাধ–এর ইংরেজি হচ্ছে Crime। সাধারণত Crime বা অপরাধ বলতে সমাজ বা ব্যক্তি বিশেষের প্রতি কোন বেআইনি কার্যকলাপ করাকে বুঝায়। দেশের প্রচলিত আইন যা করতে নিষেধ করেছে এবং করলে শাস্তির বিধান করেছে, সে ধরনের আইন বহির্ভূত কাজকে অপরাধ বলে। বস্তুত যা শাস্তিযোগ্য তাই অপরাধ। যে সমস্ত নৈতিক অপকর্ম যার জন্য আইনে দণ্ডের বিধান নেই, সেগুলোকে যথার্থভাবে আইনের ভাষায় অপরাধ বলা চলে না। যারা নৈতিক অপকর্ম করে, তারা বড় জোর দুর্নীতিবাজ আখ্যা পেতে পারে। আইনে যে কাজ শাস্তিযোগ্য ঘোষিত হয়েছে, সে কাজ করলেই আসামি শাস্তি পেতে পারেন।

যে সমস্ত কর্ম বা কর্মবিচ্যুতি বা কর্মবিরতি আইনে নিষিদ্ধ এবং যা করলে দণ্ডবিধিতে বা অন্যান্য আইনে দণ্ডের বিধান আছে তাকেই অপরাধ বলে। অপরাধের সংজ্ঞা হচ্ছে এর শাস্তিযোগ্যতা। বাংলাদেশের আইনে অপরাধ, এমন কিছু কাজের উল্লেখ করছি যেগুলো দণ্ডযোগ্য। যেমন ঃ

১. রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ,
২. রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র,
৩. রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অস্ত্র সংগ্রহ,
৪. বিদ্রোহ,
৫. কোন এশীয় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ,
৬. রাজবন্দি বা যুদ্ধবন্দিকে পালানোর জন্য সরকারি কর্মচারীর সহায়তা,
৭. ঐ প্রকার পলাতক বন্দিকে সহায়তা,
৮. বিদ্রোহে সহায়তা,
৯. বিদ্রোহে সহায়তায় সক্রিয়তা,
১০. মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান বা সৃজন,
১১. দণ্ডিত ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে গ্রেফতার না করা,
১২. মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতারের ক্ষেত্রে বাধা প্রদান,
১৩. মুদ্রা নকল বা জাল,
১৪. নকল বা জালমুদ্রা আমদানি রফতানি,
১৫. স্ট্যাম্প নকল বা জাল করা,

www.pathagar.com

১৬. নরহত্যা,

১৭. নিমখুন,

১৮. নাবালক ও উম্মাদের আত্মহত্যায় সহায়তা,

১৯. আঘাতের সাথে হত্যার প্রয়াস,

২০. বিনা অনুমতিতে গর্ভপাত,

২১. মারাত্মক অস্ত্রের সাহায্যে গুরুতর আঘাত করা,

২২. জোর করে কিছু আদায় করবার জন্য গুরুতর আঘাত,

২৩. হত্যার জন্য ছিনতাই,

২৪. সন্ত্রাস, ছিনতাই, অপহরণ,

২৫. দাস ব্যবসা,

২৬. বলাৎকার,

২৭. অস্বাভাবিক যৌন অপরাধ,

২৮. চুরি, ডাকাতি, ডাকাতির সাথে থাকা,

২৯. দস্যুতা,

৩০. সরকারি কর্মচারী কর্তৃক বিশ্বাসভঙ্গ,

৩১. চোরাই মাল রাখা,

৩২, চোরাইমালের ব্যবসা,

৩৩. গৃহে অগ্নিসংযোগ,

৩৪. জাহাজ প্রভৃতিতে অগ্নিসংযোগ,

৩৫. মূল্যবান দলিল জাল,

৩৬. অপরাধের উদ্দেশ্যে অনধিকার প্রবেশ,

৩৭. অনধিকার প্রবেশপূর্বক গুরুতর আঘাত,

৩৮. জালদলিলকে খাঁটি হিসেবে ব্যবহারকরণ,

৩৯. জালিয়াতির জন্য প্রতীক ইত্যাদি নকল,

৪০. উইল জাল,

৪১. বিচারে বাধা প্রদান,

৪২. নিষেধাজ্ঞার পরও উপদ্রব বজায় রাখা,

৪৩. অন্যায় অবরোধ,

৪৪. আইনগত আদেশ অমান্য ইত্যাদি।

এ ছাড়াও আরো অনেক অপরাধমূলক কাজ রয়েছে।

অভিযোগের ইংরেজি প্রতিশব্দ Charge। কারো বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ থাকলে সেই অভিযোগ দায়ের করতে হয়। কেউ অপরাধ করলেও তাকে শাস্তি দেওয়া যায় না। তার

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করতে হয়। ফৌজদারি কার্যবিধির ২২১ ধারায় অপরাধের অভিযোগ গঠন সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে,

১. এই বিধির অধীন প্রত্যেক আসামি যে অপরাধ করেছে তার বিবরণ থাকবে, অপরাধের নাম উল্লেখই যথেষ্ট বিবরণ ।

২. যে আইন দ্বারা অপরাধটির সৃষ্টি হয়েছে তাতে এর কোন নির্দিষ্ট নাম থাকলে চার্জে কেবল সেই নামেই এর বিবরণ দেয়া যাবে।

৩. যে আইন দ্বারা অপরাধটির সৃষ্টি হয়েছে তাতে এর কোন নির্দিষ্ট নাম না থাকলে এর সংজ্ঞা এমনভাবে উল্লেখ করতে হবে যাতে আসামি তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারে।

৪. যে আইন এবং যে ধারা অনুসারে অপরাধ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে চার্জে তার উল্লেখ করতে হবে।

৫. কোন ক্ষেত্রে চার্জ বা অভিযোগ প্রণয়ন করা হলে, তা এই মর্মে বিবৃতি দেওয়ার শামিল হয় যে, উক্ত বিশেষ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অপরাধটির সংগঠনের জন্য আইনগত যে সকল শর্ত রয়েছে তা পূরণ করা হয়েছে।

৬. অভিযোগ আদালতের ভাষায় লিখতে হবে।

৭. আসামি পূর্বে অপরাধের দায়ে দণ্ডিত হওয়ার কারণে পরবর্তি অপরাধের ক্ষেত্রে বর্ধিত দণ্ড বা ভিন্ন প্রকৃতির দণ্ডে দণ্ডনীয় হলে এবং পরবর্তী অপরাধের দণ্ডবৃদ্ধি বা প্রকৃতি পরিবর্তনের জন্য পূর্ববর্তী দণ্ড প্রমাণ করবার প্রয়োজন হলে অভিযোগে পূর্ববর্তী দণ্ডের ঘটনা তারিখ, স্থান উল্লেখ করতে হবে। এরূপ উল্লেখ না করে থাকলে আদালত দণ্ডদানের পূর্বে যে কোন সময় উহা যোগ করতে পারেন।

পূর্ণ সমতা

পূর্ণ সমতা হচ্ছে অসমতা অসাম্য বা বৈষম্যের বিপরীত পূর্ণ সমতা। কোন রকম অসমতা বা বৈষম্য প্রদর্শন না করে যে আচরণ তাকে পূর্ণ সমতা বলে।

বিচারের ক্ষেত্রে পূর্ণ সমতা বলতে বুঝায় বিচার সংশ্লিষ্ট সকল ক্ষেত্রে অন্যান্যরা যে সব সুযোগ সুবিধা লাভ করে, অভিযুক্ত ব্যক্তিও সেরূপ লাভ করবেন। অভিযোগ খণ্ডনের জন্য, আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য, আইনানুগ যে সব ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেসব থেকে বঞ্চিত করা হবে না—এমন নিশ্চয়তা। আইনের আশ্রয়লাভ এবং সুষ্ঠু বিচার লাভের ক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সমান সুবিধা লাভ করবেন, কারো প্রতি বিশেষ অনুরাগ বা বিরাগ প্রদর্শন করা হবে না। বিচারের ক্ষেত্রে সমতা বলতে মোটামুটি এটাই বুঝায়।

যথাযথ বিচার পাওয়ার জন্য বিচারের ক্ষেত্রে সমতা অত্যন্ত জরুরি। কোন কারণে বা কোন অজুহাতে ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিচারের ক্ষেত্রে অসমতা প্রদর্শন করলে যথাযথ বিচার লাভ

www.pathagar.com

কঠিন হয়ে পড়বে। এতে করে বিভিন্ন ব্যক্তির অধিকার ও কর্তব্য যথাযথভাবে নির্ধারণ করা যাবে না এবং ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের যথার্থ বিচার হবে না। তাই ন্যায় বিচারের স্বার্থেই বিচারের ক্ষেত্রে পূর্ণ সমতা প্রতিষ্ঠা আবশ্যক।

বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা নিয়ে বিতর্ক চলছে দীর্ঘকাল থেকে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বলতে কি বুঝায়, বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার পদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ে ব্যাপক মতদ্বৈততা রয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা বলতে কোন কিছুর অস্তিত্ব আছে কি?

প্রথমেই দেখা যাক বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কি বুঝায়? বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতার যারা পৃষ্ঠপোষক তাদের অভিমত হচ্ছে , ন্যায়বিচার কার্যকর করতে হলে বিচার বিভাগকে আইন ও শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ এবং হস্তক্ষেপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে হবে। বিচারপতিগণ যাতে সকল প্রকার ভীতি, চাপ এবং অনিশ্চয়তার হাত থেকে মুক্ত থাকতে পারেন তার ব্যবস্থাও করতে হবে। বিচারপতিদের দিক থেকেও নিরপেক্ষতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। তারা কাউকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের মনোভাব বর্জন করে এবং সকল প্রকার রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত অগ্রাধিকার থেকে মুক্ত হয়ে বিচারকার্য করবেন। এভাবে বিচার বিভাগকে প্রভাবমুক্ত রাখার চেষ্টা এবং বিচারকদের পক্ষ থেকে নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকার দৃষ্টিভঙ্গি বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার রক্ষাকবচ।

এবার দেখা যাক নিরপেক্ষতা বজায় রাখার পদ্ধতি? বিচার বিভাগ কোন স্বয়ংশাসিত সংস্থা নয়। বিচারপতিদের মাধ্যমেই বিচার বিভাগের প্রক্রিয়া মূর্ত হয়ে ওঠে। সুতরাং বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য বিচার বিভাগের কাঠামোগত বিন্যাসের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারাদালত বলতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকেই বুঝায়। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার গুরুত্ব অপরিসীম। অধ্যাপক লাস্কী (Laski) যথার্থই বলেছেন, 'কিভাবে রাষ্ট্র তার বিচারকার্য নিষ্পন্ন করছে তা জানতে পারলেই রাষ্ট্রের নৈতিক চরিত্রের স্বরূপ অনেকটা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায়।' লর্ড ব্রাইস বলেছেন, 'কোন দেশের সরকারের কৃতিত্ব পরিমাপ করবার সর্বোত্তম মাপকাঠি হচ্ছে তার বিচার বিভাগের দক্ষতা ও যোগ্যতা। বাস্তবিকই বিচারকদের দক্ষতা, যোগ্যতা, নিরপেক্ষতা এবং স্বাধীনতার উপরই বিচার বিভাগের সত্যিকার স্বাধীনতা সর্বতোভাবে নির্ভরশীল। সত্যিকার অর্থে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অর্থ হল কর্তব্য পালনে বিচারকদের স্বাধীনতা। বিচারকগণ যখন রায় প্রদানের ক্ষেত্রে সর্ব প্রকার সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব এবং সরকারি কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকবেন, তখনই বিচার বিভাগের সত্যিকার স্বাধীনতা রক্ষিত হবে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে বিচারকদের অবশ্যই সৎ, দক্ষ ও নিরপেক্ষ হতে হবে।

www.pathagar.com

সকল প্রকার শাসন ব্যবস্থাতেই বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে। যে সকল উপাদান বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষা করে এবং বিচারকদের নিরপেক্ষভাবে তাদের কর্তব্য নির্ভয়ে পালন করতে সাহায্য করে, নিম্নে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রথম বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কর্মদক্ষতা ও নিরপেক্ষতা বহুলাংশে নির্ভর করছে বিচারকদের যোগ্যতার উপর। তাই বিচারকগণ কিভাবে নিয়োগ লাভ করেন, সে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিচারকদের নিয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে বিতর্ক আছে এবং বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে । যে পদ্ধতিতে বিচারক নিয়োগ করা হোক না কেন দেখতে হবে যেন যোগ্য দক্ষ ও সৎ লোক নিয়োগ লাভ করেন। কোন কারণে অযোগ্য বা অসৎ লোক বিচারক নিয়োগ হলে বিচার বিভাগে স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন হবে। আইনসভা কর্তৃক নির্বাচন, জনগণ কর্তৃক নির্বাচন এবং প্রধান নির্বাহী কর্তৃক মনোনয়ন এই তিনটির কোন একটি পদ্ধতিতে সাধারণত বিচারক নিযুক্ত হন।

আইনসভা কর্তৃক বিচারপতি নির্বাচন পদ্ধতি সাধারণ বা সর্বজনস্বীকৃত কোন পদ্ধতি নয়। এ পদ্ধতি সরকারের ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির পরিপন্থি এবং এতে বিচার বিভাগ আইন বিভাগের অধীনস্থ হয়ে পড়ার আশংকা থেকে যায়। উপরন্ত আইনসভা কর্তৃক নির্বাচনের অর্থ হচ্ছে দলীয় সদস্যদের নির্বাচন এবং যখন দলীয় সম্পর্কের ভিত্তিতে বিচারক নির্বাচন করা হয় তখন মেধা এবং নিরপেক্ষতা প্রায় সম্পূর্ণই বিপন্ন হয়। বিচারপতিদের জনগণ কর্তৃক নির্বাচন পদ্ধতি সর্বপ্রথম ফ্রান্সে জনগণের সার্বভৌমত্ব (popular Sovereignty) এবং ক্ষমতা স্বতন্ত্রকরণ নীতির (principle of separation) প্রসারের ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এই পদ্ধতি সুইজারল্যাণ্ডের কোন কোন কান্টনে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন অঙ্গ রাজ্যে এবং রাশিয়ার নিম্ন আদালতসমূহে অনুসৃত হয়ে থাকে। কিন্তু জনগণ কর্তৃক বিচারক নির্বাচনের পদ্ধতি হচ্ছে সর্বাধিক ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি। অধ্যাপক লাস্কির (Lasky) ভাষায় 'বিচারকদের নিয়োগ পদ্ধতির মধ্যে জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি হচ্ছে ব্যতিক্রমবিহীনভাবে নিকৃষ্ট।' এই অসুবিধা দূরীকরণার্থে বর্তমানে অধিকাংশ দেশেই প্রধান নির্বাহী কর্তৃক বিচারক নিয়োগের বিধান অনুসরণ করা হচ্ছে। মনে করা হয় যে, এই পদ্ধতিই সর্বাপেক্ষা ত্রুটিমুক্ত।

প্রধান নির্বাহী কর্তৃক বিচারক নিয়োগের পদ্ধতিও একেবারে বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। অনেকের মতে, এতে বিচারকদের উপর প্রধান নির্বাহীর রাজনৈতিক প্রভাব থেকেই যায়। এর ফলে বিচারকগণ সম্পূর্ণভাবে রাজনীতির উর্ধ্বে উঠতে পারেন না। তবে প্রধান নির্বাহী যদি বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী এবং ক'জন বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশক্রমে বিচারক নিয়োগ করেন, তাহলে আর কোনরূপ অসুবিধা থাকে না।

দ্বিতীয়ত, বিচারকের কার্যকাল তাদের নিয়োগ পদ্ধতির মতই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত একবার নিযুক্ত হলে বিচারকদের অবসর গ্রহণের বয়স হওয়া পর্যন্ত কার্যে বহাল থাকা উচিৎ।

www.pathagar.com

বিচারকদের পদচ্যুত করার ক্ষমতা কোন অবস্থাতেই শাসন বিভাগের হাতে ন্যস্ত করা উচিত নয়। কেবলমাত্র বিচার নিষ্পত্তি ক্ষেত্রে তাদের মারাত্মক চারিত্রিক দোষ প্রমাণিত হলে তাদের পদচ্যুত করা যাবে, অন্যথায় নয়। তদুপরি বিচারকদের কার্যকাল এবং চাকুরির শর্তাবলী শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে নির্ধারিত হওয়া উচিত। শাসনতন্ত্রে বর্ণিত অপরাধের অভিযোগ ব্যতীত কোন প্রকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে যাতে তাদের অপসারণ করা না যায়, সে ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক।

তৃতীয়ত, বিচারকদের কার্যক্ষমতা নির্ভর করে তাদের কর্ম সম্পাদনের ইচ্ছার উপর; কর্মসম্পাদনের ইচ্ছা আবার বহুলাংশে নির্ভর করে পদোন্নতির আশা বা সম্ভাবনার উপর। কাজেই বিচারকের পদোন্নতির বিষয়টি অত্যন্ত যত্নের সাথে বিবেচনা করা উচিত। সাধারণত জেষ্ঠ্যত্ব নীতি অনুসারে এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মেধা এবং কর্মদক্ষতাও বিচারকদের পদোন্নতির ভিত্তি হতে পারে। বিচারকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে সুপারিশ গ্রহণ ও পক্ষপাতিত্ব করা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার অন্যতম অন্তরায়।

চতুর্থত, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বিচারকদের উচ্চতম বেতন ও ভাতার সুব্যবস্থা, চাকুরিতে থাকাকালীন চাকুরির স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা, এবং উচ্চহারে অবসরকালীন ভাতার সুব্যবস্থা থাকা অপরিহার্য। বেতনের পর্যাপ্ততা, এবং নিরাপত্তা বিচারকদের সঠিকভাবে কর্তব্য সম্পাদনে উদ্বুদ্ধ করে। অধিকাংশ রাষ্ট্রেই বিচারপতিদের বেতন ভাতাদি, অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদি এবং চাকুরির শর্তাবলী সংবিধান কর্তৃক নির্ধারিত হয়ে থাকে।

পঞ্চমত, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ডব্লিউ. এফ. উইলোবী (W. F. Willoughby) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও কর্মদক্ষতা অর্জনের জন্য তিনটি প্রধান শর্তের উল্লেখ করেছেন। (১) বিচারের জন্য অপরাধীদের তাদের সামনে নিয়ে আসার অধিকার বিচারপতিদের থাকতে হবে। (২) আদালতের যাবতীয় বিষয়াদির গুরুত্ব যাতে জনগণকে উপলব্ধি করাতে বিচারকগণ সক্ষম হন, সে সুযোগ তাদের থাকতে হবে। (৩) বিচারকদের আদেশ ও রায়কে কার্যকর করার পর্যাপ্ত ক্ষমতা তাদের থাকতে হবে।

ষষ্ঠত, এবং সর্বোপরি বিচার বিভাগকে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে হবে। এই ব্যব্যস্থাকে কার্যকরী করবার জন্য সাংবিধানিক বিধিবিধান এবং ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবর্তন করা আবশ্যক। বিশেষ করে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারে শাসন বিভাগ আইন বিভাগের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। এবং ফলে শাসন বিভাগ একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে শাসন বিভাগের একচ্ছত্র আধিপত্য রোধ করতে হলে বিচার বিভাগ স্বাধীন, নিয়ন্ত্রণমুক্ত এবং নিরপেক্ষ থাকা আবশ্যক।

বস্তুত বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং নিরপেক্ষতার অর্থ হচ্ছে বিচারপতিদের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা। আর তা রক্ষা করার জন্য যে পদ্ধতির সুপারিশ করা হয়েছে তা হচ্ছে ঃ (১) বিচারপতিদের যোগ্যতার মান নির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। (২) বিচারপতিদের মেয়াদের

www.pathagar.com

নিরাপত্তা, অপসারণের কারণ ও পদ্ধতির নির্দিষ্টতা। (৩) উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা। (৪) অবসরকালীন অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা। (৫) অবসর গ্রহণের পর কোন লাভজনক সরকারি পদে নিযুক্ত হবার সুবিধার নিষিদ্ধকরণ। (৬) বিচারপতি পদ থেকে অবসর গ্রহণের পর কোন আদালতে আইনজীবীরূপে কাজ করার উপর নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি। এইসব পদ্ধতি নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করলে আশা করা যায় যে, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা সুরক্ষিত হবে।

ন্যায্য ও প্রকাশ্য শুনানী

বিচারের নামে প্রহসন পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক হয়েছে, আজও যে হয় না তা নয়। সামরিক আদালত হচ্ছে এমনি ধরনের এক প্রহসনমূলক বিচার ব্যবস্থা। যেখানে বিচার হয় রুদ্ধদ্বার কক্ষে, আসামি পক্ষে আইনজীবী থাকে না, আর থাকলেও তা নামমাত্র। আসামিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয় না। এমনি ধরনের দ্রুতগতিতে বিচার অনুষ্ঠিত হয় যে, মনে হয় রায় পূর্বেই নির্ধারিত ছিল, ঘোষণা দেওয়ার জন্য এটা শুধু আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। এতে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়। এটাকে ন্যায্য ও প্রকাশ্য শুনানী বলে না।

ন্যায্য ও প্রকাশ্য শুনানী সেটাই, যেখানে বিচার হবে স্বাভাবিক ও নিয়মিত আদালতে, যথানিয়মে। অভিযুক্ত ব্যক্তি তার আত্মপক্ষ সমর্থনের পর্যাপ্ত সুযোগ পাবেন। প্রয়োজনে এক বা একাধিক আইনজীবী নিযুক্ত করতে পারবেন। স্বাভাবিক আদালতে সর্বসমক্ষে বিচারকার্য শুরু হবে। শুনানী অনুষ্ঠিত হবে। সাক্ষিগণের সাক্ষ্য প্রদান ও জেরা অনুষ্ঠিত হয়। শুনানী অনুষ্ঠিত হওয়ার পর বিচারক প্রকাশ্যে রায় প্রদান করেন।

সার সংক্ষেপ

মানুষের যেমন অধিকার আছে তেমনি তার কর্তব্যও আছে। দেশের সংবিধান এবং আইন এই অধিকার ও কর্তব্যের সীমারেখা দেয় এবং সংজ্ঞা নির্ধারণ করে। মূলত এ কাজ দেওয়ানি আইনের।

ফৌজদারি আইন অপরাধের পরিচয় প্রদান করে এবং সেই পরিচয়ে অপরাধ বলে চিহ্নিত কর্মকাণ্ডে কেউ লিপ্ত হয়েছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য অভিযোগ গঠনের প্রক্রিয়া বলে দেয়।

এ দুটি ক্ষেত্রে অর্থাৎ দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচারের ক্ষেত্রে মানবাধিকারের ঘোষণা এই যে, এ গুলির বিচার হবে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারালয়ে এবং ন্যায্য ও প্রকাশ্য শুনানীর মাধ্যমে এবং এই বিচারের ভিত্তি হবে সমতা।

কার কি অধিকার এবং সে অধিকার কতখানি এবং কার কি কর্তব্য এবং সে কর্তব্য কতখানি এই প্রশ্নগুলি নির্ধারণের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে বিচারালয়ের উপর। একইভাবে অপরাধ

www.pathagar.com

নির্ধারিত হয়েছে কিনা তাও নির্ধারণের কাজ বিচারালয়ের উপর। বিচারালয়ের মর্যাদা তাই অতি উচ্চ ও সুমহান। বিচারালয়ে বিচার হবে প্রকাশ্যে ও ন্যায্য। এখানে স্থান নেই কোন আবেগের বা নিভৃতের। এখানে সকল মানুষকে জ্ঞান করা হবে সমান। বিচারালয়ের রাজা ও প্রজা, ধনী ও নির্ধন একই মর্যাদার অধিকারী।

একটি প্রবাদ আছে যে, বিচার শুধু নিরপেক্ষ হলেই চলবে না, এটি যে নিরপেক্ষভাবে নিষ্পন্ন হয়েছে তা প্রতীয়মান হতে হবে। বিচারকে নিরপেক্ষ প্রতীয়মান হতে হলে বিচারকে প্রকাশ্য হতে হবে।

বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থী সকল ব্যক্তির অধিকার আছে শুনানী লাভের। এ বিষয়ে সকল পক্ষের অধিকার সমান। এক পক্ষের কথা শুনে, বা সকল পক্ষকে শুনানীর সমান সুযোগ না দিয়ে বিচার করা মানবাধিকার ঘোষণা লঙ্ঘন বলে গণ্য হয়।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

(ক) যে কেউ দণ্ডযোগ্য কোন অপরাধে অভিযুক্ত হলে তার আত্মপক্ষ সমর্থনের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে, এমন প্রকাশ্য আদালত কর্তৃক আইন অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ বলে বিবেচিত হওয়ার অধিকার রয়েছে।

(খ) কাউকেই কোন কাজ বা ত্রুটির জন্য দণ্ডযোগ্য অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা চলবে না, যদি সংঘটনকালে তা জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য না হয়ে থাকে। আবার দণ্ডযোগ্য অপরাধ সংঘটনকালে যতটুকু শাস্তি প্রযোজ্য ছিল তার চেয়ে অধিক শাস্তি প্রয়োগ চলবে না।

Article : 11. (1) Everyone charged with a penal offence has the right to be persumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has all the guarantees necessary for his defence.

(2) No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or ommission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.)

www.pathagar.com

ভাষ্য

প্রথম উপ-অনুচ্ছেদ

আলোচ্য উপ-অনুচ্ছেদে দণ্ডযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকারের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই অনুচ্ছেদ মতে, দণ্ডযোগ্য কোন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির ততক্ষণ পর্যন্ত নির্দোষ বিবেচিত হওয়ার অধিকার রয়েছে, যতক্ষণ তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের নিশ্চয়তা দানকারী আদালত কর্তৃক আইন অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত না হবেন। এই বক্তব্যটুকু সুস্পষ্টরূপে বুঝে নিতে হলে আমাদেরকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ, আদালত এবং আইন অনুযায়ী কথাগুলো বিশ্লেষণ করতে হবে।

মানুষ অভিযুক্ত হয়, হতে পারে। অপরাধ করে যেমন অভিযুক্ত হয় তেমনি অপরাধ না করেও অভিযুক্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অভিযুক্ত হলেও যেমন কোন ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান করা হয় না তেমনি অভিযুক্ত হলেও মানুষ অপরাধী নয়। কোন ব্যক্তিকে তখনই দণ্ড প্রদান করা যায় যখন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়। অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী হতে পারে আবার নাও হতে পারেন। কোন নিরপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঈর্ষাবশত বা অসৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে কেউ অভিযোগ করতে পারে। অভিযুক্ত ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থন করে অভিযোগ খণ্ডনের চেষ্টা করবেন। এর পরও যদি আইন অনুযায়ী তিনি আদালতে দোষী সাব্যস্ত হন, আদালতে তার অভিযোগ প্রমাণিত হয় তাহলে তিনি দণ্ড পাবেন এবং তখনই তিনি অপরাধী বলে বিবেচিত হবেন। নিরপরাধ মানুষকে অপরাধী বলাই এক ধরনের দণ্ড। তাই কাউকে অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়া মাত্র অপরাধী বলা যাবে না। দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত নিরপরাধী বিবেচিত হওয়ার অধিকার দণ্ডযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত প্রতিটি ব্যক্তির রয়েছে।

আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ

আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ হচ্ছে অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকার। আত্মপক্ষ সমর্থন অর্থ হচ্ছে নিজের পক্ষ অবলম্বন করা। এটা হচ্ছে মানব প্রকৃতি। প্রকৃতিগতভাবেই মানুষ নিজের পক্ষ অবলম্বন করে। এমনকি নিতান্ত ব্যতিক্রম ছাড়া গুরুতর অপরাধীও নিজেকে নিরপরাধ প্রতিপন্ন করার প্রয়াস চালায়। অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি লাভের প্রয়াস চালানোর অধিকারই হচ্ছে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ। স্বাভাবিক অবস্থায় বিচারের ক্ষেত্রে এই অধিকার থাকে। যেখানে বিচারের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় সেখানে ন্যায়বিচার বিদ্যমান থাকে না।

সাধারণভাবে ফৌজদারি বিচারের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজকে মানুষের বাসযোগ্য করার জন্য অপরাধীকে শাস্তি প্রদান আর নিরপরাধকে অভিযোগ থেকে রেহাই দেওয়া, মুক্তি দেওয়া। যখন

www.pathagar.com

কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপন করা হয় তখন তাকে দোষী সাব্যস্ত করা অর্থাৎ তার দোষ প্রমাণ করা অভিযোগ উত্থাপকের দায়িত্ব। আবার ক্ষেত্রবিশেষে অভিযুক্ত ব্যক্তির দায়িত্ব হচ্ছে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করা। নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করতে হলে যে আইনগত সাহায্য ও সহযোগিতা দরকার সেটা বিচার ব্যবস্থায় আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থাকলেই সম্ভব। অভিযুক্ত ব্যক্তি মানেই অপরাধী নয় ; অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অপরাধী সাব্যস্ত করতে অনেকগুলো স্তর অতিক্রম করতে হয়, অনেকগুলো প্রক্রিয়া অবলম্বন করেই তবে অভিযুক্তকে অপরাধী অথবা নিরপরাধ সাব্যস্ত করা হয়।

পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি সভ্য দেশে ফৌজদারি বিচারের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সকল বিচারেরই পদ্ধতি রয়েছে, ফৌজদারি বিচারের পদ্ধতি হচ্ছে ফৌজদারি কার্যবিধি বা ক্রিমিন্যাল প্রসিডিউর। এতে ফৌজদারি আদালতের গঠন, এলাকা, ক্ষমতা, বিচারের পদ্ধতি ইত্যাদি লিপিবদ্ধ থাকে। অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সমন জারি, গ্রেফতারি পরওয়ানা, পলাতক আসামির বিরুদ্ধে হুলিয়া, ক্রোক, তল্লাশি, অভিযোগ প্রদান, মামলা আরম্ভ, সাক্ষ্য প্রমাণাদি উপস্থাপন ইত্যাদি ফৌজদারি কার্যপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। ফৌজদারি কার্যবিধি অনুসরণ করে বিচার অনুষ্ঠিত হলে অভিযুক্ত ব্যক্তির আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থাকে। অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য নিম্নোক্ত অবস্থা বিদ্যমান থাকা জরুরি।

এক : অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ হবে সুনির্দিষ্ট। কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ বা আনয়নের পর সেটা যথাযথভাবে তদন্ত করতে হয় এবং বিচারকের নিকট পেশ করতে হয়। তারপর আসে অভিযোগ প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করার কাজ। এটা বিচারপদ্ধতির অংশ। যারা অভিযোগ প্রমাণ করতে চান তারা যেমন সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করবেন তেমনি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তার নিজের কথা বলবার অধিকার প্রদান করতে হবে এটা তার মৌলিক অধিকার। এজন্য তিনি পছন্দমত সুদক্ষ উকিল নিয়োগ করতে পারবেন। যে আদালতে এই অধিকার প্রয়োগের সুযোগ আছে সেখানে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ বিদ্যমান আছে মনে করা যায়। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে None should be condemned unheard ল্যাটিন প্রবাদটিও এর কাছাকাছি, যার অর্থ হচ্ছে একতরফা বিচার কোন বিচারই নয়।

দুই : অপরাধ সংঘটনের ইচ্ছা, অপরাধের উদ্দেশ্য, অপরাধের সুযোগ ও সম্ভাব্যতা যাচাই ইত্যাদি বিষয়ও অভিযোগ প্রমাণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, জটিল ও বিতর্কিত বিষয়। এক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকার আছে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডনের জন্য দরকারি তথ্য হাজির করা। অভিযোগ থেকে মুক্তির জন্য, নিজেকে রক্ষা করার জন্য যে সব আলামত ও তথ্য পেশ করা সম্ভব সেগুলো উপস্থাপনের অধিকার না থাকলে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ আছে বলা যায় না। অভিযোগ খণ্ডনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপনের সুযোগ না দিলে অভিযুক্ত ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারবেন না।

www.pathagar.com

যার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে তার আত্মপক্ষ সমর্থন করার অধিকার ও সাক্ষি হওয়ার যোগ্যতা সম্পর্কে বাংলাদেশের আইনে ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৪০ ধারায় বিধান রয়েছে। নিম্নে তা পরিবেশিত হল :

(১) ফৌজদারি আদালতে কোন অপরাধে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তির অথবা আদালতে এই আইন অনুসারে যাহার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হইয়াছে তাহার একভোকেটের মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার থাকিবে।

(২) এইরূপ কোন আদালতে, যাহার বিরুদ্ধে ১০৭ ধারা বা দশম অধ্যায়, একাদশ অধ্যায়, দ্বাদশ অধ্যায় বা ছত্রিংশ অধ্যায় বা ৫৫২ ধারা অনুসারে মামলা রুজু করা হইয়াছে, সেই ব্যক্তি নিজে উক্ত মামলার সাক্ষি হিসেবে হাজির হইতে পারে।

(৩) কোন অপরাধের দায়ে ফৌজদারি আদালতে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তি আসামিপক্ষে সাক্ষি হওয়ার যোগ্য হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে বা তাহার সহিত একই মামলায় অভিযুক্ত অপর কোন আসামির বিরুদ্ধে প্রণীত অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য শপথ গ্রহণপূর্বক সাক্ষ্য দিতে পারিবে। তবে—

(ক) সেই ব্যক্তি নিজে লিখিতভাবে অনুরোধ না করিলে তাহাকে সাক্ষি হিসাবে ডাকা হইবে না; অথবা

(খ) সে সাক্ষি দিতে ব্যর্থ হইলে মামলার কোন পক্ষ বা আদালত সেই বিষয়ে কোন মন্তব্য করিতে পারিবে না, অথবা ইহা দ্বারা তাহার বিরুদ্ধে বা তাহার সহিত একই মামলায় অভিযুক্ত অপর কোন আসামির বিরুদ্ধে কোন অনুমানের উদ্ভব হইবে না।

তিন : বিচারাধীন মামলার আদালত সম্পর্কে অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকার রয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি মনে করেন, একটি বিশেষ আদালতে ন্যায়বিচার লাভের ব্যাপারে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত, তাহলে ন্যায়বিচার লাভের প্রত্যাশায় তিনি ঐ আদালত থেকে মামলা স্থানান্তর করার আবেদন করতে পারেন। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে আদালত মানেই ন্যায়বিচারের আধার। কিন্তু তারপরও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তার মানসিক তৃপ্তির জন্যই মামলা স্থানান্তরের অধিকার দিতে হবে। যে বিচার ব্যবস্থায় এই অধিকার রক্ষিত হয়, সেখানে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ আছে, আর যেখানে মামলা এক আদালত থেকে অন্য আদালতে স্থানান্তরের অধিকার নেই সেখানে অভিযুক্ত ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ নেই।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের আইনে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯১ ধারায় 'আসামির আবেদনক্রম মামলা স্থানান্তর' বিষয়ে যে বিধান রয়েছে নিম্নে তা পরিবেশিত হল ঃ

'যখন কোন ম্যাজিস্ট্রেট পূর্ববর্তী ধারার (১) উপধারার দফা (খ) অনুসারে কোন অপরাধ আমলে নেবেন তখন সাক্ষ্য গ্রহণের পূর্বে আসামিকে জানাইতে হইবে যে, সে অন্য কোন আদালতে তাহার মামলার বিচার পাওয়ার অধিকারী এবং আসামি অথবা একাধিক আসামি থাকিলে তাহাদের মধ্যে যে কোন একজন উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা বিচার অনুষ্ঠানে আপত্তি

www.pathagar.com

করিলে মামলাটি উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা বিচারের পরিবর্তে দায়রা আদালতে প্রেরণ করা হইবে অথবা অপর কোন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হস্তান্তর করা হইবে।'

চার : অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত অনুষ্ঠানে বিচারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মামলার তদন্তের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি এবং সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি রয়েছে। যে অভিযোগ তদন্তের জন্য যে পদমর্যাদার তদন্তকারী নিযুক্ত হওয়ার বিধান রয়েছে এবং যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করার কথা, কার্য ক্ষেত্রে সেটি অনুসৃত না হলে ন্যায়বিচার বিপন্ন হবে। আবার অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি মনে করেন তার মামলার তদন্তকারী ব্যক্তি কোন কারণে নিরপেক্ষ তদন্ত করছেন না তাহলে তিনি তদন্তকারী কর্মকর্তা পরিবর্তনের আবেদন করতে পারেন। এই অধিকার থাকলে ধরে নেওয়া হবে যে অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ আছে। অন্যথায় নয়।

পাঁচ : কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ অথবা অভিযোগ থেকে কাউকে মুক্তি দিতে [illegible] সাক্ষ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের ডাক্তারি সাক্ষ্য, রাসায়নিক পরীক্ষকের সাক্ষ্য ইত্যাদির গুরুত্ব অপরিসীম। রেজিস্ট্রেশন, উত্তরাধিকার, সম্পত্তি হস্তান্তর ইত্যাদি আইনের ক্ষেত্রেও সাক্ষির গুরুত্ব কম নয়। যাই হোক ফৌজদারি মামলার অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষের সাক্ষিগণ যাতে ভয়ভীতি ছাড়াই নির্বিঘ্নে সাক্ষি দিতে পারেন, সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত হলেও অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ আছে বলা যায়। সাক্ষিগণকে সাক্ষ্য দিতে বাধা দিলে, ভয় প্রদর্শন করলে, সাক্ষিগণের পক্ষে সত্যকথা বলা কঠিন হয়ে পড়ে। তখন অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থাকে না।

বস্তুত ফৌজদারি মামলার আসামি তথা অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হলে তিনি দোষী সাব্যস্ত হবেন, অপরাধী বিবেচিত হবেন। অপরাধী সাব্যস্ত হলে স্বাভাবিক নিয়মেই তার জন্য শাস্তি অবধারিত। অপরাধী শাস্তি পেলে তাতে কোন দুঃখবোধ থাকার কথা নয়। কিন্তু নিরপরাধ মানুষ যদি শাস্তি পায় তাহলে সেটা আইন এবং মানবতার জন্য লজ্জাজনক। তাই প্রতিটি অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থাকা উচিত। এই সুযোগ না দিয়ে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করে দণ্ড দেয়া বিনা বিচারে দণ্ড দেয়ারই নামান্তর। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দেয়া একটি অমানবিক কাজ। বিচারের ক্ষেত্রে এমনটি করা হলে বিচারকেই প্রহসন করা হয়।

তাই মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদের দাবি হচ্ছে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করার আগে তাকে প্রকাশ্য আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করতে হবে। সুবিচারের স্বার্থে এটা অত্যন্ত জরুরি।

www.pathagar.com

প্রকাশ্য আদালতে :

দণ্ডযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী বা নির্দোষ সাব্যস্ত করা হবে কোথায়? যে কেউ কি দোষী সাব্যস্ত করতে পারেন? নিশ্চয়ই নয়। অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী না নির্দোষ, সেটি প্রতিপন্ন করার স্থান হচ্ছে আদালত। ঘোষণাপত্রে ইংরেজি Public trial শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা বলতে পারি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত বিচারালয়। যে আদালতে দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে কারো কোন রকম হস্তক্ষেপ ছাড়াই বিচার অনুষ্ঠিত হয়, সেই আদালতেই অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার অনুষ্ঠিত হবে। আদালত হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন ব্যাখ্যাকারী সংস্থা। আদালতের কাজ হচ্ছে কোন অভিযোগের সত্যতা যাচাই এবং আইন অনুযায়ী সুবিচার করা। আদালতের মাধ্যমেই ব্যক্তি তার দেশের প্রচলিত আইনের বাস্তব ফলাফল এবং কার্যকারিতা অনুধাবন করতে পারেন। আদালতের মাধ্যমেই বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা এবং সুবিচার নিশ্চিত হতে পারে। আদালতের প্রতি মানুষ শ্রদ্ধাশীল হলে আইনের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল হবে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা আদালতের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার উপর নির্ভর করে। উল্লেখ্য আদালত বলতে বিশেষ কোন ভবনকে বোঝায় না। আদালত হচ্ছে বিচারসংশ্লিষ্ট কতিপয় জীবন্ত মানুষের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানও দেশের আইন অনুযায়ী গড়ে ওঠে। পৃথিবীর সকল দেশের বিচার কাঠামো অভিন্ন না হলেও এদের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে। আদালতের গঠন, ক্ষমতা, কার্যাবলি ইত্যাদি কার্যবিধিতে সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে। এই বিধি মোতাবেক আদালত গঠিত হয়।

বাংলাদেশের আদালত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ষষ্ঠভাগে বিচার বিভাগের গঠন ক্ষমতা ও কার্যাবলি বর্ণিত হয়েছে। এর ১ম পরিচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্ট সম্পর্কে বিধান রয়েছে, ২য় পরিচ্ছেদে রয়েছে অধঃস্তন আদালত সম্পর্কিত বিধানাবলি। প্রাসঙ্গিক বিধায় নিম্নে তা পরিবেশিত হলো ঃ

বাংলাদেশের আইনে ফৌজদারি কার্যবিধিতে ফৌজদারি আদালত ও অফিসের গঠন সম্পর্কে বিধান রয়েছে। নিম্নে তা পরিবেশিত হল।

ফোজদারি আদালত ও অফিসের গঠন সম্পর্কে ঃ

ক. ফৌজদারি আদালতের শ্রেণিবিভাগ

ধারা ৬। ফৌজদারি আদালতের শ্রেণিবিভাগ। সুপ্রিমকোর্ট ও এই আইন ছাড়া বর্তমানে বলবৎ অন্যকোন আইন দ্বারা গঠিত আদালত ব্যতীত বাংলাদেশে পাঁচ প্রকার ফৌজদারি আদালত থাকিবে, যথা :

১. দায়রা আদালত।

২. মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটগণ।

৩. প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটগণ।

www.pathagar.com

৪. দ্বিতীয় শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটগণ।

৫. তৃতীয় শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটগণ।

খ—আঞ্চলিক বিভাগ

ধারা : ৭ দায়রা বিভাগ ও জিলাসমূহ। — (১) বাংলাদেশে কতিপয় দায়রা বিভাগ থাকিবে এই আইনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি দায়রা বিভাগ একটি জিলা অথবা একাধিক জিলা লইয়া গঠিত হইবে।

বিভাগ ও জিলা পরিবর্তনের ক্ষমতা। — (২) সরকার এইরূপ বিভাগ ও জিলার সীমা অথবা সংখ্যা পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান বিভাগ ও জিলা বজায় থাকিবে। — (৩) এই আইন বলবৎ হওয়ার সময় যে সকল দায়রা বিভাগ ও জিলা বিদ্যমান ছিল উক্তরূপে পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত সেই সকল দায়রা বিভাগ ও জিলা বহাল থাকিবে।

(৪) এই কার্যবিধির উদ্দেশ্যে একটি মেট্রোপলিটান এলাকা দায়রা বিভাগ হিসাবে পরিগণিত হইবে।

গ—আদালত এবং অফিসসমূহ

ধারা : ৯। দায়রা আদালত। — (১) সরকার প্রত্যেকটি দায়রা বিভাগের জন্য একটি করিয়া দায়রা আদালত স্থাপন করিবেন। এবং এই আদালতে একজন জজ নিয়োগ করিবেন এবং মেট্রোপলিটান এলাকার দায়রা আদালতকে মেট্রোপলিটান দায়রা আদালত বলা হইবে।

(২) সরকার সরকারি গেজেটে সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশ জারি করিয়া দায়রা আদালত কোথায় বা কোন কোন স্থানে বসিবে, সেই সম্পর্কে নির্দেশ দিতে পারিবেন কিন্তু এইরূপ আদেশ না হওয়া পর্যন্ত দায়রা আদালতসমূহ পূর্বের ন্যায় বসিবে।

(৩) এইরূপ এক বা একাধিক আদালতে কার্য করার জন্য সরকার অতিরিক্ত দায়রা জজ ও সহকারী দায়রা জজও নিয়োগ করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটকে ২৯ গ ধারা অনুসারে কোন অপরাধের বিচার করার বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জিলা যে দায়রা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত , তথাকার সকল সহকারী দায়রা জজ ঐ দায়রা বিভাগের অতিরিক্ত দায়রা জজ নিযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৪) সরকার এক দায়রা বিভাগের দায়রা জজকে অপর একটি বিভাগের অতিরিক্ত দায়রা জজও নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং এইরূপ ক্ষেত্রে তিনি সরকারের নির্দেশ অনুসারে দুইটি বিভাগের যে কোন একটির এক বা একাধিক স্থানে বসিয়া মামলার নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

www.pathagar.com

(৫) এই আইন বলবৎ হওয়ার সময় যে সকল দায়রা আদালত বিদ্যমান ছিল তাহার সবগুলিই এই আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

ধারা ১০ । (১) জিলা ম্যাজিস্ট্রেট। —

(১) মেট্রোপলিটান এলাকার বাইরে সরকার প্রত্যেক জিলায় একজন করিয়া প্রথম শেণির ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করিবেন, যিনি জিলা ম্যাজিস্ট্রেট নামে অভিহিত হইবেন।

(২) সরকার যে কোন প্রথম শেণির ম্যাজিস্ট্রেটকে অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা যুগ্ম জিলা ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করিতে পারিবেন। এবং এইরূপ অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা যুগ্ম জিলা ম্যাজিস্ট্রেট সরকারের নির্দেশ অনুসারে এই আইন অথবা বর্তমানে বলবৎ অপর কোন আইন অনুযায়ী জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের যে-কোন অথবা সকল ক্ষমতা লাভ করিবেন।

(৩) ১৯২ ধারার (১) উপধারা, ৪০৭ ধারা (২) উপধারা এবং ৫২৭ ধারা (২) ও (৩) উপধারার উদ্দেশ্যে এইরূপ অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা যুগ্ম জিলা ম্যাজিস্ট্রেট জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধঃস্তন বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

ধারা ১১। জিলা ম্যাজিস্টেটের শূন্য পদে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত অফিসার। —জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের পদ শূন্য হওয়ার ফলে কোন অফিসার অস্থায়ীভাবে তদস্থলে জিলার প্রধান নির্বাহী প্রশাসক নিযুক্ত হইলে, সরকারের আদেশ সাপেক্ষে তিনি এই আইন দ্বারা জিলা ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও সকল কর্তব্য সম্পাদন করিবেন।

ধারা-১২। অধঃস্তন ম্যাজিস্ট্রেটগণ। — (১) সরকার উপযুক্ত মনে করিলে মেট্রোপলিটান এলাকার বাহিরে কোন জিলায় জিলা ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়াও যে কোন সংখ্যক ব্যক্তিকে প্রথম, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শেণির ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবেন; এবং এই আইন অনুসারে তাহাদিগকে যে ক্ষমতা দেওয়া হইবে সরকার অথবা সরকারের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে জিলা ম্যাজিস্ট্রেট বিভিন্ন সময়ে সেই সকল বা যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগের স্থানীয় এলাকা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

তাহাদের অধিক্ষেত্রের স্থানীয় সীমা। — (২) অনুরূপ সংজ্ঞা দ্বারা অন্যরূপে নির্ধারিত না হইলে এই সকল ব্যক্তির অধিক্ষেত্র ও ক্ষমতা এইরূপ সমস্ত জিলায় সম্প্রসারিত হইবে।

ধারা ১৩। ম্যাজিস্ট্রেটের উপর মহকুমার দায়িত্ব অর্পণের ক্ষমতা । — (১) সরকার প্রথম অথবা দ্বিতীয় শেণির কোন ম্যাজিস্ট্রেটের উপর কোন মহকুমার দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারিবেন। এবং প্রয়োজনবোধে এই দায়িত্ব হইতে তাহাকে অব্যাহতি দিতে পারিবেন।

(২) এইরূপ ম্যাজিস্ট্রেটগণ মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট নামে অভিহিত হইবেন।

www.pathagar.com

জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের উপর ক্ষমতা অর্পণ। (৩) সরকার এই ধারায় বর্ণিত নিজ ক্ষমতা জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের উপর অর্পণ করিতে পারিবেন।

১৩ ক থানা ম্যাজিস্ট্রেট। —(১) সরকার যে কোন প্রথম বা দ্বিতীয় শেণির ম্যাজিস্ট্রেটকে একটি থানায় নিযুক্ত করিতে পারেন এবং এইরূপ ম্যাজিস্ট্রেটকে থানা ম্যাজিস্ট্রেট বলা হইবে।

(২) একজন থানা ম্যাজিস্ট্রেট এই কার্যবিধি অনুযায়ী মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রদত্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন।]

[১৯৮২ সনের ৬০ নং অধ্যাদেশ অনুযায়ী সন্নিবেশিত]

ধারা–১৪। বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেটগণ। (১) কোন বিশেষ মামলা বা বিশেষ শেণির মামলা সংক্রান্ত, অথবা মেট্রোপলিটান এলাকা বহির্ভূত কোন স্থানীয় এলাকার সাধারণভাবে সকল মামলা সংক্রান্ত, যে সকল ক্ষমতা অত্র কার্যবিধি অনুসারে কোন প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় শেণির ম্যাজিস্ট্রেটের উপর অর্পিত বা অর্পণ যোগ্য আছে, সরকার তাহার সবগুলি বা যে কোন ক্ষমতা যে–কোন ব্যক্তির উপর অর্পণ করিতে পারেন।

(২) এইরূপ ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট নামে অভিহিত হইবেন এবং সরকারের সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশে নির্ধারিত মেয়াদের জন্য নিযুক্ত হইবেন।

(৩) সরকার যেরূপ শর্ত উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করেন, সেরূপ শর্ত সাপেক্ষে (১) উপধারায় বর্ণিত ক্ষমতা স্বীয় নিয়ন্ত্রণাধীন কোন অফিসারের উপর অর্পণ করিতে পাবিবেন।

(৪) সহকারী জিলা সুপারিনেটেনডেন্টের নিম্নপদের কোন পুলিস অফিসারের উপর এই ধারা অনুসারে কোন ক্ষমতা অর্পণ করা যাইবে না, এবং শান্তিরক্ষা, অপরাধ দমন ও ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আনয়নের উদ্দেশ্যে, অপরাধীদের সন্ধান, গ্রেফতার ও আটক এবং বর্তমানে বলবৎ কোন আইন দ্বারা অর্পিত অন্যান্য কর্তব্য সম্পাদনের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, তাহা ব্যতীত অন্য কোন ক্ষমতা কোন পুলিশ অফিসারকে দেওয়া যাইবে না।

ধারা ১৫। ম্যাজিস্ট্রেটগণের বেঞ্চ।

(১) মেট্রোপলিটান এলাকার বাহিরে কোন স্থানে দুইজন অথবা ততোধিক সংখ্যক ম্যাজিস্ট্রেটকে একত্রে বেঞ্চ গঠনের নির্দেশ সরকার দিতে পারেন এবং আদেশ দ্বারা এই বেঞ্চকে এই বিধি অনুসারে প্রথম দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শেণির ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রদত্ত অথবা প্রদেয় ক্ষমতা দিতে পারেন এবং যেই সকল মামলা অথবা যেই সকল শেণির মামলা বা যেই সকল স্থানীয় এলাকা সরকার উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন সেই সকল মামলায় অথবা সেই সকল শেণির মামলায় বা স্থানীয় এলাকায় উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগের নির্দেশ সরকার দিতে পারে।

(২) এই ধারা অনুসারে প্রদত্ত কোন আদেশ দ্বারা অন্যরূপ বিধান না করা হইয়া থাকিলে বেঞ্চের বর্তমান কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের মধ্যে সর্বোচ্চ শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটকে এই

www.pathagar.com

বিধি দ্বারা যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, বেঞ্চের সেই ক্ষমতা থাকিবে এবং আইনের উদ্দেশ্যে বেঞ্চকে যথাসম্ভব উক্ত শেণির ম্যাজিস্ট্রেট বলিয়া গণ্য হইবে।

ধারা ১৬ । বেঞ্চসমূহের পথ নির্দেশনার জন্য বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা। — (১) সরকার অথবা সরকারের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে কোন জিলার ম্যাজিস্ট্রেট বেঞ্চের পথ নির্দেশের উদ্দেশ্যে এই কার্যবিধির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বিভিন্ন সময়ে নিম্নলিখিত বিষয়ে বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(ক) বিচার্য মামলার শেণি ;

(খ) বৈঠকের সময় ও স্থান ;

(গ) বিচারের জন্য বেঞ্চ গঠন

(ঘ) বৈঠকে উপস্থিত ম্যাজিস্ট্রেটগণের মধ্যে কোন মতবিরোধ দেখা দিলে তাহা মীমাংসার পদ্ধতি।

ধারা ১৭। ম্যাজিস্ট্রেটগণও বেঞ্চসমূহকে জিলা ও মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে রাখার ব্যবস্থা। — (১) ১২, ১৩ ও ১৪ ধারা অনুসারে নিযুক্ত সমস্ত ম্যাজিস্ট্রেট ও ১৫ ধারা অনুসারে গঠিত সমস্ত বেঞ্চ জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধঃস্তন হইবে এবং তিনি ম্যাজিস্ট্রেটবৃন্দ ও বেঞ্চসমূহের মধ্যে কাজ বন্টনের জন্য এই কার্যবিধির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বিভিন্ন সময়ে বিধিমালা প্রণয়ন করিতে অথবা বিশেষ আদেশ জারি করিতে পারিবেন ; এবং

(২) মহকুমায় কার্যরত প্রত্যেকটি ম্যাজিস্ট্রেট (মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট ব্যতীত) ও প্রত্যেকটি বেঞ্চ মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের অধঃস্তন হইবেন। তবে জিলা ম্যাজিস্ট্রেটের সাধারণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকিবে।

সরকারী দায়রা জজকে দায়রা জজের অধীনে রাখা। —

(৩) সহকারী দায়রা জজগণ যে যে দায়রা জজের আদালতে এখতিয়ার প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহারা সেই সেই দায়রা জজের অধঃস্তন হইবেন এবং দায়রা জজ তাহার অধঃস্তন সহকারী দায়রা জজদের কার্যবন্টনের জন্য এই কার্যবিধির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বিভিন্ন সময়ে বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(৪) দায়রা জজ নিজে বিশেষ কারণবশত অনুপস্থিত থাকিলে অথবা কার্যসম্পাদন করিতে অক্ষম হইলে কোন অতিরিক্ত অথবা সহকারী দায়রা জজ, অথবা অতিরিক্ত অথবা সহকারী দায়রা জজ না থাকিলে জিলা ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা কোন জরুরি আবেদনপত্রের নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করিতে পারিবেন, এবং এইরূপ জজ অথবা ম্যাজিস্ট্রেটের উক্ত আবেদনপত্র সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের অধিক্ষেত্র থাকিবে।

www.pathagar.com

(৫) এই আইনে অতঃপর স্পষ্টভাবে উল্লেখিত পরিমাণ ও পদ্ধতিতে ছাড়া ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ ধারা অনুযায়ী নিযুক্ত অথবা গঠিত জিলা ম্যাজিস্ট্রেট, ম্যাজিস্ট্রেটগণ অথবা বেঞ্চসমূহের কেহই দায়রা জজের অধঃস্তন হইবে না।

ধারা-১৮। মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ। —

(১) একটি মেট্রোপলিটান এলাকায় সরকার এই কার্যবিধির উদ্দেশ্যে একজন চীফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করিবেন এবং অন্য কয়েকজন মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করিবেন।

(২) সরকার একজন বা একাধিক অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং উক্ত চীফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটগণ অত্র কার্যবিধি অনুসারে বা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইন অনুসারে সরকারের নির্দেশমত চীফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটের সকল ক্ষমতা বা যে কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন।

(৩) সরকার অত্র কার্যবিধি অনুসারে যে কোন বিশেষ মামলা বা বিশেষ শেণির মামলাসমূহ সম্পর্কে অথবা মেট্রোপলিটান এলাকার বা উহার কোন অংশের সাধারণ মামলাসমূহ সম্পর্কে মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটের সকল বা যে কোন ক্ষমতা যে কোন ব্যক্তিকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

আইন অনুযায়ী

যখন কোন ব্যক্তি দণ্ডযোগ্য কোন অপরাধে অভিযুক্ত হন তখন তার বিরুদ্ধে বিচার অনুষ্ঠিত হয়। বিচার হয় আদালতে। আদালতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এতে অভিযুক্ত ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ পাবেন। প্রশ্ন হচ্ছে, কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন, সেই ব্যক্তির অভিযোগের বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ, বিচার, অভিযোগ প্রমাণ, ইত্যাদি কিসের ভিত্তিতে হবে? এসবই হবে আইনের ভিত্তিতে। দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী বিচার অনুষ্ঠিত হবে।

আইন কাকে বলে? এ নিয়ে বিভিন্ন অনুচ্ছেদে আলোচনা হয়েছে। এখানে আমরা সংক্ষেপে আইনের দুই একটি সংজ্ঞা আলোচনা করবো।

জন আরস্কিন (John Erskine) বলেন, নাগরিকের প্রতি বাধ্যকর সার্বভৌম শক্তির সাধারণ আদেশকে আইন বলে। হবস (Hobbes) বলেন, দেশের সকল মানুষের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ শক্তি যে আদেশ দেয় তাকেই আইন বলে। বিশিষ্ট আইন দার্শনিক স্যামন্ড বলেন, আইন হচ্ছে ন্যায় প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও প্রয়োগকৃত নীতিমালা। ইহরিং বলেন, আইন হচ্ছে সমাজ জীবনের ঐ সকল অবস্থার সমষ্টি যা বাধ্যতামূলক বাহ্যিক পন্থা অবলম্বনে রাষ্ট্রশক্তি কর্তৃক সংরক্ষিত হয়। কিটন (Keeton) বলেন, আইন হচ্ছে একটি

www.pathagar.com

রাজনৈতিক সমাজের নির্ধারিত অঙ্গ সমূহের দ্বারা প্রয়োগকৃত এবং উক্ত সমাজের আধিপত্যশীল রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাধীনে এবং তার ন্যায়পরতার ধারণার ভিত্তিতে অথবা যাদের উপর বিধি প্রণয়নের ভার অর্পিত হয়েছে তাদের ন্যায়পরতার সাধারণ ভিত্তিতে আরোপিত আচরণবিধি।

ভিনোগ্রাডফ (Vinogradoff) বলেন, আইন হচ্ছে ক্ষমতার বণ্টন ও প্রয়োগ সম্পর্কে কতিপয় বিধি যা সমাজ কর্তৃক মনুষ্য ও দ্রব্যের প্রতি আরোপিত ও বলবৎ করা হয়। পাউণ্ড (Pound) বলেন, আইন হচ্ছে ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সরকারি স্থায়ী আদালত কর্তৃক স্বীকৃত ও বলবৎকৃত কতিপয় নীতিমালা। গ্রিন বলেন, আইন হচ্ছে, এক ধরনের অধিকার ও বাধ্যবাধকতা যা রাষ্ট্র বলবৎ করে। ব্লাকস্টোন (Blacksone) বলেন, অতি সাধারণ ও ব্যাপক অর্থে আইন হচ্ছে কার্যের নিয়ম এবং যা জীবন অথবা জড়, যুক্তিসঙ্গত অথবা অযৌক্তিক কর্ম নির্বিশেষে প্রয়োজন। হল্যান্ড (Holland) বলেন, আইন হচ্ছে সার্বভৌম রাজনৈতিক কর্তপক্ষ কর্তৃক আরোপিত মানুষের বাহ্যিক আচরণ সম্পর্কিত সাধারণ বিধি। আইনের সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে যিনি সর্বাধিক পরিচিত তিনি হচ্ছেন জন অস্টিন।

অস্টিন সাধারণভাবে একমাত্র রাষ্ট্রপ্রধানের আদেশকে আইন হিসেবে বিবেচনা করতেন। আদেশভিত্তিক আইনের প্রকৃতিই এই যে, তা প্রণয়ন এবং কার্যকরী করার জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তি সমষ্টি থাকবে এবং আইন অমান্যকারীর জন্য শাস্তির ব্যবস্থা তাতে থাকবে। আস্টিনের উদ্দেশ্য ছিল অস্তিবাচক আইনকে সামাজিক আচার বা নীতিবাচক নিয়মাবলী হতে পৃথকীকরণ করা। আদেশমূলক ভিত্তির উপর জোর দেওয়াতে এই উদেশ্য সাধিত হয়। কেননা সামাজিক রীতিনীতি কোন ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক নির্দিষ্ট হয় নাই। তাই অস্টিনের মতে, অস্তিবাচক আইনের বিজ্ঞান হচ্ছে আইন দর্শন।

অস্টিন আইনকে কর্তৃপক্ষের আদেশ হিসেবে জোর দেওয়ায় তার দৃষ্টি পরিণত বা সভ্যদেশের কাঠামোর দিকে নিবদ্ধ রইল। কেননা এটা বুঝতে কষ্ট হয় না যে, রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক আইনকে চালু করবার জন্য কার্যকরী রাষ্ট্রযন্ত্র সে সকল রাষ্ট্রেরই সম্ভব যেগুলি উন্নতির বেশ কিছুটা উচ্চস্তরে উন্নীত হয়েছে। অবশ্য আইন কোন স্থিতিশীল নির্দেশের সমষ্টি নয়। বরং আইন কতিপয় জীবন্ত নীতির সমষ্টি যা অন্তনির্হিত শক্তির গুণে বেড়ে চলতে পারে। যে আইন চালু আছে এবং অস্টিনের অন্তবর্তীরা যে চালু আইনকে কেবল মাত্র আইন দর্শনের আলোচনার বিষয়বস্তু বলে গর্ব করেন, তাকে খুব সুক্ষ্মভাবে, যে আইন চালু হওয়া উচিৎ তা হতে পৃথক করা সম্ভব নয়। কেননা যেখানে আইনের স্পষ্ট নির্দেশ নাই সেখানে বিচারকগণ অনবরত তাদের মতে, যা আইন হওয়া উচিত তাকে অস্তিবাচক আইনের পোষাকে সজ্জিত করেছেন। বাস্তবিক পক্ষে আইনের উপাদান বিচারক কোথা হতে সংগ্রহ করবেন? আদেশভিত্তিক নীতির অনুসারীদের কেউ কেউ প্রকারান্তরে ধরে নেন যে, চলিত আইনের বিশ্লেষণ এবং উপাদান (Deduction) দ্বারা আইনঘটিত সমস্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব।

www.pathagar.com

কিন্তু সামান্য চিন্তা করলেও প্রতীত হবে যে, এই ধারণা অত্যন্ত ভ্রান্তিজনক। ইংল্যান্ডের সাধারণ আইনের নীতিগুলি পূর্ণায়বে আকাশ হতে অবতরণ করে নি। এমনকি আমরা এও বলতে পারি না যে আইনের পরিবর্ধন শেষ হয়েছে। অতিমাত্রায় যারা অস্তিত্ববাদী তাদের খেয়াল থাকে না যে, আইন কেবলমাত্র যুক্তি বা বিশ্লেষণের মাধ্যমেই পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয় না বরং আইন ক্রমে ক্রমে এর নিজস্ব রূপটি পরিবর্তন করে সমাজ জীবনের পরিবর্তনশীল মূল্যবোধের মাধ্যমে। এভাবে বর্তমানের আইনের আকৃতি আমাদের সম্মুখে পাচ্ছি। বস্তুত আইন হচ্ছে প্রচলিত প্রথা এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ।

বস্তুত কোন ব্যক্তি যখন দণ্ডযোগ্য কোন অপরাধে অভিযুক্ত হন তখন দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে সাধারণ বিচারালয়ে তার বিচার অনুষ্ঠিত হবে। বিচারে আইন সম্মত উপায়ে আত্মপক্ষ সর্থনের সকল সুযোগ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দেওয়া হবে। এতে যদি অভিযোগ প্রমাণিত হয় ,তাহলে অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী বা অপরাধী বিবেচিত হবেন। কিন্তু যতক্ষণ তিনি দোষী সাব্যস্ত না হবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত নিরপরাধী বিবেচিত হওয়ার অধিকার তার রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মপক্ষ সমর্থনের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে এমন আদালত কর্তৃক আইন অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত না হবেন ততক্ষণ পর্যন্ত নির্দোষ বিবেচিত হওয়ার অধিকার দণ্ডযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত প্রতিটি ব্যক্তির রয়েছে। এই বক্তব্য অনুসারে সাধারণত মানুষ ভাল এবং নিরপরাধ--এটাই ধরে নেওয়া হয়। এর পর যদি মানুষের বিরুদ্ধ আনীত অভিযোগ প্রকাশ্য আদালতে প্রমাণিত হয় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সকল সুযোগ দেওয়ার পরও প্রমাণিত হয় যে অভিযুক্ত ব্যক্তি সত্যি সত্যিই দোষী তাহলেই কেবল দোষী বলা যাবে। অভিযুক্ত ব্যক্তি মানেই দোষী বিবেচনা করা মানবাধিকারের পরিপন্থী।

উপঅনুচ্ছেদ খ

আলোচ্য অনুচ্ছেদে দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে আদালতের একটি সীমাবদ্ধতার কথা বলা হয়েছে। সীমাবদ্ধতা হচ্ছে এরকম, কোন ব্যক্তিকে এমন একটি অভিযোগে দণ্ড দেওয়া হচ্ছে , যে বিষয়টি বিচার অনুষ্ঠানের সময়ে আইন অনুযায়ী দোষ এবং দণ্ডযোগ্য অপরাধ কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি যখন ঐ কাজটি সংগঠিত করে তখন তা অপরাধ ছিল না। আইনের সংশোধন বা নতুন আইন তৈরি হওয়ার কারণে এমনটি হতে পারে। একসময়ে আইনে যা দোষের ছিল না সময়ের পরিবর্তনে সেটা দোষের বিবেচিত হতে পারে। আইনের এই পরিবর্তন স্বাভাবিক ও সঙ্গত। কিন্তু পূর্বে দোষের ছিল না এবং ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময় অপরাধমূলক কাজ বিবেচিত হতো না এমন কাজের জন্য পরে কাউকে দণ্ড দেওয়া যাবে না। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা আদালতের প্রতি এই সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছে।

সময় দ্রুত বদলাচ্ছে, পরিবর্তন হচ্ছে সমাজের। এই পরিবর্তনের প্রভাব পড়ছে আইনের উপর। মানুষের মূল্যবোধের পরিবর্তন, মানবিক চেতনার বিকাশ ইত্যাদির কারণে অনেক

www.pathagar.com

পুরাতন আইন রদবদল হচ্ছে, নতুন আইন প্রণীত হচ্ছে। এর ফলে এটা খুব স্বাভাবিক যে একসময় যে কাজটি অপরাধ বলে গণ্য হতো না, এখন সেটা অপরাধ মনে করা হতে পারে। আবার এর বিপরীতও হতে পারে । তাই কার্য সংঘটনকালে যেটি অপরাধ গণ্য হতো না সে কাজের জন্য পরে শাস্তি দেওয়া যাবে না। দিলে সেটাকে শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন মনে করা যেতে পারে।

যখন কোন অপরাধমূলক কার্য সংঘটিত হয়, তখন সে কাজটি যদি কোন দেশের জাতীয় আইনে অথবা আন্তর্জাতিক আইনে অপরাধ বলে বিবেচিত হয়, তাহলে সেই অপরাধ প্রমাণিত হলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান করা যাবে। কিন্তু কার্যটি যখন সংঘটিত হয় তখন সেটা জাতীয় বা আন্তর্জাতিক কোন আইনেই অপরাধ ছিল না, পরে অপরাধ বিবেচিত হয়েছে, এমন কাজের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান করা যাবে না।

যেমন ভারত উপমহাদেশে একসময় বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না বা অপরাধ বিবেচিত হতো না। সামাজিক সচেতনতার কারণে পরবর্তীকালে বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ হয়। বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার অব্যবহিত আগে অনেক জ্ঞানীগুণী লোকও বাল্যে বিবাহ করেছেন। বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ আইনটি প্রণীত ও গৃহীত হওয়ার পর যদি ইতিপূর্বে যারা বাল্যবিবাহ করেছেন তাদের দণ্ড দিতে শুরু করা হয় তাহলে কাজটি যথার্থ হবে না। কারণ তখন এ বিষয়ে আইন ছিল না, আইন ভঙ্গ করার প্রশ্নই উঠে না।

অতএব দণ্ডযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে দেখতে হবে অভিযুক্ত ব্যক্তি যখন অপরাধমূলক কাজটি সম্পাদন করেছিল তখন সে সময়কার আইনে সেটা দণ্ডনীয় বা অপরাধমূলক কাজ ছিল কি না। তখন যদি সেটা অপরাধ বলে বিবেচিত না হয়ে থাকে তাহলে এই অভিযোগে দণ্ড প্রদান করা যাবে না।

দ্বিতীয় সীমাবদ্ধতা হচ্ছে শাস্তির পরিমাণ বিষয়ক। এই বিষয়টি আলোচনার পূর্বে শাস্তির প্রকৃতি ও বিবর্তন সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোকপাত করছি।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে, শাস্তি হলো প্রতিশোধ গ্রহণের প্রবৃত্তির ফল। অপরাধ নিঃসন্দেহে দেশ ও জাতির এবং সমাজের শান্তি নষ্ট করছে। সমাজ ও দেশের বাসিন্দাদের ক্ষতি করছে। তাই মনে করা হয় সমাজের সমতা নিশ্চিত করতে পারে এমন সব দণ্ড বিধায়ক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ এবং দরকার। প্রতিশোধ নিলে সমাজের সমতা অনেকটা নিশ্চিত হয়।

শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অপরাধীর প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণের প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত, সব সময় এমন কথাও ঠিক নয়। শাস্তি হলো আইনভঙ্গের অনেকগুলো প্রতিক্রিয়ার মধ্যে একটি। প্রাচীন সমাজে অপরাধের প্রতিশোধমূলক প্রতিক্রিয়া হিসাবে এই প্রকৃতি মোটেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

প্রাচীন সমাজে তিন ধরনের মন্দ কর্মের জন্য তিন ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা যেত। এগুলোর একটিও দণ্ড বিধায়ক নয়। প্রথমটি ছিল গোষ্ঠীগত ও ধর্মীয় অপরাধ। যাদুকরণ, পবিত্রতা

www.pathagar.com

লঙ্ঘন, বিষ প্রয়োগ ইত্যাদি জাতীয় অপরাধের জন্য অপরাধীকে সম্পূর্ণ ধ্বংসে সাধন, হত্যা বা নির্বাসিত করা হত। দ্বিতীয় প্রকার মন্দ কর্ম হল পরিবারভুক্ত নয় এমন ব্যক্তির ক্ষতিসাধন করা। এসব অপরাধ বর্তমানকালের হত্যা ও মারধোরের সমতুল্য। এসব অপরাধের শাস্তিও ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা। তৃতীয় প্রকারের মন্দকর্ম হল দুষ্কৃতকারী কর্তৃক একই পরিবারের অন্যান্য সদস্যের ক্ষতিসাধন করা। তখনকার দিনে এসব অপরাধকে তেমন আমলে আনা হতো না। এজন্য কোনো শাস্তিও দেয়া হতো না। পরিবারের উপহাস আর বিদ্রুপই ছিল এসব অপরাধ নিয়ন্ত্রণের কার্যকর পদ্ধতি। প্রাচীন সমাজে সন্তান কর্তৃক পিতৃহত্যা একটি জঘন্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হলেও গোত্র বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা হত্যাকারীকে শাস্তি দিত না। পরিবারের সদস্যরা মনে করতো পরিবারের একজন সদস্য খোয়া যাওয়াতে ইতিমধ্যেই পরিবার দুর্বল হয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় অপরাধীকে শাস্তি দিয়ে পরিবারকে আরো দুর্বল করা নির্বুদ্ধিতার শামিল। তবে এ ধরনের অপকর্মে তারা বিস্ময় ও বিরক্তি প্রকাশ করত।

রাজতন্ত্রের যুগে রাজশক্তির অভ্যুদয়ের সাথে সাথে অপরাধীকে আইনের অধীনে সমর্পণ করা সরকারি নীতি হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে আদালতের সৃষ্টি হয় এবং সরকার এর পৃষ্ঠপোষকতা করে ।কালক্রমে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করাটা ব্যক্তির আওতা থেকে সমষ্টিগত বা সামাজিক পর্যায়ে বিস্তৃত হয়। অন্যায়কে অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হল এবং অপরাধ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও দলের যৌথ স্বার্থের বিষয় হয়ে দাঁড়াল। অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করে দল তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে ।

আধুনিক যুগের প্রারম্ভে অপরাধীকে শাস্তি দেয়া জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সামাজিক প্রতিক্রিয়ার এবং এর সাথে জড়িত নীতিমালা ও পদ্ধতি সংক্রান্ত বিতর্কের প্রেক্ষিতে শাস্তিদান ও কারা পরিচালনা বিষয়ক বিভিন্ন মতবাদেরও উদ্ভব হয়।

আইন ভঙ্গের সাধারণ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে শাস্তি। শাস্তি বা দণ্ড প্রয়োগে স্থান ও কালভেদে তারতম্য ঘটে। শাস্তি বাস্তবায়নের জন্য মানবেতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রধানত সাতটি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এগুলো হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড, নির্বাসন, কারাদণ্ড, শারীরিক নির্যাতন, সামাজিক মর্যাদা হরণ, অর্থদণ্ড এবং ক্ষতিপূরণ। বিবর্তনের ধারায় এদের একটি থেকে আরেকটির উদ্ভব ঘটেনি।

অপরাধের ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে। আইনের পরিবর্তন আসছে, সেই সাথে পরিবর্তন হচ্ছে শাস্তির পরিমাণ ও পদ্ধতির। কোন অপরাধ যখন সংঘটিত হয় তখন ঐ অপরাধের জন্য যে পরিমাণ শাস্তির বিধান থাকে সংশ্লিষ্ট অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিকে শুধু সেই পরিমাণ দণ্ড দেওয়া যাবে। অপরাধ সংঘটনকালে অপরাধের জন্য যে পরিমাণ শাস্তি নির্ধারিত ছিল পরবর্তীতে উক্ত অপরাধে দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদানে ভিন্নতা করা যাবে না।

www.pathagar.com

আলোচ্য অনুচ্ছেদ ও বাংলাদেশের সংবিধান মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৫ নং অনুচ্ছেদের সামঞ্জস্য রয়েছে। নিম্নে তা পরিবেশিত হল ঃ

অনুচ্ছেদ ৩৫

(১) অপরাধের দায়যুক্ত কার্য সংঘটন কালে বলবৎ ছিল, এইরূপ আইন ভঙ্গ করিবার অপরাধ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে না। এবং অপরাধ সংঘটনকালে বলবৎ সেই আইন বলে যে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারিত, তাহাকে তাহার অধিক বা তাহা হইতে ভিন্ন দণ্ড দেওয়া যাইবে না।

(২) এক অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে একাধিকবার ফৌজদারিতে সোপর্দ ও দণ্ডিত করা যাইবে না।

(৩) ফৌজদারি অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক বক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইবুন্যালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচার লাভের অধিকারী হইবেন।

(৪) কোন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাইবে না।

(৫) কোন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাইবে না কিংবা নিষ্ঠুর অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেওয়া যাইবে না কিংবা কাহারও সহিত অনুরূপ ব্যবহার করা যাইবে না।

(৬) প্রচলিত আইনে নির্দিষ্ট কোন দণ্ড বা বিচার পদ্ধতি সম্পর্কিত কোন বিধানের প্রয়োগকে এই অনুচ্ছেদের (৩) বা (৫) দফার কোন কিছুই প্রভাবিত করিবে না।

বাংলাদেশে বিচার বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বিচার বিভাগ–এর গঠন ক্ষমতা ও কার্যাবলি সম্পর্কে বিধান রয়েছে। নিম্ন তা পরিবেশিত হল।

ষষ্ঠভাগ
বিচার বিভাগ

১ম পরিচ্ছেদ—সুপ্রিম কোর্ট

৯৪। (১) "বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট" নামে বাংলাদেশের একটি সর্বোচ্চ আদালত থাকিবে এবং আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ লইয়া তাহা গঠিত হইবে।

www.pathagar.com

(২) প্রধান বিচারপতি (যিনি "বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি" নামে অভিহিত হইবেন) এবং প্রত্যেক বিভাগে আসনগ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতি যেরূপ সংখ্যক বিচারক নিয়োগের প্রয়োজন বোধ করিবেন, সেইরূপ সংখ্যক অন্যান্য বিচারক লইয়া সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হইবে।

(৩) প্রধান বিচারপতি ও আপিল বিভাগে নিযুক্ত বিচারকগণ কেবল উক্ত বিভাগে এবং অন্যান্য বিচারক কেবল হাইকোর্ট বিভাগে আসন গ্রহণ করিবেন।

(৪) এই সংবিধানের বিধানাবলি-সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারক বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন।

নজির

প্রধান বিচারপতির সত্তা স্বতন্ত্র, তিনি শুধু বিচারপতি; অন্যান্যরা বিচারক। তবু প্রধান বিচারপতিও একজন বিচারক, কারণ এই অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় দফায় "অন্যান্য" শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইবার পর তিনি বিচারক থাকিয়াই যান এবং কোন কারণে তিনি যদি প্রধান বিচারপতির পদ হারান, তাহা হইলে সেই কারণে তিনি বিচারকের পদ হইতে চ্যুত হন না।[১]

যে মামলার কোন স্তরে বিচারক সাক্ষ্যরূপ উপস্থিত হইয়াছেন, সেই মামলা ঐ বিচারক বিচার করিতে পারেন না।[২] যে ব্যাপারে বিচারকের ব্যক্তিগত জ্ঞান আছে, সেই ব্যাপারে তিনি বিচার করিতে অনধিকারী।[৩]

৯৫। (১) প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারক রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক না হইলে, এবং

(ক) সুপ্রিম কোর্টে অন্যূন দশ বৎসরকাল এ্যাডভোকেট না থাকিয়া থাকিলে, অথবা

(খ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে অন্যূন দশ বৎসরকাল কোন বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠান না করিয়া থাকিলে,

অথবা

(গ) সুপ্রিম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগ লাভের জন্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য যোগ্যতা না থাকিয়া থাকিলে তিনি বিচারক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।

(৩) এই অনুচ্ছেদে "সুপ্রিম কোর্ট" বলিতে ১৯৭৭ সালের দ্বিতীয় ফরমান (দশম সংশোধন) আদেশ প্রবর্তনের পূর্বে যে কোন সময়ে বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত এলাকার মধ্যে যে আদালত হাইকোর্ট অথবা সুপ্রিম কোর্ট হিসাবে এখতিয়ার প্রয়োগ করিয়াছেন সেই আদালত অন্তর্ভুক্ত হইবে।

---

www.pathagar.com

সংশোধন

এই অনুচ্ছেদের (১) দফা ১৯৭৫ সনের ২ নং আইনের ১৩ ধারা বলে মূল (১) দফার পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

(২) ও (৩) দফা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে ১৯৭৮ সনের ২য় ঘোষণাপত্র আদেশ নম্বরঃ৪-এর ২য় তফসিল বলে, মূল (২) এবং (৩) দফার স্থলে।

আদিরূপ

৯৫। (১) প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারককে নিয়োগদান করিবেন।

(২) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক না হইলে এবং

(ক) সুপ্রিম কোর্টে অন্যূন দশ বৎসরকাল অ্যাডভোকেট না থাকিয়া থাকিলে, অথবা

(খ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে অন্যূন দশ বৎসর কোন বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠান না করিয়া থাকিলে, এবং অন্যূন তিন বৎসর জেলা বিচারকের ক্ষমতা নির্বাহ না করিয়া থাকিলে তিনি বিচারকপদে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন না।

(৩) এই অনুচ্ছেদ "সুপ্রিম কোর্ট" বলিতে এই সংবিধান-প্রবর্তনের পূর্বে যে কোন সময়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে আদালত হাইকোর্ট হিসাবে এখতিয়ার প্রয়োগ করিয়াছে, সেই আদালত অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৯৬। (১) এই অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, কোন বিচারক পঁয়ষট্টি বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(২) এই অনুচ্ছেদের নিম্নরূপ বিধানাবলি অনুযায়ী ব্যতীত কোন বিচারককে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করা যাইবে না।

(৩) একটি সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল থাকিবে যাহা এই অনুচ্ছেদে "কাউন্সিল" বলিয়া উল্লিখিত হইবে এবং বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারকের মধ্যে পরবর্তী যে দুইজন কর্মে প্রবীণ তাঁহাদের লইয়া গঠিত হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কাউন্সিল যদি কোন সময়ে কাউন্সিলের সদস্য এইরূপ কোন বিচারকের সামর্থ্য বা আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করেন, অথবা কাউন্সিলের কোন সদস্য যদি অনুপস্থিত থাকেন অথবা অসুস্থতা কিংবা অন্য কোন কারণে কার্য করিতে অসমর্থ হন তাহা হইলে কাউন্সিলের যাঁহারা সদস্য আছেন, তাঁহাদের পরবর্তী যে বিচারক কর্মে প্রবীণ তিনিই অনুরূপ সদস্য হিসাবে কার্য করিবেন।

www.pathagar.com

(৪) কাউন্সিলের দায়িত্ব হইবে—

(ক) বিচারকগণের জন্য পালনীয় আচরণ বিধি নির্ধারণ করা,

এবং

(খ) কোন বিচারকের অথবা কোন বিচারক যেরূপ পদ্ধতিতে অপসারিত হইতে পারেন সেইরূপ পদ্ধতি ব্যতীত তাঁহার পদ হইতে অপসারণযোগ্য নহেন এইরূপ অন্য কোন কর্মকর্তার, সামর্থ্য বা আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করা।

(৫) যে ক্ষেত্রে কাউন্সিল অথবা অন্য কোন সূত্র হইতে প্রাপ্ত তথ্যে রাষ্ট্রপতির এইরূপ বুঝিবার কারণ থাকে যে কোন বিচারক—

(ক) শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে তাঁহার পদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করিতে অযোগ্য হইয়া পড়িতে পারেন, অথবা

(খ) গুরুতর অসদাচরণের জন্য দোষী হইতে পারেন, সেইক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কাউন্সিলকে বিষয়টি সম্পর্কে তদন্ত করিতে ও উহার তদন্তফল জ্ঞাপন করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন।

(৬) কাউন্সিল তদন্ত করিবার পর রাষ্ট্রপতির নিকট যদি এইরূপ রিপোর্ট করেন যে, উহার মতে উক্ত বিচারক তাঁহার পদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছেন অথবা গুরুতর অসদাচরণের জন্য দোষী হইয়াছেন তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা উক্ত বিচারককে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করিবেন।

(৭) এই অনুচ্ছেদের অধীনে তদন্তের উদ্দেশ্যে কাউন্সিল স্বীয় কার্য-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করিবেন এবং পরওয়ানা জারি ও নির্বাহের ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের ন্যায় উহার একই ক্ষমতা থাকিবে।

(৮) কোন বিচারক রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

সংশোধন

৯৬ অনুচ্ছেদ ১৯৭৮ সনের ২য় ঘোষণাপত্র আদেশ নম্বর ৪-এর ২য় তফসিল বলে মূলে ৯৬ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় "বাষট্টি" শব্দটির পরিবর্তে "পয়ষট্টি" শব্দটি সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬—১৯৮৬ সনের ১ নং আইন বলে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

আদিরূপ

৯৬। (১) এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলি-সাপেক্ষে কোন বিচারক বাষট্টি বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

www.pathagar.com

(২) প্রমাণিত অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের কারণে সংসদে মোট সদস্য-সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতার দ্বারা সমর্থিত সংসদের প্রস্তাবক্রমে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির আদেশ ব্যতীত কোন বিচারককে অপসারিত করা যাইবে না।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন প্রস্তাব সম্পর্কিত পদ্ধতি এবং কোন বিচারকের অসদাচরণ বা অসামর্থ্য সম্পর্কে তদন্ত ও প্রমাণের পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন।

৯৭। প্রধান বিচারপতির পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে প্রধান বিচারপতি তাঁহার দায়িত্বপালনে অসমর্থ বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে ক্ষেত্রমত অন্য কোন ব্যক্তি অনুরূপ পদে যোগদান না করা পর্যন্ত কিংবা প্রধান বিচারপতি স্বীয় কার্যভার পুনরায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত আপিল বিভাগের অন্যান্য বিচারকের মধ্যে যিনি কর্মে প্রবীণতম, তিনি অনুরূপ কার্যভাব পালন করিবেন।

৯৮। সংবিধানের ৯৪ অনুচ্ছেদের বিধানাবলি সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতির নিকট সুপ্রিম কোর্টের কোন বিভাগের বিচারক-সংখ্যা সাময়িকভাবে বৃদ্ধি করা উচিত বলিয়া সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে তিনি যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন এক বা একাধিক ব্যক্তিকে অনধিক দুই বৎসরের জন্য অতিরিক্ত বিচারক নিযুক্ত করিতে পারিবেন, কিংবা তিনি উপযুক্ত বিবেচনা করিলে হাইকোর্ট বিভাগের কোন বিচারককে একজন এ্যাডহক বিচারক হিসেবে যে কোন অস্থায়ী মেয়াদের জন্য আপিল বিভাগে আসন গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন, এবং অনুরূপ বিচারক এইরূপ আসন গ্রহণকালে আপিল বিভাগের একজন বিচারকের ন্যায় একই এখতিয়ার ও ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন ;

তবে শর্ত থাকে যে, অতিরিক্ত বিচারকরূপে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে এই সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের অধীন বিচারকরূপে নিযুক্ত হইতে কিংবা বর্তমান অনুচ্ছেদের অধীন আরও এক মেয়াদের জন্য অতিরিক্ত বিচারকরূপে নিযুক্ত হইতে বর্তমান অনুচ্ছেদের কোন কিছু নিবৃত্ত করিবে না।

সংশোধন

অনুচ্ছেদের প্রথম লাইনে "৯৪ অনুচ্ছেদের বিধানাবলি সত্ত্বেও" শব্দগুলির পদ "প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া" শব্দগুলি ১৯৭৫ সনের ২ নং আইনের ১৫ ধারা বলে বিলুপ্ত হইয়াছে , এবং

www.pathagar.com

আদি সংবিধানের ৯৮ অনুচ্ছেদের "যে কোন অস্থায়ী মেয়াদের জন্য আপিল বিভাগে আসন গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন" শব্দগুলির পরিবর্তে নিযুক্ত অংশটি ১৯৭৮ সনের ২য় ঘোষণাপত্র আদেশ নং ৪-এর ২য় তফসিল বলে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে :

"একজন এ্যাডহক বিচারক হিসাবে যে কোন অস্থায়ী মেয়াদের জন্য আপিল বিভাগে আসন গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন এবং অনুরূপ বিচারক এইরূপ আসন গ্রহণকালে আপিল বিভাগের একজন বিচারকের ন্যায় একই এখতিয়ার ও ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।"

আদিরূপ

৯৮। এই সংবিধানের ৯৪ অনুচ্ছেদের বিধানাবলি সত্ত্বেও প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট সুপ্রিম কোর্টের কোন বিভাগের বিচারক-সংখ্যা সাময়িকভাবে বৃদ্ধি করা উচিত বলিয়া সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে, তিনি যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন এক বা একাধিক অনধিক দুই বৎসরের জন্য অতিরিক্ত বিচারক নিযুক্ত করিতে পারিবেন, কিংবা তিনি উপযুক্ত বিবেচনা করিলে হাইকোর্ট বিভাগের কোন বিচারককে যে কোন অস্থায়ী মেয়াদের জন্য আপিল বিভাগের আসন গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, অতিরিক্ত বিচারকরূপে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে এই সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের অধীন বিচারকরূপে নিযুক্ত হইতে কিংবা বর্তমানে অনুচ্ছেদের অধীন আরও এক মেয়াদের জন্য অতিরিক্ত বিচারকরূপে নিযুক্ত হইতে বর্তমান অুচ্ছেদের কোন কিছুই নিবৃত্ত করিবে না।

৯৯। (১) (২) দফায় ব্যবস্থিত বিধান ব্যতিরেকে, কোন ব্যক্তি অতিরিক্ত বিচারকরূপে দায়িত্ব পালন ব্যতীত বিচারক পদের দায়িত্ব পালন ব্যতীত বিচারক পদে দায়িত্ব পালন করিয়া থাকিলে উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণের কিংবা অপসারিত হইবার পর তিনি কোন আদালত বা কর্তৃপক্ষের নিকট ওকালতি বা কার্য করিতে পারিবেন না অথবা বিচার বিভাগীয় বা আধা-বিচার বিভাগীয় পদ ব্যতীত প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে বহাল হইবেন না।

(২) কোন ব্যক্তি হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক পদে বহাল থাকিলে উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণে বা অপসারিত হইবার পর তিনি আপিল বিভাগে ওকালতি বা কার্য করিতে পারিবেন।

www.pathagar.com

সংশোধন

১৯ অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হইয়াছে, ১৯৭৮ সনের ২য় ঘোষণাপত্র আদেশ নম্বর ৪–এর ২য় তফসিল বলে, মূল ৯৯ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে।

আদিরূপ

১৯। কোন ব্যক্তি (এই সংবিধানের ৯৮ অনুচ্ছেদের বিধানাবলি অনুসারে অতিরিক্ত বিচারকরূপে দায়িত্ব পালন ব্যতীত) বিচারকরূপে দায়িত্বপালন করিয়া থাকিলে উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণের বা অপসারিত হইবার পর তিনি কোন আদালত বা কর্তৃপক্ষের নিকট ওকালতি বা কার্য করিবেন না এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন না।

১০০।[১] রাজধানীতে সুপ্রিম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকিবে, তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লইয়া প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে অন্য যে স্থান বা স্থানসমূহ নির্ধারণ করিবেন, সেই স্থান বা স্থানসমূহে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে।

১০১। এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা হাইকোর্ট বিভাগের উপর যেরূপ আদি, আপিল ও অন্য প্রকার এখতিয়ার, ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে বা হইতে পারে উক্ত বিভাগের সেইরূপ এখতিয়ার, ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকিবে।

---

১ মূল ১০০ অনুচ্ছেদটি পুনর্বহাল করা হইয়াছে। কেননা সংবিধান (অষ্টম সংশোধন) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সালের ৩০ নং আইন) বলে ১০০ অনুচ্ছেদের সংশোধন মহামান্য আদালত কর্তৃক এখতিয়ার বহির্ভূত ও অকার্যকর ঘোষণা করা হইয়াছে (বি. সি. আর. ১৯৮৯ (এ.ডি.) ভলিউম–৯)।
উল্লিখিত আইনবলে সংশোধিত ১০০ অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপ ছিল :
"১০০। সুপ্রিম কোর্টের আসন। —(১) এই অনুচ্ছেদ–সাপেক্ষে, রাজধানীতে সুপ্রিম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকিবে।
(২) হাইকোর্ট বিভাগ ও উহার বিচারকগণ সুপ্রিম কোর্টের স্থায়ী আসনে এবং উহার স্থায়ী বেঞ্চগুলির আসনসমূহে আসন গ্রহণ করিবেন।
(৩) কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, যশোহর, রংপুর এবং সিলেটে হাইকোর্ট বিভাগের একটি করিয়া স্থায়ী বেঞ্চ থাকিবে, এবং প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে যেরূপ নির্ধারণ করিবেন প্রত্যেক স্থায়ী বেঞ্চের সেইরূপ বেঞ্চসমূহ থাকিবে।
(৪) প্রত্যেক স্থায়ী বেঞ্চে আসন গ্রহণের জন্য প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে যেরূপ সংখ্যক হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক মনোনয়নের প্রয়োজনবোধ করিবেন সেইরূপ সংখ্যক বিচারক লইয়া স্থায়ী বেঞ্চটি গঠিত হইবে, এবং উক্তরূপ মনোনয়নের পর মনোনীত বিচারকগণ বেঞ্চটিতে বদলী হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।
(৫) রাষ্ট্রপতি, প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শক্রমে, যে এলাকা সম্পর্কে প্রতিটি স্থায়ী বেঞ্চের এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা হাইকোর্টের বিভাগের উপর অর্পিত বা অর্পিত হইতে পারে এইরূপ এখতিয়ার ক্ষমতা বা দায়িত্ব থাকিবে তাহা নির্দিষ্ট করিবেন ; এবং যে এলাকা ঐভাবে নির্দিষ্ট করা হয় নাই সেই এলাকা সম্পর্কেই সুপ্রিম কোর্টের স্থায়ী আইনে আসীন হাইকোর্ট বিভাগের উক্তরূপ এখতিয়ার, ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকিবে।
(৬) প্রধান বিচারপতি স্থায়ী বেঞ্চগুলি সম্পর্কিত সকল আনুষঙ্গিক, সম্পূরক বা অনুবর্তী বিষয়ে বিধি প্রনয়ন করিবেন।"

www.pathagar.com

সংশোধন

অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হইয়াছে মূল ১০১ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে। ১৯৭৮ সনের ২য় ঘোষণাপত্র আদেশ নং ৪–এর ২য় তফসিল এই পরিবর্তনের উৎস।

আদিরূপ

১০১। এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা হাইকোর্ট বিভাগের উপর যেরূপ আদি, আপিল ও অন্য প্রকার এখতিয়ার ও ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, উক্ত বিভাগের সেইরূপ এখতিয়ার ও ক্ষমতা থাকিবে।

নজির

এই অনুচ্ছেদে আরও বলা হইয়াছে যে, সকল দেওয়ানি, ফৌজদারি এবং রাজস্ব আদালত ও ট্রাইব্যুনাল তাহাদের স্ব স্ব এখতিয়ার ও কার্য–ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে থাকিবে। বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের ৯৪ অনুচ্ছেদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।[১]

১০২। (১) কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে এই সংবিধানের তৃতীয়ভাগের দ্বারা অর্পিত অধিকারসমূহের যে কোন একটি বলবৎ করিবার জন্য প্রজাতন্ত্রের বিষয়াবলির সহিত সম্পর্কিত কোন দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিসহ যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্ট বিভাগ উপযুক্ত নির্দেশাবলী বা আদেশাবলি দান করিতে পারিবেন।

(২) হাইকোর্ট বিভাগের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আইনের দ্বারা অন্য কোন সমফলপ্রদ বিধান করা হয় নাই, তাহা হইলে—

(ক) যে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে

(অ) প্রজাতন্ত্র বা কোন স্থায়ী কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলির সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তিকে আইনের দ্বারা অনুমোদিত নয়, এমন কোন কার্য করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য কিংবা আইনের দ্বারা তাঁহার করণীয় কার্য করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিয়া ; অথবা

(আ) প্রজাতন্ত্র বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলির সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তির কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন কার্যধারা আইনসম্মত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে করা হইয়াছে ও তাহার কোন আইনগত কার্যকারিতা নাই বলিয়া ঘোষণা করিয়া

www.pathagar.com

উক্ত বিভাগ আদেশ দান করিতে পারিবেন ; অথবা

(খ) যে কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে

(অ) আইনসঙ্গত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে বা বেআইনি উপায়ে কোন ব্যক্তিকে প্রহরায় আটক রাখা হয় নাই বলিয়া যাহাতে উক্ত বিভাগের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইতে পারে সেইজন্য প্রহরায় আটক উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত বিভাগের সম্মুখে আনয়নের নির্দেশ প্রদান করিয়া

অথবা

(আ) কোন সরকারি পদে আসীন বা আসীন বলিয়া বিবেচিত কোন ব্যক্তিকে তিনি কোন কর্তৃত্ববলে অনুরূপ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠানের দাবি করিতেছেন, তাহা প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করিয়া

উক্ত বিভাগ আদেশ দান করিতে পারিবেন।

(৩) উপরি-উক্ত দফাসমূহে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন আইনের ক্ষেত্রে বর্তমান অনুচ্ছেদের অধীন অন্তর্বর্তীকালীন বা অন্য কোন আদেশদানের ক্ষমতা হাইকোর্ট বিভাগের থাকিবে না।

(৪) এই অনুচ্ছেদের (১) দফা কিংবা এই অনুচ্ছেদের (২) দফার (ক) উপ-দফার অধীন কোন আবেদনক্রমে যে ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী আদেশ প্রার্থনা করা হইয়াছে এবং অনুরূপ অন্তর্বর্তী আদেশ—

(ক) যেখানে উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য কোন ব্যবস্থার কিংবা কোন উন্নয়নমূলক কার্যের প্রতিকূলতা বা বাধা সৃষ্টি করিতে পারে, অথবা

(খ) যেখানে অন্য কোনভাবে জনস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হইতে পারে, সেইখানে অ্যাটর্নি-জেনারেলকে উক্ত আবেদন সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত নোটিশ দান এবং অ্যাটর্নি-জেনারেলের (কিংবা এই বিষয়ে তাঁহার দ্বারা ভারপ্রাপ্ত অন্য কোন এ্যাডভোকেটের বক্তব্য শ্রবণ না করা পর্যন্ত এবং এই দফার (ক) বা (খ) উপ-দফায় উল্লেখিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে না বলিয়া হাইকোর্ট বিভাগের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান না হওয়া পর্যন্ত উক্ত বিভাগ কোন অন্তর্বর্তী আদেশদান করিবেন না।

(৫) প্রসঙ্গের প্রয়োজনে অন্যরূপ না হইলে এই অনুচ্ছেদে "ব্যক্তি" বলিতে সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহ বা কোন শৃঙ্খলা বাহিনী সংক্রান্ত আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত কিংবা এই সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য নয়, এইরূপ কোন ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত যে কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল অন্তর্ভুক্ত হইবে।

www.pathagar.com

সংশোধন

১০২ অনুচ্ছেদও পূর্বোক্ত আদেশ বলে ১০২ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত। বর্তমান সংশোধন-পূর্ব অনুচ্ছেদটি আবার ১৯৭৫ সনের ২ নং আইনের ১৬ ধারা বলে মূল ১০২ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত হইয়াছিল।

বর্তমান সংশোধন-পূর্বরূপ

১০২। (১) হাইকোর্ট বিভাগের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আইনের দ্বারা অন্য কোন সমফলপ্রদ বিধান করা হয় নাই, তাহা হইলে

(ক) যে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে

(অ) প্রজাতন্ত্র বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলির সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্বপালনে রত ব্যক্তিকে আইনের দ্বারা অনুমোদিত নয়, এমন কোন কার্য করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য কিংবা আইনের দ্বারা তাঁহার করণীয় কার্য করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিয়া,

অথবা

(আ) প্রজাতন্ত্র বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলির সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তির কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন কার্যধারা আইনসঙ্গত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে করা হইয়াছে বা গৃহীত হইয়াছে ও তাহার কোন আইনগত কার্যকরতা নাই বলিয়া ঘোষণা করিয়া

উক্ত বিভাগ আদেশদান করিতে পারিবেন ; অথবা

(খ) যে কোন ব্যক্তি আবেদনক্রমে

(অ) আইনসঙ্গত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে বা বেআইনি উপায়ে কোন ব্যক্তিকে প্রহরায় আটক রাখা হয় নাই বলিয়া যাহাতে উক্ত বিভাগের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইতে পারে, সেইজন্য প্রহরায় আটক উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত বিভাগের সম্মুখে আনয়নের নির্দেশ প্রদান করিয়া,

অথবা

(আ) কোন সরকারি পদে আসীন বা আসীন বলিয়া বিবেচিত কোন ব্যক্তিকে তিনি কোন কতৃত্ব বলে অনুরূপ পদ-মর্যাদায় অধিষ্ঠানের দাবি করিতেছেন, তাহা প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করিয়া

উক্ত বিভাগ আদেশদান করিতে পারিবেন।

www.pathagar.com

(২) (১) দফায় যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও হাইকোর্ট বিভাগের কোন অন্তর্বর্তী আদেশদানের বা এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন আইনের ক্ষেত্রে বর্তমান অনুচ্ছেদের অধীন কোন আদেশ দানের ক্ষমতা থাকিবে না।

(৩) প্রসঙ্গের প্রয়োজনে অন্যরূপ না হইলে এই অনুচ্ছেদে "ব্যক্তি" বলিতে সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহ অথবা কোন শৃঙ্খলা-বাহিনী সংক্রান্ত আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত কিংবা এই সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত যে কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল অন্তর্ভুক্ত হইবে।

আদিরূপ

১০২। (১) কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে এই সংবিধানের তৃতীয় ভাগের দ্বারা অর্পিত অধিকারসমূহের যে কোন একটি বলবৎ করিবার জন্য প্রজাতন্ত্রের বিষয়াবলির সহিত সম্পর্কিত কোন দায়িত্বপালনকারী ব্যক্তিসহ যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্ট বিভাগ উপযুক্ত নির্দেশাবলী বা আদেশাবলী দান করিতে পারিবেন।

(২) হাইকোর্ট বিভাগের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আইনের দ্বারা অন্য কোন সমফলপ্রদ বিধান করা হয় নাই, তাহা হইলে

(ক) যে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে

(অ) প্রজাতন্ত্র বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলির সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্বপলন রত ব্যক্তিকে আইনের দ্বারা অনুমোদিত নয়, এমন কোন কার্য করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিয়া,

অথবা

(আ) প্রজাতন্ত্র বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলির সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্বপালনে রত ব্যক্তির কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন কার্যধারা আইনসঙ্গত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে করা হইয়াছে বা গৃহীত হইয়াছে ও তাহার কোন আইনগত কার্যকরতা নাই বলিয়া ঘোষণা করিয়া উক্ত বিভাগ আদেশদান করিতে পারিবেন; অথবা

(খ) যে কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে

(অ) আইনসঙ্গত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে বা বেআইনি উপায়ে কোন ব্যক্তিকে প্রহরায় আটক রাখা হয় নাই বলিয়া যাহাতে উক্ত বিভাগের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইতে পারে, সেইজন্য প্রহরায় আটক উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত বিভাগের সম্মুখে আনয়নের নির্দেশ প্রদান করিয়া, অথবা

www.pathagar.com

(আ) কোন সরকারি পদে আসীন বলিয়া বিবেচিত কোন ব্যক্তিকে তিনি কোন কর্তৃত্ববলে অনুরূপ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠানের দাবি করিতেছেন, তাহা প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করিয়া উক্ত বিভাগ আদেশদান করিতে পারিবেন।

(৩) উপরি-উক্ত দফাসমূহে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন আইনের ক্ষেত্রে বর্তমান অনুচ্ছেদের অধীন কোন আদেশদানের ক্ষমতা হাইকোর্ট বিভাগের থাকিবে না।

(৪) এই অনুচ্ছেদের (১) দফা কিংবা অনুচ্ছেদের (২) দফার (ক) উপ-দফার অধীন কোন আবেদনক্রমে যে ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী আদেশ প্রার্থনা করা হইয়াছে এবং অনুরূপ অন্তর্বর্তী আদেশ

(ক) যেখানে সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য কোন ব্যবস্থার কিংবা কোন উন্নয়নমূলক কার্যের প্রতিকূলতা বা বাধা সৃষ্টি করিতে পারে, অথবা

(খ) যেখানে অন্য কোনভাবে জনস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হইতে পারে,

সেইখানে অ্যাটর্নি-জেনারেলকে উক্ত আবেদন সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত নোটিশদান এবং অ্যাটর্নি-জেনারেলের (কিংবা এই বিষয়ে তাঁহার দ্বারা ভারপ্রাপ্ত অন্য কোন অ্যাডভোকেটের) বক্তব্য শ্রবণ না করা পর্যন্ত এই দফার (ক) বা (খ) উপ-দফায় উল্লিখিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে না বলিয়া হাইকোর্ট বিভাগের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান না হওয়া পর্যন্ত উক্ত বিভাগ কোন অন্তর্বর্তী আদেশ দান করিবেন না।

(৫) প্রসঙ্গের প্রয়োজনে অন্যরূপ না হইলে এই অনুচ্ছেদে "ব্যক্তি" বলিতে সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহ সংক্রান্ত আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত কিংবা এই সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত যে কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল অন্তর্ভুক্ত হইবে।

নজির

হাইকোর্টের এই ক্ষমতা (নিষেধের রীট) তখনই ব্যবহৃত হয়, যখন অন্যত্র কোথাও প্রতিকারের বিধান প্রাপ্তব্য নহে।[১] নিম্ন আদালত যদি ভুল রায় দিয়া থাকেন, তাহার প্রতিকার আপিল আদালতে খুঁজিতে হইবে।[২] হাইকোর্ট বিভাগ এই শেণির দরখাস্ত (কেস) গ্রহণ করিবার পূর্বে দেখিবেন যে, অন্যভাবে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি যথার্থ প্রতিকার পাইতেন কি-না। এই ব্যাপারে অধিক ঔদার্য প্রদর্শিত হইলে আইন দ্বারা সৃষ্ট অন্যান্য বিচারালয়ের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা হ্রাস পাইতে পারে। অবশ্য অন্য সংস্থার মাধ্যমে প্রতিকার সমফলপ্রদ না হইলে কেস গ্রহণ করাই

www.pathagar.com

উচিত।[৩] অন্যান্য আদালত বা সংস্থা যে ফয়দা দিতে পারেন, তাহা যদি যথেষ্ট না হয়, বা তাহা যদি ব্যয়সাধ্য হয়, তবে সেই ফয়দাকে সমফলপ্রদ বলা যায় না।[৪] সমফলপ্রদ বিধান থাকিলেই হাইকোর্ট বিভাগ ক্ষমতাহীন হইয়া যায় না। অন্য বিধান কার্যকরী করিতে দীর্ঘ সময় লাগিলে এবং তাহা হইতে যথেষ্ট না হইলে এবং তাহা অসুবিধাজনক হইলে হাইকোর্ট বিভাগ সেই কেস গ্রহণ করিবেন।[৫]

হাইকোর্ট বিভাগ নিষেধাদেশ (writ of prohibition) দিতে পারিবেন এই বলিয়া যে, অধীনস্থ ব্যক্তি বা সংস্থা যাহা করিবার উদ্যোগ নিয়াছেন তাহা করিবেন না, কারণ যাহা তিনি করিতে যাইতেছেন, তাহা আইন বহির্ভূত বা আইন বিরুদ্ধ। আদালত যে নিষেধাজ্ঞা দিয়া থাকেন, তাহা হইতে এই নিষেধাদেশ ভিন্ন। নিষেধাজ্ঞা ব্যক্তি বিরুদ্ধে হয়, কিন্তু নিষেধাদেশ সংস্থার উপর হয়।

অবশ্য সরকারি কর্মচারীর উপর আইন যে ক্ষমতা ন্যস্ত করিয়াছে, সেই ক্ষমতা পরিচালনার অধিকার তাঁহারই। কিন্তু সেই ক্ষমতা সততার সাথে ব্যবহার করিতে হইবে। আইনের মুখোশ পরিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য ক্ষমতা ব্যবহার নিরোধের অধিকার হাইকোর্ট বিভাগের আছে। প্রসঙ্গত স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যাহার উপর ক্ষমতা ন্যস্ত আছে তিনি ভুল করিতে পারেন, ভুলের বিরুদ্ধে এই দফায় দরখাস্ত চলে না।

হাইকোর্ট বিভাগ এই আদেশ প্রদান করিবার সময় তর্কাতীত তথ্যের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। যে তথ্য তর্কমূলক, সেখানে যাইবেন না। কর্তৃপক্ষ তথ্যের যে বর্ণনা দিয়াছেন, হাইকোর্ট বিভাগ তাহা উল্টাইবেন না।[৬] যেখানে মোটে প্রমাণ নাই, সেখানে প্রমাণের উল্লেখ থাকিলে, কিংবা যেখানে প্রমাণ আছে, অথচ প্রমাণহীনতার উল্লেখ করা হইয়াছে, সেখানে হাইকোর্ট বিভাগ আপন অধিকার বিস্তার করিতে পারিবেন।[৭]

যেহেতু এই সত্যিকার (অকার্যকর ঘোষণা : certiorari) বিচারভিত্তিক অনুগ্রহমূলক, সেইহেতু বিলম্বের কারণে এই ঘোষণার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয়।[৮] প্রার্থনাকারী যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করিয়া থাকেন, তখন তাহার দরখাস্ত অগ্রাহ্য হয়। প্রার্থনাকারীর আচরণের মধ্যে প্রতারণা থাকিলেও দরখাস্ত না মঞ্জুর হয়।[৯]

স্বাভাবিক ন্যায় বিচারের (Natural justice) নীতি ব্যাহত হইলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনে তর্কিত আদেশ এই ক্ষমতাবলে বলে হাইকোর্ট বিভাগ বাতিল করিয়া ঘোষণার আদেশ জারি করিতে পারেন। স্বাভাবিক ন্যায় বিচার নিম্নবর্ণিত প্রকারের হইয়া থাকে,—

---

৩. পি. এল. ডি. ১৯৫৭ করাচী ৬৯৪
৪. পি. এল. ডি.১৯৩৫ লাহোর ৪৩১
৫. পি. এল. ডি. ১৯৬৩ এস. সি. ৩২২
৬. পি. এল. ডি. ১৯৬৩ এস. সি. ৩৮২
৭. পি. এল. ডি. ১৯৬৩ লাহোর, ৬৩
৮. পি. এল. ডি. ১৯৬৪ এস. সি. ৮২৯
৯. পি. এল. ডি. ১৯৬৩ করাচী, ৪৫০

www.pathagar.com

(ক) সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী নিজে যদি সিদ্ধান্তের প্রতি আসক্ত থাকেন, তবে তাহা (সিদ্ধান্ত) অন্যায়,[১]

(খ) বক্তব্য বলিবার সুযোগ না দিয়া সাজা প্রদান অন্যায়,[২] এবং

(গ) কী কারণে বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত হইল, আহত ব্যক্তি তাহা জানিবার অধিকার রাখে।[৩]

নজির

মার্শাল ল' কোর্ট :

মার্শাল ল কোর্ট বা ট্রাইব্যুনাল যদি তাহাদের এখতিয়ার বা অধিক্ষেত্রের বাহিরে কাজ করে, বা ঠিকমত গঠিত না হয় কিংবা যদি স্পষ্ট অসততাপূর্ণ কিছু করে তবে সুপ্রিম কোর্ট বিষয়টি এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দেখিতে পারে।[৪]

ম্যাণ্ডামাস রিট :

ম্যাণ্ডামাস রিটে তথ্যের প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্ট দেখিতে পারে। কিন্তু স্বত্বের প্রশ্নে কোন সিদ্ধান্ত দিতে পারে না।[৫]

বিকল্প প্রতিকার :

বিকল্প প্রতিকারে প্রাপ্য হওয়া সত্ত্বেও তাহা যদি গ্রহণ করা না হইয়া থাকে তবুও সংবিধান বহির্ভূত বা সংবিধান পরিপন্থী কোন আদেশ দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে সুপ্রিম কোর্ট সেই আদেশ রদ করিতে পারে।[৬]

রাষ্ট্রপতিক পদ্ধতি :

পার্লামেন্টারি পদ্ধতি হইতে রাষ্ট্রপতিক পদ্ধতিতে যে বিবর্তন করা হইয়াছে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে, তাহা সংসদের ক্ষমতা বহির্ভূত হইলে ও পরবর্তীকালে এমন সব ঘটনা ঘটিয়াছে যাহার ফলে ঐ পরিবর্তনকে আর সংবিধানের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী বলা যায় না।[৭]

---

১. পি. এল. ডি. ১৯৬৪, এস. সি.৬৮
২. পি. এল. ডি. ১৯৬৫, এস. সি. ৯০
৩. পি. এল. ডি. ১৯৬৫, পাটনা ১৬২
৪. 33 DLR (AD) 155
৫. 34 DLR 255
৬. 31 DLR 184
৭. 33 331

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা :

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ই হইতেছে একমাত্র সিদ্ধান্তকারী। পাঠ্যক্রম এবং পরীক্ষা গ্রহণ এসব ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।[১]

সংবাদপত্র

সংবাদপত্র যখন নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছিল তখন উহা অধিগ্রহণ করা বেআইনি।[২]

১০৩. (১) হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রি, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল শুনানিরর ও তাহা নিষ্পত্তির এখতিয়ার আপিল বিভাগের থাকিবে।

(২) হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রি, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগের নিকট সেইক্ষেত্রে অধিকারবলে আপিল করা যাইবে, যেক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ

(ক) এই মর্মে সার্টিফিকেট দান করিবেন যে, মামলাটির সহিত এই সংবিধান-ব্যাখ্যার বিষয়ে আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে ; অথবা

(খ) কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন ; অথবা

(গ) উক্ত বিভাগের অবমাননার জন্য কোন ব্যক্তিকে দণ্ডদান করিয়াছেন ;

এবং সংসদের আইন-দ্বারা যেরূপ বিধান করা হইবে, সেইরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রে।

(৩) হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রি, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে যে মামলায় এই অনুচ্ছেদের (২) দফা প্রযোজ্য নহে, কেবল আপিল বিভাগ আপীলের অনুমতিদান করিলে সেই মামলায় আপিল চলিবে।

(৪) সংসদ আইনের দ্বারা ঘোষণা করিতে পারিবেন যে, এই অনুচ্ছেদের বিধানসমূহ হাইকোর্ট বিভাগের প্রসঙ্গে যেরূপ প্রযোজ্য, অন্য কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রেও তাহা সেইরূপ প্রযোজ্য হইবে।

সংশোধন

(খ) উপ-দফাটি মূল (খ) উপ-দফার স্থলে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে ১৯৭৮ সনের ২য় ঘোষণা আদেশ নং ৪-এর ২য় তফসিল বলে।

---

১. 30 DLR 268
২. 33 DLR 381

www.pathagar.com

আদিরূপ

১০৩। (১) হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রি, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল শুনানিরর ও তাহা নিষ্পত্তির এখতিয়ার আপিল বিভাগের থাকিবে।

(২) হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রি, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগের নিকট সেই ক্ষেত্রে অধিকারবলে আপিল করা যাইবে, যে ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ

(ক) এই মর্মে সার্টিফিকেট দান করিবেন যে, মামলাটির সহিত এই সংবিধান–ব্যাখ্যার বিষয়ে আইনের গুরুত্বপর্ণ প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে ;

অথবা

(খ) কোন মৃত্যুদণ্ড বহাল করিয়াছেন কিংবা কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন ; অথবা

(গ) উক্ত বিভাগের অবমাননার জন্য কোন ব্যক্তিকে দণ্ডদান করিয়াছেন ; এবং সংসদের আইন–দ্বারা যেরূপ বিধান করা হইবে, সেইরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রে।

(৩) হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রি, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে যে মামলায় এই অনুচ্ছেদের (২) দফা প্রযোজ্য নহে, কেবল আপিল বিভাগ আপীলের অনুমতিদান করিলে সেই মামলায় আপিল চলিবে।

(৪) সংসদ আইনের দ্বারা ঘোষণা করিতে পারিবেন যে, এই অনুচ্ছেদের বিধানসমূহ হাইকোর্ট বিভাগের প্রসঙ্গে যেরূপ প্রযোজ্য, অন্য কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রেও তাহা সেইরূপ প্রযোজ্য হইবে।

নজির

বিচার করিবার সময় যদি দেখা যায় যে, সংবিধানের কোন বিশেষ অনুচ্ছেদ বা দফার ব্যাখ্যার উপর মামলাটির ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল, তখন ধরিয়া লওয়া যায় যে, মামলাটির সহিত গুরুত্বপূর্ণ সংবিধান ব্যাখ্যার প্রশ্ন জড়িত।[১]

হাইকোর্ট বিভাগ তখন সার্টিফিকেট দিবেন ঃ

(১) যখন তর্কিত প্রশ্নটি সংবিধান ব্যাখ্যা সম্পর্কিত আইনের প্রশ্ন হইবে, এবং

(২) যখন তাহা গুরুত্বপূর্ণ হইবে।[২]

---

১. এ. আই. ১৯৪৯ এলাহাবাদ ৬৩২
২. এ. আই. আর. ১৯৪৯ এফ. সি. ৬

www.pathagar.com

যে প্রশ্নের সমাধান পূর্বে হইয়া গিয়াছে, তাহাকে আর গুরুত্বপূর্ণ বলা যায় না।[১]

যেখানে তর্কিত প্রশ্ন জনসাধারণের বৃহৎ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট এবং যাহার উপর পূর্বের সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য নহে, তাহা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বলা চলে।[২]

সার্টিফিকেট দিবার প্রাক্কালে হাইকোর্ট বিভাগ দেখিবেন যে, তর্কিত প্রশ্নটি সংবিধানভিত্তিক কি-না। অন্য আইনের তর্ক থাকিলেই সার্টিফিকেট দেওয়া চলিবে না।[৩]

অনুমতি বলে আপিল সেইসব ক্ষেত্রে চলিবে, যেইসব ক্ষেত্রে আপিল বিভাগ অনুমতি দিবেন। ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলায় অন্তর্বর্তী আদেশের বিরুদ্ধেও অনুমতি দিলে আপিল চলিবে।

অবশ্য সাক্ষ্যপ্রমাণভিত্তিক হইলে সিদ্ধান্ত ভুল হইলেও আপীলের অনুমতি পাওয়া যায় না।[৪] অবশ্য ভুল যদি গুরুতর এবং মারাত্মক হয়, তবে অনুমতি পাওয়া যায়।[৫] মারাত্মক এবং গুরুতর অর্থে এমন দোষ বুঝায় যাহা বিচারের বুনিয়াদকে নাড়া দেয়।[৬]

সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে যে অনুমতির আবেদন করিতে হইবে, এমন কোন আইন নাই।[৭]

আপিল বিভাগে আপিলঃ

যে ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ ফৌদজারি কার্যবিধির বিধান অনুসারে মৃত্যুদণ্ডকে হ্রাস করিয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করেন সেক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের এই আদেশ আপিলযোগ্য নয়।[৮]

১০৪। কোন ব্যক্তির হাজিরা কিংবা কোন দলিলপত্র উদ্‌ঘাটন বা দাখিল করিবার আদেশসহ আপিল বিভাগের নিকট বিচারাধীন যে কোন মামলা বা বিষয়ে সম্পূর্ণ ন্যায়বিচারের জন্য যেরূপ প্রয়োজনীয় হইতে পারে, উক্ত বিভাগ সেইরূপ নির্দেশ, আদেশ, ডিক্রি বা রিট জারি করিতে পারিবেন।

১০৫। সংসদের যে কোন আইনের বিধানাবলি-সাপেক্ষে এবং আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রণীত যে কোন বিধি-সাপেক্ষে আপিল বিভাগের কোন ঘোষিত রায় বা প্রদত্ত আদেশ পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা উক্ত বিভাগের থাকিবে।

১. এ. আই. ১৯৬২ এস. সি. ১৩১৪
২. এ. আই. আর. ১৯৫২ পাটনা ২৩
৩. পি. এল. ডি. ১৯৬৪ করাচী ৬১৪ ডি. বি.
৪. পি. এল. ডি. ১৯৬৫ এস. সি. ৪৬৬
৫. পি. এল. ডি. ১৯৫২ এফ. সি. ১০৫
৬. পি. এল. ডি. ১৯৫৩ এফ. সি. ৩১৭
৭. পি. এল. ডি. ১৯৬৮ এফ. সি. ২৬
৮. পি. এল. ডি. ১৯৬৪ এস. সি. ২৬
৯. ২৭ DLR (sc) 120.

www.pathagar.com

১০৬। যদি কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হয় যে, আইনের এইরূপ কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে বা উত্থাপনের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, যাহা এমন ধরনের ও এমন জনগুরুত্বসম্পন্ন যে, সেই সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি প্রশ্নটি আপিল বিভাগের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং উক্ত বিভাগ স্বীয় বিবেচনায় উপযুক্ত শুনানির পর প্রশ্নটি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে স্বীয় মতামত জ্ঞাপন করিতে পারিবেন।

নজির

কোন প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টে অভিমতের জন্য পাঠানো হইবে, সে বিচারের অধিকার একমাত্র রাষ্ট্রপতির। চাকুরি সম্পর্কীয় বিধির ব্যাখ্যা করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টে প্রশ্ন পাঠাইতে পারেন।[১]

অবশ্য প্রশ্নটি সুগঠিত ও স্পষ্ট হইতে হইবে। যে প্রশ্নের মধ্যে জিজ্ঞাস্য এলোমেলো, সুপ্রিমকোর্ট তাহার উত্তর দিবেন না।[২] সুপ্রিম কোর্টের অভিমত রাষ্ট্রপতির উপর বাধ্যকর নহে।[৩]

১০৭। (১) সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইন-সাপেক্ষে সুপ্রিম কোর্ট রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লইয়া প্রত্যেক বিভাগের এবং অধস্তন যে কোন আদালতের রীতি ও পদ্ধতি-নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) সুপ্রিম কোর্ট এই অনুচ্ছেদের ১ দফা এবং সংবিধানের ৯১৩ অনুচ্ছেদের অধীন দায়িত্বসমূহের ভার উক্ত আদালতের কোন একটি বিভাগকে কিংবা এক বা একাধিক বিচারককে অর্পণ করিতে পারিবেন।

(৩) এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধিসমূহ সাপেক্ষে কোন কোন বিচারককে লইয়া সুপ্রিম কোর্টের কোন বিভাগের কোন বেঞ্চ গঠিত হইবে বা ১০০ অনুচ্ছেদের ৩ দফায় উল্লিখিত হাইকোর্ট বিভাগের কোন স্থায়ী বেঞ্চের কোন বেঞ্চ গঠিত হইবে এবং কোন কোন বিচারক কোন উদ্দেশে আসন গ্রহণ করিবেন, তাহা বিচারপতি নির্ধারণ করিবেন।[৪]

১. পি. এল. ডি. ১৯৬০ এস. সি. ১৯৫
২ পি. এল. ডি. ১৯৬০ এস. সি. ১৯৫
৩. এ. আই. আর. ১৯৭৪ এফ. সি. ৭৩
৪. সংবিধানের ১০৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় "কোন্ বিভাগের কোন্ বেঞ্চ গঠিত হইবে" শব্দগুলির পরিবর্তে "সুপ্রিম কোর্টের কোন্ বিভাগের কোন বেঞ্চ গঠিত হইবে বা ১০০ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় উল্লিখিত হাইকোর্ট বিভাগের কোন্ স্থায়ী বেঞ্চের কোন্ বেঞ্চ গঠিত হইবে" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীসমূহ প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

www.pathagar.com

(৪) প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্টের যে কোন বিভাগের কর্মে প্রবীণতম বিচারককে সেইবিভাগে এই অনুচ্ছেদের (৩) দফা কিংবা এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধিসমূহ-দ্বারা অর্পিত যে কোন ক্ষমতাপ্রয়োগের ভার প্রদান করিতে পারিবেন।

সংশোধন (৮ম সংশোদনের পূর্বে)

এই অনুচ্ছেদের (২) "দফায় ১১৩ অনুচ্ছেদের" শব্দ দুইটি প্রতিস্থাপিত হইয়াছে "১১৩, ১১৫ ও ১১৬ অনুচ্ছেদসমূহের বদলে। এই পরিবর্তন ঘটাইয়াছে ১৯৭৮ সনের ২য় ঘোষণাপত্র আদেশ নম্বর ৪-এর ২য় তফসিল।

আদিরূপ

১০৭। (১) সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইন সাপেক্ষে সুপ্রিম কোর্ট রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লইয়া প্রত্যেক বিভাগের এবং অধস্তন যে কোন আদালতের রীতি ও পদ্ধতি-নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) সুপ্রিম কোর্ট এই অনুচ্ছেদের (১) দফা এবং এই সংবিধানের ১১৩, ১১৫ ১১৬ অনুচ্ছেদসমূহের অধীন দায়িত্বসমূহের ভার উক্ত আদালতের কোন একটি বিভাগকে কিংবা এক বা একাধিক বিচারককে অর্পণ করিতে পারিবেন।

(৩) এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধিসমূহ-সাপেক্ষে কোন কোন বিচারককে লইয়া কোন বিভাগের কোন বেঞ্চ গঠিত হইবে এবং কোন কোন বিচারক কোন উদ্দেশ্যে আসন গ্রহণ করিবেন, তাহা প্রধান বিচারপতি নির্ধারণ করিবেন।

(৪) প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্টের যে কোন বিভাগের কর্মে প্রবীণতম বিচারককে সেই বিভাগে এই অনুচ্ছেদের (৩) দফা কিংবা এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধিসমূহ-দ্বারা অর্পিত যে কোন ক্ষমতাপ্রয়োগের ভার প্রদান করিতে পারিবেন।

অষ্টম সংশোধনের পূর্বের আদিরূপ

১০৭। (১) সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইন-সাপেক্ষে সুপ্রিম কোর্ট রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লইয়া প্রত্যেক বিভাগের এবং অধস্তন যে কোন আদালতের রীতি ও পদ্ধতি-নিয়ন্ত্রনের জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) সুপ্রিম কোর্ট এই অনুচ্ছেদের (১) দফা এবং এই সংবিধানের ১১৩ অনুচ্ছেদের অধীন দায়িত্বসমূহের ভার উক্ত আদালতের কোন একটি বিভাগকে কিংবা এক বা একাধিক বিচারককে অর্পণ করিতে পারিবেন।

www.pathagar.com

(৩) এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধিসমূহ-সাপেক্ষে কোন কোন বিচারককে লইয়া কোন বিভাগের কোন বেঞ্চ গঠিত হইবে এবং কোন কোন বিচারক কোন উদ্দেশ্যে আসন গ্রহণ করিবেন, তাহা প্রধান বিচারপতি নির্ধারণ করিবেন।

(৪) প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্টের যে কোন বিভাগের কর্মে প্রবীণতম বিচারককে, সেই বিভাগের এই অনুচ্ছেদের (৩) দফা কিংবা এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধিসমূহ-দ্বারা অর্পিত, যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগের ভার প্রদান করিতে পারিবেন।

নজির

প্রধান বিচারপতি হাইকোর্ট বিভাগের বেঞ্চ গঠন করিবার অধিকার রাখেন। তাঁহার আদেশে যখন কোন বেঞ্চ বাতিল হয় তখন সেই বেঞ্চের আর কোন কার্যক্ষমতা থাকে না। অতঃপর সেই বেঞ্চ কোন কাজ করিলে তাহা সর্বোতোভাবে এখতিয়ার বহির্ভূত।[১]

১০৮। সুপ্রিম কোর্ট একটি "কোর্ট অব্ রেকর্ড" হইবেন এবং ইহার অবমাননার জন্য তদন্তের আদেশদান বা দণ্ডাদেশদানের ক্ষমতাসহ আইনসাপেক্ষে অনুরূপ আদালতের সকল ক্ষমতার অধিকারী থাকিবেন।

নজির

বিচারক আদালতের বাহিরে মামলা সম্পর্কে প্রভবান্বিত হইয়াছেন, এইরূপ উক্তি করা[২] , বক্তৃতায় বা আচরণে এমন ভাব প্রদর্শন, যাহাতে বিচারাধীন মামলার স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হইতে পারে তাহা[৩] , বিচারাধীন মামলার পক্ষকে শাসাইয়া বা ভয় দেখাইয়া মামলার গতি নিয়ন্ত্রণ করা[৪] , বিচারাধীন মামলার বিষয়বস্তু সম্পর্কে সমান্তরাল তদন্ত চালানো[৫] , আদালতের নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করা[৬] , এগুলি শাস্তিযোগ্য অবমাননা।

সাধারণ আলোচনা

সুপ্রিম কোর্টকে "কোর্ট অব রেকর্ড" বলা হয়।

---

১. 35 DLR (AD) 290
২. এস. সি. আর. ২১৫
৩. এ. ১৯৫৯ পাঞ্জাব ৩১৯
৪. ১৯৫৩ এস. সি. আর ২১৫
৫. এ. ১৯৬১ এস. সি. ৬৩৩
৬. এ. ১৯৬২ এস. সি. ১০৫৯

www.pathagar.com

যে আদালতে কার্যাবলি এবং কার্যধারা চিরস্থায়ীভাবে রক্ষা করিবার বিধান বর্তমান সেই আদালতকে "কোর্ট অব্ রেকর্ড" বলে। এই রেকর্ড এতই প্রামাণ্য যে তাহাদের সত্যতা সর্বদা প্রশ্নাতীত।

সুপ্রিম কোর্টের অবমাননার জন্য সুপ্রিম কোর্ট তদন্তের আদেশ দান বা দণ্ডাদেশ দান করিতে পারেন। তবে এই ক্ষমতা সংসদীয় আইন সাপেক্ষ হইবে।

সুপ্রিম কোর্ট বিচারকবর্গকে রক্ষা করিবার জন্য নয়, বিচারপ্রতিষ্ঠানের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা অটুট রাখিবার উদ্দেশ্যে অবমাননাকর শাস্তির বিধান করা হয়।

বিচারক আদালতের বাইরে মামলা সম্পর্কে প্রভাবান্বিত হইয়াছেন, এইরূপ উক্তি করা ; বক্তৃতায় বা আচরণে এমন ভাব প্রদর্শন করা যাহাতে বিচারাধীন মামলার স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হইতে পারে ; (বিচারাধীন মামলার স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হইতে পারে ;) বিচারাধীন মামলার পক্ষকে শাসাইয়া বা ভয় দেখাইয়া মামলার গতি নিয়ন্ত্রণ করা, বিচারাধীন মামলার বিষয়বস্তু সম্পর্কে সমান্তরাল তদন্ত চালানো, আদালতের নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করা, এগুলি শাস্তিযোগ্য অবমাননা।

কোন প্রকাশনা আদালতে অবমাননাকর দায়ে দোষী কিনা তাহা নিম্নলিখিত তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া নির্ধারিত হয়। ঃ

১। কিছু প্রকাশিত হইয়াছে কিনা ?

২। প্রকাশনাটি একটি বিচারাধীন মামলার নিরপেক্ষ বিচারকে প্রভাবিত করার লক্ষ্যে প্রকাশিত কিনা ?

৩। প্রকাশনাটি বিচারের সঠিক ধারাকে বাধা প্রধান করিয়াছে অথবা জনমনে পূর্ব সংস্কার বা পূর্ব ধারণার জন্ম দিয়াছে কিনা ?

৪। প্রকাশকালে বিচারাধীন মামলা সম্পর্কে প্রকাশক অবহিত ছিলেন কি? অথবা এ ব্যাপারে অবহিত ছিলেন কি যে মামলা দায়ের করা হইতেছে?

সুপ্রিম কোর্ট বিচার সংক্রান্ত ব্যাপারে সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্য যদি দায়িত্বহীনভাবে নিরপেক্ষ সমালোচনার সীমা অতিক্রম করে এবং নির্দেশিত ও পরিকল্পিত পন্থায় বিচারকদের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা বিনষ্ট করে এবং বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম থেকে বিচারকগণকে দূরে রাখে এবং মৌলিক অধিকার বলবৎ করার পথে বাধা প্রদান করে বা সংবিধান পরিপন্থী কর্মের মাধ্যমে বৈষম্য সৃষ্টি করে তবে তাহা আদালত অবমাননার পর্যায়ে পড়ে।

যখন কোন প্রবন্ধ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিদের বিরুদ্ধে কেলেঙ্কারী সৃষ্টির মাধ্যমে কুৎসা রচনা করে, এবং প্রবন্ধটি যদি এই রকম বক্তব্য পেশ করে যে, বিচার ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থার অভাব রহিয়াছে ও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালতে বিচারকগণ

www.pathagar.com

বিদেশী বা বিচার বহির্ভূত বিবেচনায় কাজ করেন এবং তাহার ফলে সুবিচার হইতে পারে না, তখন নিঃসন্দেহে প্রবন্ধটি কোর্টের অবমাননা করিয়াছে।

যদি কোন ব্যক্তি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারপতিকে আক্রমণ করে, অযৌক্তিকভাবে কোন প্রবন্ধ লেখে ও প্রকাশ করে তাহা হইলে সে আদালত অবমাননার দায়ে দোষী হইবে। কোন নিবন্ধ আদালত অবমাননার দায়ে দোষী কিনা, তাহা নির্ধারণকল্পে আদালত প্রবন্ধটিকে সতর্কভাবে পাঠ করিবেন এবং দেখিবেন যে প্রবন্ধটি নিরপেক্ষ এবং আইনানুগ মন্তব্য ও সমালোচনা করিয়াছে অথবা দায়িত্বহীনভাবে কোর্টের কোন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পূর্ব ধারণা দিয়াছে। যদি দেখা যায় যে, প্রবন্ধটি কোর্টের মর্যাদা এবং সম্মানকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে আদালতের অবমাননা হয়।

আমাদের সংবিধান অনুযায়ী সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নাগরিকের স্বাধীনতার চাইতে বেশী নয়। সংবাদপত্রের পেশাকে জনগণের চাইতে আলাদাভাবে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয় নাই। জনগণ এবং সাংবাদিকের পরিধি সমান এবং একজন নাগরিকের মতই সংবাদপত্রও আইন অমান্য করিতে পারে না। সুতরাং প্রকাশ করার প্রক্রিয়াটি সংবিধানে ৩৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত যুক্তিসঙ্গত বিধি-নিষেধের অধীন।

ইহা মনে রাখা ভাল, যে বিচারকগণ তাহাদের পদের বৈশিষ্ট্যের কারণে সংবাদপত্রের সাথে কোন বিতর্কে যোগ দিতে পারেন না এবং একজন সাধারণ নাগরিকের সমান সারিতে দাঁড়াইয়া সংবাদপত্রের মাধ্যমে বাক্‌যুদ্ধে লিপ্ত হইতে পারেন না।

বিচারাধীন মামলার দোষগুণ সম্পর্কে বা বিচারের সাক্ষি সম্পর্কে সংবাদপত্রে আলোচনা অনুমোদন করা যায় না। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে কোন সাক্ষির বিবৃতির একতরফা প্রকাশনা আদালত অবমাননার আওতায় পড়ে। তবে মন্তব্য এবং সমালোচনার পথে যে প্রধান বাধা থাকে, পরিপূর্ণভাবে একটি সিদ্ধান্তে পৌছানোর পর তাহা তিরোহিত হয় এবং তখন সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার কোন সম্ভাবনা থাকে না। সেই ক্ষেত্রে আইন নিরপেক্ষ এবং সঠিক সমালোচনার স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়। আদালত যে সিদ্ধান্ত দিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিতে গিয়া সাংবাদিক বিরূপ সমালোচনার অধিকার রাখেন। তবে এই ক্ষেত্রে ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে কোন আদালতে মামলা শেষ হওয়ার পর সেই আদালতকে দুর্নীতি ও অযোগ্যতার অভিযোগ তুলে তিরস্কার করার মাধ্যমে সম্মানজনক আক্রমণ করিলে, সমালোচককে আদালত অবমাননার দায়ে দণ্ড প্রদান করা যাইতে পারে। ঘটনার সঙ্গে প্রবন্ধটি জড়িত নয় ও তাহার বিচার তখন শুরু হয় নাই বা সাথে সাথে শুরু হইবে, কিন্তু শুনানির তারিখ পরে নির্ধারণ করা হইবে, এই ভিত্তিতে সংবাদপত্রে কোন প্রবন্ধ প্রকাশনাকে যুক্তিসঙ্গত বলা যায় না। তথ্য বা মন্তব্যের সত্যতা অপ্রাসঙ্গিক। লেখকের সরল বিশ্বাস এবং বিদ্বেষ উভয়ই বিবেচনার জন্য অপ্রাসঙ্গিক। যে ব্যক্তি সংবাদপত্রের আক্রমণের সম্মুখীন হইয়াছে তাহার বিচারের ফলাফল অবমাননাকারীর কোন কাজে লাগিবে না। এই ধরনের মামলায় দোষপ্রাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভর

www.pathagar.com

করে পরীক্ষিত হয়। যে ব্যাপারটি সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন করা হইয়াছে তাহা বিচার পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করে কিনা এবং তাহা কি উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে এই প্রশ্নের উপর নির্ভর করে। কোন সংবাদপত্র প্রকাশনায় অবমাননার প্রধান বিবেচ্য বিষয় কোন মন্দ কাজকে প্রকাশ্যে তুলে ধরার সৎ উদ্দেশ্য নয়। আদালত অবমাননার গুরুত্ব , দোষ স্বীকার করিলেই ক্ষতিপূরণ হয় না। প্রতিবাদী যদি কোন স্থানীয় সংবাদপত্রের মালিক ও সম্পাদক হয় এবং সেই সংবাদপত্রের যদি সীমাবদ্ধ প্রচার সংখ্যা থাকে ও নিয়মিত প্রকাশিত না হয় তখন সেই মালিক এবং সম্পাদককে জরিমানার আদেশ প্রদান করিলে আইনের শাস্তির উদ্দেশ্য সফল হইবে।

১০৯। হাইকোর্ট বিভাগের অধঃস্তন সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনালের[১] উপর উক্ত বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা থাকিবে।

সংশোধন

১৯৭৫ সনের ২ নং আইনের ১৭ ধারা বলে আদি সংবিধানের ১০৯ অনুচ্ছেদ হইলে "আদালতের" পর "ও ট্রাইব্যুনালের" শব্দ দুইটি বিযুক্ত হইয়াছে।

আদিরূপ

১০৯। হাইকোর্ট বিভাগের অধস্তন সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনালের উপর উক্ত বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকিবে।

নজির

১০৯ অনুচ্ছেদ হাইকোর্ট বিভাগকে অধস্তন সকল আদালতের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দিয়াছে। Special Powers Act-এর ৩০ ধারা অনুযায়ী আপিল আদালত সৃষ্টি করিয়া হাইকোর্ট বিভাগের এই ক্ষমতাকে নষ্ট করা যায় না এবং এইরূপ কিছু করা হইলে তাহা সংবিধান পরিপন্থী। Special Powers Act-এর অধীনে Special Tribunal-এর রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে যাওয়া যায়।[২]

তবে Army Act-এর রায়ের Court Martial হাইকোর্ট ডিভিশনের অধীন নয়।[৩]

---

১. দ্বাদশ সংশোধনীর দ্বারা যুক্ত।
২. 32 DLR 142
৩. 34 DLR (AD) 125

www.pathagar.com

১১০। হাইকোর্ট বিভাগের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত বিভাগের কোন অধস্তন আদালতের বিচারাধীন কোন মামলায় এই সংবিধানের ব্যাখ্যাসংক্রান্ত আইনের এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বা এমন জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয় জড়িত রহিয়াছে, সংশ্লিষ্ট মামলার মীমাংসার জন্য যাহার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন, তাহা হইলে হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত আদালত হইতে মামলাটি প্রত্যাহার করিয়া লইবেন, এবং

(ক) স্বয়ং মামলাটির মীমাংসা করিবেন ; অথবা

(খ) উক্ত আইনের প্রশ্নটির নিষ্পত্তি করিবেন এবং উক্ত প্রশ্ন সম্বন্ধে হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের নকলসহ যে আদালত হইতে মামলাটি প্রত্যাহার করা হইয়াছিল, সেই আদালত (বা অন্য কোন অধস্তন আদালতে) মামলাটি ফেরৎ পাঠাইবেন এবং তাহা প্রাপ্ত হইবার পর, সেই আদালত উক্ত রায়ের প্রতি সঙ্গতি রক্ষা করিয়া মামলাটির মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

১১১। আপিল বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন হাইকোর্ট বিভাগের জন্য এবং সুপ্রিম কোর্টের যে কোন বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন অধস্তন সকল আদালতের জন্য অবশ্যপালনীয় হইবে।

সাধারণ আলোচনা

সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক ঘোষিত আইন বলিতে কি বুঝায়? সুপ্রিমকোর্ট আইন-প্রণয়ন করিতে পারে না, আইন ব্যাখ্যা করিতে পারে। এই ব্যাখ্যার অন্য নাম আইন-ঘোষণা। এই ঘোষণাকে আইনের ভাষায় নজির বলা হয়। ইংরেজীতে ইহার নাম Ruling.

নজির

আইনের প্রথম উৎস হইতেছে সংসদ আর আইনের দ্বিতীয় নজির। সুপ্রিম কোর্টের বিচারকবৃন্দ তাহাদের সামনে আনীত মামলা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করার প্রয়োজনে আইনের বিশ্লেষণ করেন। এই বিশ্লেষণ হইতে যে নীতি উদ্ভব হয় তাহাকেই বলে নজির, এইভাবে উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত দ্বারা আইন পরিবর্তিত হয়। এই নজিরকেও আইনের উৎস বলা হয়। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

একজনের দখল হইতে তাহার কোন সম্পদ যদি তাহার বিনানুমতিতে অসদুদ্দেশ্যে অন্য কেউ সরায়, তাহা হইলে সেই কাজটিকে চুরি বলা হয়।

প্রশ্ন হইতেছে দখল বলিতে কি বুঝায়? দবির তাহার জমি বর্গাদার দ্বারা চাষ করায়। বর্গাদারদের মাধ্যমে তাহার এই যে ভোগ, ইহাকে কি দখল বলা যায়? এক যুক্তিতে বলা যায় যে ঐ জমিতে দখল নাই দবিরের, বর্গাদারের আছে। আর এক যুক্তিতে বলা যায় যে দখল আছে দবিরের, তাহার বর্গাদার একজন শ্রমিক মাত্র।

www.pathagar.com

এই প্রশ্নে উচ্চ আদালত সিদ্ধান্ত দিয়াছে যে ঐ জমিতে দবিরের দখল আছে, ইহাকেই বলে নজির।

নজিরের দরকার পড়ে কেন? ইহার উত্তর অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে খুব কঠিন নয়, যখন কোন আইন প্রণীত হয়, তাহার ভিত্তি থাকে পূর্ব অভিজ্ঞতা, ভবিষ্যতের দিকেও কিছু নজর থাকে। কিন্তু খুব বেশী দূর ভবিষ্যতে নজর দেওয়া সম্ভব নয়।

মামলা-মোকদ্দমা বিচার করবার সময় দেখা যায় যে আইনে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা কোন কোন ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ বা অস্পষ্ট। মামলা-মোকদ্দমা আদালতে দাখিল হইলে বিচারককে সেগুলি নিষ্পত্তি করিতেই হইবে। সেই অবস্থায় বিচারক সকল পক্ষের যুক্তি শুনিয়া এবং নিজের বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া তাহা অসম্পূর্ণ বা অস্পষ্ট আইনকে সম্পূর্ণ এবং স্পষ্ট করেন। নজিরের সার্থকতা এইখানেই।

বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টে ঘোষিত আইন সকল আদালতের জন্য অবশ্য পালনীয়। কিন্তু কেন? এই কেন-র উত্তর আছে।

বিবিধ আইন ব্যাখ্যা ও প্রয়োগকালে আদালত যদি এক এক সময় এক এক ভাবে চলেন, তবে আইন তাহার নিশ্চিতি হারায়। আইনের অর্থের ব্যাপারে তখন ভুল বোঝা-বুঝির সৃষ্টি হইতে পারে। তাই সংবিধান এই ব্যবস্থা দিয়াছে যে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত বা অভিমত অবশ্যই প্রতিপালনীয়। বাংলাদেশের সকল আদালত সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন মানিতে বাধ্য। অন্য দেশের উচ্চ আদালতের নজির মানিতে বাধ্য না হইলেও সেইসব অভিমতের যুক্তি বিবেচনায় গ্রহণ করা আমাদের দেশে আইনসিদ্ধ।

বস্তুত নজির বিধি-বদ্ধ আইনের মত নির্দেশের আকারে কিছুই বলে না। নজির আইনের ব্যাখ্যা থাকে এবং সেই ব্যাখ্যার পিছনে যুক্তি থাকে। সেই যুক্তি সব সময় মূল্যবান।

তবে এখানে একটি কথা আছে। উচ্চ আদালত মামলায় সিদ্ধান্ত দিবার সময় এমন কিছু অভিমত ব্যক্ত করিতে পারেন, যেগুলি কেসের বিষয়বস্তুর সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত নয়। এই সিদ্ধান্ত অবিটার (Obiter) নামে খ্যাত, এইগুলি বাধ্যকর নয়।

বাংলাদেশের জিলা এবং উপজিলা পর্যায়ের আদালতসমূহে নজিরের ব্যবহার খুব ব্যাপক নয়। এইসব আদালতের বিচারকবৃন্দ স্বীকার করেন যে নজিরও একটি আইনের উৎস। কিন্তু বাস্তব অসুবিধার কারণে তাহারা এই উৎস হইতে খুব বেশি ফায়দা গ্রহণ করিতে পারেন না।

প্রায় সকল আদালতে আইনের মূল বইগুলি পাওয়া যায়, এবং ঐ মূল আইনগুলির উপর ভিত্তি করিয়া বিচারকগণ আইন প্রয়োগ করেন। নজিরের জন্য প্রয়োজন মূল আইনের ভাষ্য এবং নজির যে সমস্ত সাময়িকীতে মুদ্রিত হয় সেই সব সাময়িকী।

সুপ্রিম কোর্ট ছাড়া অন্যান্য কোন কোন আদালতে নজিরের ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনীহাও দেখা যায়, সেই পার্থক্য নিরসন করিয়া নিশ্চিত অভিমতে পৌঁছানোর জন্য সময় এবং আগ্রহের প্রয়োজন।

www.pathagar.com

ইংরেজদের মধ্যে নজিরের ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক এবং অতি পুরাতন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিলাতের আদালতে পূর্ববর্তী নজিরের ভিত্তিতে মামলায় সিদ্ধান্ত দেওয়া হইত। অবশ্য তখন পর্যন্ত সকলের মনে এই ধারণা জন্মে নাই যে, নজিরের সূত্র সম সময় বিচারক মানিতে বাধ্য। তখন পর্যন্তও বিচারকগণ নিজস্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন এবং যদিও পূর্ববর্তী নজিরের উপর তাহারা যথেষ্ট মর্যাদা দিতেন তবুও সেই ধারাকে অনুসরণ করার কোন বাধ্যবাধকতা বিচারকদের ছিল না। (ষোড়শ শতাব্দীতে Dyer সাহেবের রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর নজিরের প্রভাব বাড়িয়া যায়। এই ধারাকে Coke পূর্ণরূপ দেন, কিন্তু তখন পর্যন্তও নজির কোন বাধ্য শক্তির রূপ পায় নাই। Vougham এবং Mathew Hate বলিতেন যে, নজিরকে গ্রহণ করিতে হইবে তাহার যুক্তির জন্যে, শক্তির জন্যে নয়। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই ধারা চলে।

উনবিংশ শতাব্দীতে নজির বাধ্যবাধকতার রূপ গ্রহণ করে। এই সময় নিম্নবর্ণিত ছয়টি সূত্র বিশেষ সম্মান লাভ করে ঃ

১। প্রত্যেক আদালত তাহার উচ্চ আদালতের নজির মানিতে বাধ্য।

২। সর্বপ্রকার আদালতের সিদ্ধান্ত সম্মানযোগ্য।

৩। নির্ণীত আদালতের রায়ের ততটুকু বাধ্যকর, যতটুকু দ্বারা কোন বিশেষ সূত্র হয়।

৪। সময় অতিক্রান্ত হইলেও নজিরের মূল্য হ্রাস পায় না।

৫। অবশ্য অতি পুরাতন নজিরসমূহ বর্তমান অবস্থার সাথে খাপ নাও খাইতে পারে।

৬। নজির প্রামাণ্য রিপোর্ট হইতে গ্রহণ করা প্রয়োজন।

আমার ব্যক্তিগত অভিমত এই যে, আমাদের দেশে আইনের বিবর্তন উচ্চ আদালতের মাধ্যমে না হইয়া যথাসম্ভব সংসদের মাধ্যমে হওয়া বহুলাংশে শ্রেয়। একথা সর্বাগ্রে বুঝিয়া লওয়া দরকার যে, সংসদ দ্বারা প্রণীত আইন বিচারকগণের জন্য বাধ্যতামূলক। সুতরাং তাহাদের বিচারবুদ্ধির বিহারের সীমা নিতান্তই সংকীর্ণ, বিচারকগণের আইন-প্রণয়নের ক্ষমতার কেবলমাত্র আইনের প্রয়োগের সময় উদ্ভূত ফাঁকগুলি বন্ধ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ক্ষতিকর আইন প্রণীত হইলে সেই আইনের কুফল দৃষ্টে সংসদ সংশোধন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে ঐ ক্ষতি বা অন্যায়কে দূর করিতে পারে। কিন্তু উচ্চ আদালতের নজির নিম্ন আদালত অনুসরণ করিতে বাধ্য। সেখানে সংশোধন প্রক্রিয়া শ্লথ।

আমি মনে করি যে, বিচার ও আইন-প্রনয়ণের ক্ষেত্র পৃথক হওয়া উচিত। সংশোধন করাও আইনের এই পরিবর্তনের মাধ্যমে সামাজিক সমস্যার সমাধান করার দায়িত্ব সংসদের উপর ন্যস্ত থাকা উচিত।

www.pathagar.com

সংসদীয় আইনের সুবিধা এই যে, ঐ আইন নিশ্চিত এবং পরিস্ফুট। ইহাতে বিধানগুলি সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা হয়। অপরপক্ষে, আদালত সৃষ্ট আইনের মূলনীতি (Ratio deciderd) আবিষ্কার করা অনেক সময় কষ্টকর।

অস্টিনের মতে সংসদীয় আইন শ্রেষ্ঠতর, কেননা এই আইন যথাযথ ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সংসদ কর্তৃক প্রণীত হয়, অপরদিকে বিচারের জন্য আনীত মামলা নিষ্পত্তির অভিষ্ঠ সামনে রাখিয়া বিচারকবৃন্দ তাহাদের কাজ নিষ্পন্ন করে। ঠিক নজির ভিত্তিক আইনের সৃষ্টির দিকে তাহাদের প্রবণতা থাকিবার কথা নয়।

আদালত কর্তৃক সৃষ্ট আইন বিচারক বিশেষের প্রবণতা মোতাবেক রূপ লাভ করিতে পারে। অপর পক্ষে সংসদ কর্তৃক সৃষ্ট আইন বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তির বিচার-বিবেচনার ফল। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রাজনৈতিক মতবাদের প্রভাবে সংসদ সৃষ্ট আইন এক দেশদর্শী হয়।

১১২। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত সকল নির্বাহী ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সুপ্রিম কোর্টের সহায়তা করিবেন।

১১৩। (১) প্রধান বিচারপতি কিংবা তাঁহার নির্দেশক্রমে অন্য কোন বিচারক বা কর্মচারী সুপ্রিম কোর্টের কর্মচারীদিগকে নিযুক্ত করিবেন এবং রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদনক্রমে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রণীত বিধিসমূহ অনুযায়ী এই নিয়োগদান করা হইবে।

(২) সংসদের যে কোন আইনের বিধানাবলি-সাপেক্ষে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রণীত বিধিসমূহে যেরূপ নির্ধারিত হইবে, সুপ্রিম কোর্টের কর্মচারীদের কর্মের শর্তাবলী সেইরূপ হইবে।

২য় পরিচ্ছেদ—অধস্তন আদালত

১১৪। আইনের দ্বারা যেরূপ প্রতিষ্ঠিত হইবে, সুপ্রিম কোর্ট ব্যতীত সেইরূপ অন্যান্য অধস্তন আদালত থাকিবে।

নজির

অধস্তন আদালতঃ

বাংলাদেশের সকল আদালতই সুপ্রিম কোর্টের অধীন। সুতরাং এমন কোন আদালত সৃষ্টি করা অবৈধ যাহা সুপ্রিম কোর্টের অধীন নয়। ঐরূপ করা হইলে তাহা সংবিধান পরিপন্থী হইবে।[১]

১১৫। বিচারবিভাগীয় পদে বা বিচারবিভাগীয় দায়িত্বপালনকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উক্ত উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিসমূহ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নিয়োগদান করিবেন।

www.pathagar.com

নজির

যে সমস্ত কর্মচারী বিচার-কার্যে রত (বিচার-কর্মবিভাগীয় অফিসার এবং বিচার বিভাগীয় দায়িত্বপালনে রত), তাহাদের কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতি, ছুটি মঞ্জুর ও শৃঙ্খলা বিধান রাষ্ট্রপতি করিবেন।

পদোন্নতি কেহ স্বত্ব হিসাবে দাবি করিতে পারে না। সুতরাং শাস্তিমূলকভাবে ছাড়া পদোন্নতি হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করিতে হইলে তাহাকে কারণ প্রদর্শনের নোটিশ প্রদান করিতে হয় না।[১]

১১৬ক। এই সংবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে বিচার-কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ এবং ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন।

সংশোধন

এই অনুচ্ছেদ সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন ১৯৭৫ দ্বারা সংবিধানে সংযোজিত হইয়াছে।

৩য় পরিচ্ছেদ—প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল

১১৭। (১) ইতঃপূর্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কে বা ক্ষেত্রসমূহ হইতে উদ্ভূত বিষয়াদির উপর এখতিয়ার প্রয়োগের জন্য সংসদ আইনের দ্বারা এক বা একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন :

(ক) নবম ভাগে বর্ণিত বিষয়াদি এবং অর্থদণ্ড বা অন্য দণ্ডসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কর্মে শর্তাবলী ;

(খ) যে কোন রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের চালনা ও ব্যবস্থাপনা এবং অনুরূপ উদ্যোগ বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষে কর্মসহ কোন আইনের দ্বারা বা অধীন সরকারের উপর ন্যস্ত বা সরকারের দ্বারা পরিচালিত কোন সম্পত্তির অর্জন, প্রশাসন, ব্যবস্থপনা ও বিলি ব্যবস্থা ;

(গ) যে আইনের উপর এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের (৩) দফা প্রযোজ্য হয় সেইরূপ কোন আইন।

www.pathagar.com

সংশোধন

এই অনুচ্ছেদের আদি ১১৫ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত। ১৯৭৫ সনের ২য় আইনের ১৮ ধারা এই পরিবর্তন ঘটাইয়াছে।

আদিরূপ

১১৫। (১) বিচারবিভাগীয় পদে বা বিচারবিভাগীয় দায়িত্ব পালনকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে

(ক) জেলা-বিচারকের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের সুপারিশক্রমে, এবং

(খ) অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে উপযুক্ত সরকারি কর্মকমিশন ও সুপ্রিম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উক্ত উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিসমূহ-অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নিয়োগদান করিবেন।

(২) কোন ব্যক্তি জেলা-বিচারক পদে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি—

(ক) নিয়োগলাভের সময়ে প্রজাতন্ত্রের কর্মে রত থাকেন এবং উক্ত কর্মের অন্যূন সাত বৎসরকাল বিচারবিভাগীয় পদে বহাল না থাকিয়া থাকেন, অথবা

(খ) অন্যূন দশ বৎসরকাল অ্যাডভোকেট না থাকিয়া থাকেন।

১১৬। বিচার-কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচার-বিভাগীয় দায়িত্বপালনে রত ম্যজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতিদান ও ছুটি মঞ্জুরিসহ) শৃঙ্খলাবিধান রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং সুপ্রিম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাহা প্রযুক্ত হইবে।

সংশোধন

এই অনুচ্ছেদে 'পদোন্নতিদান ও শৃঙ্খলাবিধান' শব্দগুলির পর "রাষ্ট্রপতির" শব্দটি "সুপ্রিম কোর্টের" পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে ১৯৭৫ সনের ২ নং আইনের ১৯ ধারা বলে। এবং 'ন্যস্ত থাকিবে' শব্দগুলির পর "এবং সুপ্রিম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাহা প্রযুক্ত হইবে" বাক্যাংশটি ১৯৭৮ সনের ২য় ঘোষণাপত্র আদেশ নং ৪-এর ২য় তফসিল বলে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

আদিরূপ

১১৬। বিচার-কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচারবিভাগীয় দায়িত্বপালনে রত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থলনির্ধারণ, পদোন্নতিদান ও ছুটি-মঞ্জুরিসহ) ও শৃঙ্খলাবিধান সুপ্রিম কোর্টের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

www.pathagar.com

(২) কোন ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের অধীন কোন প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত হইলে অনুরূপ ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারের অন্তর্গত কোন বিষয়ে অন্য কোন আদালত কোনরূপ কার্যধারা গ্রহণ করিবেন না বা কোন আদেশ প্রদান করিবেন না ;

তবে শর্ত থাকে যে, সংসদ আইনের দ্বারা অনুরূপ কোন ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা বা অনুরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের বিধান করিতে পারিবেন।

সংশোধন

এই অনুচ্ছেদের (গ) উপ-দফায় "৩" সংখ্যাটির ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটিয়াছে দুইবার। আদি সংবিধানে "৩ " ছিল। সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন ১৯৭৫ দ্বারা তাহা "২" করা হয়। আবার ১৯৭৮ সনের ২য় ঘোষণাপত্র আদেশ নং ৪-এর ২য় তফসিল বলে উপরোক্ত "২" সংখ্যার পরিবর্তে "৩" প্রতিস্থাপিত হয়।

নজির

প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল :

যে ক্ষমতা প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালকে দেওয়া হইয়াছে তাহার উপর অন্য কোন আদালতের অধিক্ষেত্র নাই।[১]

এই অনুচ্ছেদ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তি

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদের সাথে পৌর ও রাজনীতিক অধিকার সম্পর্কে আন্তর্জাতিক চুক্তির অনুচ্ছেদ ১৪-এর সামঞ্জস্য রয়েছে। নিম্নে তা পরিবেশিত হল ঃ

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

(১) আদালত ও ট্রাইব্যুনালের সমক্ষে সকল ব্যক্তি সমান। কোন মামলায় কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন অপরাধের অভিযোগ অথবা তাহার অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণকালে, আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত উপযুক্ত, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ন্যায্য ও প্রকাশ্য শুনানির অধিকার তাহার থাকিবে। গণতান্ত্রিক সমাজে নৈতিকতা, জনশৃঙ্খলা অথবা জাতীয় নিরাপত্তার কারণে অথবা মোদ্দমার বিভিন্নপক্ষের ব্যক্তিগত জীবনের স্বার্থে প্রয়োজন হলে, অথবা বিশেষ পরিস্থিতিতে আদালত যদি মনে করেন যে, তা প্রচারের ফলে ন্যায় বিচার ব্যাহত হতে পারে

www.pathagar.com

তবে, সাংবাদিক ও জনসাধারণকে সম্পূর্ণ বিচার অথবা তার অংশবিশেষ (শ্রবণের সুযোগ) থেকে বঞ্চিত করা যেতে পারে। তরুণদের স্বার্থে অনুরূপ প্রয়োজন না হলে, কিংবা মোকদ্দমাতে বিবাহ সংক্রান্ত বিবাদ অথবা সন্তানের অভিভাবকত্বের প্রশ্ন জড়িত না থাকলে, ফৌজদারি মামলা অথবা আইন সংক্রান্ত মোকদ্দমায় প্রদত্ত যে কোন রায় প্রকাশ করতে হবে।

(২) আইন অনুসারে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত ফৌজদারি অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত সকল ব্যক্তির নির্দোষ বলে বিবেচিত হওয়ার অধিকার থাকবে।

(৩) কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগ মীমাংসার ব্যাপারে সমতার ভিত্তিতে তার নিম্নলিখিত ন্যূনতম নিশ্চয়তা লাভের অধিকার থাকবে ঃ

(ক) তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের কারণ ও ধরন সম্পর্কে, তিনি যে ভাষা বুঝেন সে ভাষায় অবিলম্বে এবং বিস্তারিতভাবে অবগত হওয়া ;

(খ) আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রস্তুতি এবং নিজের পছন্দমত কৌশুলীর সাথে যোগাযোগ করার জন্য পর্যাপ্ত সময় ও সুবিধা লাভ ;

(গ) অযথা বিলম্ব না করে বিচার লাভ ;

(ঘ) নিজের উপস্থিতিতে বিচার লাভ করা, এবং নিজে অথবা নিজের পছন্দমত আইনসংক্রান্ত সাহায্যের মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থন করা ; আইন সংক্রান্ত সাহায্য না থাকলে তার এই অধিকার সম্পর্কে অবগত হওয়া ; ন্যায় বিচারের স্বার্থে প্রয়োজন হলে আইনসংক্রান্ত সাহায্য লাভ করা এবং অনুরূপ সাহায্য লাভের জন্য অর্থ প্রদানের যথেষ্ট সংস্থান না থাকলে বিনা মূল্যে তা লাভ করা ;

(ঙ) তার বিপক্ষীয় সাক্ষিদিগকে পরীক্ষা করা অথবা করান, এবং একইরূপ অবস্থা বা শর্তের অধীনে তার স্বপক্ষীয় সাক্ষিদের হাজিরা ও পরীক্ষার ব্যবস্থা করা ;

(চ) আদালতে ব্যবহৃত ভাষা বুঝতে অথবা বলতে অসমর্থ হলে বিনা মূল্যে দোভাষীর সাহায্য লাভ করা ;

(ছ) নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করতে অথবা নিজের দোষ স্বীকার করতে তাকে বাধ্য না করা ;

(৪) তরুণদের ক্ষেত্রে, তাদের বয়স এবং তাদের পুনর্বাসনের উন্নতি বিধানের প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি রেখে কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করতে হবে;

(৫) কোন অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন এমন প্রত্যেক ব্যক্তির উচ্চতর ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আইন অনুসারে তার অপরাধ এবং দণ্ডাদেশের পুনর্বিবেচনা লাভের অধিকার থাকবে।

(৬) যদি কোন ব্যক্তিকে ফৌজদারি অপরাধের দায়ে দোষী বলে চূড়ান্ত রায় প্রদান করা হয় এবং পরবর্তীকালে কোন নতুন অথবা নতুনভাবে উদঘাটিত ঘটনার ফলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, উক্ত ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার হয় নি এবং সে কারণে উক্ত ব্যক্তির শাস্তি রদ করা

www.pathagar.com

হয় কিংবা তাকে মার্জনা করা হয়, তবে সে ব্যক্তি অনুরূপ শাস্তিদানের ফলে যে কারাভোগ করেছেন তার জন্য তাকে আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দান করতে হবে ; অবশ্য যদি এটা প্রমাণিত হয় যে, অজ্ঞাত ঘটনাটি সময়মত প্রকাশ না হওয়ার জন্য উক্ত ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে অথবা অংশত দায়ী তবে ক্ষতিপূরণ লাভের অধিকারী হবেন না।

(৭) যে অপরাধের অভিযোগে কোন ব্যক্তিকে দেশের আইন ও শাস্তিমূলক কার্যবিধি অনুযায়ী একবার চূড়ান্তভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে অথবা অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে সে অপরাধের জন্য পুনরায় তার বিচার করা কিংবা তাকে শাস্তি প্রদান করা যাবে না।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদের সাথে মানবাধিকার সংক্রান্ত ইউরোপীয় কনভেনশনের ৬ নং অনুচ্ছেদের সামঞ্জস্য রয়েছে। নিম্নে তা পরিবেশিত হল :

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

(১) কোন ব্যক্তির পৌর অধিকার ও কর্তব্য নিরূপণ অথবা তার বিরুদ্ধে কোন অপরাধের অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে, আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ট্রাইব্যুনালে, যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে, নিরপেক্ষ ও প্রকাশ্য শুনানির অধিকার প্রত্যেকের থাকবে। বিচারের রায় প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে হবে ; কিন্তু একটি গণতান্ত্রিক সমাজে নৈতিকতা জনশৃঙ্খলা অথবা জাতীয় নিরাপত্তার খাতিরে, কিশোরদের স্বার্থ অথবা (মামলার) পক্ষগুলোর ব্যক্তিগত জীবন সংরক্ষণের জন্য সেরূপ প্রয়োজন হলে, অথবা কোনরূপ প্রচার ন্যায়বিচারের স্বার্থে ক্ষতিকর হতে পারে এমন পরিস্থিতিতে, আদালতের নিকট যেমন আবশ্যক বিবেচিত হবে সেই পরিমাণে সম্পূর্ণ বিচার কার্য অথবা এর কোন অংশ হতে সাংবাদিক ও জনসাধারণকে বাইরে রাখা যেতে পারে।

(২) ফৌদজারি অপরাধে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত আইন অনুসারে দোষী প্রমাণিত না হন ততক্ষণ তিনি নির্দোষ বলে গণ্য হবে।

(৩) ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির নিম্নলিখিত ন্যূনতম অধিকারসমূহ আছে;

(ক) তিনি যে ভাষা বুঝেন সেই ভাষায় এবং সবিস্তারে তার বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রকৃতি এবং কারণ সম্পর্কে অবিলম্বে অবগত হওয়া ;

(খ) তার পক্ষ সমর্থনের প্রস্তুতির জন্য পর্যাপ্ত সময় ও সুবিধাদি লাভ ;

(গ) ব্যক্তিগতভাবে নিজেই অথবা আইনগত সাহায্যের মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থন অথবা যদি আইনগত সাহায্য লাভের জন্য ব্যয় করার মত যথেষ্ট সম্বল তার না থাকে তবে, ন্যায় বিচারের স্বার্থে প্রয়োজন হলে, বিনা খরচে অনুরূপ সাহায্য লাভ ;

www.pathagar.com

(ঘ) তার বিপক্ষীয় সাক্ষিদিগকে পরীক্ষা করা অথবা পরীক্ষা করান এবং তার বিপক্ষীয় সাক্ষিদিগকে যে নিয়ম শর্তের অধীনে হাজির ও পরীক্ষা করা হয় সেই একই শর্তে তার স্বপক্ষীয় সাক্ষীদিগকে হাজির ও পরীক্ষা করান।

(ঙ) তিনি যদি আদালতে ব্যবহৃত ভাষা না বুঝেন তবে বিনা খরচে একজন দোভাষীর সাহায্য লাভ করা।

সারসংক্ষেপ

অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ প্রতিষ্ঠা করতে হলে তিনটি দূরতিক্রম্য কঠিন স্তর পার হতে হয়। মানবাধিকার ঘোষণার বিবেচনায় এ তিনটির কোনটির ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ মাত্র শিথিলতা উপেক্ষণীয় নয়।

প্রথম স্তরটি হচ্ছে এই যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি যে কর্মকাণ্ড নিষ্পন্ন করেছেন তা সংশ্লিষ্ট আইনের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে । সকল অন্যায় বা গুনাহ্ অপরাধ নয়, আবার এও হতে পারে যে, সকল অপরাধ অন্যায় বা গুণাহ্ নয়। যে মেয়ের বয়স সতের বছর এগার মাস উনত্রিশ দিন তেইশ ঘন্টা। তার বিয়ে দেওয়া পিতার পক্ষে গুনাহ্ বা পাপ নয় কিন্তু শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অনুমতি নিয়ে মদ খাওয়া অপরাধ নয় কিন্তু সকল মুসলমানের জন্য পাপ। সুতরাং প্রথম স্তরে বিবেচনা করতে হবে উত্থাপিত অভিযোগ গুলি আইনের চোখে অপরাধ বলে চিহ্নিত কিনা।

দ্বিতীয় স্তরে আসে এই অনুমান যে, সকল মানুষ নিরপরাধ। এই নিরপরাধ গণ্য হওয়ার যে অধিকার সেটি একান্তই মৌলিক। গল্প-গুজবে যে মানুষ দূর্নীতিপরায়ণ বলে চিহ্নিত, সে মানুষ আসলে অত্যন্ত সৎও হতে পারে। সে জন্য ধরে নিতে হয় যে, সকল মানুষই সৎ। যিনি বলতে চান যে, কোন ব্যক্তি অপরাধী, পর্যাপ্ত এবং সন্দেহমুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা তাকেই প্রমাণ করতে হয় যে ঐ ব্যক্তি অপরাধী। এখানে অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকার আছে, আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ পাওয়ার। সব পরিস্থিতি এবং সাক্ষ্য প্রমাণ বিবেচনা করার পর যদি দেখা যায় অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী তবেই সে অপরাধী গণ্য হবে।

তৃতীয় স্তরে আসে দণ্ড বা শাস্তির ব্যবস্থা। শাস্তির ক্ষেত্রে (?) প্রয়োগ নিষিদ্ধ। টুপি মাথায় না দেওয়া যদি অপরাধ হয় তবে এই অপরাধ ঘোষণাকারী আইন যে দিন জারি হয়েছে তার আগের দিনের খালি মাথার মানুষ শাস্তি পাবে না।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ : ১২

কাউকে তার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, পরিবার, বসতবাড়ি বা চিঠিপত্রের ব্যাপারে খেয়ালখুশিমত হস্তক্ষেপ অথবা সম্মান ও সুনামের উপর আক্রমণ করা চলবে না। অনুরূপ হস্তক্ষেপ অথবা আঘাতের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির রয়েছে।

(Article : 12. No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.)

ভাষ্য

আলোচ্য অনুচ্ছেদে কোন ব্যক্তির নিম্নোক্ত বিষয়ে অপরের স্বেচ্ছাচারী হস্তক্ষেপ থেকে তাকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে :

১. ব্যক্তিগত গোপনীয়তা

২. পরিবার

৩. বসতবাড়ি

৪. চিঠিপত্র

প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিম্নোক্ত দু'টি বিষয়ে অন্যের আক্রমণ থেকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে :

১. সম্মান

২. সুনাম

এই অনুচ্ছেদে উপরোক্ত চারটি ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারী হস্তক্ষেপ এবং দু'টি ক্ষেত্রে আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রত্যেক ব্যক্তিকে আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার দিয়েছে।

www.pathagar.com

নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা

প্রথমেই আলোচনা করব প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে। অভাব মেটানো এবং নিজেকে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত করার জন্যই মানুষ সমাজ গড়ে তুলেছে। ব্যক্তি হচ্ছে সমাজের ক্ষুদ্রতর একক এবং পরিবার হচ্ছে সমাজের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। পরিবারের ভবিষ্যত কি এ নিয়ে নানা জল্পনা কল্পনা চলছে তবে অনেকের মতে, মানব জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে পরিবার ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে হবে। যাই হোক এখনো পরিবার নামক এই সুপ্রাচীন সমাজিক প্রতিষ্ঠানটি টিকে আছে। ব্যক্তি যেহেতু পরিবার ও সমাজের মূল ইউনিট সেহেতু ব্যক্তির অস্তিত্বই হচ্ছে মূল বিষয়। ব্যক্তি নিরাপদ অবস্থানের জন্য গড়ে তুলেছে বসতবাড়ি। ব্যক্তি ব্যক্তিতে বা ব্যক্তি গোষ্ঠীতে অথবা গোষ্ঠী–ব্যক্তিতে যোগাযোগ রক্ষার জন্য চিঠিপত্র ব্যবস্থা চালু হয়েছে। ব্যক্তির স্বাধীন সত্তা বজায় রাখার জন্য, ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, পরিবার, বসতবাড়ি এবং চিঠিপত্র ইত্যাদির ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারী হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপত্তা প্রয়োজন।

ব্যক্তিগত গোপনীয়তা

ব্যক্তির নিজের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় রয়েছে যা তার একান্ত নিজস্ব। এসবের মধ্যে আছে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক আলোকচিত্র, ব্যক্তিগত ডায়েরি, দলিলপত্র, আত্মজীবনী ইত্যাদি। এগুলো যদি কোন ব্যক্তি অপরকে প্রদর্শন করতে অস্বীকৃত হন, অর একান্ত নিজস্ব বিষয় যদি তিনি গোপন রাখতে চান, তাহলে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনস্বাস্থ্য, জনশৃঙ্খলা ও জনগণের নৈতিকতার স্বার্থে আইন আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ ছাড়া এসবে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় বলা হয়েছে যদি কেউ অনুরূপ হস্তক্ষেপ করে তাহলে এর বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির রয়েছে।

বাংলাদেশের সাক্ষ্য আইনে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বজায় রাখার কতিপয় বিধান সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রাসঙ্গিক বিধায় ঐ আইনের ধারাগুলো নিম্নে উল্লেখ করছিঃ

ধারা--১২২। বিবাহ বজায় থাকাকালীন বার্তা

কোন ব্যক্তি যিনি বিবাহিতা বা যাহার সহিত বিবাহ হইয়াছে, বিবাহ বজায় থাকাকালে সেই ব্যক্তির সহিত তারহার স্ত্রী বা স্বামীর বার্তার বিষয়বস্তু প্রকাশ করিতে সেই ব্যক্তিকে বাধ্য করা যাইবে না ; বার্তা প্রদানকারীর বা তাহার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধির সম্মতি ব্যতীত বার্তার বিষয়বস্তু প্রকাশ করিবার অনুমতিও তাহাকে দেওয়া যাইবে না। তবে বিবাহিত ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে কোন দেওয়ানি মামলায় অথবা তাহাদের একজনের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করিবার দায়ে অপরজন ফৌজদারিতে সোপর্দ হইয়া থাকিলে, সেই ক্ষেত্রে বার্তার বিষয় প্রকাশ করিতে দেওয়া যাইবে।

www.pathagar.com

ধারা--১২৪। সরকারি বার্তার আদান প্রদান

প্রকাশ করিলে জনস্বার্থের ব্যাঘাত হইবে বলিয়া যখন কোন সরকারি কর্মচারী মনে করিবেন, তখন সরকারি বিশ্বস্ততায় লব্ধ বার্তা তিনি প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবেন না।

ধারা--১২৫। অপরাধ সংঘটন সম্পর্কে সংবাদ

ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ অফিসারকে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার সংবাদ কোথা হইতে পাইয়াছেন তাহা বলিতে বাধ্য করা যাইবে না এবং সরকারি রাজস্ব-সংক্রান্ত অপরাধ সংঘটনের সংবাদ রাজস্ব বিভাগীয় অফিসারকে কোথা হতে পাইয়াছেন তাহা বলিতে বাধ্য করা যাইবে না।

ধারা--১২৬। পেশা সম্পর্কিত বার্তা

ব্যারিস্টার, এটর্নি, উকিল, মক্কেলের ব্যারিস্টার,এটর্নি বা উকিল হিসাবে কাজ করিবার সময়ে এবং উদ্দেশ্যে উক্ত মক্কেল কর্তৃক বা মক্কেলের পক্ষ হইতে তাহার নিকট প্রদত্ত কোন সংবাদের বিষয় মক্কেলের অনুমতি ব্যতীত প্রকাশ করিতে পাইবেন না। অথবা বৃত্তিগত কার্য সম্পাদনকালে এবং প্রসঙ্গে মক্কেলের যে সব দলিলের সহিত তিনি পরিচিত হইয়াছেন, সেইগুলির বিষয়বস্তু বা অবস্থার বিষয়ে কোন বিবৃতি দিতে পারিবেন না অথবা তাহার কার্যকালে ও উদ্দেশ্যে মক্কেলকে তিনি যে পরামর্শ দিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

দোভাষী এবং ব্যারিস্টার, এটর্নি বা উকিলগণের কেরাণী বা কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও এই ধারা (১২৬) প্রযোজ্য হইবে।

ধারা--১২৯। আইন উপদেষ্টার সহিত গোপন বার্তার আদানপ্রদান

কোন ব্যক্তি ও তার পেশাদার আইন উপদেষ্টার মধ্যে গোপনীয় সংবাদাদি আদান প্রদান হইয়া থাকিলে, সেই ব্যক্তি যদি মামলায় সাক্ষ্য দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ না করেন, তবে সেই গোপনীয় সংবাদ আদান প্রদানের বিষয় আদালতে প্রকাশ করিতে তাহাকে বাধ্য করা যাইবে না। যদি তিনি সাক্ষ্য প্রদান করেন, তবে তাহার দেওয়া সাক্ষ্যের ব্যাখ্যার জন্য উক্ত গোপনীয় সংবাদ আদান প্রদানের বিষয় আদালতের জানা প্রয়োজন হইলেই কেবল তাহাকে উহা প্রকাশ করিতে বাধ্য করা যাইবে, অন্য কিছু নহে।

ধারা--১৩০। মামলার পক্ষ নহে এরূপ সাক্ষির স্বত্বের দলিল উপস্থাপন

মামলার পক্ষ নয় এরূপ কোন সাক্ষিকে তাহার সম্পত্তির স্বত্ব সংক্রান্ত কোন দলিল অথবা যে দলিল বলে কোন সম্পত্তি তিনি বন্ধকদার বা জামিনদার হিসাবে দখল করেন সেই দলিল, অথবা যে দলিল দাখিল করিলে তাহার কোন অপরাধ ধরা পড়িবার আশঙ্কা থাকে এইরূপ কোন দলিল, আদালতে দাখিল করিতে তাহাকে বাধ্য করা যাইবে না।

www.pathagar.com

যদি না, যে ব্যক্তি উক্ত দলিল করাইতে চাহেন, তাহার বা যাহার মাধ্যমে তিনি অধিকার দাবি করিতেছেন, তাহার সহিত সাক্ষি কোন লিখিত চুক্তিতে উক্ত দলিল দাখিল করিতে সম্মত হইয়া থাকেন।

পারিবারিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপত্তা

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার পারিবারিক বিষয়ে অন্যের স্বেচ্ছাচারী হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, পারিবারিক বিষয় বলতে কি বুঝায় এবং এর নিরাপত্তার প্রয়োজন কেন?

পরিবার হচ্ছে এমন একটি ক্ষুদ্র সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেখানে সাধারণত স্বামী-স্ত্রী তাদের অবিবাহিত সন্তানসন্ততিসহ বসবাস করে। অবশ্য বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পরিবার হচ্ছে সমাজের সেই ক্ষুদ্রতর সংগঠন যেখানে স্বামী-স্ত্রী তাদের অবিবাহিত সন্তানসহ এবং ক্ষেত্রবিশেষে সন্তানসন্ততির স্ত্রীপরিজনসহ বসবাস করে। পরিবার বিভিন্ন আকার ও প্রকারের হতে পারে। পরিবারের প্রধান কাজ হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর জৈবিক চাহিদা মেটানো ও সন্তান উৎপাদন। প্রেম, ভালবাসা, আদর যত্ন, খাওয়ানো পরানো ও পরিচর্যা—পরিবারের অন্যতম কাজ। উৎপাদন উপার্জন, শিক্ষাদান, ধর্মকর্ম শেখানো, রাজনৈতিক তৎপরতা, সন্তানের সামাজিকীকরণ, চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা ইত্যাদি আধুনিক পরিবারের অপরিহার্য কাজ। পরিবারের এসব কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো হচ্ছে পারিবারিক বিষয়।

কোন ব্যক্তি পারিবারিক বিষয় যেমন, বিবাহ, সন্তান জন্মদান, সন্তান লালন পালন, সন্তানের শিক্ষাদীক্ষা, সন্তানের সামাজিকীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে কারো স্বেচ্ছাচারী হস্তক্ষেপ থেকে ব্যক্তিকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে।

পরিবার হচ্ছে মানুষের শান্তির আধার

পরিবারের মাধ্যমেই মানুষের সামাজিক জীবনের শুরু। বিশেষ কোন সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায় পরিবার গড়ে উঠেনি বরং অনেকগুলো কারণ মানুষকে পরিবার গঠনে উদ্বুদ্ধ করেছে। যেমন, বিবাহিত জীবনের মাধ্যমে বৈধ উপায়ে যৌন আনন্দ লাভ। সন্তান লাভের বাসনা এবং তাদের প্রতি স্নেহাশিষ ও ভালবাসা, নিজের বংশধর রেখে যাওয়ার ইচ্ছা। পারস্পরিক সহযোগিতা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভ, বার্ধক্যের অসহায়ত্বের আশঙ্কা এবং সন্তানের উপর নির্ভরশীলতা বা সন্তানের সাহচর্য কামনা। এবং সর্বোপরি জীবনের সুখ-দুঃখ ও হাসি-কান্নায় নির্ভরশীল সঙ্গী পাওয়া।

এই সব কারণে মানুষ যে পরিবার গড়ে তোলে, সেই পারিবারিক জীবনে, পারিবারিক বিষয়ে যদি অন্য কেউ খেয়ালখুশিমত হস্তক্ষেপ করে তাহলে তার পারিবারিক জীবনের আনন্দ, সুখ,

www.pathagar.com

শান্তি বিঘ্নিত হবে। নিরূপদ্রবভাবে, শান্তিপূর্ণভাবে, অন্যের হস্তক্ষেপ ছাড়া পারিবারিক জীবন উপভোগ করা প্রত্যেক মানুষের প্রত্যাশা। মানুষের এই প্রত্যাশার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় পারিবারিক বিষয়ে অন্যের হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে।

বসতবাড়িতে স্বেচ্ছাচারী হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপত্তা

গৃহ মানুষের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। কর্মক্লান্ত জীবনে অবসর বিনোদন, নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যতের স্বপ্নের জাল বোনার জায়গা হচ্ছে ঘর। ঘরই পারিবারিক জীবনের ঠিকানা। ঘরে থাকে জীবনযাপনের উপকরণ, সুখের সামগ্রী। ঝড়, বৃষ্টি, রোদ, বাদল থেকে রক্ষার জন্য ঘর অপরিহার্য। ঘরকে কেন্দ্র করেই পরিবারের সকল কাজকর্ম আবর্তিত হয়। খাবার দাবার, পোশাক পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে মানুষ যখন একটি সুন্দর পরিচ্ছন্ন ঘরে বসবাস করে তখন সে প্রত্যাশা করে কেউ তাকে উপদ্রব করবে না, যখন তখন বিনা অনুমতিতে কেউ তার ঘরে ঢুকবে না। তাকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখবে না। ঘর ধ্বংস করবে না।

ঘর মানুষেরই প্রয়োজন হয়। অপর কোন প্রাণী দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া গৃহনির্মাণ করে না। জলজ প্রাণী, নদ-নদী, খালবিল, পুকুর, হাওর আর সমুদ্রের বিশাল জলরাশিতে নিরুদ্দেশভাবে ঘুরে বেড়ায়। বন্য পশু বন-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, পাখি আকাশে ওড়ে। ঘর বলতে যা বোঝায় এমন কোন আবাস তাদের দরকার হয় না। সাময়িক সময়ের জন্য তারা বাসা বাঁধে বটে, তবে তাকে নিরাপদ আশ্রয় বলা চলে না। তাদের নিরাপত্তার কোন নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না।

কিন্তু মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতেই মানুষ গড়ে তুলেছে সমাজ। তৈরি করেছে আবাস। সেই আবাসে চাই নিরাপত্তা। এটা তার মানবিক অধিকার।

চিঠিপত্রে হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপত্তা

চিঠিপত্র হচ্ছে যোগাযোগ মাধ্যম। যোগাযোগের আরো অনেক মাধ্যম আছে। যেমন, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, ফ্যাক্স, টেলেক্স ইত্যাদি। এ সবের মাধ্যমে মানুষ পরস্পরের সাথে যোগাযোগ ও মত বিনিময় করতে পারে। যোগাযোগের বিষয়বস্তু নির্ধারিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বাইরে অন্য কেউ না জানুক এটা যোগাযোগকারীর অভিপ্রায় হতে পারে। নিজের চিঠিপত্র, ফোন, টেলেক্স, ফ্যাক্স—ইত্যাদির গোপনীয়তা রক্ষা করার অধিকার প্রত্যেক মানুষেরই রয়েছে। ব্যক্তিগত গোপনীয়তার মতই চিঠিপত্র এবং যোগাযোগের গোপনীয়তার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোন ব্যক্তির চিঠিপত্র ও যোগাযোগের গোপনীয়তার নিশ্চয়তা না থাকলে তার ব্যক্তি স্বাধীনতারই নিরাপত্তা থাকে না। তাছাড়া মানুষ দীর্ঘদিনের সাধনায় এসব পদ্ধতি আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করেছে। এসব পদ্ধতির ব্যবহারই মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক করেছে। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব

www.pathagar.com

এখানেই। কিন্তু মানুষ যদি সভ্যতার এসব উপাদান নির্বিঘ্নে ব্যবহার করতে না পারে তাহলে মানুষ এবং পশুর মধ্যে প্রভেদ কোথায়? মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ের যদি নিরাপত্তা না থাকে তাহলে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব কিসে? মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার এই অনুচ্ছেদে তাই কারো ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের ব্যাপারে অন্যের খেয়ালখুশিমত হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদে প্রত্যেক মানুষকে তার সম্মান ও সুনামে অন্যের আঘাত বা আক্রমণ থেকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে। এবারে আমরা আলোচনা করব সম্মান ও সুনাম বলতে কি বুঝায়? কিভাবে এসবের উপর আঘাত আসে এবং এ বিষয়ে নিরাপত্তা লাভের প্রয়োজনীয়তা।

সম্মান (Honour) সুনাম (Reputation)

মানুষের মান-মর্যাদা, ইজ্জত, সুনাম, সততা, সতীত্ব ইত্যাদি হচ্ছে সম্মান। আইনের চোখে সম্মান হচ্ছে একটি সম্পত্তি। কোন মানুষ সম্পর্কে অন্য মানুষের ভাল জানাটাই হচ্ছে তার সুনাম। দ্রব্যসামগ্রী, ভূমি ইত্যাদি যেমন সম্পত্তি, সম্মান বা সুনামও তেমনি সম্পত্তি। দু'টির মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, ভূমি বা দ্রব্য সামগ্রী ধরা ছোঁয়া যায় তাই এটা কর্পোরেল বা দেহী সম্পত্তি আর সম্মান ধরা ছোঁয়া যায় না, তাই সেটা ইনকর্পোরাল বা বিদেহী সম্পত্তি।

দেহী সম্পত্তি মূল্যবান কিন্তু বিদেহী সম্পত্তি অমূল্য। শেক্সপিয়ার বলেছেন, প্রত্যেক মানুষের কাছে তার সুনামই হল বড় ঐশ্বর্য। যে আমাদের টাকাকড়ি কেড়ে নেয়, সে আমাদের কিছুই নিতে পারে না, কারণ টাকার নিজের কোন মূল্য নেই। আজ সে তোমার, কাল সে আমার আবার পরশু দিন আরেক জনের হবে। কিন্তু যে আমার সম্মান কেড়ে নেয় সে আমার যথাসর্বস্বই কেড়ে নেয়; তাতে সে ধনী হয় না বটে, কিন্তু আমাকে একেবারে নিঃস্ব করে দেয়।

সুনাম বা সম্মানের বিষয়টি মানুষের সহজাত নয়। অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে মানুষ তার সম্মান ও সুনাম অর্জন করে। সম্মান ও সুনাম তার অর্জিত বিষয়। শুধু চারিত্রিক সম্মান বা সুনামই নয় আরো অনেক ক্ষেত্রে মানুষ সম্মানের অধিকারী হতে পারে। যেমন, স্বামীর অকাল মৃত্যুর পর যে অসহায় রমণী চরম প্রতিকূলতার সাথে সংগ্রাম করে তার সন্তানদের উচ্চশিক্ষিত এবং মানুষের মত মানুষরূপে প্রতিষ্ঠিত করে তুলতে সক্ষম হন তার সম্মান বা সুনাম হচ্ছে ত্যাগের, দক্ষতার এবং ভাগ্যের। এই রমণী সকলের নিকট সম্মানের পাত্রী।

এ ছাড়াও পেশাগত ক্ষেত্রে মানুষের সম্মান বা সুনাম গড়ে উঠতে পারে। এটা সাধারণত পেশাগত দক্ষতা, সদ্ব্যবহার এবং ব্যক্তিগত আচরণের কারণে গড়ে ওঠে। আসলে সকল মানুষেরই সম্মান আছে। যেখানে দুর্নাম নেই সেখানেই সুনাম বা সম্মান আছে ধরে নিতে হবে কেননা আইন সকল মানুষকেই সৎ মনে করে। অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মানুষ নিরপরাধ। কারণ সমাজে খারাপ মানুষের সংখ্যা, ভাল মানুষের তুলনায় অনেক কম। আবার খারাপ মানুষের মধ্যে

www.pathagar.com

সুপ্রবৃত্তির তুলনায় কুপ্রবৃত্তির পরিমাণ খুবই সামান্য। তাই আইনের চোখে সাধারণভাবে সকল মানুষই সম্মানীয়। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা মানুষের সম্মান ও সুনামের উপর অন্যের আক্রমণ বা আঘাত থেকে তাকে নিরাপত্তা দিয়েছে। কারণ সম্মান ও সুনাম রক্ষার অধিকারটি মানবিক অধিকার।

মানুষের সম্মান ও সুনামের উপর আঘাত আসে মানুষের তরফ থেকেই। মানুষই মানুষের ইজ্জতের উপর আক্রমণ চালায়। বিভিন্নভাবে এই আঘাত আসতে পারে। বক্তৃতা, বিবৃতি, লেখনী, রিপোর্ট ইত্যাদির মাধ্যমে সম্মানে আঘাত আসতে পারে, আঘাত আসতে পারে ছবি, চিত্র, কার্টুন ইত্যাদির মাধ্যমে। মৃত ব্যক্তিরও সম্মান আছে। মৃত ব্যক্তি জীবিত থাকাকালীন যে আচরণ তার সম্মানে আঘাত হানতে পারতো এবং যা তার জীবিত উত্তরাধিকারীদের অনুভূতিতে আঘাত হানে তা নিন্দাজনক। এই জাতীয় কাজের মাধ্যমে মানুষের সুনামে আঘাত করা হয়।

এ জাতীয় আঘাত থেকে নিরাপত্তা লাভ করা মানুষের জন্য অপরিহার্য। ধন-সম্পদ নষ্ট হলে তা পুনরায় অর্জনের সম্ভাবনা থাকে। চেষ্টা-সাধনা করলে, অনুকূল পরিবেশ থাকলে ধন-সম্পদ উপার্জন করা যায় কিন্তু সম্মান বা সুনাম যদি একবার ক্ষুণ্ন হয় তাহলে যে ক্ষতি হবে সেটা অপূরণীয়। একবার দুর্নাম রটে গেলে মানুষের চরিত্র যে কালিমা লেগে যায় সেটি মিটিয়ে ফেলা সম্ভব হয় না। সম্মাননের হানি হলে সুনাম বিনষ্ট হলে মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকাই কষ্টকর হয়। তাই মানবাধিকারের প্রবক্তাগণ মানুষের সুনামের অধিকারটি রক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় মানুষের সম্মান ও সুনামে অন্যের আঘাত বা আক্রমণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের আইনে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের আইনে দণ্ডবিধির ৪৯৯ থেকে ৫০২ ধারাসমূহে মানহানি সম্পর্কিত বিধান রয়েছে। ধারাগুলো নিম্নে উল্লেখ করছি ।

৪৯৯।

—যে ব্যক্তি এইরূপ অভিপ্রায়ে বা এইরূপ জানিয়া বা এইরূপ বিশ্বাস থাকার কারণ সত্ত্বেও কথিত বা পাঠের জন্য অভিপ্রেত শব্দাবলি বা চিহ্নাদি বা দৃশ্যমান কল্পমূর্তির সাহায্যে কোন ব্যক্তি সম্পর্কিত কোন নিন্দাবাদ প্রণয়ন বা প্রকাশ করে যে অনুরূপ নিন্দাবাদ অনুরূপ ব্যক্তির সুনাম নষ্ট করিবে সেই ব্যক্তি অতঃপর ব্যতিক্রান্ত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত উক্ত ব্যক্তির মানহানি করে বলিয়া গণ্য হইবে।

৫৫।

—**মানহানির শাস্তি ঃ** যে ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির মানহানি করে সেই ব্যক্তি বিনাশ্রমে কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

www.pathagar.com

৫০১।

—মানহানিকর বলিয়া পরিচিত বিষয় মুদ্রণ বা খোদাইকরণ। যে ব্যক্তি এমন কোন বিষয় মুদ্রণ বা খোদাই করে, যাহা কোন ব্যক্তির মানহানিকর বলিয়া সে জানে বা তাহার অনুরূপ বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে, সেই ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

৫০২।

—মানহানির বিষয় সংবলিত মুদ্রিত বা খোদাইকৃত বস্তু বিক্রয়করণ। —যে ব্যক্তি মানহানিকর বিষয় সংবলিত কোন মুদ্রিত বা খোদাইকৃত বস্তু—উহা অনুরূপ বিষয় সংবলিত বলিয়া জানিয়া বিক্রয় করে বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করে, সেই ব্যক্তি বিনাশ্রম কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

বাংলাদেশের আইনের দণ্ডবিধির ৫০৩ ধারায় অপমান ও বিরক্তি সম্পর্কিত বিধান রয়েছে। এই ধারাটিও নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

৫০৩। **অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন**

—যে ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে আতঙ্কিত করার অভিপ্রায়ে তাহার দেহ সুনাম বা সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করার অথবা যে ব্যক্তিতে তাহার স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে তাহার দেহ বা সুখ্যাতির ক্ষতি সাধন করার ভীতি প্রদর্শন করে, অথবা সেই ব্যক্তিকে অনুরূপ ভীতি প্রদর্শনের বাস্তবায়ন এড়ানোর উপায় হিসাবে সে আইনত যে কাজ করিতে বাধ্য নহে, তাই করিতে বাধ্য করার বা সেই ব্যক্তির যে কাজ করার আইনানুগ অধিকার রহিয়াছে তাহা হইতে তাহাকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে অনুরূপ ভীতি প্রদর্শন করে।

আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার

কারো ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, পরিবার, বসতবাড়ি, চিঠিপত্র ইত্যাদির ব্যাপারে যদি কেউ স্বেচ্ছাচারমূলকভাবে হস্তক্ষেপ করে অথবা কারো সম্মান বা সুনামের উপর যদি কেহ আঘাত করে তাহলে উক্ত হস্তক্ষেপ ও আঘাতের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার এই অনুচ্ছেদে স্বীকৃত হয়েছে।

আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারের বিষয়টি বিশ্লেষণ করা দরকার। এই অধিকারটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কিন্তু অধিকার প্রদান করবে জাতীয় রাষ্ট্র। এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়াবলীতে যদি হস্তক্ষেপ বা আঘাত আসে তাহলে আক্রান্ত ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারী কিন্তু রাষ্ট্রের আইনে যদি এসব বিষয়ে নিরাপত্তার সুস্পষ্ট বিধান না থাকে তাহলে আইনের আশ্রয় লাভের নিশ্চয়তা দেবে কে? আইনের আশ্রয়লাভের জন্য আইনের শাসন থাকা অপরিহার্য।

www.pathagar.com

আইনের শাসনের অর্থ হচ্ছে মানুষের শাসনের বিপরীত। মানুষের আদেশ নয়, আইনের আদেশ হচ্ছে একমাত্র প্রতিপালনীয়। মানুষের ইচ্ছা বা খেয়ালখুশীমত আদেশ প্রদান করলে আইনের শাসন হয় না। দেশে প্রচলিত আইন অনুসারে যদি বিচার পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে তাহলেও বুঝতে হবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত আছে। আইনের শাসন থাকলেই আইনের আশ্রয় পাওয়া যাবে।

যিনি আইন প্রয়োগ করেন, তিনিও মানুষ, সুতরাং আইনের শাসনকে মানুষের শাসন বলেও ভুল হতে পারে কিন্তু ব্যাপারটি আসলে তা নয়। কারণ আইন প্রয়োগকারী ব্যক্তি মানুষ হলেও তিনি আইনের চতুর্সীমার বাইরে যেতে পারেন না। যদি যান তবে সেটা আইনের শাসন থাকে না।

আইন বলতে বৈধ আইন বুঝায়। খামখেয়ালি আইনকে আইন বলা যায় না। আইনকে হতে হবে সংবিধান বর্ণিত যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তৈরি এবং মৌলিক অধিকারানুগ। যিনি যখন যেভাবে আইন প্রণয়নের অধিকার রাখেন, তিনি তখন সেভাবে আইন প্রণয়ন করলেই আইন বৈধ হবে। বৈধ আইনের বৈধ প্রয়োগের ব্যবস্থাই হচ্ছে আইনের শাসন। আইন বৈধ উপায়ে তৈরি হল কিনা এবং আইনের প্রয়োগ বৈধ কিনা সেটা দেখার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ থাকা চাই। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ আইনের শাসনের জন্য অপরিহার্য। আইনের শাসনই আইনের আশ্রয় লাভের পথকে সুগম করবে।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদ বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক দেশের আইনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকা চাই। থাকা চাই সাংবিধানিক নিশ্চয়তা। অনেক দেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকারে এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়গুলির সবকয়টি অথবা অংশবিশেষ উল্লেখ আছে এবং সাংবিধানিক নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে। প্রথমেই আমরা এ বিষয়ে বাংলাদেশের সংবিধানের বিধান আলোচনা করব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে

বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৩ অনুচ্ছেদে গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণের কথা বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনসাধারণের নৈতিকতা, বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধসাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের

(ক) প্রবেশ, তল্লাশি ও আটক হইতে স্বীয় গৃহে নিরাপত্তা লাভের অধিকার থাকিবে ; এবং

(খ) চিঠিপত্রের ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনতা রক্ষার অধিকার থাকিবে।

বাংলাদেশের সংবিধানের এই অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার আছে—

(ক) আপন গৃহে নিরাপদে থাকার ;

www.pathagar.com

(খ) আপন গৃহে কাহাকেও প্রবেশ করতে না দিবার ;

(গ) আপন গৃহে তল্লাশি করিতে না দিবার ;

(ঘ) আপন গৃহে আটক না হওয়ার ;

(ঙ) চিঠিপত্রে গোপনতা বজায় রাখার ; এবং

(চ) অন্যভাবে অন্যের সাথে যোগাযোগের ব্যাপারে গোপনতা রক্ষা করার।

এই ছয়টি অধিকার কিছু বাধা নিষেধের অধীন। তবে সেই বাধানিষেধ—

(ক) যুক্তিসঙ্গত হতে হবে, এবং

(খ) আইনের দ্বারা আরোপিত হতে হবে , এবং

(গ) রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে হতে হবে, এবং

(ঘ) জন শৃঙ্খলার স্বার্থে হতে হবে, বা

(ঙ) জনসাধারণের নৈতিকতার স্বার্থে হতে হবে, বা

(চ) জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে হতে হবে।

এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশের আইন

নিজের গৃহে সংরক্ষিত হওয়ার অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আইন এর ব্যতিক্রম ঘটাতে পারে। ফৌজদারি কার্যবিধির ৯৬ থেকে ১০৩ ধারায় গৃহে তল্লাশির বর্ণনা রয়েছে। প্রাসঙ্গিক ধারাগুলো উল্লেখ করছি ঃ

ধারা ৯৬। **কখন তল্লাশি পরোয়ানা পাঠান যাইতে পারে**

১। যখন কোন আদালতের এরূপ বিশ্বাস করার কারণ ঘটে যে, যে ব্যক্তির উপর ৯৪ ধারা অনুসারে কোন সমন বা আদেশ অথবা ৯৫ ধারার (১) উপধারা অনুসারে কোন অধিযাচন পত্র প্রেরণ করা হইয়াছে বা হইতে পারে, সেই ব্যক্তি সমন বা অধিযাচন পত্র প্রেরণ করা হইয়াছে বা হইতে পারে, সেই ব্যক্তি সমন বা অধিযাচনে বর্ণিত দলিল বা বস্তু দাখিল করিবে না ; অথবা

যখন এইরূপ দলিল বা বস্তু কোন ব্যক্তির দখলে আছে বলিয়া আদালতের জানা নাই ; অথবা

যখন আদালত মনে করেন যে, সাধারণ তল্লাশি বা পরিদর্শন দ্বারা এই কার্যবিধি অনুসারে পরিচালিত কোন তদন্ত, বিচার বা অন্য কোন কার্যক্রমের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

তখন আদালত তল্লাশি পরোয়ানা প্রদান করিতে পারেন এবং যে ব্যক্তির প্রতি এই পরোয়ানা নির্দেশিত হইবে তিনি পরোয়ানা ও অতঃপর বর্ণিত বিধান অনুসারে তল্লাশি বা পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

www.pathagar.com

(২) অত্র আইনে বর্ণিত কোন বিধান জিলা ম্যাজিস্ট্রেট বা চিফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট ব্যতীত অপর কোন ম্যাজিস্ট্রেটকে ডাক বা তার কতৃপক্ষের হেফাজতে রক্ষিত কোন দলিল, পার্সেল বা অন্য কোন বস্তু তল্লাশির জন্য পরোয়ানা মঞ্জুর করার কর্তৃত্ব দিবে না।

৯৭। পরোয়ানা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা

আদালত উপযুক্ত মনে করিলে পরোয়ানায় এমন কোন স্থান বা উহার অংশবিশেষ নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারেন যেখানে তল্লাশি বা পরিদর্শন সীমাবদ্ধ থাকিবে, এবং যে ব্যক্তির উপর উক্ত পরোয়ানা কার্যকরী করার দায়িত্ব থাকিবে, তিনি কেবল উক্তরূপে নির্দিষ্ট স্থান বা তার অংশবিশেষ তল্লাশি বা পরিদর্শন করিবেন।

ধারা-৯৮। যে বাড়িতে চোরাই মাল, জাল দলিল প্রভৃতি আছে বলিয়া সন্দেহ করা হয়, তথায় তল্লাশি করা ;

(ক) কোন জিলা ম্যাজিস্ট্রেট, মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট, মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট অথবা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট খবর পাইয়া প্রয়োজনীয় তদন্তের পর যদি তাহার এইরূপ বিশ্বাস করার কারণ ঘটে যে, কোন স্থানে চোরাই মাল মজুত রাখা বা বিক্রয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। অথবা

জাল দলিল, নকল করার বা জালিয়াতি করার যন্ত্রপাতি বা সাজসরঞ্জাম জমা রাখা, বিক্রয় বা প্রস্তুত করার জন্য ব্যবহৃত হয় ; অথবা

কোন স্থান জালদলিল, নকল সিল বা নকল টিকেট বা মুদ্রা অথবা মুদ্রা বা টিকেট জাল বা নকল করার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বা সাজসরঞ্জাম রাখা বা জমা দেওয়া হয় ; অথবা

কোন জিলা ম্যাজিস্ট্রেট বা মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট খবর পাইয়া প্রয়োজনীয় তদন্তের পর যদি তার এরূপ বিশ্বাস করার কারণ ঘটে যে, কোন স্থান দণ্ডবিধির ২৯২ ধারায় বর্ণিত কোন অশ্লীল বস্তু রাখা, বিক্রয় প্রস্তুত বা উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। অথবা কোন স্থানে এইরূপ কোন অশ্লীল বস্তু রাখা বা জমা করা হয়।

তাহা হইলে তিনি পরোয়ানা প্রদান করিয়া কনস্টেবল পদের উপরস্থ কোন পুলিশ অফিসারকে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে কর্তৃত্ব দিতে পারেন :

প্রয়োজন অনুসারে সাহায্য লইয়া এইরূপ স্থানে প্রবেশ করার, এবং

(খ) পরোয়ানার নির্দিষ্ট উপায়ে উক্ত স্থানে তল্লাশি করার, এবং

(গ) সেখানে প্রাপ্ত যে কোন সম্পত্তি, দলিল, সিল, টিকেট বা মুদ্রা যেগুলোকে তিনি যুক্তিসঙ্গতভাবে চোরাই বেআইনিভাবে সংগৃহীত, জাল, মিথ্যা বা নকল বলিয়া মনে করেন এবং উপরোক্ত যন্ত্রপাতি ও সাজ সরঞ্জাম অথবা কোন অশ্লীল বস্তুর দখল গ্রহণ করার , এবং

(ঘ) এইরূপ সম্পত্তি দলিল, সিল, টিকেট, মুদ্রা, যন্ত্রপাতি বা সাজসরঞ্জাম অথবা অশ্লীল বস্তু কোন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করার, অথবা অপরাধীকে যতক্ষণ পর্যন্ত ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট

www.pathagar.com

হাজির করা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত উহা ঘটনাস্থলে পাহারা দিয়া রাখার অথবা অন্য কোনভাবে উহা কোন নিরাপদ স্থানে রাখার, এবং

(ঙ) এইরূপ কোন সম্পত্তি চোরাই বা অন্য কোন উপায়ে বেআইনিভাবে সংগৃহীত, অথবা এইরূপ দলিল, সিল, টিকেট মুদ্রা, যন্ত্রপাতি বা সাজসরঞ্জাম জাল, মিথ্যা বা নকল অথবা এইরূপ যন্ত্রপাতি বা সাজসরঞ্জাম মুদ্রা বা টিকেট নকল বা জাল করার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে বা হইবে, অথবা এইরূপ অশ্লীল বস্তু বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া, বন্টন, প্রকাশ্যে প্রদর্শন, প্রচার, আমদানি বা রপ্তানি করা হইয়াছে বা হইবে বলিয়া জানিয়া যাহারা এইরূপ সন্দেহ করার কারণ আছে বলিয়া জানিয়া অথবা এইরূপ সম্পত্তি, দলিল, সিল, টিকেট, মুদ্রা, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম বা অশ্লীল বস্তু জমা রাখা, বিক্রয় প্রস্তুত বা রাখার সহিত জড়িত আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, ঘটনাস্থলে উপস্থিত এইরূপ প্রত্যেকটি লোককে গ্রেফতার করার ও কোন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট লইয়া যাওয়ার।

২। এই ধারার বিধানসমূহ—

(ক) জাল মুদ্রা,

(খ) জাল বলিয়া সন্দেহযুক্ত মুদ্রা, এবং

(গ) মুদ্রা জাল করার যন্ত্রপাতি বা সাজসরঞ্জাম সম্পর্কিত বিধান যথাসম্ভব যথাক্রমে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(ক) ১৮৮৯ সালের ধাতু প্রতীক আইন লঙ্ঘন করিয়া প্রস্তুত অথবা ১৯৬৯ সনের শুল্ক আইনের ১৬ ধারা অনুসারে প্রদত্ত বর্তমানে বলবৎ কোন বিজ্ঞপ্তি লঙ্ঘন করিয়া বাংলাদেশে আনীত ধাতুর খণ্ড,

(খ) উক্ত রূপে প্রস্তুত বলিয়া অথবা উক্তরূপে বাংলাদেশে আনীত বলিয়া সন্দেহযুক্ত, অথবা উপরিউক্ত আইনদ্বয়ের প্রথমটি লঙ্ঘন করিয়া বিলি করার নিমিত্ত ধাতুর খণ্ড, এবং

(ঘ) উক্ত আইন লঙ্ঘন করিয়া ধাতুর খণ্ড প্রস্তুতের যন্ত্রপাতি বা সাজসরঞ্জাম।

ধারা ৯৯। **অধিক্ষেত্রে বহির্ভূত স্থানে তল্লাশির সময় প্রাপ্ত জিনিসের বিলি ব্যবস্থা**

যখন প্রদানকারী আদালতের অধিক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার বাইরে কোন স্থানে তল্লাশি পরোয়ানা কার্যকরী করিতে গিয়া যে সকল জিনিসের তল্লাশি করা হইতেছে উহার কোনটি পাওয়া যায়, তখন অতঃপর সন্নিবেশিত বিধান অনুসারে প্রণীত উহার তালিকাসহ সেই জিনিস অবিলম্বে পরোয়ানা প্রদানকারী আদালতে দাখিল করিতে হইবে ; তবে এইরূপ স্থান উক্ত আদালত অপেক্ষা কোন এখতিয়ারসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকটতর হইলে উক্ত তালিকা ও জিনিস অবিলম্বে উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দাখিল করিতে হইবে ; এবং অন্যরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের সঙ্গত কারণ না থাকিলে উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত তালিকা ও জিনিস উক্ত আদালতে লইয়া যাওয়ার কর্তৃত্ব সম্বলিত আদেশ দিবেন।

www.pathagar.com

ধারা ১০০। বেআইনিভাবে আটক ব্যক্তির জন্য তল্লাশি

যখন কোন মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের এইরূপ বিশ্বাস করার কারণ ঘটে যে, কোন ব্যক্তিকে এমন পরিস্থিতিতে রাখা হইয়াছে যাহাতে আটক রাখা অপরাধে পরিণত হয়, তখন তিনি তল্লাশি পরোয়ানা প্রদান করিতে পারেন এবং যাহার প্রতি পরোয়ানাটি নির্দেশিত হইবে, তিনি পরোয়ানা অনুসারে উক্ত আটক ব্যক্তির জন্য তল্লাশি করিতে পারিবেন এবং উক্ত ব্যক্তিকে যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে অবিলম্বে তাহাকে কোন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করিতে হইবে এবং তিনি ঘটনার পরিস্থিতি অনুসারে উপযুক্ত আদেশ দিবেন।

ধারা ১০১। তল্লাশি পরোয়ানার নির্দেশ প্রভৃতি

ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৩, ৭৫, ৭৭, ৭৯, ৮২, ৮৩, ৮৪ ধারার বিধানসমূহ যথাসম্ভব ৯৬, ৯৮, ৯৯-ক ও ১০০ ধারা অনুসারে প্রদত্ত তল্লাশি পরোয়ানার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

ধারা ১০২। আবদ্ধ স্থানের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি তল্লাশি করিতে দিবে

(১) এই অধ্যায় অনুসারে তল্লাশি বা পরিদর্শনযোগ্য কোন স্থান যদি বন্ধ থাকে তাহা হইলে তথায় বসবাসকারী বা উক্তস্থানে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি, পরোয়ানা প্রয়োগকারী অফিসার বা অন্য কোন ব্যক্তি দাবি করিলে ও পরোয়না দেখাইলে তাহাকে অবাধে তথায় প্রবেশ করিতে দিবেন ও তল্লাশির সকল প্রকার যুক্তিসঙ্গত সুবিধা দিবেন।

(২) যদি উক্ত স্থানে প্রবেশ করা না যায়, তাহা হইলে উক্ত অফিসার বা পরোয়ানা প্রয়োগকারী অন্য কোন ব্যক্তি ৪৮ ধারায় বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে অগ্রসর হইতে পারেন।

যে বস্তু সম্পর্কে তল্লাশি হওয়া উচিত, উক্ত স্থানে বা স্থানের নিকটে কোন ব্যক্তি উক্ত বস্তু তাহার দেহে লুকাইয়া রাখিতেছে বলিয়া যদি যুক্তিসঙ্গতভাবে সন্দেহ করা যায়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির দেহ তল্লাশি করা যাইতে পারে। উক্ত ব্যক্তি স্ত্রীলোক হইলে ৫২ ধারা নির্দেশাবলী অনুসরণ করিতে হইবে।

ধারা ১০৩। সাক্ষির উপস্থিতিতে তল্লাশি চালাইতে হইবে

(১) এই অধ্যায় অনুসারে তল্লাশি করার পূর্বে তল্লাশি করিতে উদ্যত অফিসার বা অন্য কোন ব্যক্তি, যে স্থান তল্লাশি করা হইবে সেই এলাকার দুইজন বা ততোধিক সম্মানিত অধিবাসীকে তল্লাশিতে হাজির থাকিতে ও উহার সাক্ষি হইতে আহ্বান জানাইবেন এবং এইরূপ করার জন্য তাহাদিগকে বা তাহাদের যে কোন একজনের প্রতি লিখিত আদেশ দিতে পারিবেন।

(২) তাহাদের উপস্থিতিতে তল্লাশি করিতে হইবে এবং উক্ত অফিসার বা অন্য ব্যক্তি তল্লাশির সময় আটক সমস্ত জিনিস ও যে স্থানে সেগুলো পাওয়া গিয়াছে উহার একটি তালিকা

www.pathagar.com

প্রস্তুত করিবেন এবং উক্ত সাক্ষিগণ তালিকায় দস্তখত করিবেন, তবে আদালত যদি বিশেষভাবে সমন দিয়া তলব না করেন, তাহা হইলে এই ধারা অনুসারে পরিচালিত তল্লাশির কোন সাক্ষিকে উক্ত তল্লাশির সাক্ষি হিসাবে আদালতে হাজির হইতে নির্দেশ দেওয়া যাইবে না।

(৩) তল্লাশিকৃত স্থানের দখলকারী ব্যক্তি অথবা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তল্লাশির সময় হাজির থাকার অনুমতি দিতে হইবে এবং উক্ত দখলকারী ব্যক্তি বা তাহার প্রতিনিধি অনুরোধ করিলে তাহাকে এই ধারা অনুসারে প্রণীত ও উপরিউক্ত সাক্ষিগণের স্বাক্ষরিত তালিকার একটি নকল দিতে হবে।

(৪) যখন ১০২ ধারা (৩) উপধারা অনুসারে কোন ব্যক্তির দেহ তল্লাশি করা হইবে, তখন যে সকল জিনিসের দখল গ্রহণ করা হইল উহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি অনুরোধ করিলে তাহাকে উহার একটি নকল দিতে হইবে।

(৫) লিখিত আদেশ দ্বারা আহ্বান জানানো সত্ত্বেও যে ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত এই ধারা অনুসারে পরিচালিত কোন তল্লাশিতে হাজির হইতে ও সাক্ষি হইতে অস্বীকার বা অবহেলা করেন, তিনি দণ্ডবিধির ১৮৭ ধারায় বর্ণিত অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

বাংলাদেশের আইনে চিঠিপত্রের গোপনতা

আইনের দ্বারা যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ ছাড়া কোন নাগরিকের খামে বন্ধ চিঠি খোলা যায় না, টেলিফোন টেপ করা যায় না, কথোপকথন টেপ করা যায় না।

বস্তুত বাংলাদেশের আইন দেশের প্রতিটি নাগরিকের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, পরিবার, বসতবাড়ী, চিঠিপত্র ইত্যাদির উপর অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বৈরাচারী হস্তক্ষেপকে অবদমিত করে। তেমনিভাবে সুনাম এবং সম্মানের নিশ্চয়তা বিধানের জন্যও আইন রয়েছে। রাষ্ট্রীয় আইনই মানুষের মানবিক অধিকার রক্ষা করতে পারে। এই জাতীয় মানবাধিকার রক্ষার আইনগত নিশ্চয়তা অপরিহার্য।

এই অনুচ্ছেদ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তি

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদ পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে আন্তর্জাতিক চুক্তির ১৭ নং অনুচ্ছেদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। নিম্নে তা পরিবেশিত হল :

অনুচ্ছেদ : ১৭

(১) কোন ব্যক্তির গোপনীয়তা, পরিবার, গৃহ অথবা পত্র আদান প্রদানের ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারমূলক অথবা বেআইনিভাবে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। অথবা তার সম্মান ও সুনামের উপর বেআইনিভাবে আক্রমণ করা চলবে না।

www.pathagar.com

(২) অনুরূপ হস্তক্ষেপ কিংবা আক্রমণের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয়লাভের অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির থাকিবে।

মানবাধিকার সংক্রান্ত ইউরোপীয় কনভেনশনের ৮ নং অনুচ্ছেদও অনুরূপ। নিম্নে তা পরিবেশিত হল :

অনুচ্ছেদ : ৮

(১) প্রত্যেক ব্যক্তির তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন, তাঁর গৃহ ও চিঠিপত্র-এর প্রতি সম্মানলাভের অধিকার আছে।

(২) আইন অনুযায়ী ব্যতীত এবং একটি গণতান্ত্রিক সমাজে জাতীয় নিরাপত্তা, জননিরাপত্তা অথবা দেশের অর্থনেতিক সমৃদ্ধির স্বার্থে বিশৃঙ্খলা অথবা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির স্বার্থে বিশৃঙ্খলা অথবা অপরাধ নিরোধের জন্য, স্বাস্থ্য অথবা নৈতিকতা সংরক্ষণ অথবা অন্যের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যেরূপ প্রয়োজন সেরূপ ব্যতীত, এই অধিকার উপভোগ বা প্রয়োগের উপর কোন সরকারি কর্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপ করবে না।

এই অনুচ্ছেদ ও ইসলাম

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদের মূল বক্তব্য হচ্ছে ব্যক্তিগত পারিবারিক ও চিঠিপত্রের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তার অধিকার। এ বিষয়ে ইসলামে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে।

ইসলামে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিষয়ের উপর অনুচিত হস্তক্ষেপ কিংবা শক্তি প্রয়োগের কোনই অবকাশ নেই। কোন অজুহাতে ব্যক্তিগত গোপনীয়তায় অবশ্যই বিঘ্ন সৃষ্টি করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে কুরআনের সুরা হুজরাতের নিম্নোক্ত আয়াত উদ্ধৃত করছি। এতে বলা হয়েছে, "হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা অতিরিক্ত অনুমান থেকে বিরত হও, নিশ্চয়ই কোন কোন অনুমান পাপজনক। এবং তোমরা গুপ্তচর হইও না এবং অসাক্ষাতে পরস্পরের দুর্নাম করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে ভালবাসে? কিন্তু তোমরা তা ঘৃণা করে থাকো এবং আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমতাবান, করুণাময়।" এই আয়াতে অনুমান, গোয়েন্দাগিরি, এবং পরচর্চাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অনুমান বা সন্দেহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভিত্তিহীন নিন্দনীয় অপরাধ। কারণ সন্দেহের কারণে অনেক সময় নিরপরাধ মানুষের উপর মারাত্মক অবিচার হতে পারে। অপরের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ, গোয়েন্দাগিরি, গুপ্তচর বৃত্তি ইত্যাদির মানেই হচ্ছে সন্দেহসৃষ্টি। এই সন্দেহ প্রবণতাও পাপ। অসাক্ষাতে নিন্দাও ঠিক তেমনি। এসবের ফলে মানুষ যা নয় তা মনে করে তার প্রতি অবিচার করা ইসলামের দৃষ্টিতে গর্হিত কাজ।

www.pathagar.com

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা অর্থাৎ গোপনীয়তা রক্ষা করে চলার জন্য কুরআনের সূরা নূরে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। বলা হয়েছে, "হে বিশ্বাসিগণ, তোমারা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অপরের গৃহে প্রবেশ করো না। — যে পর্যন্ত অনুমতি গ্রহণ না করো। এবং গৃহের অধিবাসীদের প্রতি সালাম করো। ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা অনুধাবন করতে পার।" ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা মানব জীবনের স্বাভাবিক বিকাশের জন্য অপরিহার্য। ইসলামের বিধান বা রীতি হচ্ছে অন্যের ঘরে প্রবেশের জন্য বিনয়ের সাথে অনুমতি প্রার্থনা ও সালাম প্রদান করা। অন্যের ঘরে আকস্মিকভাবে প্রবেশ করে কাউকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলা ইসলামের রীতি নয়।

হযরত মুহাম্মদ (দঃ) তার সাহাবাগণকে এই উপদেশ দিতেন যে, নিজের ঘরেও আকস্মিকভাবে গোপনীয়ভাবে প্রবেশ করা উচিত নয়। ঘরে প্রবেশের সময় এমনভাবে প্রবেশ করবে যে, গৃহবাসী যেন বুঝতে পারে যে কেহ ঘরে প্রবেশ করছে। কারো ঘরে প্রবেশের পূর্বাভাষ পেয়ে গৃহবাসী যেন সতর্ক হয়ে যেতে পারে। কারণ গৃহাভ্যন্তরে মানুষ অগোছালো থাকতে পারে। যে দৃশ্যটা অন্যের না দেখাই ভাল। এমনিভাবে অন্যের গৃহে উঁকি মেরে দেখা। অন্যের চিঠিপাঠ বা এতে দৃষ্টিপ্রদান ইসলাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

সারসংক্ষেপ

পাবিরাবিক নিভৃতি এবং যোগাযোগের গোপনীয়তা সংরক্ষণ একটি মানবিক অধিকার। প্রত্যেক পরিবারের প্রত্যেক গৃহের আছে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা, প্রত্যেক পরিবারের আছে একটি বিশিষ্ট মহিমা। এগুলির ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ মানুষের মহিমা ও মর্যাদার উপর জুলুম।

যোগাযোগ বা চিঠিপত্রের গোপনীয়তাও এমন একটি মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের সহায়ক সম্পদ যে, তার খেলাপ সাধারণত সহনীয় নয়। আমি কখন কাকে কিভাবে কি লিখছি বা বলছি তা যদি কোন সতর্ক প্রহরায় শ্যেন চক্ষুর আওতায় থাকে তাহলে স্বাভাবিকভাবে আমার লেখা বা বলা পরিণত স্ফূর্তি পায় না, লেখা বা বলা তখন আড়ষ্ট হয়ে যায়। সেই আড়ষ্টতা মনুষ্যত্ব বিকাশের পথে কঠিন বাধা।

মানুষের সুনাম একটি দুর্লভ সম্পত্তি। এই সুনামের উপর মৃদু আঘাতও আহত ব্যক্তির বুকে কঠিন বাধা হয়ে বিধে। সুনাম সংরক্ষণের জন্য তাই মানবাধিকারের এই ঘোষণা । এইগুলি ব্যাহত হলে আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার সকলেরই রয়েছে।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

ক. প্রত্যেকেরই রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে চলাচল ও বসতি স্থাপনের অধিকার রয়েছে।

খ. প্রত্যেকেরই নিজদেশসহ যে কোন দেশ ছেড়ে যাওয়ার ও স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অধিকার রয়েছে।

(Article : 13. (1) Everyone has the right to freedom of movement and resedence within the borders of each state.

(2) Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.)

ভাষ্য

আলোচ্য অনুচ্ছেদে প্রত্যেক ব্যক্তির নিম্নোক্ত অধিকারগুলোর কথা বলা হয়েছে :

১. রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে চলাচলের অধিকার

২. বসতি স্থাপনের অধিকার

৩. যে কোন দেশ ত্যাগের অধিকার

৪. স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অধিকার।

ব্যক্তিজীবনে উপরোক্ত চারটি অধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়গুলো যথার্থভাবে অনুধাবনের জন্য প্রত্যেকটি পৃথকভাবে বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

রাষ্ট্রীয় সীমানা চিহ্নিতকরণ

রাষ্ট্রীয় সীমানা প্রাকৃতিক ও কৃত্রিমভাবে চিহ্নিত হতে পারে। রাষ্ট্রীয় সীমানা এমন একটি চিহ্ন যা দ্বারা একটি রাষ্ট্রের ভূখণ্ডকে অন্য রাষ্ট্রের ভূখণ্ড থেকে পৃথক করা যায়। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের বিস্তৃতির পরিধি নির্ধারণের জন্য রাষ্ট্রীয় সীমানা চিহ্নিত করা একান্ত দরকার। একটি রাষ্ট্রের সুনির্দিষ্ট সীমানা ব্যতীত ঐ রাষ্ট্র তার সকল এলাকার উপর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না।

বিশেষ চিহ্ন বা রেখা দ্বারা সীমানা নির্ণয় করা হয়। পর্বতমালা, সমুদ্র, নদীসমূহ, মরুভূমি প্রভৃতি প্রাকৃতিকভাবে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডকে পৃথক করে থাকে। আবার দুই রাষ্ট্রের স্থলভাগ সীমান্তে পাথর পুঁতে কাঁটা তারের বেড়া সৃষ্টি করে, প্রাচীর নির্মাণ করে প্রভৃতি পদ্ধতিতে

www.pathagar.com

রাষ্ট্রীয় সীমানা চিহ্নিত করা যায়। অধিকাংশ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

যেখানে দু'টি রাষ্ট্রের ভূখণ্ড কোন হ্রদ, জলভাগ বা নদী দ্বারা পৃথক হয়েছে, সে ক্ষেত্রে ঐ দু'টি রাষ্ট্রের সীমানাচিহ্ন ঐ হ্রদ জলভাগ বা নদীর মধ্যভাগ দিয়ে চিহ্নিত হবে। যে ক্ষেত্রে কোন পর্বতমালা দুইটি রাষ্ট্রীয় ভূ-খণ্ডকে পৃথক করে সে ক্ষেত্রে একটি রাষ্ট্রই সমগ্র পর্বতমালা নিজ সীমানায় লাভ করতে পারে। অথবা দুটি রাষ্ট্রই ঐ পর্বতমালার সমান অংশের মালিক হতে পারে।

রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে আপত্তির উদ্ভব হলে, রাষ্ট্রসমূহের দূতদের মাধ্যমে আলোচনা ও অঙ্গীকার নামার দ্বারা তা মীমাংসা করা হয়। আবার সালিশীর মাধ্যমেও রাষ্ট্রীয় সীমানা সংক্রান্ত সম্পর্কিত আপত্তির নিষ্পত্তি করা হয়ে থাকে। সীমানা সংক্রান্ত সমস্যা পর্যবেক্ষণের জন্য কমিশন গঠন করারও প্রয়োজন হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর মধ্যে সীমানা নির্ধারণে আপত্তি উঠলে ১৮৮২ সালে উভয় রাষ্ট্রই তাদের সীমানা চিহ্নিত করার জন্য আন্তর্জাতিক কমিশন নিয়োগে সম্মত হয়েছিল। অনুরূপভাবে ১৯০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা অঙ্গীকার চুক্তির মাধ্যমে নিজ নিজে দেশের সীমানা নির্ধারণ করেছিল।

ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীনতা অর্জন করার পর এই দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত সংক্রান্ত আপত্তির উদ্ভব হয়। উভয় দেশই সীমান্ত সমস্যাসমূহ নিষ্পত্তির জন্য সালিশী কর্তৃপক্ষের কাছে উত্থাপন করে। তৎপর র‍্যাট ক্লিপ এওয়ার্ড ১৯৪৭ (Rateliffe Award 1947) দ্বারা এই দুই দেশের সীমান্ত সংক্রান্ত সমস্যার নিষ্পত্তি করা হয়েছিল ।

কোন রাষ্ট্রের সীমানা কোন এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত তা সুস্পষ্ট করার জন্য সীমান্তে দেওয়াল, খুঁটি, কাঁটাতারের বেড়া স্তম্ভ প্রভৃতির দ্বারা নির্দেশ করা হয়। অনুরূপভাবে দু'টি রাষ্ট্রের জলসীমা নির্দেশ করার জন্য জলসীমান্তের উপর ভাসমান বল বা অন্য কিছু দ্বারা চিহ্ন দেওয়া যায়।

রাষ্ট্রীয় সীমানা যে নীতির ভিত্তিতেই নির্ধারিত হোক এবং যা দিয়েই চিহ্নিত হোক এই সীমানার অভ্যন্তরে চলাচল এবং বসতিস্থাপন ও বসবাসের অবাধ অধিকারের কথা আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। কোন কারণে দেশ ত্যাগকালে পুনর্প্রবেশের অধিকারের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় সীমার অভ্যন্তরভাগ পুরোটাই প্রত্যেক নাগরিকের স্বদেশভূমি হিসাবে বিবেচিত।

রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে চলাচলের অধিকার

মানুষের যে সকল স্বাধীনতা রয়েছে এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে চলাচলের অধিকার। ব্যক্তি যে রাষ্ট্রের নাগরিক সে রাষ্ট্রের মধ্যে চলাচলের অধিকার তার রয়েছে। চলাচলের অধিকার অনেক ব্যাপক।

মুক্তবিহঙ্গ যেমন স্বাধীনভাবে উড়ে বেড়ায় নীল আকাশের বুকে তেমনি মানুষও স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে চায়। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সে ঘুরে বেড়াতে চায় বিশ্বব্যাপী। কিন্তু ইচ্ছা

www.pathagar.com

করলেই তো আর সবখানে যাওয়া যায় না। একটা সময় ছিল যখন বিশ্বব্যাপী ঘুরে বেড়াতে তার কোন বাধা নিষেধ ছিল না কিন্তু কালক্রমে আন্তর্জাতিক আইন কানুন চালু হয় এবং ব্যক্তির অবাধ চলাফেরার গণ্ডি জাতীয় রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ হয়। এখন এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দেশের নির্ধারিত নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয়। দেশ থেকে দেশে যেতে বাধা নিষেধ আছে, আছে আইন কানুন নিয়মনীতি কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে চলাচলের ক্ষেত্রে মানুষের স্বাধীনতা রয়েছে।

একজন ব্যক্তির যেখানেই জন্ম হোক, যেখানেই বসবাস করুক না কেন তার দেশের সর্বত্র তিনি যাতায়াত করতে পারেন। যাতায়াত ও চলাফেরার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে কোন বাধা নেই। বাধাহীন চলাফেরা করার স্বাধীনতা তার মৌলিক অধিকার। চলাফেরা করার ক্ষেত্রে বাধা নিষেধ পরাধীনতারই নামান্তর। মানুষ স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের যে অধিকার নিয়ে জন্মেছে স্বাধীনভাবে দেশের অভ্যন্তরে চলাফেরার অধিকার এর অন্তর্ভুক্ত।

স্বাধীনভাবে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে চলাচল এবং যাতায়াতের ক্ষেত্রে বাধানিষেধ থাকা আর কারাগারে বসবাস প্রায় সমপর্যায়ের। তাই প্রতিটি মানুষের এই অধিকার রয়েছে যে, সে স্বাধীনভাবে নিজের দেশের অভ্যন্তরে চলাচল করতে পারবে।

তবে এই স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বাধা নিষেধ থাকতে পারে। সে বাধা নিষেধ হবে আইনের। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা, জননিরাপত্তা ও জনস্বার্থে এই অধিকার আইন দ্বারা সঙ্কুচিত হতে পারে। স্বাধীনভাবে চলাচলের ক্ষেত্রে বাধানিষেধ অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত হওয়া চাই।

যেমন : কোথাও যদি প্লেগ বা অন্য কোন সংক্রামক রোগের মহামারি বা প্রকোপ দেখা দেয় তাহলে এর প্রসার বন্ধ করার জন্য সে স্থানে নাগরিকদের চলাফেরার স্বাধীনতা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। সংক্রামক রোগে আক্রান্ত রোগীদের সাধারণ পরিবহণে যাতায়াতকে আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ করা যেতে পারে। যে এলাকায় সংক্রামক রোগের আক্রমণ ঘটেছে সেখানে সুস্থ মানুষের চলাফেরা নিষিদ্ধ হতে পারে। দুর্গ, পুরাকীর্তি প্রভৃতি সংরক্ষিত এলাকায় জনসাধারণের যাতায়াত সংরক্ষিত হতে পারে। দাগি আসামি, দুস্কৃতকারী এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী লোকদের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হতে পারে। অর্থাৎ যাদের অবাধ চলাচল অন্যের স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনে বাধার সৃষ্টি করে আইন দ্বারা তাদের স্বাধীনভাবে চলাচলের অধিকার হরণ করা যায়। এর কারণ হচ্ছে স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারীতাকে প্রশ্রয় দেয় না। এবং যারা স্বাধীনভাবে চলাচলের অধিকার নিয়ে অপরের স্বাধীনতার বিঘ্ন ঘটায় তাদের চলাচলের অধিকার নিয়ন্ত্রিত করা আইনসঙ্গত।

বসতিস্থাপনের অধিকার

মানুষ জন্ম নেয় বাড়িতে, হাসপাতালে এমনকি রাস্তায়। কেউ জন্মায় শহরের সুরম্য অট্টালিকায়, অজপাড়া-গাঁয়ের নিভৃত কোণে। যে যেখানেই জন্ম নিক সমগ্র স্বদেশ ভূমিই তার

www.pathagar.com

মাতৃভূমি। তাই দেশের যে কোন অঞ্চল যদি বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহলে -মাতৃকার জন্য সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে সারাদেশের মানুষ। আমরা যেহেতু সমগ্র দেশটাকে মাতৃভূমি মনে করি এবং দেশের যে কোন এক ব্যক্তি আক্রান্ত হলে সকলেই ব্যথা অনুভব করি এক দেহের মত, সেহেতু সমগ্র দেশের যে কোন স্থানে বসতি স্থাপনের অধিকার আমাদের রয়েছে।

প্রত্যেক দেশেই অঞ্চল ভেদে মানুষজনের ভাষা চালচলন, আচার ব্যবহার, রীতিনীতি ইত্যাদির মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। একই দেশের মানুষের মধ্যেও রুচি ও বৈশিষ্ট্যগত ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন দক্ষিণ ভারতের মানুষ আর পশ্চিম বঙ্গের মানুষের মধ্যে বিস্তর ফারাক। সকল পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একই জাতীয় রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বসবাসরত সকল মানুষ, সকল নাগরিক একই ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ। দেশাত্মবোধের এই ঐক্যসূত্রের কারণে মানুষ পুরো দেশকে নিজের মনে করে যেমন আমরা মনে করি আমার দেশ বাংলাদেশ। দেহের একটি অংশে আঘাত লাগলে যেমন সর্বাঙ্গে ব্যথা অনুভূত হয় তেমনি দেশের যে কোন অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হলে সারা দেশে প্রতিক্রিয়া হয়। নিজের দেশের যে কোন জায়গায় বসতি স্থাপন করা এবং বসবাস করার অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

প্রশাসনিক কারণে একটি দেশে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত হয়। যেমন প্রদেশ, বিভাগ, জেলা, রাজ্য, কাউন্টি ইত্যাদি। দেশের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য এই ব্যবস্থা নেওয়া হয় কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অঞ্চলগুলো পরস্পর থেকে পৃথক এবং অধিবাসীরা একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন বরং এ হচ্ছে দেশ পরিচালনার সুবিধার জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা। এক জেলার মানুষের অন্য জেলায় যেতে যেমন কোন বাধা নেই তেমনি এক জেলার মানুষের অন্য জেলায় বসতি স্থাপনেও কোন বাধা নেই। দেশের যে কোন স্থানে বসতি স্থাপনের জন্য কোন নাগরিকের কোন রকম প্রতিবন্ধকতা থাকে না, থাকতে পারে না।

যদি এমন হয় যে এক দেশের এক জেলার মানুষের অন্য জেলায় যেতে অনুমতি লাগে এক এলাকার মানুষ অন্য এলাকায় বসবাস করতে বাধানিষেধ থাকে তাহলে সমগ্র দেশটাকে সকলে নিজের মত করে ভাবতে পারে না। এতে দেশপ্রেম এবং দেশাত্মবোধ খর্ব হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই একটি দেশের প্রত্যেক নাগরিকের সে দেশের অভ্যন্তরে যে কোন স্থানে অবাধে যাতায়াতের এবং বসতি স্থাপনের অধিকার নিশ্চিত করা দরকার। মানুষ হিসেবে প্রত্যেকেরই নিজের দেশের যে কোন স্থানে বসবাসের অধিকার রয়েছে।

দেশ ছেড়ে যাওয়ার অধিকার

প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজ দেশসহ যে কোন দেশ ছেড়ে যাওয়ার অধিকার এর অন্তর্ভুক্ত। দেশ ছেড়ে যাওয়ার অধিকারটি চলাচলের স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত। কোন দেশ ছেড়ে যাওয়ার এবং অন্য দেশে প্রবেশের অধিকার এক রকম নয়। প্রতিটি দেশে তার নাগরিকদের বহির্গমনের সুনির্দিষ্ট নিয়ম কানুন রয়েছে তেমনি রয়েছে বিদেশীদের বহির্গমনের বিধান। সেই বিধান মেনে দেশ ত্যাগ করার অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির রয়েছে।

www.pathagar.com

পাখি আকাশে উড়তে চায়, যে দিকে খুশি যেতে চায়। এই চাওয়াটা তার প্রকৃতি। খাঁচায় বন্দী পাখির খাওয়া পরার অভাব হয় না। তেমনি অভাব হয় না নিরাপত্তার। পাখি যিনি পোষেন তিনি পাখিকে মাঝে মাঝে ডাক্তারও দেখান, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং হিংস্র জীব জানোয়ারের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। সেদিকটা বিবেচনা করলে পাখি খাঁচায় থাকে বেশ । কিন্তু তার পরও পাখি বন্দী থাকতে চায় না। খাওয়া পরার নিশ্চয়তাসহ বন্দী জীবনের চেয়ে অনিশ্চিত স্বাধীন জীবন তার পছন্দ। স্বাধীন জীবনে মনের সুখে ঘুরে বেড়ানো যায়। মানব প্রকৃতিও স্বাধীনচেতা। সে স্বাধীনভাবে চলাচল করতে চায়। চলাচলের একটা দিক হচ্ছে দেশ ত্যাগ। কেউ যদি কোন দেশ ছেড়ে যেতে চায়, তাকে বাধা প্রদান করা যাবে না, সেটা তার মাতৃভূমি হলেও। দেশ ছাড়তে বাধা প্রদান স্বাধীনতা হরণেরই নামান্তর।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অধিকার

মানুষ স্বদেশ ছেড়ে ভিন দেশে যেতে পারে। কারণে অকারণে যেতে পারে। যেতে পারে উন্নততর জীবিকার সন্ধানে, অথবা শুধুমাত্র পর্যটনের জন্য। বিভিন্ন কারণে মানুষ প্রিয় জন্মভূমি, আত্মীয় পরিজন ছেড়ে ভিন দেশে যায়। স্বদেশ ছেড়ে ভিন্ দেশে যাওয়ার স্বাধীনতা যেমন মানুষের আছে তেমনি স্বাধীনতা আছে স্বদেশে ফিরে আসারও।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রতিভা। যিনি অনেক দিন বিদেশে অতিবাহিত করার পরও স্বদেশের ও মাতৃভাষার মায়া কাটাতে পারেন নি, অবশেষে ফিরে এসেছেন মাতৃভূমিতে। মাইকেলের লেখনীতে মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি দরদ ফুটে উঠেছে।

বঙ্গভাষা কবিতায় কবি লিখেছেন :

পাইলাম কালে
মাতৃভাষারূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে

কপোতাক্ষ নদ কবিতায় লিখেছেন :

সতত, হে নদ তুমি পড় মোর মনে।
সতত, তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনো (মায়ামন্ত্র ধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে।

কেউ যদি দীর্ঘদিন বিদেশে কাটানোর পর দেশে ফিরে আসতে চান তাহলে তাকে বাধাপ্রদান করা যাবে না। কারণ স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের অধিকার মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

www.pathagar.com

এই অনুচ্ছেদ ও আঞ্চলিকতা, জাতীয়তা এবং আন্তর্জাতিকতা

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদে প্রতিটি ব্যক্তির স্বদেশের সীমানায় চলাচল, বসতি স্থাপন,দেশত্যাগ এবং স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি অধিকারের কথা ঘোষণা করেছে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী জাতীয়তাবাদী ধারণার সাথে আন্তর্জাতিকতাবাদ যেমন জনপ্রিয় হচ্ছে তেমনি আঞ্চলিকতার ধারণাটিও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তাই প্রসঙ্গক্রমে আমরা এখানে আঞ্চলিকতা, জাতীয়তা এবং আন্তর্জাতিকতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি।

আন্তর্জাতিকতা

প্রত্যেক মানুষের যেমন নিজস্ব দেশীয় ঐতিহ্যবোধ ও চেতনা আছে তেমনি আছে তার বিশ্বজনীন বোধ। প্রত্যেকেই নিজ রাষ্ট্রের সদস্য বা নাগরিক এ কথা যেমন সত্যি তেমনি সে বিশ্ব মানব সমাজের সদস্য এ কথাও সত্যি। রাষ্ট্রের গণ্ডি যেমন আছে তেমনি আছে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল। বিভিন্ন কবি সাহিত্যিকের লেখনিতে আন্তর্জাতিকতার ভাবধারা ফুটে উঠেছে। নজরুল যেমন তার 'বিংশ শতাব্দী' কবিতায় লিখেছেন :

পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে
য়ুরোপ,রাশিয়া, আরব, মিসর, চিনে
আমরা আজিকে এক প্রাণ এক দেহ
এক বাণী— কারো অধীন র'ব না কেহ।

ফরিয়াদ কবিতায় বলেছেন ঃ

তোমার দেওয়া এ বিপুল পৃথি সকলে করিব ভোগ
এই পৃথিবীর নাড়ীর সাথে আছে সৃজন-দিনের যোগ।

জাতীয়তাবাদ হচ্ছে একটি ঐতিহ্যগত ধারণা। বংশ, ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি কারণে একটি জনসমষ্টির মধ্যে গভীর ঐক্যবোধ গড়ে উঠে। এই একাত্মবোধের জন্য ঐ জনসমাজের প্রত্যেকেই সুখ, দুঃখ, ন্যায়, অন্যায়, মান-অপমানের সমান অংশীদার বলে মনে করে। তখন তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ গড়ে ওঠে। এই জাতীয়তাবোধের সাথে দেশ প্রেম মিলে যখন তা একটি রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে গড়ে উঠে তখন তাকে জাতীয়তাবাদ বলে। জাতীয়তাবাদ মূর্ত হয়ে উঠে রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষার মধ্যে।

জাতীয়তাবাদ মানুষকে নিজ জাতির মত অন্য জাতিকেও ভালবাসতে শিক্ষা দেয়। এই আদর্শ জাতিকে যেমন আত্মপ্রত্যয়ের শিক্ষা দেয় তেমনি সমস্ত ক্ষুদ্রতা, ও সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা যোগায়। আদর্শ জাতীয়তাবাদ "নিজে বাঁচ, অপরকে বাঁচতে দাও।"—এই সুমহান আদর্শ প্রচারের মাধ্যমে বিশ্ব সভ্যতার প্রগতির পথ উন্মুক্ত করেছে।

www.pathagar.com

উনবিংশ শতাব্দী থেকেই জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকশিত হতে শুরু করে। এর ফলে সারা বিশ্বে জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতেই দেশে দেশে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন দানা বাধে এবং বিভিন্ন দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। অবশ্য উগ্র জাতীয়তাবাদ অনেক যুদ্ধেরও কারণ হয়েছিল। জাতি/রাষ্ট্রের সদস্য বা নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অবাধে চলাচলের অধিকার প্রতিটি মানুষেরই রয়েছে।

আন্তর্জাতিকতা হচ্ছে এমন একটি মানসিক অনুভূতি যা মানুষকে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্দীপ্ত করে। আন্তর্জাতিকতার আদর্শে আস্থাশিল ব্যক্তি কখনোই নিজেকে রাষ্ট্রীয় সংকীর্ণতার গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখতে চায় না। সে চায় বিশ্ব মানব সমাজের সদস্য হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে। সংকীর্ণ জাতীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে বিশ্বশান্তি, নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করাই আন্তর্জাতিকতার আদর্শে বিশ্বাসী প্রতিটি ব্যক্তির উদ্দেশ্য। তাই দেশ ত্যাগ ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের অধিকারটিকে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে জাতীয়তাবাদ এবং আন্তর্জাতিকতাবাদ যেমন জনপ্রিয় হচ্ছে তেমনি আঞ্চলিকতাবাদও মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। এটা একদিকে যেমন বিভিন্ন রাষ্ট্র নিয়ে অঞ্চলের সহযোগিতার জন্য দেখা দিচ্ছে তেমনি একটি দেশের বিভিন্ন এলাকার মধ্যেও আঞ্চলিক স্বার্থচিন্তা জোরদার হচ্ছে। যেমন বাংলাদেশে দক্ষিণ বঙ্গ, উত্তর বঙ্গ, বরিশাল, চট্টগ্রাম, সিলেট অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে নিজ নিজ অঞ্চলের সুবিধা স্বার্থ ইত্যাদি নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। আঞ্চলিক উন্নয়ন এবং অঞ্চলের অধিবাসীদের পশ্চাদপদতা থেকে মুক্তির জন্য এটা হতে পারে। কিন্তু তাই বলে এক অঞ্চলের অধিবাসীদের অন্য অঞ্চলে চলাচল ও যাতায়াতে বিঘ্ন সৃষ্টি করা যায় না। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে দেশের যে কোন অঞ্চলে চলাচল ও বসতি স্থাপনে কোন বাধা সৃষ্টি করা যাবে না।

সাম্প্রতিককালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আঞ্চলিকতাবাদ ও আঞ্চলিক স্বার্থ চেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ফলে রাষ্ট্রের মধ্যে ভাঙন ও বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইতিমধ্যে সোভিয়েত সমাজ ভেঙে পনরটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। বিগত দশকেও যারা সোভিয়েত নাগরিক হিসেবে পরিচিত ছিল তারা এখন রুশ, কাজাক, তাজিক, উজবেক, আর্মেনিয়ান, আজারি ইত্যাদি বিভিন্ন জাতিতে পরিচিত। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার আগে সকল সোভিয়েত নাগরিকের বিশাল দেশের সর্বত্র যাতায়াতের অধিকার ছিল এখন আর তেমনটি নেই। এখন রুশ নাগরিক আর্মেনিয়ায়, আর্মেনিয়রা লিথুয়ানিয়ায় বা কাজাকরা উজবেকিস্তানে অবাধে যাতায়াত করতে পারবে না, পারবে না যেখানে খুশি সেখানে বসতি স্থাপন করতে। বস্তুত রাষ্ট্রের কাঠামো বা গঠনগত পরিবর্তনের সাথে এই অধিকার পরিবর্তন হয়। যেমন সম্প্রতি আফ্রিকায় ইরিত্রিয়া নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে, যা ছিল ইথিওপিয়ার অংশবিশেষ। ইরিত্রিয়া স্বাধীন হওয়ার আগ পর্যন্ত আদ্দিস আবাবা থেকে আসমারা যেতে কোন বাধা ছিল না কিন্তু এখন দু'টি শহর ভিন্ন দু'টি দেশের রাজধানী হওয়ার কারণে তাদের মধ্যকার অবাধ চলাচলের অধিকার সংকুচিত হয়েছে, সংকুচিত হয়েছে বসতি স্থাপনের অধিকারও।

www.pathagar.com

বস্তুত চলাচল ও বসতি স্থাপনের অধিকারটি রাষ্ট্রের সীমানার ধারণার সাথে সম্পর্কযুক্ত। রাষ্ট্রের মানচিত্র পরিবর্তন হলে এই অধিকারের পরিধিও পরিবর্তিত হবে। যিনি যে রাষ্ট্রের নাগরিক সেই রাষ্ট্রের বৈধ সীমানার ভেতর চলাচল এবং সেই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বসতি স্থাপনের অধিকার তার জন্য সংরক্ষিত। এটা প্রত্যেকের মৌলিক অধিকার এবং মানবাধিকার।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৬ নং অনুচ্ছেদে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদের প্রতিফলন ঘটেছে। প্রাসঙ্গিক বিধায় নিম্নে এর উল্লেখ করছি।

'জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদশের সর্বত্র অবাধে চলাফেরা, উহার যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতিস্থাপন এবং বাংলাদেশ তাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।'

জনস্বার্থ এবং যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ এই দু'টি বিষয় আলোচনা করা দরকার।

কোন বাধানিষেধ যুক্তিসঙ্গত তা নির্ণয় করবেন সুপ্রিম কোর্ট। যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধের প্রশ্নের শেষ জবাব সংসদ দিতে পারেন না। যুক্তিসঙ্গত শব্দটির বস্তুনিষ্ঠ বিচার হওয়া চাই।

যে যুক্তিতে বলা হয় যে, বাধা নিষেধের যৌক্তিকতা নির্ধারণের অধিকার কেবলমাত্র সংসদের, আদালতের নাই সে যুক্তি অগ্রাহ্য। বাধানিষেধের যৌক্তিকতা নির্ধারণের এখতিয়ার আদালতের আছে। যে যুক্তিতে বলা হয় যে, সংসদ বা নির্বাহী বিভাগের বিবেকের পরিবর্তে আদালতের বিবেকের স্থান দেওয়া সংবিধানের বিধান নহে তাহাও অগ্রাহ্য। তবে আদালত এই প্রশ্নের জবাব দিবেন একটি বিশেষ নীতির আলোকে। সে নীতি হচ্ছে সুবিবেচনার নীতি। একজন সাধারণ মানুষ একটি বাধাকে যুক্তিসঙ্গত মনে করেন কিনা তা বস্তুনিষ্ঠভাবে খুঁজে দেখতে হবে। এটা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। সমস্ত অবস্থাকে বিবেচনা করে আইনের আলোকে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে।

যখন কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি এই দাবিতে আবেদন করবেন যে, সংশ্লিষ্ট আইন যে বাধানিষেধ আরোপ করছে, তা যুক্তিসঙ্গত নয়, তখন আদালত নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচনা করবেন।

(ক) সংশ্লিষ্ট আইনে যে অধিকার খর্ব বা বিনষ্ট হয়েছে তার প্রকৃতি, (খ) যে বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, (গ) বাধানিষেধ আরোপের ফলে কি এবং কতখানি অন্যায় বা অপব্যবহার রোধ করা যাচ্ছে, (ঘ) স্থানীয় অবস্থা, (ঙ) সময়ের প্রভাব ইত্যাদি এসব বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে আদালত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন বাধা যুক্তিসঙ্গত কিনা।

জনস্বার্থ কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থ বহন করে। আভ্যন্তরীন শান্তি শৃঙ্খলা, জনসাধারণের নৈতিকতা, আর্থিক ও সামাজিক সমস্যা, প্রভৃতির কারণে বাধা নিষেধ আরোপ করে যে সমস্ত আইন প্রণীত হয়, সেগুলোকে জনস্বার্থে করা হয়েছে এমন বলা যায়।

বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৬ অনুচ্ছেদ অনুসারে বাংলাদেশের সর্বত্র নাগরিকদের অবাধে চলাফেরা, কোন স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপন, দেশত্যাগ এবং দেশে পুনঃপ্রবেশের অধিকার জনস্বার্থে আইন দ্বারা আরোপিত, যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধের অধীন। এই অধিকারগুলো একেবারে অবাধ ও নিরঙ্কুশ নয়।

www.pathagar.com

আলোচ্য অনুচ্ছেদ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তি

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদের সাথে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তির সামঞ্জস্য রয়েছে। নিম্নে তা পরিবেশিত হল।

পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি

অনুচ্ছেদ : ১২

(১) কোন রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে আইনসম্মতভাবে অবস্থানকারী প্রত্যেক ব্যক্তির সেই রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে চলাচল করা এবং বসবাসের স্থান নির্বাচন করার স্বাধীনতা থাকবে।

(২) প্রত্যের ব্যক্তির নিজ দেশসহ যে কোন দেশ ত্যাগ করার স্বাধীনতা থাকবে।

(৩) জাতীয় নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনস্বাস্থ্য, নৈতিকতা অথবা অন্যের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়োজনে এবং বর্তমান চুক্তিতে স্বীকৃত অন্যান্য অধিকারগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে আইনের দ্বারা যেরূপ বাধানিষেধ নির্ধারিত হয় সেইরূপ বাধানিষেধ ব্যতীত, উপরিউক্ত অধিকারগুলোর উপর কোন বাধানিষেধ আরোপ করা যাবে না।

(৪) কোন ব্যক্তিকে তার নিজে দেশে প্রবেশের অধিকার থেকে স্বেচ্ছাচারমূলকভাবে বঞ্চিত করা যাবে না।

এই অনুচ্ছেদ ও ইসলাম

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদের মূল বক্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে চলাচল, বসতিস্থাপন, দেশত্যাগ ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি অধিকার। ইসলামি দর্শন এই অধিকারগুলিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করেছে।

হযরত মুহাম্মদ (দঃ) হিজরতের পর যখন মদিনায় রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা করেন তখন থেকেই ইসলামি রাষ্ট্রের ধারণা বাস্তবে রূপ লাভ করে। ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিকদের রাষ্ট্রের সর্বত্র চলাচল এবং যে কোন স্থানে বসতি স্থাপনের অধিকার ছিল। ইসলামি রাষ্ট্রের সীমানা ও পরিধি সম্প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে মক্কা ও মদিনার মুসলমানরা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। তাঁরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে কূফা, দামেস্ক, বাগদাদ, মিসর প্রভৃতি স্থানে গমন করেন এবং সেখানে বসতি স্থাপন করেন। ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সম্ভাবনাময় ও নেতৃত্বদানকারী মুসলমানরা প্রায়শঃই দেশে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গমন করেছেন এবং নতুন নতুন জায়গায় তাদের বসতি গড়ে তুলেছেন। অবশ্য পরবর্তীকালে হযরত উসমান আরবদের অনারব অঞ্চলে বসতি স্থাপনে বাধানিষেধ আরোপ করেছিলেন। এতেও দেখা যায় বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়তে কোন বাধা ছিল না।

www.pathagar.com

তবে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরের বিভিন্ন রাষ্ট্রে যাতায়াতে বাধা না থাকলেও বসতি স্থাপনে কিছুটা বাধা ছিল। যাই হোক ইসলাম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে চলাচল ও বসতি স্থাপনের অধিকারকে সংরক্ষণ করে।

রাষ্ট্র একটি অখণ্ড সত্তা এবং সমগ্র রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি ধূলিকণায় সংঘটিত প্রত্যেকটি ভূমিতে সকল নাগরিকের পদচারণার অধিকার নিশ্চিত। এই অধিকার মানবাধিকাররূপে চিহ্নিত। রাষ্ট্রের মধ্যে প্রদেশ থাকতে পারে, থাকতে পারে বিভাগ বা উপবিভাগ। সেগুলি প্রশাসনিক ব্যবস্থামাত্র। নাগরিকের অধিকার এই প্রশাসনিক ব্যবস্থা দ্বারা খর্বিত হয় না।

দেশের মধ্যে যেমন, দেশ থেকে বের হওয়া এবং ফিরে আসাও তেমনি মানবাধিকার। যেদিন মানুষ সমুদ্র পার হওয়াকে প্রায়শ্চিত্যযোগ পাপ মনে করতো সেদিন এবং সেকাল শেষ হয়ে গেছে। দেশ থেকে দেশান্তরে ভ্রমণ এখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এগুলিও তাই মানবাধিকাররূপে চিহ্নিত।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

(ক) নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য প্রত্যেকেরই অন্য দেশসমূহে আশ্রয় প্রার্থনা ও পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

(খ) অরাজনৈতিক অপরাধসমূহ অথবা জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি বিরোধী কার্যকলাপ থেকে উদ্ভূত নির্যাতনের ক্ষেত্রে এই অধিকার প্রার্থনা করা নাও যেতে পারে।

(Article : 14. (1) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution. (2) This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non political crimes or form acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.)

ভাষ্য

আলোচ্য অনুচ্ছেদের মূল বিষয় হচ্ছে ভিন্ন দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনার অধিকার। কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা ও ভোগ করা যাবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা পারা যাবে না এই অনুচ্ছেদে তার দিক নির্দেশনা রয়েছে। অন্যদেশে রাজনৈতিক আশ্রয় ও এর বিভিন্ন দিক নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হচ্ছে।

রাজনৈতিক আশ্রয়ের অধিকার

আন্তর্জাতিক আইনে রাজনৈতিক আশ্রয় একটি অধিকার। এই অধিকারের কারণে বিদেশী নাগরিককে প্রবেশের ও থাকার অনুমতি দেওয়া হয়। কোন নাগরিক যদি তার নিজ রাষ্ট্র থেকে বিতাড়িত হয় অথবা যদি তার পশ্চাদ্ধাবন করা হয়, তাহলে ঐ নাগরিক বিদেশের কাছে আশ্রয় চাইতে পারে এবং বিদেশী রাষ্ট্রও তাকে আশ্রয় দিতে পারে। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার

www.pathagar.com

আলোচ্য অনুচ্ছেদে যে রাজনৈতিক আশ্রয়ের কথা বলা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে, কোন রাষ্ট্র কর্তৃক কোন পলাতক রাজনৈতিক অপরাধীকে আশ্রয়দানসহ নিরাপত্তামূলক ব্যব্যস্থা গ্রহণ করা।

আন্তর্জাতিক আইনে আশ্রয়দান কথাটি দুইটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। (ক) সাধারণত আশ্রয় দেওয়া হয়ে থাকে সাময়িক বা অস্থায়ীভাবে। (খ) যে ব্যক্তিকে আশ্রয় প্রদান করা হয় তার নিরাপত্তার জন্য আশ্রয় প্রদানকারী রাষ্ট্রের উপর দায়িত্ব বর্তায়।

রাজনৈতিক আশ্রয় হচ্ছে এক ধরনের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা। যিনি রাজনৈতিক ভিন্ন মতাবলম্বনের জন্য সাধারণত নির্যাতনের শিকার হন, তিনি ভিন্নদেশে অর্থাৎ যেখানে নিরাপত্তা লাভ করবেন বলে বিশ্বাস রাখেন, সেখানে আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারেন। এই জাতীয় আশ্রয় প্রার্থনা করার এবং আশ্রয় পেলে তা ভোগ করার অধিকার প্রতিটি নির্যাতিত মানুষেরই আছে। নিরাপত্তার জন্যই যেহেতু আশ্রয় প্রার্থনা করা হয় সেহেতু আশ্রয় পেলে এর সাথে স্বাভাবিকভাবেই যেটা লাভ করা হয়, সেটা হচ্ছে রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক নিরাপত্তা। রাজনৈতিকভাবে আশ্রিত প্রতিটি ব্যক্তির নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব হচ্ছে আশ্রয় প্রদানকারী রাষ্ট্রের।

রাজনৈতিক আশ্রয়ের প্রকারভেদ

রাজনৈতিক আশ্রয় প্রধানত দুই প্রকার হতে পারে।

এক : ভূখণ্ডগত আশ্রয় (territorial asylum) :

একটি রাষ্ট্র তার নিজস্ব ভূ-খণ্ডের অভ্যন্তরে এ ধরনের আশ্রয় অনুমোদন করে। ভূখণ্ডগত আশ্রয়ের নীতিটি আধুনিক আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা সৃষ্টি হয়নি, বরং প্রাচীন আইন দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছে। প্রাচীনকালে রোম নগর রাষ্ট্র থেকে কেউ পালিয়ে গেলে ঐ পলাতক ব্যক্তি অন্যদেশে ভূখণ্ডগত আশ্রয় নিয়ে থাকতো। বিদেশী নাগরিককে যদি প্রবেশের ও বসবাসের অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে সেটাকে ভূখণ্ডগত আশ্রয় বলে।

১৯৬৬ সালের অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিতে উল্লেখ করা হয় যে, চুক্তির প্রত্যেক পক্ষরাষ্ট্র তার প্রয়োজনে যে কোন আইনসঙ্গত আন্তর্জাতিক সাহায্য ও সহযোগিতা দাবি করতে পারবে। এই বিধান অনুসারে যে কোন রাষ্ট্র যুদ্ধের সময় বা অন্য যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় নাগরিকদের নিরাপত্তার জন্য সাময়িকভাবে অন্য রাষ্ট্রের কাছে নিরাপদ আশ্রয় চাইতে পারে।

যে কেউ ইচ্ছা করলে অন্য দেশের দেওয়া আশ্রয় প্রত্যাখান করতে পারে, যদি সে আশ্রয় তার নিজের দেশের স্বার্থের পরিপন্থী হয়। কোন রাষ্ট্র বিশেষ বিশেষ কারণে অন্য দেশের কোন বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিমণ্ডলকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করতে পারে। আবার একটি রাষ্ট্র পূর্ব চুক্তি দ্বারা অন্য একটি রাষ্ট্রকে প্রয়োজনের সময় আশ্রয় প্রদানের জন্য বাধ্য করতে পারে।

রাজনৈতিক কারণে দোষী বা নির্যাতিত ব্যক্তির আশ্রয় লাভের অধিকার আছে। কিন্তু যে কোন পলাতক ব্যক্তির বা দোষী ব্যক্তির আশ্রয় লাভের অধিকার আছে এ কথা বলা হয় নি।

www.pathagar.com

দুই : ভূখণ্ড বহির্ভূত আশ্রয় :

ভূখণ্ড বহির্ভূত আশ্রয় বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন :

(ক) বিদেশী দূতাবাস ও কূটনৈতিক মিশনে আশ্রয়—

যদি কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রের ভিতরে অবস্থিত অন্য রাষ্ট্রের দূতাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে তা বিদেশী দূতাবাসে আশ্রয় বলে অভিহিত করা হয়। আধুনিক আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী আশ্রয় অনুমোদনের ক্ষমতা কোন বিদেশী কূটনৈতিক মিশন প্রধানের নেই। এটা বিশ্বাস করা হয় যে, বিদেশী দূতাবাসগুলো রাষ্ট্রের জন্য কোন আপত্তিকর কাজ করতে পারে না, এবং আরো মনে করা হয় যে, বিদেশী দূতাবাসকে রাষ্ট্রের জন্য কোন বিপদের উৎস কেন্দ্রে পরিণত করা যায় না। তবু, দেখা যায় যে, ব্যর্থ বিদ্রোহী বা সামরিক অভ্যুত্থানকারীগণ প্রায়ই আশ্রয়ের জন্য বিদেশী মিশনে আবেদন জানায়। এজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৮৮৫ সালে কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের জন্য একটি বিধি প্রণয়ন করে। এই বিধিতে উল্লেখ করা হয় যে, কোন কূটনৈতিক প্রতিনিধিকে অন্য কোন বিদ্রোহী বা রাষ্ট্রদ্রোহীকে দূতাবাসে আশ্রয় অনুমোদন করার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি।

প্রথাগত আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে বিদেশী দূতাবাসগুলো সংরক্ষিত এলাকা। দূতাবাস বা কূটনৈতিক মিশন এলাকায় মিশন প্রেরক সংশ্লিষ্ট দেশের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা হয়। তাই অন্য কোন ব্যক্তি মিশন প্রধান বা সংশ্লিষ্ট বিশেষ ব্যক্তির সম্মতি ছাড়া কূটনৈতিক মিশনে বা দূতাবাসে প্রবেশ করতে পারে না। ১৯২৮ সালের কূটনৈতিক প্রতিনিধি সংক্রান্ত হাভানা কনভেনশনের ২২ অনুচ্ছেদে উপরোক্ত প্রথাগত আন্তর্জাতিক আইনের বিধান সমর্থন করা হয়েছে।

বর্তমানে শুধুমাত্র লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে সেখানকার রাজনৈতিক বাস্তবতার কারণে দূতাবাসে আশ্রয় লাভের বিষয়টি চালু আছে। সেখানকার স্থানীয় প্রথাগত আইনে এটা স্বীকৃত। যদি বিশেষ পরিস্থিতিগত কারণে কোন ব্যক্তি বিদেশী দূতাবাস বা কূটনৈতিক মিশনে আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহলে ঐ আশ্রিত ব্যক্তিকে প্রত্যর্পণের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দূতাবাস প্রধান বা মিশন প্রধানকে বা কোন কর্মকর্তাকে বল প্রয়োগ করতে পারবে না।

যদি কোন ব্যক্তি শান্তি ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করে এবং অপরাধ গুরুতর হয় তাহলে ঐ ব্যক্তিকে আশ্রয় দানের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। আইকম্যান নামক যে ব্যক্তি মানবতার বিরুদ্ধে অপকর্মে সমরনায়ক হিটলারের দোসর ছিল, সে ১৯৬৭ সালে আর্জেন্টিনায় ধরা পড়ে। ইসরাইল তাকে নিয়ে এসে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আইকম্যান মানবতার বিরুদ্ধে পরিচালিত অন্যায় কাজে হিটলারের সহযোগী ছিল, যে জন্য তাকে আশ্রয় দেওয়া অন্যায় কাজ।

আইনবিদ স্টার্ক (Starke) এর মতে, নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলোতে বিদেশী দূতাবাস আশ্রয় অনুমোদন করতে পারে। (ক) কোন উত্তেজনাকর রাজনৈতিক হাঙ্গামা থেকে কোন ব্যক্তির প্রাণরক্ষার জন্য ; (খ) যেখানে স্থানীয় অবশ্য পালনীয় প্রথা হিসেবে বিদেশী দূতাবাসে আশ্রয় স্বীকৃত হয়ে আসছে ; (গ) বিশেষ চুক্তির অধীনে যে চুক্তিতে সাধারণত রাজনৈতিক অপরাধীদের বিদেশী দূতাবাসে আশ্রয় লাভের অনুমোদিত বিধান রয়েছে।

www.pathagar.com

(খ) আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অঙ্গনে আশ্রয় : আন্তর্জাতিক আইনে এমন কোন বিধান নেই যার দ্বারা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কোন অপরাধীর আশ্রয় অনুমোদন করতে পারবে। তবে, কোন আসন্ন বিপদের হাত থেকে রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কোন ব্যক্তিকে সাময়িকভাবে আশ্রয় দিতে পারে।

(গ) যুদ্ধজাহাজে আশ্রয় : কোন ব্যক্তি যদি সমুদ্রতীরে কোন অপরাধ সংগঠিত করে অতঃপর তীরে নোঙর করা কোন যুদ্ধজাহাজে আশ্রয় নেয়, সে ক্ষেত্রে জাহাজের অধিনায়ক ঐ অপরাধী ব্যক্তিকে হস্তান্তর করতে অস্বীকার করলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ঐ ব্যক্তিকে জোরপূর্বক আটক করতে পারবে না। এই ধরনের পরিস্থিতিতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ঐ পতাকাবাহী সরকারের কাছে কূটনৈতিক প্রতিবাদ জানাতে পারে। কোন ব্যক্তির যখন জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, সেই মুহূর্তে মানবিক কারণে আশ্রয় দেওয়া হয়। আশ্রয় অনুমোদন করার পর ঐ আশ্রিত ব্যক্তিকে অন্য কোন আশংকাজনক পরিস্থিতির মধ্যে নিপতিত করা যায় না। এ জন্য আশ্রয় প্রদানকারী রাষ্ট্র, সংস্থা বা ব্যক্তির আইনগত দায়িত্ব হলো, আশ্রিত ব্যক্তির নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা।

রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের জন্য প্রযোজ্য আশ্রয় সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করতে পারে। ১৯২৮ সালে আমেরিকান রাষ্ট্রসমূহ হাভানাতে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করে। এই সম্মেলনে ফৌজদারি অপরাধে অপরাধী বা দণ্ডিত ব্যক্তিকে যুদ্ধজাহাজে আশ্রয় অনুমোদন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু রাজনৈতিক অপরাধে অপরাধীদের যুদ্ধজাহাজে আশ্রয় দান অনুমোদন করা হয়।

(ঘ) বাণিজ্যিক জাহাজে আশ্রয় : বাণিজ্যিক জাহাজসমূহের উপর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এখতিয়ার থাকে। এ জন্য বাণিজ্যিক জাহাজ স্থানীয় অপরাধীদের আশ্রয় অনুমোদন করতে পারে না।

আশ্রয় প্রদান ও প্রত্যাখানের অধিকার

আইনবিদ হল (Hall) এর মতানুসারে কোন রাষ্ট্র তার ভূখণ্ডে অন্য নাগরিককে আশ্রয় প্রদান করবে কিনা, সে রাষ্ট্রের ইচ্ছা বা সম্মতির উপর নির্ভর করে। বলপ্রয়োগের দ্বারা আশ্রয় আদায় করা যায় না বরং আশ্রয় প্রদান করা একটি মানবিক ব্যাপার। রাজনৈতিক উত্তেজনার সময় বা সশস্ত্র সংগ্রামের সময় যখন জনজীবন বিপদাপন্ন হয়ে পড়ে, তখন মানবিক কারণেই অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহ দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের আশ্রয় অনুমোদন করে থাকে।

কোন রাষ্ট্র যদি মনে করে যে, অন্য রাষ্ট্রের কোন বিশেষ ব্যক্তিকে আশ্রয় অনুমোদন করলে সেক্ষেত্রে আশ্রয়দানকারী রাষ্ট্রের প্রতি হুমকি সৃষ্টি হতে পারে, তাহলে ঐ বিশেষ ব্যক্তিকে আশ্রয় প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানাতে পারে। আবার কোন রাষ্ট্রের যদি এই মর্মে যথাযথ উপলব্ধির কারণ থাকে যে, আশ্রয় অনুমোদন করা হলে আশ্রিত ব্যক্তির যথাযথ নিরাপত্তা বিধান করা যাবে না, সে ক্ষেত্রে ঐ রাষ্ট্র অনুরূপ আশ্রয় অনুমোদন করতে বিরত থাকতে পারে।

www.pathagar.com

১৯২৮ সালে হাভানায় অনুষ্ঠিত একুশ জাতির আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সাধারণ অপরাধে দোষী ব্যক্তি ও সেনা এবং নৌবাহিনী থেকে পরিত্যক্ত ব্যক্তিদের আশ্রয় অনুমোদন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ১৯২৮ সালের হাভানা কনভেনশনে আশ্রয়ের নীতিকে আন্তর্জাতিক আইনের অংশ হিসেবে স্বীকার করা হয় নি। আশ্রয় নীতিকে আন্তর্জাতিক আইনের অংশ ও অবিচ্ছেদ্য নীতি হিসেবে গ্রহণ করার জন্য ১৯৩৩ সালে মন্টিভিডিওতে আর একটা নতুন কনভেনশন তৈরি করা হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এতে স্বাক্ষর দানে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে আশ্রয় সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক নীতিগুলো অমীমাংসিতই থেকে যায়।

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিষদের সুপারিশ, যা ১৯৭৪ সালের ১৬ই মে সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হয়, তার ৬ নং দফায় বলা হয় যে, শান্তি, আত্মনিয়ন্ত্রণ, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, স্বাধীনতার সশস্ত্র সংগ্রাম ও জরুরি অবস্থায় জনবসতির বিশেষ করে নারী এবং শিশুদেরকে সর্বজনীন মানবাধিকার ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি, শিশুদের অধিকারের ঘোষণা এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক আইনের নীতিমালা মোতাবেক আশ্রয়, নিরাপত্তা, খাদ্য, চিকিৎসা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

১৯৬৭ সালের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণায় বলা হয় যে, যে ব্যক্তিকে একটি রাষ্ট্র আশ্রয় দিয়েছে, অন্য সকল রাষ্ট্র ঐ আশ্রয়ের মর্যাদা দিতে প্রস্তুত থাকবে। এ ছাড়াও বলা হয় যে, কোন ব্যক্তি যদি আবশ্যক কারণে আশ্রয় চায়, তাহলে তাকে সীমান্তে বাধা দেওয়া যাবে না এবং যদি সে সীমান্ত অতিক্রম করে রাষ্ট্রের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহলে ঐ রাষ্ট্র সেই মুহূর্তে তাকে বহিষ্কার করবে না বা পশ্চাদ্ধাবন করবে না। বহিঃসমর্পণ চুক্তির দ্বারা রাজনৈতিক আশ্রয় সংক্রান্ত অধিকার নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

১৯৮৭ সালের সন্ত্রাসবাদ নিরোধ সংক্রান্ত কনভেনশনে বলা হয় যে, সন্ত্রাসী কাজে অপরাধী ব্যক্তি যদি অন্য কোন রাষ্ট্রে আশ্রয় নেয়, তাহলে ঐ ব্যক্তি যে রাষ্ট্রের প্রকৃত অধিবাসী, সেই রাষ্ট্র ফেরত চাইলে আশ্রয় প্রদানকারী রাষ্ট্র তাকে ফেরত পাঠাবে। তবে, যদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ফেরত চাওয়া হয় তাহলে আশ্রয়দানকারী রাষ্ট্র ফেরত পাঠাতে বাধ্য নয়।

ভূখণ্ডগত আশ্রয় সংক্রান্ত ঘোষণা ১৯৬৭

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের আদেশ বলে আন্তর্জাতিক আইন কমিশন কর্তৃক ১৯৬৭ সালের ১৪ই ডিসেম্বর ভূখণ্ডগত আশ্রয় সংক্রান্ত বিধান গৃহীত হয়। এই বিধানসমূহ ভূখণ্ডগত আশ্রয় সংক্রান্ত ঘোষণা ১৯৬৭ নামে অভিহিত।

এই ঘোষণার প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হয় যে, আশ্রয়ের প্রধান উদ্দেশ্য হবে, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা, জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সম্পর্কের উন্নয়ন করা করা, রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক

www.pathagar.com

মানবিক সমস্যাবলীর সমাধান খুঁজে বের করা। এই ঘোষণার প্রধান লক্ষ্য হবে বর্ণ, নারী, পুরুষ, ভাষা, ধর্মগত কোন ভেদাভেদ না করে মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা সৃষ্টির জন্য সকল জাতিকে অনুপ্রাণিত করা।

১৯৬৭ সালের আশ্রয় সম্পর্কিত ঘোষণা দুটি সর্বজনীন অধিকারকে সর্বাগ্রে স্থান দেয়।

(১) নির্যাতন, যন্ত্রণা, ক্লেশ, রাজনৈতিক উত্তেজনা থেকে মুক্তি বা রেহাই পাওয়ার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি অন্য যে কোন দেশে আশ্রয় খুঁজতে পারে।

(২) এই অধিকার সাধারণভাবে রাষ্ট্রীয় অরাজনৈতিক কর্মে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তি বা জাতিসংঘ নীতিবিরুদ্ধ কোন কাজে অভিযুক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে।

ভূখণ্ডগত আশ্রয় সংক্রান্ত ঘোষণার অনুচ্ছেদ : ১

(ক) একটি রাষ্ট্র তার সার্বভৌমত্বের অধিকার বলেই আশ্রয় অনুমোদন করবে। সর্বজনীন মানবাধিকারের নীতিগুলোর মত আশ্রয়ের অধিকারকেও সকল রাষ্ট্র সম্মান প্রদর্শন করবে।

(খ) যে ক্ষেত্রে কেউ শান্তি ও নিরাপত্তা বিরুদ্ধ গুরুতর অন্যায় কাজ করে অথবা বৃহত্তর মানবের কল্যাণ বিরোধী কোন জঘন্য কাজ করে, সে ক্ষেত্রে অনুরূপ অপরাধী ব্যক্তিকে আশ্রয় প্রদান করতে কোন রাষ্ট্র বাধ্য হবে না।

(গ) এই ঘোষণায় আশ্রয় অনুমোদনের ক্ষেত্রগুলোর বাইরেও অন্য কোন ক্ষেত্রে আশ্রয় দেওয়া যাবে কিনা, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র পরিস্থিতি মূল্যায়নপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ১৪ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আশ্রয় সকল রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় অনুমোদন করবে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্র আশ্রয় অনুমোদন বা প্রদান করতে বা প্রদানকৃত আশ্রয় বহাল রাখতে সমস্যার সম্মুখীন হয়, সে ক্ষেত্রে ঐ রাষ্ট্র নিজ বা অন্য রাষ্ট্রের সাথে যৌথভাবে ঐ বিষয়টি জাতিসংঘের দৃষ্টিগোচরে আনতে পারে। জাতিসংঘ আশ্রয় সংক্রান্ত অনুরূপ বিষয় আন্তর্জাতিক সংহতি রক্ষার্থে কতটুকু অনুমোদন যোগ্য বা আশ্রয়দানকারী রাষ্ট্রের পক্ষে আশ্রিতের কতটুকু দায়িত্ব বহন করা সম্ভব সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

উপরোক্ত অনুচ্ছেদ ১ (ক) অনুযায়ী কাউকে একবার আশ্রয় অনুমোন করা হলে, আশ্রিতের নিরাপত্তা বিরোধী কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না, বা প্রদত্ত আশ্রয়ের অনুমোদন প্রত্যাখান করা যায় না। নির্যাতিত কোন ব্যক্তি নির্যাতন থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আশ্রয়ের অনুসন্ধানে অন্য একটি রাষ্ট্রে প্রবেশ করলে, তাকে আশ্রয়ের অনুমোদন থেকে আর বঞ্চিত করা যায় না।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

কোন ব্যক্তিকে আশ্রয় অনুমোদন করা হলে ঐ ব্যক্তির নিরাপত্তা বিধান করতে হবে এবং জাতিসংঘ সনদের নীতি অনুযায়ী ঐ ব্যক্তির সাথে আচরণ করতে হবে।

আশ্রয় সংক্রান্ত এই বিধানগুলো শরণার্থী ও রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

শরণার্থী ও দেশত্যাগ সম্পর্কিত কনভেনশন

১৯৪৮ সালের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার উপর ভিত্তি করে জাতিসংঘের সাধারণ সভার তত্ত্বাবধানে শরণার্থীদের আইনগত মর্যাদা সম্পর্কিত কনভেনশনের খসড়া তৈরি হয়। ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে শরণার্থীদের মর্যাদা সম্পর্কিত কনভেনশনটি অনুমোদিত কার্যকর হয়।

এই কনভেনশনের ২ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক শরণার্থী অবস্থানকারী রাষ্ট্রের সকল বিধিবিধানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে এবং সরকারি আদেশসমূহ মেনে চলবে।

৩ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে এই কনভেনশনের পক্ষ রাষ্ট্রসমূহ বর্ণ ধর্ম বা কোন দেশের প্রতি ভেদাভেদ না করে সকল, শরণার্থীর প্রতি সমানভাবে আচরণ করবে। রাষ্ট্রসমূহ রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে তাদের জাতীয় নাগরিকদের মত শরণার্থীদের সাথে আচরণ করবে। বিশেষ করে ধর্মীয় অভ্যাস, ও শিশুদের ধর্মীয় লেখাপড়ার ক্ষেত্রে শরণার্থীদের অবাধ স্বাধীনতা দিবে।

৭ নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক ৩ বছর বসবাসের পর সকল শরণার্থী অবস্থানকারী ভূখণ্ডে পারস্পরিক সম্পর্কভিত্তিক আইনগত সুবিধা পেতে পারে। শরণার্থীদের আশ্রয় অধিকার ও সুবিধাদি শরণার্থীদের আশ্রয় অনুমোদনকারী রাষ্ট্র এই কনভেনশন কর্তৃক গৃহীত সকল অধিকার ও সুবিধাদি শরণার্থীদের প্রদান করবে।

২০ নং অনুচ্ছেদে শরণার্থীদের রেশনিং অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ সংক্রান্ত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। যেখানে নাগরিকদের জন্য নিয়মিত খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করার পদ্ধতি চালু আছে, সেখানে শরণার্থীরাও জাতীয় নাগরিকদের মত খাদ্য সামগ্রির সাধারণ বণ্টনের আওতাধীন বলে গণ্য হবে। শরণার্থী গ্রহণকারী রাষ্ট্র শরণার্থীদের জন্য সুবিধাজনকভাবে বসবাসের গৃহের ব্যবস্থা করবে। শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে জাতীয় নাগরিকদের মতই শরণার্থীদেরকে সুযোগ প্রদান করতে হবে।

২৪ নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক শ্রম ও সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে শরণার্থীদেরকে নিম্নলিখিত সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে হবে।

(ক) শরণার্থীরা স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে। বিধি অনুযায়ী তারা বেতন, অতিরিক্ত সময়ে কাজ করার সুবিধা, সবেতন ছুটি প্রভৃতি অধিকার জাতীয় নাগরিকদের মত লাভ করবে। শরণার্থীরা চাকুরিতে শিক্ষানবিশী প্রশিক্ষণার্থী হওয়ার সুযোগ পাবে। শরণার্থীরা যৌথ দর কষাকষির সুযোগও লাভ করবে।

www.pathagar.com

(খ) শরণার্থীরা সামাজিক নিরাপত্তার ভিত্তিতে অসুস্থ হলে চিকিৎসার সুবিধা, সন্তান জন্মদানের সুবিধা, পারিবারিকভাবে বসবাসের সুবিধা ইত্যাদি সুযোগ লাভ করবে।

(গ) চাকুরিকালীন সময় যদি কর্তব্য কাজ করতে যেয়ে কোন শরণার্থী দৈহিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে এর জন্য সে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাবে।

২৭ নং অনুচ্ছেদে শরণার্থীকে পরিচয়পত্র দেওয়ার বিধান করা হয়েছে। যে সকল শরণার্থীদের ভ্রমণের জন্য কোন বৈধ কাগজপত্র নেই তাদেরকে আশ্রয়দানকারী রাষ্ট্র উপযুক্ত পরিচয়পত্র সরবরাহ করবে।

২৯ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রসমূহ শরণার্থীদের উপর কোন কর বা রাজস্ব আরোপ করবে না।

৩১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, নিজ রাষ্ট্রে উত্তেজনাকর বা হুমকি পরিস্থিতির কারণে যখন কোন ব্যক্তি অন্য রাষ্ট্রের অনুমোদন ছাড়াই প্রবেশ করে, সে ক্ষেত্রে অনুরূপ অন্যায় প্রবেশের জন্য ঐ ব্যক্তিকে কোন দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে না। শরণার্থীদের গ্রহণকারী রাষ্ট্র তাদের প্রয়োজনীয় চলাফেরার ব্যাপারে কোন প্রতিবন্ধকতামূলক শর্ত আরোপ করবে না। অনুমোদনকারী রাষ্ট্র কোন শরণার্থীকে কোন অজুহাতে বহিষ্কার করতে পারবে না। তবে ঐ রাষ্ট্র জাতীয় শান্তি ও নিরাপত্তার প্রশ্নে শরণার্থীদের জন্য আন্তর্জাতিক আইন মোতাবেক বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

৩৪ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, দেশত্যাগী বা শরণার্থীরা যাতে অবস্থানকারী রাষ্ট্রে নাগরিকতা অর্জন করতে পারে ,তার জন্য সম্ভাব্য সুবিধা প্রদান করতে হবে।

এই কনভেনশনের পক্ষরাষ্ট্রসমূহ ও শরণার্থীদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার জন্য জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার রয়েছেন। সংশ্লিষ্ট হাইকমিশনার শরণার্থী ও তাদের অনুমোদনকারী রাষ্ট্রের সম্পর্ক বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করে থাকেন।

এই কনভেনশনের ফলে বাস্তুহারা দেশত্যাগী এবং শরণার্থীদের আইনগত মর্যাদা সম্পর্কে একটি আইনগত ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। এ ছাড়াও দেশত্যাগী ও শরণার্থী সমস্যা নিরসনের জন্য দেশত্যাগের সমস্যা কমিয়ে আনার জন্য দেশত্যাগ সঙ্কোচন কনভেনশন ১৯৬১ সালে গৃহীত হয়েছে।

মানুষ মানুষের বন্ধু, আবার মানুষই মানুষের শত্রু। মত পথ ও বিশ্বাসের বিভিন্নতার কারণে মানুষের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য হয়। এই পার্থক্যের কারণে মানুষ কখনো প্রতিপক্ষের উপর চড়াও হয়। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা নির্যাতনের শিকার হয়। এই নির্যাতন যখন চরম আকার ধারণ করে, সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যায় তখনই নির্যাতিত মানুষ নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষার জন্য, আপাতত পরিত্রাণের জন্য ভিন দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় চায়। এই আশ্রয় চাওয়া এবং আশ্রয় ভোগ করা তার অধিকার। সকল মানুষেরই এই অধিকার রয়েছে।

কিন্তু এই অধিকার লাভে অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে, যদি নির্যাতন হয় অরাজনৈতিক অপরাধের কারণে। অর্থাৎ খুন, রাহাজানী, দস্যুবৃত্তি, ধর্ষন, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, দেশদ্রোহ

www.pathagar.com

ইত্যাদি মারাত্মক অপরাধসমূহ থেকে উদ্ভূত কোন নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচার জন্য রাজনৈতিক আশ্রয়ের নিশ্চয়তা নেই। কারণ এই সকল অপরাধ মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। আর মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করে নিজের মানবাধিকারের দাবিকে আগেই নষ্ট করা হয়। তাছাড়া জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি বিরোধী কোন কাজ করলে সে ক্ষেত্রে যে নির্যাতনের উদ্ভব হয়, তা থেকে বাঁচার জন্য রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা একটি অনিশ্চিত অধিকার। এই অধিকার লাভের কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি নেই। শুধুমাত্র রাজনৈতিক অপরাধের কারণে যদি কোন নির্যাতন নেমে আসে তাহলে সেই নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য রাজনৈতিক আশ্রয় লাভের অধিকার প্রতিটি ব্যক্তির রয়েছে।

এই অনুচ্ছেদ ও ইসলাম

আলোচ্য অনুচ্ছেদের মূল বক্তব্য হচ্ছে নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য ভিন দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভের অধিকার। রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা এবং ভোগের অধিকারের একটি পূর্বশর্ত হচ্ছে নির্যাতন থেকে মুক্তি। স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ অবস্থায় ভিনদেশে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা ও ভোগের অধিকার থাকে না।

এ প্রসঙ্গে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে হলে আমাদেরকে অনেক পিছনে ফিরে তাকাতে হবে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) যখন সবে ইসলাম প্রচার শুরু করলেন তখনই মক্কার কায়েমী স্বার্থবাদীদের তরফ থেকে তার উপর নেমে এলো চরম নির্যাতন। শুধু নবী মুহাম্মদের উপরই নয়, সেই সঙ্গে নবদীক্ষিত মুসলমানের উপরও চলতে থাকে চরম নির্যাতন। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর গোত্রের লোকজনই ছিল নির্যাতনকারীদের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ। নির্যাতনের মাত্রা এতটা ভয়াবহ ও মারাত্মক ছিল যে, সে সহ্য করা ছিল অত্যন্ত দুঃসাধ্য। মক্কায় হযরত মুহম্মদের (সাঃ) ইসলামের প্রচারের মাত্রা যত বাড়তে থাকলো নির্যাতনের মাত্রাও তত বাড়তে থাকলো। মক্কাবাসীদের জুলুম নির্যাতন থেকে স্বয়ং নবী মুহাম্মদ পর্যন্ত রক্ষা পান নি। নবদীক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে যারা ছিলেন ক্রীতদাস, তারা তাদের মালিক বা প্রভূ কর্তৃক চরম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তাদের মধ্যে অনেককে জ্বলন্ত অঙ্গারের মধ্যে শুইয়ে রাখার ঘটনাও ঘটেছে। হযরত মুহম্মদ (দঃ) যখন মক্কার অদূরবর্তী তায়েফে ইসলাম প্রচার করতে গেছেন, তখন মুহম্মদ (দঃ) -এর উপর নেমে এসেছে চরম নির্যাতন। তায়েফবাসীদের লেলিয়ে দেয়া ছেলেমেয়েদের ছোঁড়া ঢিলের আঘাতে নবী রক্তাক্ত হয়েছেন। মক্কাবাসীদের নির্যাতন ও অত্যাচারের মাত্রা যখন সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেছে, তখন হযরত মুহম্মদ (দঃ) তার সঙ্গী সাথীদের হিজরতের অনুমতি দিয়েছেন। নির্যাতিত নওমুসলমানের প্রথমে আবিসিনিয়া তথা বর্তমান ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় দফায় মুসলমানরা হিজরত করেন ইয়াসরিব বা মদিনায়। কুরাইশদের অত্যাচার উৎপীড়ন যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং তারা নবী মুহাম্মদ (দঃ)কে হত্যার পরিকল্পনা করে তখন তিনি আবুবকরকে সঙ্গে নিয়ে নিজেও মদিনায় হিজরত করেন। মদিনায় যারা মক্কা থেকে হিজরত করেন তাদের মোহাজের বলা হতো আর যারা মুসলমানদের মদিনায় আশ্রয় দিয়েছিলেন তারা ছিলেন আনসার বা সাহায্যকারী।

হিজরত ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত যুগান্তকারী ঘটনা। নির্যাতনের কারণে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) স্বয়ং যেখানে মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে মদিনায় আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং সেই আশ্রয় আজীবন ভোগ করেছিলেন সেখানে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা এবং ভোগের অধিকার ইসলামে অনস্বীকার্য।

হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় কুরাইশ এবং মুসলমানদের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল তাতে একটি শর্ত ছিল এরকম যে, কোন মক্কাবাসী মদিনায় আশ্রয় নিলে মুসলমানরা তাকে কুরাইশদের নিকট প্রত্যর্পণে বাধ্য থাকবে কিন্তু কোন মুসলমান মক্কায় ফেরত গেলে কুরাইশরা তাকে প্রত্যর্পণে বাধ্য থাকবে না। চুক্তির আলোচ্য শর্ত থেকে মনে হতে পারে যে, মুসলমানরা রাজনৈতিক আশ্রয় প্রদানে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক ছিল। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার আসলে তা নয়। প্রথমত, মুসলমানদের এই আস্থা ছিল যে, তাদের মধ্য থেকে কেউ মক্কায় ফিরে যাবে না, তদুপরি মুসলমানদের পক্ষ থেকে কারো উপর জুলুম নির্যাতন চালানোর প্রশ্নই আসে না। দ্বিতীয়ত মক্কার নবদীক্ষিত মুসলমানদের উপর জুলুম অত্যাচার অব্যাহত ছিল, এমতাবস্থায় মুসলমানদের মদিনায় আশ্রয় দেয়ার বিষয়টি ছিল নবীর নৈতিক দায়িত্ব। কিন্তু কুরাইশদের সাথে আশ্রয়দানের বিরোধী উক্ত চুক্তির মাধ্যমে নবদীক্ষিত মুসলমানদের ভিন্নস্থানে আশ্রয় গ্রহণে উৎসাহিত করেছেন। যাতে নতুন এলাকা মুসলমানদের অধ্যুষিত হতে পারে। বস্তুত, ইসলাম নির্যাতন থেকে মুক্তির জন্য রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা ও ভোগের অধিকারকে মূল্যবান অধিকার বলে স্বীকৃতি দিয়েছে।

সারসংক্ষেপ

প্রত্যেক মানুষ এই বিশ্বের অধিবাসী। আবার প্রত্যেক মানুষ একটি অঞ্চলের অধিবাসী। এই অঞ্চল ভৌগোলিক হতে পারে যেমন এই পৃথিবী এখন সাতটি মহাদেশে বিভক্ত। জল বায়ু ও তাপের নিরিখে এই পৃথিবী আবার কতিপয় ভাবে বিভক্ত যেমন—উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চল, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল ইত্যাদি। এই অঞ্চল আবার রাজনৈতিকও হতে পারে। যেমন : বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান। এই রাজনৈতিক অঞ্চলগুলি দেশ নামে চিহ্নিত। চিহ্ন যেভাবেই দেওয়া হোক না কেন এবং এ আঞ্চলিকতা যতই প্রয়োজনীয় হোক না কেন, মানুষ যে বিশ্বের অধিকারী এ কথাকে অস্বীকার করা অসত্যকে প্রশ্রয় দেওয়ার শামিল।

www.pathagar.com

যে মানুষ নিজের দেশে নিগৃহীত, বিশ্বের মানুষ হিসেবে তার অধিকার আছে অপর দেশে আশ্রয় পাবার। এই অধিকার অস্বীকার করার নাম বিশ্বমানবতার প্রতি অশ্রদ্ধাবোধ।

যে দেশ পরদেশের আশ্রয় প্রার্থনাকারীকে আশ্রয় দেয়, সে দেশ ঐ পরদেশের শত্রু নয়, আশ্রয় প্রদানকারী দেশ মানবতারই সেবা করে।

কিন্তু আশ্রয় যারা চান তারা যদি নিগৃহীত হন, তাদের কোন অপরাধের জন্য কিংবা এমন কিছুর জন্য যা নীতিভিত্তিক নয়, সে ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির আশ্রয় প্রার্থনার কোন অধিকার থাকে না।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

(ক) প্রত্যেকেরই একটি জাতীয়তার অধিকার রয়েছে।

(খ) কাউকেই যথেচ্ছভাবে তার জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করা অথবা তাকে তার জাতীয়তা পরিবর্তনের অধিকার অস্বীকার করা চলবে না।

(Article : 15. (1) Everyone has the right to a nationality, (2) No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.)

ভাষ্য

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদের মূল বক্তব্য হচ্ছে জাতীয়তার অধিকার। মানুষের মৌলিক এবং প্রধান পরিচয় হচ্ছে তার জাতীয়তা। এখন মানুষ বিশ্ব মানব সম্প্রদায়ের অংশ। বিশ্বসভায় মানুষের পরিচয় হচ্ছে তার জাতীয়তার মাধ্যমে। জাতির পরিচয়েই মানুষ আবির্ভূত হয় বিশ্বের দরবারে। এই পরিচয় হরণ করা হলে মানুষের একটি প্রধান সত্তা হরণ করা হয়। আলোচ্য অনুচ্ছেদ বিশ্লেষণ করার জন্য আমরা জাতি, জাতীয়তা, জাতীয়তার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করব। আলোচনা করব এই অধিকারের প্রয়োজনীয়তা এবং এটা হরণ করলে মানুষের কি অসুবিধা হতে পারে?

আলোচ্য অনুচ্ছেদের মূল আলোচ্য বিষয় জাতীয়তার অধিকার (Right of a nationality)। এই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝতে হলে আমাদেরকে জাতি ও জাতীয়তা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নিতে হবে। নিম্নে জাতি ও জাতীয়তা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে।

জাতি

ল্যাটিন শব্দ Natio বা Natus থেকে জাতি শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। Natio বা Natus-এর অর্থ হচ্ছে জন্ম। সেদিক থেকে বিচার করলে জাতি হচ্ছে একই বংশোদ্ভূত জনসমষ্টি। কিন্তু আধুনিককালে জাতি বলতে সেই জনসমষ্টিকে বুঝায় যারা কতকগুলো সাধারণ

www.pathagar.com

ঐক্যবোধে আবদ্ধ ও সংগঠিত। বর্তমানে জাতি একটি বাস্তব ধারণা। বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী জাতি সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন এবারে সেগুলো উল্লেখ করছি।

ম্যাকাইভারের মতে, 'জাতি হচ্ছে ঐতিহাসিক পরিস্থিতি দ্বারা সৃষ্ট, আধ্যাত্ম চেতনা দ্বারা সমর্থিত, একত্রে বসবাস করার সংকল্পবদ্ধ, সম্প্রদায়গত মনোভাবসম্পন্ন জনসমাজ, যারা নিজেদের জন্য সাধারণ শাসনতন্ত্র রচনা করতে চায়।'

র‍্যামজে মুইর বলেন, "জাতি এইরূপ একটি জনসমষ্টি,যারা নিজেকে প্রকৃতিগতভাবে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ বলে মনে করে। তাদের ঐক্যবোধ এত দৃঢ় এবং বাস্তব যে, তারা একত্রে বাস করতে আনন্দ পায় এবং বিচ্ছিন্ন হলে অসন্তুষ্ট হয় এবং তাদের সঙ্গে একই ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ নয় এরূপ লোকের শাসন সহ্য করতে পারে না।"

হায়েজ (Hayes) বলেন, "জাতীয় একটি সমাজ পরিপূর্ণ ঐক্য এবং সার্বভৌম স্বাধীনতা লাভ করে জাতিতে পরিণত হয়। সুতরাং জাতি বলতে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ সেই জনসমাজকে বুঝায় যারা একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে বসবাস করে। জাতি স্বাধীন হতে পারে আবার স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত কোন পরাধীন জনগোষ্ঠীও জাতি হতে পারে। পৃথিবীতে এমন অনেক জনগোষ্ঠী আছে যারা জাতীয় স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ লড়াই করে যাচ্ছে। এবারে জাতির বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করব।

জাতির বৈশিষ্ট্য

তিন প্রকার বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানুষকে নিয়ে জাতি গড়ে উঠতে পারে।

এক ঃ একটি জাতি বলতে বুঝাবে সেই বিশাল জনসমষ্টি যারা একটি বিশেষ দৈহিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে পারে। গায়ের রং, চোখের রং ও ধরন, চুলের রং ও ধরন এবং নাক ও মুখের গঠন কাঠামো।

দুই ঃ কতকগুলি বিশেষ উপাদান আছে যেগুলোর ভিত্তিতে একটি জনসমষ্টি নিজেদের এক জাতি বলে মনে করতে পারে। যেমন ঃ ধর্ম বা ভাষাগত ঐক্য, অভিন্ন ভৌগোলিক অবস্থান, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ঐক্যবোধ।

তিন ঃ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বা স্বাধীনতার চেতনা একটি বিশেষ অঞ্চলের বা এলাকার মানুষকে এক জাতিতে পরিণত করতে পারে। এরা পরাধীন হলে স্বাধীনতা চাইবে আর স্বাধীন হলে তাকে অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করবে।

এ সকল বৈশিষ্ট্যের সবকিছুর ঐক্য অথবা কোন একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলেই জাতি গড়ে উঠতে পারে।

www.pathagar.com

জাতীয়তা

একই ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম, বংশ, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং ভৌগোলিক এলাকায় ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ ও লালিত হয়ে যখন কোন জনসমষ্টি নিজেদেরকে অন্য জনসমষ্টি থেকে আলাদা মনে করে তখন সেই জনসমষ্টি জাতীয়তায় পরিণত হয়। জাতীয়তা একটি অধ্যাত্ম চেতনা ও মানসিক ধারণা। অধ্যাপক লাস্কির মতে, জাতীয়তার ভাব সাধারণভাবে মানসিক ব্যাপার। ফরাসি চিন্তাবিদ রেনান বলেন, "জাতীয়তা একটি মানসিক সত্তা এবং এটা এক প্রকার সজীব মানসিকতা। একটি জাতীয় সমাজ যখন পরিপূর্ণ ঐক্য এবং সার্বভৌম স্বাধীনতা লাভ করে তখনই তা জাতিতে পরিণত হয়। জাতি জাতীয়তার ধারণার বাস্তব রূপ মাত্র। জাতীয়তার ধারণা যেখানে নেই সেখানে জাতি গড়ে উঠতে পারে না।

জাতীয়তার অধিকারের প্রয়োজনীয়তা

জাতীয়তা একটি চেতনার নাম, একটি প্রেরণার নাম। যে চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয় এবং একটি ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়ে মানুষ পরস্পরকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, সহযোগিতা করে। এই চেতনা মানুষকে কতিপয় সাধারণ ও অভিন্ন স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য উদ্বুদ্ধ করে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে। এক জাতির মানুষ তাদের সকলের কল্যাণকে নিজের কল্যাণ মনে করে। জাতির রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন, অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও মুক্তিলাভ, সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ লাভ এবং সামাজিক উন্নয়ন ইত্যাদির জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালাতে উদ্বুদ্ধ করে জাতীয়তাবোধ। এই চেতনা মানুষকে জাতি গঠনে উদ্যম জোগায় ; উদ্দীপনা জোগায় নিজের স্বার্থ ত্যাগে। জাতি গঠনে মানুষের যত প্রয়াস, প্রচেষ্টা, উদ্যোগ, তৎপরতা, উৎসাহ সবই জাতীয়তাবোধ থেকে উৎসারিত।

মানুষ এককভাবে, বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবনের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না। এই প্রয়োজন পূরণ এবং আরো অগ্রগতি সাধনের জন্য রাজনৈতিক সংগঠন দরকার। রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার জন্য যে ঐক্যসূত্র দরকার সেটি হচ্ছে জাতীয়তাবোধ। ভাষা, ধর্ম, ইতিহাস ঐতিহ্য, ভূখণ্ড ইত্যাদি যে সব উপাদান জাতি গঠনে মানুষকে উৎসাহিত করে সে সবের এক বা একাধিক উপাদানের ভিত্তিতে মানুষ জাতি গঠন করে। এই জাতির মধ্যে ঐক্য, সংহতি, সমন্বয়, সমঝোতা, বন্ধুত্ব, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব, একাত্মতা ও অভেদ রক্ষার জন্য যে বিষয়টি ভিতর থেকে মানুষকে প্রেরণা দান করে তা হচ্ছে জাতীয়তা। এই চেতনার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

মানুষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন এবং তা রক্ষা করার জন্য আত্মিক প্রেরণা দরকার। একটি দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বিপুল পরিমাণ ত্যাগ দরকার হয়, আত্মবিসর্জন দিতে হয় অসংখ্য মানুষকে। নিবেদন, উৎসর্গ ও কুরবানি দিতে হয় অফুরন্ত সম্পদ, অগণিত জীবন। আর শুধু কি স্বাধীনতা অর্জন, একে রক্ষা করার জন্যও কম ত্যাগের দরকার হয় না। মানুষের এই যে ত্যাগ, উৎসর্গ, কুরবানি, বিসর্জন বা সমর্পণ এসবের জন্য কে মানুষকে উদ্যম ও উদ্দীপনা জোগায়? সে হচ্ছে জাতীয়তাবোধ। জাতীয়তাবোধই মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার প্রেরণা দান করে, মানুষকে উদ্দীপিত করে।

www.pathagar.com

একটি স্বাধীনতাকামী জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতা লাভের জন্য, আর একটি স্বাধীন জাতিকে গড়ে তোলার জন্য যুদ্ধ, সংগ্রাম, সাধনা দরকার হয়, দরকার হয় উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার। প্রচণ্ড পরিশ্রম এবং হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে জাতিকে গৌরব ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। একদল মানুষের আত্মবলিদান ছাড়া একটি জাতির উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও প্রগতি সম্ভব নয়। কিন্তু এই একদল মানুষ কেন আত্মদান করবে, কেন নিবেদন করবে নিজেকে। আপাত কোন কল্যাণ না দেখেও মানুষ নিজেকে সমর্পণ করে জাতির জন্য, জাতির জন্য আত্মত্যাগে মানুষকে প্রেরণা দান করে জাতীয়তাবোধ। এই বোধ ভেতর থেকে ক্রিয়াশীল না হলে মানুষ শুধুই আত্মকেন্দ্রিক হত, স্বার্থপর হত। নিজেকে নিয়ে মেতে থাকত সর্বক্ষণ। এতে তার নিজেরও কোন লাভ হত না, লাভ হত না জাতির। তাই জাতীয়তাবোধকে আমরা জাতীয় অগ্রগতি ও কল্যাণের প্রেরণাদায়ক শক্তি মনে করতে পারি।

জাতীয়তা হচ্ছে মানুষের পরিচয়ের অন্যতম সূত্র। যে সূত্রের মাধ্যমে মানুষ পরস্পরকে পরস্পরের সামনে তুলে ধরে। এটা যেমন ঐক্যের সূত্র তেমনি এটা পার্থক্যেরও সূত্র। জাতীয়তা একদল মানুষকে এক জাতিতে পরিণত করে আবার এক জাতিকে অন্য জাতি থেকে পৃথক করে। ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, ধর্ম, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ভূখণ্ডের মানুষ যেমন একজন অন্যজনকে একেবারে আপনার করে নিতে পারে না তেমনি অভিন্ন ভাষা, ধর্ম, ইতিহাস ঐতিহ্যের অধিকারী মানুষ একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। তাদের ঐক্যের জন্য একটি অবলম্বন চাই। জাতীয়তা হচ্ছে সেই অবলম্বন।

জাতীয়তা পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তন নির্ভর করে মানুষের ইচ্ছার উপর। এক সময়ের দুনিয়া কাঁপানো জাতিসমূহ কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে অনেক নতুন জাতি। সাড়া জাগানো জাতির উত্তরপুরুষেরা এখন পরিচিত হচ্ছে ভিন্ন নামে। হয়তোবা বৈশিষ্ট্যেও এদের পরিবর্তন এসেছে। বর্তমান রাজনীতির নিয়ন্ত্রক আমেরিকান বা মার্কিন জাতি, পাঁচশত বছর আগে যাদের অস্তিত্বও ছিল না। এককালের পারশিকরা এখন ইরানি জাতি। আড়াই শত বছর আগের ভারতীয়রা এখন বহু জাতিতে বিভক্ত। এক আরব জাতির অভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে এসেছে অনেক জাতি। আবার অনেকগুলো জাতি একীভূত হয়ে একজাতি গঠনের ইতিহাসও আছে। রুশ বিপ্লবের পর অনেক জাতি মিলে গড়ে তুলেছিল সোভিয়েত জাতি। এরা আবার বিভক্ত হয়ে তাদের পৃথক জাতিসত্তাকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছে। জাতীয়তাবোধের মাধ্যমে জাতি সৃষ্টি ও ভাঙা কোনটাই অস্বাভাবিক নয়।

জাতীয়তার অধিকার হরণ

শক্তি প্রয়োগ ও স্বাধীনতা হরণের মাধ্যমে জাতীয় পরিচয় কেড়ে নেওয়ার ঘটনা বিরল নয়। আমরা এবারে পৃথিবীর কিছু গুরুত্বপূর্ণ জাতির জাতীয়তার পরিচয় কেড়ে নেওয়ার চিত্র তুলে ধরব।

www.pathagar.com

উত্তর ভারতের প্রায় ছিয়াশী হাজার বর্গমাইল এলাকা জুড়ে হিমালয়ের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা ভূ-স্বর্গ কাশ্মির। বর্তমান জনসংখ্যা সোয়া কোটি। এদের জাতীয় পরিচয় ছিল কাশ্মিরি। পাক ভারত বিভক্তির সময় কাশ্মিরের তৎকালীন মহারাজা কাশ্মিরকে ভারতের সাথে অঙ্গীভূত করেন। সেই থেকে ভারত সরকারের দৃষ্টিতে কাশ্মিরিগণ ভারতীয় কারণ কাশ্মির ভারতের অংশ বা অঙ্গরাজ্য। অবশ্য কাশ্মিরের অধিবাসীরা দীর্ঘদিন থেকে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে আসছে।

১৯১৭ সালের পূর্বে মধ্য এশিয়ায় বেশ কিছু জাতি গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল। এদের মধ্যে উজবেক, কাজাক, আজারি, তাজিক, তুর্কি, আর্মেনীয় ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের পর ১৯২২ সালে ভ. ই. লেলিনের নেতৃত্বে যখন ইউ.এস.এস.আর. গঠিত হয় তখন সেই জাতিগুলোর জাতীয়তা হরণ করে তাদের সোভিয়েত জাতি হিসাবে পরিচিত করা হয়। ১৯৯২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে এরা আবার তাদের পূর্ব পরিচয়ে পরিচিত হতে শুরু করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠন ও মধ্য এশিয়ার জাতিসমূহের জাতীয়তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

৪ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত আমাদের পাশের দেশ মায়ানমার (বার্মা) । মেনন, শান, কাচিন, কয়া, কারেন, চিন এবং রোহিঙ্গা নামের বিভিন্ন জাতিসত্তার মানুষের বাস সেখানে। এরা সকলে মিলে যদি বার্মিজ জাতিগঠন করে থাকে তাহলে কারো কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু বার্মার কারেন এবং রোহিঙ্গারা দীর্ঘদিন থেকে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে। ১৯২৩ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত বার্মায় বৃটিশ শাসন কায়েম ছিল। এ সময় ১৯৩৭ সালে বার্মায় হোম রুল জারি করে সকল জাতিসত্তার পরিচয় হরণ করা হয়। রোহিঙ্গাদের নিজেদের পৃথক জাতিসত্তা এবং আরাকান নামে পৃথক আবাসভূমির দাবি করছে। রোহিঙ্গাদের জাতীয় পরিচয় হরণ করা জাতীয়তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার উদাহরণ।

অতিপরিচিত এবং বহুল আলোচিত মধ্যপ্রাচ্য সংকট যা ফিলিস্তিনিদের জাতীয়তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল যাবৎ ফিলিস্তিনিরা ঘুরে বেড়াচ্ছে শিবির থেকে শিবিরে উদ্বাস্তু পরিচয়ে। বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের রাজনৈতিক ও আর্থিক্য আনুকূল্যে এবং সামরিক সহযোগিতায় ইসরাইলিরা ফিলিস্তিনের আরব মুসলমানদের জাতীয়তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। এমনিভাবে তিব্বতীদের জাতীয়তার অধিকার হরণ করেছে চিনা সরকার। ইরাক হরণ করেছে কুর্দিদের জাতীয়তার অধিকার। শতাব্দীর শুরুতেই বৃটেন হরণ করে আইরিশদের জাতীয়তার অধিকার। এভাবে কত জাতির স্বাধীনতা হরণ করা হচ্ছে, বঞ্চিত করা হচ্ছে তাদের জাতীয়তা থেকে, তাদের আত্মপরিচয় থেকে। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা প্রত্যেকের জাতীয়তার অধিকার স্বীকার করেছে এবং কাউকেই জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না—এই ঘোষণা দিয়েছে।

www.pathagar.com

জাতীয়তা পরিবর্তন

জাতীয়তা ধারণের অধিকার যেমন মানুষের রয়েছে তেমনি জাতীয়তা পরিবর্তনের অধিকারও রয়েছে। রাজনৈতিক পরিবর্তন ও বিপ্লবের মাধ্যমে জাতীয়তার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আসতে পারে। যেমন : ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চের আগে বাংলাদেশী নামে কোন জাতির পরিচয় বা অস্তিত্ব ছিল না বিশ্বের দরবারে। বর্তমান বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডের অধিবাসীরা পাকিস্তানি, বৃটিশ ভারতীয়, ভারতীয়, বাঙালি ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। পাকিস্তানি বঞ্চনার বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামের অভিন্ন ঐতিহ্য আর ভাষার মিলের ভিত্তিতে আমরা এই ভূখণ্ডের অধিবাসীরা নয় মাসের একটি সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে তুলেছি নতুন দেশ, বাংলাদেশ। এখন আমাদের জাতীয়তা হচ্ছে বাংলাদেশী। এটা রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফসল।

সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠনের ফলে সেখানকার মধ্য এশীয় প্রজাতন্ত্রসমূহের জাতিগুলোর জাতীয়তা বিলুপ্তি এবং সোভিয়েত জাতি গঠনের পেছনে মূল কারণ হিসেবে অনেকে বিপ্লবের কথা বলেন। আবার সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙন এবং সেই জাতিগুলোর পুনরুত্থানকেও অনেকে ব্যাপক রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফসল মনে করেন।

কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও বর্ণের মানুষ এসে একত্রিত হয়ে গড়ে তুলেছে আমেরিকান জাতি। এদের মধ্যে ইংরেজ, আফ্রিকান, তুর্কি, গ্রিক, পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, এশিয়ান তথা সব জাতির মানুষই রয়েছে, তবে এরা সকলেই এখন আমেরিকান। এভাবে মানুষ তার প্রয়োজনে, স্বেচ্ছায়, বৈধ উপায়ে জাতীয়তা পরিবর্তন করতে পারে। এটা তার মানবিক অধিকার।

ব্যাপকভিত্তিক রাজনৈতিক পরিবর্তন আর বিপ্লব ছাড়াও ব্যক্তিগত পর্যায়ে জাতীয়তা পরিবর্তন হতে পারে। ধর্ম পরিবর্তন, নাগরিকত্ব অর্জন, দেশ ত্যাগ ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের জাতীয়তা পরিবর্তিত হতে পারে। বিভিন্ন দেশে নাগরিকত্ব অর্জন বর্জন ইত্যাদির বিভিন্ন রকমের স্বীকৃত পথ রয়েছে। প্রচলিত আইনের স্বীকৃত পথ অনুসারে যে কোন ব্যক্তি তার জাতীয়তা পরিবর্তন করতে পারে, এ অধিকার প্রত্যেক মানুষের জন্যই সংরক্ষিত। কেউ যদি নাগরিকত্ব ত্যাগের মাধ্যমে জাতীয়তা পরিবর্তন করতে চায় তাহলেও বলপূর্বক তাকে এই কাজ থেকে বিরত রাখা যাবে না। জাতীয়তা পরিবর্তনের এই কাজ থেকে বিরত করা আর জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করা একই কথা।

বর্তমান বিশ্বে রাজনৈতিক নিপীড়নের কারণে অনেক মানুষ স্বদেশ ত্যাগ করে ভিনদেশে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করছে। প্রার্থিত দেশে আশ্রয় পেলে, সে দেশেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে এবং এক পর্যায়ে সে দেশের নাগরিকত্ব নিয়ে নতুন জাতীয়তা লাভ করছে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের শিকার হাজার হাজার ভিয়েতনামীর আমেরিকায় আশ্রয় গ্রহণ এবং পরবর্তীতে আমেরিকান জাতিভুক্ত হওয়ার বিষয়টি এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

www.pathagar.com

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা মানুষের জাতীয়তার অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে বলেছে, কাউকেও যথেচ্ছভাবে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না এবং কেউ যদি নিজের জাতীয়তা পরিবর্তন করতে চায় তাহলে এতে অস্বীকার করা যাবে না।

আলোচ্য অনুচ্ছেদে "যথেচ্ছভাবে (arbitrarily) জাতীয়তা থেকে কাউকে বঞ্চিত না করার" কথা বলা হয়েছে। arbitrarily শব্দের অর্থ হচ্ছে "কোন বিধি নিয়ম দ্বারা আবদ্ধ নয় এমন", বিধিবহির্ভূত, ইচ্ছামত, খামখেয়ালি, স্বেচ্ছাচারী ইত্যাদি। তবে কি বিধিসম্মতভাবে জাতীয়তার অধিকার হরণ করা যায়?

জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করার ক্ষেত্রে বিধিসম্মত এবং বিধিবহির্ভূত প্রসঙ্গটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি উত্থাপন করা হয় তা হচ্ছে, কাউকে জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করার কোন বিধিসম্মত উপায় আছে কি? এ প্রশ্নের জবাব খুঁজলে দেখা যাবে যে, দেশদ্রোহীতা বা রাষ্ট্রদ্রোহীতার কারণে অনেক সময় নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হয়। নাগরিকত্ব কেড়ে নিলে স্বাভাবিকভাবেই ঐ ব্যক্তি জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত হয়। যেমনটি আমাদের দেশে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী কতিপয় শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়েছিল। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তারা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এদেশে সংগঠিত সকল হত্যাকাণ্ড ও নারী ধর্ষণের সাথে জড়িত ছিল, জড়িত ছিল হত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের সাথে। এ জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে দুটি ধারণা চালু আছে। একটি ধারণা হচ্ছে এই যে, যারা একটি জাতির সকলের অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠের মানবাধিকার হরণ করতে চায় বা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, তাদের মানবাধিকার হরণ করাই সঙ্গত। তাদেরকে জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করার মধ্যে কোন অন্যায় নেই। অন্য আরেকটি মত হচ্ছে, কোন অপরাধের অজুহাতেই কারো নাগরিক অধিকার হরণ করা উচিত নয়, বঞ্চিত করা ঠিক নয় তার জাতীয়তা থেকে।

যাই হোক, আমরা সেই বিতর্কে না গিয়েই বলতে চাই যে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় আলোচ্য অনুচ্ছেদে মানুষের জাতীয়তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে। কোন ব্যক্তির জাতীয়তা কেড়ে না নেয়ার কথা বলা হয়েছে এবং কেউ স্বীয় জাতীয়তা বদলাতে চাইলে এতে অস্বীকৃতি জানাতে নিষেধ করা হয়েছে। সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার জন্য মানুষের এই অধিকার নিশ্চিত করা দরকার।

জাতীয়তা পরিবর্তন ও নাগরকিত্ব পরিবর্তন

আধুনিক কালে নাগরিকত্ব অর্জনের বিভিন্ন পন্থা আছে। জন্মসূত্র, বৈবাহিক সূত্র এবং অনুমোদন সূত্রে কোন দেশের নাগরিকত্ব অর্জন করা যায়। কোন ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রহণ করে অথবা ব্যক্তির পিতামাতা যে দেশের নাগরিক, জন্মসূত্রে সে ব্যক্তি ঐ দেশের নাগরিক। সেই দেশের জাতীয়তার পরিচয়েই সে পরিচিত। পরিবর্তনশীল সময়ের প্রেক্ষিতে ঐ ব্যক্তি বৈবাহিক সূত্রে অথবা অনুমোদন সূত্রে নতুন কোন দেশের নাগরিক হতে পারেন। নতুন করে তিনি যে দেশের

www.pathagar.com

নাগরিকত্ব অর্জন করলেন, সেই দেশের জাতীয়তার পরিচয়ে তিনি পরিচিত হবেন। এতে করে দেখা যাচ্ছে যে, একই ব্যক্তির দুটি জাতীয়তা পরিচয় থাকতে পারে। এমনি ধরনের দুটি নাগরিকত্ব এবং দুটি জাতীয়তা পরিচয় আছে এমন অসংখ্য বাংলাদেশী ছড়িয়ে আছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। যুক্তরাজ্যে এমন অনেক বাংলাদেশী আছেন, যারা দীর্ঘদিন যাবৎ সেখানে আছেন। ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন, রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিচ্ছেন। এরাই আবার বিভিন্ন সময় দেশে ফিরে বিভিন্ন নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। এই যে দ্বি-নাগরিকত্ব যা দুটি জাতীয়তার ভিত্তি তাও অবাস্তব কিছু নয়। সম্প্রতি ওপি-ওয়ান কর্মসূচির আওতায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসনের জন্য অসংখ্য বিদেশীকে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে। যে সব প্রবাসী যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন গ্রহণ করেছেন তারা যেমন আমেরিকার নাগরিক তেমনি আবার তাদের পূর্বতন দেশেরও নাগরিক। বাস্তব ক্ষেত্রে তাদের এখন জাতীয়তার পরিচয় দুটি। এই ধরনের দুটি জাতীয়তা যদি সংশ্লিষ্ট দেশের আইনের লঙ্ঘন না হয়, বিধি বহির্ভূত না হয় তাহলে দুটি জাতীয়তার অধিকারও ঐ ব্যক্তির রয়েছে। তবে এই বিষয়টি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও আভিবাসন আইনের আওতায় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক।

জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা

জাতীয়তাকে কেন্দ্র করে যে চেতনার উন্মেষ হয়েছে, তাকে বলে জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদ হচ্ছে আধুনিক বিশ্ব রাজনীতির নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি। আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবাদের ধারণার প্রসার ঘটে। এর ফলে বিশ্বের রাজনৈতিক মানচিত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে।

জাতীয়তাবাদের বিকাশ এবং আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্রসমূহের উদ্ভবের ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নানাবিধ কলহ ও বিরোধের সূত্রপাত হয়েছে। দেশে দেশে সীমান্ত বিরোধ, যুদ্ধবিগ্রহ লাগছে। এই কলহ, বিরোধ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসান ঘটিয়ে বিশ্বে শান্তি শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তর্জাতিকতার ধারণার উদ্ভব হয়েছে। জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ যে আন্তর্জাতিকতার উদ্ভব, তার লক্ষ্য হচ্ছে জাতীয় রাষ্ট্রের স্থলে বিশ্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।

আন্তর্জাতিকতা বা বিশ্ব রাষ্ট্রের ধারণাকে অতিসাম্প্রতিক মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন গ্রিসে হেলেনেস্টিক রাষ্ট্রচিন্তায় এর আভাস পাওয়া যায়। তৎকালীন গ্রিক চিন্তাবিদগণ তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর রাষ্ট্রের পরিবর্তে বিশ্বনগরীর (World City) আদর্শ বাস্তবায়নের চিন্তাভাবনা করেন। মধ্যযুগীয় অন্যতম দার্শনিক চিন্তাবিদ দান্তেও (Dante) তার সময়কালের ইতালির অভ্যন্তরীণ দুরবস্থা অবলোকন করে বিশ্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করেন। আধুনিক কালে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে স্বার্থসংঘাত, আদর্শিক দ্বন্দ্ব, সীমান্ত বিরোধ, অন্যরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা জাতীয় রাষ্ট্রের সার্থকতা ও সফলতা সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি করেছে।

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিকতার ধারণা যারা পোষণ করেন, তাদের মতে, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশকে কাজে লাগিয়ে জাতীয়তাবাদীরা মারাত্মক মারণাস্ত্রের সাহায্যে মানব সভ্যতাকে সংকটাপূর্ণ করে তুলেছে। এই সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্য বৃহত্তর মানব গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিকতার বিকাশ আবশ্যক। মানুষকে জাতীয়তার স্বার্থের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করে তাদের মধ্যে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের মনোভাব জাগিয়ে তুলতে হবে।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ

১৯৭১ সালের দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, সংবিধানের ভাষায়, "জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধের" মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে যে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে, তার সকল অধিবাসী বা নাগরিক 'বাংলাদেশী' নামে পরিচিত হয়। বাংলাদেশের জনগণ ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে মার্চ এই জাতীয়তা ধারণ করেছে। ইতিপূর্বে এর অধিবাসীরা পাকিস্তানি, বৃটিশ ভারতীয় বা ভারতীয় ইত্যাদি নামে অভিহিত হত।

ভারতবর্ষের এই অঞ্চলের যে অংশটুকু বর্তমানে বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ হিসাবে পরিগণিত, সে অংশের মানুষের ভাষা বাংলা। সে কারণে ভাষার ভিত্তিতে এখানে একটি জাতিসত্তা গড়ে ওঠে, যা বাঙালি নামে অভিহিত হয়ে আসছে দীর্ঘদিন থেকে, উভয় বাংলার অধিবাসীদের ভাষা এক হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে সংস্কৃতিগত একটি অভিন্ন ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। কারণ অভিন্ন ভাষা ভাবের আদান প্রদানে সহায়ক ছিল।

১৯৪৭ সালের বৃটিশ ভারত বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের রূপ নিলে বাংলা দ্বিখণ্ডিত হয়ে এর পশ্চিমাংশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় আর পূর্বাঞ্চল পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তানের অঙ্গীভূত হয়। তখন পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জাতীয় পরিচয় হয় ভারতীয় বাঙালি আর পূর্ববঙ্গের মানুষ হয় পাকিস্তানি বা পূর্বপাকিস্তানি।

এতে হাজার বছরের ঐতিহ্যে লালিত বাঙালি দ্বিখণ্ডিত হয় এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে বাঙালি জাতিসত্তা কিছুটা হলেও ভূ-লুণ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহে জাতীয়তাবাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু জাতীয়তাবাদের কোন সংজ্ঞা সংশোধিত সংবিধানে দেওয়া হয় নি। ১৯৭৮ সালের পূর্বে সংবিধানের নবম অনুচ্ছেদে জাতীয়তাবাদের ভিত্তি বর্ণিত হয়েছিল। এতে বলা হয়েছিল "ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তির উপর জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত।" ১৯৭৮ সালে ঐ অনুচ্ছেদ রদ করা হয়।

যে সকল উপাদান নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত যেমন—ভাষা, বংশ, ধর্ম, ভৌগোলিক সান্নিধ্য, রাষ্ট্রীয় সংগঠন, ইতিহাস, ঐতিহ্য, জাতীয় ভাব ইত্যাদির অনেকগুলিই বাংলাদেশে বিদ্যমান। বাংলাদেশের মানুষ একটি অবিভক্ত ও সংহত ভৌগোলিক এলাকায় বাস করে, এরা একই ভাষায় কথা বলে, এদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এক, এর প্রত্যেকটিই জাতীয়তাবাদের এক একটি উপাদান।

www.pathagar.com

সে কারণে আমাদের জাতীয়তাবোধ স্পষ্ট। এদেশের অধিবাসীরা অন্য দেশ থেকে নিজেদেরকে স্বতন্ত্র মনে করে, এটাও জাতীয়তাবাদের একটি লক্ষণ। অধিবাসীদের শতকরা ৮৫ ভাগ মুসলমান। তাদের মধ্যে ধর্মীয় চেতনার ঐক্যও বিদ্যমান, তাই এরা একটি ভিন্ন জাতি।

ধর্মীয় ঐক্যের বিষয়টিকে যদি জাতীয়তাবাদের চেতনা হিসেবে ধরে নেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে যে, এদেশের ভিন্নধর্মাবলম্বীদের সাথে তাদের স্বাতন্ত্র্য যেমন ফুটে উঠে তেমনি ভিনদেশের মুসলমানদের সাথে তাদের ঐক্য প্রতিভাত হয়ে উঠে। আমরা যদি জাতি হিসেবে নিজেদেরকে মুসলমান পরিচয় দেই তাহলে আমাদের রাষ্ট্রীয় সীমানায় বসবাসরত মানুষের মধ্যে বিভক্তি আসে এবং ভিন দেশের নাগরিকদের সাথে সংহতি প্রকাশ পায়। এটা জাতীয় রাষ্ট্রগঠনের সহায়ক নয়।

ভাষার অভিন্নতার বিষয়টি যদি জাতীয়তাবাদের মূল বা একমাত্র উপাদান হিসেবে ধরে নেওয়া হয়, তাতেও দেখা যাবে যে, আমাদের এই স্বাধীন ভূখণ্ডে বসবাসরত মণিপুরী, খাসিয়া, চাকমা, মুড়ং, গারো, সাঁওতাল প্রভৃতি যারা বাংলা ভাষাভাষী মানুষ নয় তাদের সাথে বাংলা ভাষাভাষীদের একটি পার্থক্যের দেয়াল দাঁড়িয়ে গেছে। তেমনি পশ্চিম বাংলার বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সাথে ঐক্য গড়ে উঠেছে, যা জাতীয় সংহতির মারাত্মক অন্তরায় হতে পারে।

কিন্তু বাংলাদেশ নামের ভূখণ্ডের অধিবাসী, সে যে ধর্ম, যে ভাষা, যে এলাকার অধিবাসীই হোক না কেন, সকলে দীর্ঘদিন ধরে এক অভিন্ন ঐতিহ্যে ও সংস্কৃতিতে লালিত হয়ে আসছে, এবং এটাই তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটিয়েছে। এই জাতীয়তাবোধ তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে। একটি অভিন্ন স্বার্থ, অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের দীর্ঘদিনের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ও নয় মাসের যুদ্ধ আমাদেরকে একটি জাতি গঠনে উদ্বুদ্ধ করেছে। যার কারণে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধের বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়েই আমরা "বাংলাদেশী" জাতিতে পরিগণিত হয়েছি।

দীর্ঘদিন ধরে ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলে এক একটি জনগোষ্ঠীর মানুষ সম্প্রদায়গত যে জীবনে এসে পৌঁছায় তাকে বলা হয় জাতীয় সম্প্রদায়। এই জাতীয় সম্প্রদায়ের দুটি দিক আছে— সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক। সামাজিক দিক থেকে জাতীয় সম্প্রদায়কে বলে জাতীয় সমাজ আর রাষ্ট্রনৈতিক দিক থেকে তা হচ্ছে জাতীয় রাষ্ট্র। বর্তমানে রাষ্ট্র ব্যবস্থা জাতীয় রাষ্ট্রের সমবায়ে গঠিত।

জাতীয় রাষ্ট্রের ভাব বা আদর্শকে বলে জাতীয় ভাব বা জাতীয়তাবাদ। আবার কোন পরাধীন জাতি বা জনসমাজ যদি নিজেদের মধ্যে ঐক্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে স্বাধীনতা অর্জন এবং স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবি করে তবে তাকেও জাতীয়তাবাদ বলে অভিহিত করা হয়। জাতীয়তাবাদের উৎস হচ্ছে মানুষের গূঢ়তম প্রবৃত্তি।

বাংলাদেশের মানুষ পরাধীন অবস্থায় নিজেদের অভিন্ন স্বার্থ হাসিলের জন্য নিজেদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলে স্বাধীনতার জন্য সম্মিলিতভাবে সংগ্রাম করেছে তাই এদেশের অধিবাসীরা

www.pathagar.com

বাংলাদেশী জাতি। এই জাতীয়তার অধিকার এদেশের প্রতিটি নাগরিকের মানবাধিকার হিসেবে আলোচ্য অনুচ্ছেদে স্বীকৃত হয়েছে।

জাতীয়তা : ক্রম পরিবর্তনশীল এক ধারণা

পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে যখন মানুষের আবির্ভাব হয় প্রথম তখন তার পরিচয় কি ছিল? কোন জাতি সত্তার অধিকারী ছিল সে? কোন বর্ণ, কোন গোত্রীয় পরিচয় ছিল তার? এই প্রশ্নের উত্তর নিরূপণ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার তবে একটা বিষয় বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, সেটা হচ্ছে আদি মানব ছিল মানব জাতির মৌলিক একক। তার জাতিসত্তার পরিচয় অনুসন্ধান করলে বলতে হবে যে , সে ছিল মানব জাতির অন্তর্ভুক্ত। সেই মানব জাতি আজো আছে। আজো পৃথিবীর সকল মানুষই মানব জাতির মৌলিক একক। সেই মানব জাতির মধ্যেই আছে আরো শত শত জাতি সত্তা। এ যেন একের ভেতর শত। কত জাতের মানুষ আছে আমাদের এই ভুবনে। আমেরিকান, ইউরোপীয়ান, আফ্রিকান, আরাবিয়ান, ফার্সীয়ান, ইণ্ডিয়ান, মঙ্গোলিয়ান, রাশান এমনি ধরনের অনেক অনেক রকমের। এগুলোর মধ্যে রয়েছে আবার বিভিন্ন জাত, বিভিন্ন বিভাগ। যেমন ইউরোপীয়ানদের মধ্যে আছে গ্রিক, আইরিশ, ইংলিশ, স্কটিস, সুইডিস, স্পেনিশ, রোমান ইত্যাদি। আফ্রিকানদের মধ্যে আছে লিবিয়, ইথিওপীয়, ইরিত্রিয়, সোমালি, ইনকাথা, জুলু ইত্যাদি। ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে আছে বাঙালি, বিহারি, গোজরাটি, পাঞ্জাবি, কাশ্মিরি, মণিপুরি, নাগা, তামিল ইত্যাদি। আরাবীয়ানদের মধ্যে আছে মিশরীয়, ইরাকি, কুয়েতি, সৌদীয়ান , লেবানিজ, ফিলিস্তিনি, সিরিয়ান ইত্যাদি। এশিয়ানদের মধ্যে আছে জাপানি, মালয়ি, চিনা, সিংহলি, বার্মিজ, তিব্বতি ইত্যাদি। এমনি ধরনের নানা জাত নানা জাতির মানুষ আছে এই দুনিয়ায়।

একই উৎস থেকে উৎসারিত মানব জাতি এখন শতধারায় বিভক্ত। কেন আসলো এ বিভক্তি? কি দরকার ছিল শতধারায় প্রবাহিত হওয়ায়? নদী যেমন একই পর্বত থেকে অনেকগুলি উৎপত্তি হয়ে বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে আবার একই সাগরে পতিত হয় তেমনি মানব জাতি। মানব জাতির আদি উৎস এক ও অভিন্ন। "কালো আর ধলো, বাহিরে কেবল, ভিতরে সকলি সমান রাঙ্গা।" এই সমান রাঙ্গা, অভিন্ন মানুষ শতধারায় বিভক্ত হওয়ার কারণ কি? কেন মানব জাতির প্রতিটি একক একই এবং অভিন্ন পরিচয়ে আবির্ভূত না হয়ে বিভিন্ন পরিচয়ে পরিচিত, বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত?

এরও বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। মানব জাতির বহুধা বিভক্তির পেছনেও যুক্তি আছে। একই পরিবারের একই বংশের প্রতিটি মানুষের পৃথক পৃথক নাম থাকে। শুধুমাত্র পরিবারের অভিন্ন নামেই তারা পরিচিত হয় না। পারিবারিক পরিচয়ের পরও তাদের প্রত্যেকের পৃথক পরিচয় থাকে। একই ব্যক্তির অনেকগুলো পরিচয় থাকতে পারে যেমন হাসান। সে বাঙালি, সে মুসলমান, সে বাংলাদেশী এবং সর্বোপরি সে মানুষ। তার একটি পরিচয় অন্য পরিচয়গুলোকে গ্রাস করে না।

www.pathagar.com

বরং একই সঙ্গে সহঅবস্থান করতে পারে। তেমনি জাতিসত্তার বিভিন্নতাও মানব পরিচয়টিকে হরণ করে না। আমাদের প্রশ্ন ছিল কেন মানব জাতি বহু জাতিসত্তায় বিভক্ত?

প্রথমত, পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথেই মানুষ খাদ্য, আবাস এবং আশ্রয়ের সন্ধানে ছড়িয়ে পড়তে থাকে পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে। এতে করে কিছু মানুষ বিচ্ছিন্ন হয় পরস্পর থেকে। আবার কিছু মানুষ একত্রিত হয় একে অপরের সঙ্গে। বিচ্ছিন্নতা মানুষে মানুষে দূরত্ব সৃষ্টি করে, একতা সৃষ্টি করে মিল অভিন্নতা।

বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে দূরত্ব ক্রমশ দুরতিক্রম্য হয়ে দাঁড়ায়। এরপর এক এক অঞ্চলের আবহাওয়া, জলবায়ু, প্রাকৃতিক পরিবেশ, মাটি ইত্যাদি মানুষের চেহারা, মন-মেজাজ ইত্যাদিকে এক এক রকম করে ফেলে। ফলে স্থান বা অঞ্চল ভেদে মানুষ হয় এক এক ধরনের। বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের চেহারা মন-মেজাজ, চাহিদা ইত্যাদির অমিল মানুষে মানুষে পার্থক্যের সূচনা করেছে আর মিল সূচনা করেছে ঐক্যের। এভাবেই বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি হয়েছে।

পৃথিবীতে অনেক ভাষা, ধর্ম, বর্ণ ও বৈশিষ্ট্যের মানুষ আছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে কেন্দ্র করে মানুষ সৃষ্টি করেছে এক একটি জাতি। তবে এই বিষয়গুলো স্থির নয়। কখনো মানুষ ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে তুলেছে জাতি, কখনো প্রাধান্য দিয়েছে ভাষাকে, বর্ণের ভিত্তিতেও জাতি গড়ে উঠার নজির আছে । আবার আছে অঞ্চলের ভিত্তিতে। কখনো এসব কিছুকে উপচিয়ে শুধু রাজনেতিক চেতনা বা রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে জাতি গড়ে উঠেছে। পুরো বিষয়টি নির্ভর করছে মানুষের চিন্তা এবং মনের গ্রহণযোগ্যতার উপর। অর্থাৎ কোন জনগোষ্ঠী বিশেষ কোন কিছুর ভিত্তিতে যখন নিজেদের জাতিসত্তার নতুন পরিচয় জারি করতে চায় তখন তাকে রোখা যায় না। একাধিক জাতি এক জাতিসত্তায় বিলীন হওয়ার নজির যেমন আছে তেমনি ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে এক জাতি বহু জাতিতে রূপান্তর হওয়ার। সঙ্ঘবদ্ধভাবে সম্মিলিত ভাবে একটি জনগোষ্ঠী যেমন জাতীয়তার পরিবর্তন ঘটাতে পারে তেমনি বিচ্ছিন্নভাবে একজন ব্যক্তিও তার জাতীয়তার পরিবর্তন করতে পারে। মানুষের জাতিসত্তার পরিবর্তনটি সহজ, স্বাভাবিক এবং গ্রহণযোগ্য। প্রতিনিয়তই এই পরিবর্তন হচ্ছে এবং হবে।

বৃটিশ ভারতে ভারতীয় জাতিসত্তার পরিচয়ে জনগোষ্ঠী ছিল তারা এখন ভারতীয়, পাকিস্তানি এবং বাংলাদেশী এই ত্রিধারায় বিভক্ত। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত এ অঞ্চলের পাকিস্তানি পরিচয়ের জনগোষ্ঠী এখন পাকিস্তানি ও বাংলাদেশী হিসেবে বিভক্ত। এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। তেমনি বর্তমান ভারতে অনেক জাতিগোষ্ঠীর বাস। তাদের ভাষা, কৃষ্টি, আচার, খাবার, ঐতিহ্য, পোষাক ইত্যাদিতে অনেক পার্থক্য। এরা বাঙালি, বিহারি, পাঞ্জাবি, কাশ্মিরি, নাগা, মণিপুরি, তামিল ইত্যাদি অনেক জাতিগোষ্ঠীতে বিভক্ত। তবুও তারা তাদের সকল জাতিসত্তাকে এক ও অভিন্ন ভারতীয় জাতিসত্তায় বিসর্জন দিয়েছে। তাদের জাতিগত পরিচয় তারা ভারতীয়। তেমনি পাকিস্তানি জাতিসত্তার অভ্যন্তরে আছে সিন্ধি, পাঞ্জাবি, পাঠান ইত্যাদি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী। সারা পৃথিবীতে এমনি অনেক উদাহরণ আছে জাতিসত্তার

www.pathagar.com

পরিবর্তনের। পরিবর্তনের এই ব্যাপারটি হচ্ছে মেনে নেওয়ার। ইরিত্রিয়ানরা যখন নিজেদের আলাদা জাতি মনে করে তখন তাদেরকে আর ইথিওপীয় মনে করার যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। পনেরটি ভিন্ন ভিন্ন জাতি মিলে ত্রিশের দশকের শুরুতে যখন সোভিয়েত জাতি গঠন করেছিল তখন যেমন তাদের বাধা দেওয়া যায় নি তেমনি শতাব্দীর শেষ দশকে তারা যখন ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে স্বকীয় পরিচয়ে আবির্ভূত হতে চেয়েছে তখনও তাদের দমন করা যায় নি। এসব উদাহরণ থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে প্রতি জাতির জনগোষ্ঠীর নিজেদের জাতিসত্তার পরিচয় নির্ধারণের বিষয়টি একান্তই তাদের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। জাতিসত্তার পরিচয় পরিবর্তন হতে পারে। কোন জনগোষ্ঠীর জাতিসত্তার পরিচয় পরিবর্তন হবে কিনা তা নির্ভর করে তাদের মতামত ও ইচ্ছার উপর। জাতিগত পরিচয় পরিবর্তনে যেমন বাধা দেওয়া যাবে না তেমনি পরিবর্তনের জন্য বাধ্যও করা যাবে না।

ব্যক্তির শুধুমাত্র ব্যক্তিগতভাবে জাতিসত্তার পরিচয় পরিবর্তনেরও অনেক উদাহরণ আছে। যেমন ভারত বিভাগের সময় অনেকেই স্বেচ্ছায় দেশ ত্যাগ করে নিজের জাতীয়তা নির্ধারণ ও পরিবর্তন করেছেন। অনেক ভারতীয় এশিয়ান আফ্রিকান বিভিন্ন সময়ে বৃটিশ বা আমেরিকার জাতীয়তা গ্রহণ করেছেন। ফলে এরা হয়েছেন এশিয় আমেরিকান, কালো আমেরিকান, আরাবিয়ান আমেরিকান। এই ধারা আজো অব্যাহত আছে। নাগরিকত্ব পরিবর্তনের মাধ্যমে এক জাতি থেকে অন্য জাতিতে পরিবর্তনের ঘটনা কম নয়। বর্তমানে জাতীয়তার পরিচয় বলতে জাতীয় রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব বুঝায়। কোন ব্যক্তি যখন কোন বিশেষ রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করে তখন সেই সেই জাতীয় রাষ্ট্রের জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত হয়। সেই জাতির তখন যে পরিচয় তারও তখন সেই একই পরিচয়।

জাতীয়তা ধারণের, জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত না হওয়ার এবং জাতীয়তা পরিবর্তনের অধিকারটি মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি মানুষের একটি জাতিগত পরিচয় অবশ্যম্ভাবী, যে পরিচয়ে সে আবির্ভূত হবে বিশ্ব মানচিত্রে। কারো জাতিগত পরিচয় হরণ করা মানবাধিকারের পরিপন্থী।

এই অনুচ্ছেদ ও ইসলাম

জাতীয়তার অধিকার আলোচ্য অনুচ্ছেদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এ বিষয়ে ইসলামের বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও বিজ্ঞানভিত্তিক। জাতীয়তার অধিকারকে ইসলাম সম্মান প্রদর্শন করে। ইসলাম মানুষকে অভিন্ন জাতিসত্তার অধিকারী মনে করে। অর্থাৎ ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ হচ্ছে মানব জাতির অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের সুরা বাকারায় বলা হয়েছে, " শুরুতে সকল মানুষ একজাতিভুক্ত ছিল, আল্লাহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে নবীগণকে পাঠালেন তাদের সাথে সঠিকভাবে কিতাবও নাজিল করলেন, যাতে লোকে যে বিষয়ে বিবাদ করতে ছিল, সে বিষয়ে তারা তাদের

www.pathagar.com

মধ্যে মীমাংসা করতে পারে।" সূরা ইউনুসে বলা হয়েছে, "মানুষ প্রথমে এক জাতি ছিল, পরে নানা দল হয়েছে। এবং যদি তোমার প্রভুর তরফ হতে আগেই দণ্ড না দেওয়ার ওয়াদা না হত তবে তারা যে বিষয়ে দলাদলি করছে তার শেষ মীমাংসা করেই দেওয়া হত।"

ইসলাম সকল মানুষকে এক ও অভিন্ন জাতি অর্থাৎ মানব জাতি মনে করলেও মানুষের জাতীয় পরিচয়কে অস্বীকার করে নি। কুরআনের সূরা হুজরাতে বলা হয়েছে, "হে লোকসকল, নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃজন করেছি এবং আমি তোমাদেরকে নানা উপজাতি ও জাতিতে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সেই আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যে সবচেয়ে নেককার। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব জানেন সবকিছুর খবর রাখেন।"

ইসলামের দৃষ্টিতে সমগ্র মানবজাতি এক, তবে তাদের মধ্যে পরিচয় নির্দেশ করার জন্য বর্ণ গোত্র ও জাতিগত বিভিন্নতা স্বাভাবিক ও যৌক্তিক।

সারসংক্ষেপ

মানুষের কিছু পরিচয় আছে, যেগুলো লাভ করার ব্যাপারে নিজস্ব কোন অধিকার বা দায়িত্ব নেই। যে পরিবারে এবং যে দেশে এবং যে পিতার ঔরসে এবং মাতার গর্ভে দবির জন্মগ্রহণ করেছে, সেই পরিবার দেশ এবং পিতা মাতা তার পরিচয়। এই পরিচয় এতই স্বাভাবিক যে, এগুলো থেকে দবিরকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

আমরা সকলেই এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি, এটি যেমন সত্য ; আমরা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছি এটিও তেমনি সত্য। বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করে আমরা বাংলাদেশী হয়েছি। এই জাতীয়তাকে আমরা গৌরব মনে করি।

জাতীয়তাবাদের একটি অহংকার আছে। সেই অহংকার কিছু আবেগের জন্ম দেয়। সেই আবেগ মহামূল্যবান। এই আবেগের বশবর্তী হয়ে মানুষ তার জাতীয়তা রক্ষার জন্য বহু কিছু বিসর্জন দিতে পারে এমনকি জীবনও। জাতীয়তা লাভের অধিকার তাই একটি মানবাধিকার।

যার যা জাতীয়তা, তার অধিকার আছে সেই জাতীয়তা সংরক্ষণের। এই অধিকার হরণ করা যায় না কোন কারণে। তবে কেউ যদি পরিবর্তন করতে চায়, সে অধিকার তার আছে । সে একজন বিশ্ব নাগরিক। তাই এই অধিকার তার মৌলিক।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

(১) গোত্র, জাতীয়তা, অথবা ধর্মের ভিত্তিতে কোনরূপ সীমাবদ্ধতা ব্যতিরেকে, পূর্ণবয়স্ক সকল পুরুষ ও নারীর বিবাহ এবং পরিবার প্রতিষ্ঠা করার অধিকার রয়েছে। বিবাহে ও বিবাহিত অবস্থায় এবং বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে নারী ও পুরুষ সমান অধিকার লাভের অধিকারী।

(২) ভাবী দম্পতির অবাধ ও পূর্ণ সম্মতির ভিত্তিতেই কেবল বিবাহ বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হবে।

(৩) পরিবার হচ্ছে সমাজের স্বাভাবিক ও মৌলিক গোষ্ঠী একক এবং তা সমাজ ও রাষ্ট্রের রক্ষণ লাভের অধিকারী।

(Article : 16. (1) Men and women of full age,without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution. (2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spoues. (3) The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.)

ভাষ্য

সর্বজনীন মানবাধিকার সনদের আলোচ্য অনুচ্ছেদের মূল বক্তব্য হচ্ছে বিবাহ সম্পাদন ও পরিবার প্রতিষ্ঠা। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার আগে আমাদের বিবাহ ও পরিবার সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা দরকার।

www.pathagar.com

বিবাহ কাকে বলে?

বিবাহ হচ্ছে একটি কার্যপ্রণালী যার মাধ্যমে মানুষ পারিবারিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে। একাকী বাস করতে চায় না মানুষ, একাকী বাস করা তার পক্ষে সম্ভবও নয়। তাই মানুষ চায় জীবনের একজন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সঙ্গী। পুরুষ তার একজন স্ত্রী সঙ্গী খোঁজে আর স্ত্রী খোঁজে পুরুষ সঙ্গী। পুরুষ নারী পরস্পর একত্রে বসবাস করে আনন্দ উপভোগ করতে চায়, দুঃখ কষ্ট পরস্পরের মধ্যে ভাগ করে নিতে চায়। এমনি অবস্থা থেকে বিবাহ প্রথার উদ্ভব।

নারী ও পুরুষের মধ্যে সংসার ও পারিবারিক জীবন যাপনের সুযোগ করে দেয় বিবাহ। বিবাহ যৌনক্ষুধা বৈধ উপায়ে পরিতৃপ্তি, সন্তান উৎপাদন, সন্তান প্রতিপালন এবং হৃদয়বৃত্তি প্রকাশের সুযোগ করে দেবে। বস্তুত বিবাহ হচ্ছে পরিবার গঠনের মূল সূত্র। বিবাহ, সে যে পদ্ধতিরই হোক না কেন, এ ছাড়া পরিবার প্রতিষ্ঠার কথা স্বাভাবিকভাবে আশা করা যায় না ।

বিবাহ সম্পর্কে প্রখ্যাত নৃবিজ্ঞানী ওয়েস্টার মার্ক বলেছেন, বিবাহ পুরুষ এবং নারীর মধ্যে কমবেশী স্থায়ী এমন একটি সম্বন্ধ যা বংশ বিস্তারের প্রক্রিয়াকে ছাড়িয়ে সন্তান উৎপাদনের পরেও বলবৎ থাকে। এই সংজ্ঞায় আমরা বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের তিনটি উপাদান পাচ্ছি। যথা—নারী পুরুষের মধ্যে সম্বন্ধ, সম্বন্ধের মোটামুটি দীর্ঘস্থায়িত্ব এবং সন্তান উৎপাদন ও বংশবিস্তারের সঙ্গে এই সম্বন্ধের নিবিড় যোগ।

এক স্বামীর এক স্ত্রী এবং এক স্ত্রীর এক স্বামী এই বিবাহ ব্যবস্থা এখন বেশ জনপ্রিয়। কিন্তু এক স্বামীর একাধিক স্ত্রী অর্থাৎ বহু পত্নীত্ব ব্যবস্থা আজো লোপ পায় নি। আফ্রিকার কোন কোন উপজাতি, ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশেও এই ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এমনকি পৃথিবীর অনেক আদিম উপজাতির মধ্যে এক স্ত্রীর বহুস্বামী অর্থাৎ বহুপতিত্ব ব্যবস্থা চালু ছিল।

বিবাহের স্থায়িত্বের প্রশ্নটি অত্যন্ত জটিল। কেননা আধুনিক উন্নত দেশগুলোতে মুহূর্তে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটছে যা থেকে বিবাহের স্থায়ীত্বের বিষয়ে সন্দেহের সংশয়ের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। হলিউডের চিত্র তারকাদের বিবাহ বিচ্ছেদের খবরপত্র পত্রিকা আমাদের প্রায়ই জানান দেয়। অন্যদিকে আবার চিরস্থায়ী বিবাহ ব্যবস্থাও আছে। যেমন, হিন্দুসমাজের বিবাহ জন্ম জন্মান্তরের বন্ধন। স্বামীর মৃত্যু হলেও বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয় না। তাই হিন্দু রমণীরা স্বামীর মৃত্যুর পর আজীবন মৃত স্বামীর স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিবাহ একটি আমরণ ব্যবস্থা। মুসলিম সমাজে স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যু হলে পুনর্বিবাহ বৈধ কিন্তু তারপরও অনেক পুরুষ এবং স্ত্রীলোক যৌবনে স্ত্রী বা স্বামী হারা হয়ে পুনর্বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন না। নিঃসঙ্গই থেকে যান আজীবন।

সন্তান উৎপাদনের সঙ্গে বিবাহ বন্ধন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বস্তুত বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। নর নারীর সঙ্গ আর নারী নরের সঙ্গ কামনা করে। এরা পরস্পরের সংস্পর্শ পেতে চায়। নর ও নারীর এই পারস্পরিক আকর্ষণের পরিণতি যৌনমিলন। যৌন মিলনের আকাঙ্ক্ষা যাতে সামাজিক বিশৃঙ্খলা এবং বিভেদের কারণ না হয় তাই বিবাহের

www.pathagar.com

মাধ্যমে মানুষের এই সহজাত প্রবৃত্তিকে এক জোড়া নারী ও পুরুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়। বিবাহ ব্যবস্থার ফলে নর ও নারীর যথেচ্ছ যৌন মিলন বাতিল হয় তবে বিবাহিত এক জোড়া নারী পুরুষের অবাধ যৌনমিলন সামাজিক স্বীকৃতি পায়। বিয়ের পর স্বামী স্ত্রী যৌন মিলনের আনন্দ উপভোগ করে। এর ফলে সন্তানের জন্ম হয়। নর নারী যেমন পরস্পরকে চায় তেমনি সন্তানও চায়। বিবাহোত্তর যৌনমিলনের মাধ্যমে মানুষের সন্তানাকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণতা লাভ করে। কাজেই বলা যায়, বিবাহ নারীপুরুষের মধ্যে স্বীকৃত যৌন মিলনের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং এই মিলনের পরিণতিতে তাদের সন্তানের আকাঙ্ক্ষা পরিণতি লাভ করে।

ক্যাথলিন গ্রাফ নামক জনৈক নৃবিজ্ঞানী বিবাহ সম্পর্কে বলেন যে, "বিবাহ একটি রমণী এবং এক বা একাধিক ব্যক্তির মধ্যে এমন সম্বন্ধ যার ফলে ঐ রমণীর গর্ভজাত সন্তান সমাজের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে সম অধিকার ভোগ করে।" এই ধারণার অনুসারী নৃবিজ্ঞানীদের মতে, যৌন মিলন বা সন্তান উৎপাদন নয়, সমাজের সদস্য হিসেবে সন্তানের অধিকার প্রতিষ্ঠাই বিবাহের উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে উত্তরাধিকারের প্রশ্নটি আসে। সাধারণভাবে সন্তান পিতার উত্তরাধিকার লাভ করে। তাই বিবাহের মাধ্যমে পিতৃত্বের বৈধ ও স্বীকৃত ব্যক্তি না থাকলে নারীর সন্তান লা ওয়ারিশ হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। তাই আমরা বলতে পারি বিবাহ হচ্ছে সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ যা ব্যতীত সমাজ ব্যবস্থা গতিহীন নির্জীব হয়ে পড়তে পারে। সমাজ অচল হয়ে যেতে পারে।

বিবাহ অনেক ধরনের হতে পারে। যে ধরনের, যে প্রকৃতির বিবাহ ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকুক না কেন, তাকে অব্যাহত রাখতে হবে। যে সমাজে যে প্রথা চালু আছে সেই সমাজের সদস্যকে সেই প্রথায় বিবাহকর্ম সম্পাদনের অধিকার দিতে হবে। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে। এই অধিকার হরণ করার অর্থ মচ্ছে মানবিক অধিকার হরণ করা। কারণ বিয়ের মাধ্যমে মানুষ নিম্নোক্ত সুবিধাগুলো লাভ করে। মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য এই সুবিধাগুলো অপরিহার্য। যেমন ঃ

(১) বিবাহ নারীর সন্তানের আইনগত পিতৃত্ব এবং পুরুষের সন্তানের আইনগত মাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

(২) বিবাহ স্বামীকে স্ত্রীর যৌন জীবন এবং স্ত্রীকে স্বামীর যৌনজীবনের উপর অধিকার প্রদান করে।

(৩) বিবাহ স্বামীর শ্রমশক্তির উপর স্ত্রীর এবং স্ত্রীর শ্রমশক্তির উপর স্বামীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে।

(৪) বিবাহ স্বামীর সম্পত্তির উপর স্ত্রীকে এবং স্ত্রীর সম্পত্তির উপর স্বামীকে কর্তৃত্ব দেয়।

(৫) বিবাহ স্বামী ও স্ত্রীর উপর সন্তানের প্রতিপালন ও সন্তানের ভবিষ্যত গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব অর্পণ করে।

(৬) বিবাহ স্বামী ও স্ত্রীর নিজ নিজ আত্মীয়স্বজনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করে।

www.pathagar.com

উপরে যে কাজগুলোর কথা বলা হলো সেগুলোর মধ্যে দেওয়া নেওয়ার বাস্তবতা সুস্পষ্ট। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দেওয়া নেওয়া, আদান প্রদানের আদর্শের সর্বোচ্চ পরিপূর্ণতা ঘটে থাকে। নারী পুরুষের স্বার্থের একত্ব, মন ও মতের মিল, মমত্ববোধ, সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও সহনশীলতার পূর্ণ বিকাশের সূত্র হচ্ছে বিবাহ। বিবাহের মাধ্যমে যে সম্পর্কের সূচনা হয় তাতে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মনের খোরাক জোগায়, একজনের নিঃসঙ্গতা অপরে পূরণ করে, একজনের অভাব অন্যজনে মেটায়। আপদে-বিপদে, আনন্দে-বিষাদে, সুখে-দুঃখে, রোগে-শোকে, স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের কাছ থেকে সহানুভূতি পায়, একাত্মতা লাভ করে এবং দুঃখ সইবার মনোভাব লাভ করে। মানব জীবনের জন্য এটা এক অপরিহার্য পাওনা।

বস্তুত বিয়েতে আনন্দ আছে, আছে দায়িত্ব। আর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে আছে বিষাদ। বিয়ের আনন্দ, দায়িত্ব, বিষাদ একজন নারী পুরুষ বা একজোড়া নারী পুরুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটা ব্যক্তি, দম্পতি, পরিবার ইত্যাদির গণ্ডি ছাড়িয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ পরিসরে বিস্তৃত। বিবাহ মানুষের মানুষের মৌল মানবিক চাহিদাগুলো যেমন পূরণ করে অন্য কোন প্রতিষ্ঠান তেমনটি পারে না। অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বিয়ে থেকে মানুষ বেশি তৃপ্তি ও সুখ লাভ করতে পারে।

হাজার হাজার বছর ধরে বিয়ে নামক এই সামাজিক প্রতিষ্ঠানটি পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। অদূর ভবিষ্যতে এই প্রতিষ্ঠান বিলুপ্তির কোন সম্ভাবনা আছে কি? এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া কঠিন। তবে এ বিষয়ে বিশ্বখ্যাত পত্রিকা লাইফ ম্যাগাজিনের একটি সমীক্ষার কথা উল্লেখ করা যায়। সত্তর দশকে পশ্চিমা বিশ্বের ইংরেজি ভাষাভাষী বাষট্টি হাজার নর নারীর উপর পরিচালিত এই সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, পশ্চিমারা মনে করেন, নানা বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও সময়ের বিবর্তনে মানুষ বিবাহের প্রয়োজনীয়তা আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করবে। এবং ভবিষ্যতে বিবাহের প্রতি মানুষের মনোভাব আরো ইতিবাচক হবে। বিবাহের প্রতি মানুষের এই ইতিবাচক ধারণার মূল কারণ হচ্ছে আর্থিক নিরাপত্তা। এক সময় ছিল যখন নারী সম্পূর্ণরূপে পুরুষের আয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল। আজ সেই অবস্থা খানিকটা পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু এখনো পৃথিবীতে অধিকাংশ নারী পুরুষের আয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। আবার যে সকল নারী কর্মক্ষম, উপার্জন করেন তারা স্বামীর আয়ের সাথে নিজের আয় মিলিয়ে সংসারের স্বাচ্ছন্দ্যকে বৃদ্ধি করেন। যেভাবেই হোক না কেন নারী পুরুষ একজনের উপার্জন অথবা দুজনের উপার্জন মিলে যে আর্থিক নিরাপত্তা আসে তা বিবাহের মাধ্যমেই অর্জিত হয়।

আর্থিক নিরাপত্তাই মানুষের সব নয়। এ ছাড়াও একজন মানুষ নানাবিধ নিরাপত্তার প্রত্যাশা করে। মানুষ, সে নারী হোক বা পুরুষ হোক, বিপদে আপদে, রোগব্যাধিতে, দ্বিধাগ্রস্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণে একাকী অসহায় বোধ করে। সবচেয়ে বেশি অনিরাপত্তা বোধ আসে মানুষের বৃদ্ধত্বের চিন্তা থেকে। বৃদ্ধ বয়সের একটি অবলম্বন মানুষ পূর্বাহ্নে স্থির করে রাখতে চায়। এটাই মানুষকে বিবাহে উদ্বুদ্ধ করে। তাই বিবাহের প্রয়োজনটা হচ্ছে মানবিক প্রয়োজন। বিবাহের মাধ্যমেই গড়ে উঠে পরিবার।

www.pathagar.com

পরিবার কাকে বলে?

মানুষের আদিম ও প্রাচীনতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে পরিবার। পরিবার মানব সমাজের সেই প্রাথমিক সংগঠন যাতে এক বা একাধিক পুরুষ তার বা তাদের স্ত্রীপুত্র কন্যা ও অন্যান্য পরিজন নিয়ে বসবাস করে। মানুষ স্বভাবতই সংগপ্রিয় এবং সামাজিক জীব। সে একাকী থাকতে চায় না। স্নেহ প্রেম প্রীতি ও ভালবাসার পাত্রপাত্রী নিয়ে সে বসবাস করতে চায়। চায় জীবনের প্রতিটি স্তরে সহযোগিতা আর ভালবাসা। এজন্য স্ত্রী পুত্র কন্যার স্নেহ ও ভালবাসায় আবদ্ধ থাকতে চায়, পুরুষ আর নারী চায় স্বামী সন্তানের ভালবাসার আবেষ্টনীতে বসবাস করতে। তাই মানুষের স্বাভাবিক মনোভাবের অভিব্যক্তি হচ্ছে পরিবার। পরিবার প্রতিষ্ঠার অধিকার হচ্ছে মানবাধিকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

পরিবার কাকে বলে এ সম্পর্কে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীর মতামত উল্লেখ করছি। অধ্যাপক ম্যাকাইভার (Maciver) বলেছেন, "সন্তান সন্ততির জন্মদান এবং লালনপালনের লক্ষ্যে বিবাহভিত্তিক ক্ষুদ্র সামাজিক একককে পরিবার বলে।" কিম্বল ইয়ং (Kimbal Young) বলেছেন, "সমাজ স্বীকৃত পন্থায় সন্তান সন্ততির অধিকারী এক বা একাধিক পুরুষ এবং এক বা একাধিক মহিলার দ্বারা গঠিত সামাজিক সংস্থাকে পরিবার বলে।" রড্ম্যান এবং গ্রামস (H Rodman and P. Grams) বলেছেন, "পরিবার হচ্ছে সমাজের এমন ক্ষুদ্র একক যা বিবাহের মাধ্যমে নারী পুরুষের মিলন ঘটায় এবং সন্তান সন্ততির জন্মদান ও লালন পালনের মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ সুগম করে।"

বস্তুত পরিবার হচ্ছে সমাজের ক্ষুদ্রতম একক। বিবাহ হচ্ছে পরিবারের প্রাণ। মাতা পিতা এবং সন্তান এই দুই প্রজন্মের সম্মেলন হয় পরিবারে , আর সন্তান উৎপাদন ও লালন পালন হচ্ছে এর প্রধান কাজ। পরিবারবিহীন সমাজের কথা ভাবাই যায় না।

পরিবারের প্রয়োজনীয়তা

পরিবার গড়ে উঠার ইতিহাস মানব সভ্যতার ইতিহাসের মতই প্রাচীন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের পরিবার পদ্ধতি চালু ছিল, আজও সর্বত্র পরিবার কাঠামো এক রকম নয়। পিতৃতান্ত্রিক, মাতৃতান্ত্রিক, একক, যৌথ, একপত্নীক, বহুপত্নীক, বহুপতি ইত্যাদি নানা রকম পরিবার পদ্ধতি বিভিন্ন সময়ে এই সমাজে প্রচলিত ছিল। কোন কোনটি আজও আছে। যে কাঠামো বৈশিষ্ট্য বা ধরনের পরিবার পদ্ধতিই হোক পরিবারের বিদ্যমানতা সবসময়ই ছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন পরিবার গড়ে উঠে ? পরিবারের প্রয়োজন কি? পরিবার না থাকলে মানুষের কি অসুবিধা হবে? এসব প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আমাদের অবশ্যই পরিবারের কার্যাবলী বিশ্লেষণ করতে হবে। পরিবার যে সব কাজ করছে পরিবার নামক এই সামাজিক প্রতিষ্ঠানটি না থাকলে এই কাজগুলো কোন প্রতিষ্ঠান সম্পাদন করতো তা অনুসন্ধান করতে হবে। তাহলেও আমরা পরিবারের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবো। তাই এবার পরিবারের কার্যাবলী আলোচনা করছি।

www.pathagar.com

১. **জৈবিক কাজ ঃ** পরিবারের প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে সন্তান সন্ততির জন্মদান। জন্মের পর তাদের যত্ন নেওয়া এবং শৈশবে তাদের লালন পালনের ব্যবস্থা করা। তাই পরিবারকে সন্তান উৎপাদনকারী ও লালনপালনকারী প্রতিষ্ঠানও বলা হয়। বর্তমানে অনেক উন্নতদেশ এবং আমাদের দেশের শহরাঞ্চলে শিশু লালন পালনের ভার মাতৃমঙ্গল, শিশুসদন ইত্যাদির হাতে অর্পণ করা হচ্ছে। অনেক দেশে শিশুদের লালন পালনের ভার রাষ্ট্রের হাতে অর্পিত হয়েছে। তথাপিও পৃথিবীর সিংহভাগ শিশুর লালন পালনের ভার আজও রাষ্ট্রের হাতে যায় নি। পরিবারই তাদের পালন কেন্দ্র । তাছাড়া সন্তান উৎপাদনের ভার আজও সম্পূর্ণরূপে পরিবারের হাতে অর্পিত আছে।

২. **অর্থনৈতিক কার্য ঃ** একসময় পরিবারই ছিল উৎপাদন কেন্দ্র। বিভিন্ন পেশা ও শিল্পকর্ম দ্বারা পরিবারের সদস্যগণ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র জোগাড় করত। পরিবারই ছিল খাদ্য বস্ত্র ও আশ্রয়ের স্থল। নারী পুরুষের সহজ শ্রমবিভাগ পরিবারের মধ্যেই প্রথম প্রবর্তিত হয়। কুটির শিল্প, চাষবাস এবং শ্রম প্রদানের মাধ্যমে পরিবারের অর্থনৈতিক প্রয়োজন মিটানো হত। আধুনিককালে পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন কল কারখানা, শিল্প ও ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠান কৃষিক্ষেত্র ইত্যাদি কাজ করে পরিবারের প্রয়োজন পূরণ করে। অতীতে যেমন পরিবারের আওতায় অনেক কিছু উৎপাদন করা হতো এখন তেমনটি না হলেও পরিবার অনেক কুটির শিল্পজাত দ্রব্য, ফলমূল, তরিতরকারী, সব্জি, হাঁস মুরগীসহ গৃহপালিত পশু উৎপাদনের কেন্দ্র। তাছাড়া পরিবারের সদস্যরা বাইরে কাজকর্ম করলেও এর মাধ্যমে যে মজুরি পাবে তাতে পরিবারের আর্থিক প্রয়োজন পূরণ হবে।

৩. **শিক্ষামূলক কাজ ঃ** শিশুদের সামাজিকীকরণের মূল এবং প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র হচ্ছে পরিবার। সামাজিক শিষ্টাচার, ব্যক্তিগত জীবনে সততা ও সাধুতা পালন, ইত্যাদির শিক্ষা শিশুরা পারিবারিক পরিমণ্ডলেই লাভ করে। আত্মত্যাগ, সহযোগিতা, সামাজিক সুবিচার এবং অন্যান্য সামাজিক গুণাবলী অর্জনের জন্য পরিবার হচ্ছে আদর্শ স্থান। বর্তমানে স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ যদিও শিক্ষাদনের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করছে তবুও প্রাথমিক শিক্ষা এবং সামাজিকীকরণের বিষয়টিকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। আর এ ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৪. **অবকাশরঞ্জক কাজ ঃ** পারিবারিক পরিবেশে অবকাশ যাপনের জন্য গল্পগুজব, খেলাধুলা এবং আমোদ আহলাদের মাধ্যমে মানুষ আনন্দ লাভ করে থাকে। অতীতে পরিবারই ছিল অবকাশ ও আনন্দ বিনোদনের কেন্দ্র। আধুনিককালে বিভিন্ন ধরনের বিনোদন মাধ্যম প্রচলিত হওয়ার পরও টেলিভিশন ভি.সি.আর পরিবারের বিনোদন গুরুত্বকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে।

৫. **রাজনৈতিক কার্য ঃ** পরিবার কতগুলো রাজনৈতিক কাজ সম্পাদন করে। নেতৃত্ব ও আনুগত্য—যা রাজনীতির মূলকথা—তা মূলত পরিবারেই শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। পরিবারের

www.pathagar.com

কর্তা হিসেবে পিতা সাধারণত কোন আদেশ প্রদান করলে অন্যরা তা মেনে চলে। তিনি সকলের অধিকার ও সম্মান রক্ষা করে চলেন। নিয়মানুবর্তিতা, আনুগত্য এবং নেতৃত্ব বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুতিকাগার হচ্ছে পরিবার। রাজনৈতিক চেতনার এই শিক্ষা পরিবারে না হলে অন্য কোথায়ও তা পাওয়া যাবে না।

৬. **মনস্তাত্বিক কার্য ঃ** ভালবাসা, স্নেহ মায়া, মমতাবোধ ইত্যাদি দ্বারা পরিবার সকলের মানসিক অভাব পূরণ করে। একে অন্যের ব্যথায় ব্যথিত হয়। সুখে দুঃখে অংশগ্রহণ করে, একই ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হয়ে মনস্তাত্বিক কাজ সম্পাদন করে পরিবার। এই কাজ অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব নয়।

৭. **সামাজিক কার্য ঃ** পরিবারের সদস্যরা পরস্পরকে আত্মরক্ষায় সাহায্য করে, উন্নতি সাধনের অনুপ্রেরণা যোগায়, প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে সাহায্য প্রদান করে, মানসিক বৃত্তিগুলির উৎকর্ষ সাধনে সহায়তা করে—যা কিনা সুস্থ সমাজ গঠনের সহায়ক।

আধুনিক কালে পরিবারের কার্যক্ষেত্র অনেকখানি সঙ্কুচিত হয়েছে কিন্তু পরিবারের গুরুত্ব কমেনি। পরিবারকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে মায়া মমতা, সদ্ভাব গড়ে উঠে। ভবিষ্যত বংশধরকে গড়ে তোলার জন্য এবং উত্তরাধিকার রেখে যাওয়ার জন্য, কাজের প্রেরণা যোগায় পরিবার।

পরিবার একটি শক্তিশালী এবং ব্যাপক বিস্তৃত সামাজিক প্রতিষ্ঠান। মানুষের কল্যাণ, সমৃদ্ধি এবং টিকে থাকার জন্যই এই প্রতিষ্ঠান অপরিহার্য। প্রতিটি মানুষের পরিবার প্রতিষ্ঠার অধিকার রয়েছে। এ ক্ষেত্রে মানুষকে জাতি, জাতীয়তা এবং ধর্মের ভিত্তিতে কোন সীমাবদ্ধতায় ফেলা যাবে না। পরিবার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোন রকমের বাধা নিষেধের আওতায় ফেলা যাবে না কোন মানুষকে।

পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ ও নারী

ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই উপমহাদেশে বাল্যবিবাহ বন্ধ এবং বিধবা বিবাহ প্রচলন করার জন্য প্রবল আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রমুখ। সে সময় এমন ঘটনাও ঘটেছিল যে, তিন মাস বয়সী মেয়ে শিশুকে বিয়ে দিয়েছে তার অভিভাবকরা। আট নয় বছর বয়স হলে মনে করা হত যে বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং যেনতেনভাবে একটি পাত্র জোড় করে মেয়েকে পাত্রস্থ করাটা ছিল সামাজিক প্রথা। সেখানে বয়সের হিসাব করা হত না। ৭ বছরের কনে আর ৬০ বছরের বুড়ো বর হলেও আপত্তির কারণ ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ বিল পাশ করানোর সাথে সাথে বাল্যবিবাহ রোধের সংগ্রামে অবতীর্ণ হন।

এই একশত বছরের ব্যবধানে পৃথিবীর চেহারা অনেক বদলে গেছে। ১৯২৯ সালে প্রবর্তিত Child Marriage Restraint Act ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত মেয়েদের বিয়ে আইনত

www.pathagar.com

নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১৮৭২ সালে ভারতে সিভিল ম্যারেজ এ্যাক্ট প্রণীত হয়। সে আইন অনুযায়ী পাত্র ও পাত্রীর সর্বনিম্ন বয়স যথাক্রমে ১৮ ও ১৪ করা হয়। বিয়েতে বর ও কনের সম্মতি আবশ্যক বলে ধারা যুক্ত হয়। উভয়ের বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার স্বীকৃত হয় এবং এক স্ত্রী বর্তমান থাকতে দ্বিতীয় বিয়ে নিষিদ্ধ করা হয়। বাংলাদেশে ১৯৮৩ সালে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়ের বিয়ে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স নির্ধারণ করা হয় মেয়ের জন্য ১৮ আর ছেলের জন্য ২১। জাতিসংঘের শিশু অধিকার কনভেনশন অনুযায়ী অনূর্ধ্ব ১৮ বছরের ছেলেমেয়েরা শিশু। অতএব, পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ নারী বলতে যথাক্রমে ২০ ও ১৮ বছরের বেশি পুরুষ ও নারী বুঝায়।

ঠিক কত বছর বয়স পর্যন্ত একটি মানব সন্তানকে শিশু বলা যাবে, অথবা কত বছর বয়স হলে পূর্ণবয়স্ক নারী বা পুরুষ বলা যাবে এ বিষয়ে সর্বসম্মত কোন মত নেই। জাতিসংঘের ১৯৮৯ সালের Convention on the Rights of the Child-এর প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,

For the purpose of the present Convention, a Child means every human being below the age of eighteen years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.

এই ধারা অনুযায়ী আঠার বছর পর্যন্ত সব ছেলেমেয়েই শিশু। ১৮৭৫ সালের The Majority Act অনুযায়ী ও আঠারো বছর বয়স পূর্ণ হলে একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি সাবালকত্ব অর্জন করেছে বলে মনে করা হয়। ইউনিসেফের রিপোর্ট অনুসারে বাংলাদেশে ৬৬% মেয়ে ১৮ বছর বয়সের আগেই সন্তানের মাতা হয় আর ৮০% মেয়ে মাতা হয় ২০ বছর বয়সের আগে। পরিকল্পনা কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ১৯৮৯ সালে বালাদেশের মেয়েদের বিয়ের বয়সের গড় ছিল ১৮.৪। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের বিদ্যমান অবস্থায় কোন মেয়েকে ১৮ বছরের কম হলেও শিশু গণ্য করা খুবই দুরূহ এবং অবাস্তব। সার্ক ১৯৯০ সালকে মেয়ে শিশুবর্ষ বলে ঘোষণা করেছে এবং স্থির করেছে যে, বিশ বছর পর্যন্ত মেয়েদের শিশু বলে গণ্য করা হবে। অতএব বলা যায় যে, অনূর্ধ্ব বিশ বছরের মানবসন্তান শিশু বলে গণ্য হবে আর বিশোর্ধ্ব মানবসন্তান পূর্ণ বয়স্ক বলে পরিগণিত হবে। অথচ এই দেশেই প্রবাদ ছিল যে বাঙালি মেয়ে কুড়িতেই বুড়ি। অপরিণত বয়সে বিয়ে দিয়ে কুড়িতে বুড়ি বানানোর প্রয়াসও ছিল।

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি পূর্ণবয়স্ক নারী এবং পূর্ণবয়স্ক পুরুষ বলতে কাদেরকে বুঝায়। এরা অর্থাৎ পূর্ণবয়স্ক নারী ও পুরুষেরা তিন অবস্থায় বা তিনটি বিষয়ে সমান অধিকার লাভ করবে। যথা :

(ক) বিবাহ করার ব্যাপারে (to marriage)
(খ) বিবাহিত অবস্থায় (during marriage)
(গ) বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে (at its dissolution)

www.pathagar.com

এই তিনটি বিষয় কিঞ্চিত বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

(ক) **বিবাহ সম্পর্কে নারী পুরুষের সমান অধিকার** ঃ বিবাহ সম্পর্কে বিভিন্ন সমাজে যদিও বিভিন্ন ধারণা ও রেওয়াজ প্রচলিত আছে তথাপি একটি বিষয়ে সবার মধ্যে প্রায় অভিন্নতা রয়েছে যে, বিবাহ হচ্ছে নারী পুরুষের মধ্যে মোটামুটি স্থায়ী বন্ধন। সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে লালিত পালিত এবং ভিন্ন পরিবেশে বেড়ে উঠা দু'জন মানুষ একই সূত্রে আবদ্ধ হয় বিবাহের মাধ্যমে। বিবাহ তাদের মধ্যে দৈহিক ও আত্মিক মিলন ঘটিয়ে দেয়। যাদের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হবে তাদের পরস্পরের সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার, পরস্পরকে পূর্বাহ্নে জানার ব্যাপারে সম অধিকার থাকা বাঞ্ছনীয়। পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে নারী পুরুষ সকলেই সমান অধিকার লাভ করবে।

আমাদের দেশে বিবাহের ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীর পাত্র নির্বাচনের কোন সুযোগ নেই। পিতামাতা যাকে তার বর হিসাবে নির্ধারণ করেন তার সম্পর্কে কোন কিছু না জেনেই বিবাহের আসরে বসতে হয়। অন্যদিকে কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষ তার পাত্রী নির্বাচনের জন্য সম্ভাব্য পাত্রী তথা বিবাহ-উপযুক্তা মেয়েদের বাড়িতে গমন করে মেয়ে দেখেন অনেকটা হাটে বাজারে গরু দেখার মত। নারী তাদের কাছে পণ্যের মত। তাই তারা নারীর চোখ, কান, নাক, মুখ, আঙুল ইত্যাদি বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন। সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া এই হচ্ছে সমগ্র বাংলাদেশের চিত্র যা বিবাহের পূর্বে পরিলক্ষিত হয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের চিত্রও প্রায় একই রূপ।

(খ) **বিবাহিত অবস্থায় সমঅধিকার** ঃ বিবাহিত অবস্থায় নারী পুরুষ হন একই পরিবারের সদস্যা ও সদস্য। পরিবার গড়ে তোলা, পরিবারের আয় উন্নতি, অগ্রগতি বিকাশ ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের সমান ভূমিকা বা অবদান থাকে। পরিবারের আর্থিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য চাকরি, ব্যবসা, শ্রমদান, সন্তান জন্মদান ও তার লালন পালন, সন্তানের শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা, পরস্পরের জৈবিক চাহিদা মেটানো, বিনোদন, আমোদ প্রমোদ নিরাপত্তা রক্ষা, ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে নারী পুরুষ কারো অবদান খাটো করে দেখার কোন সুযোগ নেই। পরিবারে নারী পুরুষের অবদান যেখানে সমান, সেখানে নারী পুরুষের অধিকারের মধ্যে বৈষম্য প্রদর্শনের কোন কারণ নেই। তাই বলা হয়েছে বিবাহিত অবস্থায় নারী পুরুষের অধিকার সমান। সম অধিকার লাভে তাদের কোন অযোগ্যতা নেই।

কিন্তু আমাদের সমাজের বৃহদাংশে বিবাহিত নারী সাধারণভাবে গৃহ পরিচালিকা, দাসী ইত্যাদি থেকে উন্নত কিছু হওয়ার স্বীকৃতি পায় নি। দিবা রাত্রি হাড়ভাঙ্গা খাটুনী এবং তারপরও পুরুষের মনোরঞ্জন ছাড়া তার কোন কাজ নেই, অথচ তার কাজের শ্রমের স্বীকৃতি নেই। বিবাহিত অবস্থায় পারিবারিক জীবনে নারী পুরুষের মধ্যে যে সহযোগিতা, সহমর্মিতা, মমত্ববোধ ও আত্মিক যোগ থাকা দরকার, আমাদের সমাজে সর্বত্র সেটি নেই। বাংলাদেশে বিবাহিত নারীর উপর নির্যাতনের মাত্রা অনেক বেশি। বিবাহিত অবস্থায় শুধু স্বামী কর্তৃক নয় সেই সঙ্গে শ্বশুর-

www.pathagar.com

শাশুড়ি, দেবর-ভাসুর, জা-ননদ প্রমুখের দ্বারা নির্যাতনের অনেক ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশে। যৌতুকের কারণেই বিবাহিত অবস্থায় নারীকে চরম নির্যাতনের শিকারে পরিণত হতে হচ্ছে। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে বিবাহিত অবস্থায় অর্থাৎ পারিবারিক জীবনে নারী ও পুরুষ সমান অধিকার লাভের যোগ্য। কোন অজুহাতেই পারিবারিক জীবনের অধিকার লাভে নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না।

(গ) **বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে নারী পুরুষ সমঅধিকার ঃ** বিবাহ নারী পুরুষের মধ্যে যে বন্ধন, সহমর্মিতা, নৈকট্য, ভালবাসা সৃষ্টি করার কথা অনেক সময় বিভিন্ন কারণে সেটা নাও হতে পারে। বিবাহিত নারী পুরুষের মধ্যে যদি প্রেম ভালবাসা না থাকে বনিবনা না হয়, শারীরিক বা মানসিক কোন কারণে যদি মতানৈক্য, দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি অসম্ভব হয়ে পড়ে, তাহলে বিবাহ বিচ্ছেদের দিকে এগোনা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। মেজাজ, আচরণ এবং জৈবিক কারণেই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে থাকে। পারস্পরিক নির্ভরতা, সহযোগিতা এবং আস্থার পরিবেশ গড়ে তোলার জন্যই মানুষ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বিবাহিত অবস্থায় পারিবারিক জীবনে যদি সহযোগিতা, আস্থা এবং নির্ভরতার পরিবেশ গড়ে তুলতে কোন দম্পতি ব্যর্থ হয়, তাহলে দুর্ভাগ্য হলেও তাদেরকে বিবাহ বিচ্ছেদ মেনে নিতে হয়। মানবাধিকার ঘোষণার এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রেও নারী পুরুষের অধিকার সমান। অর্থাৎ কোন পুরুষ যদি মনে করেন তার স্ত্রীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক অব্যাহত রাখা তার পক্ষে আর সম্ভব নয় তাহলে তিনি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন। এই অধিকার তার রয়েছে আবার কোন নারী যদি মনে করে তার স্বামীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক অব্যাহত রাখা তার পক্ষে সম্ভব নয়, তাহলে তিনিও বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন। তার এই অধিকার রয়েছে। এই অধিকার পুরুষের যেমন, নারীরও তেমনি রয়েছে। বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে নারী ও পুরুষ সমান অধিকার লাভের যোগ্য।

আমাদের সমাজে সাধারণত স্বামীই স্ত্রীকে তালাক দেয়। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের মধ্যে মেয়েরা স্বামীকে তালাক দেওয়ার ঘটনা একেবারে বিরল নয় তবে তার সংখ্যা খুবই কম। মুসলিম পারিবারিক আইনের তালাক দেওয়ার ক্ষমতা স্ত্রীর থাকবে কিনা সেটা বিবাহের রেজিস্ট্রেশন তথা কাবিনে উল্লেখ থাকতে হয়।

আলোচ্য অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে বিবাহ বন্ধন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ভাবী দম্পতির অবাধ সম্মতি এবং পূর্ণ সম্মতি প্রয়োজন হবে।

অবাধ ও পূর্ণ সম্মতি

বিবাহ সম্পন্ন হবে একজন পূর্ণ বয়স্কা নারী এবং একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের মধ্যে। অনেকগুলো আত্মিক ও শারীরিক এবং সামাজিক প্রয়োজন পূরণের জন্য বিবাহ সম্পন্ন হয়।

www.pathagar.com

যৌনানুভূতি, সন্তান লাভের বাসনা, উত্তরাধিকারী সৃষ্টি, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, পারস্পরিক সহযোগিতা, সামাজিক চেতনা ইত্যাদিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে কোন নারী বা পুরুষ যখন বিবাহের কথা চিন্তা করেন তখন তাকে অবশ্যই ভাবতে হয় জীবনসঙ্গী হিসেবে কাকে পেলে তার ঐসব চাহিদা, প্রয়োজন বা অভাব মিটবে। তখনই বিবাহের পাত্রপাত্রী নির্বাচনের প্রশ্নটি আসে। নারী পুরুষ প্রত্যেকেরই নিজের সঙ্গী নির্বাচনের অবাধ অধিকার রয়েছে। এই অনুচ্ছেদের মূল কথা এটাই।

পূর্ণ বয়স্ক নারী পুরুষ নিজের ভবিষ্যত, কল্যাণ অকল্যাণ ভাল মন্দ সম্পর্কে সচেতন। তাই নিজের জীবন সম্পর্কে যে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তার রয়েছে। এক্ষেত্রে যারা তার শুভাকাঙ্ক্ষী বা অভিভাবক তারা পরামর্শ দিতে পারেন কিন্তু কোন ব্যাপারেই বাধ্য করতে পারেন না। ব্যক্তিগত জীবনে বাধ্যবাধকতা স্বাধীনতা হরণেরই নামান্তর। বিবাহ যেমন একদিকে সামাজিক প্রতিষ্ঠান, অন্যদিকে তেমনি পাত্র–পাত্রীর একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। যারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দাম্পত্য জীবন শুরু করবেন, বিবাহের ব্যাপারে তাদের উভয়ের অবাধ ও পূর্ণ সম্মতি থাকতে হবে। কোন বাধ্যবাধকতা ছাড়াই পূর্ণ সম্মতির ভিত্তিতে বিবাহ বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হবে। কাউকে চাপ দিয়ে সম্মতি আদায় অথবা সম্মতি ব্যতিরেকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধ্য করা মানবাধিকারের নীতিমালার পরিপন্থী।

এই অনুচ্ছেদের শুরুতেই আমরা পরিবার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেছি। এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, পরিবার হচ্ছে সমাজের স্বাভাবিক ও মৌলিক গোষ্ঠী একক।

সমাজ অর্থই হচ্ছে মানুষের দলবদ্ধভাবে বসবাস। এই পৃথিবীতে মানুষ সমাজবদ্ধ বা দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করে বিভিন্ন ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়ে। সমাজের কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলো স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠে এবং পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এই প্রতিষ্ঠান চোখে পড়ে। আবার কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান বা সামাজিক সংগঠন আছে যেগুলো মানুষ বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে গড়ে তুলেছে। এগুলো হচ্ছে কৃত্রিম সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

পরিবার হচ্ছে এমন একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান যা সমাজ সৃষ্টির শুরুতেই অতি স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠেছে। সমাজের সবচেয়ে প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান হচ্ছে পরিবার। মানুষের বংশরক্ষা অথবা মানব জাতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্যই পরিবারের আবশ্যকতা। পরিবার নামক এই সামাজিক প্রতিষ্ঠানটি না থাকলে মানব জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব হতো না। তাই পরিবার যে সমাজের স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সমাজের যতগুলো প্রতিষ্ঠান আছে সেটা স্বাভাবিক হোক আর কৃত্রিম হোক, এর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্র বা ছোট প্রতিষ্ঠান হচ্ছে পরিবার। মানব সমাজের ক্ষুদ্রতম দলগত একক হচ্ছে পরিবার। পরিবারকে বিভক্ত করলে এর মধ্যে আর কোন দল বা গোষ্ঠীর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। পরিবার হচ্ছে সমাজের একেবারে ক্ষুদ্রতম গোষ্ঠী একক। পরিবারের সদস্যদের একজন থেকে অন্যজনকে পৃথক করার কোন উপায় নেই। তাই এটা মৌলিক প্রতিষ্ঠান।

www.pathagar.com

সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক সংরক্ষণ

সমাজের প্রাচীনতম এবং ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে পরিবার। পরিবারকে রক্ষা করার দায়িত্ব যুগপৎভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রের। সমাজ ও রাষ্ট্র পরিবারকে সংরক্ষণ করার জন্য কিভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা দরকার।

সমাজের কর্তব্য : পরিবার গঠনের অন্যতম উপাদান হচ্ছে বিবাহ। বিবাহ একটি সামাজিক আচার। সমাজবদ্ধ মানুষ সমাজকে সুসংবদ্ধ গড়ে তোলার জন্য এই আচার গড়ে তুলেছে। বিবাহ প্রথা অব্যাহত রাখা এবং বৈবাহিক জীবনে দম্পতির মধ্যে সদ্ভাব বজায় রাখার জন্য সামাজিক আনুকূল্য দরকার। সমাজবদ্ধ মানুষ পরস্পরকে এ বিষয়ে সহায়তা করতে পারে। তাছাড়া বিবাহ এবং পরিবার গঠনের ক্ষেত্রে যত সামাজিক নিয়ম কানুন রয়েছে, সেগুলো সময়োপযোগী করে পরিবার সংরক্ষণে সমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

আধুনিক কালে ইউরোপ ও আমেরিকায় বিবাহ বিচ্ছেদের হার মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। আমাদের সমাজের নিম্নবিত্ত ও উচ্চবিত্তদের মধ্যে এই বিবাহ বিচ্ছেদরে হারও বেড়ে চলেছে। এটা পরিবারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শংকার সৃষ্টি করছে। বিবাহ বিচ্ছেদের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার পেছনে যে সকল কারণ বিদ্যমান তার মধ্যে সামাজিক অস্থিরতাই প্রধান। যে সকল কারণে দাম্পত্য কলহ সৃষ্টি হয়, দম্পত্তির মধ্যে বিরোধ ও বিচ্ছেদ ঘটে সমাজের কর্তব্য হচ্ছে সেইসব কারণ অনুসন্ধান করে তা নির্মূলের চেষ্টা করা। পরিবার ব্যবস্থাকে সংরক্ষণের জন্য সমাজবদ্ধ মানুষের মধ্যে সহনশীলতা, সহমর্মিতা এবং সহযোগিতা ও প্রেমের পরিবেশ গড়ে তোলা সমাজের অপরিহার্য কর্তব্য।

রাষ্ট্র কর্তৃক সংরক্ষণ

রাষ্ট্র হচ্ছে একটি কৃত্রিম রাজনৈতিক সংগঠন। রাষ্ট্রের অন্যতম উপাদান হচ্ছে সার্বভৌমত্ব। এই সার্বভৌমত্ব ক্ষমতা বলে রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করতে পারে এবং আইন ভঙ্গকারীর শাস্তিবিধান করতে পারে। সার্বভৌম ক্ষমতা থাকার কারণে রাষ্ট্র অত্যন্ত শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। এই শক্তি বা ক্ষমতা প্রয়োগ করে রাষ্ট্র জনস্বার্থে সকল কর্ম সম্পাদন করতে পারে।

পরিবার ব্যবস্থা সংরক্ষণে রাষ্ট্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । পরিবার গঠনের পূর্বশর্ত বিবাহ। বিবাহ ব্যবস্থাকে দীর্ঘস্থায়ী ও গতিশীল করার জন্য রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করে তা কার্যকর করতে পারে। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে নারীপুরুষের সম্মতি, বিবাহিত জীবনে সম অধিকার, বিবাহ বিচ্ছেদের বিষয়ে সম অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করে নারী পুরুষের অধিকার সংরক্ষণ করতে পারে। বিবাহিত জীবনে, পারিবারিক জীবনে অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে এমন আচরণের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করে রাষ্ট্র পরিবারকে সংরক্ষণ করতে পারে।

www.pathagar.com

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, পরিবার নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠানটি সমাজ ও রাষ্ট্রের রক্ষণ লাভের অধিকারী। বিষয়টাকে একটু ভিন্নভাবে বললে বলা যায় যে, সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তব্য হচ্ছে পরিবারকে সংরক্ষণ করা।

এই অনুচ্ছেদ ও আন্তর্জাতিক চুক্তি

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদের মূল বক্তব্য হচ্ছে বিবাহ বিচ্ছেদ এবং পরিবার গঠনের অধিকার। পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং মানবাধিকারসংক্রান্ত ইউরোপীয় কনভেনশনে এ সম্পর্কে বিধান রয়েছে। নিম্নে তা পরিবেশিত হল।

পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে আন্তর্জাতিক চুক্তি

অনুচ্ছেদ : ২৩

(১) পরিবার সমাজের স্বাভাবিক ও মৌলিক গোষ্ঠী একক এবং তা সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক সংরক্ষণ লাভের অধিকারী ।

(২) বিবাহযোগ্য বয়সের পুরুষ ও নারীর বিবাহ করার অধিকার এবং পরিবার প্রতিষ্ঠা করার অধিকার স্বীকার করতে হবে।

(৩) বিবাহ-ইচ্ছুক পুরুষ ও নারীর অবাধ ও পূর্ণ সম্মতি ব্যতিরেকে কাকেও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা যাবে না।

(৪) বর্তমান চুক্তি, পক্ষ রাষ্ট্রসমূহ বিবাহ সম্পর্কে, বিবাহিত অবস্থায় এবং বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রীর সমান অধিকার ও দায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। যদি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে তবে সন্তানাদির (যদি সন্তান থাকে) জন্য প্রয়োজনীয় সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

মানবাধিকার সংক্রান্ত ইউরোপীয় কনভেনশন

অনুচ্ছেদ : ১২

বিবাহযোগ্য বয়সের নারী পুরুষদের বিবাহ করার এবং পরিবার প্রতিষ্ঠা করার অধিকার আছে এবং এই অধিকার নিয়ন্ত্রণকারী জাতীয় আইনানুসারে তা ব্যবহার করতে হবে।

এই অনুচ্ছেদ ও ইসলাম

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদের মূল বক্তব্য হচ্ছে বিবাহ ও পরিবার গঠনের অধিকার। ইসলাম বিবাহ ও পরিবার গঠনের অধিকার প্রদান করেছে সকল প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও নারীকে। ইসলামে বিবাহে নারীপুরুষের সম্মতির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলামি

www.pathagar.com

আইন অনুসারে সুস্থ মস্তিষ্ক ও বালেগ বালেগা কোন মুসলমানের বিবাহ তার সম্মতি ব্যতীত সম্পন্ন করা হলে তা বাতিল হবে।

সম্মতি হচ্ছে বিবাহবন্ধনের তৃতীয় শর্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে যথাক্রমে পাত্রপাত্রীর সুস্থ মস্তিষ্ক ও পরিণত বয়স্ক হওয়া। সম্মতির বিষয়টি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে ইচ্ছুক পুরুষ ও নারীর সম্পর্কিত। উভয়ের সম্মতি ব্যতীত বিবাহ বৈধ নয়। এ সম্পর্কে মহানবী হযরত মুহম্মদের (দঃ) কয়েকটি বাণী এখানে পেশ করছি।

মহানবী (সাঃ) বলেছেন, "কুমারী নিজে তার সম্মতি প্রকাশ করবে। এবং তার মৌনতাও সম্মতি।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ বলেছেন, বিবাহ দেওয়া হবে না অকুমারী বালেগা নারীকে তার বিনা পরামর্শে এবং কুমারী বালেগা বালিকাকে তার বিনা সম্মতিতে। সাহাবীরা বললেন, হে রাসুলুল্লাহ, কিরূপ হবে সম্মতি তার? তিনি বললেন, চুপ থাকাও।

ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ বলেছেন, অকুমারী বালেগা নারী বেশি হক রাখে নিজের সম্বন্ধে তার অভিভাবক অপেক্ষা, আর কুমারী বালেগা বালিকার সম্মতি নিতে হবে এবং মৌনতাও হবে তাঁর সম্মতি।"

"খানসা বিনতে খিযাম বর্ণনা করেছেন, তার পিতা বিবাহ দিলেন তার অনুমতি না নিয়েই, যদিও তিনি ছিলেন অকুমারী বালেগা। অতঃপর তিনি তা অপছন্দ করলেন এবং রাসুলুল্লাহর নিকট আসলেন। এবং তার অপছন্দের কথা বললেন। তখন রাসুলুল্লাহ বাতিল করে দিলেন তার পিতার দেওয়া বিবাহ।"

উপরোক্ত হাদিসসমূহ থেকে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, বালেগা নারী কুমারী হোক বা অকুমারী হোক বিবাহের ব্যাপারে তার সম্মতি আবশ্যক।

সম্মতি প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন উভয় প্রকার হতে পারে। কুমারীর নিঃশব্দে হাসা, সশব্দে হাসা অথবা চুপ থাকা, বা নিঃশব্দে ক্রন্দন করা প্রচ্ছন্ন সম্মতি বলে গণ্য হবে। কিন্তু হাসির দ্বারা কৌতুক বা পরিহাস প্রকাশ পেলে অথবা নিরবতায় দুঃখ ও ক্ষোভ বোঝা গেলে প্রচ্ছন্ন সম্মতি বলে বিবেচিত হবে না।

বিবাহের সম্মতি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও বলপ্রয়োগহীন হওয়া অত্যাবশ্যক। কোন বিবাহে বলপ্রয়োগ বা প্রতারণামূলকভাবে সম্মতি গ্রহণ করা হলে স্বীকার করে না নেওয়া পর্যন্ত বিবাহটি অবৈধ হবে।

বস্তুত ইসলাম বিবাহের ব্যাপারে প্রাপ্তবয়স্ক নারীপুরুষের অবাধ সম্মতির উপর গুরুত্বারোপ করেছে। কোন পক্ষের বিশেষ করে নারীর সম্মতি ব্যতীত বিবাহ সম্পাদিত হলেও সেই বিবাহকে ইসলাম বৈধ বিবাহ হিসাবে স্বীকৃতি দেয় না। ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ হচ্ছে একটি পবিত্র বন্ধন। এবং এই পবিত্র বন্ধনের ভিত্তিতে পরিবার গঠনের দায়িত্ব প্রতিটি নর ও নারীর।

www.pathagar.com

বিবাহবিচ্ছেদসংক্রান্ত ইসলামি আইন

তালাক হচ্ছে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর উপায়। ইহা তিন প্রকারের হতে পারে। যথা —(১) স্বামী কর্তৃক (২) স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের সম্মতিক্রমে এবং (৩) স্বামী বা স্ত্রীর আবেদনক্রমে আদালতের মারফত।

বিবাহের পূর্বে বা পরে সম্পাদিত কোনও চুক্তিতে সুস্পষ্টরূপে ক্ষমতা না দেওয়া থাকলে স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিতে পারেন না। তবে কতিপয় ক্ষেত্রে তিনি আদালতের মারফত স্বামীকে তালাক দিতে পারেন।

তবে স্বামী বা স্ত্রী যার পক্ষ হতেই তালাক দেওয়া হোক না কেন, তাকে অবশ্যই ১৯৬১ সালের পরিবার আইন অধ্যাদেশের বিধান অনুসারে অগ্রসর হতে হবে। এই আইনে বলা হয়েছে যে, যে কোন আকারে তালাক ঘোষণার পর, যথাশীঘ্র সম্ভব বিষয়টি লিখিতভাবে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানকে জানাতে হবে এবং চেয়ারম্যানকে প্রদত্ত লিখিত নোটিশের একখানি নকল অপর পক্ষকে (স্বামী বা স্ত্রী) দিতে হবে। এই নোটিশ দেওয়ার বিধান অমান্য করলে এক বৎসর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় প্রকারের শাস্তি হবে। তালাক যে পক্ষই দিয়ে থাকুক না কেন, যেদিন চেয়ারম্যানকে নোটিশ দেওয়া হবে সেদিন হতে নব্বই দিন অতিবাহিত না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তালাক বলবৎ হবে না। তবে স্বামী তালাক দিয়ে থাকলে এবং তালাকের সময় স্ত্রী গর্ভবতী থাকলে নব্বই দিন এবং সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত, এই দু'টির মধ্যে যে মেয়াদটি দীর্ঘতর, সেই মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর তালাক বলবৎ হবে।

নোটিশ পাওয়ার দিন হতে তিরিশ দিন সময়ের মধ্যে চেয়ারম্যান একটি সালিস পরিষদ গঠন করবেন। চেয়ারম্যান একজন স্বামীর প্রতিনিধি এবং একজন স্ত্রীর প্রতিনিধি এই তিনজনকে নিয়ে সালিস পরিষদ গঠিত হবে। এই পরিষদ স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ মিটিয়ে তাদেরকে তালাক হতে বিরত থাকতে রাজি করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

পরিবার আইন অধ্যাদেশের এই বিধানটি পবিত্র কোরআনের সূরা নেসার ৩৫ নম্বর আয়াতের নির্দেশ অনুসারে প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আয়াতে "যদি তোমরা দুইজনের (স্বামী-স্ত্রী) মধ্যে বিচ্ছেদের আশংকো কর তাহলে স্বামীর পক্ষ হতে একজন বিচারক এবং স্ত্রীর পক্ষ হতে একজন বিচারক নিয়োগ কর ; তারা উভয়ে যদি সমঝোতা কামনা করে, তাহলে আল্লাহ তাদের পুনর্মিলন ঘটাবেন, কারণ আল্লাহ সবই জানেন এবং সবকিছু সম্পর্কে সজাগ।"

পূর্ববর্তী আয়াতে বিচ্ছেদ এড়ানোর পন্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, ভাঙ্গনের আশংকা সৃষ্টি হলে প্রথমে স্ত্রীকে তিরস্কার করবে। ইহাতে ফলোদয় না হলে তার জন্য পৃথক শয়নের ব্যবস্থা করবে। কিন্তু তাতেও যদি কাজ না হয় তাহলে তাকে প্রহার করবে। অতঃপর স্ত্রী যদি অনুগত হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে আর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু প্রহারের পরও যদি স্বামীর অনুগত না হয়, তাহলে ৩৫ নম্বর আয়াতের বিধান অনুসারে বিচারক নিয়োগ করতে হবে।

www.pathagar.com

স্বামী কর্তৃক তালাক

যে-কোন সাবালক ও সুস্থমনা মুসলিম স্বামী কোন কারণ না দর্শিয়ে যে কোন সময় তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারেন।

ভবিষ্যতে কোন ঘটনা ঘটার বা না ঘটার শর্তেও তালাক দেওয়া যেতে পারে। কেউ যদি তার স্ত্রীকে এই মর্মে চিঠি লিখেন যে, এক মাসের মধ্যে তিনি তাকে টাকা পাঠাবেন, কিন্তু টাকা যদি না পাঠান তাহলে চিঠিখানি তালাকনামা বলে গণ্য হবে ; এবং এক মাসের মধ্যে তিনি যদি সত্য সত্যই টাকা না পাঠান, তাহলে তালাক হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। এরূপ তালাককে শর্তাধীন তালাক বলা হয়ে থাকে।

তালাক মৌখিকও হতে পারে, অথবা লিখিতও হতে পারে। এর জন্য কোন সুনির্দিষ্ট আকার বা মুসাবিদার প্রয়োজন নেই। মুখের কথা হতে অথবা লিখিত তালাকনামা হতে যদি কে কাকে তালাক দিচ্ছে, তা সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারা যায়, তাহলে যথেষ্ট হবে। এমনকি স্ত্রীর উপস্থিতিতে তালাক দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। তালাকের সংবাদ তার নিকট পৌঁছিয়ে দিলেই চলে।

মৌখিক অথবা লিখিত যে প্রকারই হোক না কেন তালাকের ভাষা যদি সহজবোধ্য না হয়ে দুই প্রকারের অর্থবোধক হয় এবং বক্তা বা লেখকের উদ্দেশ্য যদি সহজে বোধগম্য না হয়, তাহলে তালাক বলবৎ হবে না।

তালাক সাধারণত তিন প্রকারের হয়ে থাকে—তালাকে আহসান, তালাকে হাসান, এবং তালাকে বিদাত।

তালাকে আহসান

এই প্রকার তালাকে তুহরের সময়, অর্থাৎ স্ত্রীর দুইটি মাসিক রক্তস্রাবের মধ্যবর্তী সময়ে একবার মাত্র তালাক ঘোষণা করে পরবর্তী তিনটি মাসিক রক্তস্রাবের শেষ সময় পর্যন্ত যৌনসঙ্গম হতে বিরত থাকতে হয়। স্ত্রীর সাথে আদৌ যৌনসঙ্গম না থাকলে স্ত্রীর মাসিক রক্তস্রাবের সময়ও এই প্রকারের তালাক ঘোষণা করা যায়।

তালাকে হাসান

এই প্রকার তালাকে পর পর তিনটি তুহরে তিনবার তালাক দিতে হয়। এবং প্রথম তালাক উচ্চারণ করার পর হতে তৃতীয় তালাক উচ্চারণ করার সময় পর্যন্ত যৌনসঙ্গম হতে বিরত থাকতে হয়। প্রথম তালাক যে তুহরে ঘোষণা করা হবে, দ্বিতীয় তালাক ঠিক তার পরবর্তী তুহরে ঘোষণা করতে হবে। মধ্যবর্তী সময়ে কোন তুহর বাদ দেওয়া যাবে না, এবং প্রথম হতে তৃতীয় তালাক পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যৌনসঙ্গম করা যাবে না।

তালাকে বিদাত

একে তালাকে বিদাই নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। ইহা দুই প্রকারে সম্পন্ন হতে পারে। এক তুহরে একটিমাত্র বাক্যে তিনবার তালাক ঘোষণা করা যেতে পারে, যেমন—"আমি তোমাকে

www.pathagar.com

তিন তলাক দিলাম", অথবা এক তুহরের মধ্যে তিনটি পৃথক বাক্যে তালাক ঘোষণা করা যেতে পারে, যেমন "আমি তোমাকে তালাক দিলাম, আমি তোমাকে তালাক, আমি তোমাকে তালাক দিলাম।" অথবা

(২) তালাক কোনক্রমেই প্রত্যাহার করা হবে না, এই ইচ্ছা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করে এক তুহরে একটি মাত্র বাক্যে তালাক ঘোষণা করা যেতে পারে, যেমন—"আমি তোমাকে তালাকে বায়েন দিলাম।" "বায়েন" শব্দটির অর্থ হচ্ছে প্রত্যাহারের অযোগ্য।

তালাক কখন বলবৎ হবে

সুন্নি আইনে কেবল তালাকে আহসান ও তালাকে হাসানকেই সহিহ বলে গণ্য করা হয়। কারণ, এই দুই প্রকার তালাক তিনটি তুহর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত চূড়ান্ত হয় না বলে স্বামী তার সিদ্ধান্ত পুনরায় বিবেচনা করে দেখার সুযোগ পান। এইরূপ বিবেচনার পর তিনি যদি ভাল মনে করেন, তাহলে প্রত্যক্ষভাবে (ঘোষণা করে), অথবা পরোক্ষভাবে (যেমন, যৌনসঙ্গম করে) তিন তালাক প্রত্যাহার করতে পারেন।

কিন্তু বিদাত তালাক সঙ্গে সঙ্গে চূড়ান্ত হয়ে যায় বলে স্বামীর আর পুনর্বিবেচনার অবকাশ থাকে না। এই কারণে সুন্নী আইনে এই প্রকারের তালাককে ফাসিদ তালাক বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয় হিজরিতে উমাইয়া বংশের শাসনের আমলে তালাকের বিদাত সর্বপ্রথম প্রবর্তিত হয়। কিন্তু ফাসিদ হলেও এ প্রকারের তালাকই এই উপমহাদেশে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত।

১৯৬১ সালের পরিবার আইন অধ্যাদেশ চালু হওয়ার পর, বাংলাদেশে তালাকে আহসান বা তালাকে হাসানের সাথে তালাকে বিদাতের আর বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। কারণ, এই অধ্যাদেশ অনুসারে তালাক যে প্রকারেই ঘোষণা করা হোক না কেন, তা সাথে সাথে বলবৎ হবে না। তালাক ঘোষণা করা হয়েছে বলে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানকে যেদিন নোটিশ দেওয়া হবে, সেদিন হতে নব্বই দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তালাক বলবৎ হবে।

তালাকের ক্ষমতা হস্তান্তর

তালাক দেওয়ার ক্ষমতা মূলত স্বামীর হলেও তিনি উহা স্ত্রীর নিকট অথবা অপর কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করতে পারেন। এরূপ হস্তান্তর শর্তবিহীনও হতে পারে অথবা শর্তাধীনও হতে পারে। আবার কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যও হতে পারে, অথবা চিরদিনের জন্যও হতে পারে। সাময়িকভাবে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রত্যাহার করা যেতে পারে না ; কিন্তু স্থায়ীভাবে ক্ষমতা দেওয়া হলে উহা প্রত্যাহার করা যেতে পারে। যে প্রকার ক্ষমতাই দেওয়া হোক না কেন এটা সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য হতে হবে। দেওয়া হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যাবে না, বা অনুমান করা চলবে না। এইভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি উহা যথানিয়মে প্রয়োগ করতে পারেন। এইভাবে অপরকে তালাকের ক্ষমতা

www.pathagar.com

দেওয়াকে 'তাফভিজ' বলা হয় এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত তালাককে "তালাকে তাফভীজ" বলা হয়।

স্ত্রীকে শর্তাধীন ক্ষমতা প্রদান

বিবাহের পূর্বে বা পরে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যদি এইরূপ কোন চুক্তি সম্পাদিত হয় যে, কোন একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে স্ত্রী নিজেকে তালাক দিতে পারবেন, তাহলে ইহা সম্পূর্ণরূপে বৈধ চুক্তি বলে গণ্য হবে। তবে আরোপিত শর্ত অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত এবং মুসলিম আইন ও রীতিনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। এভাবে ক্ষমতা দেওয়া হয়ে থাকেল এবং চুক্তিতে বর্ণিত নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে স্ত্রী নিজেকে তালাক দিতে পারবেন। এই প্রকার তালাক স্বামীই দিচ্ছেন বলে ধরে নেওয়া হবে। চুক্তিতে যদি এরূপ শর্ত থাকে যে, স্বামী দ্বিতীয় বার বিবাহ করলে স্ত্রী নিজেকে তালাক দিতে পারবেন, এবং পরে যদি স্বামী সত্যসত্যই দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন, তাহলে এই দ্বিতীয় বিবাহের পর যে কোন সময় স্ত্রী নিজেকে তালাক দিতে পারেন। এই বিধান অনুসারে স্ত্রীকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়, তা আর প্রত্যাহার করা যেতে পারে না, এবং নির্দিষ্ট পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পর যে কোন সময়, এমনকি স্বামী দাম্পত্য অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য মামলা দায়ের করার পর স্ত্রী উহা প্রয়োগ করতে পারেন।

বাধ্যতামূলক তালাক

কোন স্বামী যদি বলপ্রয়োগের ফলে বাধ্য হয়ে অথবা স্বেচ্ছায় মাদক দ্রব্য গ্রহণ করে মাতাল অবস্থায় অথবা পিতা বা অপর কাকেও খুশি করার জন্য স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাহলে তালাকের ভাষা যদি সুস্পষ্ট হয়, এবং উদ্দেশ্য যদি সহজে বোধগম্য হয়, তাহলে তালাক সম্পূর্ণ বৈধ হবে। অনুরূপভাবে হাসি-ঠাট্টাভাবে তালাক দেওয়া হলে তাও বৈধ হবে।

ইলা তালাক

ইলা হচ্ছে একটি বিশেষ ধরনের তালাক। স্বামী বা স্ত্রী কোন কারণে কসম করে কসমের পর হতে পর পর চারমাসকাল যৌনসঙ্গম হতে বিরত থাকলে এই তালাকের কারণ সৃষ্টি হয়। অবশ্য কসম ও উহার পর চারমাস কাল যৌনসঙ্গম হতে বিরত থাকলেই তালাক হয়ে যায় না, ইহার ফলে স্ত্রী আদালতের মারফত তালাক পাওয়ার অধিকার লাভ করেন মাত্র।

জিহার তালাক

কোন স্বামী তার স্ত্রীকে নিজের মাতা বা অপর কোনও মুহাররামা নারীর সাথে তুলনা করলে এইজন্য অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্ত না করা পর্যন্ত স্ত্রী তার সাথে বসবাস করতে বা যৌনসঙ্গম করতে

www.pathagar.com

অস্বীকার করতে পারেন। স্বামী অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্ত না করলে স্ত্রী আদালতের মারফত বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার লাভ করবেন।

জিহার একটি অতিশয় প্রাচীন প্রথা। কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে আরবদের মধ্যে ইহা প্রচলিত ছিল। কোন স্বামী, স্ত্রী হতে বিচ্ছিন্ন হতে চাইলে তিনি তাকে মা বলে ডাকতেন, অথবা মায়ের সাথে তুলনা করতেন। অতঃপর বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত, কিন্তু স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ করতে পারতেন না। রাসূলুল্লাহ নবুয়ত লাভের পরও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। সেই সময় একবার আউস-বিন-সামিত নামক এক ব্যক্তি তার স্ত্রী খাওলাকে এই প্রথায় তালায় দেয়। খাওলা রাসূলুল্লাহর নিকট হাজির হয়ে এই অনাচারের প্রতিকার দাবি করেন। কিন্তু রাসুল এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে খাওলা আল্লাহর নিকট কান্নাকাটি করতে থাকেন। অতঃপর এই বিষয়টি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর নিকট অহি নযিল হয়। আল কুরআনের সুরা মুজাদিলায় এই অহি লিপিবদ্ধ আছে। "মুজাদিলা" শব্দের অর্থ হচ্ছে আবেদনকারী বা ফরিয়াদি। এ শব্দটি দ্বারা খাওলাকেই বুঝান হচ্ছে।

সুরা মুজাদিলায় জিহার প্রথায় স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার কঠোর নিন্দা করে আল্লাহ তায়ালা এইরূপ স্ত্রীর সাথে পুনর্মিলনের উপায় বলে দিয়েছেন। সুরার প্রথমে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কোন স্বামী যদি তার স্ত্রীকে মাতা সম্বোধন করে পৃথক করে দিয়ে থাকে তাহলে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাকে একটি গোলাম আজাদ করতে হবে, অথবা উহার সঙ্গতি না থাকেল পর পর দুইমাস রোজা রাখতে হবে। রোজা রাখতে সক্ষম না হলে ষাটজন দরিদ্র লোককে খাওয়াতে হবে। একমাত্র এই তিনটির যে কোন একটির উপায়ে প্রায়শ্চিত্ত করার পরই স্বামী পুনরায় তার স্ত্রীকে স্পর্শ করতে পারবেন।

যৌথ তালাক

স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে একমত হয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারেন এবং এইরূপ বিচ্ছেদকে যৌথ তালাক বলা যেতে পারে। যৌথ তালাক দুই প্রকারের হতে পারে— যেমন, খুলা ও মুবারাত।

(১) **খুলা**—যেক্ষেত্রে স্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে স্বামী রাজি হন এবং অতঃপর উভয়ে আপোষে বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পাদন করেন, তাকে খুলা বলা হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে অবশ্যই খেসারত দিতে হবে। কোন প্রকার এবং কি প্রকার খেসারত দিতে হবে, তা উভয় পক্ষের মধ্যে আপোষে স্থির হতে পারে। এ সম্পর্কে কোন বাধাধরা নিয়ম নেই। একমাত্র শর্ত হচ্ছে এই যে, খেসারত অবশ্যই দিতে হবে। স্ত্রী স্বামীকে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা বা অন্য কোন সম্পদ দিতে পারেন, অথবা তার দেনমোহরের দাবি ছেড়ে দিতে পারেন। এমনকি স্ত্রী যদি স্বামীকে মাত্র একটি টাকা প্রদান করেন এবং স্বামী যদি উহা গ্রহণ করেন, তা হলেও খেসারত দেওয়ার শর্ত পালন করা হবে।

(২) **মুবারাত**—খুলা ও মুবারাতের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে এই যে, খুলার ক্ষেত্রে স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদের প্রস্তাব করে থাকেন, কিন্তু মুবারাতের সময় স্ত্রী বা স্বামী যে কোন একজন প্রস্তাব

www.pathagar.com

করতে পারেন। মুবারাত জাতীয় যৌথ তালাকের ক্ষেত্রেও খেসারত দেওয়ার নিয়ম আছে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটি অতিরিক্ত নিয়ম এই যে, যিনি বিবাহ্ বিচ্ছেদের প্রস্তাব করবেন তিনি খেসারত দিবেন। ফলে খুলার ক্ষেত্রে স্ত্রী খেসারত প্রদান করে থাকেন। কিন্তু মুবারাতের ক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রী যে কোন একজন খেসারত দিতে পারেন। খুলা তালাকে স্ত্রীর গরজ অধিক থাকে এবং মুবারাত তালাকে উভয় পক্ষের সমান গরজ থাকে।

তালাকের ন্যায় খুলা ও মুবারাত নিয়মে বিবাহ্ বিচ্ছেদের পরও স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করতে হবে।

স্বামীর ধর্মত্যাগ—কোন মুসলিম স্বামী ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করলে মুসলিম স্ত্রীর সাথে তার বিবাহ্ বাতিল হয়ে যাবে । কিন্তু অপর কোন ধর্মাবলম্বী স্বামী যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, তাহলে তার বিবাহ্ সঙ্গে সঙ্গে বাতিল হয়ে যাবে না। প্রথমে তাকে স্ত্রীর নিকট ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাব করতে হবে। স্ত্রী যদি ইসলাম গ্রহণ করতে রাজী না হন কেবল তখন বিবাহ্ বাতিল করা যাবে।

স্ত্রীর ধর্মত্যাগ—কোন মুসলিম স্ত্রী ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করলে, মুসলিম স্বামীর সাথে তার বিবাহ্ বাতিল হবে না। ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করার পর বিবাহ্ বাতিল করার জন্য স্ত্রীকে মামলা দায়ের করতে হবে। অনুরূপভাবে কোন হিন্দু বা অন্য কোনও ধর্মাবলম্বী স্ত্রী যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, তাহলে তার বিবাহ্ সঙ্গে সঙ্গে বাতিল হয়ে যাবে না। প্রথমে তাকে তার স্বামীর নিকট ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রস্তাব করতে হবে। স্বামী যদি রাজি না হন, কেবল তখনই বিবাহ্ বাতিল করা যাবে।

ভবিষ্যৎ বিচ্ছেদ

স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যদি এরূপ কোন চুক্তি সম্পাদিত হয় যে, ভবিষ্যতে তাদের মধ্যে মতবিরোধ হলে তারা বিবাহ্ বিচ্ছেদ করবেন, তাহলে ইহা সম্পূর্ণরূপে বৈধচুক্তি বলে গণ্য হবে।

স্ত্রী কর্তৃক বিবাহ্ বিচ্ছেদ

মুসলিম আইন অনুসারে বিবাহিতা যে কোন স্ত্রী নিম্নলিখিত দশটি কারণে যে কোনও একটির ভিত্তিতে আদালতের মারফত বিবাহ্ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, স্বামী আদালতের আশ্রয় নিয়ে সরাসরি তালাক দিয়ে বিবাহ্-বিচ্ছেদ করতে পারেন। কিন্তু স্ত্রীর এইরূপ কোন ক্ষমতা নেই। বিবাহ্ বিচ্ছেদ করতে স্ত্রীকে নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক কারণের ভিত্তিতে নিয়মিতভাবে মামলা দায়ের করতে পারেন। যে সকল কারণে স্ত্রী বিবাহ্-বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করতে পারেন, তা নিম্নরূপ ঃ

১. নিখোঁজ স্বামী :

কোন স্বামীর গতিবিধি চার বৎসরকাল অজ্ঞাত থাকলে বিবাহ্-বিচ্ছেদ দাবি করতে পারেন। এই কারণে যে মামলা দায়ের করা হবে, তার আরজিতে মুসলিম আইন মোতাবেক স্বামীর

www.pathagar.com

ওয়ারিশানের নাম ও ঠিকানা দিতে হবে, এবং তাদের উপর মামলার নোটিশ জারি করতে হবে। মামলার শুনানির সময় এরূপ ওয়ারিশানে, তাদের বক্তব্য পেশ করার অধিকার থাকবে। আরজি দাখিলের তারিখে স্বামীর মৃত্যু হয়েছে বলে ধরে নিয়ে মুসলিম আইন অনুসারে তার ওয়ারিশান কারা তা স্থির করে নিতে হবে।

স্বামীর কোন চাচা বা ভ্রাতা থাকলে তারা ওয়ারিশ হউন বা না হউন, মামলায় তাদেরকে অবশ্যই পক্ষ করতে হবে।

এ মামলায় আদালত ডিক্রি প্রদান করলেও ডিক্রির তারিখ হতে ছয়মাসের মধ্যে উহা কার্যকরী বা বলবৎ হবে না। এ ছয় মাসের মধ্যে স্বামী যদি ব্যক্তিগতভাবে অথবা ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিনিধির মারফত হাজির হয়ে এ মর্মে আদালতের আস্থা সৃষ্টি করতে পারেন যে, তিনি স্বামী হিসাবে তার দায়িত্ব পালন করতে প্রস্তুত আছেন, তাহলে আদালতকে অবশ্যই ডিক্রি বাতিল করে দিতে হবে।

(২) ভরণপোষণে ব্যর্থতা :

স্বামী দুই বৎসর কাল স্ত্রীর ভরনপোষণ না করলে, অথবা করতে অবহেলা করলে স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদ দাবি করতে পারেন।

তবে কোন প্রকার যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত স্ত্রী যদি স্বামীর সাথে বসবাস বা যৌনসঙ্গম না করেন, তাহলে স্বামী তার ভরনপোষণ দিতে বাধ্য নহেন। কিন্তু স্বামী তলবি মোহরানা পরিশোধ করেন নাই বলে স্ত্রী যদি তার সাথে বসবাস বা যৌনসঙ্গম না করেন, তাহলে স্বামী তার ভরনপোষণ দিতে অস্বীকার করতে পারেন না।

ভরণপোষণ বলতে খাদ্য, পোশাক ও বাসস্থান বুঝায়। তবে ইহা স্বামীর সামাজিক মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। স্ত্রী ধনী এবং তার যথেষ্ট আর্থিক সঙ্গতি আছে বলে স্বামী তার ভরণপোষণ দিতে অস্বীকার করতে পারেন না। স্ত্রী ধনী বা দরিদ্র যাই হোক না কেন, স্বামী তার নিজের সামাজিক মর্যাদা অনুসারে তার ভরণপোষণ করতে বাধ্য।

পুনরায় বিবাহ

মুসলিম পরিবার আইন অধ্যাদেশের বিধান লংঘন করে স্বামী পুনরায় বিবাহ করলে স্ত্রী তালাক দাবি করতে পারেন। মুসলিম পরিবার আইন অধ্যাদেশের বিধানের জন্য "বিবাহ" অধ্যায়ে "বহুবিবাহ" শিরোনামা দ্রষ্টব্য।

(৪) স্বামীর কারাদণ্ড :

কোন অপরাধের জন্য স্বামীর সাত বৎসর বা ততোধিক সময়ের জন্য কারাদণ্ড হয়ে থাকলে স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য মামলা দায়ের করতে পারেন। কিন্তু কারাদণ্ডের আদেশ চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত আদালত স্ত্রীর মামলায় ডিক্রি প্রদান করবেন না।

www.pathagar.com

(৫) স্বামীর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা :

যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত স্বামী তিন বৎসরকাল বৈবাহিক দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হলে স্ত্রী বিবাহ-বিচ্ছেদ দাবি করতে পারেন। স্বামীর দায়িত্ব বা বৈবাহিক দায়িত্ব বলতে প্রধানত যৌনসঙ্গমের দায়িত্ব বুঝায়।

(৬) নপুংশক স্বামী :

বিবাহের সময় নপুংশক স্বামী, অর্থাৎ সন্তান জন্মদানে অক্ষম থাকলে এবং পরবর্তীকালে উক্ত অবস্থা অব্যাহত থাকলে স্ত্রী বিবাহ-বিচ্ছেদের দাবি করলে, মামলা দায়ের করতে পারেন। মামলা দায়ের হওয়ার পর স্বামী যদি আবেদন করেন, তাহলে তিনি যে অক্ষমতা মুক্ত হয়ে সন্তান উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জন করেছেন, তা প্রমাণ করার জন্য আদালত তাকে এক বৎসর সময় দিবেন। এই এক বৎসরের মধ্যে স্বামী যদি সত্যসত্যই প্রমাণ করতে পারেন যে, তার অক্ষমতা রহিত হয়েছে এবং তিনি সক্ষমতা অর্জন করেছেন, তাহলে স্ত্রীর মামলা খারিজ হয়ে যাবে।

এই বিধান অনুসারে মামলা দায়ের করে স্ত্রীকে প্রমাণ করতে হয় না যে, তার স্বামী যে নপুংশক, তা তিনি বিবাহের সময় জানতেন না। ইহা ব্যতীত আদালত কর্তৃক প্রদত্ত এক বৎসর সময় অতিবাহিত হওয়ার পর স্ত্রীকে প্রমাণ করতে হয় না যে, তার স্বামী এখনও নপুংশক রয়েছেন। স্বামীকেই প্রমাণ করতে হবে যে, তিনি অক্ষমতা হতে মুক্ত হয়ে সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা অর্জন করেছেন। এই ক্ষমতা অবশ্য তার স্ত্রী প্রসঙ্গে হতে হবে।

(৭) উন্মাদ স্বামী :

স্বামী দুইবৎসর যাবৎ উন্মাদ থাকলে অথবা কুষ্ঠরোগ বা কোন সংক্রামক যৌন রোগে আক্রান্ত হলে স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদের দাবি করতে পারেন।

(৮) বিবাহ প্রত্যাখান :

স্ত্রীর বয়স ষোল বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বিবাহ হয়ে থাকলে, এবং আঠার বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই বিবাহ প্রত্যাখান করে থাকলে, এই কারণে তিনি বিবাহ বিচ্ছেদের দাবি জানাতে পারেন। বিস্তারিত আলোচনার জন্য "বিবাহ" অধ্যায়ের "বিবাহ প্রত্যাখান" শিরোনামা দ্রষ্টব্য।

(৯) স্বামীর নিষ্ঠুরতা :

স্বামী স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করলে, অর্থাৎ নিম্নে বর্ণিত কার্যগুলির যে কোন একটি করলে স্ত্রী দাবি করে মামলা দায়ের করতে পারেন :

(ক) স্বামী প্রতিনিয়ত মারধর করেন, অথবা এমন নিষ্ঠুর আচরণ করেন, যা দৈহিক নির্যাতন না হলেও স্ত্রীর জীবন দুঃখময় ও অসহ্য করে তোলে ;

www.pathagar.com

(খ) স্বামী দুশ্চরিত্র নারীদের সাথে মেলামেশা করেন, অথবা কুখ্যাত জীবন যাপন করেন, অথবা

(গ) স্ত্রীকে নৈতিকতা বিরোধী জীবন যাপন করতে চেষ্টা বা বাধ্য করেন; অথবা

(ঘ) স্ত্রীর সম্পত্তির অপচয় করেন, অথবা স্ত্রীকে তার সম্পত্তির উপর আইনগত অধিকার প্রয়োগ করতে বাধাদান করেন; অথবা

(ঙ) স্ত্রীকে তার ধর্মপালন করতে বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান করতে বাধাপ্রদান করেন; অথবা

(চ) একাধিক স্ত্রী থাকলে কুরআনের নির্দেশ অনুসারে তাকে (মামলার বাদিনীকে) অন্যান্য স্ত্রীদের সাথে সমান ব্যবহার করেন না।

(১০) **অন্যান্য কারণ :**

মুসলিম আইনে বৈধ বলে স্বীকৃত এরূপ অন্য কোন কারণেও স্ত্রী বিবাহ্ বিচ্ছেদের দাবি করে মামলা করতে পারেন। মেজাজের পার্থক্য বা স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ঘৃণা বৈধ কারণ বলে পরিগণিত হয় না। ইলা, জিহার, তাফভীজ প্রভৃতি এই "অন্যান্য কারণ" শিরোনামার অন্তর্ভুক্ত। অতএব এই তিন প্রকারের বিবাহ্ বিচ্ছেদ করতে হলে স্ত্রীকে অবশ্যই তা আদালত মারফত করতে হবে। লিয়ান অর্থাৎ স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগের ক্ষেত্রেও বিবাহ্ বিচ্ছেদের জন্য স্ত্রীকে আদালতে শরণাপন্ন হতে হবে। স্বামীর অভিযোগ যদি সত্য হয়, তাহলে স্ত্রীর বিবাহ্-বিচ্ছেদের দাবি গ্রাহ্য হবে না, কিন্তু অভিযোগ মিথ্যা হলে আদালত বিবাহ্ বিচ্ছেদের আদেশ দিতে পারেন। স্ত্রী মামলা দায়ের করার পর স্বামী যদি তার অভিযোগ প্রত্যাহার করেন, এবং আদালত যদি বুঝতে পারেন যে, সঙ্গত ভিত্তিতে অভিযোগ করা হলেও স্বামী উক্ত ভিত্তিতে পরে অসত্য বলে জানতে পেরে, আন্তরিকতার সাথে অভিযোগ প্রত্যাহার করেছেন, তাহলে স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন মঞ্জুর হবে না। স্ত্রী যদি ইহুদি বা খ্রিষ্টান হয়, তাহলে স্বামী ব্যভিচারের অভিযোগ করেছেন বলে তিনি বিবাহ্ বিচ্ছেদ দাবি করতে পারেন না। বিবাহ্ ফাসিদ হয়ে থাকলে কোনও মুসলিম স্ত্রীও এই কারণে বিবাহ্ বিচ্ছেদ দাবি করে মামলা দায়ের করতে পারবেন না।

বিবাহ্-বিচ্ছেদের ফলাফল

যে কারণে যে আকারেই বিবাহ্-বিচ্ছেদ হয়ে থাকুক না কেন, বিচ্ছেদ বলবৎ হওয়ার নিম্নলিখিত ফলাফল দেখা দিবে :

বিবাহের অধিকার :

যৌন সঙ্গম হয়ে থাকলে ইদ্দতের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর অন্যত্র বিবাহ্ করতে পারেন। কিন্তু যৌন সঙ্গম না হয়ে থাকলে তাকে উদ্দত পালন করতে হয় না বলে তিনি বিবাহ্ বিচ্ছেদ বলবৎ হওয়ার অব্যবহিত পরই বিবাহ্ করতে পারেন।

www.pathagar.com

স্বামীর ক্ষেত্রে যৌন সঙ্গম হয়ে থাকুক বা না থাকুক, বিচ্ছেদের পরই তিনি পুনরায় বিবাহ করতে পারেন। তবে তার যদি একাধিক স্ত্রী থাকে এবং একজনের সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে থাকে, তাহলে তিনি একমাত্র তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর ইদ্দতের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরই পুনরায় বিবাহ করতে পারেন।

মোহরানা পরিশোধ ঃ

বিবাহ বিচ্ছেদের পর মোহরানার টাকা অবিলম্বে পরিশোধ করতে হবে। যৌনসঙ্গম হয়ে থাকলে স্ত্রী মোহরানার সমুদয় টাকা পাবেন। কিন্তু যৌনসঙ্গম না হয়ে থাকলে তিনি অর্ধেক টাকা পাবেন ; এবং মোহরানার পরিমাণ যদি নির্ধারিত না হয়ে থাকে, তাহলে তিনি কেবল তিন প্রস্থ পোশাক পাবেন।

ওয়ারিশী স্বত্ব লোপ ঃ

বিবাহ-বিচ্ছেদ বলবৎ হওয়ার পর স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের সম্পত্তিতে অংশলাভের অধিকার রহিত হয়ে যায়। কিন্তু বিচ্ছেদ যতদিন বলবৎ না হবে, ততদিন এই অধিকার বহাল থাকবে।

যৌন সঙ্গম অবৈধ ঃ

বিবাহ-বিচ্ছেদ বলবৎ হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যৌনসঙ্গম অবৈধ হয়ে যায়। ফলে এইরূপ যৌনসঙ্গম হতে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করলে উহা জারজ সন্তান বলে গণ্য হবে।

পুনর্বিবাহ ঃ

বিবাহ-বিচ্ছেদের পর সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয় পুনরায় পরস্পরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেন। এইরূপ পুনর্বিবাহ ইদ্দতের মধ্যেও হতে পারে বা পরেও হতে পারে।

কিন্তু একই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তিনবার বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার পর তারা যদি পুনরায় পরস্পরকে বিবাহ করতে চান, তাহলে স্ত্রীকে প্রথমে অপর একজন তৃতীয় ব্যক্তিকে বিবাহ করতে হবে। এইরূপ বিবাহ হওয়ার পর এবং প্রকৃতপক্ষে যৌনসঙ্গম হওয়ার পর তৃতীয় ব্যক্তি যদি তালাক দেন, অথবা মারা যান, কেবল তখনই স্ত্রী তার পূর্বতন স্বামীকে পুনরায় অর্থাৎ চতুর্থবার বিবাহ করতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ, পূর্ববর্তী আইনে প্রথমবার বিবাহ-বিচ্ছেদ হওয়ার পর পক্ষদ্বয় পুনরায় পরস্পরকে বিবাহ করতে চাইলে স্ত্রীকে প্রথমে একজন তৃতীয় ব্যক্তিকে বিবাহ করতে হত। ১৯৬১ সালের মুসলিম পরিবার আইন অধ্যাদেশ দ্বারা আইনটি উপরোক্তরূপে সংশোধন করা হয়েছে।

www.pathagar.com

সারসংক্ষেপ

নারী এবং পুরুষ মিলে যে একক, তার মহিমা অপার। যেমন নারী তেমন পুরুষ, একজন অন্যজনের পরিপূরক। এদের মিলনে মানব জীবনের পূর্ণতা। বিবাহের মাধ্যমে এই মিলন অবাধ হয়।

এই মিলনে কোন বাধা থাকা উচিত নয়। উচিত নয় ভেদাভেদ জাতি বা ধর্মের কারণে। প্রত্যেক পুরুষ এবং নারীর অধিকার থাকা উচিত, বিবাহে আবদ্ধ হওয়ার। এটি একটি মহান মানবাধিকার।

নারী পুরুষের মিলনের মধ্যে যে বন্ধন সেটি শৃঙ্খলার জন্য, শৃঙ্খলের জন্য নয়। মিলন যখন শেকল হয়ে পায়ে বাধে তখন সে মিলন ভেঙে যাওয়াই উচিত। এবং সেই ভাঙ্গার অধিকার যেমন পুরুষের তেমন নারীর। এখানেও কোন অসমতা থাকা উচিত নয়। বিবাহের ভিত্তি যেমন নারী পুরুষের অবাধ সম্মতি বিবাহ বিচ্ছেদেরও ভিত্তি তাদের পূর্ণ অভিপ্রায়।

বিবাহের মাধ্যমে নারী পুরুষের বাঞ্ছিত ফল সন্তান। স্বামী-স্ত্রী এবং সন্তান নিয়ে পরিবার। পরিবার গঠন এবং সংরক্ষণের অধিকার মৌলিক।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

(ক) প্রত্যেকেরই একাকী এবং অপরের সহযোগিতায় সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার রয়েছে। (খ) কাউকেই তার সম্পত্তি থেকে খেয়ালখুশিমত বঞ্চিত করা চলবে না।

(Article : 17. (1) Everyone has the right to own property alone as well as in association with others. (2) No one shall be arbitrarily deprived of his property.)

ভাষ্য

আলোচ্য অনুচ্ছেদে ব্যক্তির সম্পত্তির মালিকানার অধিকারের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে কাউকেই খেয়ালখুশিমত তার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা চলবে না। এই বক্তব্য অনুধাবন করতে হলে আমাদেরকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করতে হবে।

ক. সম্পত্তি

খ. মালিকানা

গ. মালিকানা অর্জনের উপায়

গ. সম্পত্তি থেকে কাউকে বঞ্চিত করা

সম্পত্তির সংজ্ঞা

সম্পত্তি শব্দটি কোন বিমূর্ত ধারণা নয়। ইংরেজি property শব্দের আভিধানিক অর্থ সম্পত্তি। property শব্দের অর্থ হচ্ছে, 'আইনসিদ্ধ অধিকারের বিষয়বস্তু' অথবা 'সম্পদের দখল'। property শব্দটি ল্যাটিন proprietas থেকে ফরাসি

www.pathagar.com

Proprite হয়ে ইংরেজিতে এসেছে। যার অর্থ হচ্ছে যথাক্রমে "দ্রব্যের নিজস্ব প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য" এবং স্বত্ব মালিকানা। গ্রিক pro, Prin সংস্কৃত প্রা (pra) ইত্যাদি Property শব্দের সমার্থক। এসবের অর্থ হচ্ছে সম্মুখে, সমীপে, পক্ষে।

অতএব ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, সম্পত্তি শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক ও জটিল। একটিমাত্র সাধারণ শব্দ দিয়ে এর মূল ভাব ব্যক্ত করা অত্যন্ত কঠিন। কারণ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন অর্থে সম্পত্তি শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

ব্যাপক অর্থে ব্যক্তির বর্ণনাযোগ্য সকল আইনসিদ্ধ অধিকার সম্পত্তির আওতাভুক্ত। একজন মানুষের সম্পত্তি বলতে সেইসব কিছুকেই বোঝায়, আইনসিদ্ধভাবে যা তার অধিকারে আছে, এই ধারণাটি অতীতে প্রচলিত ছিল। কিন্তু আধুনিক কালে তা প্রায় উঠেই গেছে। এই ধারণা মতে, ব্যক্তির স্বাধীনতা, জীবন, খ্যাতি, যশ, স্ত্রী, দাস ইত্যাদি সবই সম্পত্তি বলে গণ্য।

সংকীর্ণ অর্থে ব্যক্তির মালিকানার অধিকার সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তিগত অধিকার সম্পত্তি নয়। মালিকানার অধিকার ব্যক্তির স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির উপর বর্তায় আর ব্যক্তিগত অধিকার বর্তায় ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা, পদমর্যাদা ও অবস্থার উপর। এই অর্থে ব্যক্তির সম্পত্তির আওতায় রয়েছে ভূমি, স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি, কারবারের অংশীদারিত্ব, ঋণ, ইত্যাদি কিন্তু জীবন, স্বাধীনতা ও কীর্তি সম্পত্তি নয়। আধুনিক কালে এই অর্থটাই সর্বাধিক ব্যবহৃত হচ্ছে।

সব রকমের মালিকানা এবং স্থাবর সম্পত্তির অধিকার সম্পত্তির অধিভুক্ত। সম্পত্তির আইন মূলত মালিকানার অধিকার সংক্রান্ত আইন। এই অর্থে লাখেরাজ জমি, ইজারার বলে অধিকৃত জমি, স্থাবর সম্পত্তির পেটেন্ট, গ্রন্থস্বত্ব ইত্যাদি সম্পত্তি বলে গণ্য, কিন্তু চুরির আয় ও ঋণ সম্পত্তি নয়।

আরো সংকীর্ণ অর্থে, বাস্তব বিষয়-আশয় এবং বস্তুগত জিনিসের উপর মালিকানার অধিকার ব্যতীত অন্য কিছু সম্পত্তি নয়। এ্যারেন (Ahrens) এর মতে, সম্পত্তি হচ্ছে সেই বস্তুগত বিষয় যেখানে মানুষের প্রত্যক্ষ ক্ষমতা প্রতিফলিত হয়। অস্টিন (Austin) এর মতে, দাস পালনের অধিকার ছাড়া মানুষের সকল প্রকার অধিকারই কখনো কখনো সম্পত্তি বলে বিবেচিত হয়। আবার কখনো জীবন ধারণের অধিকারও সম্পত্তি বলে গণ্য হয়। এমনকি ক্রীতদাসও সম্পত্তি বলে গণ্য হয় এই কারণে যে, এদের উপর আইনসিদ্ধ স্বত্ব বা মালিকানা থাকে। কখনো কখনো ব্যক্তিগত ও

www.pathagar.com

মালিকানা সংশ্লিষ্ট উভয় প্রকার যত সম্পদই আছে সবই সম্পত্তি বিবেচিত হয়। এই ধারণাটি সম্পত্তির ব্যাপক অর্থদায়ক এবং সেকেলে।

আধুনিককালে বুদ্ধিগত এবং স্পর্শনাতীত সম্পত্তিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোর আওতায় পড়ে গ্রন্থস্বত্ব, ট্রেডমার্ক, শিল্পকর্মের মালিকানা প্যাটেন্ট ইত্যাদি। আরলি জে (Arle J.)-এর মতে, যে সব জিনিস চিহ্নিত করা যায় না এবং অনধিকার কবল থেকে মুক্ত করা যায় না, উদ্ধার করা যায় না বন্দীত্ব থেকে, সেসব জিনিস হয়তো প্রাচীন কালে সম্পত্তি বলেই গণ্য হত। তখনকার সমাজ সম্পত্তি এবং উদ্ধার প্রক্রিয়া সবই ছিল অতিশয় সাধারণ প্রকৃতির। কিন্তু আধুনিক সভ্য সমাজে যেখানে মানুষের সম্পর্ক এবং সুবিধাদি অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করছে, সেখানে এই ধারণা সঠিক নয়।

সম্পত্তি শব্দটির সাথে মালিকানা শব্দটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যেখানেই সম্পত্তি আছে সেখানেই মালিকানার প্রশ্নটি উপস্থিত। এই মালিকানা ব্যক্তিসমষ্টি, গোষ্ঠী, রাষ্ট্র সমাজ যারই হোক না কেন? সম্পত্তিতে মালিকানা প্রতিষ্ঠার প্রবণতা কবে থেকে শুরু হয়েছে অথবা সম্পত্তির মালিকানার ধারণাটি কবে চালু হয়েছে এই বিষয়ে সামাজিক নৃবিজ্ঞানীদের গবেষণার অন্ত নেই। কিন্তু আজো এ বিষয়ে সন্দেহাতীতভাবে কিছু প্রমাণিত হয় নি। তবে একটি বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা অভিন্ন মত পোষণ করেন যে, সম্পত্তি একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সামাজিক বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে এর মালিকানার প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান রূপ লাভ করেছে।

সম্পত্তির প্রকারভেদ

সম্পত্তির প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, হস্তান্তর, স্থানান্তর যোগ্যতা, মালিকানা ইত্যাদি দিক বিবেচনা করে সম্পত্তিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথমত, সম্পত্তিকে শরীরী (corporeal) এবং অশরীরী (incorporal) এই দুইভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথমোক্ত শ্রেণীর সম্পত্তি স্পর্শন দ্বারা বোধগম্য কেননা এর বাস্তব স্বত্বা বা অস্তিত্ব বিদ্যমান। বস্তুগত জিনিসের উপর মালিকানার অধিকার হচ্ছে বস্তু বা জিনিস ব্যবহারকারীর সাধারণ স্থায়ী ও উত্তরাধিকারীর নিশ্চয়তা। ভূমি বা সম্পত্তির মালিকানা হচ্ছে এর উপর ব্যবহারকারীর সামগ্রিক অধিকার। অশরীরী সম্পত্তি হচ্ছে এমন প্রকৃতি, যা স্পর্শন দ্বারা বোধগম্য নয়। অর্থাৎ ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

www.pathagar.com

এই শ্রেণীর সম্পত্তিকে বুদ্ধিভিত্তিক বা প্রায়োগিক সম্পত্তিও বলা হয়ে থাকে। এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সে সব সম্পত্তি যেগুলোকে আইন দ্বারা সংরক্ষণ করা হয়। অশরীরী সম্পত্তিকে সম্পত্তি হিসেবে অনুমোদন ও সংরক্ষণের ধারা সাম্প্রতিক কাল থেকেই শুরু হয়েছে। এক সময় শুধুমাত্র ভূমি সম্পত্তি হিসাবে সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করতো, মানুষের নজর কাড়তো।

শরীরী বা বাস্তব অস্তিত্বসম্পন্ন সম্পত্তিকে এর স্থানান্তরযোগ্যতার দিকটি বিবেচনা করে আবার দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন : অস্থাবর এবং স্থাবর। অস্থাবর সম্পত্তি স্থানান্তরযোগ্য। যে সকল শরীরী বা বাস্তব অস্তিত্বসম্পন্ন সম্পত্তি বা দ্রব্য স্থানান্তর করা যায় সেগুলো অস্থাবর সম্পত্তি বলে গণ্য হয়। বস্তুগত পদার্থের মধ্যে নিম্নবর্ণিত দু'টি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোন একটি বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ বস্তুকে হয় স্থানান্তর করা যাবে অথবা যাবে না। যে সব বস্তু বা পদার্থ স্থানান্তর করা সম্ভব সেগুলো প্রথমোক্ত শ্রেণীভুক্ত। এ জাতীয় সম্পত্তি যথেষ্ট পরিবর্তনশীল। স্থাবর সম্পত্তি স্থানান্তর অযোগ্য। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ভূমি। স্যামন্ডের (Salmond)–এর মতে, স্থানান্তর অযোগ্য এক টুকরো জমির অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটা হচ্ছে ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের একটি সুনির্দিষ্ট অংশ। এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ভূপৃষ্ঠের তলদেশ, একেবারে পৃথিবীর সর্বশেষ সীমা পর্যন্ত। কোক (Coke)–এর মতে, আইন অনুসারে পৃথিবী বা ভূমি নিচের দিকে বহু পরিমাণে বিস্তৃত।

এটা শুধু পানি নয় বরং বাতাস এবং অন্যান্য জিনিস এমন কি স্বর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলাদেশের রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট অনুসারে, স্থাবর সম্পত্তি হচ্ছে ভূমি, দালান–কোঠা, খেয়াঘাট, মৎস্য খামার এবং ভূমি ও ভূমি সংশ্লিষ্ট জিনিস থেকে প্রাপ্ত সুবিধাদি। ভূমির সাথে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত দ্রব্যাদি স্থাবর সম্পত্তি কিন্তু বৃক্ষ, শষ্য বা ঘাস এই শ্রেণীভুক্ত নয়। বাংলাদেশের সম্পত্তি হস্তান্তর আইন ও দণ্ডবিধি স্থাবর সম্পত্তির তালিকা থেকে জীবন্ত বৃক্ষ, উঠতি ফসল এবং ঘাস বাদ দিয়েছে।

সম্পত্তির উপরোক্ত বিভক্তিকে বাস্তব (real) এবং ব্যক্তিগত (personal) এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। বাস্তব সম্পত্তি সাধারণত ভূমিকেই নির্দেশ করে। আর ভূমি বলতে শুধু ভূ–পৃষ্ঠের উপরিভাগকেই বোঝায় না বরং পৃথিবীর বহিরঙ্গে এবং অভ্যন্তরে অবস্থিত স্থায়ী প্রকৃতির সবকিছুই স্থাবর সম্পত্তি বলে বিবেচ্য। যেমন খনিজ দ্রব্য, তেল, গ্যাস ইত্যাদি। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে স্থানান্তর যোগ্য মালিকানার অধিভুক্ত সবকিছুকে বোঝায়। এর আওতায় পড়ে নোট, স্টক, টাকা ইত্যাদি ; এমনকি অবাস্তব সম্পত্তিও অস্থাবর সম্পত্তির পরিধিভুক্ত।

www.pathagar.com

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, বাস্তব ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি, এই উভয় প্রকার শ্রেণীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও একেবারে অভিন্ন নয়। এই সম্পর্ক ঐতিহাসিক কিন্তু যৌক্তিক নয়। ভূমির উপর মানুষের যত রকমের অধিকার আছে তার সবটুকুকেই বাস্তব সম্পত্তি হিসেবে আইন স্বীকৃতি দিয়েছে।

অশরীরী সম্পত্তি যা স্পর্শন দ্বারা বোধগম্য নয় এবং যা সাধারণত বুদ্ধিভিত্তিক। এগুলোকে আবার নিজস্ব (repropria) এবং পরক (readiena) এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমোক্ত ভাগে পড়ে সেইসব সম্পত্তি, যে সবের উপর মালিকানার হক আছে কিন্তু এগুলোর বস্তুগত অস্তিত্ব নেই, নেই কোন দৈহিক অবয়ব। এ জাতীয় সম্পত্তি অস্তিত্বশীল কিন্তু ধরা ছোঁয়ার বাইরে। আইন সাধারণত যদি বস্তুগত সম্পত্তি নিয়েই আলোচনা করে কিন্তু বর্তমানে মানুষের বুদ্ধিভিত্তিক চর্চা, দক্ষতা ও পরিশ্রমের ফলে সৃষ্ট কিছু অবস্তুগত বিষয়কে সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করে। এবং আইন দ্বারাই এগুলো সংরক্ষিত হয়। এ জাতীয় সম্পত্তির কিছু উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হল।

সাহিত্যকর্ম, নাট্যকর্ম, সংগীতকর্ম, শিল্পকর্ম, চলচ্চিত্রকর্ম, ইত্যাদিকে আমরা বুদ্ধিভিত্তিক সম্পত্তি বলতে পারি।

সাহিত্যকর্মের এলাকা ব্যাপক বিস্তৃত। নাটক, নভেল, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, সমালোচনা ইত্যাদিকে শুধু সাহিত্য বলে না। মানবিক, ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনীতিক, অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক সকল বিষয়ের লেখা ও রচনাকে সাহিত্যকর্ম বলা যায়। বিজ্ঞানের বই, আইনের বই, দর্শনের বই, ইতিহাসের বই ইত্যাদি সবই সাহিত্যকর্ম। এমনকি বইয়ের তালিকাও সাহিত্যকর্ম।

নাট্যকর্মের আওতায় পড়ে সকল প্রকার নাটক, আবৃত্তিযোগ্য রচনা, নৃত্য সম্পর্কীয় কাজ, মূকাভিনয়ের জন্য কাজ এবং দৃশ্য বিন্যাস ও অভিনয় সম্পর্কে লিখিত কাজ। বস্তুত নাটক রচনা থেকে মঞ্চায়ন পর্যন্ত বিভিন্ন স্তর সম্পর্কিত সকল বুদ্ধিভিত্তিক কাজই নাট্যকর্মের অন্তর্ভুক্ত।

সংগীতকর্ম বলতে গান, গজল ইত্যাদির রচনা, সুরারোপ, কণ্ঠ দেওয়া এবং মেলডি ও হারমনিয়ামের সমন্বয় সম্পর্কীত রচনা বোঝায়। এ রচনা অবশ্য লিখিত মুদ্রিত অথবা অঙ্কিত হতে হবে। প্রকৃতিদত্ত যোগ্যতা এবং সাধনার সমন্বয়েই সংগীতকর্ম সৃষ্টি হয়।

শিল্পকর্ম বলতে সাধারণত পেইন্টিং, ড্রইং, খোদাই, ভাস্কর্য, ফটোগ্রাফি ইত্যাদি বোঝায়। উডকাট প্রিন্ট, এচিং, লিথোগ্রাফ ইত্যাদিও শিল্পকর্মের অন্তর্ভুক্ত।

www.pathagar.com

চলচ্চিত্রকর্ম বলতে অডিও ভিজুয়্যাল শিল্প বোঝায়। ছবি এবং ধ্বনির সমন্বয়েই এই শিল্প। কাহিনী, সংলাপ, চিত্র, সম্পাদনা ইত্যাদি সবই সম্পত্তি। কারণ এগুলো মানুষের মেধা ও শ্রমের ফসল।

বর্তমানে অশরীরী সম্পত্তি, সম্পত্তি হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সাহিত্যকর্ম, নাট্যকর্ম, সঙ্গীতকর্ম, শিল্পকর্ম, চলচ্চিত্রকর্ম ইত্যাদির মাধ্যমে, এর স্রষ্টা বিপুল পরিমাণ অর্থের মালিক হতে পারেন। একটি সাড়া জাগানো গ্রন্থ বা একটি সাড়া জাগানো চলচ্চিত্রের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা আয় হতে পারে। তাই সম্পদ হিসেবে অশরীরী সম্পত্তিকে খাটো করে দেখার কোন অবকাশ নেই।

মালিকানার দিক থেকে বিবেচনা করলে সম্পত্তিকে ব্যক্তিগত (private) এবং সরকারি (public) এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যে সম্পত্তি ব্যক্তিবিশেষের মালিকানায় থাকে তাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে আর যে সম্পত্তির মালিক রাষ্ট্র সে সম্পত্তিকে সরকারি সম্পত্তি বলে।

মালিকানা

ব্যক্তিগত মালিকানার আকাঙ্ক্ষা মানুষের সহজাত প্রকৃতির অঙ্গ কিনা এ নিয়ে মনোবিজ্ঞানীরা যথেষ্ট গবেষণা করেছেন। তারা লক্ষ্য করেছেন, কোন কিছু নিজের বলে আঁকড়ে ধরে রাখার প্রবৃত্তি একটি মানব শিশুর মধ্যেও বিদ্যমান। আবার সামাজিক নৃবিজ্ঞানীরা পৃথিবীর এমন অনেক আদিম জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যাদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা একেবারেই নেই। তাই প্রশ্ন উঠেছে যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণার উদ্ভব কোত্থেকে? প্রবৃত্তি থেকে, না সামাজিক সংস্কৃতি থেকে? ধারণা করা হয় যে, মানুষের সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস, সামাজিক জীবন যাপন এবং সামাজিক অনুশাসন থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানার ধারণার উদ্ভব। ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংস্কৃতিরই ফল, মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির ফসল নয়।

মানুষ সমাজে বাস করে। হাজারো ঘাত প্রতিঘাত সমস্যা সংকট আর দুঃখ দুর্দশার মধ্য দিয়ে মানব সমাজের অগ্রগতি অব্যাহতভাবে চলছে। সমাজে বসবাস করেই সম্ভবত মানুষের এই উপলব্ধি জাগ্রত হয়েছে যে, জীবন যাপনের জন্য সম্পত্তি অর্জন করা দরকার। ভবিষ্যতের অনাকাঙ্ক্ষিত কোন দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য সম্পত্তি সঞ্চয় করা প্রয়োজন। তারপরও অতি ক্ষুদ্রকায় প্রাণী পিপিলিকা, মৌমাছির খাদ্য সংগ্রহের প্রবণতা লক্ষ্য করে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন মানুষের এমন প্রবণতা সহজাত কিনা?

www.pathagar.com

বৃটিশ মনোবিজ্ঞানী গিনসবার্গের ভাষায়, "ধন সম্পদ অর্জন এবং তাকে ব্যক্তিগত অধিকারে রাখার কোন বিশেষ প্রবৃত্তি মানুষের আছে কিনা সে সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীরা আজো ঐক্যমতে পৌঁছাতে পারেন নি।

সম্পত্তির ধরন যেমন ভিন্ন তেমনি এর মালিকানা বিভিন্ন রকমের। সামাজিক নৃবিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকে জানা গেছে যে, আদিম সমাজে নানা ধরনের মালিকানা বিদ্যমান ছিল। এর মধ্যে যৌথ মালিকানাই ছিল বহুল প্রচলিত। এই যৌথ মালিকানা প্রধানত রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় পরিজনের মধ্যে এবং স্থানীয় এলাকার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ধর্মীয় আদর্শ, রাজনৈতিক দর্শন, অর্থনৈতিক কাঠামো, সামাজিক মূল্যবোধ ইত্যাদি সম্পত্তি এবং সম্পত্তির মালিকানা ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। হিন্দু ও মুসলমানদের সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিধান সম্পূর্ণ ভিন্ন। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপসহ অনেক সমাজতান্ত্রিক দেশে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র অনুসৃত হয় এবং বিশ্বব্যাপী সম্পত্তি ও মালিকানার ধারণায় মার্ক্সীয় তত্ত্বানুসারে এক ব্যাপক পরিবর্তন আসে। মার্কসীয় তত্ত্বানুসারে ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জনকে যেখানে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে এবং সম্পত্তির উপর ব্যক্তির মালিকানাকে প্রতিহত করা হয়েছে সেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জনের উপায়ের প্রশ্ন অবান্তর। সেখানে সকল সম্পত্তির মালিক রাষ্ট্র। তাই স্বাভাবিক ভাবে উত্তরাধিকার, হস্তান্তর ইত্যাদির সুযোগ নেই। বর্তমানে বাজার অর্থনীতি অনুসৃত হওয়ার কারণে এই তত্ত্বের প্রায়োগিক দিক কিছুটা হলেও বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

যাই হোক সম্পত্তি ও মালিকানা ব্যবস্থাটি আগেও ছিল, আজো আছে, হয়তো ভবিষ্যতেও থাকবে।

সম্পত্তি অর্জনের উপায়

অধ্যাপক স্যামন্ড (Salmond) সম্পত্তি অর্জনের চারটি উপায় বা পন্থা নির্দেশ করেছেন। পন্থাগুলো হচ্ছে :

ক. দখল (possession)

খ. দীর্ঘ ভোগজনিত অধিকার (prescription)

গ. চুক্তি বা সমঝোতা (agreement)

ঘ. উত্তরাধিকার (inheritance)

www.pathagar.com

ক. দখল (possession) হচ্ছে স্বত্বের বস্তুগত কার্যকারণ বা বাস্তবায়ন। বস্তুগত বিষয়ের দখল হচ্ছে এর মালিকানার প্রমাণ। যে ব্যক্তির সম্পত্তি দখলে আছে এবং যে ব্যক্তি স্বত্ব অর্জন করে, ঐ সম্পত্তির উপর তার পূর্ণ মালিকানা কায়েম হয়ে যায়। যদি একটি দ্রব্য কোন ব্যক্তির দখলে বা অধিকারে থাকে তাহলে একমাত্র প্রকৃত মালিক ছাড়া কেউ তাকে উচ্ছেদ করতে পারেন না। এমন কি প্রকৃত মালিকও দখলকারের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করতে পারেন না। তিনি তার নিজস্ব অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আইনের সাহায্য ও আনুকূল্য পাবেন। অধ্যাপক স্যামন্ডের ভাষায় "একটি জিনিসের মালিক একব্যক্তি, জিনিসটি অন্যায়ভাবে দখলে আছে আরেক ব্যক্তির। এক্ষেত্রে মালিক দুজন। একজন প্রকৃত মালিক আর একজন দখলকারী মালিক। দখলদার যদি প্রকৃত মালিক ছাড়া অন্য কারো দ্বারা সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদ বা বিতাড়িত হয়, সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে উক্ত সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের অধিকার তার রয়েছে। যে সম্পত্তির কোন স্বত্বাধিকারী নেই, সেই সম্পত্তি যিনি দখল করে আছেন পৃথিবীর অন্য যে কেউ থেকে তার স্বত্বই অধিকতর অগ্রগণ্য। এজন্য মুক্ত আকাশে ঘুরে বেড়ানো পাখি, সমুদ্রের মাছ তারই মালিকানায় চলে যাবে যে তাকে আগে ধরবে।

খ. দীর্ঘভোগজনিত অধিকার (prescription) হচ্ছে সম্পত্তির মালিকানা অর্জন বা হারানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। অধ্যাপক স্যামণ্ড বলেছেন, সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার কারণে সম্পত্তির উপর অধিকার সৃষ্টি বা রহিত হওয়ার বিষয়ই হচ্ছে এই অধিকার। এটা দু'ধরনের হতে পারে। ইতিবাচক অর্থাৎ অর্জনক্ষম ভোগদখল আর নেতিবাচক তথা বিলুপ্তির সহায়ক ভোগদখল। ইতিবাচক ভোগদখল হচ্ছে নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার ফলে অধিকার সৃষ্টি হওয়া। নেতিবাচক ভোগদখল হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার ফলে অধিকার বিনষ্ট হয়ে যাওয়া। সময় অতিবাহিত হওয়ার দু'টি বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে। ইতিবাচক ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে দখলের এবং স্বত্বের অধিকার আর নেতিবাচক ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে বঞ্চিত হওয়ার ঘটনা। যদি কেউ ২০ বছর যাবৎ একটা রাস্তা বা নদীপথের মালিক না হয়েও ভোগ দখল করে তাহলে সে ঐ সময়ের সমাপ্তি থেকে উক্ত বাস্তব নদী পথের মালিক ও স্বত্বাধিকারী বলে বিবেচিত হবে। এমনিভাবে কেউ যদি কোন সম্পত্তির মালিক হয়েও ১২ বছর উক্ত সম্পত্তি দখল করতে না পারে তাহলে সেই সময় থেকেই

www.pathagar.com

তার স্বত্ব বিলুপ্ত হবে। ভোগদখলের এই দুই ধারাই নির্দেশ করবে যে, এতে একজন সম্পত্তি হারাবে আর অন্যজন লাভ করবে।

গ. চুক্তি হচ্ছে সম্পত্তি অর্জনের অন্যতম মাধ্যম বা পন্থা। একটি সাধারণ ইচ্ছা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিজেদের মধ্যে আইনগত সম্পর্ক স্থাপনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দুই বা ততোধিক ব্যক্তির সম্মতি হচ্ছে চুক্তি বা সমঝোতা। চুক্তি হচ্ছে দ্বিপাক্ষিক সমঝোতার পরিণতি। বাস্তব অধিকার একের নিকট থেকে অন্যের নিকট হস্তান্তরের জন্য দলিল বা চুক্তি হচ্ছে একটা উপায়। আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক যে কোন চুক্তির মাধ্যমে সম্পত্তি হস্তান্তর করা যায়। সাধারণ নিয়ম হচ্ছে এই যে, চুক্তির মাধ্যমে যাকে কিছু হস্তান্তর করে দেওয়া হয়, তার স্বত্ব যিনি হস্তান্তর করেন তার স্বত্ব থেকে শ্রেষ্ঠতর হতে পারে না। এটা এজন্য যে, কোন মানুষই তার নিজস্ব স্বত্ব থেকে উন্নততর কোন স্বত্ব হস্তান্তর করতে পারে না। এ ক্ষেত্রেও আবার কিছু ব্যতিক্রম আছে।

ঘ. সম্পত্তি অর্জনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা হচ্ছে উত্তরাধিকার। যখন কোন ব্যক্তি মারা যায় তখনও তার কিছু অধিকার বিদ্যমান থাকে এবং এগুলো তার উত্তরাধিকারীর উপর বর্তায়। মৃত্যুর সাথে সাথে যে সব সম্পত্তির উপর অধিকার বিনষ্ট হয় সেগুলো হচ্ছে অনুত্তরাধিকারমূলক সম্পত্তি। আর যে সব সম্পত্তির উপর মৃত্যুর পরও অধিকার থাকে সেগুলো উত্তরাধিকারমূলক। সম্পত্তির মালিকানা সংশ্লিষ্ট অধিকারগুলো উত্তরাধিকারমূলক। কিন্তু ব্যক্তির পদমর্যাদার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগত অধিকারগুলো উত্তরাধিকারমূলক নয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও যে ব্যতিক্রম নেই তা নয়। যেমন গ্রন্থস্বত্ব ইত্যাদি।

এ ছাড়াও সম্পত্তি অর্জনের আরো কিছু উপায় আছে। যেমন : ক্রয়, এওয়াজ, দান গ্রহণ, উপহারলাভ, ভাড়া ইত্যাদি। অর্থ বা অন্যকিছুর বিনিময়ে কিছু ক্রয় করলে সেটা নিজের সম্পত্তি বলে গণ্য হয়। বর্তমান বিশ্বে সম্পত্তি অর্জনের প্রধান উপায় হচ্ছে ক্রয়। ক্রয়ের মাধ্যমে সম্পত্তির বৈধ মালিক হওয়া যায়। সম্পত্তি অর্জনের এটাই গুরুত্বপূর্ণ উপায়। কারো নিকট থেকে দান হিসেবে , উপহার হিসেবে কোন কিছু গ্রহণ করলে সেটা সম্পত্তি বলে পরিগণিত হয়। তাই দান এবং উপহারকে আমরা সম্পত্তি অর্জনের উপায় হিসেবে ধরে নিতে পারি। ভাড়ার মাধ্যমেও সম্পত্তি লাভ করা যায় তবে ভাড়ার মাধ্যমে যে সম্পত্তি অর্জিত হয় সেটা সীমিত সময়ের জন্য। ভাড়া বা মর্টগেজের মাধ্যমে অর্জিত সম্পত্তি একটি নির্দিষ্ট সময় পর আর থাকে না। এসব ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন অঞ্চলে সম্পত্তি অর্জনের বিভিন্ন উপায় আছে। প্রত্যেকটি উপায়ই সম্পত্তি অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

www.pathagar.com

সম্পত্তি কাকে বলে, মালিকানা বলতে কি বোঝায় এবং মালিকানা অর্জনের উপায়, এ সম্পর্কে আমরা উপরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলাম। এক্ষণে সম্পত্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক বিষয়ে একটি পরিষ্কার ধারণা হল। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রত্যেকেরই সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার রয়েছে। মালিকানা অর্জনের উপায় আলোচনাকালে দেখা গেছে নিজের চেষ্টায় সম্পত্তির মালিক হওয়া যায় আবার অন্যের সহযোগিতায়ও মালিকানা অর্জন করা যায়। বিধিসম্মত উপায়ে সম্পত্তির যে মালিকানা অর্জিত হয়, সেটা নিজে থেকেই হোক আর অন্যের সহযোগিতায়ই হোক সেই সম্পত্তির মালিকানার অধিকার ব্যক্তির জন্য সংরক্ষিত।

ঘ. সম্পত্তির মালিকানা থেকে কাউকে বঞ্চিত না করা

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদে প্রত্যেকের সম্পত্তির মালিকানার অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। প্রত্যেকের সম্পত্তির মালিকানা দৃশ্যত ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকারকেই নির্দেশ করে। ব্যক্তিগত মালিকানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এই শতাব্দীর বিশ্ব রাজনীতির গতি প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা থাকবে কি থাকবে না এ নিয়ে বিশ্ববাসী ছিল দু'টি প্রধান শিবিরে বিভক্ত। বর্তমানে এই বিতর্ক কমে আসলেও একেবারে শেষ হয়ে যায় নি। মার্কসীয় সাম্যবাদের অনুসারী যারা, তাদের মতে, ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পত্তি মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির হাতে কেন্দ্রীভূত করে এবং সিংহভাগ মানুষকে নিঃস্ব ও দরিদ্রে পরিণত করে। তাই ব্যক্তিগত মালিকানা শোষণের হাতিয়ার। তারা সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় বিশ্বাস করেন। রাষ্ট্রীয় মালিকানা যৌথ মালিকানায় বিশ্বাস করেন। রাষ্ট্রীয় মালিকানা যৌথ মালিকানারই সংস্করণ। এর বিপরীত ধারা হচ্ছে, মুক্ত বাজার অর্থনীতি বা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা অনুসারে ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন, ভোগ ও বিনিয়োগের অবাধ অধিকার সকলের আছে। এতে রাষ্ট্র ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা হরণ বা নিয়ন্ত্রণ করে না। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা থাকা না থাকা নিয়ে দীর্ঘ পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপের অনেক দেশ এবং লাতিন আমেরিকার কোন কোন দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ করা হয়েছিল। সম্প্রতি সেই ব্যবস্থাকে পরিত্যাগ করে আবার ব্যক্তিগত মালিকানার দিকে ফিরে আসছে অনেক দেশ। অনেক সমাজতান্ত্রিক দেশে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

www.pathagar.com

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদ বলছে, কাউকে তার সম্পত্তি থেকে যথেচ্ছভাবে, খেয়ালখুশিমতো বঞ্চিত করা চলবে না। এটা হচ্ছে ব্যক্তির সম্পত্তির রক্ষাকবচ।

ব্যক্তির আর্থিক নিরাপত্তার জন্যই ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এটা ব্যক্তিস্বাধীনতা ও নিরাপত্তার প্রতীক। ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকলে মানুষ ইচ্ছামত সৃজনশীল কাজে নিযুক্ত হতে পারে। অবসরকালে সুখী সুন্দর জীবন যাপন করতে পারে।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি হচ্ছে ব্যক্তির পরিশ্রমের পুরষ্কার, যে শ্রমের বিনিময়ে সে সম্পত্তি অর্জন করে তার উপর ব্যক্তির অধিকার জন্মগত। এ অধিকার ব্যক্তিকে কর্মে উৎসাহিত করে, যা সমাজের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব্যক্তির কতিপয় বৈশিষ্ট্যকে বিকশিত করে। যেমন—পরিবারের প্রতি ভালবাসা, উদারতা, আবিষ্কারের আগ্রহ, সমাজ উন্নয়নের মানস ইত্যাদিকে জাগিয়ে তোলে ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি মানুষকে আত্মমর্যাদাশীল, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং ইচ্ছানুযায়ী উন্নয়ন ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের প্রেরণা যোগায় এবং সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। এটা দুর্যোগ মোকাবেলায়ও সাহায্য করে।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি মানুষকে সচেতন ও দায়িত্বশীল করে, সেই সাথে সমাজকেও। ব্যক্তিগত সম্পত্তির কারণে মানুষের মধ্যে দায়িত্বশীলতা, একাগ্রতা, কর্মস্পৃহা, উদ্যমতা সৃষ্টি হয়। এটা মানুষকে কাজে উদ্দীপ্ত করে তোলে।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারটি মানবিক। আর এই অধিকারটি কেড়ে নেওয়া অমানবিক। তাই মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদ মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা হরণ করতে নিষেধ করেছে।

ভিক্টোরিয়ান যুগের ইংল্যান্ডের অন্যতম রাষ্ট্রচিন্তাবিদ টি. এইচ. গ্রিন তাঁর 'Lectures on the Principles of Political Obligation' গ্রন্থে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এর উপর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেছেন। তার মতে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি হচ্ছে মানুষের নৈতিক জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কাজেই ব্যক্তিগত পর্যায়ে সেই সম্পত্তির অধিকার কারো কারো দ্বারা সাধারণভাবে অপব্যবহৃত হলেও গ্রিন এ অধিকারকে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের দ্বারা ক্ষুণ্ণ করার পক্ষপাতি নন। তার চোখে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার হল এক পবিত্র অধিকার। তার মতে, এ পবিত্র অধিকারে রাষ্ট্র কেবলমাত্র তখনই হস্তক্ষেপ

www.pathagar.com

করতে পারে যখন ব্যক্তিগত পর্যায়ে এ অধিকার এমনভাবে ব্যবহৃত হয় যে, অন্যান্য সকলে এ অধিকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়।

আবার জন লক তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্বে ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকারের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। এই তিনটি অধিকারের মধ্যে সম্পত্তির অধিকারই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার বলে বিবেচিত হয়েছে। তাঁর মতে, সম্পত্তির অধিকারের মধ্যেই ব্যক্তির স্বাধীনতা ও জীবনের অধিকার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ তিনি যে কথা বলতে চেয়েছেন তা হল এই যে, মানুষের জীবন ও স্বাধীনতার অধিকার প্রয়োগ করা সম্ভব একমাত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগ দখলের মধ্য দিয়ে এবং এজন্য মানুষ প্রকৃতির রাজ্য পরিত্যাগ করে রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ে তুলেছে। এবং জীবনের পরে সম্পত্তি রক্ষার তাগিদই মানুষের সর্বাধিক, কখনো কখনো এই তাগিদ জীবনের চেয়েও বেশি। তাই মানবাধিকার সনদেও এই অধিকার রক্ষার তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কাউকেই তার সম্পত্তি থেকে খেয়ালখুশিমত বঞ্চিত করা চলবে না। এখানে ব্যক্তিকে তার সম্পত্তি থেকে যে একেবারেই বঞ্চিত করা যাবে না এমনটি বলা হয় নি। বরং বলা হয়েছে, খেয়ালখুশিমত বা স্বেচ্ছাচারমূলকভাবে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা চলবে না। এর অর্থ হচ্ছে জাতির স্বার্থে, জনস্বার্থে আইনসম্মত উপায়ে সম্পত্তি থেকে ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাবে। যেমন—হিরোইন বা অন্যকোন মাদক দ্রব্যের ব্যবসায়ী, যার কাছে মাদকদ্রব্য পাওয়া গেল। এই মাদক দ্রব্য তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এই সম্পত্তি থেকে তাকে বঞ্চিত করলে কি মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হবে? নিশ্চয়ই নয়। কারণ মাদক দ্রব্য রাখা বা এর ব্যবসা করা আইনসম্মত নয়। সম্পত্তি হিসেবে এগুলো অবাঞ্ছিত, জনস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর বলে এসব সম্পত্তির অধিকার থেকে আইন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করতে পারে। তাছাড়া ফৌজদারি অপরাধের শাস্তি হিসেবে কাউকে অর্থদণ্ড প্রদান করা হলে,এর ফলে তাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হতে পারে। এমনিভাবে আইনসম্মত উপায়ে ব্যক্তিকে তার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হতে পারে। দেশের প্রচলিত আইন যদি ন্যায়সঙ্গত কারণে কাউকে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে তাহলে সেটা মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার পরিপন্থী হবে না। যেমন—কোন ব্যক্তি যদি চোরাকারবারের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ টাকার মালিক হয়ে যান, যাকে সাধারণত কালো টাকা বলা হয়, তা থেকে তাকে বঞ্চিত করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

এই অনুচ্ছেদ ও বাংলাদেশের সংবিধান

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদের মূল বক্তব্য হচ্ছে সম্পত্তি ও মালিকানা। এ সম্পর্কে গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বিধান রয়েছে। সংবিধানের ১৩ নং অনুচ্ছেদে মালিকানার নীতি বর্ণিত হয়েছে এবং সম্পত্তির অধিকার বর্ণিত হয়েছে ৪২ নং অনুচ্ছেদে। নিম্নে অনুচ্ছেদ দুটি পরিবেশিত হল ঃ

অনুচ্ছেদ : ১৩

উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বণ্টনপ্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে :

(ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারি খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা ;

(খ) সমবায়ী মালিকানা অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা ; এবং

(গ) ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২

(১) আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা নিষেধ-সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলিব্যবস্থা করার অধিকার থাকবে এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যবাধকতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ত বা দখল করা যাইবে না।

(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রণীত আইনে ক্ষতিপূরণসহ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখলের বিধান করা হইবে এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ, কিংবা ক্ষতিপূরণ নির্ণয় বা প্রদানের নীতি ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা হইবে ; তবে অনুরূপ কোন আইনে ক্ষতিপূরণের বিধান অপর্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া সেই আইন সম্পর্কে কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।

(৩) ১৯৭৭ সালে ফরমানসমূহ (সংশোধন) আদেশ (১৯৭৭ সালের ১ নং ফরমানসমূহ আদেশ) প্রবর্তনের পূর্বে প্রণীত কোন আইনের প্রয়োগকে, যতদূর তাহা

www.pathagar.com

ক্ষতিপূরণ ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখলের সহিত সম্পর্কিত, এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই প্রভাবিত করিবে না।

এই অনুচ্ছেদ ও অন্যান্য সংবিধান

The Constitution of India. Article No. 31

(1) No person shall be deprived of his property save by authority of law.

(2) No property shall be compulsorily acquired or requisitioned save for a public purpose and save by authority of a law which provides for compensation for the property so acquired or requisitioned and either fixes the amount of the compersation or specifies the principles on which, and the manner in which, the compensation is to be determined and given ; and no such law shall be called in question in any court on the ground that the compensation provided by that law is not adequate.

(2A) Where a law does not provide for the transfer of the ownership or right to possesion of any property or right to possession of any property to the state or to a corporation owned or controlled by the State, it shall not be deemed to provide for the compulsory acquisition, or requisitioning of property, not with standing that it deprives any person of his property.

(3) No such law as is referred to in clause (2) made by the Legislature of a State shall have effect unless such law, having been reserved for the consideration of the President, has received his assent.

(4) If any Bill pending at the commencement of this constitution in the Legislature of a State has, after it has

www.pathagar.com

been passed by such Legislature, been reserved for the consideration of the President and has received his assent, then not withstanding anything in this constitution, the law so assented to shall not be called in question in any court on the ground that it contravenes the provisions of clause (2)

(5) Nothing in clause (2) shall affect--

(a) the provisions of any existing law other then a law to which the provisions of caluse (6) apply, or

(b) the provisions of any law which the State may hereafter make--

(I) for the persose of imposing or levying any tax or penalty ; or

(II) for the promotion of public health or the prevention of danger to life or property, or

(III) in persuance of any agreement entered into between the Government of the Dominion of India or the Government of India and the Government of any other country, or otherwise, with respect to property declared by law to be evacuee property.

(6) Any law of the State enacted not more than eighteen months before the commencement of this constitution may within three months from such commencement be submitted to the President for his certification ; and thereupon, if the President by public notification so certifies, it shall not be called in question in any court on the ground that it contravenes the provisions of clause (2) of the article or has contravened the provisions of sub section (2) of section 299 of the Government of India Act 1935.

www.pathagar.com

এই অনুচ্ছেদ ও ইসলাম

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদের মূল বক্তব্য হচ্ছে সম্পত্তির মালিকানা। ইসলামি শরীয়তে হালাল উপায়ে অর্জিত সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত। তবে এ ক্ষেত্রে কিছু কর্তব্য থেকে যায়। যেমন : যাকাত আদায়, দান খয়রাত করা, পিতামাতা, ছেলেমেয়ে, স্ত্রী পরিজন, ভাইবোন ও অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের লালন পালন ও যত্নের ব্যয়ভার বহন, রাষ্ট্রের আরোপিত কর প্রদানসহ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন। দুর্ভিক্ষ, প্লাবন, যুদ্ধবিগ্রহ, ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, মহামারী ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে সহায়তা দান। এসব শর্ত পালন করলে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ থেকে সম্পদের মালিকানা সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে। ইসলামি শরীয়ত অনুসারে সম্পদের মালিক কতগুলো অধিকার ভোগ করেন।

প্রথমত : সম্পত্তির মালিক সম্পদের ভোগের ও ব্যবহারের অধিকার রাখেন। তবে এ ক্ষেত্রে সামান্য সীমাবদ্ধতা আছে। সম্পত্তি বা সম্পদ অপচয় করার অধিকার ইসলাম প্রদান করেনা। সম্পদের মালিক হলেই এর যথেচ্ছ ব্যবহার করা যাবে ইসলাম তা স্বীকার করে না। হালাল উপায়ে অর্জিত সম্পদ সৎ, সঠিক ও কল্যাণমূলক খাতে খরচ করতে বলা হয়েছে। সম্পত্তি ভোগ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে কৃপণতা ও অপচয় এই দু'টিকেই ত্যাগ করে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত : সম্পত্তির মালিকের অধিকার আছে, অধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে ব্যবসা বাণিজ্যে বিনিয়োগ করার, তবে এ ক্ষেত্রে অসৎ পথ অবলম্বন করা তথা কালোবাজারী, মুনাফাখোরী, মজুদদারী, সুদের কারবার ইত্যাদিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ সুদকে করেছেন হারাম আর ব্যবসাকে করেছেন হালাল।

তৃতীয়ত : সম্পদের স্বত্ব রক্ষা এবং মালিকানা হস্তান্তর করার অধিকার রয়েছে সম্পদের মালিকের। স্বত্বরক্ষা সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে, "তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না (২ : ১৮৮) সরকার জাতীয় প্রয়োজনে বা সামগ্রিক স্বার্থে কারো জমি হুকুম দখল করা প্রয়োজন মনে করলে মালিকের সম্মতিতে উপযুক্ত মূল্য প্রদান করে তা করতে পারেন। কথিত আছে যে, মদিনায় মসজিদে নব্বী নির্মাণের জন্য মহানবী (দঃ) যে স্থানটি নির্বাচন করলেন তার মালিক ছিল দু'জন ইয়াতিম বালক। বালকদ্বয় জমিটি মসজিদের জন্য বিনামূল্যে দান করতে চেয়েছিল কিন্তু মহানবী (দঃ) অনুমান করে মূল্য নির্ধারণ করলেন, এবং তৎকালীন বাজার দর অনুযায়ী

www.pathagar.com

তা পরিশোধ করে জমিটি গ্রহণ করলেন। হাদিসে আছে, "যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ।" (বুখারী)

মালিকানা হস্তান্তরের অধিকার সম্পদের মালিকের রয়েছে তবে এ ক্ষেত্রে তার কতিপয় সীমাবদ্ধতা আছে যেমন অছিয়ত বা উইল এবং হেবা করার ব্যাপারে মালিক নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী নয়। তিনি তার বৈধ ও আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারীদের বঞ্চিত করতে পারেন না। এ বিষয়ে ইসলামি আইনে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে।

বস্তুত ইসলামে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা অনুমোদিত কিন্তু মালিকানা অর্জন তথা সম্পত্তির মালিক হওয়ার ক্ষেত্রে হালাল উপার্জনের তাগিদ দেওয়া হয়েছে। তেমনি সম্পত্তি ব্যয়ের ব্যাপারেও হালাল পথে খরচ করতে বলা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে তোমাদের সম্পত্তিতে বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে। অতএব, সম্পত্তির মালিক দরিদ্র, ইয়াতিম, মিস্‌কিন তথা বঞ্চিতদের হক আদায় করবেন।

সারসংক্ষেপ

মানুষকে বাঁচতে হলে তার কিছু সহায় সম্বল চাই। এই সহায় সম্বলের অপর নাম সম্পত্তি। যে কপর্দকহীন, তার যত আস্ফালনই থাক না কেন সে আসলে শক্তিহীন।

মানুষকে বাঁচতে হলে, সুন্দরভাবে জীবন যাপন করতে হলে, পূর্ণভাবে বিকশিত হতে হলে তার প্রয়োজন এমন কিছু সম্বল যা তাকে আশ্রয় দিতে পারে। বিপদের দিনে, প্রবর্তনা দিতে পারে সম্পদের দিনে।

সম্পত্তির অধিকার তাই মানবাধিকার রূপে চিহ্নিত হয়েছে। এই মানবাধিকার শুধু অর্জনে ও বর্জনে সীমায়িত নয় এর বিস্তৃতি সম্পত্তির সংরক্ষণেও । কোন মানুষ বঞ্চিত হবে না তার সম্পত্তি থেকে, অকারণে কিংবা অন্যায় কারণে বা অপর্যাপ্ত কারণে। যার লাঠি তার মাটি—এ নীতি চলবে না।

যা আমার নিজের, তা আমার একান্তই নিজের ; সেখানে যদি অন্যের উপদ্রবের উদ্যত আশংকা আমাকে পীড়িত করে তবে সে সম্পদ আমার হয়েও পূর্ণভাবে আমার থাকে না। যার যেটুকু আছে তার সেটুকু রাখবার নিশ্চিন্তিও তাই মানবাধিকার।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে ; এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে তার ধর্ম বা ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তন করার স্বাধীনতা, এবং একা বা অন্যের সঙ্গে সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে এবং প্রকাশ্যে বা গোপনে শিক্ষাদান অনুশীলন, ধর্ম অনুষ্ঠান ও পালনের মাধ্যমে নিজ ধর্ম ও বিশ্বাস অভিব্যক্ত করার স্বাধীনতা।

(Article : 18. Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion ; this right includes freedom to change his religion or belief and freedom, either alone or in community with others and in public or private to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

ভাষ্য

আলোচ্য অনুচ্ছেদে তিনটি বিষয়ে স্বাধীনতার অধিকারের কথা বলা হয়েছে। বিষয় তিনটি হচ্ছে,

১. চিন্তা (Thought)

২. বিবেক (Conscience)

৩. ধর্ম (Religion)

www.pathagar.com

উপরোক্ত তিন বিষয়কে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের জন্য এবং কেন এগুলোকে মানবাধিকারের বিষয়বস্তু হিসেবে চিহ্নিত করা হল তা পর্যালোচনার জন্য আলোচনাকে তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করবো।

চিন্তার স্বাধীনতার অধিকার

চিন্তা কাকে বলে?

চিন্তার স্বাধীনতার অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে প্রথমেই দেখতে হবে চিন্তা বলতে কি বোঝায়? আমাদের দেশে যখন কোন মানুষ বিশেষ কোন কারণে বিপদের সম্মুখীন হয় তখন তার জন্য বিপদের কারণটি চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এখানে চিন্তা বলতে ভাবনাকে বোঝায়। যখন বলা হয় এটা এরিস্টটল বা প্লেটোর চিন্তা তখন আমরা চিন্তা শব্দটি দিয়ে মত, ধারণা, পদ্ধতি বা আদর্শ বুঝি। কোন কথাশিল্পী যখন তার গল্প বা উপন্যাসের কাহিনী নিয়ে চিন্তা করেন তখন আমরা চিন্তা শব্দটিকে কল্পনার সমার্থক মনে করি। তেমনি চিন্তা শব্দটি দ্বারা ধ্যান ধারণা, মত, বিবেচনা ইত্যাদি বোঝায়। চিন্তা হচ্ছে একটি মানসিক ক্রিয়া। অনেক সময় মানুষের মুখের ভাব, চাহনি, কপালের অবস্থা, বসার ধরন ইত্যাদি দেখে যদিও অনুমান করা যায় যে, মানুষ চিন্তা করছে কিন্তু তথাপিও চিন্তা বিষয়টি সাধারণত ধরাছোঁয়ার বাইরে। মানুষের ভাব, কল্পনা, বিবেচনা, ধারণা, মত, ধ্যান ইত্যাদি যদি হয় চিন্তা এবং এসব যদি ধরা ছোঁয়া বা দেখা না যায় তাহলে চিন্তা স্বাধীনতার অধিকারের প্রশ্ন আসে কেন। মানুষ যা খুশি তাই ভাবতে পারে, কল্পনা করতে পারে। মনে মনে সে ন্যায় অন্যায়, কল্যাণ অকল্যাণ, সৎ-অসৎ অনেক কিছুই ভাবতে পারে, চিন্তা করতে পারে। খারাপ চিন্তা নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে গর্হিত হলেও আইনের চোখে অপরাধ নয়। তাছাড়া খারাপ কিছু ভাবলে তো কেউ ধরতে পারবে না। বারণ করতে পারবে না। একের মনের উপর অন্যের নিয়ন্ত্রণ নেই। মনের দ্বার গোড়ায় তো পুলিশ বসানো যাবে না। কল্পনার রথে চড়ে যদি কোন মানুষ উড়ে বেড়ায় দেশ থেকে দেশান্তরে তাহলে পাসপোর্ট ভিসার দোহাই দিয়ে তাকে আটকানো যাবে না। অতএব, চিন্তার ক্ষেত্রে মানুষ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণহীন। তাই সঙ্গত কারণেই সেই প্রশ্নটি এসে যায় যে, মানুষের যে ক্ষেত্রটির উপর কোন রকম নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যায় না, সেই ক্ষেত্রে স্বাধীনতার অধিকারের কথা উঠবে কেন? মানুষ তো বাধাহীন ভাবে চিন্তা করে যাচ্ছে, তাহলে চিন্তার স্বাধীনতার অধিকার রক্ষার দাবি কেন?

www.pathagar.com

আপাত দৃষ্টিতে চিন্তার ক্ষেত্রে মানুষকে আমরা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণহীন যদিও ভাবছি তথাপি একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, মানুষের স্বাধীন চিন্তার স্রোত বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্নজনের দ্বারা।

প্রথমত, চিন্তা যদিও শুধুমাত্র মন ও মাথার কাজ তবুও চিন্তার সূত্র দরকার হয়। আমরা যাকে বলি চিন্তার খোরাক, সেটি না থাকলে মানুষ চিন্তা করতে পারে না। যেমন—শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প—এসব মানুষকে ভাবতে সাহায্য করে। নতুন কিছু উদ্ভাবনে অনুপ্রাণিত করে। শিক্ষাহীন মানুষের চিন্তার ক্ষেত্র হয় খুবই সীমাবদ্ধ। শিক্ষা না থাকলে মানুষ বড় কিছু ভাবতে সক্ষম হয় না। অনেক সময় দেখা যায় আমাদের সমাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের শিক্ষা গ্রহণের অধিকার বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। শিক্ষালাভের অধিকার বাধাপ্রাপ্ত হলে চিন্তার স্বাধীনতাও বাধাপ্রাপ্ত হয়। তাই চিন্তার স্বাধীনতার অধিকার রক্ষার প্রশ্ন আসে।

দ্বিতীয়ত, উন্নত সাহিত্য মানুষের চিন্তার জগৎকে আন্দোলিত করে, যেমন মার্কসীয় সাহিত্য এক সময় বিশ্বব্যাপী তরুণ যুব সমাজের মনোজগতে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। অনেক সময় দেখা যায় অনেক দেশে এ জাতীয় সাহিত্যের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়। সাহিত্য প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা যদি মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করা হয় তাহলে সাহিত্য পাঠের নিষেধাজ্ঞা হবে চিন্তার স্বাধীনতা হরণ। কেননা সাহিত্য পাঠে বাধা মানুষের স্বাধীন চিন্তার স্রোতকে বাধা দেওয়ারই নামান্তর। এই বিষয়টি প্রায়ই ঘটে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অজুহাতে। তাই চিন্তার স্বাধীনতার অধিকারের প্রশ্নটি এসে যায়।

তৃতীয়ত, শিল্প সংস্কৃতি বিভিন্ন শাখা, মাধ্যম বা উপকরণ মানুষের চিন্তার ক্ষেত্র প্রসারিত করে। শিল্প সংস্কৃতির চর্চা বাধাপ্রাপ্ত হলে চিন্তার স্বাধীনতা বাধাপ্রাপ্ত হয়। শিল্প সংস্কৃতি বিকাশের পথ রুদ্ধ হলেও চিন্তার স্রোতে বাধা পড়ে। এই যে শিল্প সংস্কৃতি চর্চা ও বিকাশের পথ এটাও বাধাপ্রাপ্ত হয়, বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সমাজে। তাই চিন্তার স্বাধীনতার অধিকারের প্রশ্নটি না এসে পারে না।

অনেকে মনে করেন চিন্তা করার স্বাধীনতা মানে চিন্তাকে প্রকাশ করার স্বাধীনতা। তাদের মতে, চিন্তা যদি প্রকাশ না পায় তাহলে সে চিন্তা অর্থহীন আর প্রকাশ করতে গেলে সেখানে স্বাধীনতার প্রশ্নটি এসে যায়। আমরা চিন্তা প্রকাশের স্বাধীনতাকে মত প্রকাশের স্বাধীনতা হিসেবে বিবেচনা করবো এবং সে বিষয়টি অন্য অনুচ্ছেদে আলোচ্য বিষয়। তাই এখানে আমরা মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে চিন্তার স্বাধীনতার সাথে একাকার

www.pathagar.com

করে ফেলব না। মতামত নিশ্চয়ই চিন্তার ফসল । কিন্তু সকল চিন্তাই মতামতের জন্ম দেয় না।

চিন্তার স্বাধীনতা হরণ অমানবিক কেন?

মানুষকে বলা হয় সৃষ্টির সেরা জীব। অন্যান্য প্রাণির সাথে মানুষের একটি মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে এই যে, মানুষ চিন্তা করতে পারে। ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, কল্যাণ-অকল্যাণ ইত্যাদি সম্পর্কে ভাবতে পারে এবং ভাবে। চিন্তাভাবনা করার যে যোগ্যতা বা গুণ মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগতভাবে বিদ্যমান, সেই গুণ বা যোগ্যতা হরণ করা হলে মানুষ এবং ইতর প্রাণির মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। চিন্তার স্বাধীনতা হরণ করলে মানুষকে ঠেলে দেওয়া হয় পশুর কাতারে। তাই চিন্তার স্বাধীনতা হরণ করা অমানবিক কাজ।

মানুষ হিসেবে জন্ম নিলেই মানুষ হওয়া যায় না। মানুষ হওয়ার জন্য নিরন্তর সাধনা করতে হয়। চর্চা ও সাধনার মাধ্যমে মানবিকতার বিকাশ মানুষ হওয়ার পূর্বশর্ত। অবরুদ্ধ পরিবেশে, শোষণ নির্যাতনের অক্টোপাশ থেকে মানুষ হওয়া খুবই কঠিন। মুক্ত চিন্তার পরিবেশ মানুষ হওয়ার জন্য অত্যন্ত জরুরি। মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠার পক্ষে যত প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হতে পারে এর মধ্যে চিন্তার স্বাধীনতা হরণ অন্যতম তাই এটা অমানবিক কাজ।

মানব সভ্যতা একটি গতিশীল প্রক্রিয়ার নাম। যুগে যুগে সমাজ সংস্কারক, দার্শনিক, রাজনীতিক, চিন্তাবিদ তথা বিভিন্ন মনীষীদের চিন্তা সভ্যতাকে গতিদান করেছে, এগিয়ে নিয়ে এসেছে। উন্নত জীবনবোধসম্পন্ন মানুষের চিন্তার ফসল হচ্ছে ক্রমোন্নতিশীল এই মানব সভ্যতা। চিন্তার স্বাধীনতা হরণ করার অর্থই হচ্ছে সভ্যতাকে ব্যাহত করা। তাই চিন্তার স্বাধীনতার অধিকার হরণ মানবিকতার বিরুদ্ধ।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের আলোচ্য অনুচ্ছেদে চিন্তার স্বাধীনতার অধিকারের কথা বলা হয়েছে। মানুষকে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে হলে এই অধিকারটি থাকতেই হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মূল আইন তথা সংবিধান "মৌলিক অধিকার" হিসেবে এটাকে সংরক্ষণের নিশ্চয়তা রয়েছে। কিন্তু তারপরও বাস্তব অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সময়ে সময়ে সামরিক আইন, জরুরি অবস্থা ইত্যাদি জারির মাধ্যমে চিন্তার স্বাধীনতাকে হরণ করা হয়। এশিয়া আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে রাজতন্ত্র, একদলীয় শাসন, একনায়কতন্ত্র, শেখতন্ত্র ইত্যাদির যাঁতাকলে চিন্তার স্বাধীনতা বিপন্ন হচ্ছে। এই দুরবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বিশ্বব্যাপী ব্যাপক

www.pathagar.com

জনমতগঠন অপরিহার্য, সেই সঙ্গে চিন্তার স্বাধীনতা যারা কেড়ে নেয় তাদের উপর প্রচণ্ড আন্তর্জাতিক চাপ প্রয়োগ করা জরুরি।

মুক্ত চিন্তার সুযোগ থাকলে মানুষ তার বর্তমান নিয়ে ভাবতে পারবে। তৈরি করতে পারবে একটি সুন্দর ভবিষ্যতের পরিকল্পনা। অকল্যাণকে বাদ দিয়ে কল্যাণকে গ্রহণ করতে হলে, মন্দকে পরিত্যাগ করে ভালকে বেছে নিতে হলে, অন্যায়কে প্রত্যাখান করে ন্যায়কে অবলম্বন করতে হলে মুক্ত চিন্তার স্বাধীনতা দরকার। মুক্ত চিন্তা মানুষকে সত্য অন্বেষণে সহায়তা করবে।

এই বিষয়টি উপলব্ধিতে আনতে হবে যে, আমি যেহেতু আমার নিজের চিন্তার স্বাধীনতা প্রত্যাশা করি, অন্য জনও তার অধিকার চাইবে। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তিকেই একে অপরের চিন্তার স্বাধীনতার অধিকারের নিশ্চয়তা বিধানে কার্যকরভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

বিবেকের স্বাধীনতার অধিকার

বিবেক কাকে বলে?

মনের মধ্যে যে অনির্বচনীয় শক্তিটি মানুষকে সৎকাজে উৎসাহ এবং অসৎকাজে নিরুৎসাহ প্রদান করে, সেটিই হচ্ছে বিবেক। যা ভাল কাজের জন্য মনের মধ্যে আনন্দ জাগায় এবং খারাপ বা মন্দ কাজের জন্য অনুশোচনার উদ্রেক করে তাই হচ্ছে বিবেক।

পশুরা ক্ষুধা পেলে খাদ্য যেখানেই পায় সেখান থেকে কেড়ে নিয়ে খায়। মানুষ তা করে না ; পশুরা যত্রতত্র তাদের দৈহিক জৈবিক চাহিদা মেটানোর জন্য যৌনকর্মে লিপ্ত হয় ; মানুষ তা করে না। পশুদের ন্যায় অন্যায়, কল্যাণ অকল্যাণ, ভাল মন্দ বোধ নেই, মানুষের আছে, কারণ মানুষ বিবেকসম্পন্ন প্রাণী। বিবেকবোধ মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে পৃথক করেছে, বিশেষত্ব দান করেছে।

বিবেক হচ্ছে একটি মানবিক গুণ। মানুষের কি করা উচিত, কি করা উচিত নয় এই বিষয়টি নির্ধারণে বিবেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভালমন্দ, ন্যায় অন্যায়, সত্যমিথ্যা, কল্যাণ-অকল্যাণ ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের মধ্যে একটি সর্বজনীন ধারণা প্রচলিত আছে। যিনি সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলবেন, যিনি ন্যায়কে ন্যায় এবং অন্যায়কে অন্যায় মনে করবেন তিনি বিবেকবান মানুষ। শান্তি স্থিতি প্রতিষ্ঠার জন্য পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে বিবেক মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে।

www.pathagar.com

বিবেকের স্বাধীনতা হরণ

বিবেক যদি একটি মানসিক বিষয় হয় তাহলে এর স্বাধীনতা হরণ করা হয় কিভাবে—এই প্রশ্নটি আসতে পারে। একটি ভাল কাজকে আপনি ভাল বলবেন। মন্দ কাজকে মন্দ বলবেন এতে আপনাকে বাধা দেবে কে? এতে আপনার বাহ্‌বা পাবারই কথা। কিন্তু না বাধা আসে। বিবেক স্বীকৃত কাজ করতে প্রতিনিয়তই বাধা আসছে, বাধা আসবে। আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিক থেকে চাপের সম্মুখীন হই। অন্যায়ের প্রতিবাদ না করতে, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানে, অসৎকর্মে প্রবৃত্ত হতে অনেক সময় আমাদেরকে বাধ্য করা হয়। আর্থিক সংকট তথা দারিদ্র্য, সামাজিক বা রাজনৈতিক চাপ এবং অন্যান্য বহুবিধ সমস্যা অনেক সময় মানুষকে বিবেকবর্জিত কাজ করতে বাধ্য করে। এখানেই বিবেকের স্বাধীনতা হয় পর্যুদস্ত। কর্মক্ষেত্রে অধস্তন ব্যক্তিবর্গ যখন তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নেকনজরে থাকার জন্য হরহামেসা মোসাহেবের ভূমিকা পালন করে, কোন কিছুতেই প্রতিবাদ করে না তখনই মনে হয় যে, ঐ ব্যক্তিবর্গ বিবেকের স্বাধীনতা হারিয়েছে। বিবেকের স্বাধীনতা না থাকলে, বিবেকের স্বাধীনতা অনুসৃত না হলে, সমাজের মানুষের প্রকৃত অবস্থাটা উপলব্ধি করা কঠিন হয়ে পড়ে। মানুষ যখন সত্যকে সত্য, মিথ্যাকে মিথ্যা বলে না তখন কোন কিছু সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়াটা, দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। বিবেকের স্বাধীনতা হরণের ঘটনা আমাদের সমাজে ঘটছে অহরহ।

বিবেক শব্দটি দ্বারা যদি আমরা moral sense তথা নীতিবোধ বা নৈতিক চেতনা বুঝি তাহলেও এর স্বাধীনতা হরণের প্রশ্নটি আসে। কারণ মানুষের মনে যে নীতিবোধ বা নৈতিক চেতনা জাগ্রত ও বিকশিত হয় সেটি তার পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। অপসংস্কৃতি, নীতিবোধ বা নৈতিকতা বিবর্জিত শিক্ষা, কুরুচিপূর্ণ সাহিত্য ও শিল্পকর্ম মানুষের নৈতিক চেতনায় আঘাত হানতে পারে এবং স্বাভাবিকভাবেই মানুষের বিবেকের স্বাধীনতা হরণের প্রশ্নটি তখন দেখা দিবে। মানুষের নীতিবোধ লালন ও বিকাশে যখন কোন দিক থেকে কোনভাবেই আক্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকে না তখনই বুঝতে হবে যে, বিবেকের স্বাধীনতা আছে। প্রতিকূল পরিবেশ আর বিরুদ্ধ পরিস্থিতির চাপে পড়ে বিবেকবান মানুষের বিবেকবোধও লোপ পেতে পারে। এ জাতীয় প্রতিকূল পরিবেশ আর বিরুদ্ধ পরিস্থিতি বিবেকের স্বাধীনতাকে হরণ করে।

www.pathagar.com

বিবেক যেহেতু একটি মানবিক গুণ এবং এটাকে হরণ করলে মানুষ ও পশুর মধ্যে তেমন পার্থক্য থাকে না সেহেতু বিবেকের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখা একটি মানবিক কাজ। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যদি বিবেকের স্বাধীনতা হরণ করে তবে সে একটি মৌল মানবিক অধিকার হরণ করল।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় আলোচ্য অনুচ্ছেদে বিবেকের স্বাধীনতার অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার

ধর্ম কাকে বলে?

ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার বিশ্লেষণের পূর্বে আমাদের দেখতে হবে ধর্ম কাকে বলে? সাধারণত ধর্ম বলতে কোন অদৃশ্য নিয়ন্ত্রক শক্তির—বিশেষত ঈশ্বর বা খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা বোঝায়। কিন্তু ব্যাপক অর্থে যে কোন ধরনের বিশ্বাস, পূজা বা আনুগত্যের নিয়মকানুনই ধর্ম। কিন্তু তারপরও ধর্মের যথার্থ সংজ্ঞা প্রদান অত্যন্ত দুরূহ বিষয়। কেউ কেউ বলেন যিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না অর্থাৎ নাস্তিক তারও ধর্ম আছে এবং সেটা হচ্ছে নাস্তিকতা। তাদের মতে, নাস্তিকতাও একটি ধর্ম।

কোন বিতর্কে না গিয়ে আমরা বলতে চাই যে, জনসাধারণ যাকে ধর্ম বলে গ্রহণ করেছেন তাই ধর্ম।

ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে—

(ক) ধর্ম বা ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তন করার স্বাধীনতা

(খ) একা বা অন্যের সঙ্গে সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে, প্রকাশ্যে বা গোপনে নিজ ধর্ম বা বিশ্বাস অভিব্যক্ত করার জন্য

—ধর্ম শিক্ষাদানের অধিকার

—ধর্ম অনুশীলনের অধিকার

—ধর্ম অনুষ্ঠানের অধিকার

—ধর্ম পালনের অধিকার।

(ক) ধর্ম বা ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তন :

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের নিজের উপলব্ধির পরিবর্তন হতে পারে। মানুষের বিশ্বাস ধ্যান ধারণার পরিবর্তন হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। মানুষের যেহেতু

www.pathagar.com

চিন্তা ও বিবেকের মত গুণ রয়েছে সেহেতু সে সর্বদাই সত্য অনুসন্ধানী হবে। এই অনুসন্ধান তার বিশ্বাসে পরিবর্তন আনতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। পশুর নিজের কোন বিশ্বাস নেই, তার বিশ্বাস পরিবর্তনের প্রশ্নই উঠে না। মানুষই একমাত্র প্রাণী যে বিশ্বাস বা অবিশ্বাসকে অবলম্বন করে এবং তার বিশ্বাস বা অবিশ্বাস পরিবর্তনশীল, সেহেতু ধর্ম বা ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তনের স্বাধীনতার অধিকার মানবিক অধিকার। ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা যেমনি একটি অমানবিক কাজ, ধর্ম বর্জন বা পরিবর্তনে বাধ্য করাও একটি অমানবিক কাজ।

(খ) ধর্মশিক্ষা দানের স্বাধীনতা

যে যে ধর্মে বিশ্বাস করে বা ধর্ম মেনে চলে অন্যদেরকে সেই ধর্ম বা ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে জ্ঞান ও শিক্ষা প্রদান করতে পারে। তবে কাউকে জোর জুলুম বা জবরদস্তিমূলকভাবে কিছু শিক্ষা দেওয়া যাবে না। ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের বিষয়টি একক বা সম্মিলিতভাবে প্রকাশ্যে বা গোপনে হতে পারে। ধর্মপালনের জন্য ধর্মশিক্ষা গ্রহণ অপরিহার্য। ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ধর্ম পালনে বাধা প্রদানেরই নামান্তর।

ধর্ম অনুশীলনের স্বাধীনতা

যে যে ধর্ম বিশ্বাস করে সেই ধর্ম অনুশীলন ও চর্চার স্বাধীনতা তার মৌলিক অধিকার। শুধু বিশ্বাস পোষণের অধিকার দিয়ে সেই বিশ্বাসকে বাস্তবে চর্চার অধিকার না দিলে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই ধর্ম অনুশীলন করা, ধর্ম চর্চা করা এবং ধর্মকে অভ্যাসে রপ্ত করার স্বাধীনতা প্রত্যেকের মৌলিক মানবিক অধিকার। ধর্ম অনুশীলনের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা আর ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা একই কথা।

ধর্ম অনুষ্ঠানের স্বাধীনতা

অধিকাংশ ধর্মেরই কিছু আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে , যা সেই ধর্মবিশ্বাসের অংশ। ধর্মবিশ্বাসকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে সেই সব অনুষ্ঠান পালন করতে হয়। অধিকাংশ প্রধান প্রধান ধর্মই শুধু বিশ্বাসের উপর চলে না, কিছু আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলতে হয়। এই সব ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা—যেমন পূজা, উপাসনা ইত্যাদি প্রতিপালনের আর ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা একই বিষয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের স্বাধীনতা না থাকলে ধর্মের স্বাধীনতার কোন অর্থ হয় না।

www.pathagar.com

পশুপাখির ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের দরকার পড়ে না। মানুষই ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করে। তাই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের স্বাধীনতার অধিকারটি মানবিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

ধর্মপালনের স্বাধীনতা

এক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন, ধর্মীয় ব্রতাদি পালন, ধর্মীয় উৎসব পালন ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে প্রকাশ্যে, গোপনে ধর্ম পালনের অধিকার প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার। এই অধিকার হরণ করার অর্থ হচ্ছে তার মানবিক অধিকার হরণ করা।

বস্তুত, মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা অর্থাৎ স্বাধীনভাবে ধর্মবিষয়ক শিক্ষাদান, অনুশীলন, অনুষ্ঠান ও পালন পরস্পরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটি অধিকার হরণ করলে অন্যগুলো অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারটি অত্যন্ত ব্যাপক। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আইন ও সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। এবারে আমরা বিভিন্ন দেশের সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারটি কিভাবে দেখা হয়েছে তা উল্লেখ করবো।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত চিন্তা বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতার প্রতিফলন ঘটেছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ ও ৪১ অনুচ্ছেদে। বাংলাদেশের সংবিধানে এগুলোকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। নিম্নে ৩৯ ও ৪১ অনুচ্ছেদে সংশ্লিষ্ট অংশ উদ্ধৃত করা হল।

৩৯। (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।

৪১. (১) আইন জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতাসাপেক্ষে

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে।

(খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে।

(২) কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম সংক্রান্ত না হইলে তাহাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না।

www.pathagar.com

সাধারণ আলোচনা

বাংলাদেশের সংবিধানের ৪১ অনুচ্ছেদে ধর্মীয় স্বাধীনতা যে মৌলিক অধিকার বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য সংবিধান সংরক্ষণ করেছে তা বর্ণিত হয়েছে। ধর্মীয় ব্যাপারে এই অনুচ্ছেদ তিনটি অধিকারের ঘোষণা দিয়েছে। (১) প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম পালন বা প্রচারের অধিকার, (২) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনের অধিকার, (৩) নিজস্ব ধর্মসংক্রান্ত না হলে ধর্মীয় শিক্ষা অনুষ্ঠান বা উপাসনায় যোগদান করার অধিকার। অবশ্য এই তিনটি অধিকার আইন জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতাসাপেক্ষ।

প্রথমেই বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্ম কাকে বলে এ বিষয়ে খানিকটা আলোকপাত করা যাক। সংবিধানে ধর্মের কোন সংজ্ঞা দেওয়া হয় নি। সাধারণভাবে ধর্ম বলতে আমরা ইসলাম, খ্রিষ্টান, ইহুদি, হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতিকে বুঝি কিন্তু বাহ্যত এদের মধ্যে মৌলিক কোন ঐক্য দেখা যায় না। এমন কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য নেই যার মাপকাঠিতে পড়লেই ধর্ম বলা যাবে। ঈশ্বরের প্রতি আস্থা যদি ধর্ম হয় তাহলে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মকে ধর্ম বলা যায় না কারণ তারা নিরীশ্বরবাদী। একত্ববাদ যদি ধর্ম হয় তবে খ্রিষ্টান ও হিন্দুদের ধার্মিক বলার অবকাশ নেই। জনৈক ইংরেজ দার্শনিক বলেছেন ঈশ্বরের উপাসক সকল মানুষই ধার্মিক একথা ঠিক নয়। তবে দার্শনিক মতবাদ আমাদের বিবেচ্য বিষয় নয়।

অস্ট্রেলিয়ার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি লাথাম বলেন, "মানুষের ইতিহাসে ধর্ম সম্পর্কে ধারণার বিবর্তন প্রায় বৈপ্লবিক। ইউরোপীয়ানগণ মানুষের সহিত মহাপ্রভুর সম্পর্ককে ধর্ম মনে করেন কিন্তু বৌদ্ধরা কোন মহাপ্রভুকে বিশ্বাস করে না। এমন অনেক ধর্ম আছে যারা বিশেষভাবে এবং বিশেষ ধরনের পোশাক পরে এবং বিশেষ রীতি অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করে এবং এগুলোকে তারা ধর্ম বলে চিহ্নিত করে। সত্য বলতে কি প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজস্বভাবে তাদের ধর্মের উপাদান গড়ে নেয়। আদালতের পক্ষে এর কোন একটি উপাদানকে ধার্মিকতা না বলা শোভন নয়। এ্যানাব্যাপ্টিস্টগণ শপথ নেয় না, আদালতে উপস্থিত হতে অস্বীকৃতি জানায়, অস্ত্রধারণ করে না এবং সকল সরকারকে খ্রিষ্টবিরোধী বলে মনে করে। এই সম্প্রদায়কে ধর্মহীন মনে করা অনুচিত। জাপানের শিন্টো ধর্মে সম্রাটকে ঈশ্বর মনে করা হয়। কোরবানি বা পশু উৎসবও অনেক ধর্মের অঙ্গ। এগুলোর কোনটিকে ধর্ম বহির্ভূত কাজ বলে আদালত মনে করতে পারেন না।

অতঃপর বিচারপতি লাথাম বলেন, সকল ধর্মকে পূর্ণভাবে সংরক্ষণ করতে গেলে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় থাকে না। অতএব ধর্মের সংজ্ঞা নির্ধারণ কঠিন ব্যাপার।

www.pathagar.com

আমি মনে করি, যে মানব গোষ্ঠীকে যে ধর্মাবলম্বী মনে করা হয় তারাই সেই ধর্মাবলম্বী। যারা যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, সে সেই পরিবারের ধর্মের অনুসারী। অন্যভাবে বলা যায় জনসাধারণ যে বিষয়টিকে ধর্ম বলে মনে করে সেটিই ধর্ম। যারা ঈশ্বরকে স্বীকার করে না তাদেরও ধর্ম আছে।

ধর্ম সম্পর্কে আমার ধারণা পেশ করলাম। এবার প্রথম অধিকারটি নিয়ে আলোচনা করা যাক। নামাজ পড়ার, পূজা করার, মস্‌জিদ মন্দির বা গির্জায় যাওয়ার এবং নামাজ, পূজা বা প্রার্থনা প্রচার করার অধিকার মৌলিক।

তবে ধর্মীয় স্বাধীনতার এই অধিকার আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষ। ধর্মীয় কোন কাজ যদি আইন জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা ভঙ্গ করে, তবে তা সংবিধান দ্বারা সংরক্ষিত হয় না। প্রাসঙ্গিকবোধে মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের কিছু সিদ্ধান্ত উদ্ধৃতি দেওয়া যায়। সেখানে কোন নারী বা পুরুষ তাদের স্বামী বা স্ত্রী থাকতে পুনর্বার বিয়ে করতে পারেন না। যদিও কোন কোন সম্প্রদাসের ধর্মে বহুবিবাহ অনুমোদিত তবুও তারা বহুবিবাহের অনুমতি পায় নি। এই প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট বলেন, মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং অভিমত আদালতের উর্ধ্বে কিন্তু তারা ধর্মপালন করতে গিয়ে যে সব কাজ করে তা আইনের উর্ধ্বে নয়। নরবলি কোন ধর্মে সিদ্ধ হলেও তা কোন সরকার স্বীকার করে নিতে পারে না। অতিপ্রাকৃতিক বা আধিভৌতিক শক্তির দ্বারা রোগ নিরাময় করাও আইন দ্বারা বন্ধ করা যেতে পারে। টীকা নেওয়ার জন্য আইন করা যায়।

অন্যকে আঘাত করে নিজ নিজ ধর্ম পালন করার অধিকার কারো নেই। বাংলাদেশের সংবিধানে যে সব মৌলিক অধিকার বিধৃত, সেগুলো ধর্মীয় স্বাধীনতার অজুহাতে ভঙ্গ করা যায় না। ধর্মের ব্যাপারে বৈষম্য সংবিধান নিষেধ করেছে। সাধারণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান যা অন্যকে আঘাত করে না, তাতে পূর্ণ স্বাধীনতা সকলেরই আছে। হিন্দু, পূজা আহ্নিক করবে, খ্রিষ্টান রোববারে গীর্জায় যাবে, মুসলমান নামাজ পড়বে—এতে কেউ বাধা দিতে পারবে না। কিন্তু এর বাইরে অন্যান্য সব আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার অধীন।

এবার দ্বিতীয় অধিকার নিয়ে আলোচনা করা যায়। ধর্মীয় সম্প্রদায় বলতে সাধারণত কেন বিশেষ ধর্মাবলম্বী লোকসমষ্টিকে বোঝায়। এই উপমহাদেশের উচ্চ আদালতসমূহের মতে, হিন্দুরা একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং মুসলমানরা একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়। উপসম্প্রদাসেয়র উদাহরণ দেওয়া যায় হিন্দুদের শাক্ত ও বৈষ্ণব দ্বারা এবং

www.pathagar.com

মুসলমানদের হানাফী এবং শাফেয়ী দ্বারা। প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং উপসম্প্রদায় ওয়াক্ফ ট্রাস্ট বা দেবোত্তরের মাধ্যমে বা অন্যভাবে নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষণ ও পরিচালনা করতে পারে।

এবারে দেখা যাক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারটি। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন মুসলমানকে কোন হিন্দুর পূজায়, বা হিন্দুকে কোন মুসলমানের মিলাদে অংশগ্রহণ করতে বলা যাবে না। এই নিরাপত্তা শুধু সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নয়, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রযোজ্য।

তবে এই অধিকার আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার অধীন।

ধর্মীয় স্বাধীনতা আইনের অধীন, একথা বলার অর্থ কি? ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে হলে তা আইনের মাধ্যমে করতে হবে। নির্বাহী আদেশ দ্বারা ধর্মীয় ব্যাপারে কোন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যায় না। তবে যে আইন দ্বারা এই নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হবে তা সংবিধানের বিধান অনুযায়ী জারিকৃত হতে হবে। এবং সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত অন্যান্য মৌলিক অধিকারের সাথে অসামঞ্জস্য আইন করা যাবে না। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ব্যাপারে রাষ্ট্র আইন করতে পারবে। ওয়াক্ফ আইন এর অন্যতম উদাহরণ।

জনশৃঙ্খলার স্বার্থে ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। মহররমের সময় তাজিয়াসহ মিছিল করা নিঃসন্দেহে একটি ধর্মীয় অধিকার। কিন্তু ইহা জনশৃঙ্খলার কারণে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আইন দ্বারা অধিকারপ্রাপ্ত হয়ে সরকার বলে দিতে পারবে কোন পথে মিছিল চলবে। পূজার সময় হিন্দুরা বাজনা বাজাবার অধিকার রাখে এবং বাজনাসহ তারা মিছিল করতে পারবে। কিন্তু জনশৃঙ্খলার কারণে ঐ মিছিলকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

রাষ্ট্রের দায়িত্ব রয়েছে জনগণের মধ্যে বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে নিরাপত্তার ভাব জাগ্রত করা। নানাপ্রকার এবং বিভিন্ন ধরনের আইনের মাধ্যমে তারা জনশৃঙ্খলা বজায় রাখার প্রয়াস পায়। জনশৃঙ্খলার মধ্যে জননিরাপত্তা ও জনস্বার্থ অন্তর্ভুক্ত। জনশৃঙ্খলা নষ্ট করে বা খর্ব করে বা ভঙ্গ করে এমন কোন কাজ ধর্মের অনুমোদনে করা হলেও তা নিয়ন্ত্রণযোগ্য। আমার ধর্ম ভাল—একথা বলতে দোষ থাকবে কথা নয় কিন্তু অন্য ধর্ম একেবারেই তুচ্ছ সুতরাং অবজ্ঞেয় এমন ঘোষণা আইনসম্মত নয়। ধর্মীয় স্বাধীনতা নৈতিকতার স্বার্থে ও নিয়ন্ত্রণের যোগ্য। নৈতিকতার সাথে শালীনতার যোগ অবিচ্ছেদ্য। নারী পুরুষের অবাধ মিলন, দিগম্বর অবস্থায় বিচরণ প্রভৃতি যদি ধর্মগতভাবে কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুমোদিত হয় তবুও তা আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

ধর্মীয় স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার সম্বলিত এই অনুচ্ছেদটি সংবিধানে পূর্বাপর একই অবস্থায় বিদ্যমান আছে। ১৯৭৮ সালে দ্বিতীয় ঘোষণাপত্র আদেশ নং ৪-এর দ্বিতীয় তফসিল বলে সংবিধানের আট (৮) অনুচ্ছেদে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা হয়, তার ফলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপরিচালনার চারটি মূলনীতির প্রথম স্থানে স্থাপিত হয় আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস এবং বলা হয় আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হবে যাবতীয় কার্যাবলির ভিত্তি। এই পরিবর্তনের পরও আলোচ্য অনুচ্ছেদ (৪১) অক্ষত রয়ে গেছে।

প্রশ্ন হচ্ছে সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার স্থলে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন প্রতিস্থাপিত হওয়ার পর রাষ্ট্র কর্তৃক ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ হতে পারে কিনা।

আমি এ বিষয়ে কতিপয় ইসলামি চিন্তাবিদগণের সাথে আলোচনা করেছি। তারা বলেছেন, 'আল্লাহর উপর আস্থার' সাথে ধর্মীয় স্বাধীনতার কোন বিরোধ নেই। ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলমান থাকতে পারে এবং তারা তাদের ধর্ম অবলম্বন, পালন এবং নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে। তাদের কথা বলার, বই পুস্তক লেখার, ছাপাবার এবং সভাসমিতি করার অধিকার রয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদে ধর্মের কারণে সকল প্রকার বৈষম্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ২৯ অনুচ্ছেদে সরকারি কর্মে নিয়োগের ব্যাপারে ধর্মের কারণে বৈষম্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এ সকল অনুচ্ছেদের সাথে ৪১ অনুচ্ছেদ মিলিয়ে দেখলে বুঝা যাবে যে, বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার রক্ষার সকল প্রকার নিশ্চয়তা বিদ্যমান রয়েছে।

ভারতীয় সংবিধানে

Article 25. (1) Subject to public order, morality and health and to the other provisions of his part, all persons are equally entitled of freedom of conscience and the freely to profess, practice and propagate religion.

(2) Nothing in this article shall effect the operation of any existing law or prevent the State from making any law--

www.pathagar.com

(a) regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice ;

(b) providing for social welfare and reform or the throuwing open of Hindu religious institution of a public character to all classes and sections of Hindus.

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে

The first Amendment to the constitution (1791) says--

"Congress shall make no law respecting an establishment of religion or ...prohibiting the free exercise thereof."

অস্ট্রেলিয়ার সংবিধানে

S. 116.

"The commonwealth shall not make any law for establishing or for imposing any religious observance, or for prohibiting the free exercise of any religion, and no religious test shall be required as a qualification for any office or public trust under the Commonwealth."

সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানে (অধুনালুপ্ত)

Article 124. (1936)

"Freedom of religious worship and freedom of anti-religious propaganda is recognised for all citizens.

ফ্রান্সের সংবিধানে

"No one ought to be disturbed on account of his opinion, even religious, provided their manifestation does not derange the public order established by law."

www.pathagar.com

জাপানের সংবিধানে

"Freedom of religion is guaranteed to all ... No person shall be compelled to take part in any religious act, celebration, rite or practice.

পশ্চিম জার্মানির সংবিধানে

"1. Freedom of faith and conscience and freedom of religious and ideological (weltanschauliche) profession shall be inviolable.

2. Undistrubed practice of religion shall be guaranteed.

3. No one may be compelled against his conscience to perform war service as a combatant. Details shall be regulated by a federal law."

মানবিক অধিকারসংক্রান্ত ইউরোপীয় কনভেনশন

সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রের অনুচ্ছেদ ঃ ১৮–এর প্রতিফলন ঘটেছে মানবিক অধিকার সংক্রান্ত ইউরোপীয় কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ঃ ৯–এ। প্রাসঙ্গিক বিধায় অনুচ্ছেদটি নিম্নে উল্লেখ করছি।

অনুচ্ছেদে ঃ ৯

(১) প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তা বিবেক এবং ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার আছে। এই অধিকারের মধ্যে তাঁহার ধর্ম অথবা বিশ্বাস পরিবর্তন করার স্বাধীনতা, এবং এককভাবে বা অন্যান্যের সহিত সমষ্টিগতভাবে এবং প্রকাশ্যে অথবা গোপনে অর্চনা, শিক্ষাদান, অনুশীলন ও প্রতিপালনের মাধ্যমে নিজ ধর্ম অথবা বিশ্বাস ব্যক্ত করার স্বাধীনতা অন্তর্ভুক্ত।

(২) কোন ব্যক্তির নিজ ধর্ম অথবা বিশ্বাস ব্যক্ত করার স্বাধীনতা কেবল আইনের দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হয় সেইরূপ এবং একটি গণতান্ত্রিক সমাজে জননিরাপত্তার স্বার্থে, জনশৃঙ্খলা, জনস্বাস্থ্য অথবা নৈতিকতা সংরক্ষণ অথবা অন্যান্যের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যেরূপ প্রয়োজন সেরূপ সীমাবদ্ধতার অধীন হইবে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের প্রাসঙ্গিক আইন

ধর্মসম্পর্কিত অপরাধ সংক্রান্ত দণ্ডবিধির ধারাসমূহ

ধারা ২৯৫।

কোন শ্রেণীবিশেষের ধর্মের প্রতি অবমাননা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে উপাসনালয়ের ক্ষতিসাধন করা বা উহা অপবিত্র করা। যে ব্যক্তি এইরূপ অভিপ্রায়ে বা এইরূপ অবগতি সহকারে জণগণের যে কোন শ্রেণীর উপাসনালয় বা উক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক পবিত্র বলিয়া বিবেচিত কোন বস্তু ধ্বংস, অনিষ্ট বা অপবিত্র করে যে, তদ্বারা সেই জনগণের যে কোন শ্রেণীর ধর্মের প্রতি অবমাননা করিবে বা জনগণের যে কোন শ্রেণীর অনুরূপ ধ্বংস, অনিষ্ট বা অপবিত্রকরণকে তাহাদের ধর্মের প্রতি অবমাননা বলিয়া বিবেচনা করার সম্ভাবনা রহিয়াছে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ধারা ২৯৫-ক।

কোন শ্রেণীবিশেষের ধর্ম বা ধর্মীয় বিশ্বাসকে অবমাননা করিয়া উহার অনুভূতিতে কঠোর আঘাত হানার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত বিদ্বেষাত্মক কার্যসমূহ। —যে ব্যক্তি, বাংলাদেশের নাগরিকদের যে কোন শ্রেণীর ধর্মীয় অনুভূতিতে কঠোর আঘাত হানিবার অভিপ্রায়ে স্বেচ্ছাকৃত ও বিদ্বেষাত্মকভাবে কথিত বা লিখিত শব্দাবলির সাহায্যে বা দৃশ্যমান কল্পমূর্তির সাহায্যে উক্ত শ্রেণীর ধর্ম বা ধর্মীয় বিশ্বাসকে অবমাননা করে বা অবমাননা করার উদ্যোগ করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ধারা – ২৯৬।

ধর্মীয় সমাবেশে গোলমাল সৃষ্টি করা—

যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে উপাসনা বা ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানে আইনানুগভাবে নিয়োজিত কোন সমাবেশে গোলমান সৃষ্টি করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ধারা–২৯৭।

গোরস্তান ইত্যাদিতে অনধিকার প্রবেশ—

যে ব্যক্তি, কোন ব্যক্তির অনুভূতিতে আঘাত হানবার বা কোন ব্যক্তির ধর্মকে অবমাননা করিবার অভিপ্রায়ে বা তদ্বারা কোন ব্যক্তির অনুভূতি আহত হইবার সম্ভাবনা

www.pathagar.com

রহিয়াছে বা কোন ব্যক্তির ধর্ম অবমানিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে এইরূপ অবগতি সহকারে ;

কোন উপাসনালয় বা সমাধিস্থানে বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের জন্য বা শবাগার হিসাবে স্বতন্ত্রভাবে রক্ষিত কোন স্থানে অনধিকার প্রবেশ করে অথবা কোন মানুষের মৃতদেহের প্রতি অবমাননা করে বা অন্ত্যেষ্টিক উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য সমবেত ব্যক্তিবর্গের প্রতি ব্যাঘাত ঘটায় :

সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ধারা–২৯৮।

ইচ্ছাকৃতভাবে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানিবার জন্য শব্দসমূহ ইত্যাদি উচ্চারণ করা।

যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তির ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানিবার অভিপ্রায়ে উক্ত ব্যক্তির শ্রুতিগোচর কোন শব্দ উচ্চারণ করে বা আওয়াজ দেয় বা উক্ত ব্যক্তির দৃষ্টিগোচরে কোন অঙ্গভঙ্গি করে বা উক্ত ব্যক্তির দৃষ্টিগোচরে কোন বস্তু রাখে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ এক বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

সারসংক্ষেপ

ধর্ম সংজ্ঞার উর্ধ্বে। মন নিয়ে ধর্মের কারবার। মানব মন বিচিত্র। তাই ধর্মের ধারণাও বিচিত্র। যদি বলি ঈশ্বরই ধর্মের ভিত্তি অর্থাৎ যেখানে ঈশ্বর নেই সেখানে ধর্ম নেই তাহলে সত্য ভাষণ হবে না। বৌদ্ধদের একটি বিরাট অংশ নিরীশ্বরবাদী। কিন্তু তাই বলে বৌদ্ধ ধর্ম যে ধর্ম নয়, এমন কথা বলা যায় না।

এইসব জটিলতার মধ্যেও ধর্মের পরিচয়ের একটি সাধারণ সূত্র বের করা যায়। যে দল গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় যেসব আচার সংস্কার বা বিশ্বাসকে তাদের ধর্ম বলে মনে করে সেটাই তাদের ধর্ম।

কোন ধর্মের মধ্যে জন্মলাভ করে সেই ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা কিংবা নতুন কোন ধর্ম গ্রহণ করা কিংবা গ্রহণের পর একটিকে বর্জন করে অন্যটিতে আশ্রয় করা, একাজগুলি মানুষের চিন্তার বিবেকের এবং বিশ্বাসের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। এই অধিকার এক প্রকার স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা থেকে কাউকে বঞ্চিত করা অনুচিত। এটি তাই একটি মানবাধিকার।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

প্রত্যেক ব্যক্তির মতামত ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার আছে ; এই অধিকারের মধ্যে, কোনরূপ হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে মতামত পোষণের অধিকার এবং যে কোন বাহনের মাধ্যমে ও সীমান্ত নির্বিশেষে তথ্য ও ভাবধারণা অন্বেষণ করা, গ্রহণ করা ও প্রদান করার স্বাধীনতা অন্তর্ভুক্ত।

(Article : 19 Everyone has the right to freedom of opinion and expression ; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.)

ভাষ্য

আলোচ্য অনুচ্ছেদের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে মতামত ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার। এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ঃ

(ক) কোন হস্তক্ষেপ ব্যতীত মতামত পোষণের অধিকার।

(খ) যে কোন বাহনের মাধ্যমে ও সীমান্ত নির্বিশেষে

(১) তথ্য ও ভাব-ধারণা অন্বেষণ করার অধিকার

(২) তথ্য ও ভাব-ধারণা গ্রহণ করার অধিকার

(৩) তথ্য ও ভাব-ধারণা প্রদান করার অধিকার

এই অনুচ্ছেদে যথার্থভাবে অনুধাবন করতে হলে আমাদেরকে মতামত, ভাব-ধারণা, তথ্য, মতামত প্রকাশের মাধ্যম ইত্যাদি সম্পর্কে প্রথমেই আলোচনা করতে হবে।

www.pathagar.com

মতামত

আধুনিক কালে মতামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশ্বের যে সব রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু আছে, সেসব দেশের শাসকগণ জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করতে পারেন না। আর জনগণের মতামত অর্থই হচ্ছে ব্যক্তিবর্গের মতামত। এক সময়কার উপেক্ষিত জনগণ আজ রাজনৈতিক ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত। জনগণের মতামত বর্তমানে প্রশাসকদের জন্য খুবই বিবেচনার বিষয়। তাই দেখা যায়, পৃথিবীর উন্নত এবং শীর্ষস্থানীয় রাষ্ট্রসমূহের জাতীয় নির্বাচনে জনমত জরিপ করা হয়। জরিপের রিপোর্ট নির্বাচনকে বেশ প্রভাবিত করে কারণ নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্তে যারা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন জরিপের ফলাফল তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। এক্ষেত্রে মতামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

বর্তমানে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রায় অকার্যকর। জাতীয় রাষ্ট্রের পরিধি বৃদ্ধি এবং জনসংখ্যার আধিক্য প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের পরিবর্তে পরোক্ষ এবং প্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত করেছে। জনগণ তাদের মতামত প্রদান করে তাদের মধ্য থেকে প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। যারা প্রতিনিধি তাদেরকে জনগণের মতামতের ভিত্তিতে চলতে হয়। অতএব রাষ্ট্র পরিচালনায় মতামতের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশাসক বা সরকারের কাজ হচ্ছে, জনগণের ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করা। জনগণের ইচ্ছা তাদের মতামতের ভিত্তিতে প্রকাশিত হয়। জনগণের একক হচ্ছে ব্যক্তি, অতএব জনগণের মতামতের অর্থ হচ্ছে ব্যক্তির বা ব্যক্তি সমষ্টির মতামত। তাই আধুনিক কালে রাষ্ট্র শাসন ও পরিচালনায় মতামতের তোয়াক্কা না করে এগোনার কোন উপায় থাকা উচিত নয়।

মতামত কাকে বলে, তা যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে দেখবো যে, কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে কোন ব্যক্তির অভিপ্রায়, ইচ্ছা, বক্তব্য, অভিমত, মন্তব্য, মনোভাব ইত্যাদিকে আমরা মতামত বলতে পারি। মতামত প্রকাশিত হতে পারে আবার অপ্রকাশিতও হতে পারে । যদি কেউ তার মতামত প্রকাশ না করে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলবো মতামত পোষণ করা।

মানুষ যদি জড়বুদ্ধি না হয় তাহলে তার জানার পরিধির আওতায় যে কোন বিষয়ে তাঁর মতামত থাকা স্বাভাবিক। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে মেয়েদের মতামতের রাজনৈতিক গুরুত্ব যদিও নেই, তথাপি তা অন্যান্যের মতামতকে প্রভাবিত করতে পারে।

জ্ঞান, চিন্তা, বুদ্ধি এবং বিবেকের সমন্বয়ে মতামতের উদ্ভব হয়। মানুষের সামনে যখন কোন বিষয় উপস্থাপন করা হয় তখন সেই বিষয় সম্পর্কে ঐ ব্যক্তির যত জ্ঞান আছে তা মুহূর্তেই তার মনের মধ্যে সক্রিয় হয়ে উঠে। বিষয়টি নিয়ে তিনি চিন্তাভাবনা করেন। এক্ষেত্রে তিনি নিজের বিবেক ও বুদ্ধিকে কাজে লাগান।

এরপর বিষয়টি সম্পর্কে তার যে মনোভাব বা অভিপ্রায় জন্মে সেটাই তার মতামত। মতামত ব্যক্তিত্বের অন্যতম অভিব্যক্তি। যে মানুষ কোন কিছু নিয়ে ভাবে না ; জীবন জীবিকা, সমাজ সংসার নিয়ে যার কোন চিন্তা নেই, স্বভাবতই তার কোন মতামত থাকে না।

www.pathagar.com

কিন্তু সচেতন মানুষ মাত্রই প্রতিটি বিষয়ে নিজে একটা মত পোষণ করে, সেই মত প্রকাশ করে, অন্যকে মত প্রদান করে। একটি বিষয়ে অনেকের মত যখন এক হয় তখন তা জনমতে রূপ নেয়। রাষ্ট্রপরিচালনা, সরকার গঠন, আইন শাসন ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই মতামত খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

মতামত বিষয়টি এমন যে, তা কোন কিছুকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। যেমন একজন ব্যক্তি একটি বিশেষ পদের জন্য উপযুক্ত কিনা—এই বিষয়ে মতামত। অথবা একটি বিশেষ জায়গায় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দরকার আছে কিনা—সে বিষয়ে ব্যক্তির মতামত। আবার এও মতামত হতে পারে যে, একটি বিশেষ ঘটনা দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করে তোলে। এ অবস্থায় সরকারের ' 'দত্যাগ করা জরুরি কিনা। এমনি রকম আরো বহু বিষয় আছে, যেগুলো সম্পর্কে ব্যক্তির মতামত থাকতে পারে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিকসহ প্রত্যেকটি বিষয়ে ব্যক্তির অভিমতই হচ্ছে তার মতামত।

মতামত বিষয়টি ব্যক্তি স্বাধীনতার সাথে ওতোপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। মতামতের মধ্য দিয়েই ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা ব্যক্ত হয়। কোন ব্যক্তিকে যদি কোন বিষয়ে মতামত পোষণ করতে, প্রকাশ করতে, প্রদান করতে বাধা দেওয়া হয় তাহলে প্রকারান্তরে তার ব্যক্তি স্বাধীনতাকেই হরণ করা হয়। তাছাড়া ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ, তার সামাজিক চেতনাবোধ, মানবিক বৃত্তির উৎকর্ষ ইত্যাদিকে অব্যাহত রাখতে মতামতকে প্রাধান্য দিতে হবে। স্বাধীনভাবে মত পোষণ, প্রকাশ, প্রচার ও ধারণের অধিকার বাস্তবায়িত হলেই ,কোন ব্যক্তি প্রকৃত মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে পারবে। কোন বিষয়ে সকলের মতামত এক ও অভিন্ন হবে এটা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি সব বিষয়ে সকলের মধ্যে ভিন্নমত থাকবে তাও ঠিক নয়। মতামত যাই হোক, ব্যক্তির মতামতকে শ্রদ্ধা জানাতে হবে, কেননা কারো মতামতকে শ্রদ্ধা জানানোর অর্থ সেই ব্যক্তিকেই শ্রদ্ধা জানানো।

মতামত প্রকাশ

মানুষ তার অতীত, সমকালীন সমাজ এবং ভবিষ্যত বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে। দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি নিয়েও ভাবে। এই ভাবনাচিন্তার ফলে প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে ব্যক্তির অভিমত গড়ে উঠে। ব্যক্তির মনের মধ্যে যে ভাব ও মত জাগ্রত হয় তা অপরের শ্রুতি বা দৃষ্টিগোচর হওয়ার জন্য কোন উপায়ে উপস্থাপন করাই হচ্ছে মতামত ও ভাব প্রকাশ। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে ব্যক্তির মতামতের গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যক্তির মতামত যদি প্রকাশ না করে, তার মনের মধ্যেই উপ্ত থাকে তাহলে এই মতামত অপরকে স্পর্শ করে না এবং এই জাতীয় মতামতের তেমন গুরুত্বও নেই। কিন্তু যখনই কোন ব্যক্তিং মতামত প্রকাশিত হয় তখন তা অন্যান্য ব্যক্তির মনে রেখাপাত করে, এতে অন্যান্য ব্যক্তির মতামত প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হয়। যখন একটি বিষয়ে অনেক ব্যক্তির মতামত এক ও

www.pathagar.com

অভিন্ন হয় তখন সেটি হয় জনমত। কোন একটি বিষয়ে জাতীয়ভিত্তিক জনমত যেমনি গড়ে উঠে তেমনি বিশ্বজনমতও হতে পারে। জনমত গড়ে উঠার ব্যাপারটি মূলত মতামত প্রকাশের কারণেই হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তির মতামত যখন যুক্তিপূর্ণ ও কল্যাণকর হয় তখনই অপরাপর ব্যক্তিবর্গ তার মতের সাথে সংহতি প্রকাশ করে। এই বিষয়টি তখনই সম্ভব, যখন ব্যক্তি তার মতামত প্রকাশ করে। আধুনিক কালে কোন সচেতন মানুষই তার নিজের মতামতকে শুধু অন্তরে পুষে রাখতে চায় না, সে মতামত প্রকাশ করতে চায়। প্রকাশিত মতামতের ভিত্তিতে বা নিজের মতামতের অনুকূলে অপরাপর মানুষের সাড়া প্রত্যাশা করে। নিজের মতামতকে জনমত হিসেবে দেখতে চায়। তাই বিভিন্ন মাধ্যমে মানুষের মতামত প্রকাশিত হয়।

মতামত প্রকাশের মাধ্যম

ব্যক্তির মতামত প্রকাশের অনেক মাধ্যম রয়েছে। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার এই যুগে মতামত প্রকাশের মাধ্যমের অভাব নেই। অভিনব এ সব মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যে মতামত ছড়িয়ে পড়ে দুনিয়াব্যাপী। বর্তমানে কোন কোন মাধ্যমে, ব্যক্তির মতামত প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নিম্নে সেগুলো উপস্থাপন করছি :

১. **সংবাদপত্র :** মতামত প্রকাশের মাধ্যম বা বাহন হিসেবে সংবাদপত্রের গুরুত্ব ও কার্যকারিতা অত্যন্ত ব্যাপক। কোন ব্যক্তি বিবৃতি, প্রবন্ধ, নিবন্ধ ইত্যাদি আকারে নিজের মতামত সংবোদপত্রে প্রকাশ করতে পারেন। অথবা নিদেন পক্ষে সংবাদপত্রে প্রকাশার্থে চিঠিপত্র লিখে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে পারেন। সংবোদপত্রে সাধারণত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি প্রকাশিত হয়। এই সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতামত প্রদান করলে, তা সংবোদপত্র অপরাপর পাঠকদের গোচরীভূত করে। এভাবে ব্যক্তির মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করে থাকে।

২. **সভা সমাবেশ :** বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সভা, সমাবেশ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, বিতর্ক, ইত্যাদিতে বক্তৃতা, আলোচনা, প্রস্তাব, ঘোষণা ইত্যাদি আকারে মতামত প্রকাশিত হয়। এক ব্যক্তির মতামত হাজার জনের কানে পৌছে। এভাবেই একজনের মতামত অন্যজনের মতামতকে প্রভাবিত করে। মত প্রকাশের এই মাধ্যমের উপযুক্ত ও যথার্থ ব্যবহার নির্ভর করে ব্যক্তির জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং আকর্ষণীয় উপস্থাপনার উপর। রাজনৈতিক দলের সভা সমাবেশ হচ্ছে মতামত প্রকাশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাহন।

৩. **ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া :** বর্তমান যুগে ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন, ফ্যাক্স, টেলিপ্রিন্টার, টেলেক্সসহ বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমের ব্যাপক প্রসার এখন দুনিয়াজোড়া। এসবের ব্যবহার যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে জনপ্রিয়তাও। এইসব জনপ্রিয় গণমাধ্যম বা প্রচার মাধ্যম সমূহের মাধ্যমে

www.pathagar.com

ব্যক্তির মতামত প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত মতামত বিশ্ব জনমত গঠনে ব্যাপকভাবে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

৪. **বই পুস্তক, পুস্তিকা** ঃ ব্যক্তি তার মতামতকে তুলে ধরে বিভিন্ন বই পুস্তক বা পুস্তিকার মাধ্যমে। গল্প, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, কবিতা, সমালোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যক্তির মতামত প্রকাশিত হয় বই পুস্তকে। এটাকে আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ মাধ্যম বলি এজন্য যে, এতে লেখক তাঁর নিজের মতামতকে সুন্দর সাবলীলভাবে উপস্থাপন করতে পারেন। সমাজ নিরীক্ষণের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, চিন্তা ও গবেষণার ফসল প্রকাশিত হয় বইপুস্তকে। তাই বইপুস্তক পুস্তিকাকে আমরা মতামত প্রকাশের বলিষ্ঠ উপায় মনে করি।

৫. আইনসভা : জনগণের পক্ষে জনপ্রতিনিধিগণের মতামত প্রকাশের একটি আইনগত মাধ্যম হচ্ছে আইনসভা। আইনসভায় প্রকাশিত মতামত প্রকৃতপক্ষে জনগণেরই মতামত। জনপ্রতিনিধিগণ আইনসভায় যে সব বক্তব্য উপস্থাপন করেন, সে সবের ভিত্তিতে জনগণের মতামত গড়ে উঠে। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকারি ও বিরোধী দলের পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের ফলে, সেই বিষয়ে একটি যৌক্তিক মতামত পোষণ করা জনগণের জন্য সহজ হয়। আইনসভা যেমন ব্যক্তির মতামত প্রকাশের মাধ্যম তেমনি তা মতামত গঠনেরও মাধ্যম।

তথ্য (Information)

সাধারণভাবে তথ্য বলতে কোন কিছুর সংবাদ বা খবর বুঝায়। একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, তথ্য হচ্ছে জ্ঞানের উৎস বা ভিত্তি। আমরা যখন কোন বিষয় সম্পর্কে তথ্য লাভ করি, তখন সে বিষয় সম্পর্কে আমাদের সম্যক জ্ঞান অর্জিত হয়। নতুন কোন আবিষ্কার উদ্ভাবন ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু জানার অর্থ হচ্ছে, সে সম্পর্কে কোন তথ্য লাভ। তথ্য বিভিন্ন বিষয়ের হতে পারে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক ইত্যাদি সকল বিষয়ে তথ্য থাকতে পারে। এমনকি সামরিক ও কূটনৈতিক তথ্যও আছে, এসব তথ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

আধুনিক কালে তথ্য হচ্ছে শক্তি। যার কাছে যত বেশি তথ্য আছে, তিনি তত বেশি শক্তিমান। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তথ্যের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। রাষ্ট্রের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যত তথ্য আছে সবকিছু অবহিত হতে হয়। রাষ্ট্রের আয়ের সম্ভাব্য উৎস, জনসাধারণের প্রয়োজন, জনশক্তির ক্ষমতা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য না জানলে যথার্থ পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্ভব হবে না। কৃষি, শিল্পে উন্নয়নের জন্য সে সম্পর্কিত সর্বশেষ তথ্য জানতে হয়। জানতে হয় এসবের সমস্যা সম্পর্কিত তথ্যও। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধনের জন্য সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির তথ্য জানতে হয়। বস্তুত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার গবেষণার ক্ষেত্রে, তার বিচরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে হয়।

www.pathagar.com

প্রয়োজনীয় এবং পর্যাপ্ত তথ্য জানা না থাকলে অন্ধকারে হাতড়ানোর মত চলতে হয়। এতে সুষ্ঠুভাবে কাজ করার সুযোগ থাকে না। আধুনিক কালে তাই প্রতিটি বিভাগের সাথেই তথ্যকেন্দ্র গড়ে উঠছে।

ভাবধারণা (Ideas)

ভাব-ধারণাও মানুষের চিন্তা গবেষণার ফসল। মতামতের সাথে এর খানিকটা পার্থক্য আছে। মতামত সাধারণত কোন একটি বিষয় বা সমস্যাকে কেন্দ্র করে প্রদান করা হয় কিন্তু ভাব ধারণা হচ্ছে সম্পূর্ণ নতুন। দৈনন্দিন জীবনে মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসিকান্না, সমস্যা সম্ভাবনা, সামাজিক সংকট, সংগতি, অসংগতি, অভাব প্রাচুর্য ইত্যাদি দেখতে দেখতে এবং নিজের জ্ঞানের ঘাত প্রতিঘাতে নতুন নতুন চিন্তা মাথায় আসে। মানুষের জীবনের নতুন পথ পন্থা উদ্ভাবন করে। এসবই হচ্ছে ধারণা, ভাব। ইংরেজিতে যাকে বলে Idea।

Idea বা ধারণার উৎস হচ্ছে চিন্তা। সমাজে বিরাজমান সমস্যাকে নিয়ে চিন্তার উদ্ভব হয়। এই চিন্তা থেকেই সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবন হয়। এই উপায়ই হচ্ছে idea বা ধারণা। যেসব ধারণা জীবনের অনেক দিক ও বিভাগে ব্যাপ্ত সেসব ধারণা হচ্ছে মতবাদ। মানব জীবনে অর্থনৈতিক দিক নিয়ে অনেক চিন্তা ও ধারণার উদ্ভব হয়েছে। যেগুলোকে আমরা বলি অর্থনৈতিক মতবাদ। তেমনি রাজনৈতিক, ধর্মীয়, আইন ইত্যাদি বিষয়ে অসংখ্য মতবাদ চালু আছে আমাদের সমাজে। মানুষের জীবন এখন সমস্যাসঙ্কুল। এইসব সমস্যা সমাধানের জন্য দরকার যথার্থ উপায়। সকল মানুষের মেধা প্রজ্ঞা সমান নয়। তাই নিজের সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে পাওয়ার জন্য অন্যের সহযোগিতা দরকার হয়। অন্যের উদ্ভাবিত উপায়কে মানুষ অবলম্বন করে। এই সব অবলম্বনই হচ্ছে মতবাদ। জীবন পরিচালনার জন্য ভাব ধারণা মতবাদ ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

সমাজ পরিচালিত হয় একটি ধারণার উপর। দিন দিন সমাজ পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় এক একটি সমাজ পরিচালনার জন্য মানুষ এক একটি ধারণাকে গ্রহণ করে। কোন সমাজের মানুষ কোন ধারণাকে অবলম্বন করে পরিচালিত হবে, তা নির্ভর করে সেই সমাজের মানুষের ইচ্ছার উপর। ধারণা হিসাবে যাই হোক একটাকে গ্রহণ করতেই হবে। প্রতিটি সমাজ একটি নির্দিষ্ট মত, পথ, ভাব বা ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়। ধারণা, আদর্শ বা মতবাদবিহীন সমাজ হচ্ছে অথৈ সাগরে লক্ষ্যহীন জাহাজের মত।

বর্তমানকালে মানব জাতি দুটি প্রধান ধারণার ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। এর একটি হচ্ছে পুঁজিবাদী ধারণা, অধুনা যাকে মুক্তবাজার অর্থনীতি বলা হচ্ছে। এই ধারণার অনুষঙ্গ রাজনৈতিক আদর্শ হচ্ছে উদারনৈতিক গণতন্ত্র। এই ধারণা অনুসারে রাষ্ট্রের উৎপাদন উপকরণসমূহের মালিক হবে জনগণ। তারা অবাধে উৎপাদন করতে পারবে। বিনিয়োগ, বণ্টন, ভোগ, সঞ্চয়, মুনাফা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তার উপর কারো কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। অন্য ধারণাটি হচ্ছে

www.pathagar.com

এর বিপরীত। সমাজতন্ত্র নামে পরিচিত এই ধারণার মূল ভিত্তি হচ্ছে মালিকানার উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ। এই ধারণা মতে, সকল উৎপাদন উপকরণের মালিক রাষ্ট্র। উৎপাদন, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, ভোগ, মুনাফা ইত্যাদি সবই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হবে। এতে নিয়ন্ত্রিত বাজার ব্যবস্থা অনুসৃত হয়। বস্তুত ধারণা হিসেবে কোনটি শ্রেষ্ঠ সেই বিতর্কে না গিয়েই আমরা বলতে চাই যে, মানুষ নিজের কল্যাণের জন্য ধারণার উদ্ভব ঘটিয়েছে। এইসব ধারণা বা মতবাদকে অবলম্বন করেই মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলে রাখা ভাল যে, ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার এলাকা এবং পরিধি, বাকস্বাধীনতার এলাকা ও পরিধি থেকে বহুগুণ বৃহৎ। ধ্বনি, লেখনি, চিত্র, অভিনয়, ভঙ্গিমা, ব্যানার, ফেস্টুন, অথবা এই শ্রেণীর অন্য মাধ্যম দ্বারা ভাব প্রকাশ এই স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত।

ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা বলতে শুধু নিজের ভাব প্রকাশের স্বাধীনতাকেই বুঝায় না। অন্যের ভাব প্রকাশের স্বাধীনতাকেও বুঝায়। ভাব প্রচারও এর অন্তর্ভুক্ত। প্রচারিত না হলে ভাব প্রকাশ অর্থহীন হয়ে পড়ে। রেডিও, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, গ্রামোফোন, লাউডস্পীকার, প্রভৃতি মাধ্যমে ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার সীমা

এক শ্রেণীর আইনদার্শনিকের মতে, ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ হওয়া উচিত। তাদের মতে এক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন নেই। আপনি মনে করতে পারেন যে, আপনার বন্ধুর কোন কথা লেখা বা মতবাদ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং অসত্য, সুতরাং আপনার বন্ধুর এই অযৌক্তিক লেখা বা মতবাদ সর্বসাধারণের সম্মুখে প্রকাশিত হওয়া অনুচিত। এই জাতীয় অসহনশীলতার বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি হচ্ছে—আপনি যে মতবাদকে অযৌক্তিক মনে করছেন, সেই মতবাদ আপনার মতে অন্যায় হলেও বাস্তবিক পক্ষে সেটি সুস্থ হতে পারে। আপনার ধারণা যে সবসময় অভ্রান্ত তা মনে করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। যে মুহূর্তে একটি মতবাদকে অন্যায্যতার অভিযোগে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়, সেই মুহূর্তে হয়তো একটি যথার্থ সত্যের মৃত্যু ঘটে। সহস্র ব্যক্তির মতের প্রতিকূলে যখন এক ব্যক্তির একটি মত প্রকাশিত হয় তখনো সেটাকে স্তব্ধ করে দেওয়া গর্হিত কাজ। শুধুমাত্র সংখ্যার দ্বারা কোন মতের সত্যতা বা ন্যায্যতা নির্ণয় করা যায় না।

বিরুদ্ধ মতের কষ্টিপাথরে যতক্ষণ না একটি মত যাচাই হয় ততক্ষণ সেই মতের মূল্য নিরুপিত হয় না। বস্তুত কোন মতের সত্যতা যাচাইয়ের একমাত্র পথ হচ্ছে সে মতকে বিরুদ্ধ মতের পাশাপাশি স্থাপন করা। বিভিন্ন বিরুদ্ধমতের সংঘাত সংঘর্ষে সঠিক সত্যটি বেরিয়ে আসতে পারে। একথা বলা যেতে পারে যে, যে সমস্ত মত সম্পর্কে নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শন করা সম্ভব ও স্বাভাবিক শুধু সেই সমস্ত এলাকায় বাকস্বাধিনতা থাকা উচিত। আর যেখানে মৌলিক, সনাতন ও শাশ্বত সত্য বিষয়, সেখানে বিরোধীতার সুযোগ দেওয়া অর্বাচীনতা। অবশ্য এর

www.pathagar.com

উত্তরে অনেকে বলেন, শাশ্বত সত্য বলে কিছু নেই, সকল সত্যই আপেক্ষিক। এরকম যুক্তিও শুনা যায় যে, নিছক প্রয়োজনের খাতিরে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা সীমিত হওয়া উচিত। যে মতবাদ সমাজকে অসুস্থতার দিকে টেনে নিয়ে যায় সামাজিক প্রয়োজনে সে মতবাদকে স্তব্ধ করা উচিত। আবার এর উত্তরেও বলা হয় যে, সামাজিক প্রয়োজন কোন অবস্থাতেই সত্যের মাপকাঠি হতে পারে না। সক্রেটিস তার সময়ে যুবকদের বিপথগামী করা এবং এথেন্সের সমাজকে কলুষিত করার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। সক্রেটিসের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ যদিও মিথ্যা ছিল, তথাপি তাকে হত্যা করা হয়। এটা অসম্ভব নয়, পরস্পর বিপরীত দুটি মতের মধ্যেও আংশিক সত্য লুকিয়ে আছে। কোন মতামতকে স্তব্ধ করে দিলে তার মধ্যে লুকিয়ে থাকা আংশিক সত্যের মৃত্যু ঘটে, এভাবেই সত্য বিনাশ হয়। এর মত পোষণকারীরা মনে করে বাক স্বাধীনতা বা ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ হওয়া উচিত এতে কোন বাধা বা সীমা নির্ধারণ করা সঙ্গত নয়।

অন্য শ্রেণীর সুবিজ্ঞ আইনদার্শনিকদের মতে, বাক স্বাধীনতার ব্যাপারে শৃঙ্খলার প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে প্রকাশ পদ্ধতির ধারা পরিবর্তিত হয়েছে এবং তথ্য মত ও ভাব প্রকাশের সুবিধা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। রেডিও, টেলিফোন, টেলেক্স, টেলিভিশন, টেলিপ্রিন্টার, ফ্যাক্স, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইত্যাদির মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যে দেশ দেশান্তরে খবরাখবর পাঠানো ও পাওয়া যায়।

প্রচার মাধ্যম বিজ্ঞানের এই অভূপূর্ব উন্নতির কারণে অশ্লীল অন্যায় ও অসত্য তথ্য প্রচারের আশংকা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অবস্থায় ভাব প্রকাশ স্বাধীনতার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মূলভিত্তি ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার বাক অসংযম, ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে অমিতাচার গণতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করতে পারে। তাই ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে পৃথিবীর সভ্যদেশসমূহ কতিপয় সীমা মেনে চলে।

প্রথম সীমা : আদালত ও বিচারক সম্পর্কে

বিচারকগণ নিষ্পাপ, বিচ্যুতিবিহীন মহামানব, নরাবতার বা নবীরাসূল নয়। তাদের ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয় কিন্তু তবুও মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের লক্ষ্যে বিচারের ব্যাপারে বিচারকদের সমালোচনার উর্ধ্বে রাখা হয়েছে। বিচারকগণ বিচারকার্যের সময় যদি একটি নির্ভর করার মত আশ্রয় উপলব্ধি না করেন, যদি তিনি বিত্তবান ও প্রভাবশালীদের সমালোচনার আশংকায় কম্পিত থাকেন তবে তার সিদ্ধান্ত প্রভাব নিরপেক্ষ হতে পারে না। বিচারককে তাই সমালোচনার উর্ধ্বে রাখা বাঞ্ছনীয়। তাই আদালত, বিচার ও বিচারক সম্পর্কে অবমাননাকর উক্তি প্রকাশ ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা বহির্ভূত।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় সীমা : অপযশ করা

যে উক্তিতে অন্যের অপযশ হয় সে জাতীয় উক্তি, লিখে বা মুখ প্রকাশ ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার বহির্ভূত। অন্যের অপযশ কীর্তনের অধিকার স্বাধীনতা নয়।

তৃতীয় সীমা : অশ্লীলতা

ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা মানুষকে অশ্লীলতা প্রকাশের অধিকার দেয় না। যে সাহিত্য বা চিত্র মানুষের কোন কিছুকেই উদ্দীপ্ত বা উজ্জীবিত করে না তা প্রকাশের অধিকার সভ্য সমাজে অস্বীকৃত। অবশ্য অশ্লীল শ্লীলতার ধারণা পরিবর্তনশীল ।

চতুর্থসীমা : রাষ্ট্রদ্রোহিতা

যে কথা বা লেখা বা চিত্র রাষ্ট্রের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ বা ক্রোধকে উদ্দীপ্ত করে, তা প্রকাশের অধিকার ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার সীমায় পড়ে না। অবশ্য সরকারের সমালোচনা রাষ্ট্রদ্রোহ নয়।

পঞ্চম সীমা : শান্তিভঙ্গ

দেশ বা সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্ট হতে পারে এমন কথা বা লেখা প্রচার, ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা সীমা বহির্ভূত। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতি বিদ্বেষ ছড়ানো উদ্দেশে লেখা বা কথা প্রচার এই অধিকার বহির্ভূত।

বস্তুত, সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ন্যায্য আলোচনা কিংবা কবি সাহিত্যিক ও শিল্পীর সৃষ্টিমূলক রচনা প্রভৃতিতে প্রাসঙ্গিক উক্তিসমূহ সীমাহীনভাবে অশোভন না হলে তা প্রকাশ করা আপত্তিকর নয়।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

ব্যক্তির মতামত প্রকাশ ও প্রচারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে সংবাদপত্র। বিভিন্ন প্রকার তথ্য, ধারণা, মতাদর্শ ইত্যাদি অন্বেষণ, গ্রহণ ও প্রদানের অন্যতম উপায় সংবাদপত্র। আধুনিক কালে সংবাদপত্রের শক্তির গুরুত্ব অপরিসীম, তাই স্বৈরাচারী সরকার কর্তৃক প্রায়ই সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ হতে দেখা যায়।

চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার পরিপূরক হচ্ছে এই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। কেননা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা না থাকলে মতামত প্রকাশ করা যায় না। আর মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা না থাকলে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা অর্থহীন। মানুষের চিন্তাকে প্রকাশের দুটি মাধ্যম আছে। এর একটি হচ্ছে ধ্বনি অপরটি চিহ্ন। ধ্বনি এবং চিহ্ন প্রকাশের জন্য মানুষ উদ্ভাবন করেছে কথা এবং লেখা। রেডিও, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, সংবাদপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে

www.pathagar.com

মানুষ তার কথা এবং লেখাকে অপরের সামনে তুলে ধরে। নিজের চিন্তা এবং ভাবকে অপরের সামনে তুলে ধরার এই যে মাধ্যম এটা অত্যন্ত মূল্যবান। এই মূল্যের এবং গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যমের স্বাধীনতার বিষয়টি বাকস্বাধীনতার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। যে সমাজে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নেই, সেখানে বাকস্বাধীনতার উপস্থিতির বিষয়টি আশা করা যায় না।

সকল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তিমূলে রয়েছে বাক স্বাধীনতা। কারণ জনগণের সরকার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য যে স্বজ্ঞান ও সোচ্চার জনমত প্রয়োজন, তা গড়ে উঠতে পারে একমাত্র মুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে। বাকস্বাধীনতা না থাকলে মুক্ত আলোচনার ভিত্তিতে জনমত গঠন সম্ভব নয়। মুক্ত ও অবাধ আলোচনা এর অন্তর্ভুক্ত।

বাকস্বাধীনতার বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপক বিস্তৃত। এর আওতায় পড়ে ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও কারিগরী সকল বিষয়গত মতামত ও চিন্তাধারা। এসব বিষয়ে মানুষের সকল চিন্তা-ভাবনা, মতামত, বিশ্বাস ইত্যাদি প্রকাশ করার স্বাধীনতাই বাকস্বাধীনতা। বাকস্বাধীনতার ব্যাপক ব্যবহার অনেক অঘটন ঘটাতে পারে বলে অনেকে আশংকা প্রকাশ করেন। তবুও বাকস্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত না করে তাকে স্বাভাবিকভাবে বাড়তে দেওয়া উচিত, যাতে করে সকলেই এই স্বাধীনতার স্বাদ সমভাবে ভোগ করতে পারে।

মতামত এবং ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতাও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সাথে জড়িত। ধ্বনি, লেখনি, চিত্র, অভিনয়, ভঙ্গিমা, ব্যানার, ফেস্টুন অথবা এই জাতীয় অন্য কোন উপায়ে ভাব প্রকাশ করা যায় এবং সেটাও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে পারে। তাই মতামত ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অত্যন্ত জরুরি। মানুষের ভাব প্রকাশ এবং তা প্রচারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে সংবাদপত্রের বিকল্প নেই, তা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হয়।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বলতে আমরা শুধু খবরের কাগজের স্বাধীনতাকেই বুঝি না বরং সাময়িকী, বেতার, টেলিভিশন ইত্যাদি সকল প্রকার গণমাধ্যমের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থাকে বুঝি। যে সমাজে, যে কোন উপকরণের মাধ্যমে মতামত ও ভাব প্রকাশ ও প্রচারের স্বাধীনতা আছে, সেই সমাজে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আছে বলেই ধরে নেওয়া হয়।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে লিখবার এবং তা প্রকাশ করবার স্বাধীনতা। সংবাদপত্রে লিখবার এবং তা প্রকাশ করার স্বাধীনতাটি যেহেতু মানুষের চিন্তা বিবেক ও বাকস্বাধীনতার অঙ্গ সেহেতু এই অধিকার মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। যে সমাজের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হয়, সেই সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির মানবাধিকারকে হরণ করা হয়। কোন অজুহাতেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করা বা সীমিত করা যায় না। প্রচারের স্বাধীনতা এবং সম্পাদনা বিভাগে চাকুরির স্বাধীনতা সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার অংগ। প্রকাশের পূর্বে সেন্সর করা এবং প্রকাশের পর প্রচারে বাধাদান করা বা প্রচার সীমিত করা আইনসিদ্ধ নয়। বিজ্ঞাপন, লিফলেট, প্রচারপত্র প্রকাশ করাও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অংশ। অতএব, সংবাদপত্রের

www.pathagar.com

স্বাধীনতা বলতে লিখবার, প্রকাশ করবার, বিজ্ঞাপন, লিফলেট, প্রচারপত্র ইত্যাদি প্রকাশ ও প্রচারের স্বাধীনতা বুঝায়।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সীমা

দেশের যে কোন নাগরিক এবং নাগরিকের মানবিক তৎপরতা যেমন আইনের আওতায় পড়ে তেমনি সাংবাদিক এবং সংবাদপত্রও আইনের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারে না। অর্থাৎ সহজভাবে বললে কথাটা দাঁড়ায় এই যে, দেশের সাংবাদিক এবং সংবাদপত্র দেশের আইনের অধীন।

সংবাদপত্রের মাধ্যমে যিনি বক্তব্য প্রকাশ করেন, তার অধিকার সংবাদপত্রের বাইরে থেকে যিনি বক্তব্য রাখেন তার চেয়ে বেশি নয়। দেশের আইন কানুন ভাঙ্গার উদ্দেশ্যে সংবাদপত্র কোন ব্যক্তির হাতিয়ার হতে পারে না বা অনুরূপ পরিপন্থী কার্যকলাপ থেকে নিরাপদ থাকার আশ্রয়ও হতে পারে না। তবুও সংবাদপত্রে ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত বক্তব্যের একটা বিশেষ ধরনের মর্যাদা আছে। সংবাদপত্রের প্রশংসা যেমন কাউকে সম্মানিত করতে পারে তেমনি এর তিরস্কার কাউকে করতে পারে অপমানিত। তাই সংবাদপত্রকে অনুগ্রহ প্রশংসা, বা নিন্দা তিরস্কারের প্রভাববর্জিত একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা হয়। সংবাদপত্র যখন সাধারণ মানুষের চিন্তা, চেতনা, মত ও ভাবের বাহন না হয়ে কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা দলের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য নিবেদিত হয় তখনই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হয় ভূলুণ্ঠিত। সংবাদপত্র তখন গণবিরোধী ভূমিকা পালন করে এবং তখনই সংবাদপত্রকে আইনের শাসনের আওতায় আনতে হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ হওয়া উচিত কি উচিৎ নয় এই বিষয়ে পরস্পর বিরোধী দুটি মত প্রচলিত আছে। এখানে আমরা দুটি মতই আলোচনা করছি।

সংবাদপত্র ও বাকস্বাধীনতা নিরঙ্কুশ হওয়া উচিত বলে যারা মনে করেন তাদের মতে, এক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন নেই। উদাহরণ হিসেবে তারা বলেন যে, আপনি মনে করেন, কোন ব্যক্তির কথা লেখা বা মতবাদ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং অসত্য, তাই তা জনসাধারণের সম্মুখে প্রকাশিত হওয়া অনুচিত। এই জাতীয় অসহনশীলতার বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি হচ্ছে এই যে, আপনি যে কথা লেখা বা মতবাদকে অযৌক্তিক মনে করছেন, সেইটি বাস্তবিক অর্থে অন্যায় অসত্য এবং অযৌক্তিক নাও হতে পারে। যে কথা, লেখা বা মতবাদের সাথে আপনি ভিন্ন মত পোষণ করেন, বাস্তবে সেটিই সত্য ও যথার্থ হতে পারে। আপনার ধারণাই যে সব সময় যথার্থ ও অভ্রান্ত তা মনে করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। অজস্র মানুষের বিরুদ্ধে যদি একজন মানুষ ভিন্নমত পোষণ করে তাহলে সেই একজনের মতকেও স্তব্ধ করে দেওয়ার কোন যুক্তি নেই। কারণ শুধুমাত্র সংখ্যার দ্বারাই কোন মতের সত্যতা নিরুপণ করা যায় না। একথা বলা যেতে পারে যে, জীবনের কোন ক্ষেত্রে যখন যথার্থ সত্য নিরুপণ করা প্রায় অসম্ভব, তখন যে মতবাদটি বহুজন গ্রাহ্য সেইটিই শুধু প্রকাশিত হওয়া

www.pathagar.com

উচিত। একথা বলা যেতে পারে যে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠের মত গৃহীত হচ্ছে সেহেতু বাকস্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ব্যাপারেও এই নীতি অনুসরণ করা উচিত। কিন্তু বিরুদ্ধ মতের কষ্টিপাথরে যতক্ষণ না একটি মত যাচাই হবে, ততক্ষণ এর মূল্য নিরুপিত হয় না। মতের মূল্য যাচাই করার উপায় হচ্ছে, কোন মতকে বিরুদ্ধমতে পাশাপাশি উপস্থাপন করা। সংবাদপত্রের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার মাধ্যমেই তা সম্ভব।

কেউ যদি বলেন, যে সমস্ত মত সম্পর্কে নানা রকমের যুক্তি প্রদর্শন করা সম্ভব ও স্বাভাবিক, অথবা যে সব বিষয়ে ভিন্নমতের অবকাশ রয়েছে, শুধুমাত্র সেসব বিষয়েই বাক স্বাধীনতা থাকা উচিত আর সে সব বিষয় মৌলিক, শাশ্বত ও সনাতন সত্য সেসব বিষয়ে বিরোধীতার সুযোগ দেওয়া অনুচিত। একথার জবাবে বলা যায় যে, মৌলিক শাশ্বত ও সনাতন সত্য বলে কোন বিষয় নেই। সকল সত্যই আপেক্ষিক। অতএব কোন বিষয়েই বাকস্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সীমিত হওয়া উচিত নয়।

কারো কারো মতে, প্রয়োজনের খাতিরে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বাকস্বাধীনতা সীমিত করা উচিত। তারা বলেন, যে মতবাদ সমাজকে অসুস্থতার দিকে নিয়ে যায়, সমাজের প্রয়োজনে সেই মতবাদকে স্তব্ধ করা উচিত। এর জবাবে শুধু একটি কথাই বলা যায় যে, মহান দার্শনিক ও পণ্ডিত সক্রেটিস অভিযুক্ত হয়েছিলেন সমাজকে কলুষিত করা ও এথেন্সের যুবকদের বিপথগামী করার অভিযোগে। কিন্তু এই অভিযোগ যথার্থ ছিল না অথচ সক্রেটিসকে এই অভিযোগেই বিষ প্রয়োগে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়।

অসম্ভব নয় যে, সকল মতের মধ্যেই কিছু কিছু সত্য নিহীত থাকে। তাই বাকস্বাধীনতা বা সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে হরণ করে আমরা যদি কোন বিশেষ মতকে স্তব্ধ করে দিই, টুটি চেপে ধরি তাহলে এর অন্তর্নিহিত আংশিক সত্যটিকে ধ্বংস করা হয়। তাই বাক স্বাধীনতা বা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা বা সীমিত করা উচিত নয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হওয়া উচিত নিরঙ্কুশ এবং সর্বব্যাপী।

আইনদার্শনিকদের মধ্যে বাকস্বাধীনতার ব্যাপারে শৃঙ্খলার প্রয়োজন অনুভব করেন। তাদের মতে, আজকের দুনিয়ায় প্রকাশ পদ্ধতির ধারা বদলে গেছে। তথ্য ও মত প্রকাশের সুবিধা হাজার গুণ বেড়েছে। রেডিও, টেলিভিশন, খবরের কাগজ, ফোন এমনকি উপগ্রহ ভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর এক প্রান্তের খবর অপর প্রান্তে চলে যাচ্ছে।

বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির অভাবিত উন্নতি অতিক্রত তথ্য প্রাপ্তির সুযোগকে যেমন সম্প্রসারিত করেছে, তেমনি অতি সহজে অশ্লীল, অন্যায় ও অসত্য তথ্য প্রচারের আশংকা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে বাকস্বাধীনতার ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। মিথ্যা উক্তি করা, তথ্য বিকৃত করা এবং রাষ্ট্রদ্রোহমূলক প্রচার চালানোর ক্ষেত্রে পৃথিবীর সর্বত্র নিয়ন্ত্রণ আরোপের মাধ্যমে বাকস্বাধীনতার যথেচ্ছা ব্যবহারকে সীমিত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হচ্ছে বাকস্বাধীনতা। তেমনি বাক অসংযম গণতন্ত্রের প্রধান শত্রু। পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া আবশ্যক কিন্তু তাই বলে পচা বিনষ্ট জিনিস সুস্বাদু স্বাস্থ্যকর বলে প্রচারনা চালানো অন্যায়। এ ক্ষেত্রে প্রচার নিয়ন্ত্রণ শুধু বৈধই নয় অপরিহার্যও। পৃথিবীর সভ্য দেশ সমূহে বাকস্বাধীনতার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সীমা নির্দেশ করা হয়।

এক : বিচার সম্পর্কীয় উক্তি

আদালত, বিচার বা বিচারক সম্পর্কীয় উক্তিতে বিন্দুমাত্র অবমাননা প্রকাশ শাস্তির যোগ্য। একথা অবশ্য স্বীকৃত যে, বিচারকগণ অপাপবিদ্ধ অথবা বিচ্যুতিবিহীন মহামানব বা নরাবতার নন। কিন্তু তবুও মানবের বৃহত্তর কল্যাণের উদ্দেশ্যে বিচারের ব্যাপারে বিচারককে সমালোচনার উর্ধ্বে রাখা হয়েছে। বিচারকগণ বিচার কার্যের সময় যদি একটি নির্ভরতার উপলব্ধি না করেন, যদি তিনি বিত্তশালী এবং প্রতিষ্ঠাবান বা তদাশ্রিত লোকের বিরূপ সমালোচনার আশংকায় কম্পিত থাকেন, তবে তার সিদ্ধান্ত প্রভাব নিরপেক্ষ হতে পারে না।

বিচারকে তাই সমালোচনার উর্ধ্বে রাখা একটি বাঞ্ছনীয় রীতি। সকল দেশেই বিচারককে ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান করা বা তার কাজে বাধা প্রদান করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কোন মোকদ্দমা যখন বিচারাধীন থাকে, তখন সেই মোকদ্দমার ফলাফল সম্পর্কে বিচারককে প্রভাবান্বিত করার কোন চেষ্টা করা, বিচারকের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে ইঙ্গিত করে মুখে বা কলমে কোন উক্তি করা, বিচারকের ন্যায্য আদেশ ও নিষেধ প্রতিপালন না করা প্রভৃতিও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। Contempt of Court Act এবং দণ্ডবিধির ২২৮ নং ধারা আদালত অবমাননা সম্পর্কীয় আইনের ধারক।

দুই : অন্যের অপযশ বা মানহানিকর উক্তি

যে উক্তিতে অন্যের অপযশ হয়, সেই অপযশ সৃষ্টিকারী লিখিত বা মৌখিক প্রকাশ বা উক্তি শাস্তিযোগ্য। অন্যকথায়, বাকস্বাধীনতা অন্যের অপযশ কীর্তনের অধিকার দেয় না।

সভ্যসমাজে শান্ত জীবন যাপন করতে হলে, সমাজের প্রত্যেক নাগরিকের মধ্যে নিরাপদ সহ-অবস্থানের অভ্যাস রপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রতিটি মানুষের এই অধিকারটুকু থাকা উচিত, যে কেউ তার ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্র সম্পর্কে এমন উক্তি করবে না, যাতে তাকে তার সমাজে হেয় হতে হয়। প্রত্যেক মানুষের যেমন বেঁচে থাকবার অধিকার আছে, তেমনি সামাজিক যশ অব্যাহত রাখবার অধিকারও তার সর্বজন স্বীকৃত। সুনামের অধিকারটি মানুষের মৌলিক অধিকার। একটি মৌলিক অধিকার ভোগ করতে গিয়ে আরেকটি মৌলিক অধিকারকে ভূলুণ্ঠিত করার কোন যুক্তি নেই। তাই বাকস্বাধীনতার সুবাদে কারো অপযশ করা বা মানহানি করা আইনসিদ্ধ নয়।

www.pathagar.com

তিন : অশ্লীল উক্তি

বাকস্বাধীনতা মানুষকে অশ্লীল হওয়ার অধিকার দেয় না। যে উক্তি, যে সাহিত্য বা যে চিত্র মানুষের কামরিপুকে উদ্দীপ্ত বা উজ্জীবিত করে, তা প্রকাশের অধিকার সভ্য সমাজে অস্বীকৃত। শ্লীল এবং অশ্লীলের মাঝে যে সীমারেখা টানা হয়েছে যুগে যুগে তা পরিবর্তিত এবং বিবর্তিত হয়েছে। এই সীমারেখা অত্যন্ত জটিল এবং সূক্ষ্ম। আইনদর্শনের সূত্র হচ্ছে এই যে, "যা মানুষকে কলুষিত করে তাই অশ্লীল। কিন্তু কোনটা মানব মন কলুষিত করে আর কোনটা করে না সেই প্রশ্ন অতি দুরূহ। এ সম্পর্কে নানা জন নানা কথা বলেছেন।

এক শ্রেণীর দার্শনিক বলেছেন, কোন লেখক, প্রকাশক বা শিল্পী এই সত্য যেন অস্বীকার না করেন যে, সমাজে প্রতিভার এক গুরুদায়িত্ব রয়েছে এবং সে দায়িত্বের দাবি এই যে, তার কথা যতই সত্য হোক না কেন শ্লীলতার খাতিরে তিনি তার প্রকাশকে সংযত রাখবেন। মানুষের মনে সহজাত বৃত্তিরূপে এমন কতগুলো আবেগ অবস্থান করে, যেগুলোর বৃহত্তর মানব সমাজের জন্য দৃঢ়ভাবে সংযত ও সংহত হওয়া উচিত। যে বক্তৃতা বা সাহিত্য এই বৃত্তিগুলোকে প্রশমিত করার পরিবর্তে উদ্দীপ্ত করে সেইগুলি প্রকাশযোগ্য নয়।

আরেক শ্রেণীর আইন দার্শনিকদের মতে, যে বক্তৃতা বা সাহিত্য মানুষের অতি নিগূঢ় এবং রহস্যময় অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করে, সেইগুলি শুধুমাত্র শ্লীল নয় বরং সভ্য এবং স্বাভাবিক। মানুষের এই কামনা বাসনার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে সাহিত্য এবং শিল্পে প্রেমের সৌধ। সেই সুন্দর সৌধের ভিত্তিভূমিকে ধ্বংস করা অনুচিত। সর্বপ্রকার যৌনচিন্তা ও নারীপুরুষের নিবিড়তম সান্নিধ্যের আলোচনা মধ্যযুগীয় রক্তচক্ষুর পুরোহিতবর্গের কাছে অপবিত্র ছিল। সেই যুগ অতিক্রম করে এসেছি অনেক আগেই।

শিল্প সাহিত্য যদি সমাজের দর্পণ হয়, তাহলে সমাজের সমস্ত ঘটনা সেখানে প্রতিবিম্বিত হবেই। তাতে কারো আপত্তি করবার কোন কারণ থাকা উচিত নয়। অবশ্য যে বক্তৃতা বা সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষকে শুধুমাত্র কামোদ্দীপ্ত করা তা কোন মতেই গ্রাহ্য হতে পারে না।

চার : রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক উক্তি

রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক মৌখিক এবং লিখিত উক্তি আইনের দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যে সকল উক্তি মানুষের মনে রাষ্ট্রের প্রতি হিংসা বা ক্রোধকে উদ্দীপ্ত করে, সেই সব ক্ষেত্রেও বাক স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, কোন বিশেষ দলের সরকারকে সমালোচনা করা কোন ক্রমেই রাষ্ট্রদ্রোহিতার পর্যায়ভুক্ত নয়। যে উক্তিগুলো নাগরিকবর্গের মনে ঘৃণার উদ্রেক করে, রাষ্ট্রের ধ্বংসের কাজে উৎসাহিত করে, সেই সমস্ত উক্তি রাষ্ট্রদ্রোহিতার পর্যায়ভুক্ত।

রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে প্রতিটি রাষ্ট্র ন্যায়ত এবং স্বভাবত এই দাবি করতে পারে যে, রাষ্ট্রের সমস্ত নরনারী রাষ্ট্রের প্রতি এবং রাষ্ট্রীয় সংবিধানের

www.pathagar.com

প্রতি অনুগত থাকবেন। রাষ্ট্র যে সরকার দ্বারা পরিচালিত হয় সেই সরকারের গৃহীত নীতি এবং পদ্ধতি কখনোই সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। কিন্তু যে সমস্ত উক্তি রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে আঘাত করে, কোনদিনই সেইগুলি সমর্থিত হতে পারে না। কোন উক্তি রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক আর কোনটি নয়, সেটি নির্ভর করে বক্তার মনের ভাবের উপর। এবং যাদের সামনে সেটি প্রকাশিত হচ্ছে তাদের মানসিক অবস্থার উপর ; এবং সর্বোপরি স্থান ও কালের উপর।

পাঁচ : শান্তিভঙ্গমূলক উক্তি

শান্তিভঙ্গমূলক কোন লিখিত বা মৌখিক উক্তি আইনের দৃষ্টিতে অমার্জনীয়। দেশে এবং সমাজে শান্তি অক্ষুণ্ন রাখার দায়িত্ব সরকারের। তাই শান্তি ভঙ্গকারী কোন কাজকে সরকার বরদাস্ত করেন না। যদি কোন ব্যক্তি এমন কোন কিছু বলেন বা লিখেন বা অন্যভাবে প্রকাশ করেন যা দ্বারা দেশের বিভিন্ন সমাজ এবং শ্রেণীর মধ্যে ঘৃণা ও হিংসার উদ্রেক করে, তবে তিনি আইনের দৃষ্টিতে অপরাধী। কোন অলিআল্লাহ, পীর ফকির, বা দরবেশের বিরুদ্ধে, কোন ধর্ম বা ধর্মীয় নেতার বিরুদ্ধে, কোন জাতি বা পেশার বিরুদ্ধে অসভ্য উক্তি সমর্থনযোগ্য নয়।

উল্লেখ্য যে, সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ন্যায্য আলোচনা কিংবা শিল্পীর সৃষ্টিশীল রচনা প্রভৃতিতে প্রাসঙ্গিক উক্তিসমূহ সীমাহীনভাবে অশোভন না হলে তাতে আপত্তি করা যায় না।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদের মিল রয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করছি।

৩৯। (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।

(২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ-সাপেক্ষে।

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং

(খ) সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।

অন্যান্য সংবিধানে

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের আলোচ্য অনুচ্ছেদের প্রতিফলন ঘটেছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবিধানে। নিম্নে বিভিন্ন সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারা উল্লেখ করা হলো :

India

The Constitution of India Article No. 19.

All citizens shall have the right to freedom of speech and expression ;

www.pathagar.com

U.S.A.

The First Amendment of the constitution of the United States 1791 lays down--"The Congress shall make no laws ... abridging the freedom of speech or of the press..."

England

The right of freedom of discussion like all other individual rights, is in England, not based on any declaration embodied in constitutional document, or in any particular rule of statute or common law--but is based on the ordinary rule of law that no man is to be punished except for a distinct breach of the law.

Eire :

The constitution of Eire section 40 (6) (1) says --

"The State guarantees liberty for the excercise of the following right, subject to public order and morality : (1) The right of the citizens to express freely their convictions and opinions. The education of public opinion being, however, a matter of such grave import to the common good, the State shall endeavour to ensure that organs of public opinion, such as the radio, the press, the cinema, while preserving their rightful liberty of expression, including criticism of Government policy, shall not be used to undermine public order or morality or the authority of the State. The publication or utterance of blasphemous seditions or indecent matter is an offence, which shall be punishable in accordance with law.

Japan : Article 21. says—

Freedom of assembly, association, speech, and press and all other forms of expression are guaranteed. No censorship

www.pathagar.com

shall be maintained, nor shall secrecy of any means of communication be violated.

এই অনুচ্ছেদ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তি

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদের সঙ্গে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি সামঞ্জস্য রয়েছে। নিম্নে তা পরিবেশিত হল।

পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি

অনুচ্ছেদ : ১৯

(১) কোনরূপ হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে মতামত পোষণ করবার অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির থাকবে।

(২) প্রত্যেক ব্যক্তির ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে, এই অধিকারের মধ্যে সীমান্ত নির্বিশেষে, মৌখিক এবং লিখিতভাবে অথবা মুদ্রিত আকারে, শিল্পকথার মাধ্যমে অথবা স্বীয় পছন্দমত অন্যকিছুর মাধ্যমে তথ্য এবং ভাব অন্বেষণ, গ্রহণ এবং প্রদান করার স্বাধীনতা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (২) পরিচ্ছেদে প্রদত্ত অধিকারসমূহ প্রয়োগের সাথে বিশেষ কর্তব্য ও দায়িত্ব জড়িত রয়েছে। অতএব এই অধিকারগুলোর উপর কিছু বাধানিষেধ আরোপ করা যেতে পারে। তবে অনুরূপ বাধানিষেধসমূহ কেবল আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে, এবং সেগুলো :

(ক) অন্যের অধিকার ও সুনামের প্রতি সম্মানের জন্য ;

(খ) জাতীয় নিরাপত্তা, অথবা জনশৃঙ্খলা, অথবা জনস্বাস্থ্য অথবা নৈতিকতার জন্য যেরূপ আবশ্যক কেবল সেরূপ হবে।

মানবাধিকার সংক্রান্ত ইউরোপীয় কনভেনশন

অনুচ্ছেদ : ১০

(১) প্রত্যেক ব্যক্তির ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে। এই অধিকারের মধ্যে মতামত পোষণের স্বাধীনতা এবং সরকারি হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে ও সীমান্ত নির্বিশেষে তথ্য ও ভাব গ্রহণ ও প্রদানের স্বাধীনতা অন্তর্ভুক্ত। এই অনুচ্ছেদ বেতার, টেলিভিশন অথবা সিনেমার জন্য লাইসেন্স ব্যবস্থা করা থেকে রাষ্ট্রসমূহকে বিরত করবে না।

(২) এই সকল স্বাধীনতা উপভোগের সাথে কর্তব্য ও দায়িত্ব জড়িত রয়েছে বিধায় তা স্বাধীনতা উপভোগের আইনের দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হয়, সেরূপ এবং একটি গণতান্ত্রিক সমাজে জাতীয় নিরাপত্তা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং নিরাপত্তার স্বার্থে বিশৃঙ্খলা অথবা অপরাধ নিরোধের জন্য, স্বাস্থ্য ও নৈতিকতা সংরক্ষণের জন্য, অন্যান্যের সুনাম অথবা অধিকার রক্ষার জন্য, গোপনসূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ প্রকাশ নিবারণের জন্য অথবা বিচার বিভাগের কর্তৃত্ব অথবা

www.pathagar.com

নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য, যেরূপ প্রয়োজন হয় সেরূপ আনুষ্ঠানিকতা শর্ত, বাধানিষেধ অথবা দণ্ডের অধীন করা যেতে পারে।

এই অনুচ্ছেদ ও ইসলাম

ইসলামি শরিয়ত ব্যক্তির মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে এবং উৎসাহিত করেছে যা মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদের মূল বিষয়।

আল কুরআনে মুমিনদের গুণাবলী প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, "তারা সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে বাধা দেয়।" (আল ইমরান : ১১০) মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা না থাকলে এই গুণাবলী অর্জন করা যায় না। মত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ইসলামে শুধুমাত্র সৎ ও ভাল কাজের প্রসারের জন্যই এই স্বাধীনতাকে ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। অসৎ ও মন্দ কাজের বিস্তারের জন্য মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর জীবদ্দশায় এবং তার ঘনিষ্ঠ সাহাবি বিশেষত খোলাফায়ে রাশেদিনের আমলে মত প্রকাশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল। তারা নাগরিকদের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করতেন।

উহুদের যুদ্ধের বিষয়ে নবী করিম (দঃ) তাঁর সাহাবিদের পরামর্শ নিচ্ছিলেন। প্রবীণ সাহাবিগণ মদিনার অভ্যন্তরে থেকে যুদ্ধ করার পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু হযরত হামযা প্রমুখ তরুণ সাহাবিদের মত ছিল মদিনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করা । মহানবী দেখলেন অধিকাংশের অভিমত মদিনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করা এবং সেটাই স্থির হলো। নবী করিম (দঃ) যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে হুজরায় চলে চান। এদিকে প্রবীন সাহাবিগণ তরুণদের তিরস্কার করতে থাকেন যে, তোমরা আল্লাহর রসুলের মতের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে তাকে কষ্টের মধ্যে ফেলে দিয়েছো। এই কথা শুনামাত্র তরুণরা আবেগাপ্লুত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে রাসুলের সামনে সমবেত হলেন। রাসুল (দঃ) তাদের কাকুতি মিনতি শুনার পর বললেন, দৃঢ়সংকল্প ও প্রস্তুতি শেষ হওয়ার পর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন ব্যতিরেকে অস্ত্র সংবরণ করা নবীর জন্য শোভনীয় নয়। চল, মদিনার বাইরেই যুদ্ধ সংঘটিত হবে।

কোন এক যুদ্ধে মহানবী (দঃ) মুসলমানদের আদেশ দিলেন, অমুক অমুক স্থানে অবস্থান নিতে হবে এবং শিবির স্থাপন করতে হবে। একজন সাহাবি জানতে চাইলেন এই আদেশ কি ওহির মারফত না আপনার ব্যক্তিগত? তিনি বললেন, এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত। সাহাবি আরজ করলেন, এ স্থান তো উপযোগী নয় বরং অমুক অমুক স্থানে অধিকতর সুবিধাজনক হবে। সুতরাং এই অভিমত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হল।

হযরত ওমর (রাঃ) খিলাফতের আসনে অভিষিক্ত হওয়ার পর হযরত আবু ওবাইয়া (রাঃ) হযরত মু'আজ বিন জাবাল (রাঃ) তার কাছে যৌথ পত্র লিখেন। এই পত্রে খিলাফতের

www.pathagar.com

দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং পরকালের জবাবদিহি সম্পর্কে তাকে সজাগ করে দেয়া হয়েছিল। পত্রে তারা লিখেছেন, আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাচ্ছি যে, আপনি আমাদের লিখিত পত্রের প্রকৃত মর্যাদা দিবেন না। আমরা শুধু আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং হিতাকাঙ্ক্ষী হিসাবেই এই চিঠি লিখেছি। হযরত ওমর তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এক দীর্ঘ উত্তরে লিখেন : আপনাদের উভয়ের লেখাই বিশ্বস্ততা ও সততায় পরিপূর্ণ। এই ধরনের পত্রের আমার খুবই প্রয়োজন। কাজেই আপনারা আমাকে পত্র লেখার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখবেন।

হযরত ওমরের (রাঃ) আমলে মত প্রকাশের স্বাধীনতা এতটা ছিলো যে, যে কোন লোক পথিমধ্যে কিংবা সভামঞ্চে যে কোন স্থানে তাকে বাধা দিতে পারতো, তার কাছে নিজের অভিযোগ পেশ করতে পারতো, তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারতো। মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য তিনি অভিযোগকারীদের কথার প্রতি পরিপূর্ণ মনোনিবেশ করতেন। এমনি আরো উদাহরণ আছে মত প্রকাশের স্বাধীনতার। ইসলাম মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করেছে।

সার সংক্ষেপ

জন্মগতভাবে প্রত্যেক মানুষ স্বাধীন। স্বাধীন শুধু কর্মে নয়, স্বাধীন ভাব প্রকাশেও। প্রত্যেক মানুষ জন্মগতভাবে স্বতন্ত্র। একজনের চলা বলা অন্যজনের চলাবলার সাথে মেলে না। সৃষ্ট হয়েছে সে স্বতন্ত্রভাবে। এই স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ তাই প্রকৃতির অভিপ্রায়। প্রকৃতি সকল মানুষকে একই মাপ ও ছাঁচে গড়তে পারতেন। তা যে গড়া হয় নি এতে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক মানুষের পূর্ণ সার্থকতার জন্য তার স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ অপরিহার্য।

মানুষ যা বলতে চায়, তা তার স্বাতন্ত্র্যেরই পরিচয় বহন করে। সকলে যে এক কথা বলবে না তা ধরেই নিতে হয় কারণ প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র। বলার বা ভাব প্রকাশের এই অধিকার তাই মৌলিক।

মানুষ তার ভাব প্রকাশ করতে পারে নানান ভাবে ও ঢঙে। পশুদের সে ক্ষমতা নেই। মানুষের এই অধিকারকে কেউ যদি হরণ করে তবে সে মনুষ্যত্বকে হরণ করে।

ভাব প্রকাশের অধিকার তাই একটি মহান মানবাধিকার।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ : ২০

(ক) প্রত্যেকেরই শান্তিপূর্ণভাবে সম্মিলিত হওয়ার এবং সংঘভুক্ত হওয়ার অধিকার রয়েছে।

(খ) কাউকেই কোন সংঘভুক্ত হতে বাধ্য করা যাবে না।

(Article : 20. (1) Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association. (2) No one may be compelled to belong to an association.)

ভাষ্য

আলোচ্য অনুচ্ছেদে একটি ইতিবাচক ও একটি নেতিবাচক বক্তব্য রয়েছে। প্রথমটি অর্থাৎ ইতিবাচকটি হচ্ছে অধিকার। এবং দ্বিতীয়টি অর্থাৎ নেতিবাচকটি হচ্ছে বাধ্যবাধকতা।

ইতিবাচক দিক : সমাবেশ ও সংঘভুক্ত হওয়ার অধিকার।

নেতিবাচক দিক : সংঘভুক্ত হতে বাধ্য না করা।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদ বিশ্লেষণ করার জন্য প্রথমেই আমরা আলোচনা করব সমাবেশ ও সংঘভুক্ত হওয়ার অধিকার নিয়ে।

সমাবেশ ও সংঘভুক্ত হওয়ার অধিকার

সমাবেশ শব্দের অর্থ হচ্ছে একত্র অবস্থান। একাধিক ব্যক্তি যখন একটি সাধারণ উদ্দেশ্য নিয়ে, এক জায়গায় মিলিত হয়, তখন আমরা তাকে সমাবেশ বলতে পারি। একত্রিত হওয়ার উদ্দেশ্য সু অথবা কু হোক, মহৎ অথবা গর্হিত হোক, সেটা মূল কথা নয়। উদ্দেশ্য একটা থাকতেই হবে। উদ্দেশহীন বা লক্ষ্যহীন জনতার মিলনকে সমাবেশ বলা যায় না। বাজারে কেনা কাটা করতে আসা বিপুল জন সমাগমকে, পার্কে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জনমণ্ডলিকে আমরা সমাবেশ বলি না।

যখন কোন লক্ষ্য হাসিলের জন্য, কোন দাবি পূরণের জন্য বা কোন বক্তব্য পেশ করার জন্য অথবা কোন কিছুর প্রতি ধিক্কার, ঘৃণা, নিন্দা প্রকাশের জন্য একাধিক মানুষ একত্রিত হয়ে

www.pathagar.com

থাকে তখন আমরা তাকে সমাবেশ বলি। চিন্তা, বিবেক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা ইত্যাদির সাথে সমাবেশের স্বাধীনতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সমাবেশের স্বাধীনতা না থাকলে ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। সমাবেশ হওয়ার জন্য সর্বনিম্ন কতজনের উপস্থিতি জরুরি—এ ব্যাপারে কোন নির্ধারিত সংখ্যা নেই। তবে বাংলাদেশের দণ্ডবিধির ১৪১ ধারায় বেআইনি সমাবেশ সম্পর্কিত যে বিধান আছে তাতে এই প্রত্যয় জন্মায় যে, সমাবেশ হওয়ার জন্য সর্বনিম্ন পাঁচজনের উপস্থিতি আবশ্যক।

সংঘের প্রয়োজনীয়তা

সংঘ বা সমিতি (Association) হল এমন এক জনসমষ্টি যার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ এক বা একাধিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একতাবদ্ধ হয়ে কতগুলো স্বীকৃত বা অনুমোদিত কার্যপ্রণালী ও আচরণের দ্বারা সুসংঘবদ্ধভাবে চালিত হয়। ম্যাকাইভার সংঘ বা সমিতির সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেন, "সংঘ বা সমিতি হচ্ছে সামাজিক ব্যক্তিবর্গের এমন এক সংগঠন—যা কোন সাধারণ স্বার্থ বা একাধিক স্বার্থ সাধনের সাথে সংশ্লিষ্ট।

জনসমষ্টি সমবেত হয়ে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘ গঠন করে যেমন, ট্রেড ইউনিয়ন, ফুটবল ক্লাব, সাংবাদিক ইউনিয়ন ইত্যাদি। বর্তমানে মানুষ পরস্পরের সাথে একটি মাত্র উদ্দেশ্য বা স্বার্থ আদানপ্রদানের জন্যও মিলিত হয়ে সংঘ গড়ে তুলে। সমাজ সংস্কার, বিশেষ গোষ্ঠী স্বার্থ রক্ষা, পেশাজীবীদের মানোন্নয়নসহ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সংঘ গড়ে উঠে। রাজনৈতিক দল হচ্ছে সর্ববৃহৎ সংঘ।

এই যে সমাবেশ বা সংঘভুক্ত হওয়ার অধিকার এটি মানুষের মৌলিক অধিকার। প্রত্যেক মানুষই তার রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন, নিপীড়ন থেকে মুক্তি, অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি সাধন, স্বকীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ ইত্যাদির জন্য সমাবেশে মিলিত হতে পারে, গড়ে তুলতে পারে সংঘ। সমাজবদ্ধ মানুষ একা একা থাকতে পারে না, তাকে বিভিন্নমুখী সমস্যা ও অবস্থা মোকাবেলার জন্য বিবিধ রকম সংঘ গড়ে তুলতে হয়। একটি সমাজে বসবাসরত মানুষের মধ্যে বহুমুখী প্রতিভা ও যোগ্যতা রয়েছে। সকলের যোগ্যতা ও ক্ষমতা এক রকম নয়। বিভিন্ন ধরনের মানুষের বিভিন্ন মাত্রার যোগ্যতাকে সমন্বিত করার জন্য সংঘভুক্ত হওয়া ছাড়া বিকল্প নেই।

সামাজিক শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য সংঘ প্রয়োজন। কেননা সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য নেতৃত্ব ও আনুগত্যের সুস্পষ্ট বিধিমালা দরকার। নেতৃত্ব না থাকলে এবং নেতার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের বিধান না থাকলে সমাজে শৃখলা থাকে না। আনুগত্য ও নেতৃত্বের কাঠামো একমাত্র সংঘের মধ্যে বিদ্যমান। নিয়ন্ত্রণহীন, বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত জনতার মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই মানুষ নিজেদের স্বার্থ হাসিল, প্রয়োজন পূরণ, লক্ষ্য অর্জন ইত্যাদির জন্য দল, সংঘ, সমিতি গড়ে তোলে। সংঘভুক্ত হওয়ার যে অধিকার সেটা যদি হরণ

www.pathagar.com

করা হয়, তাহলে মানুষের পক্ষে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকা কঠিন হবে, বোধ করি সম্ভবই হবে না।

সমাবেশ ও সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা

আর সমাবেশে মিলিত হওয়ার বা সমবেত হওয়ার অধিকার যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব এটা মানব জীবনের জন্য অত্যন্ত জরুরি। মানুষ কেন সমবেত হয়? কি দরকার সম্মিলিত হওয়ার ? অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, বিভিন্ন কারণে মানুষ সমবেত হয়, সম্মিলিত হয়।

প্রথমত, পারস্পরিক মতবিনিময়, যোগাযোগ ও ভাবের আদান প্রদানের জন্য মানুষ সম্মেলন বা সমাবেশে মিলিত হয়। নিজের মতামত অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং অন্যের মতামত জেনে নেওয়ার জন্যই মানুষ সম্মিলিত হয়। এই মতবিনিময় খুব সাধারণ বিষয়ও হতে পারে, আবার অত্যন্ত জটিল, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনেতিক বিষয় হতে পারে, হতে পারে জাতীয় জীবনের জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়।

দ্বিতীয়ত, কোন একটি নির্দিষ্ট আদর্শ বা ধর্ম প্রচারের জন্য মানুষ সমবেত হতে পারে। যিনি যে ধর্ম অবলম্বন করেন, যে আদর্শে বিশ্বাস করেন, সেই ধর্মে বা আদর্শে অন্যকে আকৃষ্ট করতে সমাবেশ করতে পারেন। তদুপরি ধর্মের কতগুলো আচার বা অনুষ্ঠান আছে যেগুলো পালনের জন্য সমাবেশ, সম্মেলন অপরিহার্য। এককভাবে সেগুলো প্রতিপালন সম্ভব নয়।

তৃতীয়ত, বিশেষ কোন এলাকার বা দেশের এক বা একাধিক সমস্যা সমাধানের জন্য জনগণ সমাবেশে মিলিত হয়ে উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করতে পারে। আইন সভাও এক প্রকার সমাবেশ। সমাজে দ্বন্দ্ব, সংঘাত, সমস্যা লেগেই থাকে। এসবের মোকাবেলার জন্য জনগণ সম্মেলনে সমবেত হয়ে আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

চতুর্থত, বিশেষ কোন স্থানে বা অঞ্চলে বিরাজিত অন্যায়, অপকর্মের প্রতিবাদ ও প্রতিকারের জন্য সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসিগণ সমবেত হয়ে তাদের মতামত, নিন্দা, ঘৃণা বা ক্ষোভ প্রকাশ করতে পারে। অধিকার বঞ্চিত মানুষ তাদের প্রতি কৃত বঞ্চনার প্রতিবাদে সম্মিলিত হতে পারে। প্রতিবাদ, প্রতিরোধের জন্য সভা সমাবেশ অপরিহার্য।

পঞ্চমত, আনন্দ বিনোদনের জন্যও মানুষ সভা সমাবেশ করতে পারে। আনন্দ এবং বিনোদন বিষয়াদি এমন যে, এর সাথে সমবেত হওয়ার বিষয়টি জরুরি। একা একা আনন্দ লাভ সম্ভব নয়, সম্ভব নয় বিনোদন করা। জনগণের বিনোদনের স্থানও এমন যে সেখানে সমবেত হতে হয়।

এ ছাড়া আরো অনেক কারণে মানুষ সমবেত হয়। জীবনের প্রয়োজনে সমবেত হতে হয়। সমবেত হওয়া ছাড়া জীবন যাপন অসম্ভব, অবাস্তব। সম্মেলন, সমাবেশ বা সমবেত হওয়ার পেছনে যে কারণ বা প্রয়োজন এতেই নিহিত রয়েছে সমাবেশের উদ্দেশ্য। সমাবেশের উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

সম্মিলিত হওয়ার অধিকার মানুষের আছে কিনা সে বিষয়ে বিতর্ক আছে, কেননা একটি বিশেষ কাজের উদ্দেশ্য মহৎ না মন্দ, সে বিষয়ে মানুষের মধ্যে বিতর্ক হতে পারে। যাই হোক সম্মিলিত হওয়ার এবং সংঘভুক্ত হওয়ার অধিকারটি মানুষের জন্য অত্যন্ত জরুরি। কেননা এই দুটি অধিকার হরণ করা হলে মানুষের মানবিক চেতনা ও মনুষ্যত্বের বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যাবে। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার এই অনুচ্ছেদে সমাবেশ ও সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে।

বাস্তবে এই অধিকার কতটুকু সংরক্ষিত ?

বাস্তবে পৃথিবীর অনেক দেশেই সমবেত হওয়ার এবং সংঘবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা বা অধিকার নেই। আধুনিক গণতন্ত্রের এই স্বর্ণযুগেও মধ্যপ্রাচ্যের শেখ, আমির বা রাজা শাসিত আরব রাষ্ট্রগুলোতে জনগণের এই অধিকার নেই। সংঘবদ্ধ হওয়ার এবং সমবেত হওয়ার অধিকার সেখানে একেবারেই সীমিত। মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে সংঘবদ্ধ হওয়া এবং সমবেত হওয়ার অধিকার সীমিত ছিল। আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা এবং এশিয়ার যে সব দেশে সামরিক শাসন অথবা একনায়কতন্ত্র কায়েম আছে, সে সব দেশে প্রায়ই সমাবেশের স্বাধীনতা এবং সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার খর্বিত হয়। তৃতীয় বিশ্বের এই অধিকারের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। ১৯৮৯ সালের জুন মাসের প্রথম দিকে চিনের রাজধানী শহর বেইজিং-এ তিয়ানমেন স্কোয়ারে সমাবেশের অভিযোগে হাজার হাজার নিরস্ত্র বিক্ষোভকারী পুলিশী নির্যাতনের শিকার হয়। এতে কমপক্ষে এক হাজার লোক মারা যায় হাজার হাজার গ্রেফতার হয়। একই বছর তিব্বতের রাজধানী লাসায় এক হাজারের বেশি লোক গ্রেফতার হয়। ১৯৮৮ সালে মায়ানমারে জনগণের সমাবেশ ও সংঘভুক্ত হওয়ার অধিকার হরণ করা হয়েছে। ভারতের কাশ্মির ও পাঞ্জাবে জনগণের এই অধিকার ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। এমনিভাবে আমাদের দেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সময়ে অসময়ে জনগণের সমবেত হওয়ার ও সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার হরণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। এর ফলে এই বিষয়ের সংশ্লিষ্ট মানুষের আরো কিছু অধিকার বিনষ্ট হয়। যেমন—চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা ইত্যাদি। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদে এই অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে।

বাংলাদেশে এই অধিকারের বাস্তবতা

স্বাধীন বাংলাদেশের বয়স দুই দশক পেরিয়ে গেছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এদেশের সাধারণ মানুষ খুব কমই স্বাধীনতা ভোগ করেছে। সভা সমাবেশ ও সংঘভুক্ত হওয়ার অধিকার এদেশে প্রায়ই খর্বিত হয়েছে। ১৯৭৫ সালে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় শাসন পদ্ধতি বাকশাল কায়েমের ফলে স্বাধীন বাংলাদেশে সর্বপ্রথম জনগণের সংঘভুক্ত হওয়ার

www.pathagar.com

এবং সভা সমাবেশের অধিকার খর্বিত হয়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময় সামরিক শাসনের আওতায় জনগণ অধিকারহীন অবস্থায় দিন কাটিয়েছে অনেকগুলো। ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ থেকে ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ নয় বছর এদেশের সাধারণ মানুষ সংগ্রাম করেছে একনায়কত্বের বিরুদ্ধে। অভিযোগ করা হয় যে, এই দীর্ঘ সময় মানুষের সভা সমাবেশের অধিকার, সংঘভুক্ত হওয়ার অধিকার, শোভাযাত্রার অধিকার খর্ব হয়েছে বার বার। সমাবেশ বানচালের জন্য পুলিশী নির্যাতন, জনগণকে লাঠিপেটা করা , মিছিলে কাঁদুনে গ্যাসের সেল নিক্ষেপ, লাঠি চার্জ এমনকি ট্রাক তুলে দেয়ার মত নির্মম ঘটনাও ঘটেছে। বাংলাদেশ যতবারই সামরিক শাসন জারি হয়েছে ততবারই মানুষের মৌলিক অধিকার স্থগিত রাখা হয়েছে। এতে সভা সমাবেশ বানচাল ইত্যাদি ঘটনা ঘটছে। সরকার স্বৈরাচারের ভূমিকার অবতীর্ণ হলেই এই সমস্যা দেখা দেয়। এর সব চেয়ে মজার দিক হচ্ছে এই যে, আজ যারা এই অধিকার হরণ করছে কাল তাদের অধিকারই হরণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এটা অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় যে এখানে প্রায় সকলের নিজের সভাসমাবেশ ও সংঘভুক্ত হওয়ার অধিকার প্রত্যাশা করে কিন্তু নিজে অন্যের অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করে না।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও এই অনুচ্ছেদ

বাংলদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৭ ও অনুচ্ছেদ ৩৮–এ মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার অনুচ্ছেদ ২০–এর প্রতিফলন হয়েছে। নিম্নে বাংলাদেশের সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ দুটি উল্লেখ করছিঃ

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৭। **সমাবেশের স্বাধীনতা :**

জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হইবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

অনুচ্ছেদ : ৩৮। **সংগঠনের স্বাধীনতা :**

জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

অনুচ্ছেদ ৩৭ অনুসারে বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিক অধিকার পেয়েছেন ,

(ক) শান্তিপূর্ণভাবে এবং নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হওয়ার এবং

(খ) জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করবার।

কিন্তু এই অধিকার জনশৃঙ্খলা ও জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধের অধীন।

"জনশৃঙ্খলার স্বার্থে" কথাটি সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই প্রথমেই এই কথাটি বিশ্লেষণ করি।

www.pathagar.com

দাঙ্গাহাঙ্গামার উদ্দেশ্য নিয়ে কোন কাজে অগ্রসর, অন্যের স্বাধীনতাকে ব্যাহত করতে পারে এমন কার্য করা, প্রভৃতি নিশ্চয়ই জনশৃঙ্খলার পরিপন্থী। সুতরাং এগুলোকে দমন করবার উদ্দেশ্যে নাগরিকের স্বাধীনতার উপর বাধানিষেধ আরোপ করা যায়। রাস্তাঘাটে কিংবা সরকারি স্থানে সমাবেশ করা কিংবা শোভাযাত্রা করা আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা নিষেধের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এগুলোই জনশৃঙ্খলার স্বার্থে।

বাংলাদেশের সংবিধানে সমবেত হওয়ার অধিকার নিরঙ্কুশ নয়। শান্তিপূর্ণভাবে এবং নিরস্ত্র অবস্থায় শুধু সমবেত হওয়া যায়। জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করবার অধিকার একই প্রকার শর্তের অধীন। অবশ্য জনস্বাস্থ্যের ও জনশৃঙ্খলার কারণে এই অধিকার সীমিত করা যায়।

বাংলাদেশের আইন ও এই অনুচ্ছেদ

ফৌজদারি কার্যবিধি আইনে ১২৭ ধারা বেআইনি জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার ক্ষমতা দিয়েছে। দণ্ডবিধি আইনের ১৫১ ধারায় ছত্রভঙ্গ হওয়ার নির্দেশ ফেলে তা না মানা অপরাধ বলে ধার্য করেছে। দণ্ডবিধি আইনের অষ্টম পরিচ্ছেদ বেআইনি জনতার সংজ্ঞা দিয়েছে। কোন জন সমাবেশ এবং শোভাযাত্রা হিংস্র হওয়ার আশংকা দেখা দিলে ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের ১৪৪ ধারা প্রয়োগ করা যায়। ১৮৬১ সালের পুলিশ আইনে জনসভা এবং শোভাযাত্রা সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবার অধিকার পুলিশকে দেওয়া হয়েছে। এ গুলো সংবিধানের পরিপন্থী নয়।

মানুষের জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা দেখা দিলে কিংবা জনসাধারণের শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার অবস্থা ঘটলে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সেই অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণমূলক আদেশের আওতায় আনতে পারেন। রাজনৈতিক জনসভা যদি হিংস্রতা এবং বিশৃঙ্খলার দিকে গতি গ্রহণ করে তখন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, যার উপর শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব রয়েছে, তিনি ১৪৪ ধারা প্রয়োগ করতে পারেন। শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রার অধিকার মৌলিক। সেই মৌলিক অধিকারকে এমনভাবে বাধা দেওয়া যায় না, যাতে অধিকারকে ছাপিয়ে বাধা বড় হয়ে ওঠে।

বিশ্বব্যাপী এখন গণতন্ত্রেরই অগ্রযাত্রা চলছে। গণতন্ত্রের মূলকথা হচ্ছে, রাষ্ট্রের সকল কর্মে সকল নাগরিকের অংশগ্রহণের ও মত প্রকাশের অধিকার। দেশে আজ যে শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান, কেউ মনে করতে পারেন যে এই ব্যবস্থা সঠিক আবার কেউ মনে করতে পারেন এটা বেঠিক। যারা বেঠিক মনে করেন তাদের অধিকার আছে, নিজের ধ্যানধারণা প্রচার করার, অন্যকে বুঝানো এবং নিজের দলে টেনে আনা। যারা সঠিক মনে করেন তাদেরও এই অধিকার আছে। সকলেই নিজ নিজ অভিমত প্রচারের জন্য সমবেত হতে পারেন, সমবেত করতে পারেন।

www.pathagar.com

অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের মত বাংলাদেশেও অনেক রাজনৈতিক দল আছে, প্রায় সকল দলের কর্মসূচি আছে, ম্যানিফেস্টো আছে,আদর্শ আছে। সেগুলো প্রচারিত না হলে দেশের প্রতি তাদের কল্যাণ প্রয়াসের কথা লোকে বুঝবে কি করে? তাই তাদের প্রয়োজন আছে জনসভা, সমাবেশ করার। এই জনসভার অধিকার তাদের মৌলিক। জনসভা দেশের জন্য কল্যাণকর হতে পারে। রাজনৈতিক দলের কথা শুনে, ম্যানিফেস্টো দেখে তাদের সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারে এবং এই জ্ঞানের ভিত্তিতে সে নির্ধারণ করতে পারে কোন দলকে সমর্থন করবে এবং তার রাজনৈতিক ভূমিকা কি হবে?

শুধু রাজনৈতিক দল কেন? ধর্মীয় সম্প্রদায়, সামাজিক সম্প্রদায়, বিদ্বান সম্প্রদায়, পেশাজীবী সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব বিষয় বুঝবার ও বুঝাবার জন্য জনসভা করতে পারে। যে কোন দল, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান, তাদের দাবিকে জোরদার করার জন্য আন্দোলন করতে পারে। শোভাযাত্রার অধিকারও তাদের আছে। সভা সমাবেশ, শোভাযাত্রা ইত্যাদির অধিকারও তাদের আছে। সভা সমাবেশ, শোভাযাত্রা ইত্যাদির অধিকার যেমন মৌলিক, এগুলোতে যোগদানের অধিকারও তেমনি মৌলিক। সমাবেশ শোভাযাত্রার অধিকার এতটা মৌলিক যে এগুলো শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে, সে বিষয়টি নিশ্চিত করাও সরকারের দায়িত্ব।

তবে জনশৃঙ্খলার কারণে এই অধিকারকে সংযত করা যেতে পারে। জনশৃঙ্খলা বলতে বুঝায় সেই অবস্থা যেখানে জনগণ শান্তিতে ও নিরাপদে থাকতে পারে। সেই কারণে গণশান্তিতে বিঘ্ন উৎপাদনকারী সবকিছুই জনশৃঙ্খলার পরিপন্থী। দণ্ডবিধির অষ্টম অধ্যায়, দণ্ডবিধির ১৫৩ (ক) ধারা, এবং ১৯৫ (ক) ধারা গণশান্তি বিঘ্নকারী আইনের বর্ণনা দিয়েছে। এই বিষয় সমূহের কতিপয় বিধান, যা দণ্ডবিধিতে বিদ্যমান, তা নিম্নে পরিবেশিত হল।

দণ্ডবিধি ধারা ১৪১ : বেআইনি সমাবেশ

পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশ বেআইনি সমাবেশ বলে অভিহিত করা হয়। যদি উক্ত সমাবেশ গঠনকারী ব্যক্তিগণের সাধারণ উদ্দেশ্য নিম্নোক্তরূপ হয় :

প্রথমত, অপরাধমূলক বল প্রয়োগ বা অপরাধমূলক বলপ্রয়োগের ভান করিয়া সরকার বা আইন পরিষদ বা কোন সরকারি কর্মচারীকে অনুরূপ সরকারি কর্মচারী হিসাবে তাহার আইনানুগ ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে ভয়াভিভূত করা ; অথবা

দ্বিতীয়ত, কোন আইন বা আইনানুগ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে বাধাদান করা ; অথবা

তৃতীয়ত, কোন দুষ্কর্ম বা অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ বা অন্যবিধ অপরাধ অনুষ্ঠান করা। অথবা

চতুর্থত, কোন ব্যক্তির প্রতি অপরাধমূলক বল প্রয়োগ বা অপরাধমূলক বল প্রয়োগের ভান করিয়া কোন সম্পত্তির অধিকার বা অর্জন করা, অথবা কোন ব্যক্তিকে রাস্তার অধিকার

www.pathagar.com

বা পানির অধিকার অথবা তদীয় দখল বা অধিকারভুক্ত অন্য কোন অশরীরি অধিকার হইতে বঞ্চিত করা ; অথবা

পঞ্চমত, অপরাধমূলক বল প্রয়োগ বা অপরাধমূলক বল প্রয়োগের ভান করিয়া কোন ব্যক্তিকে যাহা সম্পাদন করিবার জন্য সে আইনত বাধ্য নহে, তাহা করিতে বাধ্য করা বা যাহা সম্পাদন করার জন্য তাহার আইনানুগ অধিকার রহিয়াছে তাহা সম্পাদন হইতে তাহাকে বিরত করা।

ধারা ১৪২ : বেআইনি সমাবেশের সদস্য হওয়া

যে ব্যক্তি যে সব তথ্যের কারণে কোন সমাবেশ বেআইনি সমাবেশে পরিণত হয় তাহা অবগত হইয়া ও ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত সমাবেশে যোগদান করে বা উহাতে অবস্থান করে, সেই ব্যক্তি বেআইনি সমাবেশের সদস্য বলিয়া গণ্য হইবে। সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনা কারাদণ্ডে— যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ধারা ১৪৩ : শাস্তি

যে ব্যক্তি কোন বেআইনি সমাবেশের সদস্য হইবে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ ছয় মাস পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ধারা - ১৪৪। মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বেআইনি সমাবেশে যোগদান

যে ব্যক্তি মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বা অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইলে মৃত্যুদণ্ড হইতে পারে এইরূপ কোন কিছুতে সজ্জিত হইয়া কোন বেআইনি সমাবেশের সদস্য হয়, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ধারা-১৪৫

যে ব্যক্তি কোন বেআইনি সমাবেশ, আইনে বর্ণিত প্রণালীতে ভঙ্গ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, জানিয়াও অনুরূপ বেআইনি সমাবেশে যোগদান করে, বা উহাতে অবস্থান করে, সেই ব্যক্তি যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ধারা-১৪৬। দাঙ্গা

কখনও কোন বেআইনি সমাবেশ কর্তৃক বা উহার যে কোন সদস্য কর্তৃক অনুরূপ সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বল বা উগ্রতা প্রয়োগ করা হইলে, অনুরূপ সমাবেশের প্রত্যেক সদস্য দাঙ্গার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবে।

www.pathagar.com

ধারা-১৫৩ ক

যে ব্যক্তি কথিত বা লিখিত শব্দাবলির সাহায্যে বা সংকেতাদি বা দৃশ্যমান কল্পমূর্তিসমূহের সাহায্যে বা প্রকারান্তরে বাংলাদেশের নাগরিকগণের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে শত্রুতা বা ঘৃণার ভাব সৃষ্টির উদ্যোগ করে, সেই ব্যক্তি কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ধারা ১৫৩-খ

যে ব্যক্তি লিখিত বা কথিত শব্দাবলির সাহায্যে বা সংকেত সমূহের বা দৃশ্যমান কল্পমূর্তিসমূহের সাহায্যে বা প্রকারান্তরে যে কোন ছাত্র বা ছাত্রী শ্রেণী বা ছাত্রদের ব্যাপারে আগ্রহশীল বা তাদের সহিত সম্পর্কযুক্ত যে কোন প্রতিষ্ঠানকে এমন কোন রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের জন্য প্ররোচিত করে বা প্ররোচিত করার উদ্যোগ করে, যাহা গণশৃঙ্খলা নষ্ট বা খর্ব করে, অথবা যাহার গণশৃঙ্খলা নষ্ট বা খর্ব করার সম্ভাবনা রহিয়াছে, সেই ব্যক্তি কারাদণ্ডে—যাহার মেয়াদ দুই বৎসর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

এই অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় বক্তব্যটি হচ্ছে নেতিবাচক। যার মূল কথা হচ্ছে সংঘভুক্ত হতে কাউকে বাধ্য না করা। বিষয়টি কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ করা যাক।

আমরা ইতিপূর্বে সংঘ কাহাকে বলে, এর প্রয়োজনীয়তা কি—এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। এ আলোচনা থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, মানুষ নিজের প্রয়োজনে, নিজের মুক্তির জন্য, নিজের বিকাশের জন্য সর্বোপরি নিজের এবং মানবতার কল্যাণের জন্য সংঘবদ্ধ হয়। সংঘবদ্ধ হয় মানুষ নিজের ইচ্ছায় নিজের মনের তাগিদে। সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার যেমন মানুষের রয়েছে তেমনি রয়েছে স্বাধীনভাবে সংঘ পছন্দ করার। কিন্তু কোন মানুষকে যদি বিশেষ কোন সংঘভুক্ত হওয়ার জন্য বাধ্য করা হয় সেটা হবে অমানবিক। সংঘভুক্ত হওয়ার জন্য বাধ্য করা মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ করারই নামান্তর। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা বলেছে, কাউকেই কোন সংঘভুক্ত হতে বাধ্য করা যাবে না।

মানুষকে কিভাবে সংঘভুক্ত হতে বাধ্য করা হয় এবং এতে মানব মনে কি প্রতিক্রিয়া হয়, এর পরিণতিই বা কি এ বিষয়ে আমরা এবারে আলোচনা করব। বিষয়টি সহজে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য উদাহরণের মাধ্যমে তা উপস্থাপন করছি।

মনে করুন, আমাদের সমাজের একজন খেটে খাওয়া মানুষ, যে শুধুমাত্র নিজের দেহকে পুঁজি করে পরিবার পরিজনের সমন্বয়ে গড়ে উঠা একটি বড় সংসারের ঘানি টানছে, দৈহিক শ্রমই তার একমাত্র সম্বল। এমনি অবস্থায় হঠাৎ লোকটি অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং এক পর্যায়ে নিজের কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলল। এই দুর্দিনে কোন মানবিক সংস্থা তাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল। অভাবগ্রস্ত দরিদ্র এই অসহায় লোকটি ঐ সংস্থাকে তার ত্রাণকর্তা হিসেবে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করবে।

www.pathagar.com

পরবর্তীকালে এই সাহায্য সংস্থার কর্মীরা তাকে একটি বিশেষ ধর্মের প্রতি আহ্বান জানালো। তাদের নিজেদের ধর্মের প্রতি লোকটিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করলো। ইতিমধ্যে হয়তো ঐ দরিদ্র লোকটির পরিবারের কোন একজন সদস্যকে তারা কোন উপার্জনের কাজে পুনর্বাসিত করলো। লোকটি ইতিপূর্বে যে ধর্ম পালন করতো, হয়তো কোন কিছু না বুঝেও সেই ধর্মের প্রতি তার গভীর দরদ ও আন্তরিকতা ছিলো। কিন্তু আর্থিক সংকট, ক্ষুধার জ্বালা, আপাত কাজের নিশ্চয়তা ইত্যাদি বিবিধ সুবিধার হাতছানি এবং ফেলে আসা দিনগুলোর ভয়াবহ স্মৃতি তাকে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করবে। এটা সংঘভুক্ত হতে বাধ্য করার একটি উদাহরণ হতে পারে। এতে যদিও জোর করে ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে না কিন্তু বাধ্য হওয়ার মত একটা ঘটনা এখানে প্রচ্ছন্ন আছে।

সাম্প্রতিক কালের ছাত্র রাজনীতির একটি উদাহরণ দেই। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গ্রামের ছেলে এসেছে শহরে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবে। ভর্তি হলো স্বাভাবিকভাবেই কিন্তু গোল বেঁধেছে হলে সিট নেওয়ার সময়। দেখা গেল প্রতিটি হলেও নির্দিষ্ট পরিমাণ সিট বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের দখলে রয়েছে। কর্তৃপক্ষ সিট যার নামের বরাদ্দ দিক না কেন, ছাত্র নেতাদের অনুমোদন ছাড়া বাস্তবে সেই সিটের দখল পাওয়া যাবে না। এখন উপায় কি? হ্যাঁ উপায় একটা আছে এবং তা খুবই সহজ। ছেলেটির নামে যে সিট বরাদ্দ হয়েছে, সে সিট যে দলের নামে বরাদ্দ আছে সেই দলের তালিকায় নাম লিখাতে হবে। দল পছন্দ হোক বা না হোক এর পক্ষে সভা সমিতি মিছিলে যোগ দিতে হবে, শ্লোগান তুলতে হবে। বিশ্বাসের বিপরীতে হলেও কাজ করতে হবে। সংঘভুক্ত করার কি বিচিত্র উপায়। এটাও সংঘভুক্ত হতে বাধ্য করার উদাহরণ। এমন ঘটনা হরহামেশাই ঘটে, যার মাধ্যমে দেশের সচেতন একটি শ্রেণী মানবাধিকার হারায়।

রাজনৈতিক দলভুক্ত হওয়ার আরও বিচিত্র কাহিনী আছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে চাকুরির প্রত্যাশায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বেকার যুবক। কোন কোন রাজনৈতিক দল এই বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে যুবকের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয় নিজেদের কোন প্রজেক্টে। নতুন কর্মপ্রাপ্ত যুবক তাদের ক্ষমতার আওতায় চলে আসে। প্রথমে তারা যুবককে সহজভাবে নিজেদের দলে যোগদানের আহ্বান জানায়। এই আহ্বান প্রত্যাখাত হলে চাকরি কেড়ে নেওয়ার হুমকি আসে। এতে অনেক যুবকই পরাজিত হয়। নিষ্ঠুর বাস্তবতা তাদেরকে তাদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তৎপর হতে বাধ্য করে। সংঘভুক্ত হওয়ার জন্য এভাবে বাধ্য করা মানবাধিকারের পরিপন্থী।

শুধু রাজনৈতিক দল বা ছাত্র সংগঠনই নয়, বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী সংগঠনেও বিভিন্ন নিরীহ, নিরপরাধ মানুষকে অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য করা হয়। কোন কারণে একবার এই চক্রে জড়িয়ে পড়লে বের হওয়ার আর কোন উপায় থাকে না।

মনে করুন, এক বেকার যুবক। তার মা মৃত্যুশয্যায়। অপারেশনের জন্য টাকা দরকার। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত জন সকলের দ্বারে দ্বারে ঘুরে ব্যর্থ হয়ে যখন নৈরাশ্যে

www.pathagar.com

হাবুডুবু খাচ্ছে, তখনই কোন অপরাধী চক্র তার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল, শর্ত একটাই তাদের কিছু জিনিস কারো কাছে পৌঁছে দিতে হবে। নিরূপায় যুবক বাধ্য হল সেই সহজ শর্ত মেনে নিতে। সেই যে ঢুকল চক্রে আর বের হবার কোন পথ থাকল না। এভাবে কত মানুষকে সংঘভুক্ত হতে বাধ্য করা হচ্ছে। সংঘভুক্ত করার এ জাতীয় পন্থা মানুষের মানবাধিকার হরণ করে। কোন যুক্তি কোন অজুহাত বা কোন উপায়ে মানুষের এই অধিকার হরণ করা যাবে না। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় এই নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সরকারিভাবে মানুষকে সংঘভুক্ত হতে বাধ্য করে এমন নজিরও বিরল নয়। যে সব দেশে মার্কসীয় সমাজতন্ত্র কায়েম ছিল বা আছে, সে সব দেশে সরকারিভাবে স্বীকৃত রাজনৈতিক দল হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি। অন্য কোন রাজনৈতিক দল গঠন নিষিদ্ধ থাকার কারণে সেখানে স্বাধীনভাবে সংঘভুক্ত হওয়ার অধিকার যেমন খর্ব হয়েছে, তেমনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হতে বাধ্য করে মানবাধিকারের আরেকটি বিধান লঙ্ঘন করা হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দেশে সংঘভুক্ত হওয়ার স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে আবার সংঘভুক্ত হতে বাধ্য করা হয়েছে। দুটিই মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার পরিপন্থী।

বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধিনীর মাধ্যমে দেশের শাসন ব্যবস্থায় যে মৌলিক পরিবর্তন আনা হয় এতে দেশে একদলীয় শাসন চালু হয়। তখন সরকার অনুমোদিত একমাত্র জাতীয় রাজনৈতিক দল "বাকশাল"। সকল নাগরিককে এই দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করা হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়।

এ ছাড়াও ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়া প্রভৃতি আরব রাষ্ট্রসমূহে সরকার অনুমোদিত একমাত্র রাজনৈতিক দলভুক্ত হতে হয় জনসাধারণকে। এই বাধ্যবাধকতা মানবাধিকার সম্মত নয়। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদ মানুষকে সংঘভুক্ত হতে বাধ্য করতে নিষেধ করেছে। ইসলাম মানুষের সংঘভুক্ত হওয়ার অধিকার এবং কোন সংঘভুক্ত হতে বাধ্য না করতে বলেছে।

এই অনুচ্ছেদ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তি

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদের সাথে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তির সামঞ্জস্য রয়েছে। নিম্নে তা পরিবেশিত হলো।

পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি

অনুচ্ছেদ : ২১

(১) শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার স্বীকার করতে হবে। এ অধিকার প্রয়োগের উপর আইনানুযায়ী ব্যতীত এবং একটি গণতান্ত্রিক সমাজে জাতীয় নিরাপত্তা অথবা জননিরাপত্তা,

www.pathagar.com

জনশৃঙ্খলা, জনস্বাস্থ্য অথবা নৈতিকতা অথবা অন্যান্যের অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের স্বার্থে যেরূপ অবশ্যক প্রয়োজন সেইরূপ ব্যতীত, কোন বাধানিষেধ আরোপ করা যাবে না।

মানবাধিকার সংক্রান্ত ইউরোপীয় কনভেনশন

অনুচ্ছেদ : ১১

(১) প্রত্যেক ব্যক্তির শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হওয়ার স্বাধীনতার অধিকার এবং নিজের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন বা এতে যোগদানের অধিকার সহ অন্যান্যের সাথে সমিতি বা সংঘ গঠন করার স্বাধীনতা আছে।

(২) আইনের দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হয় এবং একটি গণতান্ত্রিক সমাজে জাতীয় নিরাপত্তা, অথবা জন নিরাপত্তার স্বার্থে বিশৃঙ্খলা অথবা অপরাধ নিরোধের জন্য, স্বাস্থ্য অথবা নৈতিকতা সংরক্ষণের জন্য অথবা অন্যান্যের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যেরূপ প্রয়োজন হয় সেইরূপ ব্যতীত এই অধিকারসমূহ ব্যবহারের উপর কোন বাধিনিষেধ আরোপ করা যাইবে না। এই অনুচ্ছেদ রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী, পুলিশ অথবা প্রশাসনের সদস্যগণ কর্তৃক অধিকারসমূহ প্রয়োগের উপর আইনসম্মত বাধানিষেধ আরোপে বাধাদান করবে না।

ইসলাম ও এই অনুচ্ছেদ

সভা সমাবেশ, সংঘ এবং পছন্দের স্বাধীনতা ইসলামে নিশ্চিত করা হয়েছে। ইসলাম আমর বিন মারকে ও নাহি আনিল মুনকার অর্থাৎ ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধের জন্য সভা সমিতির অধিকার দিয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছে,

"তোমরা সর্বোত্তম জাতি, মানব জাতির হেদায়াত ও সংশোধনের জন্য তোমাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে, তোমরা ন্যায়ের আদেশ দেবে, অন্যায়ের প্রতিরোধ করবে, এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে। (৩ ঃ ১১০)

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল, অবশ্যই থাকা উচিৎ যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, এবং সৎ কাজের নির্দেশ দিবে ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ করবে।" (৩ ঃ ১০৪)

ইসলাম ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধের জন্য সভা সমাবেশ, সম্মেলন ইত্যাদির আহ্বান ও আয়োজন করতে বলেছে এবং সংঘ বা সমিতি গঠনের অনুমতি দিয়েছে। মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকার সংরক্ষণ, অভিযোগ খণ্ডন এবং সমস্যা সমাধানের জন্য সংগঠন প্রতিষ্ঠা এবং সভা সমাবেশ ও সম্মেলন করা যায়। কিন্তু কাউকে কোন সংঘভুক্ত হতে বাধ্য করতে নিষেধ করেছে, এমনকি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে কাউকে বাধ্য করা যাবে না। কোরআনে বলা হয়েছে,

"আর যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন, তবে এরা শিরক্ করত না, আর আমি আপনাকে এদের পর্যবেক্ষক করিনি এবং আপনি ক্ষমতাপ্রাপ্তও নন।" (আনআম : ১০৭)

www.pathagar.com

"এবং যদি তোমাদের প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন তবে নিশ্চয়ই পৃথিবীতে যা আছে তারা সকলেই একযোগে বিশ্বাস স্থাপন করত। তবে কি সকলে বিশ্বাসী না হওয়া পর্যন্ত তুমি লোকদের প্রতি বলপ্রয়োগ করবে?" (সূরা ইউনুছ : ৯৯)

সারসংক্ষেপ

প্রত্যেক মানুষ যেমন স্বতন্ত্র এবং একক আবার প্রত্যেক মানুষই তেমনি তার বাঞ্ছিত দলের বা গোষ্ঠীর বা সম্প্রদায়ের অংশ। এক অংশের অধিকার আছে অন্য অংশের সাথে মিলিত হবার এবং মিলিত হয়ে কোন অভীষ্টকে পূর্ণ করবার।

একজন যা ভাবে তার ভাবনা যে পাগলামী নয় এটা প্রমাণ করবার জন্য প্রয়োজন পড়ে তার ভাবনাকে অন্যের মনে সঞ্চারিত করবার। এই সঞ্চরণের ফলে গড়ে উঠে দল, গড়ে উঠে গোষ্ঠী। সমমনা মানুষেরা সংঘ গড়ে। সকলের মনে যখন একই ভাবনা এবং অভীষ্ট যখন একই তখন তাদের বল হয় বেশি। এই বলের প্রভাবেই তারা কামিয়াব হয়।

সুতরাং সংঘ গঠনের যে অধিকার তা মৌলিক। তবে এই সংঘের ভিত্তি হতে হবে স্বেচ্ছামূলক। সংখ্যাগুরুর সংঘ দাবি করতে পারবে না সংখ্যালঘুর দলকে তাদের সাথে মিলে যেতে বা দল পরিবর্তন করতে। কোন প্রভাব বা শক্তি দলভুক্তির ভিত্তি হতে পারবে না। এই অধিকারও মৌলিক এবং এগুলো মানবাধিকার।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

(ক) প্রত্যক্ষভাবে অথবা অবাধে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিজ দেশের সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে।

(খ) প্রত্যেকেরই নিজ দেশের সরকারি চাকুরিতে সমান প্রবেশাধিকার রয়েছে।

(গ) জনগণের ইচ্ছাই সরকারের ক্ষমতার ভিত্তি হবে ; এই ইচ্ছা সর্বজনীন ও সমান ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নিয়মিত ব্যবধানে এবং প্রকৃত নির্বাচন দ্বারা ব্যক্ত হবে ; গোপন ব্যালট অথবা অনুরূপ অবাধ ভোটদান পদ্ধতিতে এরূপ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

Article : 21.

(1) Everyone has the right to take part in the government of his country directly or through freely chosen representatives.

(2) Everyone has the right of equal access to public service in his country.

(3) The will of the people shall be the basis of the authority of government. This will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.)

www.pathagar.com

ভাষ্য

বিশ্লেষণের সুবিধার্থে আলোচ্য অনুচ্ছেদকে আমরা তিনটি ভাগে বিভক্ত করবো। প্রথম ভাগে রয়েছে নিজ দেশের সরকারে অংশগ্রহণের অধিকারের কথা। এতে বলা হয়েছে "প্রত্যক্ষভাবে অথবা অবাধে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিজ দেশের সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।" আলোচ্য অনুচ্ছেদের বর্ণিত অংশটুকু অনুধাবন করতে হলে আমাদেরকে নিজের দেশের রাষ্ট্র, সরকার, জনগণের সরকারে অংশগ্রহণ, নির্বাচন, জনপ্রতিনিধিত্ব ইত্যাদি বিষয়গুলো আলোচনা করতে হবে। প্রথমেই আমরা দেখবো নিজ দেশ বলতে কি বুঝায়?

নিজ দেশ

ব্যক্তি যে রাষ্ট্রের নাগরিক সেটা হচ্ছে তার নিজ দেশ। একজন ব্যক্তি একাধিক রাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারে। সেই কারণে একাধিক দেশ তার নিজ দেশ বলে গণ্য হতে পারে। এক ব্যক্তির একই সঙ্গে একাধিক রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ার বিষয়টি আলোচনার পূর্বে আমরা রাষ্ট্রের বিষয়ে খানিকটা আলোকপাত করবো।

রাষ্ট্র হচ্ছে মানব সমাজের আধুনিকতম কার্যকর রাজনৈতিক সংগঠন। মানব সমাজের আদিমতম সংগঠন পরিবারের বিবর্তন ও পরিবর্তনের রূপ। মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতাবোধ থেকেই রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে। রাষ্ট্রের সংজ্ঞা এবং ধরণ যুগে যুগে পরিবর্তিত হতে হতে বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। রাষ্ট্র সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যে বক্তব্য রেখেছেন নিম্নে তার সংক্ষেপে উল্লেখ করা হচ্ছে।

গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল রাষ্ট্র সম্পর্কে বলেছেন যে, কতিপয় গ্রাম ও পরিবারের সমন্বয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং মানব সমাজের কল্যাণ সাধনই এর লক্ষ্য। উড্রো উইলসন বলেন, কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সুসংগঠিত জনসমষ্টিকে রাষ্ট্র বলে। ব্লান্টসলি বলেন, একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের আওতাধীনে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত জনসমাজই রাষ্ট্র। অধ্যাপক বার্জেস এর মতে, মানব জাতির কোন একটি বিশেষ অংশ সংঘবদ্ধ হয়ে বাস করলে রাষ্ট্র গঠিত হয়। অধ্যাপক গার্নার বলেন, রাষ্ট্র হল স্বল্প সংখ্যক অথবা অধিকসংখ্যক এমন একটি জনসমাজ যারা কোন একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, যারা বহিঃশত্রুর নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং যাদের একটি সুসংগঠিত সরকার আছে, যার প্রতি ঐ জনসমাজ স্বভাবতই অনুগত। অতএব, রাষ্ট্র বলতে এমন একটি জনসমষ্টি বুঝায় যারা একটি সুসংগঠিত সরকারের মাধ্যমে বাইরের নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত থেকে কোন একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর প্রদত্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, রাষ্ট্র গঠনে

www.pathagar.com

চারটি উপাদান কাজ করে। এই মৌলিক উপাদানগুলো হচ্ছে জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূ-কণ্ড, সরকার এবং সার্বভৌমত্ব।

জনসমষ্টি হচ্ছে রাষ্ট্রের মূল বিষয়। জনগণের জন্যই রাষ্ট্র গড়ে উঠে। তাই জনগণ ছাড়া রাষ্ট্রের ধারণা অসম্ভব। রাষ্ট্রের জীবনী শক্তি হচ্ছে জনগণ। তবে রাষ্ট্রের জনসংখ্যা কত হবে তার কোন সুনির্দিষ্ট পরিমাণ নেই। কোন রাষ্ট্রের জনসংখ্যা কয়েক হাজার আবার কোন রাষ্ট্রের জনসংখ্যা একশ কোটিও হতে পারে। জনগণের জন্যই রাষ্ট্র নামের এই রাজনৈতিক সংগঠনটি মানুষ গড়ে তোলে।

কোন রাষ্ট্রে বসবাসরত সকল মানুষই এর নাগরিক হবে এমন কোন কথা নেই। নাগরিক হচ্ছেন রাজনৈতিক সমাজের সে সব সদস্য, যারা উক্ত সংশ্লিষ্ট সমাজের প্রতি প্রয়োজনীয় কর্তব্য পালন করতে বাধ্য থাকেন এবং এর কর্তৃত্বাধীনে সকল প্রকার সুযোগ সুবিধায় অংশগ্রহণ করবার সমান অধিকারী হন। আধুনিক কালে নাগরিক সম্পর্কিত ধারণার আরো বিস্তৃতি ঘটেছে। অধ্যাপক লাস্কির মতে, রাষ্ট্রের সুযোগ সুবিধার অংশভোগী হলেই তাকে নাগরিক বলা চলে না। কারণ বিদেশীরা রাষ্ট্রের কাছে অনেক সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন। অনেকের মতে, নাগরিক হলো সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের ভিতর স্থায়ীভাবে বসবাস করে, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য পোষণ করে, রাষ্ট্র কর্তৃক দেয় সুযোগ সুবিধা ভোগ করে এবং বিনিময়ে রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালনে মনোনিবেশ করে। এবং সদাসর্বদা রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনে ব্রতী থাকে। নাগরিকতা সম্পর্কিত বিভিন্ন সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, নাগরিকদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্টগুলো হচ্ছে —নাগরিক রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য পোষণ করে, রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারসমূহ ভোগ করে, রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করে, রাষ্ট্রের কল্যাণ কামনা করে। নাগরিক হওয়ার প্রধান উপায় হচ্ছে জন্মসূত্র। কোন ব্যক্তির পিতামাতা যে রাষ্ট্রের নাগরিক জন্মসূত্রে তিনি সেই রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব স্বাভাবিকভাবেই লাভ করেন। এজন্য কোন আবেদন করার দরকার হয় না। আবার পিতামাতা যে দেশেরই নাগরিক হোন না কেন সন্তান যে দেশে জন্মগ্রহণ করবে জন্মস্থান নীতির আলোকে সে সেই দেশের নাগরিক হবে, তার পিতামাতা সে দেশের নাগরিক না হলেও।

তাছাড়া অনুমোদন সূত্রেও নাগরিকতা লাভ করা যায়। অনুমোদনসূত্রে নাগরিকত্ব অর্জনের জন্য সাধারণত কিছু শর্ত পালন করতে হয়। শর্তগুলো হচ্ছে, বিবাহ করা, সম্পত্তি ক্রয় করা, বহুদিন ধরে বসবাস করা, সেনাবাহিনীতে যোগদান, ভাষা জানা, চাকরি গ্রহণ, সচ্চরিত্রের অধিকারী হওয়া ইত্যাদি। অবশ্য নাগরিকত্ব অনুমোদন সূত্রে ও জন্মস্থান নীতিতে লাভ করার বিষয়টি নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের নাগরিকতা বিষয়ক আইনের উপর।

আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধান অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ দেশের সরকারে অংশগ্রহণের অধিকারী। কিন্তু কোন কারণে যদি সে নাগরিকত্ব হারায় তাহলে উক্ত অধিকার

www.pathagar.com

থেকেও সে বঞ্চিত হবে। নাগরিকত্ব বিভিন্নভাবে খোয়া যেতে পারে। কেউ যদি স্বেচ্ছায় তার নাগরিকত্ব ত্যাগ করে তাহলে সে নাগরিকত্ব হারাবে। রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া দীর্ঘদিন নিজ রাষ্ট্র থেকে অনুপস্থিত থাকলে তার নাগরিকত্ব বিলুপ্ত হতে পারে। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, রাষ্ট্রীয় আদর্শ তথা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ করলে নাগরিকত্ব খোয়া যেতে পারে। সামরিক বাহিনীর কোন সদস্য গুরুতর কোন অপরাধ করলে, কিংবা অন্য রাষ্ট্রের উপাধী গ্রহণ করলে তাঁর নাগরিকত্ব বিলুপ্ত হতে পারে। অন্য রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলে নিজ দেশের নাগরিকত্ব হারায়। এমনিভাবে যারা স্বেচ্ছায় অথবা কোন কারণে নাগরিকত্ব হারায় তারা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অধিকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়। নাগরিক ছাড়া রাষ্ট্রের সরকার গঠন বা সরকারে অংশগ্রহণের প্রশ্নই উঠে না। তাই আলোচ্য অনুচ্ছেদে কোন ব্যক্তির রাষ্ট্রের কাছে যে অধিকারের বয়ান দেওয়া হয়েছে তা লাভের পূর্বশর্ত হচ্ছে নাগরিকত্ব অর্জন বা ধারণ।

প্রত্যেক নাগরিক তার দেশের সরকারে অংশগ্রহণ করতে পারেন। তিনি প্রত্যক্ষভাবে সরকারে অংশ নিতে পারেন অথবা অবাধে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে। সবকারে অংশগ্রহণের বিষয় এবং পদ্ধতি আলোচনার পূর্বে আমরা সরকার কাকে বলে এর রূপ ও প্রকৃতি কেমন তা পর্যালোচনা করব।

সরকার

সরকার হচ্ছে একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, যার মাধ্যমে রাষ্ট্র তার কার্যাবলী সুসম্পন্ন করে থাকে। সরকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্র তার ইচ্ছাসমূহের বাস্তবায়ন ঘটায়। রাষ্ট্রের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা, জনকল্যাণ সুনিশ্চিত করা সরকারের পবিত্র দায়িত্ব। অতএব সরকার হলো শাসনকার্য সম্বন্ধীয় সংগঠন। জনসাধারণের বেশীরভাগ অংশই এই সরকারের প্রতি আনুগত্য পোষণ করে। রাষ্ট্রিয় কার্যাবলী সুসম্পন্ন করার জন্য আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের সাথে সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসমূহ সরকার বলে পরিগণিত হয়। কেউ কেউ সরকারকে রাষ্ট্রের মস্তিষ্ক হিসেবে অভিহিত করেন। বস্তুত যে সব ব্যক্তিবর্গ রাষ্ট্র পরিচালনা করেন তাদের সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানের নাম সরকার। অনেক সময় দেখা যায় যে, রাষ্ট্র ও সরকার একই অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। দুটি একাকার হয়ে যায়। অথচ রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান।

রাষ্ট্র একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান। এর মৌলিক উপাদান চারটি, যথা ঃ জনসমষ্টি, ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব। রাষ্ট্র নামক একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠানের একটি অপরিহার্য ও মৌলিক উপাদান হচ্ছে সরকার। রাষ্ট্র ছাড়া সরকারের প্রয়োজন নেই আবার সরকার ছাড়া বাস্তবে রাষ্ট্র চলতে পারে না। সকল রাষ্ট্রের মৌলিক প্রকৃতি অভিন্ন কিন্তু সকল সরকারের রূপ এক নয়। সরকার বিভিন্ন রূপের হতে পারে। রাষ্ট্র কমবেশি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের মানচিত্র বা সীমানা ও সংখ্যা যে পরিবর্তন হয় না তা নয়, তবে তা খুবই ধীর এবং সময় সাপেক্ষ। কিন্তু সরকার

www.pathagar.com

প্রায়ই পরিবর্তন হয় এবং এই পরিবর্তনই সরকারের জন্য স্বাভাবিক। রাষ্ট্র গঠিত হয় দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীকে নিয়ে আর সরকার গঠিত হয় নাগরিকদের মধ্য থেকে নির্বাচিত স্বল্প সংখ্যক মানুষ নিয়ে। রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন একটি রাজনৈতিক ধারণা। আর সরকার হচ্ছে রাষ্ট্রের পক্ষে সার্বভৌম ক্ষমতা চর্চা করার একটি বাস্তব প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জনগণের কোন অভিযোগ থাকে না কারণ রাষ্ট্র জনগণের সকল অধিকারের উৎস। সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের অভিযোগ থাকতে পারে, কেননা সরকার অন্যায়ভাবে জনগণের অধিকার হরণ করতে পারে।

রাষ্ট্র নামক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করে সরকার। সরকার কিছু সংখ্যক নাগরিকের সমন্বয়ে গড়ে উঠা প্রতিষ্ঠান। সরকার কতিপয় ব্যক্তির সমষ্টি। যে সব ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে সরকার গড়ে ওঠে, তারা দেশের বা রাষ্ট্রের নাগরিক। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কোন কোন নাগরিককে নিয়ে সরকার গড়ে উঠে? সকল মানুষই কি সরকারে অংশ নিতে পারে? যাদের নিয়ে সরকার গড়ে উঠে এবং যারা সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে না তাদের মধ্যে কি সম্পর্ক। সরকারের রূপ ও প্রকৃতি এবং সরকারে অংশগ্রহণের উপায় ও প্রক্রিয়া কি সে সম্পর্কে ধারণা নিতে হবে। এবারে আমরা আলোচনা করব সরকারের রূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে। আলোকপাত করব কিভাবে সরকার গড়ে উঠে, সে বিষয়টিও।

সরকারের রূপ ও প্রকৃতি

মানব সভ্যতা বিবর্তনের ফসল। যুগে যুগে মানুষের চিন্তাধারা বিকশিত হয়েছে। মানুষের রাজনৈতিক চিন্তাধারাও বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়ে ধাপে ধাপে এসে দাঁড়িয়েছে বিশ শতকের শেষ প্রান্তে। মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা ও চেতনার বিকাশ কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং সরকারের রূপ ও প্রকৃতি একেবারে স্থির বা অনড় নয়। প্রাচীন কালের রাষ্ট্র ও সরকার পদ্ধতি যেমন ছিল মধ্যযুগে তেমনটি দেখা যায় নি, আধুনিককালেও তেমনটি নেই যেমনটি ছিল মধ্যযুগে। সব কিছুতেই এসেছে নতুনত্ব। সরকারে জনগণের অংশগ্রহণ নির্ভর করে সরকারের প্রকৃতির উপর। সরকার বিভিন্ন রকমের হতে পারে।

প্রথমত, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার অবদান ও প্রয়োগ বিধির উপর ভিত্তি করে সরকারকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা : গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র । গণতন্ত্রে জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। একনায়কতন্ত্রে এক ব্যক্তির হাতে রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে এবং তিনি তার ইচ্ছামত রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। অতএব একনায়কতন্ত্রে জনগণের সরকারে অংশগ্রহণ সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতালাভের নীতি ও নিয়োগ পদ্ধতির ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সরকারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : প্রজাতান্ত্রিক সরকার ও সীমিত রাজতান্ত্রিক সরকার। যেখানে জনগণ একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য রাষ্ট্রপ্রধানকে নির্বাচন করে, অর্থাৎ

www.pathagar.com

রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন সেটা প্রজাতান্ত্রিক সরকার। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যেখানে উত্তরাধিকার সূত্রে বা বংশানুক্রমিক নীতির ভিত্তিতে নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন এবং সীমিত কর্তৃত্ব ভোগ করেন তা সীমিত রাজতান্ত্রিক সরকার। যেমন বৃটেন।

তৃতীয়ত, সংসদ ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সরকারকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকার, ও রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার। মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকারে শাসন বিভাগ তথা মন্ত্রীপরিষদ সরকার পরিচালনা করে এবং আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকে। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে শাসন বিভাগ আইন বিভাগের নিকট দায়ী নয়। এতে রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি। তাকে কেন্দ্র করে শাসনকার্য আবর্তিত হয়। তার কার্যে সহযোগিতার জন্য তার নিকট দায়ী একটি মন্ত্রীপরিষদ থাকে। রাষ্ট্রপতি আইন পরিষদের নিকট দায়ী নয়।

চতুর্থত, কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বন্টনের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সরকারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ও এককেন্দ্রীক সরকার। যেখানে সংবিধান অনুসারে একটি মাত্র সরকারের হাতে শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে তখন তাকে এককেন্দ্রীক সরকার বলে। যখন সংবিধানের ভিত্তিতে কেন্দ্র ও অংগরাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বন্টিত হয় তখন তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলে। গণতান্ত্রিক শাসন, সেটা এককেন্দ্রীক বা যুক্তরাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রপতি শাসিত বা মন্ত্রীপরিষদ শাসিত, প্রজাতান্ত্রিক বা সীমিত রাজতান্ত্রিক যাই হোক না কেন এতে জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকারে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু স্বেচ্ছাচারতন্ত্রে সেই সুযোগ থাকে না। স্বেচ্ছাচারতন্ত্র বিভিন্ন রকম হতে পারে। যথা : নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র, সামরিকতন্ত্র। এগুলোর প্রত্যেকটি আবার কর্তৃত্ববাদী বা সর্বাত্মকবাদী হতে পারে। যাই হোক স্বেচ্ছাচারতন্ত্রে জনগণের পক্ষে সরকারে অংশগ্রহণের সামান্যতম সুযোগও থাকে না। একমাত্র গণতন্ত্রেই জনগণের পক্ষে সরকারে অংশ নেওয়া সম্ভব। এবার আমরা জনগণের পক্ষে সরকারে অংশগ্রহণের বিষয়টি আলোচনা করবো।

গণতন্ত্র ঃ সরকারে জনগণের অংশগ্রহণ

গ্রিক শব্দ demos এবং kratia শব্দদ্বয় থেকে যে ইংরেজি democracy শব্দটির উদ্ভব তার বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে গণতন্ত্র। demos এবং kratia শব্দদুটির অর্থ যথাক্রমে people এবং power, জনগণ এবং ক্ষমতা। অতএব উৎপত্তিগত অর্থে গণতন্ত্র অর্থ হচ্ছে জনগণের ক্ষমতা। আধুনিক কালে গণতন্ত্র বলতে এমন এক ধরনের শাসন ব্যবস্থা বুঝায় যেখানে জনগণ প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিজেদের শাসন কায়েম করে, সরকারে অংশগ্রহণ করে। গণতন্ত্র সম্পর্কে অধ্যাপক সিলি বলেছেন, এটা এমন এক শাসন ব্যবস্থা, যাতে সমাজের প্রত্যেকেরই অংশীদারিত্ব রয়েছে। সি. এফ. স্টং বলেন "শাসিতের

www.pathagar.com

সক্রিয় সম্মতির উপর যে সরকার প্রতিষ্ঠিত তাকে গণতন্ত্র বলে। " আব্রাহাম লিংকনের ভাষায়, জনগণের কল্যাণের জন্য, জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত ও জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থাই গণতন্ত্র।

গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ঃ গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থাকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাবো যে, গণতন্ত্র শাসিতের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। দেশের বেশিরভাগ জনগণই এ অবস্থায় তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ পায়। এতে জনগণই রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস। এই শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল গঠন, মতপ্রকাশ এবং সরকারের সমালোচনার স্বীকৃতি রয়েছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের স্বার্থ রক্ষাই হচ্ছে এর বৈশিষ্ট্য। আইনের শাসন, সামাজিক সাম্য, ন্যায়বিচার গণতন্ত্রের অন্যতম পূর্বশর্ত। জনগণের ইচ্ছানুসারে সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকার গঠন ও পরিবর্তন গণতান্ত্রিক সমাজের অপরিহার্য নিদর্শন। অতএব সরকারে জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়টি এতে প্রায় সুনিশ্চিত। প্রশ্ন হচ্ছে এই অংশগ্রহণ প্রত্যক্ষ হবে নাকি পরোক্ষভাবে প্রতিনিধির মাধ্যমে হবে। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদে দুটি পদ্ধতির কথাই বলা হয়েছে।

সরকারে অংশগ্রহণ ঃ প্রত্যক্ষভাবে

সরকারে জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, গণতান্ত্রিক সরকার দু'ধরনের। যথা ঃ প্রত্যক্ষ এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বলতে সেই ধরনের শাসন ব্যবস্থাকে বুঝায়, যেখানে প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকগণ সরকারি কার্যাদি সম্পাদনের নিমিত্ত সরাসরি তাদের অভিমত প্রকাশ করতে পারে। আইন প্রণয়ন, কর ধার্য, বাজেট প্রণয়ন ও অনুদান, কর্মকর্তা বাছাই ও মনোনয়ন ইত্যাদি সরকারি কাজকর্ম সরাসরি নাগরিকদের মতামত প্রকাশের আওতাধীন। প্রাচীন গ্রিসে এ ব্যবস্থা চালু ছিল। বর্তমানে সুইজারল্যাণ্ডের পাঁচটি ক্যান্টনে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র চালু আছে। বৃহদায়তন রাষ্ট্র এবং অতিরিক্ত জনসংখ্যার দেশগুলোত প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সম্ভব নয়। বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রই এখন বহুল পরিমাণে জনসংখ্যা অধ্যুষিত। আয়তনও অনেক বিশাল। নগর রাষ্ট্রের নাগরিকদের মত জাতীয় রাষ্ট্রের নাগরিকদের একত্রে মিলিত হয়ে শাসন কার্য পরিচালনা করা, আইন প্রণয়ন করা, বিচারকার্য সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। সকলে মিলে প্রত্যক্ষ শাসন চালালে অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, হানাহানি ইত্যাদি লেগেই থাকবে। তাছাড়া এতে সময় ও সম্পদের অপচয় হবে অনেক বেশি। তাই আধুনিককালে সকল নাগরিকের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে দেশের সরকারে অংশগ্রহণ সম্ভব নয়। অতএব প্রত্যেকের নিজ দেশের সরকারে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের অধিকার এখন বাস্তবায়ন খুবই দুরূহ। বরং অবাধে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিজ দেশের সরকারে অংশগ্রহণের অধিকারই বর্তমানে অধিকতর উপযোগী। এটা হচ্ছে পরোক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এবার আমরা প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সরকারে অংশগ্রহণের ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করব।

www.pathagar.com

প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ

জনপ্রতিনিধিত্বের সঠিক ধারণা নির্ধারণ করা নিয়ে পরস্পর বিরোধী মতবাদ দীর্ঘকাল থেকে চালু আছে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় আইনসভা নিজেকে জনসাধারণের প্রতিনিধির ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট। এমনকি একনায়কও কখনও কখনও নিজেকে জনগণের যথার্থ প্রতিনিধি হিসেবে দাবি করেন। সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আইনসভাকে জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধির মর্যাদা দিতে চান না। তারা বলেন, এ জাতীয় আইন সভা বিত্তবান ও প্রভুত্বকামী শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। অন্যদিকে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ব্যক্তিগত সমষ্টিবাচক প্রতিনিধিত্বের তত্ত্বকে তাদের গণতান্ত্রিক মানদণ্ডের বিচারে অগণতান্ত্রিক আখ্যা দেন। কোন আইনসভাকে প্রতিনিধিত্বমূলক বলার অর্থ এই নয় যে, আইন সভা দেশের সমগ্র অঞ্চলের সকল বয়স, শ্রেণী ও ও পেশার প্রতিনিধিত্ব করে। প্রকৃত প্রতিনিধিত্বের অর্থ হচ্ছে জনসাধারণের দ্বারা সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনসভা গঠিত হবে। আইনসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জনসাধারণের নিকট প্রদত্ত অঙ্গীকার অনুযায়ী কাজ করে তাদের দাবি পূরণের প্রয়াস চালাবেন। জনসাধারণ ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পারস্পরিক আনুগত্য ও সুসম্পর্কের মনোভাব প্রতিনিধিত্বের যথার্থতা বিচার করবে। যদিও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিনিধি নির্বাচনের পর তাদের উপর জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা খুবই কম থাকে এবং পুনরায় নির্বাচনের সুযোগ না এলে প্রতিনিধিদের মূল্যায়নের সম্ভাবনা থাকে না তথাপি নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতিভূ। উপযুক্ত রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক ব্যবস্থার মাধ্যমেই এই প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়।

উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ধারণা মানুষের স্বাভাবিক অধিকার, ভোটাধিকারের সমতা, ইত্যাদি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ১৭৭৬ সালে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্যেও সমতা এবং প্রাকৃতিক অধিকারের সুস্পষ্ট স্বীকৃতি দেখতে পাওয়া যায়। প্রতিনিধিত্বের এই ধারণা অনুসারে প্রতিনিধি কোন বিশেষ সামাজিক শ্রেণীর স্বার্থের, পেশার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন না। ভৌগোলিক দিক থেকে চিহ্নিত কোন নির্বাচনী এলাকার, তার জনসাধারণের, তাদের স্বার্থের ও মতামতের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে।

এর অন্যতম স্বীকৃত বৈশিষ্ট্য হল, মানুষের যুক্তি ও বিবেচনার উপর অপরিসীম আস্থা। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের স্বার্থ, সামাজিক দাবি ও নিজ মতামতের বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণার অধিকারী। সুতরাং সবদিক বিবেচনা করে ভোট দাতারা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। অবশ্য অনেকে জনপ্রতিধিত্বকে প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব হিসেবে কার্যকর করার জন্য সর্বজনীন ভোটাধিকারের পূর্বশর্ত হিসেবে সর্বজনীন শিক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন। কারণ জনগণের যুক্তি ও বিবেচনার ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য প্রয়োজন সর্বজনীন শিক্ষার প্রসার। এতে সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে জনসাধারণের সার্বভৌম রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রকাশের সুষ্ঠু ব্যবস্থা চালু করা হয়। নির্বাচিত প্রতিনিধি, নির্বাচনী এলাকার সম্মিলিত মতামতের প্রতিনিধিত্ব করেন।

www.pathagar.com

প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরুর মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়। এতে রাজনৈতিক,সামাজিক ও অর্থনেতিক সমতার দিকে নজর দেওয়া হয়।

বস্তুত, প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রে জনগণ প্রত্যক্ষভাবে এবং অবাধে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসন ব্যব্যস্থায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

যে কোন সমাজের জন্য প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারই সর্বোত্তম সরকার। কারণ, যে সরকারে সমস্ত জনসাধারণ অংশগ্রহণ করতে পারে, সে সরকারই সকল সামাজিক প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণরূপে মেটাতে সক্ষম। সরকারে যে কোন রকমের অংশগ্রহণ, সে অতি ছোট সরকারি কার্যে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে হলেও, তাও খুব উপকারী এবং জনগণ এতে খুব উদ্বুদ্ধ হয়। জনগণের সরকারে অংশগ্রহণ জাতির সাধারণ উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে যতটুকু ব্যাপক হওয়া সম্ভব, ততটুকু ব্যাপক করা দরকার। সার্বভৌম ক্ষমতার মধ্যে সকলের সমান অধিকার দান বাঞ্ছনীয়। এই অধিকারে কিছুমাত্র কমতি করা বা বৈষম্য প্রদর্শন অনুচিত। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, আধুনিক গণতান্ত্রিক জাতীয় রাষ্ট্রসমূহের আয়তন ও লোকসংখ্যা এত বেশি যে, তাদের মধ্যে খুব স্বল্প সংখ্যক লোকই শাসনকার্যে বা সরকারে অংশ নিতে পারে। এ অবস্থায় একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারই আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যাতে জনগণ সরকারে অংশগ্রহণ করতে পারে।

প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার ব্যবস্থা সেখানেই চলতে পারে, যেখানে (ক) জনসাধারণ এই সরকার ব্যবস্থাকে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হবে। (খ) এই ব্যবস্থা সংরক্ষণ করতে যা যা করা প্রয়োজন জনসাধারণের তা করবার ইচ্ছা ও যোগ্যতা দুইই থাকতে হবে। (গ) এই সরকারকে সফল করে তোলার জন্য জনসাধারণের উপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তায়, সেই দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনের যোগ্যতা ও ইচ্ছা থাকতে হবে। এভাবে যদি প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার ব্যবস্থা গড়ে উঠে তাহলেই জনগণের পক্ষে সরকারে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে এবং জনগণ সরকারকে নিজেদের সরকার হিসেবে ভাবতে পারবে। এই জাতীয় সরকারে তাদের অধিকার সংরক্ষিত হবে।

প্রতিনিধিত্বের ইতিহাস

আধুনিক কালের গণতন্ত্র হচ্ছে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। প্রাচীন রোমে ও গ্রিসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্রের অস্তিত্ব থাকায় তখন অভিজাত শ্রেণী প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করত। জনসংখ্যা ও জাতীয় রাষ্ট্রের সীমানা বৃদ্ধির কারণে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থা চালু হয়েছে এখন।

কবে, কোথায় প্রথম প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল। মনে করা হয় যে, মধ্যযুগেই বিভিন্ন নামে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা চালু হয়। আরবে মজলিশে সুরা, ইংল্যাণ্ডে পার্লামেন্ট, স্পেনে করটেস (Cortes) জার্মানীতে ডায়েট (Diet) ফ্রান্সে

www.pathagar.com

এস্টেস জেনারেল ইত্যাদি ছিল প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা। অবশ্য মধ্যযুগে ঐসব প্রতিনিধি সভাগুলোর চরিত্র গণতান্ত্রিক ছিল না, তখন অভিজাত সম্প্রদায়, ভূ-স্বামী, ধনশালী ব্যবসায়ী তথা মুষ্টিমেয় লোক আইনসভার প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ লাভ করত।

আধুনিককালে রাজতন্ত্র ও পার্লামেন্টের সংঘাত বাধে ইংল্যাণ্ডে। ১৬৮৮ সালে ইংল্যাণ্ডের গৌরবময় বিপ্লবের সাফল্যের ফলে পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য তখনও পার্লামেন্ট পুরোপুরি গণতান্ত্রিক চরিত্র সম্পন্ন হয় নি। ১৮৩২ সালের পূর্ব পর্যন্ত বৃটিশ পার্লামেন্টে জন প্রতিনিধিত্বের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। ১৮৩২ থেকে ১৯২৮ সালের মধ্যবর্তী সময়ে নির্বাচন সংক্রান্ত কতকগুলো সংস্কারমূলক আইন প্রণীত হওয়ার ফলে বৃটিশ পার্লামেন্ট এখন সার্বভৌম। ১৮ বছর বয়ঃপ্রাপ্ত সকল বৃটিশ নাগরিকের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা এখন গৃহীত হয়েছে। এখন সমগ্র বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ জনগণের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন নামে বিভিন্ন দেশে এখন বিভিন্নভাবে জনপ্রতিনিধি সভাগুলো তাদের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের সংবিধানে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে জনপ্রতিনিধিত্বের বিধান রয়েছে। সংবিধানে নির্বাহী বিভাগ, সংসদ তথা আইনসভা এবং এসবের নির্বাচন সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে।

জাতীয় সংসদ বাংলাদেশের জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান। জাতীয় সংসদের ৩৩০ জন সদস্য জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন। এই সংসদ প্রতিষ্ঠা, সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা অযোগ্যতা, সংসদের আসন শূণ্য হওয়া, অধিবেশন, কার্যপ্রণালী বিধি, আইন প্রণয়ন ও অর্থসংক্রান্ত পদ্ধতি ইত্যাদি সংসদ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়াবলীর বর্ণনা রয়েছে সংবিধানের পঞ্চমভাগে। এর ৬৫ অনুচ্ছেদ থেকে ৭৯ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত ১ম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে সংসদ সম্পর্কিত বিধানাবলী আর ৮০ অনুচ্ছেদ থেকে ৯২ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত ২য় পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে আইন প্রণয়ন ও অর্থ সংক্রান্ত পদ্ধতি।

সংবিধানের চতুর্থভাগে নির্বাহী বিভাগ সংক্রান্ত বিধান রয়েছে। এবং প্রথম পরিচ্ছেদে ৪৮ থেকে ৫৪ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি সম্পর্কিত বিধান বর্ণিত হয়েছে এবং ৫৫ থেকে ৫৮ পর্যন্ত অনুচ্ছেদ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। এতে বর্ণিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভা সম্পর্কিত বিধান।

সংবিধানে সপ্তম ভাগে ১১৮ থেকে ১২৬ অনুচ্ছেদে নির্বাচন সম্পর্কে বিধান রয়েছে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় ভাগ

আলোচ্য অনুচ্ছেদের দ্বিতীয়ভাগে রয়েছে সরকারি চাকুরিতে প্রবেশাধিকার এবং সমান সুযোগ লাভের অধিকারের কথা। এতে বলা হয়েছে যে, "প্রত্যেকেরই নিজ দেশের সরকারি চাকুরিতে প্রবেশাধিকার ও সমান সুযোগ লাভের অধিকার রয়েছে।" এই ভাগে বর্ণিত মানবাধিকার সম্পর্কে অনুধাবন করতে হলে আমাদেরকে সরকারি চাকুরি (public service) সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে।

সরকারি চাকুরি

একটি সরকার পরিচালনার জন্য গণতান্ত্রিক দেশে কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক নেতা সরকারের উর্ধ্বতন পদ অলংকৃত করেন। এরা হচ্ছেন জনপ্রতিনিধি। একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জনগণের মতামতের ভিত্তিতে এরা সরকার গঠন ও পরিচালনা করেন। রাজনৈতিক কর্মচারী ছাড়াও একটি সরকারের বিপুল সংখ্যক স্থায়ী কর্মচারী থাকে। এরা সুনির্দিষ্ট যোগ্যতার ভিত্তিতে পরীক্ষায় অংশ নিয়ে যথাযথ উপায়ে সরকারের কার্যপরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন। সরকারের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য যে সকল স্থায়ী সরকারি কর্মচারী থাকেন তাদের চাকুরিকে বলে সরকারি চাকুরি। সরকারি কর্মচারীরা বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অধস্তন পর্যায়ের কর্মচারীদের পালন করতে হয়। সকল কর্মচারীর কর্তব্য ও ভূমিকা নির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকে এবং এদেরকে ধরাবাধা নিয়ম পদ্ধতির মধ্যে থেকে কাজ করতে হয়। প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ও কার্যাদির লিখিত ফাইল ও রেকর্ড পত্রাদি রাখার ব্যবস্থা থাকে। সরকারি কর্মচারীগণ যোগ্যতার ভিত্তিতে পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নিযুক্ত হন। এরা সরকারি চাকুরতে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন এবং এদের পদোন্নতির যোগ্যতাও কার্যকালের উপর নির্ভর করে।

সরকারি চাকুরেদের গুরুত্ব

সরকারি কর্মচারীগণ সকল শাসন ব্যবস্থারই অপরিহার্য অঙ্গ। তবে বর্তমানকালে এদের গুরুত্ব অধিকতর বৃদ্ধি পেয়েছে। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্তও রাষ্ট্রের কার্য সহজ সরল ছিল, ছিল নেতিবাচক। তখন রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য ছিল দেশের অভ্যন্তরে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা, বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা। ফলে সরকারি প্রশাসন এবং সরকারি কর্মচারীদের তখন তেমন কোন ভূমিকা ছিল না।

কিন্তু আধুনিক কালে রাষ্ট্র হচ্ছে সক্রিয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। জনকল্যাণকর কার্য সম্পাদন করাই এখন রাষ্ট্রের অন্যতম কার্য। তাছাড়া জ্ঞান বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির প্রসার ঘটায় বর্তমানে নানাবিধ জটিল সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এইসব সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব রাষ্ট্রের।

www.pathagar.com

বর্তমানে মানব জীবনের এমন কোন দিক ও বিভাগ নেই যেখানে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব বিস্তৃত নয়। রাষ্ট্রের কাজ শুধু যে বৃদ্ধি পেয়েছে তাই নয়, বরং জটিলও হয়েছে অনেক। এসব কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন অভিজ্ঞ, শিক্ষাপ্রাপ্ত, বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন কর্মকুশল সরকারি কর্মচারী। এরাই আইনসভা প্রণীত আইনকানুন এবং রাজনৈতিক শাসন, কর্তৃপক্ষের গৃহীত নীতি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সফলকাম করতে পারেন। অতএব সরকারি কর্মচারিদের গুরুত্ব সহজেই অনুধাবনযোগ্য। তাছাড়া সরকারি কাজকর্মের উৎকর্ষতার জন্য, রাজনৈতিক শাসন কর্তৃপক্ষের নীতি নির্ধারণে সহযোগিতার জন্য এবং সরকারের কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতার জন্য সর্বোপরি কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সরকারি কর্মচারীদের গুরুত্ব অপরিসীম।

উন্নয়নশীল দেশ

পৃথিবীর স্বল্পোন্নত এবং উন্নয়নকামী দেশগুলোর সমস্যা এবং সংকট যেমন প্রকট, তেমনি টিকে থাকার সংগ্রামও অত্যন্ত জোরালো। এসব দেশে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য অত্যন্ত প্রকট। বিভিন্নমুখী উন্নয়ন প্রকল্প ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এই সব দেশ দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের চেষ্টা চালাচ্ছে। বিভিন্ন কর্মপন্থার মাধ্যমে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক আধুনিকীকরণের দিকে বিশেষভাবে ঝুকেছে। উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো নির্মাণ, স্বনির্ভরতা অর্জন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা, বিবিধ উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ আবশ্যক আর এজন্য দরকার সুদক্ষ, কর্মনিপুণ সরকারি কর্মচারী। সরকারি কর্মচারী ছাড়া রাজনৈতিক নেতাদের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে নিখুঁত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

বস্তুত উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ সকল প্রকার উন্নয়ন ও অগ্রগতি নির্ভর করছে সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা, সামর্থ্য, উৎসাহ উদ্দীপনা ও উদ্যোগের উপর। প্রতিটি দেশে সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, পদোন্নতি, কার্যের শর্তাদি ইত্যাদির সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। সেই বিধানের আওতায় প্রত্যেকেরই নিজ নিজ দেশের সরকারি চাকুরিতে সমান সুযোগ লাভের অধিকার রয়েছে। কোন অজুহাতে, কোনভাবেই সরকারি চাকুরি লাভের ক্ষেত্রে নাগরিকদের প্রতি তারতম্য করা মানবাধিকারের বিধিবহির্ভূত।

বাংলাদেশের সংবিধানে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সরকারি নিয়োগলাভে সুযোগের সমতা সম্পর্কে বিধান রয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকার হিসেবে ২৯ অনুচ্ছেদে এই বিধান রয়েছে। এতে বলা হয়েছে—

(১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।

www.pathagar.com

(২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী, পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।

(৩) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই —

(ক) নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ, যাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাহাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা হইতে,

(খ) কোন ধর্মীয় বা উপ-সম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠানে উক্ত ধর্মাবলম্বী বা উপসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষণের বিধান সংবলিত যে কোন আইন কার্যকর করা হইতে,

(গ) যে শ্রেণীর কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তাহা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয়, ও সেইরূপ যে কোন শ্রেণীর নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হইতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

তৃতীয় ভাগ

আলোচ্য অনুচ্ছেদের তৃতীয় ভাগে জনগণের ভোটাধিকারের কথা বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, "জনগণের ইচ্ছাই সরকারের ক্ষমতার ভিত্তি হবে ; এই ইচ্ছা সর্বজনীন ও সমান ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নৈমিত্তিকভাবে এবং প্রকৃত নির্বাচন দ্বারা ব্যক্ত হবে ; গোপন ব্যালট অথবা অনুরূপ অবাধ ভোটদান পদ্ধতিতে এরূপ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।" এই অংশটুকু অনুধাবন করতে হলে আমাদেরকে জনগণের ইচ্ছা এবং এই ইচ্ছা প্রকাশের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে।

জনগণের ইচ্ছা ঃ সরকারের ক্ষমতার ভিত্তি

জনগণের ইচ্ছা, সম্মতি বা মতামতের বিষয়টি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর লেখায় পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। লকের রাষ্ট্রদর্শনে সম্মতি অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, যে কোন শাসকের বৈধতার প্রধানতম ভিত্তি হচ্ছে শাসিতের সম্মতি। সম্মতিকে কেন্দ্র করেই তিনি আইনসম্মত সরকার ও স্বৈরাচারী সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। যে সরকার নাগরিকদের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, লকের মতে সে সরকার নাগরিকদের আনুগত্য দাবি করতে পারে না। এরূপ সরকারের প্রতি যেহেতু নাগরিকগণ আনুগত্য প্রদর্শনে আইনত বাধ্য নয়, কাজেই এর বিরোধিতা করার আইন সঙ্গত অধিকার তাদের রয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রুশোর মতে, সার্বভৌম ক্ষমতা সব সময় স্বয়ং জনগণের হাতেই ন্যস্ত থাকে। তার মতে, চুক্তির ফলে যে রাষ্ট্রের জন্ম হয়, সেই রাষ্ট্রের হাতে চূড়ান্ত সার্বভৌম ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। এই সার্বভৌম ক্ষমতা রাষ্ট্রের কল্যাণে অভিব্যক্ত হয় সাধারণ ইচ্ছার

www.pathagar.com

মাধ্যমে। সরকার বা শাসক পরিচালিত হয় সাধারণ ইচ্ছার অনুকূলে। কাজ করার জন্য সরকারকে বাধ্য করা যায়। প্রকৃতপক্ষে জনগণের ইচ্ছার ভিত্তিতেই গণতান্ত্রিক সরকার গড়ে উঠে।

আধুনিক কালে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় জনগণের ইচ্ছার গুরুত্ব অত্যধিক। যে শাসন ব্যবস্থা জনগণের ইচ্ছাকে যতবেশি গুরুত্ব প্রদান করবে, সে শাসনব্যবস্থা তত বেশি গণতান্ত্রিক। জনগণের ইচ্ছাই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি। গণতন্ত্রে সরকার গঠন, পরিচালনা ও পরিবর্তন জনগণের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। জনগণের ইচ্ছার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে কোন সরকারই ক্ষমতার মসনদে টিকে থাকেত পারে না। জনগণের ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করার অর্থ হলো সরকারের পতন ডেকে আনা। জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সরকার স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে না। জনগণের ইচ্ছাই সরকারের অসৎ প্রবৃত্তিগুলিকে দমন করে। জনগণের ইচ্ছা, যা সরকারের ক্ষমতার উৎস, তা সর্বজনীন ও সমান ভোটাধিকারের মাধ্যমে নিয়মিত ও প্রকৃত নির্বাচনের মাধ্যমে ব্যক্ত হবে। এবারে আমাদের আলোচনা করতে হবে সর্বজনীন ভোটাধিকার এবং প্রকৃত নির্বাচন প্রসঙ্গে।

সর্বজনীন ও সমান ভোটাধিকার

সর্বজনীন ও সমান ভোটাধিকার বলতে বুঝায় এমন এক ধরনের ব্যবস্থা প্রবর্তন, যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স সকল নাগরিক সমান ভোটাধিকার প্রাপ্ত হন। সর্বজনীন ভোটাধিকার বলতে সকলের ভোটাধিকার বুঝায় না। বরং প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার বুঝায়। এই নীতি অনুসারে প্রাপ্ত বয়স্ক কোন নাগরিকের ভোটাধিকার হরণ করা হয় না, যদি না তিনি উন্মাদ, দেউলিয়া, অপ্রকৃতিস্থ, রাষ্ট্রদ্রোহী অথবা অন্য কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী না হন। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পূর্ণতা আনয়নের জন্য বিশ্বের অধিকাংশ দেশের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভোটাধিকার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। সর্বজনীন ভোটাধিকার নীতি গ্রহণের কারণ হচ্ছে ঃ

এক. গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস। এই বক্তব্যকে যথার্থ হিসেবে ধরে নিলে প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নাগরিককে তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য ভোটাধিকার প্রদান করা আবশ্যক। ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমেই কোন ব্যক্তি অধিক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে। কারো ভোটাধিকার হরণ করার অর্থ হচ্ছে তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনেই তার ভোটাধিকার প্রয়োজন। জন্মের সময় প্রকৃতির প্রদত্ত সকল সুযোগ সুবিধা লাভের সমান অধিকার নিয়ে যেমন মানুষ জন্মায়, তেমনি নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের সকল সুযোগ সুবিধা সমভাবে লাভের অধিকারও তার রয়েছে।

দুই. রাষ্ট্রের আইন, শাসন ও বিচার সকল নাগরিকের উপর সমভাবে প্রযোজ্য হয়। সকল রাষ্ট্রীয় আইন নারীপুরুষ, ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকে সমভাবে স্পর্শ করে। যা সকলকে

www.pathagar.com

সমভাবে স্পর্শ করে তা সকলের দ্বারা নির্ধারিত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। তাই সরকার গঠন ও পরিচালনায় সকলের সমভাবে অংশগ্রহণ ন্যায়ভিত্তিক এজন্য সর্বজনীন ভোটাধিকার অপরিহার্য।

তিন. সর্বজনীন ভোটাধিকার নীতি সাম্যের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভোটাধিকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সকল নাগরিক সমান রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করে। ফলে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি তার স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে সক্ষম হয়।

চার. রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হলে এবং নাগরিকদের মধ্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রত্যেক নাগরিকদের ভোটাধিকার থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ ভোটাধিকার বঞ্চিত নাগরিক তার অভাব অভিযোগ জানানোর যথার্থ সুযোগ সুবিধা পাবে না। ভোটাধিকারের অভাবে শাসন ব্যবস্থায় কোন কার্যকর ভূমিকা না থাকার কারণে নাগরিক উপেক্ষিত ও বঞ্চিত হবে। তাই সর্বজনীন ও সমান ভোটাধিকার সকল নাগরিকের ন্যায্য অধিকার।

পাঁচ. রাষ্ট্রীয় জীবনে ভোটাধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা ভোটাধিকারের মাধ্যমে শাসনকার্যে সামান্যতম অংশগ্রহণের সুযোগ নাগরিকদের রাষ্ট্র সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। নাগরিকগণ ভোটাধিকার লাভ করলে রাষ্ট্রীয় কার্যে উৎসাহিত হয়। অধিকার থাকলে কর্তব্য পালনের বিষয়ে সতর্ক থাকে। তাই সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রতিটি নাগরিকের অপরিহার্য অধিকার।

ব্যক্তিস্বাধীনতা ও স্বীয় স্বার্থরক্ষার জন্য আধুনিক বিশ্বে ভোটাধিকারই নাগরিকদের সর্বজন স্বীকৃত অস্ত্র। এর মাধ্যমেই মানুষের নাগরিক চেতনা বিকশিত হয়। গণতন্ত্রের সার্বিক সাফল্য সর্বজনীন ভোটাধিকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের উপরই বহুলাংশে নির্ভরশীল। বিশ্বের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তাই প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের সর্বজনীন ও সমান ভোটাধিকারের নীতি স্বীকৃত হয়েছে। সাম্য ও স্বাধীনতার সর্বজনীন অধিকারের দাবির অপরিহার্য অনুষঙ্গ হচ্ছে সর্বজনীন ও সমান ভোটাধিকার।

নির্বাচন ঃ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ

আধুনিককালের নির্বাচন পদ্ধতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হতে পারে। প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে দেশের ভোটাধিকার প্রাপ্ত নাগরিকগণ সরাসরি তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে। পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে দেশের ভোটাধিকার প্রাপ্ত নাগরিকগণ তাদের ভোটের মাধ্যমে একদল মধ্যবর্তী সংস্থার সদস্য নির্বাচন করে এবং পরে এই মধ্যবর্তী সংস্থার সদস্যরাই তাদের ভোটের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করে। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় প্রকার নির্বাচন পদ্ধতির কিছু সুবিধা এবং কিছু অসুবিধা আছে। তার পরও নির্বাচন পদ্ধতি যাই হোক নিয়মিত এবং প্রকৃত নির্বাচনের মাধ্যমেই জনগণের ইচ্ছা ব্যক্ত হতে হবে।

www.pathagar.com

ভোটদান পদ্ধতি

ভোটদান পদ্ধতি গোপন এবং প্রকাশ্য দু'ধরনের হতে পারে। গোপন ভোটদান পদ্ধতি বলতে বুঝায় এমন ভোটদান পদ্ধতি, যেখানে ভোটদাতারা প্রকাশ্যভাবে প্রার্থীকে সমর্থন না করে গোপনীয়তা রক্ষার মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। এই পদ্ধতিতে সাধারণত ভোটদাতাগণ ব্যালট পেপারে সংকেত চিহ্ন দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। এছাড়াও এ পদ্ধতিতে প্রার্থীদের নাম ও প্রতীক সম্বলিত গোপনভাবে সংরক্ষিত বাক্সে ভোটারগণ ব্যালটপত্র প্রদান করে প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। প্রকাশ্য ভোট প্রদানের পদ্ধতি হচ্ছে, যেখানে ভোটদাতারা প্রকাশ্যভাবে প্রতিনিধিকে সকলের সামনে নির্বাচিত করেন। এই পদ্ধতিতে ভোটদাতারা যে কোন প্রকার সংকেতদানের মাধ্যমে প্রকাশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারেন।

আধুনিককালে বিশ্বের প্রায় সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গোপন ভোট প্রদান পদ্ধতিকে স্বাগত জানানো হয়েছে। গোপন ভোট প্রদান পদ্ধতি ভোটারদের ভোটদানের ইচ্ছা স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করার সুযোগ করে দেয়। এতে অবাধ ভোটাধিকার সার্থকভাবে প্রয়োগের সম্ভাবনা বেশি। ভয়,ভীতি প্রদর্শন করে ভোটারদের ভোট প্রদানকে প্রভাবিত করার সুযোগ এতে কম। এই ব্যবস্থায় সকলের ভোটের সমমূল্য প্রদান করা হয়। তাছাড়া গোপন ভোটদান পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত দুর্নীতিমুক্ত। নির্বাচনে বিশুদ্ধতা আনয়নের জন্য গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচনই অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের উৎকৃষ্ট পন্থা। এই পদ্ধতিতে অবাধ ভোটদানের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেই এবং নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়মিত হলেই সরকারে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে। আলোচ্য অনুচ্ছেদে এটা মানবাধিকার হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

সর্বজনীন ভোটাধিকার ও নারী

সর্বজনীন ভোটাধিকার মানে কোন ভেদাভেদ ছাড়াই সকলের ভোটের অধিকার। এ নীতি অনুসারে পুরুষের ভোটের অধিকার যতটুকু, নারীরও ততটুকু অধিকার থাকবে। কারণ প্রত্যেক মানুষই তার দেশে ভাল সরকার চায়। সরকার প্রত্যেকের কল্যাণকেই স্পর্শ করে বলে তা থেকে নিজেদের প্রাপ্য অংশ আদায়ের জন্য সরকারে প্রভাব থাকা সকলেরই সমান প্রয়োজন। পুরুষের তুলনায় নারীর সে প্রয়োজন আরো বেশি। দৈহিক দিক থেকে নারী দুর্বল তাই নিজের নিরাপত্তার জন্য আইন ও সমাজের উপর তাকেই নির্ভর করতে হয় বেশি। অতএব সামাজিক ও রাজনৈতিক নিরাপত্তার জন্য নারীদের সরকারে অংশ গ্রহণের অধিকার বা প্রয়োজন দুটিই বেশি। তাই নারীর ভোটাধিকার হরণের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। মেয়েদের ব্যক্তিগতভাবে পরাধীন থাকতে হবে, এরকম মনোভাব এখন আর মানুষের নেই। মেয়ের চিন্তা, পেশা, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা কিছুই থাকবে না, তার স্বামী, পিতা, সন্তান বা ভাইয়ের ঘরের দাসি হয়ে থাকবে এমনি অবস্থা এখন আর আশা করা হয় না। পুরুষের মত নারীর সম্পত্তির মালিকানা, আর্থিক এবং বাণিজ্যিক স্বার্থ এখন আর কারো নিকট অবাস্তব কিছু নয়। মেয়েরা ভাববে, লিখবে,

www.pathagar.com

পড়াবে এই যোগ্যতা যখন স্বকৃতি পেয়েছে তখন রাজনৈতিক অযোগ্যতার আর কোন যুক্তি নেই। কোন ব্যক্তি কিসের যোগ্য, কোন কর্মের উপযুক্ত তা একমাত্র বলে দেবে ব্যক্তির যোগ্যতা। তাই নারী-পুরুষ, বর্ণ, বংশ, অর্থবিত্ত, জন্ম ইত্যাদির বিভিন্নতার কারণে কাউকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নাগরিক যারা উন্মাদ, দেউলিয়া দেশদ্রোহী নয় তাদের ভোটাধিকার থাকা সর্বজনীন সমান ভোটাধিকার। এটা যেমন পুরুষের আছে তেমনি নারীরও আছে।

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পুরুষদের ভোটাধিকারলাভের অনেক পরে স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার স্বীকৃতি লাভ করেছে। নানাপ্রকার অযৌক্তিক অজুহাতে নারী জাতির এই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিল। ১৮৬১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম নারীদের ভোটাধিকার প্রদানের আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের প্রভাব ক্রমশ সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ১৮৯৮ সালে ইংল্যাণ্ডে ৩০ বৎসর বয়স্ক ও তদূর্ধ্ব বয়সের স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয়। এর পর ১৯১৮ সালে জন প্রতিনিধিত্বমূলক আইন প্রণীত হওয়ার ফলে সীমিত সংখ্যক নারী ভোটাধিকার অর্জন করেন। ১৯২৮ সালে এই আইনের সংশোধনের ফলে নারীপুরুষ নির্বিশেষে ২১ বৎসর পর্যন্ত নাগরিকদের ভোটাধিকার লাভ করে। ১৯২০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ১৯৪৭ সালে জাপানে, ১৯৭১ সালে সুইজারল্যান্ডে নারীদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশে আজো নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত নয়।

নারীর ভোটাধিকার প্রদান না করার পেছনে যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে, ভোটাধিকার প্রদান করা হলে নারীর সুকুমার বৃত্তির অবসান ঘটবে, পারিবারিক জীবনে অশান্তি নেমে আসবে। তাছাড়া নারীরা শারীরিক গঠনের দিক থেকে পুরুষের চেয়ে দুর্বল, প্রকৃতিগতভাবে আবেগপ্রবণ ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে এসব খোঁড়া অজুহাত মাত্র। এগুলোকে নারীদের ভোটাধিকার প্রদানের বিপক্ষে শক্তিশালী যুক্তি হিসাবে দাঁড় করানো যায় না। তাই আধুনিক কালে সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে নারীর অধিকারকে খাট করে দেখা যায় না। প্রায় সকল সমাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এখন নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃতি লাভ করেছে।

চতুর্থভাগ

এই অনুচ্ছেদ ও বাস্তবতা

নিজ দেশের সরকারে অংশগ্রহণ, সরকারি চাকুরি লাভ, নিয়মিত ব্যবধানে নির্বাচন, অবাধ নির্বাচন, সর্বজনীন ভোটাধিকার, অবাধে ভোটদান ইত্যাদি বিষয়গুলোকে ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে গ্রহণ করা হয়। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ঘোষণা অনুসারে দেশ ও অঞ্চলের রাজনৈতিক মর্যাদাভিত্তিক পার্থক্য নির্বিশেষে ; ধর্ম, বর্ণ,

www.pathagar.com

গোত্র, নারী পুরুষ, ভাষা ও জাতীয়তা নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের উক্ত অধিকার গুলো জন্মগত এবং সহজাত। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, সনদ গৃহীত হওয়ার চার দশকেরও বেশি সময় পর এই অনুচ্ছেদ বাস্তবে কতটুকু অনুসৃত হচ্ছে, মানুষের উপরিউক্ত অধিকারগুলো কতটুকু সংরক্ষিত হচ্ছে?

অস্তায়মান শতাব্দীর শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কৃপায় আমাদের জীবন আলোয় ঝলমল। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে হাজার হাজার মাইলের ব্যবধানে থেকেও আমরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে পারছি, দেখতে পাচ্ছি একে অপরকে। এই শতাব্দীর শুরুতে আমাদের পূর্ব পুরুষদের কল্পনার ঘোড়াও ততদূর পৌঁছায়নি, যতটুকু পৌঁছে গেছি আমরা বাস্তবে। আমাদের এই অগ্রগতি, সমৃদ্ধি, উন্নতি বিকাশ এ সবই সম্ভব হয়েছে মানুষের চেষ্টায় সাধনায় সম্মিলিত প্রয়াসে। এত অগ্রগতির মধ্যেও মানুষের রাজনৈতিক অধিকার প্রদান ও সংরক্ষণে আমাদের গতি অত্যন্ত মন্থর। এখনো পৃথিবীর অনেক দেশে জনগণের সরকারে অংশগ্রহণ, সরকারি চাকুরিলাভের সম অধিকার নিশ্চিত হয় নি। অনেক দেশেই নিয়মিত ব্যবধানে নির্বাচন হয় না। নির্বাচন হলেও তা অবাধ এবং নিরপেক্ষ হয় না। পৃথিবীর সকল মানুষের সর্বজনীন ভোটাধিকার এখনো নিশ্চিত হয় নি।

স্বদেশের কথা দিয়েই শুরু করা যাক। ১৯৪৭ সালে বৃটিশ শাসন থেকে মুক্তির পর পাকিস্তানি শাসকমহল সুদীর্ঘ ৮ বছর পর্যন্ত সংবিধান প্রণয়নে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। ফলে নাগরিকদের সিংহভাগকে ঔপনিবেশিক আমলে প্রাপ্ত অধিকার নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। ১৯৫৬ সালে একটি সাময়িক সংবিধান প্রণীত হয় এবং স্থায়ী সংবিধান প্রণয়নের সক্রিয় উদ্যোগ গৃহীত হয়। কিন্তু তা বাস্তবায়নের পূর্বেই দেশটি সামরিক শাসনের কবলে পড়ে। এক দশকেরও বেশি সামরিক শাসনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত নাগরিকদের পক্ষে পাকিস্তানের সরকারে অংশগ্রহণের সুযোগ বলতে গেলে ছিলই না। ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী জনপ্রতিনিধিগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করা এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বিজয়ী যুক্তফ্রন্টের সরকারকে কাজ করতে না দেওয়াও জনগণকে সরকারে অংশগ্রহণের সুযোগ না দেওয়ার অন্যতম উদাহরণ।

এরপর স্বাধীন বাংলাদেশে এই অধিকার অনেক বার খর্ব হয়েছে। ১৯৭২ সালে সংবিধানে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে জনগণের সরকারে অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছিল কিন্তু ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারি সংবিধান আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সরকারে জনগণের অংশগ্রহণের অধিকারকে খর্ব করা হয়। এরপর কয়েকদফা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, সামরিক শাসন দেশের জনগণের রাজনৈতিক ও মানবাধিকারকে পর্যুদস্ত করেছে। স্বাধীন বাংলাদেশের বয়সের তুলনায় অর্ধেকেরও বেশি সামরিক কর্তৃত্বে বেড়ে উঠতে হয়েছে। সামরিক শাসনের অধীনে জনগণের পক্ষে সরকারে অংশগ্রহণের সুযোগ বা অধিকার কোনটাই থাকে না। সামরিক শাসনের আওতায় অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে নিয়মিত নির্বাচন হয় নি। ১৯৯০ সালে এই অধিকার নিরঙ্কুশভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

www.pathagar.com

১৯৮৬ সালের নির্বাচনের পরও দেশে যথার্থভাবে গণতন্ত্রের চর্চা শুরু হয় নি। বিভিন্ন সময় সরকার বিরোধী আন্দোলনের ফলে সরকার বিব্রতকর অবস্থায় পতিত হয়। ১৯৮৭ সালে আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। ফলে ব্যাপক আন্দোলন, ধর্মঘট ও অবরোধের মোকাবেলায় সরকার ২৮শে নভেম্বর সারাদেশে জরুরি আইন জারি করে। এ সময় জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় সদস্যগণ পদত্যাগ করলে সংসদ অকার্যকর হয়ে পড়ে। ৬ই ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেওয়া হয়।

১৯৮৮ সালের ৩রা মার্চ পুনরায় জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় সকল বিরোধীদলের অংশগ্রহণ ছাড়াই সরকার তার কতিপয় দল নিয়ে নির্বাচন করে। নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল ২৫১টি আসন জয়লাভ। অভিযোগ করা হয় যে, এই নির্বাচন হয়েছে ভোটারবিহীন। উল্লেখযোগ্য কোন সন্ত্রাসের ঘটনাও তাতে ঘটে নি।

বস্তুত ১৯৮৬ এবং ১৯৮৮ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটার তেমন কোন সুযোগ ছিল না। এই নির্বাচনগুলি নিয়মিত ছিল না। অবাধ ও নিরপেক্ষ বলতে যা বুঝায় এই নির্বাচনগুলোতে তার প্রতিফলন হয় নাই।

তবে ১৯৯১ সালে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির অধীনে বাংলাদেশের জনগণ অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে অংশ নিয়ে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। এখন থেকে নিয়মিত ব্যবধানে নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে বাংলাদেশে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে বলে আশা করা যায়। কারণ দেশে বর্তমানে সংসদীয় সরকার চালু হয়েছে।

বাংলাদেশে নির্বাচনের ইতিহাস অত্যন্ত ঘটনাবহুল। ৩৩০ সদস্যের জাতীয় সংসদ বাংলাদেশের জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান। সংবিধানের ৫ম সংশোধনীর আগে এর সদস্য সংখ্যা ছিল ৩১৫। ৩০০ জন প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হতেন। এখনও সে বিধান রয়েছে। বাকি ১৫ টি আসন দশ বছরের জন্য মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। এখন ১৫ এর স্থলে সংরক্ষিত আসনের পরিমাণ ৩০। জাতীয় সংসদের বিগত তিনটি নির্বাচনের ইতিহাস সংক্ষেপে উল্লেখ করবো। এ থেকেই আমাদের দেশে নির্বাচনে জনগণের অংশগ্রহণের অবস্থাটি অনুধাবন করা যাবে।

১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চে সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তারের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের পতন ঘটে। এরপর সামরিক শাসনের আওতায় সীমিত রাজনৈতিক তৎপরতা চলতে চলতে ১৯৮৪ সালে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠে। এ সময় ১৯৮৫ সালে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক (যিনি সামরিক অভ্যুত্থানে ক্ষমতায় এসেছিলেন এবং গণ অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন) এরশাদ তার গৃহীত কর্মসূচির প্রতি জনগণের আস্থা আছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য ১৯৮৫ সালের ২১শে মার্চ গণভোট অনুষ্ঠান করেন। অভিযোগ করা হয় যে, এটা ছিল একটি পাতানো খেলা। বিপুল ভোটে তার কর্মসূচির প্রতি জনসমর্থন দেখানো হয়। ১৯৮৬ সালের ৭ই মে জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের নির্বাচন

www.pathagar.com

অনুষ্ঠিত হয়। বিএনপি সামরিক শাসকের অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্তে অটল থাকে। অন্যান্য দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচন অনুষ্ঠানকালে দাঙ্গা হাঙ্গামা ও অন্যান্য কারণে বেশ কয়েকটি এলাকায় নির্বাচন স্থগিত হয়। ১৮ ও ১৯শে মে স্থগিত ভোটকেন্দ্রের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কোথাও আবার পুনর্নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের সময় ব্যাপক সংঘর্ষ, সন্ত্রাস, হত্যা, ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদির অভিযোগ ওঠে। বলতে গেলে অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নি।

সার্কভুক্ত অন্যান্য ছ'টি দেশের প্রতি নজর দিলে দেখা যাবে যে, এসব দেশের নাগরিকগণও নিরবচ্ছিন্নভাবে এসব অধিকার ভোগ করতে পারছেন না। দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র রাজাশাসিত দেশ ভুটানের জনগণের সরকারে অংশ নেওয়ার ন্যূনতম অধিকারও নেই। জনগণের দীর্ঘসংগ্রামের পরে এই দশকের শুরুতে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম রাজতান্ত্রিক দেশ নেপালের রাজতন্ত্র মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে। সেখানে এই প্রথম বারের মত অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হয়েছে। সেখানে বর্তমানে রাজা নামমাত্র শাসক। আশা করা যাচ্ছে যে, নেপালের জনগণ তাদের সরকারে অংশগ্রহণ থেকে শুরু করে অন্যান্য রাজনৈতিক অধিকারগুলো ভোগ করতে পারবে। সম্ভবত সেখানে অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচন এখন নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

উপমহাদেশের গণতন্ত্রের আদর্শ ভারত ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে গণতন্ত্রকে লালন করতে শুরু করে। ১৯৫০ সালে সেখানে সংবিধান গৃহীত হয়। পরবর্তীকালে জরুরি অবস্থা ঘোষণা, কোন কোন প্রদেশে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি, নির্বাচন বন্ধ করে অথবা নির্বাচিত সরকারকে হটিয়ে দীর্ঘদিন রাষ্ট্রপতির শাসন অব্যাহত রাখা ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের অধিকার খর্ব করার অসংখ্য উদাহরণ আছে ভারতে। তদুপরি কাশ্মির, আসাম, পাঞ্জাব প্রভৃতি দেশে জনগণের আন্দোলন চলছে। সে সব অঙ্গরাজ্যে নিরপেক্ষ অবাধ নির্বাচন ইত্যাদি হয় নি বললেই চলে। অবশ্য ভারতে নাগরিকদের রাজনৈতিক মানবাধিকার একেবারেই নেই তা বলা চলে না।

পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হওয়ার পর ১৯৭৩ সালে একটি সংবিধান প্রণীত হয়, যা ছিল মোটামুটি গণতান্ত্রিক। কিন্তু এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শিকড় গাড়তে না গাড়তেই ১৯৭৮ সালে নির্বাচনসংক্রান্ত গোলযোগের সুযোগ নিয়ে সামরিক বাহিনী ক্ষমতায় আসে। এতে জনগণের মানবাধিকার মারাত্মকভাবে বিপন্ন হয়। এক বিমান দুর্ঘটনায় পাকিস্তানের সেনা শাসক প্রাণ হারালে সেখানে আবার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু হয়। এখনও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করা এবং জনগণের মানবাধিকার হরণের ঘটনাও সেখানে ঘটে চলছে। পাকিস্তানে এখন পর্যন্ত নিয়মিত ব্যবধানে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঐতিহ্য গড়ে ওঠে নি। সেখানে নির্বাচনের জন্য আন্দোলন করতে হয়, দাবি জানাতে হয়। মাঝে মধ্যে যে সব নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেগুলোতে কারচুপি, ক্ষমতার অপব্যবহার, সন্ত্রাস ইত্যাদি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে ; জনগণের ভোটদানকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয়।

www.pathagar.com

বস্তুত দক্ষিণ এশিয়ার একশ' কোটিরও অধিক মানুষ, যাদের আবাস সার্কভুক্ত দেশগুলোতে তারা, অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের নিয়মিত অনুষ্ঠানের নিশ্চয়তা এখনো পুরোপুরি পায় নি। এসব দেশের রাজনৈতিক আকাশে খুব ঘন ঘন দেখা দেয় সামরিক শাসন অথবা জরুরি অবস্থার কালো মেঘ। তছতছ করে দেয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিপদগ্রস্ত করে মানবাধিকারকে। নির্বাচন বলতে যে পবিত্র দায়িত্ব পালন বুঝায় এসব দেশে নির্বাচনের সেই চেতনা বিকশিত হয় নি। ভোটাধিকারের মূল্য এখনো আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়, তাই আমাদের ভোটকে কিনে নেওয়া হয় সামান্য অর্থের বিনিময়ে। এমনকি ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে আমি সরকারে অংশ নিচ্ছি এই চেতনাটিও আমাদের মনে ততটা গ্রথিত হয় নি। দক্ষিণ এশিয়ার এই অধিকারের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক।

মধ্যপ্রাচ্য ঃ রাজা, বাদশা, আমির আর শেখের শাসনে পর্যুদস্ত মধ্যপ্রাচ্যের জনগণের মানবাধিকার। নিজ দেশের সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার সেখানে জনগণের জন্য সংরক্ষিত নয়। সর্বজনীন ভোটাধিকারের দাবি সেখানে উপেক্ষিত। মধ্যপ্রাচ্যের ইরান ও মিশরে নিয়তান্ত্রিক উপায়ে সরকার পরিবর্তনের ব্যবস্থা রয়েছে। ১৯৭৯ সালে ইমাম খোমেনির নেতৃত্বে সংঘটিত ইসলামি বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত সেখানে শাহের নেতৃত্বে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। অর্থাৎ আশির দশকের আগে ইরানে সর্বজনীন ভোটাধিকার, নিয়মিতভাবে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ছিল কল্পনা মাত্র। মিশরের সাবেক প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুল নাসেরের নেতৃত্বে ষাটের দশকে রাজা ফারুককে অপসারণের পূর্ব পর্যন্ত সেখানে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। বলতে গেলে মিশরে গণতন্ত্রের বয়সও সামান্য। ইরাক ও সিরিয়ায় যথাক্রমে সাদ্দাম হোসেন ও হাফিজ আল আসাদের নেতৃত্বে দীর্ঘদিন থেকে একদলীয় স্বৈরশাসন অব্যাহত রয়েছে। সেখানে মাঝে মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের কথা কল্পনাও করা যায় না। এ দুটি দেশের জনগণের পক্ষে স্বাধীনভাবে সরকারে অংশগ্রহণের সুযোগ নেই। তেমনি অবস্থা উত্তর আফ্রিকার দেশ লিবিয়াতেও। সেখানে কর্ণেল গাদ্দাফির নেতৃত্বে এক ব্যক্তির শাসন চলছে বহুদিন ধরে। আলজেরিয়ার জনগণও তাদের মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সম্প্রতি সেখানে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মৌলবাদী ইসলামি সংগঠন "ইসলামি স্যালভেশন ফ্রন্ট" নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও তাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয় নি। বর্তমানে সেখানে সেনাবাহিনীর সমর্থনপুষ্ট সরকার ক্ষমতায় আছে, যা সর্বজনীন ভোটাধিকার, নিয়মিতভাবে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন জনসাধারণের ইচ্ছা ইত্যাদির নীতি সম্পূর্ণ বিপরীত।

মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দেশে সর্বজনীন ভোটাধিকারের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। সৌদি আরব, আরব আমিরাত, কুয়েত, জর্ডান প্রভৃতি দেশে সর্বজনীন ভোটাধিকার নেই। সেসব দেশে নির্বাচনের কোন রেওয়াজ চালু হয় নি। রাজা, আমির, শেখ বা বাদশাহ উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা লাভ করেন। সম্প্রতি ইরাকি আগ্রাসন থেকে কুয়েত মুক্ত হওয়ার পর কুয়েতের আমীর

www.pathagar.com

সেখানে সীমিত আকারে গণতন্ত্র চালুর মনোবাসনা ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু সেখানে নারীদের ভোটাধিকার নেই। পুরুষদের ভোটও বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষ। তাই উপরোক্ত দেশসমূহের নাগরিকদের মানবাধিকারের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক।

মধ্যপ্রাচ্যের রাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে জনগণের রাজনৈতিক অধিকার নেই। এসব দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার বাস্তবায়নের ব্যাপারে তেমন সক্রিয় প্রয়াস চোখে পড়ে না। লেবাননে মাঝে মাঝে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও সেখানকার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, এবং ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তু, ইসরাইল ও সিরিয়ার হস্তক্ষেপ ইত্যাদি কারণে জনগণ গণতন্ত্রের সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

বস্তুত মধ্যপ্রাচ্যের জনগোষ্ঠীর সিংহভাগ তাদের মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত। সেখানে নিয়মিতভাবে নির্বাচন হয় না। যে সব দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সে সব দেশের অনেকগুলোতে সর্বজনীন ভোটাধিকার নেই, অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের উদাহরণ সেখানে খুবই কম। জনগণের পক্ষে সরকারে অংশগ্রহণ এবং সরকারি চাকুরি লাভের সম অধিকারের নিশ্চয়তা নাই বললেই চলে। তরল সোনার দেশ বলে পরিচিত এসব দেশে মানুষের প্রাচুর্য আছে কিন্তু রাজনৈতিক অধিকার নেই। বিস্ময়কর বিষয় হচ্ছে এই যে, তা অর্জনের জন্য তেমন জোরালো পদক্ষেপও নেই জনগণের।

আফ্রিকা

এই শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত আফ্রিকা মহাদেশের অর্ধশতাধিক রাষ্ট্র ছিল বৃটেন, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল, এবং বেলজিয়ামের উপনিবেশ। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত মাত্র ৭টি দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। ৬০-এর দশকে স্বাধীনতা লাভ করে ৩১টি দেশ। ৭১ থেকে ৭৬ পর্যন্ত আরো ৭টি দেশ স্বাধীন হয়। ১৯৮০ সালে জিম্বাবুই স্বাধীনতা অর্জন করে এবং সর্বশেষ স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশ হচ্ছে নামিবিয়া। এ নিয়ে অর্ধশতাধিক অর্থাৎ ৫২টি রাষ্ট্র উপনিবেশ থেকে মুক্তি পেল। স্বাধীনতাকামী আফ্রিকানদের লক্ষ্য ছিল বিদেশী শাসনের অবসান এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পরও এসব দেশের সমস্যা সমাধান হয় নি। রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংরক্ষণ, ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং বিকাশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলা, জাতীয় ঐক্য রক্ষা, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার পরিবেশ গড়ে তোলা, আফ্রিকাকে যুদ্ধের পরিবেশ থেকে মুক্ত করা ইত্যাদি লক্ষ্যসমূহ বহুলাংশে বাস্তবায়িত হয় নি। তাই আফ্রিকার অধিকাংশ স্বাধীন দেশে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত না হয়ে বিদেশী হস্তক্ষেপ, পুতুল সরকার এবং উপজাতীয় বা গোত্রগত কোন্দল লেগে আছে। বস্তুত আফ্রিকা এখন দ্বন্দ্ব, সংঘাত আর যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত। তদুপরি খরা, দারিদ্র্য, খাদ্যাভাব, আফ্রিকান জনগণের জীবনকে করে তুলেছে পর্যুদস্ত। তাছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণকায়দের ভোটাধিকার এখনও স্বীকৃত হয় নি। তাই

www.pathagar.com

আফ্রিকার জনগণের সরকারে অংশগ্রহণ, সর্বজনীন ভোটাধিকার, নিরপেক্ষ নির্বাচন, নিয়মিত নির্বাচন ইত্যাদি অধিকারগুলো বাস্তবায়িত হয় নি।

সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে

সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে আপামর জনসাধারণের নিজ দেশের সরকারে অংশগ্রহণের বিষয় নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। সমাজতান্ত্রিক আদর্শে যারা বিশ্বাস করেন তাদের মতে, সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে জনগণের সরকারে অংশ নেওয়ার সুযোগ এবং অধিকার রয়েছে। সেখানে সর্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত, নিয়মিতভাবে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু উদারনৈতিক গণতন্ত্রে যারা বিশ্বাসী তাদের মতে, যেখানে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু নেই, উন্মুক্ত রাজনীতি চর্চা যেখানে নিষিদ্ধ সেখানে নিয়মিত নির্বাচন, সর্বজনীন ভোটাধিকার, অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের কথা অর্থহীন। কেননা এতে সরকারের সমালোচনা, ভিন্নমত পোষণ, দল গঠন ও দলীয় প্রচারণা নিষিদ্ধ।

তাছাড়া শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে এসে অতি দ্রুত গতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙ্গন, জার্মানির পুনরেকত্রিকরণ পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সরকারের পতন ইত্যাদি অবলোকন করে এই ধারণা পোষণ করা সঙ্গত যে, সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সরকারে জনগণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত ছিল না। সেসব দেশে নিয়মিত নির্বাচন হলে, তা অবাধ ও নিরপেক্ষ ছিল না। দলীয় একনায়কতন্ত্র সে সব দেশে জেঁকে বসেছিল। রুমানিয়ায় ৪০ বছর যাবৎ চসেস্কুর একনায়কতন্ত্র, পোল্যান্ডের দীর্ঘ জরুরি অবস্থা ইত্যাদি একথাই প্রমাণ করে যে, সমাজতন্ত্রেই জনগণের অধিকার পুরোপুরি সংরক্ষিত হয় না। সর্বজনীন ভোটাধিকার, অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন, জনগণের অধিকার ইত্যাদি সেখানেও ভূলুণ্ঠিত হয়।

গণতান্ত্রিক দেশে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি বহুদলীয় গণতান্ত্রিক দেশসমূহে আলোচ্য অনুচ্ছেদ অনেক বেশি কার্যকর। এই সব দেশে সর্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত। শাসন ব্যবস্থার প্রকৃতি হচ্ছে এমন যে, এসব দেশে নিয়মিত ব্যবধানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠানিক রূপ পাওয়ার কারণে নির্বাচন অবাধ এবং নিরপেক্ষ হয়। বস্তুত গণতন্ত্রেই জনগণ সঠিক অর্থে নিজ দেশের সরকারে অংশ নিতে পারে।

নির্বাচনে কারচুপি

নির্বাচন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকার গঠন ও সরকার পরিবর্তনের অপরিহার্য মাধ্যম হচ্ছে নির্বাচন। নির্বাচনের পূর্বশর্ত হচ্ছে এই যে, তা অবাধ ও নিরপেক্ষ হওয়া চাই। প্রতিটি নির্বাচন এমনভাবে হওয়া আবশ্যক যে, প্রতিটি নাগরিক

www.pathagar.com

যাতে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাদের মতামত প্রদান তথা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ আসে। শুধু ক্ষমতাসীন দল নয়, ক্ষমতাবহির্ভূত দল, গোষ্ঠী বা ব্যক্তিও সংঘাত, সংঘর্ষ, সন্ত্রাস ইত্যাদির মাধ্যমে স্বাভাবিক পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানকে বাধাগ্রস্ত করে। জালভোট দান এবং নির্বাচনে কারচুপি যেন একটি সাধারণ বিষয়।

আমাদের দেশে ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকদের ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হয়। তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের ২৩৭টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ লাভ করে মাত্র ৯টি এবং বাকি ২২৩ টি আসন লাভ করে যুক্তফ্রন্ট। উক্ত নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছিল বলেই রাজনৈতিক ভাষ্যকারদের অভিমত। এরপর যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিল, ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর সামরিক শাসন জারি, ব্যাপক গণ আন্দোলন ও গণঅভ্যূত্থানের পর ১৯৭০ সালের ৫ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয় সাধারণ নির্বাচন। এতে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের ৩১৩ টির মধ্যে ২৬৮টি আসন লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০ আসনের মধ্যে ২৯৮টি লাভ করে আওয়ামী লীগ। পাকিস্তানের ২৩ বছরের ইতিহাসে প্রথম ব্যাপকভিত্তিক এই জাতীয় নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ ছিল।

১৯৭১ সালের দীর্ঘ ন'মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীন বাংলাদেশে বেশ কয়েকদফা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গণভোট, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, জাতীয় সংসদ নির্বাচন, পৌরসভা নির্বাচন, এবং ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন, উপজেলা নির্বাচন ইত্যাদি। স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশের প্রায় সকল নির্বাচনেই অংশগ্রহণকারিগণ পরস্পরের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস, কারচুপি ইত্যাদির অভিযোগ এনেছেন। শুধুমাত্র ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন, যা কিনা অনুষ্ঠিত হয়েছে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ–এর অস্থায়ী সরকারের অধীনে, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ অবাধ এবং কারচুপিমুক্ত হয়েছে বলে দেশী–বিদেশী পর্যবেক্ষক, সাংবাদিক ও ভাষ্যকারগণ অভিমত ব্যক্ত করেন। এ ছাড়া বাদবাকি সব কয়টি নির্বাচনে ক্ষমতাসীন সরকারের ক্ষমতার অপব্যবহার দুর্নীতি, প্রশাসনকে স্বীয় স্বার্থে ব্যবহার, কারচুপি ইত্যাদির অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ কখনো কম কখনো বেশি উঠেছে কিন্তু কোন নির্বাচনই একেবারে নিষ্কলুশ, কারচুপিমুক্ত অভিযোগহীন ছিল না। জাল ভোটপ্রদান, ভোটকেন্দ্রে সন্ত্রাস, ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে আসতে না দেওয়া, ভোট গণনায় কারচুপি, মিডিয়া ক্যু, ফলাফল পাল্টে দেওয়া ইত্যাকার বহুরকমের অভিযোগ এসেছে নির্বাচন সম্পর্কে। অবশ্য কখনো কখনো প্রকৃত অবস্থার তুলনার অভিযোগের মাত্রা যে একটু বেশি হয় নি তা নয়। তারপরও একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে বাংলাদেশের জনগণ সম্পূর্ণ অবাধ, নিরপেক্ষ, কারচুপিমুক্ত নির্বাচনের সাথে পরিচিত ছিল না। ফলে নির্বাচন নামক ব্যবস্থাটির প্রতিও জনগণের আস্থা যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছিল।

www.pathagar.com

১৯৭৭ সালের ৩০শে মে রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের উপর দেশের জনগণের আস্থা আছে কিনা তা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় গণভোট। প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকগণ এতে হ্যাঁ বা না সূচক ভোট প্রদান করেন।

১৯৭৮ সালের ৩রা জুন অনুষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। ১০ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মোঃ আতাউল গণি ওসমানীকে বিপুলভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

১৯৭৯ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনে ৩০০ টি আসনের জন্য স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ ২৯টি রাজনৈতিক দলের ২১২৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এর মধ্যে ১৮টি রাজনৈতিক দল ১টি আসনও পায় নি। ক্ষমতাসীন বিএনপি লাভ করে ২০৭ টি আসন।

১৯৮৬ সালের ৭ই মে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এই নির্বাচনে ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপতি এইচ.এ. এরশাদের জাতীয় পার্টি সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে ২০৮টি আসন লাভ করে। উল্লেখ্য এতে অন্যতম বিরোধী দল বি.এন.পি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নি।

১৯৮৫ সালের ২১শে মার্চে দেশব্যাপী গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। দেশে জাতীয় নির্বাচনসমূহ অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত লেঃ জেঃ এইচ.এম. এরশাদ রাষ্ট্রপতি পদে বহাল থাকবেন কিনা, তার প্রতি জনগণের আস্থা আছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। গণভোটে শতকরা ৭২ ভাই ভোট পড়ে হ্যাঁ সূচক।

১৯৮৬ সালের ১৫ই অক্টোবর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের বিরোধিতার মুখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ১৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এতে ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপতি এইচ.এম. এরশাদ বিপুল ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হন।

উপরে যে সকল নির্বাচনের কথা বলা হলা হলো সে সকল নির্বাচন সম্পূর্ণ অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছে কিনা অথবা এসব নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে কিনা—এ বিষয়ে যথেষ্ট ভিন্নমত রয়েছে। তবে একটি কথা বলা যায় যে, ১৯৯১ সালে অস্থায়ী সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন জনগণের নিকট যতটুকু আস্থা অর্জন করেছে, যতটুকু গ্রহণযোগ্য হয়েছে অতীতের কোন নির্বাচনে তেমনটি হয় নি।

নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ শুধু আমাদের দেশেই নয়। আরো অনেক দেশে এই অভিযোগ উঠেছে। ভারতের ক্ষমতাসীন কংগ্রেস আই, পাকিস্তানে ক্ষমতাসীন নওয়াজ শরীফের আই ডি এ-র বিরুদ্ধে স্ব স্ব দেশের নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। একই অভিযোগ উঠেছে ফিলিপাইনের ক্ষমতাসীন ফিদেল রামোসের সরকারের বিরুদ্ধে। তৃতীয় বিশ্বের, বিশেষ করে আফ্রিকা ও এশিয়ার অনেক দেশে গণবিচ্ছিন্ন স্বৈরাচারী সরকার নিজের ক্ষমতা পাকা পোক্ত করার জন্য নির্বাচন নাটকের অবতারণা করে। ক্ষমতায় টিকে থাকাই যেহেতু এই নির্বাচনের লক্ষ্য সেহেতু এর নিরপেক্ষতার কোন প্রশ্নই উঠে না।

www.pathagar.com

যেখানে নির্বাচনে কারচুপি হয়, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় না, সেখানে মানুষের অধিকার ভূলুণ্ঠিত হয়। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদ বলছে প্রত্যক্ষভাবে এবং অবাধে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে। এই অধিকার বাস্তবায়নের জন্য কারচুপিমুক্ত, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আবশ্যক।

নিয়মিত ব্যবধানে নির্বাচন

রাষ্ট্রপতি, আইন পরিষদ, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি, সাংসদ, গভর্নর, চেয়ারম্যান, মেয়র ইত্যাদি পদসমূহ যে দেশে যেটি রয়েছে সে দেশে সেই পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি পদেরই একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে। মেয়াদান্তে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান রয়েছে। এটাকেই বলে নিয়মিত ব্যবধানে নির্বাচন। এই মেয়াদ বা নিয়মিত ব্যবধান কোথাও দুই বছর, কোথাও তিন, চার পাঁচ বছর। যেখানে যে মেয়াদ নির্ধারিত সেই মেয়াদ অনুসরণ করাই হচ্ছে মানবাধিকারের বিধান। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদ অনুসারে নিয়মিত ব্যবধানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু বাস্তবে খুব কম দেশেই নিয়মিত ব্যবধানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতেই এই বিধানের ব্যত্যয় ঘটে। সামরিক অভ্যুত্থান, স্বৈরাচার ইত্যাদি এসব দেশের নির্বাচনের স্বাভাবিক ধারাকে বাধাগ্রস্ত করে, ফলে দেখা যায় যেখানে পাঁচ বছর অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা সেখানে দশ বছর পরও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় না।

নিয়মিত ব্যবধানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া তৃতীয় বিশ্বের জন্য একটি স্বপ্নের মতই। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মায়ানমারসহ এ অঞ্চলের দেশ সমূহে নিয়মিত ব্যবধানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়াই নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশে ১৯৭৩, ১৯৭৯, ১৯৮৬, ১৯৯১ সালে যথাক্রমে ৪টি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় যার কোনটিই নিয়মিত ব্যবধানে অনুষ্ঠিত হয় নি। এমনিভাবে অন্যান্য দেশেও নির্বাচন অনিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

সামরিক শাসন

এশিয়া আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার প্রায় শতাধিক দেশে বিভিন্ন সময় সামরিক হস্তক্ষেপ ঘটেছে। প্রতিষ্ঠিত অসামরিক সরকারকে উৎখাত করে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সামরিক সরকার কায়েম হয়েছে। কোথাও কোথাও আবার দেখা গেছে একটা সামরিক সরকারকে পাল্টা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করে আরেকটি সামরিক সরকার ক্ষমতায় এসেছে। একসময় ঔপনিবেশিক শাসনে পিষ্ট সদ্য স্বাধীন দেশগুলো অথবা পশ্চাৎপদ তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোতে সামরিক বাহিনী বারবার ক্ষমতার রঙ্গমঞ্চ দখল করেছে এবং

www.pathagar.com

এখনো করছে। বর্তমানেও পৃথিবীর অনেক দেশে সামরিক শাসন অব্যাহত আছে। পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে বেশ কয়েক দফা সামরিক শাসন জারি হয়েছে।

প্রশ্ন হচ্ছে সামরিক বাহিনী কেন রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে? কেন তারা সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে? কেনই বা বার বার সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে? এই প্রশ্নের জবাবে সামরিক বাহিনী যা বলে অর্থাৎ সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখলের সময় যে সব অজুহাত দেখিয়ে থাকে সে গুলো মচ্ছে :

এক. ঔপনিবেশিক শাসন থেকে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত পশ্চাদপদ দেশে আর্থনীতিক অনগ্রসরতা, সমস্যা ও সংকট এবং জনগণের অশিক্ষা, কুসংস্কার, পশ্চাদপদতার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজে সামরিক বাহিনীই একমাত্র সুশৃঙ্খল, সুসংগঠিত, পেশাদার নিয়মিত বাহিনী। উন্নত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এ বাহিনীর দক্ষতা, যোগ্যতা, শৃঙ্খলা, প্রশিক্ষণ ও আধুনিকায়নকে জাতির স্বার্থে, আর্থনীতিক সামাজিক অগ্রগতির প্রয়োজনে ব্যবহার করা দরকার।

দুই. রাজনৈতিক ক্ষেত্র এসব দেশে দুর্বল। বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী ও ক্ষেত্র থাকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ও বৈরী অবস্থানে আসীন। রাজনৈতিক দল, কর্মী ও নেতৃবর্গ এসব দেশে গণবিচ্ছিন্ন এবং কেবল কেবলই গোত্র ও ব্যক্তিগত সংকীর্ণ স্বার্থ হাসিলে ব্যস্ত থাকায়, সর্বোপরি অদক্ষ, অক্ষম হওয়ায়, বিশৃঙ্খল হওয়ায় সীমাহীন দুর্নীতিতে লিপ্ত থাকায়, সামগ্রিক অর্থে দেশ জাতি জনগণ হয়ে পড়ে বিপর্যস্ত। ফলে, উৎপাদনে নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা অব্যবস্থা হয় সার্বিক। দ্রব্যমূল্য হয় আকাশচুম্বী, জীবনযাত্রা হয় দুর্বিষহ এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেখা দেয় মারাত্মক অস্থিতিশীলতা। তাই সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে আর্থসামাজিক জীবনে শৃঙ্খলা আনে। দুর্নীতি, অব্যবস্থা দমন করে, স্থিতিশীলতা এনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে যথাসম্ভব দ্রুত ব্যারাকে ফিরে যেতে চায়।

তিন. বেসামরিক রাজনৈতিক গোষ্ঠী শাসন পরিচালনায় যখন ব্যর্থ হয়, বিদেশের চোখে দেশের মর্যাদা নষ্ট করে এবং সর্বোপরি স্বাধীনতার মূল উদ্দেশ্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে তখন জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় স্বাধীনতার প্রতীক সেনাবাহিনী নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে না। তাই জনগণকে রক্ষার জন্য সেনাবাহিনী বাধ্য ও একান্ত নিরুপায় হয়ে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্ষমতা দখল করে।

এমনি ধরনের আরো বহুবিধ অজুহাত এবং কারণ দেখিয়ে সামরিক বাহিনী তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে থাকে।

সামরিক শাসন সবচেয়ে মারাত্মক প্রভাব ফেলে নির্বাচন ও গণতন্ত্রের উপর। সামরিক শাসনের কারণে গণতন্ত্র অস্থিতিশীল ও হুমকির সম্মুখীন হয়। নির্বাচনের প্রতি জনগণের আস্থা কমে আসে। রাজনৈতিক দল, সরকার ও নেতৃত্বের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ক্ষমতা দখল করে সেনাবাহিনী ক্রমশ অসামরিক চরিত্র অর্জনের চেষ্টা করে। সামরিক বাহিনী জনগণকে বিভক্ত করার জন্য নির্বাচনকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। এতে নির্বাচন সম্পর্কে জনগণের ধারণা

www.pathagar.com

নেতিবাচক পর্যায়ে যেতে শুরু করে। বহুদলীয় রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে সামরিক বাহিনীর রাজনীতিতে আসা উচিত নয়। কারণ এতে মানুষের অধিকার হরণ করা হয়। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদের নীতিমালা সামরিক শাসনের সম্পূর্ণ বিপরীত।

বিভিন্ন দেশের সরকারে জনপ্রতিনিধিত্ব

বর্তমানে পৃথিবীতে অনেকগুলো স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিদ্যমান, যেগুলোতে সরকারে জনপ্রতিধিত্বের ব্যবস্থা রয়েছে। এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার যে সব দেশে একনায়কতান্ত্রিক, সামরিক স্বৈরতান্ত্রিক বা রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান সেগুলো ছাড়া বাদবাকী দেশগুলোর সংবিধান তথা শাসনতন্ত্রে জনপ্রতিনিধিত্বের সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। সরকার ব্যবস্থার বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন দেশের জনগণের সরকারে অংশগ্রহণের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি বিভিন্ন। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দেশের সরকারে জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন বিভাগের প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত নির্বাচক মণ্ডলী দ্বারা। যে নির্বাচকমণ্ডলী চার বছরের জন্য রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করেন তারা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন বলে প্রথাগতভাবে সেদেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে।

কংগ্রেস হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা। প্রতিটি থেকে দু'জন করে ৫০ টি অঙ্গরাজ্যের মোট ১০০ জন সিনেটর জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে কংগ্রেসের উচ্চ কক্ষ "সিনেট"-এ জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন। প্রেসিডেন্টের 'রানিং মেট' হিসেবে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত ভাইস প্রেসিডেন্ট সিনেটে সভাপতিত্ব করেন। ভাইস প্রেসিডেন্টের অবর্তমানে স্পীকারের দায়িত্ব পালনের জন্য সিনেটরদের মধ্যে থেকে একজনকে নির্বাচন করা হয়।

প্রতিনিধি পরিষদ (House of Representatives) যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের নিম্নপরিষদ। এর সদস্যগণ অংগরাজ্যের লোক সংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়ে থাকেন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে। এক একজন সদস্য প্রায় ত্রিশ হাজার লোকের প্রতিনিধিত্ব করেন। সিনেটকে বলা হয় রাষ্ট্রীয় সভা (House of States) আর প্রতিনিধি সভাকে বলা হয় জনগণের সভা (House of People)।

বস্তুত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, সিনেটর এবং প্রতিনিধি নির্বাচনে ১৮ বছর বয়সের সকল নাগরিকের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা নিশ্চিত থাকার কারণে বলা যায় আমেরিকার সরকারে জনগণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত হয়েছে।

www.pathagar.com

যুক্তরাজ্য

যুক্তরাজ্যে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন সভা রয়েছে। লর্ড সভা (House of Lords) উচ্চ কক্ষ এবং কমন্স সভা (House of Commons) নিম্নকক্ষ। বৃটেনের শাসন ব্যবস্থায় 'রাজা' নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান। প্রকৃতপক্ষে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত কমন্স সভাই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডের বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত ৬২৫ জন সদস্য নিয়ে কমন্স সভা গঠিত হয়। সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটে ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত কমন্স সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্যাবিনেট গঠন করেন। লর্ডসভা পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ হওয়া সত্ত্বেও তার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। জনগণের প্রতিনিধি কমন্স সভাই বৃটেনের শাসন ও আইন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। সেদিক থেকে বৃটিশ সরকারে জনগণের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিতই বলা যায়।

ভারত

রাষ্ট্রপতি, রাজ্যসভা এবং লোকসভা নিয়ে গঠিত হয় ভারতের পার্লামেন্ট। লোকসভার সদস্যগণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে আর রাজ্যসভার সদস্যগণ নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। লোকসভার সদস্য সংখ্যা ৫২৭ এবং রাজ্যসভার সদস্য সংখ্যা ২৫০ জন। লোকসভার সদস্যগণ ৫ বৎসর এবং রাজ্যসভার সদস্যগণ ৬ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। আইনসভার দুই কক্ষ এবং রাজ্য সরকার গুলোর আইনসভার সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটি নির্বাচকমণ্ডলী দ্বারা নির্বাচিত হন ভারতের রাষ্ট্রপতি। উভয় কক্ষের সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হন একজন উপরাষ্ট্রপতি। তারা উভয়ই ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। বস্তুত ভারতীয় সংবিধান জনগণের সরকারে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে।

রাশিয়া

আয়তনের দিক থেকে পৃথিবীর বৃহত্তম রাষ্ট্র রাশিয়া। এক সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভূক্ত ছিল। বর্তমানে রাশিয়ার সরকার পদ্ধতি স্থিতিশীল হয় নি তবে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা ছিল। উচ্চকক্ষের নাম ইউনিয়নের সোভিয়েত (Soviet of the Union) আর নিম্ন কক্ষের নাম জাতিসমূহের সোভিয়েত (Soviet of the Nationalistics) উভয় কক্ষের সদস্যগণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হতেন তবে দেশে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকার কারণে সেখানে শুধুমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যগণই নির্বাচনে অংশ নিতে পারতেন। কিছুটা সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হলেও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে সরকারে জনগণ অংশগ্রহণ করতে পারতো। ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার পর সে সব দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র চালু হওয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ বা জনপ্রতিনিধিত্ব আরো জোরদার হয়েছে।

www.pathagar.com

এই অনুচ্ছেদ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তি

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদের সাথে পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি সামঞ্জস্য রয়েছে। নিম্নে তা পরিবেশিত হলো :

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

প্রত্যেক নাগরিক নিম্নলিখিত অধিকার ও সুযোগ লাভ করবে এবং এসব ক্ষেত্রে ২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত কোন কারণের ভিত্তিতে কোনরূপ ভেদাভেদ করা চলিবে না এবং কোন অযৌক্তিক বাধা নিষেধ আরোপ করা যাইবে না।

(ক) সরকারি কাজকর্ম পরিচালনায় প্রত্যক্ষভাবে অথবা অবাধে নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দের অংশগ্রহণ করা ;

(খ) সর্বজনীন ও সমভোটাধিকারের ভিত্তিতে এবং নির্বাচকদের অবাধে মত প্রকাশের নিশ্চয়তা প্রদান করে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ান্তর অনুষ্ঠিত নির্ভেজাল নির্বাচনে ভোটদান করা ও নির্বাচিত হওয়া ;

(গ) সাধারণ সমতার ভিত্তিতে নিজ নিজ দেশের সরকারি কর্মে প্রবেশ করা।

এই অনুচ্ছেদ ও ইসলাম

ইসলামের প্রাথমিক যুগে আধুনিক নির্বাচন পদ্ধতির প্রচলন যদিও হয় নি তথাপি দেখা যায় যে, মহানবী (দঃ)–এর জীবদ্দশায় এবং খোলাফায়ে রাশেদিনের সময়ে পরোক্ষভাবে হলেও নেতৃত্ব নির্বাচনের পদ্ধতি চালু ছিল। ইসলামি শরীয়ত অনুসারে প্রতিটি মানুষ আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি, রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধানও আল্লাহর খলিফা। সরকার পরিচালনার মহান দায়িত্ব কোন নির্দিষ্ট শ্রেণী, দল বা গোষ্ঠীর একচ্ছত্র অধিকারে বর্তায় না। সমগ্র মিল্লাত বা জাতির উপর এই দায়িত্ব বর্তায়। জাতির লোকেরা তাদের মধ্য থেকে এই দায়িত্ব পালনের জন প্রতিনিধি নির্বাচিত করবে।

ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর ইন্তেকালের পর কে মুসলমানদের নেতৃত্ব প্রদান করবেন তা নির্ধারণ করে যান নি। তিনি তাঁর পরবর্তী খলিফা বা উত্তরাধিকারী নিয়োগ করে বা মনোনীত করে যেতে পারতেন। কিন্তু তা করেন নি বরং এই দায়িত্ব মুসলিম মিল্লাতের উপর অর্পণ করে গেছেন। হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত উসমান এবং হযরত আলী (রাঃ) প্রমুখ খলিফাগণও তাদের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান নি এমন কি তাদের বংশধরদের মধ্য থেকেই কাউকে নির্বাচিত করতে হবে এমন কথাও বলেন নি। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, ইসলামে শাসক কর্তৃক পরবর্তী শাসক মনোনয়ন এবং খলিফা কর্তৃক পরবর্তী খলিফা মনোনয়নের বিধান নেই বরং জনগণ

www.pathagar.com

তাদের মধ্য থেকেই তাদের নেতা নির্বাচন করবে এই ব্যবস্থা ছিল । ইসলামি শরীয়ত রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে শু'রা বা পরামর্শের ধারা চালু রাখার তাগিদ রয়েছে। রাসুলে করিমও (দঃ) তাঁর জীবদ্দশায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় সাহাবিদের পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। তিনি বিভিন্ন প্রদেশে নিযুক্ত তার প্রাদেশিক গভর্ণরদের প্রতি পরামর্শ গ্রহণের তাগিদ দিয়েছেন।

খোলাফায়ে রাশেদিনের খেলাফতকালে মজলিশে শুরা বা পরামর্শ সভা ছিল শাসন ব্যবস্থার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মজলিসে শুরার পরামর্শ ব্যতীত খলিফাগণ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন না। এই মজলিস ছিল জনগণের সরকারে অংশগ্রহণের নমুনা। আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তখন চালু না হলেও গণতন্ত্রের সকল ঐতিহ্য তখন চালু হয়েছিল। অতএব আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি ইসলামি সমাজে জনগণের সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে।

সারসংক্ষেপ

আমি স্বাধীন, এর অর্থ কি? এর অর্থ এই যে, আমার তৈরি আইন দ্বারা আমি নিয়ন্ত্রিত হব। অন্য কেউ যদি আইন বানায়, স্বাধীন মানুষ হিসাবে আমার অধিকার আছে সে আইন না মানার। লাঠির জোরে আমাকে আইন মানতে বাধ্য করা হলে সেটি হবে স্বৈরাচার।

কিন্তু প্রত্যেক মানুষের পক্ষে আইন তৈরি করা সম্ভব নয়, স্বাভাবিকও নয়। এই জটিল পরিস্থিতির একটা সুরাহা বের করেছে সভ্যজগত। সেই সুরাহার নাম নির্বাচন। আমরা দশজনে মিলে যদি একজনকে নির্বাচন করি আইন তৈরির জন্য, তবে ধরে নেওয়া যায় যে, তার প্রণীত আইন আমারই প্রণীত আইন।

নির্বাচন তাই এমন একটি মৌলিক অধিকার যা থেকে বঞ্চনা করার অপর নাম স্বাধীনতা হরণ।

দেশের প্রত্যেক মানুষই দেশের মালিক, সেই মালিকানা, সে যাকে যতটুকু দেয় তার পক্ষে সে ততটুকু পরিচালনা করতে পারে। সকল মানুষের অধিকার আছে শুধু মালিকানার দাবির সংরক্ষণ করার নয় বরং সরকারি কাজে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করার।

নির্বাচন এবং সরকারি কাজে অংশগ্রহণ তাই মানবাধিকাররূপে চিহ্নিত।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

সমাজের সদস্য হিসেবে প্রত্যেকেরই সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে ; প্রত্যেকেই জাতীয় প্রচেষ্টা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে এবং প্রতিটি রাষ্ট্রের সংগঠন ও সম্পদ অনুসারে তার মর্যাদা ও অবাধে ব্যক্তিত্ব বিকাশে অপরিহার্য অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ আদায় করার জন্য স্বত্ববান।

(Article : 22. Everyone as a member of society, has the right to social security and is entitle to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.)

ভাষ্য

আলোচ্য অনুচ্ছেদ বিশ্লেষণ করতে হলে আমাদেরকে সামাজিক নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তার বিভিন্ন দিক, ব্যক্তির অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার, এইসব অধিকার রক্ষায় জাতীয় প্রচেষ্টা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ইত্যাদি বিষয়গুলো আলোচনা করতে হবে।

সামাজিক নিরাপত্তা

আমরা সমাজে বাস করি। এই সমাজে এমন কিছু ঘটনা অকস্যাৎ সংগঠিত হয় যা মানুষের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বাইরে। মানুষের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত দুর্যোগপূর্ণ ঘটনা মোকাবেলার জন্য সমাজ কর্তৃক যে নিশ্চয়তা বা নিরাপত্তামূলক সেবা দান করা হয় সেটাই সামাজিক নিরাপত্তা। সামাজিক

www.pathagar.com

নিরাপত্তা সম্পর্কে স্যার উইলিয়াম বিভারিজ (Sir William Beveridge) বলেন, "বেকারত্ব বা অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, বৃদ্ধ বয়সে চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ, পরিবারের উপার্জনশীল ব্যক্তির মৃত্যু বা জন্ম ও বিয়ের সময় অতিরিক্ত ও অস্বাভাবিক ব্যয়ের দরুন যখন কোন পরিবারের আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যায় তখন যে কর্মসূচির মাধ্যমে আয়ের নিশ্চয়তা দান করা হয়—তাকেই সামাজিক নিরাপত্তা বলে।" ফ্রিডল্যান্ডার (Freedlander) বলেন, "সামাজিক নিরাপত্তা বলতে আমরা বুঝি—আধুনিক জীবনের সম্ভাব্য অসুস্থতা, বয়োঃবৃদ্ধকালীন নির্ভরশীলতা, শিল্প দুর্ঘটনা এবং অকর্মণ্যতা—যার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তি স্বীয় সামর্থ্য ও দূরদর্শিতার দ্বারা নিজেকে ও তার পরিবারকে রক্ষা করতে পারবে বলে আশা করা যায় না—তার বিরুদ্ধে সমাজ কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিরক্ষামূলক কর্মসূচি।"

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে বসবাস করার সময় মানুষ বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে বিপদের সম্মুখীন হয়। বিপদে আপদে মানুষ সমাজের নিকট আশ্রয় চায়, আশ্রয় চায় সমাজের অপরাপর সদস্যের নিকট । বিপদের সময়, দুঃখের দিনে বিপন্ন মানুষকে সমাজ কর্তৃক যে আশ্রয় দেয়া হয় সেটাই সামাজিক নিরাপত্তা। এটা কারো প্রতি করুণা করা নয় বরং সামাজিক নিরাপত্তা লাভ করা প্রতিটি মানুষের অধিকার, কেননা নিজে সামাজিক নিরাপত্তা লাভ করতে হলে অন্যের নিরাপত্তা দিতে হয়।

অনিরাপত্তা বোধ থেকেই সমাজের উৎপত্তি। তাই সমাজবদ্ধ মানুষ স্বভাবতই নিরাপত্তা প্রয়াসী। এমনকি যে বা যারা অন্যের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে সে বা তারাও নিজের বা নিজেদের নিরাপত্তা প্রত্যাশা করে। ব্যক্তিজীবনের স্থিতিশীলতার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা অত্যন্ত জরুরি। ব্যক্তি যদি তার সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয় তাহলে তার স্থিতি, অগ্রগতি ও বিকাশ ব্যাহত হবে, বাধাগ্রস্ত হবে।

দুর্যোগ মানব জীবনের অপরিহার্য অনুষঙ্গ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা দুষ্কৃতকারীদের উৎপাত কখন যে হানা দেয় মানুষের সাজানো সংসারে, তার কোন ইয়ত্তা নেই। এই দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য অপরের সহযোগিতা দরকার হয়। দুস্থ, বিপন্ন, অসহায় মানুষ নিজের হাল ধরতে পারে না। তখন তার সহযোগিতায় এগিয়ে আসে অপরাপর মানুষ। সামাজিক নিরাপত্তা না থাকলে এটুকু আশা করা যায় না। দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা আবশ্যক।

সমাজবদ্ধ মানুষ সামাজিক অগ্রগতি চায়। এই অগ্রগতির জন্য দরকার নিশ্চয়তাবোধ। অসুস্থতা, বেকারত্ব ও বৃদ্ধকালীন অবসরে জীবন যাপনের নিশ্চয়তা, দুর্ঘটনা কবলিত হলে ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া ও বিয়ের সময় সহায়তা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা ইত্যাদি মানুষকে অধিক কর্মক্ষম করে তোলে। কর্মের প্রতি উৎসাহ সামাজিক অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য। আর এটা সম্ভব সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদানের মাধ্যমেই।

যেখানে সামাজিক নিরাপত্তা নেই সেখানে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সাংস্কৃতিক বিকাশ কোন ক্রমেই আশা করা যায় না । কারণ সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের পূর্বশর্ত

www.pathagar.com

হচ্ছে সামাজিক নিরাপত্তা। সমাজের সভ্য হিসেবে প্রতিটি ব্যক্তির এই অধিকার রয়েছে যে, সে সামাজিক নিরাপত্তা ভোগ করবে।

সামাজিক নিরাপত্তার ধারণাটি অনেক ব্যাপক। একটি সমাজ গড়ে উঠে অনেক রকমের মানুষের সমন্বয়ে। সমাজবদ্ধ মানুষের রুচি, চাহিদা, প্রয়োজন, প্রত্যাশা, সমস্যা সংকট সবই থাকে। কিন্তু এগুলোর মধ্যে থাকে বহু বৈচিত্র্য। একজনের প্রয়োজনের সাথে আরেকজনের প্রয়োজন যেমন মেলে না, তেমনি একজনের সংকটের সঙ্গে অন্যজনের সংকটের মিল থাকে না। এই বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাজ জীবনে সর্বদাই সংকট ও সমস্যা মানব জীবনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এসবের মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক সংকট, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ইত্যাদি। একটি সমাজকে আমরা তখনই নিরাপদ বলতে পারি যখন সেই সমাজের অধিবাসীদের আর্থিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে নিরাপত্তা থাকে।

অর্থনৈতিক নিরাপত্তা

অর্থনৈতিক নিরাপত্তার বিষয়টি জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিস্তৃত। অর্থের সাথে সংশ্লিষ্ট মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের নিরাপত্তার বিষয়টি এর অন্তর্ভুক্ত। জীবিকা অন্বেষণ, অর্জন, উৎপাদন, বিনিময়, ভোগ, বণ্টন, বিনিয়োগ, লেনদেন ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিরাপত্তা প্রয়োজন হয়। মানুষের যদি জীবিকা অন্বেষণের স্বাধীনতা এবং অর্জনের উপায় না থাকে, আয় উপার্জন থেকে সঞ্চয় এবং সঞ্চয় থেকে বিনিয়োগের সুবিধা ও নিশ্চয়তা না থাকে, উৎপাদিত সম্পদে সকলের প্রাপ্য যদি যথার্থভাবে রক্ষিত না হয়, নিজের উপার্জন থেকে পরিমিত পরিমাণে ভোগের নিশ্চয়তা যদি না থাকে তাহলে যে অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা দেখা দেয় সেটা হচ্ছে অর্থনৈতিক অনিরাপত্তা। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনিরাপত্তা সামাজিক নিরাপত্তাহীনতারই পরিচায়ক। তাই সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য অর্থনৈতিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান আবশ্যক। প্রতিটি মানুষের এই অধিকার রয়েছে যে, সে সামাজিক নিরাপত্তার অংশ হিসেবে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভ করবে।

রাজনৈতিক নিরাপত্তা

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিষয়টিও সামাজিক নিরাপত্তা অপরিহার্য অংশ। যে সমাজে জনগণের রাজনৈতিক অধিকার নেই, সরকার গঠন ও পরিচালনায় জনগণ তাদের যথার্থ ভূমিকা রাখতে পারে না, স্বাভাবিক উপায়ে সরকার পরিবর্তন হয় না, সরকার ও জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক বিরাজ করে না, জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন স্বৈরাচারী ক্ষমতা দখল করে থাকে, সেই সমাজে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করে। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং অরাজকতা কোন নিরাপদ সমাজের বৈশিষ্ট্য নয়। যে সমাজে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও

www.pathagar.com

অরাজকতা বিরাজ করে, সেই সমাজে হত্যা, গুম, দাঙ্গা, সন্ত্রাস ইত্যাদি লেগেই থাকে, ফলে সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন হয়। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া প্রতিটি মানুষের অধিকার। সামাজিক নিরাপত্তার অপরিহার্য অংশ হিসেবে প্রতিটি মানুষের রাজনৈতিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার রয়েছে। কোন মানুষকে রাজনৈতিকভাবে নিরাপত্তা প্রদানের অর্থ এই নয় যে তাকে করুণা করা হয়েছে বরং নিরাপত্তা প্রাপ্তিটা তার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। একটি সমাজের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে সেই সমাজের রাজনৈতিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে হবে।

সাংস্কৃতিক নিরাপত্তা

সংস্কৃতি একটি সমাজের মূল। সুস্থ ও স্বাভাবিক সংস্কৃতি চর্চা সমাজকে পরিশীলিত ও বিকশিত করে। সমাজে বসবাসরত প্রতিটি নাগরিক শান্তিপূর্ণভাবে তার নিজের সংস্কৃতি চর্চা ও লালন করবে। ফলে প্রতিটি নাগরিকের জীবন হয়ে উঠবে আনন্দময়। কিন্তু কোন কারণে সংস্কৃতি চর্চার ধারা যদি ব্যাহত হয়, স্বকীয় সংস্কৃতির লালন যদি বাধাগ্রস্ত হয় তাহলে সামাজিক অশান্তি নেমে আসতে বাধ্য। তাই একটি সমাজের সামাজিক নিরাপত্তার জন্য সেই সমাজের সকল মানুষের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা থাকতে হবে, সংস্কৃতি চর্চা লালন ও উন্নয়নের সুযোগ থাকতে হবে। সাংস্কৃতিক নিরাপত্তা সামাজিক নিরাপত্তার অংশ। প্রতিটি মানুষেরই তার সমাজের সাংস্কৃতিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার রয়েছে।

ব্যক্তির অর্থনৈতিক অধিকার

ব্যক্তির অর্থনৈতিক অধিকার অত্যন্ত ব্যাপক। অর্থনীতি মানবজীবনের সে সব দিক ও বিভাগ নিয়ে আলোচনা করে যেগুলোর সাথে অর্থের সম্পর্ক রয়েছে। তেমনি ব্যক্তির যে সব অধিকারের সাথে অর্থের যোগ রয়েছে সেগুলো হচ্ছে অর্থনৈতিক অধিকার। নিম্নে সংক্ষেপে মানুষের অর্থনৈতিক অধিকার সম্পর্কে আলোকপাত করা হচ্ছে।

জীবিকার অধিকার

পৃথিবীতে সম্পদ সীমিত, মানুষের প্রয়োজন অসীম। অসীম অভাব আর প্রয়োজনের মধ্যেই এমন কিছু আছে যেগুলো ছাড়া মানব জীবন অচল। জীবিকার প্রয়োজন এর মধ্যে অন্যতম। জীবনের নিম্নতম প্রয়োজন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদির প্রয়োজন মেটানোর জন্য মানুষকে জীবিকার খোঁজে বেরুতে হয়। জীবিকা অন্বেষণ এবং জীবিকা অর্জনের অধিকারটি মানুষের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট । কেউ যদি কোন ব্যক্তির জীবিকার অধিকারটি কেড়ে নেয় তাহলে প্রকারান্তরে ঐ ব্যক্তির বেঁচে থাকার অধিকারটিই হরণ করা হলো। জীবিকার অধিকারের মধ্যে দুটি বিষয়—একটি হচ্ছে নিজের যোগ্যতা, সামর্থ ও রুচিমত

www.pathagar.com

নিজের জীবিকা বেছে নেয়ার ও নিজের ইচ্ছামত জীবিকা অন্বেষণ করার অধিকার। অপরটি জীবিকা অর্জনের অধিকার। জীবিকার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে অর্থনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই এটা মানুষের অর্থনৈতিক অধিকার। ব্যক্তি যে দেশে বাস করেন সে দেশের রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও সম্পদ অনুসারে জীবিকা অন্বেষণ ও অর্জনের অধিকার সেই ব্যক্তির রয়েছে। জীবিকার অধিকারের মতো গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অধিকার থেকে কোন ব্যক্তিকে কোন অজুহাতেই বঞ্চিত করা যাবে না। কারণ এটা প্রতিটি মানুষের অপরিহার্য মৌলিক অধিকার।

সঞ্চয়ের অধিকার

ব্যক্তি যা উপার্জন বা আয় করবেন তা থেকে প্রয়োজনমত ভোগ করে অথবা ভোগকে আপাত সংযত রেখে সঞ্চয় করতে পারেন। ভবিষ্যতেও সম্ভাব্য সংকট, দুর্যোগ ইত্যাদি মোকাবেলার জন্য এই সঞ্চয় প্রবণতা। প্রতিটি ব্যক্তির সঞ্চয় করবার অধিকার রয়েছে এবং অধিকার রয়েছে নিজের সঞ্চয়কে যে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আমানত রাখবার। এই অধিকারটি অর্থনৈতিক অধিকারভুক্ত।

বিনিয়োগের অধিকার

কোন ব্যক্তি যা সঞ্চয় করলেন, তাকে মুনাফা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিনিয়োগ করতে পারেন। বিনিয়োগ উৎপাদন বৃদ্ধির পূর্বশর্ত। জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে বিনিয়োগের ভূমিকা অত্যন্ত বেশি। নিতান্ত জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী এবং ধ্বংসাত্মক কোন ক্ষেত্র ছাড়া বিনিয়োগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যায় না। বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ প্রতিটি ব্যক্তির অর্থনৈতিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

ন্যায্য মজুরি পাবার অধিকার

ব্যক্তি যদি কোন কিছুতে শ্রম প্রদান করেন তাহলে সেই শ্রমের পরিবর্তে ন্যায্য ও যথার্থ মজুরি পাবার অধিকার তার রয়েছে। শ্রমের বিনিময়ে শ্রমিককে যে মজুরি দেয়া হয় এটা করুণা বা কৃপা নয় বরং এটা শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা—অধিকার। এই ক্ষেত্রে ব্যক্তি যতটুকু শ্রম প্রদান করবে এর যথার্থ মজুরি লাভের অধিকার তার অর্থনৈতিক অধিকারভুক্ত।

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার অধিকার

কোন ব্যক্তি যেখানে কাজ করবেন সেখানে অর্থাৎ কর্মক্ষেত্রে তার নিরাপত্তা থাকবে। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা জীবিকা লাভের নিরাপত্তারই অংশ। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা না থাকলে ব্যক্তি তার কাজে-কর্মে উৎসাহ পাবে না, জীবনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারবে না। ব্যক্তির

www.pathagar.com

এবং জাতির উন্নতির জন্যই এই অধিকার অপরিহার্য। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা লাভের অধিকারটিও অর্থনৈতিক অধিকারভুক্ত।

ব্যক্তির সামাজিক অধিকার

মানুষের সামাজিক জীবন যেমন বিস্তৃত তেমনি বিস্তৃত তার সামাজিক অধিকার। জন্মের সাথে সাথে মানুষ সমাজভুক্ত হয়। তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজ থেকে বিদায় নেয়। এই সময়ে মানুষ অনেকগুলো সামাজিক অধিকার ভোগ করে। ব্যক্তির সামাজিক অধিকারগুলো নিম্নে আলোচনা করা হচ্ছে ঃ

বেঁচে থাকার অধিকার ঃ মানুষের জীবন পরস্পরের কাছে পবিত্র। যথেচ্ছভাবে মানুষের জীবন হরণ করা যায় না। পরস্পরের বেঁচে থাকার অধিকার প্রদানের বিষয়টি সমাজস্বীকৃত ব্যবস্থা। মানুষের জীবনের নিরাপত্তা প্রদান করা সমাজের দায়িত্ব। সমাজের এই যে দায়িত্ব এটা হচ্ছে সমাজের কাছে মানুষের অধিকার। প্রতিটি মানুষের বেঁচে থাকার অধিকারটি হচ্ছে তার সামাজিক অধিকার।

বিবাহের অধিকার ঃ বিবাহ হচ্ছে একটি সমাজ স্বীকৃত ব্যবস্থা। নারীপুরুষের বৈধ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সমাজ এই অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছে। সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজ যে বৈবাহিক পদ্ধতির সৃষ্টি করেছে এর অধীনে বিবাহ কর্ম সম্পাদন এবং বিবাহিত জীবন যাপনের অধিকার প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক নরনারীর রয়েছে।। নারী পুরুষের বিবাহের অধিকারটি হচ্ছে অন্যতম সামাজিক অধিকার।

শিক্ষার অধিকার ঃ ব্যক্তির মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। সমাজের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং অধিবাসীদের প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই তার দেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও আর্থিক সংগতি অনুসারে শিক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, শিক্ষা উপকরণ লাভ, শিক্ষা গ্রহণের জন্য অধ্যয়নের বিষয় পছন্দ এর অন্তর্ভুক্ত।

ধর্ম সম্পর্কিত অধিকার ঃ ব্যক্তি তার বিচার বুদ্ধি, বিবেক অনুযায়ী যে কোন ধর্ম গ্রহণ, ত্যাগ ও পালনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত। ব্যক্তিই ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ বিচারক। ধর্ম সম্পর্কিত এই অধিকার হচ্ছে ব্যক্তির সামাজিক অধিকার। রাষ্ট্র বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান ব্যক্তির এই অধিকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

সম্পত্তির অধিকার ঃ সম্পত্তির অধিকার মানুষের জন্য একটি সমাজ স্বীকৃত ব্যবস্থা। সম্পত্তি অর্জন এবং ভোগের সুযোগ সুবিধা এর অন্তর্ভুক্ত। সম্পত্তি ব্যক্তিত্ব বিকাশের অপরিহার্য উপাদান। তাই এই অধিকার থাকা প্রয়োজন। সমাজতান্ত্রিক সমাজে এই অধিকার

www.pathagar.com

থাকে না। সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী ব্যক্তির সম্পত্তি অর্জনের ও ভোগের যতটুকু সীমা নির্ধারিত থাকে ততটুকু সম্পত্তির অধিকার ব্যক্তির রয়েছে।

চলাফেরার অধিকার ঃ এই অধিকারের অর্থ হলো রাষ্ট্রীয় সীমানার ভেতর অবাধে চলাফেরার অধিকার। অবাধে চলাফেরার স্বাধীনতা মানুষের মৌলিক অধিকার। তবুও ব্যক্তির অবাধ চলাফেরা বা অবাধ গমনাগমন রাষ্ট্রের অস্তিত্বের পক্ষে ক্ষতিকর কোন প্রভাব ফেলে কিনা তা অবশ্যই লক্ষ্য করতে হবে। কিন্তু তাই বলে বিনা বিচারে আটক, গতিবিধির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ উচিত নয়। আইনের আওতায় অবাধে চলাফেরার অধিকার প্রতিটি মানুষের রয়েছে।

চুক্তি করার অধিকার ঃ চুক্তির অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে বিভিন্ন প্রকার কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার অধিকার। ব্যবসা–বাণিজ্য, বিষয়সম্পত্তি সংরক্ষণ এবং অন্যান্য অনেক অর্থনৈতিক কাজের ভিত্তি হচ্ছে চুক্তির অধিকার। বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডেও মানুষ চুক্তিবদ্ধ হয়। বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনও এক ধরনের চুক্তি। সকলেরই চুক্তির অধিকার রয়েছে।

চিন্তা ও বিবেকের অধিকার ঃ সমাজ প্রতিটি ব্যক্তির চিন্তার স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও বিবেকের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি প্রদান করে। এই সব স্বাধীনতা ছাড়া ব্যক্তি নির্জীব হয়ে পড়বে। ব্যক্তির সামগ্রিক বিকাশের জন্য এসব ক্ষেত্রে স্বাধীনতা অপরিহার্য। মানুষ নিজের স্বাধীনতাকে জলাঞ্জলি দেয়ার জন্য নয় বরং ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সমাজবদ্ধ হয়েছে, আর তাই সমাজ তার এসব অধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। চিন্তা, বিবেক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারটি মানুষের সামাজিক অধিকার।

এমনিভাবে একটি সমাজের মানুষের আরো অনেক সামাজিক অধিকার আছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অধিকার, সভাসমিতি করার অধিকার, সাম্যের অধিকার, ন্যায়বিচার লাভের অধিকার সমাজস্বীকৃত। সুসভ্য সমাজ জীবনের জন্য এই অধিকারগুলো অত্যন্ত জরুরি।

ব্যক্তির রাজনৈতিক অধিকারগুলোও সমাজিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য এই অধিকারগুলোও অত্যন্ত জরুরি। এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে নির্বাচনের অধিকার, সরকারি চাকুরি লাভের অধিকার, যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ, দাবি ও আবেদন পেশ করার অধিকার, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বসবাসের অধিকার, বিদেশে অবস্থানকালে নিরাপত্তা লাভের অধিকার ইত্যাদি।

প্রতিটি ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য যে সব অধিকার লাভ করা অপরিহার্য সেগুলো হচ্ছে তার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার। উপরে যে অধিকারগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো সেগুলো মানব জীবনের বিকাশের জন্য অপরিহার্য। প্রতিটি মানুষের বা ব্যক্তির এ সকল অধিকারের উপর স্বত্ব রয়েছে, দাবি রয়েছে। সমাজের কাছ থেকে ব্যক্তি এই অধিকারগুলো পেতে পারে। কারণ মানুষ হিসেবে সহজাতভাবেই এসব অধিকার সে লাভ করেছে।

www.pathagar.com

ব্যক্তির অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে জাতীয় প্রচেষ্টা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কথা আলোচ্য অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে জাতীয় প্রচেষ্টা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বলতে কি বুঝায় এবং এগুলোর সীমা কতটুকু?

জাতীয় প্রচেষ্টা

জাতি বলতে এমন একটি জনসমষ্টিকে বুঝায় যারা ভাষা, কৃষ্টি, সভ্যতা, ধর্ম, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের আওতাধীনে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। জাতি সম্পর্কে ইতোপূর্বে ১৫ নং অনুচ্ছেদে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র জাতীয় প্রচেষ্টার কথা আলোচনা করবো। জাতীয় প্রচেষ্টা হচ্ছে জাতির অগ্রগতির প্রয়াস। একটি নির্দিষ্ট সময়ে মোট জাতীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে জাতির চাহিদা বা প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে যে অগ্রগতি লাভের প্রয়াস, তাকে আমরা জাতীয় প্রচেষ্টা বলতে পারি। প্রতিটি ব্যক্তি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়। ব্যক্তিস্বার্থকে পদদলিত করে, জাতির উন্নতির জন্য প্রয়াস চালায়। অবশ্য জাতীয় প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য ব্যক্তির বিকাশ সাধন করা কারণ জাতির উন্নতি হলে তার সুফল তো ব্যক্তিই ভোগ করে।

প্রতিটি রাষ্ট্রে নাগরিকদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন এবং সাংস্কৃতিক বিকাশ সাধনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। রাষ্ট্রের জনশক্তি ও সমুদয় সম্পদকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে সর্বোচ্চ অগ্রগতি সাধনই হয় পরিকল্পনার লক্ষ্য। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নিবেদিত হয় জনগণের সকল প্রচেষ্টা। রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে জনগণের উন্নতির জন্য যে প্রচেষ্টা, সেটাকেই আমরা জাতীয় প্রচেষ্টা হিসেবে গণ্য করি। জাতীয় প্রচেষ্টা ছাড়া শুধুমাত্র ব্যক্তির উদ্যোগ ও প্রয়াসে ব্যক্তির সকল অধিকার অর্জন সম্ভব নয়। তাই জাতীয় প্রচেষ্টা অত্যন্ত জরুরি।

জাতীয় প্রচেষ্টার পরিধি বা সীমা অত্যন্ত ব্যাপক। রাষ্ট্রের সাংগঠনিক কাঠামো ও সম্পদের ভিত্তিতে জনগণের তথা ব্যক্তির যে সব অধিকার আছে সেগুলোর আইনগত স্বীকৃতি ও ভিত্তি স্থাপন জাতীয় প্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্রের সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তিতে নাগরিকের বা ব্যক্তির অধিকারের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য বা ভিন্নতা বিদ্যমান। যেমন—পুঁজিবাদী ও মুক্তবাজার, অর্থনীতিভিত্তিক সমাজের ব্যক্তি যে সব অধিকার ভোগ করেন সমাজতান্ত্রিক ও নিয়ন্ত্রিত বাজার অর্থনীতিভিত্তিক সমাজের ব্যক্তি অবিকল সে সব অধিকার ভোগ করেন না। এর মূল কারণ হচ্ছে রাজনৈতিক মতাদর্শ ও রাষ্ট্রীয় সংগঠনের কাঠামোগত পার্থক্য। যাই হোক কোন রাষ্ট্রে ব্যক্তি কি কি অধিকার কতটুকু ভোগ করেন তা নির্ধারণের জন্য জাতীয় প্রচেষ্টা আবশ্যক। অতঃপর এই সব অধিকারের আইনগত স্বীকৃতি দরকার।

ব্যক্তির অধিকারের আইনগত স্বীকৃতি প্রদানই যথেষ্ট নয়। এই সব অধিকার সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত ও প্রশাসনিক সহায়তা ও নিশ্চয়তা থাকতে হবে। সমাজবদ্ধ

www.pathagar.com

মানুষের মধ্যে মানবীয় গুণাবলীর পাশাপাশি খানিকটা পাশবিকতাও বিদ্যমান। ফলে মানুষের অধিকার হরণ করে মানুষ, মানুষই মানুষের জীবন বিপন্ন করে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য জাতীয় প্রচেষ্টায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। আইনের শাসন, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ছাড়া ব্যক্তির অধিকার সংরক্ষিত হতে পারে না। তাই সঙ্গত কারণেই আইনের শাসন এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত জাতীয় প্রচেষ্টা ব্যাপ্ত। মানুষের অধিকার সমুন্নত করার জন্য আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ব্যাপারে জাতীয় প্রচেষ্টা যত জোরদার হবে ব্যক্তির অধিকার তত সুরক্ষিত হবে।

বাংলাদেশের সংবিধানে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে এ সম্পর্কে বিধান রয়েছে। নিম্নে তা পরিবেশিত হলো।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে—কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতি সাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায় :

(ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা,

(খ) কর্মের অধিকার অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরির বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার ;

(গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার ; এবং

(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকারী।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

ব্যক্তি যেমন স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, জীবন ধারণ ও বিকাশের জন্য অপরের দ্বারস্থ তাঁকে হতে হয়, যে কারণে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য মানুষ গড়ে তুলেছে সমাজ তেমনি রাষ্ট্রও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। কোন জাতিই এককভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্যান্য জাতির সহযোগিতা ছাড়া বেঁচে

www.pathagar.com

থাকতে পারে না। যদি বা কোন রকমে বেঁচে থাকে, টিকে থাকে তথাপি বিকশিত হতে পারে না। কারণ বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির প্রভাবে মানুষের চাহিদা এখন বহুমুখী। শুধু খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকাই নয় বরং সেই সঙ্গে আধুনিক উন্নততর জীবন যাপন ও শিল্প সংস্কৃতির বিকাশ মানুষের কাম্য। তার জন্য জাতিতে জাতিতে সহযোগিতা ও সম্প্রীতি দরকার।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সুফলের উপর সমগ্র মানব জাতির অধিকার রয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তি যেমন মানুষে মানুষে বিশ্বব্যাপী সহজতর করেছে, তেমনি তা মানুষকে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল করে তুলেছে। উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছে যা তথ্য বিনিময়কে জোরদার করেছে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ছাড়া এই বিনিময় ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়।

বিশ্বব্যাপী একটি ভাবধারা বর্তমানে খুব জনপ্রিয় হচ্ছে। আর তা হচ্ছে আন্তর্জাতিকতাবাদ। শান্তিকামী মানুষের পরিমাণই বোধ হয় পৃথিবীতে বেশি। তাদের প্রত্যাশা হচ্ছে শান্তি ও নিরাপত্তা। শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে মানুষের অধিকার রক্ষা পাবে না। মানবাধিকারের অনেকগুলো বিষয়ের জন্যই পূর্ব শর্ত হচ্ছে শান্তি ও নিরাপত্তা। আর এটা আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। জাতিতে জাতিতে হানাহানি, মারামারি, দ্বন্দ্ব সংঘাত মানবতাকে অন্ধকারে ঠেলে দেয়, কলঙ্কিত করে, তাই আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মনোভাব বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা আনতে পারে, যা মানবাধিকার রক্ষার জন্য অপরিহার্য।

আলোচ্য অনুচ্ছেদ অনুসারে মানুষের মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য ব্যক্তির যে সকল অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রয়েছে, সেগুলো আদায়ের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ বহুজাতিক সহযোগিতার কথা বলা হয়েছে। বহুজাতিক প্রচেষ্টা ও বিশ্ব সম্প্রদায়ের সমন্বিত প্রয়াসের মাধ্যমে মানুষের এসব অধিকার বাস্তবায়ন করতে হবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব নিম্নে আলেচিত হচ্ছে ঃ

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ঃ অর্থ মানবজীবনের অপরিহার্য উপাদান। মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অর্থের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের জনগণের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা অনেক দেশেরই নেই। তাই সেই সব দেশের নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে অর্থনৈতিক দুরবস্থা একটি মারাত্মক প্রতিবন্ধক। বিকাশমান দেশগুলোর মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রয়োজন। বিশ্বব্যাপী মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন অর্থনৈতিক সহযোগিতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংক, এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থা রয়েছে, যা ব্যক্তির অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সহযোগিতা প্রদান করছে।

www.pathagar.com

সামাজিক ক্ষেত্রে ঃ ব্যক্তির সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রয়োজন। তাই বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতির বন্ধনকে জোরদার করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এজন্য বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার অনেকগুলো মাধ্যম রয়েছে। এগুলো সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হচ্ছে।

ঋণ এবং অনুদান ঃ Loans and grants

আন্তর্জাতিক সহযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদন হচ্ছে ঋণ এবং অনুদান। অন্য রাষ্ট্রকে ঋণ এবং অনুদান প্রদানের রীতি অনেক শতাব্দী ধরেই চলে আসছে। বর্তমানে তা নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। ঋণ বা অনুদান প্রদানের বিশেষ বা সাধারণ উদ্দেশ্য থাকতে পারে। কোন রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রকে ঋণ প্রদান করতে গিয়ে প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্থ বা ঋণপত্র হস্তান্তর করে না বরং ঋণ হিসেবে পণ্যসামগ্রী প্রেরণ করে। এরূপ ঋণদানকারী দেশ স্পষ্টতই তার নিজস্ব শিল্পের উন্নতি সাধন করতে পারে। এতে করে ঋণদানকারী রাষ্ট্রের সাথে ঋণগ্রীতা রাষ্ট্রে মৈত্রী ও বন্ধুত্ব সুদৃঢ় হতে পারে। প্রায়শই ঋণের সুদের হার নগণ্য হয়। যুদ্ধোত্তর পুনর্বাসনের জন্যও ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। কোন দেশের অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক, এমনকি সামরিক সমৃদ্ধির জন্যও অন্য দেশ কর্তৃক ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। তবে আলোচ্য অনুচ্ছেদ অনুসারে মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির জন্য ঋণ ও অনুদান হিসেবে সহযোগিতা পাওয়ার অধিকার মানুষের রয়েছে। তবে ঋণ ও অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত সহযোগিতা অস্বীকারের ঘটনাও পৃথিবীতে কম ঘটে নি। যেমন ১৯৫২ সালে ইরান বৃটিশ মালিকানাধীন তেল শিল্প জাতীয়করণ করেছিল। ১৯৫৬ সালে সুয়েজখাল জাতীয়করণ করেছিল মিশর এবং ফিডেল ক্যাস্ট্রো ১৯৫৯-৬০ সালে কিউবাতে প্রদত্ত বৈদেশিক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। এসব ঘটনা বিরল, যা আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পরিপন্থী। বস্তুত, ঋণ ও অনুদান আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান উপাদান।

বৈদেশিক ঋণের একটি নেতিবাচক দিকও আছে। উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশসমূহ যত বেশি বিদেশী পুঁজির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নয়া উপনিবেশিক প্রভাবও তত বেশি প্রসারিত হচ্ছে। ঐ সব দেশ বৈদেশিক ঋণের দায়ে জর্জরিত হয়ে পড়েছে। তৃতীয় বিশ্ব রপ্তানি থেকে আয়ের ২০%—৪০% ব্যয় করে ঋণ পরিশোধের জন্য। ১৯৬০ সালে উন্নয়নশীল দেশের ঋণের পরিমান ছিল ১৮,০০০ মিলিয়ন ডলার। ১৯৮০ সালে তা ৪,৪৬,০০০ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। এর মধ্যে স্বল্পকালীন ১,৩৪,০০০ মিলিয়ন ডলার যোগ করতে হয়। ১৯৭০ সালে উন্নয়নশীল দেশসমূহের ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ছিল ৯,৩০০০ মিলিয়ন ডলার। ১৯৭৯ সালের শেষে উন্নয়নশীল দেশসমূহের মোট ঋণের বোঝা ছিল ৩,৯১,০০০ মিলিয়ন ডলার। বর্তমানে সোভিয়েতের ইউনিয়ন ভেঙ্গে যে সব স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে সেগুলোসহ

www.pathagar.com

পূর্ব ইউরোপের সাবেক কমিউনিস্ট রাষ্ট্রসমূহ বিপুল পরিমাণ ঋণের বোঝা বইছে। অনেকের মতে, এই ঋণ ব্যবস্থার মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের সম্পদ উন্নত দেশে চলে যাচ্ছে।

যত অভিযোগই আসুক না কেন, দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত তৃতীয় দুনিয়ার পশ্চাৎপদ দেশসমূহকে তাদের নূন্যতর অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তুলতে হলে অবশ্যই বৈদেশিক ঋণের সহযোগিতা নিতেই হবে। ঋণ দেয়া এবং নেয়ার সময় সকলের মধ্যে যদি রাজনৈতিক স্বার্থের চেয়ে মানবিক বোধটা বেশি থাকে, তবেই ঋণ হবে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উপাদান। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ এবং অধিকার সংরক্ষণের জন্য এই সহযোগিতা আবশ্যক। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা পাওয়াটা মানুষের অধিকার, তৃতীয় বিশ্বের অধিবাসীদের জন্য এই অধিকার আরো জোরালো।

বিদেশী মূলধন বিনিয়োগ

ব্যক্তির অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য জাতীয় ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নতি অপরিহার্য। জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদেশী মূলধন বিনিয়োগের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশী শিল্পের বিকাশ, কাঁচামালের সদ্ব্যবহার, বিপুল পরিমাণ জনশক্তির কর্মসংস্থান, জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ইত্যাদির জন্য বিদেশী মূলধন বিনিয়োগ অপরিহার্য। দারিদ্র্য প্রপীড়িত তৃতীয় দুনিয়ার মানুষদের আর্থিক অবস্থা যেখানে দরিদ্র রেখার নিচে, নিজের আয় দিয়ে যেখানে দিন গুজরানই কঠিন হয়ে পড়ে, জনগোষ্ঠীর বেশির ভাগের জীবনই যেখানে নুন আনতে পানতা ফুরায় অবস্থা, সেখানে আয় থেকে সঞ্চয় করে মূলধন সৃষ্টি এবং তা বিনিয়োগের প্রত্যাশা সুদূর পরাহত। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মতো দরিদ্র দেশের জাতীয় আয়ের অবস্থাও তেমনি নৈরাশ্যজনক। আয়ের স্বল্পতার কারণে সঞ্চয় হয় না। সঞ্চয়ের অভাবে মূলধন সৃষ্টি হয় না। মূলধন না থাকলে বিনিয়োগের প্রশ্নই ওঠে না। তাই এশিয়া আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকার স্বল্পোন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের চোখ পড়ে থাকে বৈদেশিক সাহায্য আর বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রতি। প্রথমোক্তটির তুলনায় শেষোক্তটি অনেক বেশি কার্যকর। বিদেশী বিনিয়োগ একটি দেশে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে পারে।

বিদেশী বিনিয়োগের জন্য অনুকূল পরিবেশ চাই। এটা তৈরি করতে হয় রাষ্ট্রের সরকার এবং নাগরিকদের। অনুকূল পরিবেশে মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা, ত্রুটিমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থা, শ্রম ও কাঁচামালের সহজলভ্যতা, বাজারের সম্ভাবনা ইত্যাদি। এসব না থাকলে বিদেশী মূলধন বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগে উৎসাহিত হয় না। বিনিয়োগকারীরা শুধু বিদেশী মূলধনই নিয়ে আসে না, সঙ্গে নিয়ে আসে দক্ষ ও উন্নত ব্যবস্থাপনা। পর্যাপ্ত মূলধন এবং উন্নত ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার সমন্বয়ে একটি দেশের ব্যবসা বাণিজ্য এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। তাই বৈদেশিক সাহায্যের ক্ষেত্রে বিদেশী মূলধন বিনিয়োগকে খাট করে দেখার অবকাশ নেই।

www.pathagar.com

আন্তঃসরকার পণ্য চুক্তি (Inter Government Commodity Agrements)

বিশ্ববাজারে কোন বিশেষ রাষ্ট্র যাতে কোন সুনির্দিষ্ট অংশ লাভ করতে পারে, সেটি নিশ্চিত করার জন্য আন্তঃসরকার পণ্য চুক্তি করা হয়। কোন বিশেষ পণ্যের সাধারণত অতি উৎপাদনের কারণে এবং ঐ পণ্যের বাজারে ক্ষতিকর প্রতিযোগিতা এড়ানোর জন্য এ ধরনের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যখন কোন পণ্য একাধিক দেশ কর্তৃক উৎপাদিত হয়, তখন বিশ্ববাজারে এ পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য কোন একক রাষ্ট্র যদি প্রচেষ্টা চালায় তাহলে সাধারণভাবে তা ব্যর্থ হয়। বস্তুত বাজারে পণ্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা, বাজারের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির জন্য আন্তঃসরকার পণ্যচুক্তি সম্পাদন করা হয়। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে এটাও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বিশ্বব্যাপী শিল্প উন্নয়নের কারণে মানুষের জীবনযাত্রাকে আরামপ্রদ করার জন্য বহুবিধ রকমের পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে। মানুষের একই উপযোগ পূরণের জন্য বা একই ধরনের চাহিদা মেটানোর জন্য বিভিন্ন রকমের পণ্য বাজার সয়লাব করছে। এই অবস্থায় পণ্য উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে বাজারে অস্থিতিশীলতা ও ভারসাম্যহীনতা দেখা দেবে, যা অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির পথে মারাত্মক অন্তরায়। তাই পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে আন্ত সরকার পণ্যচুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ।

বৈদেশিক সাহায্য (Foreign Aid)

বিশ শতকের চতুর্থ দশক পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় দুই তৃতীয়াংশ মানুষ ঔপনিবেশিক শোষণ এবং শাসনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অনিবার্য ধ্বংসের মুখে উপনীত হয় এবং ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যে ১২৫ কোটি মানুষ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি লাভ করে। এর পর ক্রমাগত সংগ্রাম আর আত্মত্যাগের মাধ্যমে এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার পরাধীন জাতিসমূহ স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে আনতে থাকে। বর্তমানে প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসন বলতে গেলে নাই।

কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়েই সবকিছু অর্জিত হয়ে যায় নি। স্বাধীনতা অর্জনের পরও এইসব সদ্য স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্রসমূহের গায়ে লেগে থাকে ঔপনিবেশিক শাসনের ক্ষতচিহ্ন। অশিক্ষা, অধিক জনসংখ্যার চাপ, বেকারত্ব, খাদ্যাভাব, রোগব্যাধি, দারিদ্র্য এবং অদক্ষতার বোঝা নিয়ে এরা স্বাধীনতার পতাকা উড়ায়। স্বাধীন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অগ্রগতি প্রসাশনিক পুনর্গঠন, রাজনৈতিক সংস্কার এবং সামাজিক বিকাশের কর্মসূচী নেয়ার মত যথেষ্ট মূলধন তাদের ছিল না। তাৎক্ষণিকভাবে পুঁজি সৃষ্টি এবং মূলধন গঠনের মতো যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষমতা অনেক রাষ্ট্রেরই ছিল না। ফলে তাদেরকে বৈদেশিক সাহায্যের জন্য হাত বাড়াতে হয়। সাহায্যের জন্য শুধু হাত পাততেই হয় না, অপর পক্ষে থেকেও হাত বাড়ানো হয়। অনেক

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে পুরোনো প্রভুরা এগিয়ে আসেন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে। যে কারণেই হোক এমনি করে আস্তে আস্তে বৈদেশিক সাহায্য একটি অনিবার্য ব্যবস্থা হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়।

বর্তমানে বিশ্বরাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বৈদেশিক সাহায্য। বলতে গেলে এই সাহায্যই বিশ্বরাজনীতির গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। রাজনৈতিক প্রভাব বলয় তৈরিতে বৈদেশিক সাহায্য সমরাস্ত্রের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বৈদেশিক সাহায্য দুরকমের হতে পারে। এক. সরকারি, দুই. বেসরকারি।

সাধারণত শিল্পোন্নত দেশসমূহ তাদের রাজনৈতিক কৌশলের অংশ হিসেবে অনুন্নত, উন্নয়নগামী দেশসমূহকে এমনকি উন্নত দেশসমূহকেও সরকারি ভাবে সাহায্য দিয়ে থাকে। শিল্পস্থাপন, অবকাঠামো নির্মাণ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, অভ্যন্তরীন সম্পদ আহরণ, বাজার উন্নয়ন, প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ইত্যাদির জন্য সাধারণত সাহায্য দেয়া হয়ে থাকে। কোন অঞ্চলের অনগ্রসর কোন জাতি গোষ্ঠীকে অগ্রসর করার জন্যও বৈদেশিক সরকারসমূহ সাহায্য দিয়ে থাকে। বৈদেশিক সরকারি সাহায্যের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ্য হচ্ছে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম দুর্যোগ। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, খরা, মহামারী, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি দুর্যোগ এবং যুদ্ধ, দাঙ্গা ইত্যাদি কৃত্রিম দুর্যোগের সময় বৈদেশিক সাহায্য আসে, এটা মানবিক সাহায্য। শুধু উন্নত দেশসমূহই নয় বরং অনুন্নত দেশসমূহও দুর্যোগের সময় তাদের সাধ্যমত সাহায্যের হাত বাড়ায়। বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে সরকারি সাহায্য। বিশ্বব্যাপী মানুষের আর্থনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে যে পরিমাণ আন্তর্জাতিক সাহায্যের প্রয়োজন তার একটা ব্যাপক অংশ আসে বৈদেশিক সরকারসমূহের সাহায্য থেকে।

বৈদেশিক সাহায্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাহায্য। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সাহায্য সংস্থা গড়ে উঠেছে। এই সংস্থাসমূহ দাতাদের নিকট থেকে অর্থসম্পদ সংগ্রহ করে অনুন্নত ও অনগ্রসর জাতিসমূহের কাছে পৌঁছে দেয়। এরা দাতা ও সাহায্যগ্রহীতাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে বেসরকারী সাহায্য সংস্থাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ এবং প্রদানের কারণ বিভিন্ন। যারা সাহায্য দেন তাদের লক্ষ্য থাকে একধরনের , আবার যারা গ্রহণ করে তাদের লক্ষ্য থাকে এক ধরনের । কখনও কখনও নেতিবাচক কারণেও সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে। আন্তরাষ্ট্রীয় বিরোধ সৃষ্টি, কোন দেশের শিক্ষা সংস্কৃতি ও রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ, বিচ্ছিন্নবাদী ও বিভেদপন্থী শক্তিকে সহায়তা দান ইত্যাদির জন্যও বৈদেশিক সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে। তবে অধিকাংশ সাহায্যই আসে ইতিবাচক কারণে অর্থাৎ উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য। রাষ্ট্রের অবকাঠামো নির্মাণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, জনগণের খাদ্যঘাটতি পূরণ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির জন্য বৈদেশিক সাহায্য দেয়া ও নেয়া হয়ে থাকে। বৈদেশিক বেসরকারি সাহায্য সংস্থাসমূহ

www.pathagar.com

প্রধানত তাদের নিজেদের পরিকল্পনা মতো সমাজ উন্নয়নে সাহায্য দিয়ে থাকে। এরা যে সব দেশে তাদের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে সে সব দেশে নিজেদের দক্ষ কর্মী এবং সেই সব দেশের কর্মীদের সমন্বয়ে কাজ করে থাকে।

বৈদেশিক ঋণের মতো বৈদেশিক সাহায্যও অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে একটি মারাত্মক প্রতিবন্ধক। পশ্চিমের উন্নত দেশসমূহ বৈদেশিক সাহায্যকে পররাষ্ট্রনীতির একটি হাতিয়ার রূপে প্রয়োগ করে। শর্তসাপেক্ষ সাহায্যের মাধ্যমে তার লগ্নীর ক্ষেত্র স্থির করে দেয়। এই কারণে তাদের পক্ষে নিজেদের অগ্রাধিকার অনুযায়ী লগ্নী করা সম্ভব নয়।

তারপর জাতীয় নেতৃত্বের দক্ষতা, সদিচ্ছা থাকলে এবং কূটনীতির মান উন্নত হলে বৈদেশিক সাহায্য ব্যক্তির বিকাশে এবং তার অধিকার রক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করতে পারে। এই জন্য বৈদেশিক ঋণলাভের অধিকার সকল রাষ্ট্রেরই রয়েছে। তাছাড়া সাহায্য বিষয়টিই হচ্ছে মানবিক। প্রচণ্ড দরদ, মানবিকবোধ, সহানুভূতি, সংবেদনশীলতা, মমত্ববোধ না থাকলে সাহায্য প্রদানের বিষয়টি আসে না। তাই সাহায্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন সুদৃঢ় করে। মানবাধিকার বাস্তবায়নের জন্য এই বিষয়টিও জরুরি।

প্রযুক্তি বিনিময়

এই শতাব্দীর শেষার্ধে বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তি এত দ্রুত ও ব্যাপক বিকাশ হয়েছে যে, আমরা অভিভূত, বিস্মিত। আগামী শতাব্দী আমাদের জন্য কি নিয়ে আসছে সেটা আমরা কল্পনাও করতে পারছি না। প্রযুক্তিগত উন্নতি যেখানেই ঘটুক এর সুযোগ ও সুফল ভোগ করছে সমগ্র মানব জাতি। কারণ প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এর সার্বজনীনতা। একজন বা একদলের ভোগদখলে রাখার বিষয় এটা নয়। তাই বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তিগত সহযোগিতার দ্বার এখনও উন্মুক্ত। যারা বিশেষ কোন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করছে তারা হয়তো এর মাধ্যমে মুনাফা লুটছে কিন্তু এটাকে পৌছে দিচ্ছে সকলের হাতে। প্রযুক্তি যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। রেডিও, টেলিভিশন, টেলিপ্রিন্টার, টেলেক্স, ফ্যাক্স, কম্পিউটার ইত্যাদি আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লবের সৃষ্টি করেছে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত যে সমৃদ্ধি আসছে, তা থেকে মানব জাতি যাতে উপকৃত হতে পারে সেটা নিশ্চিত করার জন্য দেশে দেশে প্রযুক্তি বিনময় চুক্তি হচ্ছে এবং সেই চুক্তি অনুযায়ী সহযোগিতাও হচ্ছে।

প্রতিটি ব্যক্তি এক অভিন্ন মানব পরিবারের সন্তান হিসেবে প্রযুক্তিগত উন্নয়নকে কাজে লাগিয়ে নিজের বিকাশকে নিশ্চিত করার অধিকার রাখেন। তাছাড়া মানবাধিকার সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে সচেতন করার জন্যও প্রযুক্তির সহায়তা নেয়া আবশ্যক। আন্তর্জাতিক সহায়তার

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে প্রযুক্তি বিনিময় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা যত বেশি ত্বরান্বিত হবে আন্তর্জাতিক সহায়তা তত বেশি গতিশীল হবে।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদ অনুসারে সমাজের সদস্য হিসেবে সামাজিক নিরাপত্তা লাভ এবং জাতীয় প্রচেষ্টা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে সামাজিক, অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক অধিকার লাভ করবে।

বস্তুত মানুষের যত অধিকার রয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রের সামগ্রিক প্রচেষ্টা নিবেদিত হবে এক্ষেত্রে বিশ্ব সম্প্রদায় রাষ্ট্রকে সহযোগিতা করবে।

সারসংক্ষেপ

রবিনসন ক্রুসোর কোন দায় দায়িত্ব ছিল না কারো প্রতি। ফলে অধিকারও ছিল না কারো উপর। জনহীন দ্বীপে যেহেতু তিনি একা তাই অধিকার ও দায়িত্বের প্রশ্ন তার কাছে অবান্তর।

বাংলাদেশের কোন নির্জন দ্বীপে যদি একজন মানুষ বসতি স্থাপন করে তাহলে সেই মানুষটির দায় ও অধিকার থাকে না। কিন্তু সেই মানুষটি যখন আরো মানুষ নিয়ে যায় দ্বীপে এবং সঙ্গে নিয়ে যায় একটা বিয়ে করা বউ তখন অবস্থা দাঁড়ায় অন্যরকম। নিজের যখন ছেলে মেয়ে হয় এবং অন্যরাও যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে তখন পরিস্থিতি আর দায় ও অধিকারহীন থাকে না। তখন তারা সমাজবদ্ধ হয় এবং একে অন্যের প্রতি অধিকার ও দায়ে আবদ্ধ হয়।

সমাজ থেকে দেশ, দেশ থেকে রাষ্ট্র, রাষ্ট্র থেকে বিশ্ব, এমনি করে বৃত্তের পরিধি বাড়ে। এই বিস্তৃত পরিসরের মধ্যে মানুষের অধিকারের দাবি স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়।

প্রত্যেক মানুষের আছে একটি মর্যাদা। আছে একটি ব্যক্তিত্ব। এই মর্যাদা সংরক্ষণ এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ সকলের কাম্য। এবং এর জন্য প্রয়োজন সামাজিক নিরাপত্তা। সব রাষ্ট্রের অবস্থা সমান নয়। যার যা সাধ্য সেই অনুযায়ী, রাষ্ট্র পূরণ করবে নাগরিকের আর্থিক সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার। নাগরিকের জন্য এগুলি মানবাধিকার।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ : ২৩

১. প্রত্যেক ব্যক্তিরই কাজ করার, নিজের ইচ্ছামত কাজ পছন্দ করার, ন্যায় ও অনুকূল অবস্থায় কাজ করার, এবং বেকার অবস্থা থেকে রক্ষণলাভের অধিকার রয়েছে।

২. প্রত্যেক ব্যক্তির, কোন রকম তারতম্য ছাড়াই, সমান কাজের জন্য সমান মজুরি লাভের অধিকার রয়েছে।

৩. কাজ করে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের ও তার পরিবারবর্গের পক্ষে মানুষের মর্যাদা রক্ষা করে জীবন ধারণের উপযুক্ত ন্যায়সঙ্গত পারিশ্রমিক পাওয়া এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহলে অন্য কোন উপায়ে সামাজিক সহায়তা লাভের অধিকার রয়েছে।

৪. প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার ও তাতে যোগদানের অধিকার রয়েছে।

(Article : 23 1. Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.

2. Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.

3. Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary by other means of social protection.

www.pathagar.com

4. Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interest.)

ভাষ্য

আলোচ্য অনুচ্ছেদে যে সব অধিকারের কথা বলা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে ঃ

১. কাজ করার অধিকার

২. পছন্দমতো কাজ বেছে নেয়ার অধিকার

৩. ন্যায় ও অনুকূল অবস্থায় কাজ করার অধিকার

৪. বেকারত্ব থেকে রক্ষণ লাভের অধিকার

৫. সমান কাজের জন্য সমান বেতন লাভের অধিকার

৬. ন্যায়সঙ্গত পারিশ্রমিক লাভের অধিকার

৭. প্রয়োজনে অন্যান্য সামাজিক সহায়তা লাভের অধিকার

৮. শ্রমিকসংঘ গঠন ও এতে যোগদানের অধিকার।

কাজ করার অধিকার

জন্মের পর থেকে মানবসন্তান কিছুদিন পরনির্ভরশীল থাকে। পিতামাতা, ভাইবোন বা অন্য কোন অভিভাবকের উপার্জনে সে লালিত পালিত হয়। তারপর একটা সময় আসে যখন নিতান্ত ব্যতিক্রমী কিছু লোক ছাড়া প্রায় সকলকে নিজের দায়িত্ব নিতে হয়, নিজের জীবন জীবিকার বোঝা বইতে হয়। এই বোঝা বহন সহজ নয়। শিক্ষা, মেধা, বুদ্ধি, শক্তি ইত্যাদির সমন্বয়ে জীবিকা অর্জনের জন্য মানুষকে কাজ করতে হয়। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক মানুষ কাজ করতে চায় কারণ জীবনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলো মেটানোর জন্য কাজ করা তার অপরিহার্য। কিন্তু কাজ করতে চাইলেই কি কাজ করা যায়? কাজ করার জন্য চাই কর্মক্ষেত্র, নিজের যোগ্যতা ও পছন্দমতো কর্ম, কর্মের আনুসঙ্গিক সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি।

প্রত্যেক ব্যক্তির এই অধিকার রয়েছে যে, সে তার জীবন যাপনের জন্য একটি কাজ পাবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ব্যক্তির অধিকারটি কার কাছে? এই অধিকারের অনুকূলে কে দায়িত্ব পালন করবে? কে ব্যক্তির জন্য কর্মক্ষেত্র তৈরি করবে, ব্যক্তিকে কাজ দেবে? এ প্রশ্নের জবাব সহজ নয়। যদি বলা হয় সমাজের কাছে ব্যক্তির এই কাজ প্রাপ্তির দাবি, তাহলে প্রশ্ন আসবে সমাজ কি এই কর্তব্য পালনে বাধ্য? একটু গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, সমাজ কারো কর্মক্ষেত্র তৈরি বা কাজ দেয়ার জন্য বাধ্য নয়। কোন ব্যক্তি কাজ না পেলে সে তার সমাজের বিরুদ্ধে আইনগত কোন ব্যবস্থা নিতে পারে না। সমাজ বড়জোর এর সদস্যের

www.pathagar.com

জীবিকা অর্জনের উপায় করে দেয়ার জন্য কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি বা তৈরির জোর প্রয়াস চালাতে পারে। আবার যদি বলা হয় রাষ্ট্র ব্যক্তির কর্মক্ষেত্র তৈরি করবে, কাজ দেবে তাহলেও বিপত্তি আছে। কারণ প্রতিটি নাগরিকের কর্ম প্রদানে রাষ্ট্রের বাধ্যতা কার্যকর করতে হলে বলতে হয় যে, রাষ্ট্রের দায়িত্ব এই যে, প্রতিটি নাগরিককে সে চাকুরি দেবে বা কাজ দেবে। রাষ্ট্রও এই চেষ্টা করে যে, তার কোন সদস্য যাতে বেকার বা কর্মহীন না থাকে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি রাষ্ট্রের কার্যাবলীর অন্যতম কিন্তু তারপরও জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান হারের সাথে তাল মিলিয়ে কর্মক্ষেত্র তৈরি কঠিন কাজ, অনেকের মতে একেবারে দুঃসাধ্য কাজ. তারপরও রাষ্ট্রযন্ত্র এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। কারণ কাজ মানুষের দরকার। কাজ না পেলে, উপার্জন না করলে মানব সন্তান খাবে কি, পরবে কিভাবে, বাসা বাঁধবে কি করে? মানুষের জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা। প্রথমোক্ত চারটির অভাব হলে মানুষ বাঁচতেই পারে না। এই অভাব মেটানোর জন্য দরকার অর্থ, অর্থের জন্য দরকার কাজ। অতএব বাঁচার জন্য কাজ চাই।

কাজ না থাকলে বিপদ অনেক। প্রথমত, কর্মহীন মানুষের যদি খাওয়া পরার নিশ্চয়তা থাকে, তাহলে তারা হয় অলস অকর্মণ্য। ফলে অসৎ প্রবৃত্তি ও কুচিন্তা তাদের মাথায় বাসা বাধে। তারা নিজেরা খারাপ কাজে লিপ্ত হয় এবং অন্যদেরকেও খারাপ কাজ করতে প্ররোচিত করে। "অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা" আর শয়তানের কারখানায় যা যা হয় তার সবই এদের দ্বারা সংগঠিত হয়। ফলে সমাজ হয় কলুষিত। দ্বিতীয়ত যাদের কর্ম থাকে না তারা যদি অভাবগ্রস্ত হয় তাহলে দারিদ্র্যের কঠোর নিস্পেষণে তারা এক সময় পাপের পথে পা বাড়ায়। হয়তো বা তারা চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানী, কালোবাজারী ইত্যাদিতে নেমে পড়ে। তখন সমাজ হয় বিপদগ্রস্ত। অতএব সামাজিক নিরাপত্তার জন্যই মানুষের কাজ দরকার।

মানুষ সমাজবদ্ধ হয়েছে এবং রাষ্ট্র নামক এই রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলেছে তাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য। কাজ পাওয়াটা মানুষের অপরিহার্য প্রয়োজন। এখানে কাজ বলতে আমরা অর্থনৈতিক কাজকে বুঝি। যে কাজ করলে, কাজের বিনিময়ে অর্থ বা অর্থকরি কিছু পাওয়া যায় তাই অর্থনৈতিক কাজ। সন্তান লালন পালন, সন্তানের প্রতি স্নেহ মমতা, প্রিয়জন বা আপনজনকে সেবা যত্ন করা অর্থনৈতিক কাজ নয়। আবার শুধুমাত্র সরকারি চাকুরিই কাজ নয়,এছাড়াও অনেক অর্থনৈতিক কাজ রয়েছে। যে সকল কাজ আইন ও নৈতিকতার দৃষ্টিতে অপরাধমূলক নয় অথচ এর মাধ্যমে অর্থপ্রাপ্তি ঘটে তাকে অর্থনৈতিক কাজ বলে বিবেচিত। ফলে কারখানায় শ্রম প্রদান, ব্যবসা বাণিজ্য, প্রশাসন ও বিচার কার্য পরিচালনা, শিক্ষাদান বা অন্যান্য সেবামূলক কাজ অর্থনৈতিক কার্যের অন্তর্ভূক্ত। আর্থিকভাবে সমর্থ ব্যক্তি এবং রাষ্ট্র অর্থনৈতিক কাজের ক্ষেত্র তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারেন। ব্যক্তি নিজেও উৎপাদনশীল কোন কাজ উদ্ভাবন করে নিজের কর্মক্ষেত্র তৈরি করে নিতে পারেন।

www.pathagar.com

কর্মক্ষেত্র তৈরির মুখ্য দায়িত্ব রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার তার পরিকল্পনার মধ্যে কর্মসংস্থানের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেবেন। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাঠামোতে নাগরিকদের কর্মসংস্থানের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে সরকারের উপর ন্যস্ত। সমাজতান্ত্রিক দেশের অর্থনীতি যেহেতু সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত এবং উৎপাদনের উপায় উপকরণের মালিক যেহেতু রাষ্ট্র, সেহেতু সেখানে প্রতিটি নাগরিকের কর্মের নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা প্রদান রাষ্ট্রের কাজ। এই দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রদর্শনের কোন সুযোগ রাষ্ট্রের নেই। অবশ্য বর্তমানে এই বিধান খানিকটা শিথিল হয়েছে।

মুক্ত বাজার অর্থনীতি অনুসৃত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে সরকারের এই বাধ্যবাধকতা নেই। তথাপি আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্রের মৌলিক কাজ হচ্ছে নাগরিকদের কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করা। তাই বর্তমানে সকল রাষ্ট্রেই সরকারের বাজেটের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে থাকে কর্মসংস্থানের বিষয়টি। রাষ্ট্রের প্রকৃতি যাই হোক। রাষ্ট্রকেই নাগরিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। এ জন্য রাষ্ট্র বহুমুখী ও ব্যাপক ভিত্তিক পরিকল্পনা নিবে, শিল্প স্থাপন করবে, পুরাতন কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারণ করবে, নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি করবে।

রাষ্ট্র ছাড়াও কর্মক্ষেত্র তৈরিতে অনেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। কোন বৃহৎ প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিবর্গ বা ব্যক্তি কর্মক্ষেত্র তৈরির জন্য শিল্প স্থাপন করতে পারে। এ জন্যও সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হয়, কেননা মূলধনের নিরাপত্তা, পণ্যমূল্যের স্থিতিশীলতা, বাজার সম্প্রসারণ, বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরি এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার মাধ্যমে সরকারই বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে পারেন। বস্তুত কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি এক কঠিন কাজ। এই কঠিন কাজটি সম্পাদনের জন্য দরকার সর্বস্তরের মানুষের সম্মিলিত প্রয়াস। কর্মক্ষেত্র যত বৃদ্ধি পাবে, মানুষের কাজ পাবার নিশ্চয়তা তত বাড়বে। মানুষের কাজ করার অধিকারের মধ্যে রয়েছে কাজ পাবার অধিকার এবং কাজে টিকে থাকার অধিকার।

পছন্দমত কাজ বেছে নেয়ার অধিকার

মানব জীবন বৈচিত্র্যময়। এই বৈচিত্র্যময় পৃথিবীতে হাজার রকমের কাজ আছে। যতই দিন যাচ্ছে ততই নতুন নতুন অভিনব ধরনের কাজের উদ্ভব হচ্ছে। কাজের মধ্যে অভিনবত্ব আসছে বৈচিত্র্য আসছে। বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি অনেক কঠিন কাজকে সহজ এবং যন্ত্রনির্ভর করে দিয়েছে।

কাজের মধ্যে যেমন বৈচিত্র্য আছে তেমনি বৈচিত্র্য আছে মানুষের রুচি ও মেজাজের মধ্যে। একজন যা পছন্দ করে অন্যজন তা করে না আবার একজন যা পছন্দ করে না, অন্যজন তা করে । এমনি ভাবে মানুষের রুচি ও পছন্দ জনে জনে আলাদা। যেমন কোন

www.pathagar.com

ব্যক্তি হয়তো জাহাজে মাল বোঝাই বা খালাস করা পছন্দ করে আবার অন্যজন হয় তো ডকে কাজ করতে ভীষণ ভয় পায়, সে কাজ করতে চায় রেল স্টেশনে। এমনিভাবে কেউ হয়তো কয়লা খনিতে কাজ করতে চায়, আবার অন্যজন মোটেই তা পছন্দ করে না। কাজের ব্যাপারে কেউ হয়তো অধিক মজুরিকে প্রাধান্য দেয় আবার অনেকে মজুরির তুলনায় সম্মান মর্যাদাকে গুরুত্ব দেয় বেশি। কেউ কেউ ভবিষ্যত নিরাপত্তার দিকটি বিবেচনায় রাখে বেশি, কেউ আবার বর্তমানকেই প্রাধান্য দেয়, ভবিষ্যতকে সে মোটেই পরোয়া করে না। এমনিভাবে চাকরি বা অন্য কোন কর্মের ব্যাপারে মানুষের সকলের চেতনা চাহিদা রুচি, পছন্দ এক হতে পারে না। কাজ পছন্দের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে সেই ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল যিনি কাজ করবেন। যিনি কাজ করবেন তার যদি কাজ পছন্দ না হয় তাহলে কাজে তিনি আন্তরিক হতে পারবেন না। তাই কাজের ব্যাপারে কর্মীর পছন্দের বিষয়টিই মূখ্য।

কাজের পছন্দের সাথে আরেকটি বিষয়ের সমন্বয় দরকার। সেটি হচ্ছে পছন্দমত যোগ্যতা। যার যে কাজ পছন্দ সে অনুযায়ী তার যোগ্যতা থাকা চাই। উপযুক্ত যোগ্যতা থাকলেই যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যথাযথ উপায়ে তিনি সে কাজ প্রাপ্তির অধিকার রাখেন। কাজের জন্য দরকারি যোগ্যতা থাকলে কেউ কাজের দাবি করতে পারে না।

প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই অধিকার রয়েছে যে, সে তার কাজ নিজে পছন্দ করবে। পছন্দের বিরুদ্ধে কাউকে কোন কাজ করতে বাধ্য করা যাবে না। অবশ্য সশ্রম কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য নয়। কেননা সশ্রম কারাদণ্ড প্রাপ্ত আসামীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কাজ করানো হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতিটি মানুষেরই নিজের কাজ পছন্দ করে নেয়ার অধিকার রয়েছে।

ন্যায় ও অনুকূল পরিবেশে কাজ করার অধিকার

কাজ করার পরিবেশ অনেক ব্যাপক বিস্তৃত বিষয়। মানুষ যেখানে কাজ করবে সেখানকার সামগ্রিক অবস্থা ও ব্যবস্থাই হচ্ছে এর পরিবেশ। এই পরিবেশ ন্যায় এবং কাজ করার অনুকূল হওয়া চাই। কাজের ন্যায় ও অনুকূল পরিবেশ বলতে নিম্নোক্ত অবস্থাকে বুঝায় :

(ক) সময়সীমা ঃ প্রত্যেকের এই অধিকার রয়েছে যে, তিনি ন্যায় সঙ্গত সময়সীমা পর্যন্ত কাজ করবেন। প্রচলিত শ্রম আইনে একজন শ্রমিকের বা কর্মীর নিকট থেকে যে পরিমাণ শ্রম বা কাজ আদায়ের বিধান রয়েছে তা থেকে বেশি সময় শ্রম আদায় করলে আর কাজের অনুকূল পরিবেশ থাকে না। ন্যায়সঙ্গত সময়সীমা পর্যন্ত কাজ করার অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

(খ) দালান ও যন্ত্রপাতির নিরাপত্তা ঃ প্রত্যেক ব্যক্তির এই অধিকার রয়েছে যে, তিনি যে ভবনে এবং যে সকল যন্ত্রপাতি দ্বারা কাজ করবেন সেগুলোর নিরাপত্তা থাকবে। ভবন ধ্বসে পড়ার, যন্ত্রপাতি বিস্ফোরিত হওয়ার আতঙ্ক যদি সর্বক্ষণ তাড়া করে বেড়ায় তাহলে কাজে মনোনিবেশ করা যায় না। কাজের অনুকূল পরিবেশের জন্য কর্মক্ষেত্রের ভবন ও যন্ত্রপাতির নিরাপত্তার দরকার।

www.pathagar.com

(গ) ন্যায়সঙ্গত ছুটি ঃ কাজের সময়ে নৈমিত্তিক ছুটি, যুক্তিসঙ্গত অসুস্থতার ছুটি উৎসব ছুটি ইত্যাদি যথাযথ বিধি মোতাবেক প্রাপ্তির অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তিরই রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কতদিন কাজ করা হয়েছে এর ভিত্তিতেই ছুটি নির্ধারিত হবে। ছুটি না পেলে কাজে উৎসাহ থাকে না। তাই কাজের ফাঁকে ফাঁকে ছুটি পাওয়া অনুকূল পরিবেশের অংশ।

(ঘ) ভবিষ্যতের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা : যে কোন কাজ ভালভাবে সম্পন্ন করার জন্য এবং কাজে গভীরভাবে মনোনিবেশ করার জন্য যে বিষয়টি খুব জরুরি সেটা হচ্ছে ভবিষ্যতের নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তার প্রশ্ন। বর্তমান যতই উজ্জ্বল হোক, ভবিষ্যতই যদি অনিশ্চিত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় তাহলে এই বর্তমান মানুষকে খুব আশ্বস্ত করে না। তাই যে কোন কাজে ভবিষ্যত নিরাপত্তার প্রশ্নটি ন্যায় ও অনুকূল পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। ভবিষ্যতের নিরাপত্তা না থাকলে বাস্তবিক ক্ষেত্রে কাজের অনুকূল পরিবেশ থাকে না।

(ঙ) চাকুরির স্থায়িত্ব ঃ কাজ করার সাথে কাজের স্থায়িত্বের প্রশ্নটি জড়িত। যে কাজের স্থায়িত্ব আছে, সে কাজ অনেক বেশি নিরাপদ। কাজের স্থায়িত্ব থাকলে কাজে অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা কম থাকে। নিশ্চিতভাবে কাজ করা যায়। তাই ন্যায় ও অনুকূল পরিবেশের পূর্বশর্ত হচ্ছে কাজের স্থায়িত্ব।

(চ) স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ঃ যে পরিবেশে স্বাস্থ্যহানির মারাত্মক আশঙ্কা থাকে সেখানে কাজ করার অনুকূল পরিবেশ থাকে না। স্বাস্থ্যকর পরিবেশ কাজের অনুকূল পরিবেশের পূর্বশর্ত। তাই কাজের পরিবেশ স্বাস্থ্যকর হওয়া আবশ্যক।

বস্তুত প্রত্যেক ব্যক্তির যেমন কাজ পাওয়ার অধিকার আছে তেমনি অনুকূল এবং ন্যায়সঙ্গত পরিবেশে কাজ করার অধিকার আছে। কাজ করার পরিবেশ ন্যায়সঙ্গত হওয়া এবং মানুষের পক্ষে কাজ করার মতো অনুকূল হওয়া আবশ্যক। তাই কাজের ন্যায্য ও অনুকূল পরিবেশ লাভ করার অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

বেকারত্ব থেকে রক্ষণ লাভের অধিকার

বেকারত্ব মানবজীবনের জন্য এক মারাত্মক অভিশাপ। বেকারত্ব দুভাবে হতে পারে। এক. কোন কর্ম না পাওয়া। দুই. কোন কারণে কর্মচ্যুতি। প্রথমোক্ত অবস্থা থেকে শেষোক্ত অবস্থা ভয়াবহ। এই ভয়াবহ অবস্থা মানুষের মধ্যে হতাশা জীবন সম্পর্কে বিতৃষ্ণা জাগিয়ে তোলে। মানুষের আত্ম নির্ভরশীল মনোভাব ক্রমশই নেতিয়ে পড়ে। তাই ব্যক্তি জীবনের জন্য বেকারত্ব অত্যন্ত মারাত্মক বিপদ।

সমাজ জীবনেও বেকারত্ব মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। যে সমাজের বেকারত্বের হার বেশি, সেই সমাজে অস্থিরতা অরাজকতা লেগেই থাকে। সামাজিক অগ্রগতি ও উন্নতির পথে তা মারাত্মক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। একটি সমাজকে বিকশিত করার জন্য, উন্নতির শীর্ষবিন্দুতে

www.pathagar.com

পৌঁছানোর জন্য দরকার সেই সমাজের কর্মক্ষম লোকদের বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি দেয়া।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বেকারত্ব এক মারাত্মক পশ্চাৎপদতার চক্র সৃষ্টি করে থাকে। যেখানে বেকার বেশি সেখানে স্বল্পসংখ্যক কর্মজীবী মানুষের আয়ের উপর নির্ভরশীল থাকে বিপুল পরিমাণ বেকার লোক। ফলে কর্মজীবীদের সঞ্চয় থাকে না। সঞ্চয় না হওয়ার কারণে মূলধন সৃষ্টি, নতুন বিনিয়োগ, নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি কিছুই সম্ভব হয় না। এতে করে বেকারের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তেই থাকে। ব্যাপক মহাপরিকল্পনা নিয়ে বেকারদের কর্মসংস্থান না করলে এই সংখ্যা শুধু বাড়তেই থাকবে। কারণ বেকারত্ব সঞ্চয়ের পথে মূল প্রতিবন্ধক। আর সঞ্চয় না হলে নতুন কর্মের সুযোগ সৃষ্টি সম্ভব নয়। তাই বেকারত্বকে রোধ করতেই হবে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বেকারত্ব হচ্ছে একটি মোক্ষম অস্ত্র। বেকারত্ব নামক এই অস্ত্রটি ব্যবহার করে ক্ষমতা দখল ও ক্ষমতা ত্যাগের মহড়া চলে। যে রাষ্ট্রে বেকারের সংখ্যা বেশি সেখানে স্থিতিশীল রাজনীতি চর্চা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কারণ বিপুল পরিমাণ বেকার কাজের দাবিতে আন্দোলন করে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে। তদুপরি সামাজিক শৃঙ্খলা বিরোধী বিভিন্ন কাজের জন্য বেকারত্ব খানিকটা দায়ী। এই অবস্থায় সুস্থ, স্থিতিশীল ও গঠনমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু করতে হলে বেকারত্ব নিরসন করতে হবে।

বেকারত্বের মতো এই প্রতিকূল নাজুক এবং অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা থেকে নিজেকে রক্ষা করার অধিকার প্রতিটি ব্যক্তির রয়েছে। বেকার না থাকা অর্থাৎ কাজ পাওয়া এবং একবার কাজ পেলে সেই কাজ থেকে বেআইনিভাবে অপসারিত না হওয়ার অধিকার সকলেরই আছে। মানুষ হিসেবে মানুষের মতো বেঁচে থাকার জন্য, জীবনের ন্যূনতম মৌলিক দাবি পূরণের জন্য বেকারত্ব থেকে আত্মরক্ষা করতেই হবে। বেকারত্ব থেকে নিজেকে রক্ষণের দায়িত্ব ও অধিকার প্রতিটি মানুষের।

সমান কাজে সমান বেতন পাওয়ার অধিকার

বেতন হচ্ছে ব্যক্তির শ্রমের মূল্য আমরা যাকে বলি পারিশ্রমিক। উৎপাদন কাজে বা অন্যকোন কাজে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি শারীরিক বা মানসিক শ্রমের বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক লাভ করেন, তাকেই বলে বেতন। বেতন দুরকমের হতে পারে। যেমন ঃ সময় ভিত্তিক বেতন ও কর্মভিত্তিক বেতন। একদিন, এক সপ্তাহ, এক মাস বা এক বৎসরের জন্য কোন ব্যক্তি যে বেতন পান তাকে বলে সময় ভিত্তিকে বেতন। আবার নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ করার জন্য কোন ব্যক্তি যে বেতন পান তাকে কর্মভিত্তিক বেতন বলে।

বেতন কিভাবে নির্ধারিত হয়?

বেতন কিভাবে নির্ধারিত হয় এই প্রশ্নে অর্থনীতিবিদগণের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। কেউ বলেছেন, যিনি শ্রম দেবেন তার জীবন ধারণের জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে বেতন

www.pathagar.com

হবে সেই পরিমাণ অর্থ। আবার কেউ বলছেন, একটি নির্দিষ্ট জীবনযাত্রার মান নির্বাহ করতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয় বেতনের হার তার সমান হবে। অন্য এক শ্রেনীর অর্থনীতিবিদের মতে, সমাজের মোট মূলধনের একটি অংশ শ্রমিকের বেতনের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়। একে বলে মজুরিভাণ্ডার। শ্রমিকের পরিমাণ ও মজুরি ভাণ্ডারের পরিমাণের উপরই বেতন নির্ভর করে। অনেকের মতে, শ্রমিকের বেতন তার প্রান্তির উৎপাদনশীলতার উপর নির্ভর করে। অবশ্য এই সব তত্ত্বই বিভিন্নভাবে সমালোচিত হয়েছে। আধুনিক অর্থনীতিবিদের মতে শ্রমিকের চাহিদা ও যোগানের উপর বেতন নির্ভর করে। চাহিদার তুলনায় শ্রমিকের যোগান কম হলে বেতন বেশি হবে আবার যোগান বেশি হলে বেতন কম হবে। যোগান ও চাহিদার সংঘাতেই বেতন নির্ধারিত হয়।

বিভিন্ন পেশায় বেতনের হারের পার্থক্য

বেতন যে ভাবেই নির্ধারিত হোক না কেন, কাজের বেতন থাকবেই। যে কাজের বেতন নেই সে কাজের কোন আর্থিক মূল্য নেই। বিভিন্ন কাজ ও বিভিন্ন পেশায় বেতনের মধ্যে তারতম্য আছে। এই তারতম্য অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত নয়। কারণ কাজের প্রকৃতি, কাজের স্থায়িত্ব, কাজের ঝুঁকি, কাজ শিক্ষার খরচ, কাজের গতিশীলতা, দক্ষতার পার্থক্য এবং আনুসঙ্গিক সুযোগ সুবিধা এসবের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যের কারণে বেতনেও পার্থক্য হয়, হওয়া স্বাভাবিক। যেমন : অপ্রীতিকর কষ্টদায়ক ও লোকে অপছন্দ করে এমন কাজে স্বাভাবিকভাবেই সহজ, আনন্দদায়ক কাজের তুলনায় বেতন বেশি হয়। যে কাজ দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়, সে কাজের তুলনায় অস্থায়ী কাজে বেতন অপেক্ষাকৃত বেশি হয়। যে সব কাজ ঝুঁকিপূর্ণ, যে কাজের দায়িত্ব বেশি, সে কাজের বেতনও বেশি। যে কাজ শিখতে বেশি খরচ হয়, বেশি সময় ও শ্রম লাগে সে কাজের বেতন বেশি হয়। যে সব কাজের চাহিদার তুলনায় শ্রমিকের যোগান বেশি হয়, সে সব কাজের বেতন কম হয়। যে সব পেশায় শ্রমিকরা অপেক্ষাকৃত সুসংগঠিত সেসব পেশার বেতন বেশি হয়ে থাকে। যে সকল কাজে বা পেশায় আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধা বেশি অর্থাৎ কমমূল্যে বা বিনামূল্যে বাসস্থান, শিক্ষা চিকিৎসা যাতায়াত সুবিধা থাকে সে সব কাজের বেতন অপেক্ষাকৃত কম হয়। মজুরি বা বেতনের হারের তারতম্য অন্যায্য কিছু নয়, কারণ বিভিন্ন কাজের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, পার্থক্য রয়েছে কাজের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। তাই বিভিন্ন কাজের বেতনও বিভিন্ন হয়।

বিভিন্ন পেশায় এবং বিভিন্ন কাজে মজুরি হারে পার্থক্য বা তারতম্য হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু একই পেশা একই শ্রম একই কাজ অথচ বেতনে পার্থক্য—এটা স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত নয়। তাই সমান কাজের জন্য সমান বেতন হওয়া আবশ্যক। অভিন্ন কাজের জন্য অভিন্ন বেতন না দেয়া নৈতিকতা ও আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ। মানুষ হিসেবে সকলেই যেহেতু সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিয়ে জন্মেছে সেহেতু একই কাজের জন্য একই শ্রমের জন্য অন্য কোন অজুহাতে

www.pathagar.com

তাদের বেতনের তারতম্য করা উচিত নয়। প্রতিটি মানুষের এই অধিকার রয়েছে যে, কোন ক্ষেত্রে কোন রকম বৈষম্য ব্যতিরেকেই সমান কাজের জন্য সমান বেতন লাভ করবে।

আলোচ্য অনুচ্ছেদে যে বিষয়টির কথা বলা হয়েছে এবং অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা হয়েছে, তা হচ্ছে, কর্ম সমান হলে বেতন সমান হতেই হবে। এ ক্ষেত্রে বৈষম্যহীনতার অধিকার প্রতিটি মানুষেরই রয়েছে। কোন অজুহাতে একই কাজের জন্য, সমান কাজের জন্য বিভিন্ন পরিমাণের মজুরীর প্রথা মানবাধিকারের পরিপন্থী।

শ্রমিকসংঘ গঠন ও এতে যোগদানের অধিকার

আলোচ্য অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রত্যেকেরই নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য শ্রমিক সংঘ গঠন করার এবং এতে যোগদানের অধিকার রয়েছে। এই কথাটি হৃদয়ঙ্গম করতে হলে আমাদেরকে শ্রমিক সংঘ কাকে বলে? এর কাজ কি তা বুঝতে হবে।

শ্রমিক সংঘ

শ্রমিকগণ নিজেদের স্বার্থরক্ষার্থে যে স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গঠন করে, তাকে শ্রমিক সংঘ বলা হয়। বাস্তবক্ষেত্রে শ্রমিকের পরিমাণ সংখ্যায় বেশি হলেও তারা অতি দরিদ্র ও দুর্বল। পক্ষান্তরে মালিকগণ সংখ্যায় কম হলেও তারা যথেষ্ট বিত্তশালী ও শক্তিমান। তাই শ্রমিকেরা একক প্রচেষ্টায় মালিকদের নিকট থেকে ন্যায্য মজুরি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা আদায় করতে পারে না। বরং মালিকরা শ্রমিকদের দরিদ্রতা ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের উপর অন্যায় শোষণ ও নির্যাতন চালায়। এবং তাদেরকে ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত রাখে। তাই শ্রমিকগণ মালিকদের শোষণ থেকে বাঁচার জন্য নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য দলবদ্ধ হয়ে শ্রমিকসংঘে গঠন করে। অর্থনীতিবিদ সিডনী এবং ওয়েবের (Sydney and Webb) মতে, শ্রমিক সংঘ হলো চাকরির বর্তমান অবস্থা বজায় রাখা অথবা বর্তমান অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য শ্রমজীবীদের একটি স্থায়ী সংগঠন। বস্তুত শ্রমিকরা সম্মিলিতভাবে নিজেদের অবস্থার উন্নয়ন ও স্বার্থ রক্ষার্থে যে সংগঠন গড়ে তোলে, তাকেই আমরা শ্রমিক সংগঠন বা ট্রেড ইউনিয়ন বলে থাকি। বর্তমান ট্রেড ইউনিয়ন ছাড়া শ্রমিকের কথা কল্পনাও করা যায় না।

ন্যায্য ও অনুকূল পারিশ্রমিকের অধিকার

এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক কর্মীর তার নিজের ও পরিবারের মানবিক মর্যাদা রক্ষার নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম, এমন ন্যায্য ও অনুকূল পারিশ্রমিক এবং প্রয়োজনবোধে সেই সঙ্গে সামাজিক সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থাদি সংযোজিত লাভের অধিকার রয়েছে।

পরিবার সম্পর্কে অনুচ্ছেদ ১৬-তে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে নিজের ও পরিবারের বলতে আমরা বুঝবো স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা ও পিতা-মাতা নিয়ে যে সংসার সে

www.pathagar.com

সংসারের সকলের। এখন সকলের মানবিক মর্যাদার প্রসঙ্গে আসি। মানবিক মর্যাদা বলতে কি বুঝায়? মানবিক মর্যাদা হচ্ছে, শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষের যে মর্যাদা সেটা। যেমন ডাস্টবিনে খাদ্য নিয়ে কুকুর যেভাবে কাড়াকড়ি করে মানুষ সেভাবে করে না কারণ এটা মানুষের কাজ নয়। যদি মানুষে মানুষে অথবা মানুষে পশুতে খাদ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি করা হয় তাহলে মানুষের মানবিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়। মানুষের খাবারের নিশ্চয়তা না থাকলে মানুষ এমন কাজ করতে পারে যা মানবিক মর্যাদার পরিপন্থী। মানুষ কাপড় পরে, অন্য কোন প্রাণীর কাপড় পরার দরকার হয় না। মানুষের যদি কাপড়ের ব্যবস্থা না থাকে, লজ্জা নিবারণের উপায় না থাকে তাহলে তার মানবিক মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়। জৈবিক চাহিদা সকল প্রাণীর আছে। তাই সকল প্রাণীই জৈবিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য পরস্পরের কাছে আসে আবার ছিটকে পড়ে, যার যার পথে। কিন্তু মানুষই একমাত্র প্রাণী যারা পরস্পরের কাছে আসলে একে অপরকে অনুভব করে এবং ঘর বাঁধে, স্থায়ীভাবে বাস করে। স্থায়ীভাবে ঘর বাঁধে, সংসার করে একমাত্র মানুষই। মানুষ যদি স্থায়ীভাবে ঘর বাঁধতে না পারে, তাহলে তার মানবিক মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়। বস্তুত মানুষের মানবিক মর্যাদা বলতে আমরা বুঝি তার অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদির নিশ্চয়তা। খাওয়া, পরা এবং বসবাসের ব্যবস্থা না থাকলে মানবিক মর্যাদা থাকে না।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা অনুসারে প্রত্যেক কর্মীর এই পরিমাণ পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকার আছে যাতে করে, সে তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে কমপক্ষে খেয়ে পরে বাস করতে পারে। ন্যূনতম মানুষের মত বেঁচে থাকতে না পারলে কাজ করে লাভ কি, কেনই বা মানুষ কাজ করবে, যদি সে বেঁচে থাকতেই না পারে। এক্ষেত্রে মানুষের দাবি অধিক কিছু নয় বরং দাবি হচ্ছে তার ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রদান করা এবং এটা সকল মানুষেরই ন্যায্য অধিকার।

শুধু ন্যায্য এবং অনুকূল পারিশ্রমিকই নয় বরং প্রয়োজন হলে আনুষঙ্গিক সুবিধাদি লাভের অধিকারও মানুষের রয়েছে। মানুষের জীবনে দুর্যোগ আসতে পারে। তাই বিপদে আপদে সামাজিক সংরক্ষণ লাভের প্রত্যাশা মানুষের স্বাভাবিক। তাই যে যেখানে কাজ করে বিপদের সময় সেখানে থেকে সার্বিক সাহায্য সহযোগিতা লাভের অধিকার তার রয়েছে।

১৯৩৬ সালের মজুরি পরিশোধ আইনে মজুরি সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

মজুরি (Wages) বলতে, অর্থে প্রকাশযোগ্য যে কোন পারিতোষিক যা চাকুরির শর্ত ব্যক্ত বা আরোপিত যাই হোক না কেন, পূরণ সাপেক্ষে কোন ব্যক্তিকে প্রদেয় বা যা কাজে নিযুক্ত ব্যক্তির নিয়মিত উপস্থিতি, ভাল কাজ বা আচরণ বা ভাল ব্যবহারের শর্তসাপেক্ষে নিযুক্ত ব্যক্তিকে তার নিযুক্তির কারণে বা কৃত কাজের জন্য পরিশোধযোগ্য তাকে বুঝায় এবং যে কোন বোনাস বা উপরিবর্ণিত ধরনের পরিশোধযোগ্য অন্যান্য অতিরিক্ত পারিতোষিক বা এরূপ ব্যক্তির চাকুরির অবসারে দরুন যে অর্থ প্রদেয় হয় তাও এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু নিম্নলিখিত বিষয়গুলি এর অন্তর্ভুক্ত হবে না—

www.pathagar.com

(ক) আবাসিক সুবিধা, সরবরাহকৃত আলো, পানি বা চিকিৎসা সুবিধা বা সরকারের সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশে বাদ দেওয়া হয়েছে এমন অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বাবদ মূল্য,

(খ) কোন পেনশন ফাণ্ড বা প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে মালিক কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা,

(গ) যে কোন যাতায়াত ভাতা বা যাতায়াত বাবদ প্রদত্ত সুবিধার মূল্য ,

(ঘ) চাকুরির ধরনের কারণে নিযুক্ত ব্যক্তির বিশেষ ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রদত্ত অর্থ ; অথবা

(ঙ) ডিসচার্জ এর কারণে প্রদেয় গ্র্যাচুইটি।

শ্রমিকসংঘের কাজ

শ্রমিকের স্বার্থরক্ষা এবং শ্রমিকদের মানোন্নয়নের জন্য শ্রমিকসংঘ অনেক কাজ করে থাকে। নিম্নে শ্রমিকসংঘের কাজের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো ঃ

১. যুক্তভাবে দরকষাকষি করা ঃ শ্রমিকসংঘের প্রধান কাজ হচ্ছে সম্মিলিতভাবে দরকষাকষির মাধ্যমে মালিকদের নিকট থেকে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবিসমূহ আদায় করা। ব্যক্তিগতভাবে কোন শ্রমিকের পক্ষে মালিকের নিকট থেকে ন্যায্য দাবিসমূহ আদায় করা সম্ভব নয়। তাই শ্রমিকসংঘের মাধ্যমে শ্রমিকরা সম্মিলিতভাবে মালিকদের উপর চাপ প্রয়োগ করতে ও দাবি আদায় করতে পারে।

২. চাকুরির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ঃ চাকুরির নিরাপত্তা বিধান করা শ্রমিকসংঘের অন্যতম দায়িত্ব। মালিক অনেক সময় তার ব্যক্তিগত সুবিধা, অসুবিধা ও স্বার্থের জন্য শ্রমিকদের ছাঁটাই করতে পারে। এ অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের পক্ষে অসহায়ভাবে বেকারত্বকে বরণ করা ছাড়া কিছুই করার থাকে না। শ্রমিকসংঘ মালিকদের এইরূপ অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করে এবং শ্রমিকরা যাতে অন্যায়ভাবে চাকুরিচ্যুত না হয় সে বিষয়ে নিশ্চয়তা বিধানের চেষ্টা করে। শ্রমিকসংঘ ছাড়া শ্রমিকদের অসহায় অবস্থায় কেউ এগিয়ে আসে না। তাই চাকুরির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা শ্রমিক সংঘের অন্যতম কাজ।

৩. উপযুক্ত মজুরি আদায় করা : শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা যেমনই হোক মালিকরা সব সময়ই শ্রমিকদের কম মজুরি দিতে চায়। মালিক সাধারণত স্বেচ্ছায় মজুরি বাড়ায় না। তাই শ্রমিকগণ তাদের ইউনিয়নের মাধ্যমে উপযুক্ত মজুরি দাবি করে। শ্রমিক সংঘের যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে শ্রমিকরা মালিকদের নিকট থেকে ন্যায্য মজুরি আদায় করতে পারে।

৪. শ্রমিক শোষণ ও নির্যাতন রোধ ঃ শ্রমিক সংঘের অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে মালিক পক্ষের শোষণ ও নির্যাতনের হাত থেকে মালিক পক্ষের শোষণ ও নির্যাতনের হাত থেকে শ্রমিকদের রক্ষা করা। মালিক পক্ষ শ্রমিকদের তুলনায় শক্তিশালী বলে তারা সর্বদাই শ্রমিকদের নির্যাতন ও শোষণ করে অধিক মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করে। মালিকগণ যাতে শ্রমিকদের প্রতি অন্যায়ভাবে শোষণ, নির্যাতন ও জুলুম চালাতে না পারে সে ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে শ্রমিক সংঘ।

www.pathagar.com

৫. কাজের সময়সীমা হ্রাস ঃ মালিকের প্রবণতা হচ্ছে শ্রমিককে কম পারিশ্রমিক দিয়ে অধিক সময় খাটানো। অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে শ্রমিকের স্বাস্থ্যহানি ঘটে। তাই কাজের ন্যায়সঙ্গত সময়সীমা বেধে দেয়ার জন্য শ্রমিক সংঘ কার্যকর ভূমিকা রাখে।

৬. কাজের শর্তাবলী উন্নয়ন ঃ শ্রমিকগণ যাতে উন্নত ও সম্মানজনক শর্তাবলীতে কাজ করতে পারে সে জন্য শ্রমিকসংঘ চেষ্টা করে শ্রমিকদের কাজের শর্তাবলী সহজতর ও উন্নত করতে। কর্মস্থলের পরিবেশ উন্নয়ন, বোনাস, পেনসন, বীমা, চিকিৎসা, শিক্ষা, বিনোদন ইত্যাদির মাধ্যমে কাজের শর্তাবলী উন্নত করতে শ্রমিকসংঘের ভূমিকা অনেক।

এছাড়াও শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলা, শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা, শ্রমিক কল্যাণ কর্মসূচী চালু করা, উৎপাদন বৃদ্ধি করা ইত্যাদির মাধ্যমে শ্রমিক সংঘ শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদ বলছে, প্রতিটি মানুষেরই শ্রমিকসংঘ গঠন করার এবং শ্রমিক সংঘে যোগদান করার অধিকার রয়েছে। ব্যক্তির কর্মক্ষেত্রে স্বার্থরক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে শ্রমিকসংঘ। তাই শ্রমিক সংঘ নিজে গড়ে তোলা যায় অথবা অন্য কারো গড়ে তোলা শ্রমিক সংঘে যোগদান করা যায়। কাউকে শ্রমিকসংঘ গঠন করা বা শ্রমিক সংঘে যোগদান করা থেকে বিরত রাখা মানবাধিকারের সনদের পরিপন্থী।

বাংলাদেশের আইনে ট্রেড ইউনিয়ন

১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে বিধান রয়েছে। নিম্নে তা পরিবেশিত হলো :

ধারা ঃ ৩. ট্রেড ইউনিয়নসমূহ ও সমিতি করার স্বাধীনতা ঃ

এই অর্ডিন্যান্সে (অধ্যাদেশ) বর্ণিত বিধানাবলী সাপেক্ষে

(ক) ভেদাভেদ নির্বিশেষে, শ্রমিকগণের সমিতিসমূহ প্রতিষ্ঠার এবং কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট সংগঠনের নিয়মাবলী সাপেক্ষে পূর্ব অনুমতি ব্যতীত, তাহাদের পছন্দমত সমিতিতে যোগদানের অধিকার থাকিবে ;

(খ) ভেদাভেদ নির্বিশেষে, মালিকগণের সমিতিসমূহ প্রতিষ্ঠার এবং কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট সংগঠনের নিয়মাবলীর সাপেক্ষে পূর্ব অনুমতি ব্যতীত তাহাদের পছন্দমত সমিতিতে যোগদানের অধিকার থাকিবে ;

(গ) ট্রেড ইউনিয়নসমূহ ও মালিকগণের সমিতিসমূহের নিজ নিজ গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলী প্রণয়নের, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে প্রতিনিধি নির্বাচনের, প্রশাসন ও কাজকর্ম সংগঠিত এবং কর্মসূচি প্রস্তুত করার অধিকার থাকিবে ;

(ঘ) ফেডারেশনের ও কনফেডারেশনসমূহ প্রতিষ্ঠার ও উহাতে যোগদানের অধিকার শ্রমিক ও মালিকগণের সংগঠনসমূহের থাকিবে এবং আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং শ্রমিক ও

www.pathagar.com

মালিকগণের সংগঠনগুলির কনফেডারেশনসমূহের সদস্য হওয়ার অধিকার এরূপ কোন সংগঠন, ফেডারেশন অথবা কনফেডারেশনের থাকিবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে,

(১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।

(২) মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে, সুষম সুযোগ সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য, রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।'

এই অনুচ্ছেদে সুযোগের সমতা অর্থাৎ সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় ভাগের মৌলিক অধিকারের অধ্যায়ে ২৭, ২৮ ও ২৯ অনুচ্ছেদে এই নীতিমালাকে মৌলিক অধিকার বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ২ নং অনুচ্ছেদের ভাষ্যে এগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

সংবিধানের বিধান অনুসারে মানুষে মানুষে সামাজিক অসাম্য বিলোপ করার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। মানুষে মানুষে অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করার কথাও এতে ঘোষিত হয়েছে। রাষ্ট্র যেখানে অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সেখানে মজুরির ক্ষেত্রে অসমতার কোন প্রশ্নই আসে না। তাই বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে এই অধিকার সুরক্ষিত হচ্ছে।

শ্রমিক শোষণ

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদে পছন্দমত কাজ বেছে নিয়ে ন্যায় ও অনুকূল পরিবেশে কাজ করার, সমান কাজের জন্য সমান মজুরি, ন্যায়সঙ্গত পারিশ্রমিক ইত্যাদি অধিকারের কথা বলা হয়েছে কিন্তু বাস্তবে এই অধিকারগুলো রক্ষিত হওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

একটা সময় ছিল যখন পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ ছিল সামন্তবাদী প্রভুদের ভূমিদাস। এর পর শিল্পবিপ্লবের পর সিংহভাগ মানুষ পরিণত হয় শিল্প শ্রমিকে। এই দুটি অবস্থাতেই মানুষকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়েছে। কাজ পছন্দ অপছন্দের কোন বালাই ছিল না। অসহনীয় মানবেতর পরিবেশে অমানুষিক শ্রম দিতে হয়েছে, তারপরও প্রভু কোন কারণে অসন্তুষ্ট হলে নেমে এসেছে নজীরবিহীন নিপীড়ন। ন্যায়সঙ্গত মজুরি, সমান মজুরি ইত্যাদি তো ছিল কল্পনারও বাইরে। অমানবিক অসহনীয় পরিবেশে কাজ করা, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পরিশ্রম করে নামমাত্র মজুরি, ন্যায়সঙ্গত পারিশ্রমিক চাইলে নিষ্ঠুরতার শিকার, কথায়

www.pathagar.com

কথায় কর্মচ্যুতি, ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য হওয়া এসব ছিল নৈমিত্তিক ব্যাপার। অধিকাংশ মানুষই ছিল এই দুঃসহ অবস্থার অক্টোপাশে বন্দী। সামান্য কিছু মানুষের খেয়াল খুশি ও মর্জিমত তাদের পদতলে নিবেদিত হয়েছে অসংখ্য বিপন্ন মানুষের শ্রম আর ঘাম। কিন্তু এখন অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে।

বিগত শতাব্দীর শেষ দশকেই বিশ্বব্যাপী শ্রমিকসংঘ গড়ে উঠতে শুরু করে, গড়ে উঠে ব্যাপক শ্রম আন্দোলন। বিশেষ করে ১৮৮৬ সালের ১লা মে আমেরিকার শিকাগো শহরে শ্রমিকরা জীবন দিয়ে শ্রম আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করেছিল। দৈনিক আটঘণ্টা কাজের দাবিতে শিকাগো শহরের শ্রমিকদের বুকের রক্তের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল শ্রমিক শ্রেনীর ন্যায় সঙ্গত অধিকার। এরপর পৃথিবীর দিকে দিকে গড়ে উঠতে থাকে আন্দোলন। শ্রমিক শোষণ, শ্রমিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং শ্রমিকদের অধিকারের দাবিতে আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। শতাব্দীর শুরুতে ১৯১৭ সালে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে রাশিয়ায় সংগঠিত হলো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে সংগঠিত এই বিপ্লব বিশ্ব রাজনীতির উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করলো। দেখতে দেখতে পূর্ব ইউরোপীয় দেশ পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, হাঙ্গেরি, চেকোশ্লোভাকিয়া, আলবেনিয়া এবং মধ্য আমেরিকান দেশ কিউবাসহ বিভিন্ন দেশে শ্রমিক শ্রেণী নেতৃত্বে বিপ্লব সংগঠিত হতে থাকে এবং কায়েম হয় সমাজতন্ত্র। তিরিশ ও চল্লিশের দশকে প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিবাদী দেশসমূহের তুলনায় অধিকতর সুযোগ সুবিধা লাভ করে। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সরকার গঠন হওয়ায় এবং শ্রমিক রাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই শ্রমিকদের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়।

এরই মধ্যে অনেক দিন, মাস, বছর গড়িয়ে গেছে। আমরা এখন শতাব্দীর শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে। নতুন শতাব্দীর আগমন লগ্নে আমরা যদি পর্যালোচনা করি আমাদের পৃথিবীর অবস্থা তাহলে কি দেখতে পাবো? সকল কর্মক্ষম মানুষ কাজ পাওয়ার নিশ্চয়তা নিয়ে কি আগামী শতাব্দীতে পা রাখতে পারবে? পছন্দমত কাজ করার বা পছন্দমত কাজ বেছে নেয়ার পরিবেশ কি সকলের জন্য সৃষ্টি হয়েছে? প্রতিটি মানব সন্তান কি ন্যায় ও অনুকূল পরিবেশে কাজ করতে পারছে? ন্যায়সঙ্গত পারিশ্রমিক কি সকলেই লাভ করছে? সমান কাজের জন্য সমান বেতন লাভের অধিকার কি সকলের নিশ্চিত হয়েছে? বেকারত্বের বিশাল বোঝা ছাড়াই কি পৃথিবী একুশ শতককে আলিঙ্গন করবে?

বস্তুত এসব প্রশ্নের ইতিবাচক জবাব মেলা ভার। অতীতের তুলনায় বর্তমান অবস্থা অনেক ভাল, অনেক বেশি মানবিক আমাদের পরিবেশ ; কিন্তু পুরোপুরি নয়। বেকারত্বের দুঃসহ বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে এশিয়া আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দরিদ্র দেশসমূহ। বৈদেশিক ঋণের আধিক্য আর দারিদ্র্যতার কারণে নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এসব দেশসমূহে প্রায় নেই বললেই চলে। যেখানে কাজের নিশ্চয়তা নেই সেখানে পছন্দমত কাজ বেছে নেয়ার অধিকার থাকা না থাকা প্রায় সমান। বেকারত্ব থেকে রক্ষণ লাভের অধিকার সকলের অর্জিত হয় নি।

www.pathagar.com

ন্যায় এবং অনুকূল পরিবেশে কাজ করার নিশ্চয়তা ও পুরোপুরি অর্জিত হয় নি। বাংলাদেশের তৈরি, পোশাক শিল্প থেকে শুরু করে দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণ ও কয়লা খনি পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসহনীয় অবস্থায় কাজ আদায়ের অভিযোগ পাওয়া যায়।

মানবাধিকার কমিশনের কাছে অভিযোগ আনা হয়েছে যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছোট ছোট মেয়েদের জোর করে কাজে খাটানো হচ্ছে এবং তাদের কাজ করার পরিবেশ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। তারা কাজ করে কার্পেট কারখানা, তৈরি পোশাক শিল্পকারখানা বা এ জাতীয় অন্যান্য জায়গায়। অনেক দেশে কৃষিকাজে বারো বছরের কম বয়স্ক ছেলেমেয়েদের কাজে লাগানো হচ্ছে। এবং তাদের কাজের পরিবেশ অত্যন্ত নিষ্ঠুরতাপূর্ণ। পৃথিবীর বহু দেশে বিপুল সংখ্যক ছেলেমেয়ে এভাবে শিক্ষা দীক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে অমানবিক পরিবেশে কাজ করে স্বাস্থ্য হারিয়ে ফেলেছে এবং এখনো তা অব্যাহত আছে। বেকারত্বের অভিশাপে এবং দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত মানুষ অনভিপ্রেত অবস্থার চাপে পড়ে নিজেকে অথবা নিজের সন্তানদেরকে মানবেতর পরিবেশে নামমাত্র মজুরিতে কাজে নিয়োজিত করতে বাধ্য হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা

জাতিসংঘের সংস্থাসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হচ্ছে, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার চুক্তিপত্রে এই সংস্থার কোন উল্লেখ ছিল না। ২৪ নং ধারার বক্তব্য অনুসরণ করে এই সংস্থা গঠিত হয়। এই ধারার একটি অংশে বর্ণিত ছিল যে, জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র প্রত্যেক পুরুষ নারী ও শিশুর কাজের জন্য ন্যায্য এবং মানবিক অবস্থা সৃষ্টি ও বজায় রাখার চেষ্টা করবে। এই পরিস্থিতি তারা কেবল বজায় রাখারই চেষ্টা করবে না, যে সকল দেশের সাথে তাদের বাণিজ্যিক ও শিল্পগত সম্পর্ক প্রসারিত হবে, সে সকল দেশেও এই উদ্যোগ প্রসারিত হবে। এই অবস্থা বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠিত হবে। জাতিসংঘের সকল সদস্যই এই সংস্থার সদস্য ছিল। জাতিসংঘের সদস্য নয় এমন রাষ্ট্রও এই সংস্থার সদস্য হতে পারত।

জেনেভায় এই সংস্থার কেন্দ্রীয় দপ্তর ও সচিবালয়। বিভিন্ন দেশের শ্রমিকদের অবস্থা, শ্রম সম্পর্কিত আইনের বিষয়ে প্রতিবেদন পেশ, শ্রমিকদের বিষয়ে তথ্য সরবরাহ ইত্যাদির জন্য এই সংস্থা বিভিন্ন পুস্তিকা প্রকাশ করেছে।

এই অনুচ্ছেদ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তি ঃ

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদের সাথে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তির সামঞ্জস্য রয়েছে। নিম্নে তা পরিবেশিত হলো।

পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

(১) নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন ও এতে যোগদানের অধিকারসহ

www.pathagar.com

অন্যান্যের সাথে সংঘবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতার অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির থাকবে।

(২)এই অধিকার প্রয়োগের উপর আইনানুযায়ী ব্যতীত এবং একটি গণতান্ত্রিক সমাজে জাতীয় নিরাপত্তা, অথবা জননিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনস্বাস্থ্য অথবা নৈতিকতা অথবা অন্যান্যের অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের স্বার্থে যেরূপ আবশ্যক সেইরূপ ব্যতীত, কোন বাধানিষেধ আরোপ করা যাবে না। এই অনুচ্ছেদ, এই অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনী এবং পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের উপর আইনসঙ্গত বাধা নিষেধ আরোপ নিবারণ করে না।

(৩) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই সমাবেশের স্বাধীনতা এবং সংগঠন করবার অধিকার সংরক্ষণ সম্পর্কিত ১৯৪৮ সালের আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার কনভেনশনের পক্ষ রাষ্ট্রগুলোকে এমন কোন আইন প্রণয়ন অথবা এমনভাবে আইন প্রয়োগ করবার কর্তৃত্ব প্রদান করে না যার ফলে উক্ত কনভেনশনে প্রদত্ত নিশ্চয়তাসমূহ ক্ষুণ্ন হতে পারে।

মানবাধিকার সংক্রান্ত ইউরোপীয় কনভেনশন

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

(১) প্রত্যেক ব্যক্তির শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হওয়ার স্বাধীনতার অধিকার এবং নিজের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন এবং এতে যোগদানের অধিকারসহ অন্যান্যের সাথে সমিতি বা সংঘ গঠন করবার স্বাধীনতা আছে।

(২) আইনের দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হয় এবং একটি গণতান্ত্রিক সমাজে জাতীয় নিরাপত্তা অথবা জননিরাপত্তার স্বার্থে, বিশৃঙ্খলা অথবা অপরাধ নিরোধের জন্য, স্বাস্থ্য অথবা নৈতিকতা সংরক্ষণে জন্য, অথবা অন্যান্যের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, যেরূপ প্রয়োজন হয় সেইরূপ ব্যতীত, এই অধিকারসমূহ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন বাধানিষেধ আরোপ করা যাবে না। এই অনুচ্ছেদ রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী, পুলিশ অথবা প্রশাসনের সদস্যগণ কর্তৃক অধিকারসমূহ প্রয়োগের উপর আইনসম্মত বাধানিষেধ আরোপে বাধা দান করবে না।

এই অনুচ্ছেদ ও ইসলাম

কাজ, ন্যায্য মজুরিসহ শ্রমিকের সকল প্রকার ন্যায়সঙ্গত অধিকার আলোচ্য অনুচ্ছেদের মূল বিষয়। এ বিষয়ে ইসলামে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে।

ইসলামের নবি হযরত মুহাম্মদ (দঃ) নিজেই শ্রমজীবী মানুষ ছিলেন। অনেক দিন পর্যন্ত তিনি শ্রম নিয়োগের মাধ্যমে লাভের অংশীদার হিসাবে হযরত খাদিজা (রাঃ) এর ব্যবসায়ে খেটেছেন। খোলাফায়ে রাশেদুনের অন্যতম দুই খলিফা হযরত ওমর এবং হযরত আলি মেহনত করে জীবন গুজরান করেছেন। অন্যতম হাদিস বর্ণনাকারী এবং এক সময়কার মদিনার গভর্ণর আবু হুরায়রা, একদা বেতনভুক্ত শ্রমিক ছিলেন। হযরত বিল্লাল, আম্মার, খাব্বার, শোহাইব, যায়েদ, উসামা প্রমুখ বিখ্যাত সাহাবিগণের সকলেই মুক্তিপ্রাপ্ত দাস ছিলেন। শুধু

www.pathagar.com

হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীগণই নয় বরং হযরতের পূর্ববর্তী নবি রাসুলগণের অধিকাংশই শ্রমজীবী মানুষ ছিলেন।

ইসলাম শ্রমিকদের মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার প্রেরণা দিয়েছে। তাদের প্রাপ্য মর্যাদা দিয়েছে। ইসলামের প্রচারক নিজে বিত্তবান মানুষ ছিলেন না, ফলে খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিকূল পরিস্থিতি তিনি হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পারতেন। ফলে ইসলামি শরিয়তে শ্রমিকের অধিকার, ন্যায্য মজুরি ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছে। শ্রমিকদের মজুরি যথাসময়ে পৌঁছে দেয়ার জন্য ইসলাম তাগিদ দিয়েছে। এ বিষয়ে ইসলামি বিধান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো ঃ

মহানবি (সাঃ) বলেন, "তোমরা মানুষকে অত্যাচার এবং শোষণ করো না। নিশ্চয়ই যারা দুনিয়ায় মানুষের উপর শোষণ চালাবে, তাকে কিয়ামতের দিন মারাত্মক শাস্তি প্রদান করা হবে।" শ্রমিকদের প্রতি শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে এটা মহানবির সাবধান বাণী। শ্রমিকের সমস্যা নিরসন এবং তাদের অধিকার পূরণে অত্যন্ত সজাগ, বাস্তব ও ন্যায়ানুগ দৃষ্টি রাখার তাগিদ দিয়ে মহানবি বলেন, "এরা তোমাদের ভাই—তোমাদের খেদমত করছে।"

ইসলামের বুনিয়াদী লক্ষ্য হলো, শ্রমিক ও তার নিয়োগকর্তা, তারা যেন একে অন্যকে ভাই বলে মনে করে এবং তাদের পরস্পরের জন্য যেন সৌভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক বিরাজমান থাকে।

অন্তত থাকা খাওয়ার ব্যাপারে এদের পরস্পরের মধ্যে যেন অর্থনৈতিক সমতা বিদ্যমান থাকে। এর দ্বারা মজুরি নীতির ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যায়। ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো, শ্রমিককে অন্তত এমন মজুরি দিতে হবে, যা দ্বারা মজুরি ও মালিকের মধ্যে অর্থনৈতিক সমতা এসে যায়। আজকাল শ্রমিকদের মজুরি যদি সেই পর্যায়ে উন্নীত করা যায়, তবে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যকার সংঘর্ষ অতি সহজেই বিলুপ্তি সাধন করা সম্ভব হবে।

কাজের সময় ও প্রকৃতি উভয় দিক থেকে শ্রমিকের উপর এতটুকু বোঝা চাপিয়ে দেওয়া যাবে না, যা তাকে বিপন্ন করে ফেলবে। সে কষ্টকর শ্রান্তিতে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়বে। "তাদের জন্য যা অতি কষ্টকর সে কাজের বোঝা তাদের উপর চাপিয়ে দিও না।" নবি করিম (সাঃ) এর এই উক্তিটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ দ্বারা বর্তমান শ্রমিকদের কাজের সময় ও এর প্রকৃতির জটিলতা অনায়াসে দূরীভূত করা যায়।

এমন সময় কোন কাজ যদি এসে পড়ে, যা মজুরের জন্য করা অতি কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় তখন এটা বন্ধ রাখতে হবে বা মজুরের অবস্থার প্রতি দৃকপাত না করে তার দ্বারা এ কঠিন কাজ করিয়ে নেয়া উচিত নয় বরং নিয়োগকর্তা বা মালিক অধিক শ্রমশক্তি নিয়োগ করে তার কাজকে হালকা করে দিতে সাহায্য করবে। "অগত্যা যদি করাতেই হয় তবে তাকে নিজে সাহায্য কর"—এর অর্থ তাই।

হযরত মুহাম্মদ (দঃ) বলেন, তিন ধরনের ব্যক্তি আছে কিয়ামতের দিন আমি যাদের দুশমন হবো। আর আমি যার দুশমন হবো তাকে আমি লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত করে ছাড়ব। উক্ত

www.pathagar.com

তিনজনের মধ্যে একজন সে—যে কোন মজুরকে খাটিয়ে নিজের পুরোপুরি কাজ আদায় করে নেয় কিন্তু মজুরি দেয় না।"

নবি (সাঃ) বলেন, "নামাজের খেয়াল রেখো আর যারা তোমাদের অধীন আছে তাদের অধিকার ভুলে যেয়ো না।" তিনি আরো বলেন, "যাদের মধ্যে তিনটি গুণ আছে, তাদের মৃত্যু অত্যন্ত সহজ হবে এবং তাদেরকে আল্লাহ্ পাক জান্নাত দেবেন। সে তিনটির মধ্যে একটি এ-ও অধীনস্থদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা।" প্রত্যেকের অধিকার আদায় করে দেয়ার ব্যাপারে ইসলামের সুস্পষ্ট তাগিদ রয়েছে। "শরীরের ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার আগেই মজুরি প্রদানের" তাগিদ রয়েছে ইসলামে।

সারসংক্ষেপ

কর্মই জীবন। ভূমিষ্ট হওয়ার পর থেকেই শুরু হয় শিশুর নড়াচড়া। সেইটুকুই তার কর্ম। পশুর জীবনে শৈশবকাল সংক্ষিপ্ত। তাদের সকল শক্তি সহজাত। মানুষের শিশু-কিশোরকাল দীর্ঘ। এই দীর্ঘ মেয়াদের সময়ে তারা অর্জন করে নানা প্রকার দক্ষতা। এই দক্ষতা তার ব্যক্তিগত সঞ্চয়।

এই অর্জিত দক্ষতার ভিত্তিতে সে লাভ করেছে কর্মের অধিকার, পেশার অধিকার। সে কাজ করবে অনুকূল পরিস্থিতিতে, ন্যায়ানুগ অবস্থায়, এটি তার অধিকার। সে যে কাজ করবে তা যদি বেতনযুক্ত হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে সে বৈষম্যহীনতা দাবি করতে পারে। শুধু বৈষম্যহীনতা নয়, পর্যাপ্ততাও তার অধিকার। সে নিয়মিত কাজ করবে এবং খেতে পাবে কম এটি হয় না।। নিজের জন্যে এবং পরিবারের জন্য, মর্যাদার সাথে জীবন যাপনের জন্য যা প্রয়োজন, কর্মের মাধ্যমে তা আয় করবার অধিকার তার থাকতে হবে।

যারা নিয়োজিত হন এবং যারা নিয়োগ করেন এই দুই শ্রেনীর মধ্যে স্বাভাবিকভাবে নিয়োগকর্তাই অধিকতর শক্তিধর। এই শক্তির প্রয়োগে সে তার কর্মচারীকে শোষণ করতে পারে। এই শোষণের মোকাবেলায় একজন কর্মচারী একেবারেই শক্তিহীন। মোকাবেলার জন্য প্রয়োজন সংঘ গঠনের, কর্মীদের সংঘে, কর্মচারীদের সংঘে। স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন গঠন এবং তাতে যোগদান একটি মানবাধিকার।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ : ২৪

প্রত্যেকেরই বিশ্রাম ও অবসর বিনোদনের অধিকার রয়েছে। কাজের সময়ের যুক্তিসঙ্গতসীমা ও বেতনসহ নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর ছুটি এ অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

(Article : 24. Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.)

ভাষ্য

আলোচ্য অনুচ্ছেদে মানুষের দুটি অধিকারের কথা বলা হয়েছে। অধিকার দুটি হচ্ছে :

১. বিশ্রাম ও

২ অবসর বিনোদন

এ ছাড়া সবেতন ছুটিকেও এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আলোচ্য অনুচ্ছেদকে অনুধাবন করতে হলে আমাদেরকে বিশ্রাম, অবসর বিনোদন সবেতন ছুটি বলতে কি বোঝায়, এগুলোর প্রয়োজনীয়তার সীমা ও গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। আমাদেরকে দেখতে হবে মানব জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ, অগ্রগতির জন্য বিশ্রাম, অবসর বিনোদন এবং সবেতন ছুটি কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আমরা প্রথমেই আলোচনা করছি বিশ্রাম সম্পর্কে।

বিশ্রাম

বিশ্রাম শব্দের দ্বারা আমরা বুঝি শ্রমের পর বিরাম। সাধারণত একটানা কাজ করতে করতে মানুষ যখন ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ে, তখন কিছুটা বিরতি ও বিরাম দিয়ে পুনরায় কাজে লেগে পড়ে। পরিশ্রমের পর এই যে বিরাম বা বিরতি একেই বিশ্রাম বলা হয়। দীর্ঘসময় কর্মহীনভাবে পড়ে থাকার নাম বিশ্রাম নয়। বিশ্রামের সাথে শ্রমের ও কর্মের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। যেখানে কাজ নেই, শ্রম প্রদানের দরকার নেই সেখানে বিশ্রামের প্রশ্ন অবান্তর। কাজ করলেই ক্লান্তি আসে, অবসন্নতা আসে এবং একসময় আর কাজ করতে ইচ্ছে করে না। তাই কাজ করতে করতে

www.pathagar.com

যখন শরীর ও মন অবসন্ন হয়ে পড়ে তখন সামান্য বিরতি দিয়ে শরীর ও মনকে কাজের উপযোগী করে পুনরায় কাজে লেগে পড়া যায়। কাজের ফাঁকে এই যে বিরতি একেই বলে বিশ্রাম।

বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা

মানবজীবন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। এই সামান্য সময়ে মানুষ অসংখ্য কাজ করতে চায়। সুখ, শান্তি, অর্থ সম্পদ, বিত্ত, খ্যাতি ইত্যাদি অর্জনের জন্য দরকার হয় পরিশ্রম। কাজ না করে, পরিশ্রম না করে জীবনে কেউ কিছু অর্জন করেছে এমন নজির বিরল। তাই কাজ ও পরিশ্রম জীবনের অবিভাজ্য অংশ। বেঁচে থাকার জন্য, জীবনে উন্নতি সাধনের জন্য এবং কমপক্ষে বর্তমান জীবনমানকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য কাজ করা চাই, পরিশ্রম করা চাই। কিন্তু ইচ্ছা হলেই এবং প্রয়োজন থাকলেই কি সব সময় কাজ করা যায়? মানুষের পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন ও বিরতিহীনভাবে কাজ করা কি সম্ভব? মোটেই নয়। কাজের ফাঁকে ফাঁকে বিশ্রাম অপরিহার্য, কিন্তু কেন? কেন বিশ্রাম দরকার সে কথায় আসছি এবার।

১. **কর্মক্ষম থাকার জন্য :** যন্ত্রপাতি দীর্ঘক্ষণ চালু থাকার পর অবস্থার প্রেক্ষিতে এর বিভিন্ন স্থানে কলকব্জা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় তেল মবিল ইত্যাদি দিতে হয়। মানুষের শরীরটাও যন্ত্রের মতো। কাজের ফাঁকে একে অবসর দিতে হয়। প্রয়োজনীয় খাদ্য পানীয় ইত্যাদি সরবরাহ করতে হয়, তবেই না শরীর থাকবে কাজের উপযোগী। অনবরত কাজ করলে এক সময় শরীর ভেঙ্গে পড়বে, শরীর কাজের উপযোগী থাকবে না। তাই শরীরকে কর্মক্ষম রাখার জন্য বিশ্রাম দরকার।

২. **উন্নত পরিকল্পনার জন্য :** মানুষকে সর্বদাই বর্তমান কাজ নিয়ে সাধারণত ব্যস্ত থাকতে হয়। তাঁর মাথায় থাকে বর্তমান কাজের ধান্ধা। কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে মানুষ যখন বিশ্রাম নেয় তখন সে ভবিষ্যতের কথা ভাবে। এভাবে ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ভাবতেই এক সময় মনের মধ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা এবং কাজের উপায় উদ্ভাবিত হয়। তাই কাজের জন্য উন্নত পন্থা, উন্নত পরিকল্পনা উদ্ভাবনের জন্য বিশ্রাম দরকার।

৩. **উদ্যম ও প্রেরণার জন্য :** কাজের চাপে মন দমে যায়। শরীর অবশ হয়ে আসে। আর কাজ করতে ইচ্ছে করে না। অবশ অলস দেহ-মন যখন কাজ চালিয়ে যেতে চায় না তখন কাজে খানিকটা বিরতি দিলে মন উদ্যম ফিরে পায়, আবার কাজে লেগে পড়তে মন চায়। বিশ্রাম শরীর ও মনে কাজের উদ্যম ও প্রেরণা সঞ্চার করে। তাই কাজে উদ্যম ও প্রেরণা লাভের জন্য কাজের ফাঁকে বিশ্রাম দরকার।

৪. **সজীব ও প্রাণবন্ত হওয়ার জন্য :** কাজ করতে করতে মানুষের মধ্যে কিছুটা নির্জীবতা চলে আসে। মানুষ কিছুটা স্থবির হয়ে পড়ে। এই স্থবিরতা, নির্জীবতা কাটিয়ে উঠার জন্য চাই কর্মে খানিকটা ছেদ। কাজের ফাঁকে ফাঁকে খানিকটা ফুরসত বা যতি দিলে মন ও শরীর সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। তাই কাজের গতির জন্য শরীর ও মনের সজীবতার জন্য চাই বিশ্রাম।

www.pathagar.com

৫. বিষণ্ণতা দূর করার জন্য : কাজ করতে করতে শরীর হয় ক্লান্ত, মন হয় অবশ । এই ক্লান্তি এবং অবসন্নতা থেকে মনে বিষণ্ণতা ছায়া ফেলে। কাজে কর্মে মন বসে না। এই অবস্থা, যা অসুস্থতার মতোই, তাকে ওষুধ দিয়ে সারানো যায় না। একে সারানোর জন্যে দরকার কাজে কর্মে খানিকটা সময় বিরাম দেয়া, শরীর এবং মনকে কিছুটা রেহাই দেয়া। মাঝে মাঝে কাজে কিছুটা রেহাই দিলে, কিছুটা অব্যাহতি দিলে বিষণ্ণতা দূর হয়। তাই বিষণ্ণতাকে দূর করার জন্য বিশ্রাম চাই।

বস্তুত বিশ্রাম জীবনের এক অপরিহার্য অনুষঙ্গ। বিশ্রামকে বাদ দিয়ে কাজের কথা, জীবনের কথা ভাবা যায় না। তাই যেখানে কাজের কথা আছে, শ্রমের কথা আছে, সেখানে বিশ্রামের কথা আছে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা যেমন জন্মসূত্রে মানুষের সাথে আছে, তেমনি আছে বিশ্রামের চাহিদা। মানুষের সহজাত প্রয়োজনগুলোর মধ্যে এটি একটি। তাই মানুষ যেখানে যে অবস্থায় এবং যে ধরনের কাজই করুক না কেন তার বিশ্রাম গ্রহণের অধিকার আছে। এই অধিকারটি যদি হরণ করা হয় তাহলে মানুষ সুন্দরভাবে সৃষ্টিশীলভাবে বেঁচে থাকতে পারে না। বিশ্রামের অধিকারটি বেঁচে থাকার অধিকারের মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

অবসর বিনোদন

অবসর শব্দের অর্থ হচ্ছে অবকাশ। অবসর শব্দের সাথে নিষ্ক্রিয়া অক্রিয়া ইত্যাদি সম্পর্কিত। অবসর বললেই সাধারণভাবে বোঝা যায় যে, কোন কাজ নেই। অখণ্ড অবসর থাকে শুধুমাত্র বেকারের আর কর্মহীন পেনশনভোগীর। আমরা যে অবসরের কথা আলোচনা করছি সেটা কাজের ফাঁকে বিশ্রামের মতোই। অবসরে বিশ্রাম নেয়া যায়। তাই বিশ্রামের জন্য অবসর দরকার। যেসব কারণে জীবনে বিশ্রাম অপরিহার্য, সে সব কারণেই অবসর অপরিহার্য। অবসর যখন বিনোদন করা হয় তখন তার সাথে কর্মের যোগ ঘটে। কিন্তু বিনোদন কর্ম সাধারণ কাজের মতো নয়। বিনোদন অবসর কাটানোর জন্য, বিশ্রাম নেয়ার জন্য।

মেলা, উৎসব, সিনেমা, থিয়েটার, ভ্রমণ, পার্টি, প্রীতি সম্মেলন, খেলা, আতশবাজি, সার্কাস, ঘুড়ি উড়ানো ইত্যাদি অবশ্যই কাজ। তবে এসব নিয়মিত কাজ না হয়ে, পেশা না হয়ে যদি বিনোদনের জন্য হয় তাহলে তা হবে আনন্দের জন্য। এই বিনোদন অবসর কাটানোর জন্য এবং বিশ্রাম নেয়ার জন্য অপরিহার্য। মানব মনকে উজ্জীবিত ও উদ্দীপিত করার জন্য কাজের ফাঁকে যেমন বিশ্রাম ও অবসর দরকার তেমনি অবসর কাটানোর জন্য দরকার বিনোদন।

বিশ্রাম এবং অবসর বিনোদনের জন্য দরকার নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর ছুটি। ছুটি না পেলে বিশ্রামের কোন উপায় নেই তেমনি অবসরেরও কোন অবকাশ নেই। তাই ছুটি এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। ছুটি সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

ছুটি এবং ছুটির প্রয়োজনীয়তা

ছুটি শব্দের অর্থ হচ্ছে নিত্যকর্ম থেকে বিরাম। কর্ম যেমন মানব জীবনের অপরিহার্য বিষয়, তেমনি ছুটিও জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। নিত্যদিন কাজ করে সপ্তাহান্তে ছুটি ভোগ করার নিয়ম পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র প্রচলিত আছে। ছুটির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

মানবজীবনের সংগ্রামমুখর অধ্যায়ে অবকাশের দরকার আছে। বিরতিহীনভাবে শুধু কাজ আর কাজ এভাবে চলে না। অবকাশ না দিয়ে সব সময় কাজ করা সম্ভবও নয়। কাজের গতিশীলতার জন্য অবসর দরকার। কাজের ফাঁকে অবকাশ পেলে পুনরায় উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করা যায়। এই অবসর ও অবকাশের জন্য ছুটি দরকার।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজে বসবাস করতে হলে তাকে অনেক সামাজিক নিয়ম কানুন ও শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়। সমাজের সাথে যে বন্ধন অর্থাৎ মানুষে মানুষে যে সম্পর্ক তাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে দরকার হয় বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান। বিবাহ, জন্মদিন, মৃত্যুবার্ষিকী, মিলাদ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে যেতে হয়। নিজেকেও এসব অনুষ্ঠান আয়োজন করতে হয়। এসব করতে হলে ছুটির দরকার। বস্তুত সামাজিকতা রক্ষা করা, সমাজকে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ করে তোলার জন্য এটা খুবই প্রয়োজন।

নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর ছুটি না থাকলে হাঁপিয়ে উঠা ছাড়া উপায় নেই। আর কাজে হাঁপিয়ে উঠলে, মনে আনন্দ না থাকলে কাজ অচল হয়ে পড়বে। তাই কাজের ফাঁকে ফাঁকে সবেতন ছুটির অধিকার মানুষের মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। এ সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের শ্রম আইনে সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে। বাংলাদেশের আইন নিম্নে উল্লেখ করছি।

বাংলাদেশের আইনে ছুটি ও অবকাশের অধিকার

(১) দোকানে বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে চাকুরিতে নিযুক্ত শ্রমিকগণ ১৯৫১ সালের শপ্‌স্ অ্যান্ড এস্টাবলিশমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৬৫ সালের ফ্যাক্টরীজ অ্যাক্ট এবং বর্তমানে প্রচলিত অন্য যে কোন আইনে নির্দিষ্ট করা যাবতীয় সবেতন ছুটি ও অবকাশ ভোগ করার অধিকার এবং তৎসহ সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে সরকার শ্রমিকদের জন্য আরো যে সকল অবকাশ ঘোষণা করিবেন তাহাও তাহারা সবেতন ভোগ করিতে পারিবে।

(২) কোন শ্রমিক কাজে অনুপস্থিত থাকিয়া ছুটি লইতে চাহিলে উক্ত উদ্দেশ্যে তাহাকে মালিকের নিকট ছুটির সময়ের ঠিকানা উল্লেখসহ লিখিতভাবে দরখাস্ত করিতে হইবে ; এবং মালিক বা তাহার ভারপ্রাপ্ত অফিসার দরখাস্ত দাখিলের এক সপ্তাহের মধ্যে এবং ছুটি আরম্ভের দুই দিন পূর্বে (যাহা আগে হয়) উক্ত দরখাস্তের উপর তাহার আদেশ লিপিবদ্ধ করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, জরুরি কারণে প্রার্থীত ছুটি যদি দরখাস্ত করার দিন হইতে বা উহার তিনদিনের মধ্যে শুরু হয়, তবে সেই ক্ষেত্রে মালিকের বা তাহার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের আদেশ দরখাস্ত করার দিনেই দিতে হবে। প্রার্থিত ছুটি মঞ্জুর করা হইলে সংশ্লিষ্ট শ্রমিককে ছুটির একটি

www.pathagar.com

ছাড়পত্র দিতে হইবে। আর ছুটির আবেদন প্রত্যাখ্যান করা বা মুলতবী রাখা হইলে তাহার কারণ উল্লেখসহ মালিককে উক্ত উদ্দেশ্যে রক্ষিত একটি রেজিস্ট্রারে উহা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। ছুটিতে যাওয়ার পর শ্রমিক যদি ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে চায় এবং যদি বর্ধিত মেয়াদের জন্য ছুটি পাওনা থাকে তবে তাহাকে মেয়াদ শেষ হওয়ার যথেষ্ট আগে মালিকের নিকট ছুটির মেয়াদ বাড়াইবার আবেদনপত্র লিখিয়া পাঠাইতে হইবে এবং মালিক যতদূর সম্ভব ছুটির ঠিকানায় বর্ধিত ছুটি আবেদন প্রত্যাখ্যান্ বা মঞ্জুর করা সম্পর্কে স্বীয় সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে জানাইবেন।

(৩) প্রথমে মঞ্জুরকৃত ছুটির মেয়াদ বা পরে মঞ্জুরকৃত বর্ধিত মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও যদি শ্রমিক কাজে অনুপস্থিত থাকে, তবে ছুটির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরবর্তী দশ দিনের মধ্যে কাজে যোগদান না করিলে এবং যথাসময়ে কাজে যোগদান না করার কারণ সম্পর্কে মালিকের সন্তুষ্টি মোতাবেক কৈফিয়ত না দিলে, তাহার চাকুরির অধিকার হারাইবার সম্ভাবনা থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারা অনুসারে শ্রমিক যদি তাহার চাকরির অধিকার হারায় তবে অতীত চাকরির জন্য আইন অনুযায়ী যেই সব সুযোগ সুবিধা তাহার প্রাপ্য হইয়াছে, তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা যাইবে না এবং সম্ভব হইলে তাহাকে "বদলী" তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিতে হইবে।

আরো শর্ত থাকে এই যে, উক্ত শ্রমিক যদি ছুটির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে চাকুরিতে ফিরিয়া আসিতে না পারার কারণ দর্শাইয়া মালিকের নিকট সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে ব্যর্থ হয় তবে মালিক দোষ লাঘব করার মতো পরিস্থিতি থাকিলে উহা বিবেচনা করিয়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে শ্রমিকের প্রত্যাবর্তনের তারিখ হইতে অনধিক সাত দিনের জন্য তাহাকে সাসপেন্ড করিতে পারিবেন এবং শ্রমিক ছুটির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর হইতে অনুপস্থিত থাকাকালীন সময়ের এবং সাসপেন্ড থাকার সময়ের বেতন হইতে বঞ্চিত হইবে ; তবে চাকুরির অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে না।

(৪) ছাটাই, চাকরি হইতে বরখাস্ত, অপসারণ, চাকরি অবসান বা চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণের কারণে অথবা পদত্যাগের দরুন কোন শ্রমিক কর্মচ্যুত হইলে ইস্ট বেঙ্গল শপ্‌স্ এস্টাব্লিশমেন্ট এ্যাক্ট, ১৯৫১, কারখানা আইন ১৯৬৫ কিংবা ঐ সময়ে চালু অন্য কোন আইনের বিধান মোতাবেক মালিকের নিকট তাহার কোন ছুটি পাওনা থাকিলে উক্ত আইনের বিধান অনুসারে মালিক তাহাকে উক্ত পাওনা ছুটি বাবদ বেতন প্রদান করিবেন। উক্ত ছুটি পাওনা হওয়ার সময় তাহার বেতনের যে হার ছিল তদনুসারে তাহাকে উক্ত পাওনা ছুটি বাবদ বেতন দিতে হইবে এবং যেদিন তাহাকে চাকরি হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে তাহার দ্বিতীয় দিবসে কাজ চলাকালীন সময়ে তাহাকে উক্ত ছুটির বেতন পরিশোধ করিতে হইবে।

www.pathagar.com

১৯৬৫ সালের কারখানা আইনের সংশ্লিষ্ট বিধান :

ছুটি ও মজুরিসহ অবকাশ

১। মজুরিসহ বাৎসরিক ছুটি (Annual Leave with wages) :

(১) কোন কারখানায় বিরতিহীনভাবে একজন শ্রমিক ১ বৎসর কাজ করিলে পরবর্তী ১২ মাস বা ১ বৎসরে সে নিম্নোক্ত হারে মজুরিসহ ছুটি পাইবে ঃ

(ক) শ্রমিক যদি প্রাপ্ত বয়স্ক হয়, তবে পূর্ববর্তী ১২ মাস কাজের জন্য প্রতি ২২ দিনে ১ দিন ;

(খ) শ্রমিক যদি শিশু বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক হয় তবে পূর্ববর্তী ১২ মাস কাজের জন্য প্রতি ১৪ দিনে ১ দিন।

উল্লেখ্য যে, ছুটির এই মেয়াদের মধ্যে সাধারণ ছুটি পড়িলে উহা উক্ত মেয়াদের অন্তর্ভূক্ত হইবে।

(২) যদি কোন শ্রমিক উপরে উল্লিখিত প্রাপ্য ছুটি ঐ ১২ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ বা আংশিক ভোগ না করে তবে ঐ ছুটি পরবর্তী পাওনা ছুটির সাথে যোগ হইবে। তবে এই ক্ষেত্রে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিক পুরাতন ছুটির ২০ দিন এবং একজন শিশু শ্রমিক ৩০ দিনের বেশি যোগ করিতে পারিবে না।

তাছাড়া আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কোন শ্রমিকের ছুটির আবেদন মালিক, ব্যবস্থাপক বা ভারপ্রাপ্ত অফিসার কর্তৃক কোন কারণে নামঞ্জুর হইলে উল্লিখিত সীমার অতিরিক্ত সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের পাওনা ছুটি হিসেবে যোগ করা হইবে।

(৩) এই ধারার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিম্নোক্ত কোন কারণে কাজ না করা সত্ত্বেও একজন শ্রমিক অব্যাহত চাকুরির মেয়াদপূর্ণ করিয়াছে বলিয়া গণ্য করিতে হইবে—

(ক) কোন সাধারণ অবকাশ ;

(খ) মজুরিসহ কোন ছুটি

(গ) অসুস্থতা বা দুর্ঘটনার কারণে মজুরিসহ বা মজুরি ছাড়া ছুটি

(ঘ) অনধিক বারো সপ্তাহ পর্যন্ত কোন মাতৃত্ব কল্যাণ ছুটি

(ঙ) কয়লা জ্বালানী বিজলী বা কাঁচামালের অভাবহেতু অথবা পণ্য জমা হওয়ার কারণে অথবা যন্ত্রপাতি বিকল হওয়ার কারণে অথবা অন্য যেই কোন কারণে মালিক শ্রমিককে চাকরিতে রাখিতে অপারগ বা অনিচ্ছুক হইয়া যতদিন লে অফ করিয়াছে ততদিনের জন্য, যদি শ্রমিকের নাম সংশ্লিষ্ট কারখানার মাস্টার রোলে অন্তর্ভূক্ত থাকে ;

(চ) বে আইনী নহে এরূপ ধর্মঘট বা বেআইনী নহে এরূপ লে-অফ ।

২। উৎসব ছুটি

(১) প্রত্যেক শ্রমিককে বৎসরে অন্তত দশদিন মজুরিসহ উৎসব ছুটি মঞ্জুর করিতে হইবে। অনুরূপ উৎসবের দিন ও তারিখ কারখানার মালিক বা ম্যানেজার নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

www.pathagar.com

(২) উৎসব উপলক্ষে যেই কোন ছুটির দিন প্রয়োজন হইলে শ্রমিককে কাজ করিতে হইবে ; কিন্তু উহার বিনিময়ে ৫১ ধারা অনুসারে তাহাকে পূর্ণ বেতনসহ ক্ষতিপূরণমূলক দুই দিনের ছুটি এবং একদিন বিকল্প ছুটির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩। নৈমিত্তিক ও অসুস্থতার ছুটি (Casual leave and sick leave)

(১) প্রত্যেক শ্রমিক বৎসরে পূর্ণ মজুরিসহ দশ দিনের নৈমিত্তিক ছুটি পাইবে ।

(২) প্রত্যেক শ্রমিক বৎসরে গড় অর্ধমজুরিসহ চৌদ্দ দিনের অসুস্থতার ছুটি পাইবে ।

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারা অনুসারে মঞ্জুরকৃত নৈমিত্তিক ছুটি বা অসুস্থতার ছুটি জমা করিয়া পরবর্তী বৎসরে ভোগ করা যাইবে না।

৪। ছুটিকালীন সময় মজুরি (Wages During leave or Holidays Period) : এই আইনের বিধান অনুসারে শ্রমিকের প্রাপ্য ছুটি বা অবকাশ বাবদ তাহাকে দিতে হইবে ;

(ক) পূর্ণ মজুরিসহ ছুটির বেলায় প্রতিদিনের কাজের জন্য সে, যেই বেতন ও মহার্ঘ ভাতা পাইয়াছে, যদি মহার্ঘ ভাতা থাকে, তাহার সমান হারে, তবে অতিরিক্ত সময়ের মজুরি বা বোনাস পাইয়া থাকিলে তাহা উক্ত হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হইবে না ; এবং

(খ) গড় অর্ধ মজুরিসহ ছুটির বেলায়, (ক) এর পদ্ধতি মোতাবেক প্রতিদিনের কাজের জন্য সে, যেই বেতন ও মহার্ঘ ভাতা পাইয়াছে, যদি মহার্ঘ ভাতা থাকে, তাহার গড় অর্ধদিনের হিসাবের সমহারে।

৫। অগ্রিম প্রদান (Payment in Advance) : কোন প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিককে অন্যূন চারদিনের ছুটি এবং শিশুশ্রমিককে অন্যূন পাঁচদিনের ছুটি মঞ্জুর করা হইয়া থাকিলে ৭৮ ধারা অনুসারে উক্ত ছুটি শুরু হওয়ার পূর্বেই তাহাকে যতদিনের ছুটি মঞ্জুর করা হইয়াছে ততদিনের বেতন অগ্রিম পরিশোধ করিতে হইবে।

১৯৬৫ সালের কারখানা আইনে শ্রমিক নিয়োগ সংক্রান্ত বিধানসমূহ : এই আইনে প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকদের নিয়োগ প্রসঙ্গে যে সকল বিধান রয়েছে নিম্নে তা আলোচনা করা হলো :

১। সাপ্তাহিক কার্যের সময় : (১) কোন কারখানায় কোন প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিককে সপ্তাহে ৪৮ ঘন্টার বেশি কাজ করিতে বলা যাইবে না বা কাজ করিতে দেওয়া যাইবে না।

(২) ৫৮ ধারায় বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিক দিনে ৯ ঘন্টার বেশি বা সপ্তাহে ৪৯ ঘন্টার বেশি কাজ করিতে পারেন :

তবে শর্ত থাকে যে, প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকের কাজের মোট ঘন্টার পরিমাণ সপ্তাহে ৬০ ঘন্টার বেশি হইবে না এবং এক বৎসরে প্রতি সপ্তাহের গড় ৫৬ ঘন্টা হইবে।

২। সাপ্তাহিক ছুটি : কোন কারখানায় কোন প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিককে অবস্থানুসারে রবিবার বা শুক্রবার কাজ করিতে বলা হইবে না বা দেওয়া যাইবে না, যদি না—

www.pathagar.com

(ক) অবস্থানুসারে শুক্রবার বা রবিবারের পূর্ববর্তী বা পরবর্তী তিন দিনের কোন একদিন সে ছুটি ভোগ করিয়া থাকে বা ছুটি ভোগ করে ; এবং

(খ) কারখানার ম্যানেজার উক্ত রবিবার বা শুক্রবারের পূর্বে অথবা বিকল্প ছুটির দিনের পূর্বে, যেইটা আগে হইবে—

(১) রবিবার বা শুখবার উক্ত শ্রমিককে কাজ করাইবার প্রয়োজনীয়তা এবং উহার পরিবর্তে কোন দিন তাহাকে ছুটি দেওয়া হইতেছে তাহা উল্লেখপূর্বক ইন্সপেক্টরের নিকট নোটিশ পাঠাইয়া থাকেন ; এবং (২) উপরোক্ত মর্মে একটি নোটিশ কারখানায় লটকাইয়া রাখেন : তবে শর্ত থাকে যে, বিকল্প ছুটির দিন যেন এমনভাবে নির্ধারণ না করা হয় যাহাতে একজন শ্রমিককে পূর্ণ একদিনের ছুটি ভোগ ছাড়াই একটানা দশ দিনের বেশি কাজ করিতে হয়।

৩। ক্ষতিপূরণমূলক সাপ্তাহিক ছুটি : এই আইনের ৫২ ধারায় বর্ণিত আছে যে, যদি কোন শ্রমিক সাপ্তাহিক ছুটি না পাইয়া থাকে, তবে সে সেই মাসেই অথবা পরবর্তী দুই মাসের মধ্যে সমপরিমাণ ছুটি ক্ষতিপূরণমূলক সাপ্তাহিক ছুটি হিসেবে ভোগ করিতে পারিবে।

৪। দৈনিক কার্যঘণ্টা : কোন কারখানায় কোন প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিককে দৈনিক নয় ঘণ্টার বেশি কাজ করিতে বলা বা করিতে দেওয়া যায় না।

তবে শর্ত থাকে যে, ৫০, ৫৪, ৫৫ ধারার বিধান সাপেক্ষে কোন কারখানায় একজন প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিক দৈনিক নয় ঘণ্টার বেশি কাজ করিতে পারে কিন্তু দশ ঘণ্টার অতিরিক্ত পারিবে না। (৫৩ ধারা)

৫। বিশ্রাম বা আহারের জন্য বিরতি : একজন প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিক এক নাগাড়ে দৈনিক ৬ ঘণ্টার বেশি কাজ করিলে তাহার বিশ্রাম ও আহারের জন্য কমপক্ষে ১ ঘণ্টা এবং দৈনিক ৫ ঘণ্টার বেশি কাজ করিলে কমপক্ষে আধঘণ্টা বিরতি দিতে হইবে। (৫৪ ধারা)

৬। কাজের সময়ের ব্যাপ্তি : চীফ ইন্সপেক্টরের অনুমতি ব্যতীত এবং তৎকর্তৃক সাধারণভাবে অথবা কোন বিশেষ কারখানার জন্য নির্দেশিত শর্তসাপেক্ষ ছাড়া কোন কারখানায় একজন প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকের কাজের সময় এমনভাবে নির্ধারিত হইতে হইবে যাহাতে উহা ৫৪ ধারা অনুসারে বিশ্রাম ও আহারের জন্য বিরতিসহ একদিনে সাড়ে দশ ঘণ্টার অতিরিক্ত না হয় এবং কারখানাটি মওসুমী ধরনের বলিয়া ঘোষিত হইয়া থাকিলে সেই ক্ষেত্রে একদিনে সাড়ে এগার ঘণ্টা অতিরিক্ত না হয়।

৭। নৈশ শিফট : এই আইনের ৫৬ ধারা মোতাবেক, প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিক যদি কোন কারখানার নৈশ শিফটে মধ্যরাত্রির পরেও কাজ করে, তবে কাজ শেষ হইবার সময় হইতে পরবর্তী একটানা ২৪ ঘণ্টা তাহার সাপ্তাহিক ছুটির দিন হিসাবে গণ্য হইবে।

www.pathagar.com

কাজের সময়ের যুক্তিসঙ্গত সীমা

মানুষ কাজ করে। কর্মব্যস্ত থাকে জীবন জীবিকার জন্য। কেউ নিজের পরিকল্পনামতো নিজের ব্যবস্থাপনায় নিজেই কাজ করে। কেউ অন্যের অধীনে কাজ করে। যে নিজের ব্যবস্থাপনায় কাজ করে তার কাজের সময়সীমার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কাজের প্রয়োজন এবং শরীরের সহনশীলতার ভিত্তিতে কাজের সময় নির্ধারিত হবে। কিন্তু যিনি অন্যের কাজ করেন, সেটা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে হোক, তার কাজের নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকা চাই। এবং এই সময়সীমা যুক্তিসঙ্গত হওয়া চাই।

যুক্তিসঙ্গত সময়সীমা পর্যন্ত কাজ করার অধিকার প্রতিটি মানুষের মানবাধিকারের আওতাভুক্ত। বিশ্রাম ও অবসর বিনোদনের যে অধিকারের কথা আলোচ্য অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কাজের সময়ের যুক্তিসঙ্গত সীমা হচ্ছে এর অন্তর্ভুক্ত।

কাজের সময়ের যুক্তিসঙ্গত সীমা ও মে দিবস

মে দিবস ঐতিহাসিক শ্রমিক সংহতি দিবস। বিশ্বব্যাপী শতাব্দীর অন্যতম মহান দিবস। দুনিয়ার তাবৎ শ্রমজীবী মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ের আলোকবর্তিকার দিন মে দিবস। ১৮৮৬ সালের ১লা মে আমেরিকার শিকাগো শহরের যে মার্কেট মালিক পক্ষের ভাড়াটিয়া কর্তৃক অসংখ্য শ্রমজীবী মানুষের বুকের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল রাজপথ। শিকাগো শহরের শ্রমিকদের রক্তদানের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল শ্রমিকশ্রেণী ন্যায় সঙ্গত অধিকার।

আমেরিকার লাখ লাখ অধিকার সচেতন শ্রমজীবী মানুষ দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে ধর্মঘটের ডাক দেয়। এই দাবি আদায়ের সংগ্রামে, বিজয় অর্জনের লক্ষ্যে তাদের অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল। ঢেলে দিতে হয়েছে বুকের তাজা লাল রক্ত। এক অমানবিক এবং দুঃসহ শোষণ ও বঞ্চনার মধ্য দিয়ে তখন আমেরিকায় শ্রমিকরা কাজ করে যেতো। দৈনিক ১৫ থেকে ১৮ ঘণ্টা ছিল তাদের কাজের সময়। এর সামান্য কম হলেই তাদের জীবনে নেমে আসতো ভয়াবহ নির্যাতন। মালিক পক্ষের ভাড়াটিয়াদের চাবুকের ঘায়ে জর্জরিত হতো তাদের সারা দেহ। এতে অতিরিক্ত খাটুনির জন্য তাদের কোন বাড়তি পারিশ্রমিকও দেয়া হতো না।

এ প্রসঙ্গে ইউরোপ ও আমেরিকাব আধুনিক শিল্প বিকাশ এবং পুঁজির প্রভাবের প্রেক্ষাপট আলোচনা করা যেতে পারে। সামন্তবাদের কবরের উপর রচিত শিল্পবিপ্লবের ধাক্কা লেগেছে ইউরোপ ও আমেরিকায় এবং এই সমৃদ্ধি আসে শ্রমিকদের শ্রম আর ঘামে।

শিল্প কারখানার আমেরিকান মালিক তথা পুঁজিপতিরা কলকারখানা চালু রাখা এবং উৎপাদনের মূল উপকরণ শ্রমিক শ্রেণীকে প্রতিদিন ১৫ থেকে ১৮ ঘণ্টা কাজ করানোর সিদ্ধান্ত নেয়। আসলে রাতারাতি অধিকতর ধনী হবার দুর্নিবার বাসনা থেকেই শ্রমজীবী মানুষদের বঞ্চিত করার হীন অসুস্থ মানসিকতা গড়ে ওঠে। বছরের পর বছর ধরে এ অবস্থা চলতে থাকে। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণী যখন অনুধাবন করতে পারলো, এভাবে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না, তারা

www.pathagar.com

সংগঠিত হতে লাগলো। অমানবিক ব্যবস্থায় আর শোষিত হতে তারা রাজি নয়। ক্রমান্বয়ে তাদের সচেতনতা, অধিকারবোধ এবং দাবি আদায়ের স্পৃহা জেগে ওঠে। সে প্রেক্ষাপটেই কাজের সময় নির্ধারণ এবং দৈনিক আটঘণ্টা কর্মদিবস ঘোষণার দাবিতে ১৮৮৬ সালে আন্দোলন শুরু হয় এবং পহেলা মে তার পরিণতি লাভ করে রক্ত দানের মাধ্যমে।

শিকাগো শহরের শ্রমিকদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয় কাজের সময়ের যুক্তিসঙ্গত সীমা। মানুষের এই ন্যায় সঙ্গত অধিকারটি অর্জনের ইতিহাস রক্ত রঞ্জিত। তাই মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদে এই অধিকার সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। ইতিহাসের নিরীখে এই অধিকারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কাজের সময়ের যুক্তিসঙ্গত সীমা ও বাস্তবতা

ক্ষুধা পীড়িত তৃতীয় বিশ্বের মানুষ। পেটে ক্ষুধার যন্ত্রাণা নিয়ে নিশিযাপন করে তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ, জেগে ওঠে দুঃস্বপ্ন নিয়ে—আগামী দিনের দুঃস্বপ্ন। দু'মুঠো ভাতের স্বপ্ন তাদের জীবনের অন্যসব স্বপ্নকে ঢেকে দেয়। প্রতিদিন নীরবে ক্ষুধার দংশনে কাটছে যে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন, অখাদ্য, কুখাদ্য খেয়ে, অপুষ্টির শিকার হয়ে, মানব জীবন পেয়েও যারা মানবিক হয়ে উঠতে পারছে না, তারা কাজের সময়ের যুক্তিসঙ্গত সীমা ভোগের অধিকার পাবে কোথায়?

সকলের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য থাকা সত্ত্বেও ৫০ কোটি লোক পৃথিবীতে ক্ষুধা ও রোগে ভুগছে। অনেকেই মৃত্যুবরণ করছে। এর কারণ খাদ্য কেনার মতো আর্থিক সঙ্গতি তাদের নেই। যাদের খাদ্যের নিশ্চয়তা নেই তারা একমুঠো খাদ্যের জন্য দিবারাত্রি শ্রম দিতে বাধ্য হয়। এজন্যই দেখা যায়, আমাদের দেশসহ তৃতীয় দুনিয়ার অনেক দরিদ্র দেশে কৃষি খামারে, ঘরে এবং অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকরা বিরতিহীনভাবে শ্রম দেয়। সূর্যোদয়ের আগেই তাদের দিনের সূচনা হয় আর সমাপ্ত হয় মধ্যরাতে। যুক্তিসঙ্গত সময়সীমা পর্যন্ত কাজ করার দাবি তারা করতে পারে না। কারণ অধিকার আদায় করার মতো দৃঢ়তা তাদের থাকে না। একদিন কাজ না করলে তাদের উনুন জ্বলবে না, স্ত্রী পুত্রকন্যা নিয়ে না খেয়ে থাকতে হবে তাছাড়া পরের দিন কাজ পাওয়ার পথ হবে বন্ধ। এই অবস্থায় অনুন্নত দেশের দরিদ্র মানুষটি কি করে কাজের যুক্তিসঙ্গত সীমা বাস্তবায়নের দাবি করতে পারে। অকারণে অধিক খাটালে সে কিইবা করতে পারে। এজন্যই যারা দারিদ্র্যকে ললাট লিখন নিয়েই জন্মায়, তাদের জীবনে যুক্তিসঙ্গত মজুরি, যুক্তিসঙ্গত সময় পর্যন্ত কাজ করার অধিকার বাস্তবের মুখ খুব একটা দেখতে পায় না।

এশিয়া ও আফ্রিকার এবং লাতিন আমেরিকার অনেক দেশে অনির্ধারিত সময়ের জন্য কাজ করার চুক্তি এখনো করা হয়। দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে মানুষ টাকা কর্জ নেয় বিত্তবানদের কাছ থেকে। এবং চুক্তি করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কর্জদাতার টাকা শোধ করতে না পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত কাজ করেই যাবে। কাজের সময়ের যুক্তিসঙ্গত সীমা সেখানে মানতে যায়

www.pathagar.com

কে? কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় বছরের পর বছর চলে যাচ্ছে, টাকা আর শোধ হচ্ছে না। কাজের সময়ের যুক্তিসঙ্গত সীমা মেনে চলার ধার ধারে না ওরা। অভিযোগ করা হয় যে, অনেক উন্নত দেশেও প্রতিবছর হাজার হাজার লোক এ ধরনের কাজ করে। এই শতাব্দীর শুরুতে পৃথিবীর সিংহভাগ সম্পদ জমা ছিল গুটিকতক ধনী রাষ্ট্রের হাতে, যারা ঔপনিবেশিকতার জাল বিস্তার করেছিল দুনিয়া ব্যাপী। ১৯১৪ সালে বৃটেনের উপনিবেশের বিস্তার ছিল সেই দেশের মোট আয়তনের চেয়ে ১০০ গুণ বড়। বৃটেন বাসীর মাথাপিছু ছিল আট জন করে পদানত মানুষ। ফরাসি উপনিবেশ ছিল তাদের আয়তনের চেয়ে ২১ গুণ বড় এবং জার্মানির উপনিবেশ ছিল সে দেশের চেয়ে ছয় গুন বড়। এই সব ঔপনিবেশিক প্রভুরা তাদের পদানত রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ ও জবরদস্তিমূলক শোষণ চালিয়েছে। অর্থনৈতিক পীড়নে বিপন্ন করেছে উপনিবেশের অধিবাসীদের জীবন। ঔপনিবেশিক শাসনের যাঁতাকল থেকে মুক্ত হয়েছে বটে কিন্তু ভাগ্যের পরিবর্তন হয় নি এদের। এখন শোষণের রূপ খানিকটা ভদ্রোচিত হয়েছে। জীবনের দুর্গতি মোচনের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার পথে এরা হাজার বাধার মুখামুখি। ক্ষুধা, অপুষ্টি, বঞ্চনা এদের জীবনের নিত্য সঙ্গী। তাই কাজের সময়ে যুক্তিসঙ্গত সীমা বাস্তবে ভোগ করার স্বপ্ন এরা সব সময় দেখতে পারে। সময়সীমার চেয়েও এদের কাছে মুখ্য বিষয় কাজ পাওয়া, মজুরি পাওয়া।

বস্তুত মানুষ কাজ করবে। কাজ করবে নিজের জীবনের জন্য, সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সভ্যতার ইতিহাস রচিত হয়েছে মানুষেরই শ্রমে ও ঘামে। মানুষ কাজ করবে না এমন দাবি কেউ করে না, কেউ এমন আবদার জানায় না। মানুষের দাবি হচ্ছে কাজের ফাঁকে ফাঁকে অবসর বিনোদন ও বিশ্রামের। এজন্য চাই কাজের সময়ের যুক্তিসঙ্গত এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর ছুটি।

বিশ্রাম, ছুটি, অবসর বিনোদন এসব মানুষের অধিকার। কাজের সময়ের যুক্তিসঙ্গত সীমা মেনে চলাও আমাদের অধিকার। কোন অজুহাতেই এই অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা যাবে না।

গৃহভৃত্য ও গৃহপরিচারিকা

উপমহাদেশের বিভিন্ন দেশ বিশেষত ভারত বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের স্বচ্ছল পরিবারসমূহ তাদের পারিবারিক ও গৃহকর্ম সম্পাদনের জন্য কাজের লোক নিয়োগ করে থাকে। সাধারণত অন্দরমহলের কাজ অর্থাৎ রান্নাবান্না কাপড়-চোপড় ধোয়া ইত্যাদির জন্য গৃহপরিচারিকা রাখা হয়। গৃহপরিচারিকাদের দাসী, ঝি, চাকরানি, ঠিকে ঝি, সেবিকা, বাঁদী, বান্দী ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। বহিঃবাটির কাজ সম্পাদনের জন্য রাখা হয় গৃহভৃত্য, যাদের চাকর, দাস, নোকর, কাজের লোক ইত্যাদি নামে ডাকা হয়। এই উপমহাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় এই চরিত্রটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একসময় এটা ছিল প্রচ্ছন্ন আভিজাত্যের প্রতীক। যার

www.pathagar.com

যত বেশি চাকর চাকরানি, দাস-দাসী, গোলাম-বাদি ছিল তিনি ছিলেন ততবেশি অভিজাত, তত বেশি সম্মানের পাত্র। কন্যা বিয়ে দেয়ার সময় বাদি সাথে দিয়ে দেয়া হতো, আজও এদেশের গ্রামে এই দৃশ্য চোখে পড়ে। নববধূর সাথে সাময়িকভাবে হলেও একজন কাজের মেয়ে দেয়া হয়।

এই গৃহভৃত্য বা চাকর, এরা বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। কেউ উত্তরাধিকার সূত্রের কোন পরিবারে চাকর চাকরানি, দাস-দাসী, হিসেবে কাজ করছে। হয়তো তার মা বাবা এই পরিবারে কাজ করতো, সেও করেই যাচ্ছে। অবশ্য এ অবস্থার এখন খানিকটা পরিবর্তন হয়েছে। এখন আগের মতো উত্তরাধিকার সূত্রে গোলামি করার মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে। মানুষের মধ্যে স্বাধীনচেতা মনোভাব জাগ্রত হয়েছে তাই মানুষ এখন আর সেভাবে জীবনযাপন করতে চায় না এবং এ ব্যাপারে তাকে বাধ্য করার কোন উপায় নেই।

আরেক ধরনের গৃহভৃত্য আছে, যারা মাস বা বৎসরের জন্য কাজের চুক্তিবদ্ধ হয়। এদের খাওয়া থাকা এবং সুনির্দিষ্ট মাহিনা থাকে। এদের নির্দিষ্ট সময়ের পর কাজ পরিবর্তন, কর্মস্থল বদলের সুবিধা থাকে। এরা মাস বা বৎসরান্তে বেতন পায়। কেউ কেউ আবার কাপড় চোপড়ও পেয়ে থাকে।

চাকর এবং গৃহভৃত্যদের মধ্যে যারা কিশোর তাদের সাধারণত নির্ধারিত মাইনে থাকে না। এরা খাওয়া পরা ও মাথা গোঁজার ঠাঁই লাভের বিনিময়ে কাজ করে। অনবরত খেটে যাওয়াই এদের কাজ।

গৃহভৃত্য ও কাজের লোক যে ধরনেরই হোক, তাদের বিশ্রাম ও অবসর বিনোদনের কোন উপায় নেই। এ অঞ্চলে এই ধারা দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছে যে, সূর্যোদয়ের আগে বাড়ীর কেউ ঘুম থেকে না জাগতেই তাকে জাগতে হবে এবং শুরু করতে হবে তার দিনের কাজ, বাড়ির সকলে ঘুমোতে গেলে ঘরের সবকিছু সেরে তারপর তাকে ঘুমোতে যেতে হবে। এই হচ্ছে আমাদের দেশসহ এতদঞ্চলের গৃহপরিচালিকার অবসরবিহীন জীবন। পরিশ্রমের রকমফের আছে, কোথাও কম পরিশ্রম করতে হয়। আবার কোথাও বেশি কিন্তু সকল গৃহপরিচারিকার একটি ক্ষেত্রে মিল আছে সে হচ্ছে, সকলকেই নিরবচ্ছিন্নভাবে অনবরত কাজ করেই যেতে হয়। বিরাম নেই বিশ্রাম নেই, ছুটি নেই, অবকাশের আনন্দ নেই। বৈচিত্র্যহীন নিরানন্দ জীবন। ছুটি অবসর, কাজের সময়ের যুক্তিসঙ্গত সীমা, সবেতন ছুটি, বিশ্রাম, বিনোদন এসব তাদের জীবনে স্বপ্নের মতো। কিছু কিছু লোক হয়তো সে অধিকার ভোগ করে তবে তা নিতান্তই ব্যতিক্রম।

যেমনি গৃহপরিচারিকা তেমনি গৃহভৃত্যের দশা। গ্রাম এবং নগর জীবনের গৃহভৃত্যদের কাজকর্ম, জীবনধারা এবং সুখসুবিধার মধ্যে খানিকটা পার্থক্য আছে। গ্রামের গৃহভৃত্যরা সাধারণত কৃষিশ্রমিক। ঘুম থেকে উঠে জমি চাষ করা থেকে শুরু করে চাষাবাদের সকল কাজই তাদেরকে করতে হয় বিরতিহীনভাবে। তাদের কাজ অবসর ছোটাছুটি ইত্যাদির কোন বালাই

www.pathagar.com

নেই। কাজ না থাকলে বেতন নেই এই হচ্ছে তাদের দশা। আরো মর্মান্তিক হচ্ছে এই যে, বৎসরের যে সময়টাতে কৃষি কাজ থাকে না তখন তারা বেকারত্বে নিমজ্জিত হয়। গৃহভৃত্যদের যেমনি নাই বিশ্রামের অবকাশ, তেমনি নাই বিনোদনের অবসর। সবেতন ছুটি, কাজের সময়ের যুক্তিসঙ্গত সীমা তারা সাধারণই ভোগ করতে পারে না।

প্রাসঙ্গিক বোধে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার (ILO) কনভেনশন (সংশ্লিষ্ট অংশ) পরিবেশিত হলো :

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা

কনভেনশন—১

শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্যকাল সীমা দৈনিক আট ঘণ্টা ও সাপ্তাহিক আটচল্লিশ ঘণ্টা নির্ধারণী।

১৯১৯ সালের ২৯শে অক্টোবর ওয়াশিংটনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক আহুত আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার সাধারণ অধিবেশনে দৈনিক আট ঘণ্টা বা সাপ্তাহিক আটচল্লিশ ঘণ্টা কার্যকাল প্রয়োগ নীতির প্রস্তাবাবলী গ্রহণের, তথা ওয়াশিংটনের অধিবেশনের প্রথম আলোচ্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণান্তে এবং এই প্রস্তাবাবলিকে একটি আন্তর্জাতিক কার্যকাল কনভেনশন ১৯১৯ বলিয়া উল্লেখিত, আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার সংবিধানের বিধিমতো উক্ত সংস্থার সদস্যদের অনুসমর্থনের জন্য নিম্নবর্ণিত কনভেনশন গৃহীত হয়।

ধারা-১

১. এই কনভেনশনের জন্য "শিল্প প্রতিষ্ঠান" শব্দে অন্তর্ভুক্ত হইবে বিশেষত :

(ক) খনি, প্রস্তর খনি এবং ভূগর্ভ হইতে খনিজ পদার্থ নিকর্ষণমূলক অন্যান্য কার্য।

(খ) জাহাজ নির্মাণ, বিদ্যুৎ বা অনুরূপ চালিকা শক্তি উৎপাদন, রূপান্তর ও পরিবহণসহ বিভিন্ন দ্রব্যাদি প্রস্তুত, পরিবর্তন, পরিশোধন, সংস্কার, অলংকরণ, প্রান্তিক উৎকর্ষ বিধান, বিক্রয়োপযোগীকরণ, ভাঙ্গন বা যেখানে দ্রব্যাদির রূপান্তর করা হয় এমন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ।

(গ) যে কোন ভবন, রেলওয়ে, ট্রামওয়ে, পোতাশ্রয়, ডক, জেটি, খাল, অভ্যন্তরীণ জলপথ, সুড়ঙ্গ পথ, পুল, উপত্যকার উপর নির্মিত পথ বা রেলওয়ে পথ, পয়ঃপ্রণালী, নালা, কূপ, তার ও দূরালাপনী, বিদ্যুৎ গ্যাস ও জল সরবরাহ বা অনুরূপ নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, সংরক্ষণ সংস্কার, পরিবর্তন বা ভাঙ্গন এবং এতদসমূহের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন বা অনুরূপ কোন নির্মাণকার্য।

(ঘ) হস্ত বাহিত পরিবহণ ব্যতীত, সড়ক, রেলপথ, সমুদ্রপথ বা অভ্যন্তরীণ জলপথে যাত্রী বা মালপত্র পরিবহণসহ ডক, অবতরণস্থল, ঘাট বা পণ্যাগার মালপত্র পরিবহণ সংক্রান্ত কার্য।

www.pathagar.com

২. সমুদ্রপথ ও অভ্যন্তরীণ জলপথে পরিবহণ সংক্রান্ত বিধি সমুদ্র পথ ও আভ্যন্তরীণ জলপথে নিয়োগ সংক্রান্ত বিশেষ সম্মেলনে নির্ধারিত হইবে।

৩. প্রত্যেক সদস্য দেশের যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষ শিল্প প্রতিষ্ঠান হইতে বাণিজ্য ও কৃষির পার্থক্য নির্দেশ করিবে।

ধারা-২

এতদপর বর্ণিত বিধান ব্যতিরেকে একই পরিবারভুক্ত সদস্যরা যে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত আছেন, এমন প্রতিষ্ঠান ব্যতীত সরকারি বা বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে বা উহার কোন শাখায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের কার্যকাল দৈনিক আট ঘণ্টা এবং সপ্তাহে আটচল্লিশ ঘণ্টার অতিরিক্ত হইবে না :

(ক) এই কনভেনশনের বিধিসমূহ, তত্ত্বাবধান কার্যে বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষীয় পদে নিয়োজিত ব্যক্তি বা গোপনীয় দায়িত্ব সম্পাদনে রত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না ;

(খ) যেখানে আইন, প্রথা বা মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী কিংবা যেখানে ঐ ধরনের কোন সংগঠন নাই, সেখানে মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী, সপ্তাহের এক বা একাধিক দিবসে কার্যকাল আট ঘণ্টার কম হয়, সেখানে যথোপযুক্ত সরকারি কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ক্রমে অথবা অনুরূপ সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের সম্মতিক্রমে সপ্তাহের অন্যান্য দিবসে কার্যকালের সীমা আট ঘণ্টার অধিক করা হইবে এমন শর্ত যে, কোন ক্ষেত্রেই এই অনুচ্ছেদের বিধি অনুযায়ী দৈনিক কার্যকাল আট ঘণ্টার সীমার বাহিরে এক ঘণ্টার বেশি বর্ধিত করা যাইবে না।

(গ) যেখানে পালা অনুযায়ী লোক নিয়োগ করা হয়, সেখানে যে কোন দিবসে আট ঘণ্টার অধিককাল এবং যে কোন সপ্তাহে আটচল্লিশ ঘণ্টার অধিককাল পর্যন্ত লোক নিয়োগ অনুমোদন যোগ্য হইবে, যদি তিন সপ্তাহ বা কম সময়ের মধ্যে কার্যকালের গড় দৈনিক আট ঘণ্টা এবং সাপ্তাহিক আটচল্লিশ ঘণ্টার অধিক না হয়।

ধারা-৩

ধারা ২-এ নির্দেশিত কার্যকালের সীমা বাস্তব বা সম্ভাব্য দুর্ঘটনা বা যন্ত্রপাতি বা কারখানার জরুরি সংস্কার বা উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রয়োজনে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। কিন্তু শুধু শিল্পের সাধারণ কর্মতৎপরতায় গুরুতর বাধা এড়ানোর প্রয়োজনেই উহা করা যাইতে পারে।

ধারা-৪

যে সব প্রক্রিয়ায় স্বভাবতই পালাক্রমে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ চালু রাখিতে হয়, সেই সব প্রক্রিয়ায় ধারা-২-এ নির্দেশিত কার্যকালের সীমা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে এই শর্তে যে, গড়

www.pathagar.com

সাপ্তাহিক কার্যকাল ছাপ্পান্ন ঘন্টার বেশি হইবে না। এই ধরনের কার্যকাল নিয়ন্ত্রণ বিধি কোন অবস্থাতেই জাতীয় আইনে শ্রমিকদের সাপ্তাহিক ছুটির পরিবর্তে প্রাপ্ত বিশ্রাম দিবস বিঘ্নিত করিতে পারিবে না।

ধারা-৫

১. যে সব ব্যতিক্রমীক্ষেত্র ধারা ২-এ নির্দেশিত বিধি কার্যকর করা যাইবে না বলিয়া বিবেচিত হয় কিন্তু শুধু সে সব ক্ষেত্রে সরকার সেইভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, শ্রমিক ও মালিক সংগঠনের মধ্যে দীর্ঘতর সময়ের জন্য দৈনিক কার্যকালের সীমা সম্পর্কিত চুক্তিকে বিধিগত বলবৎ প্রদান করা যাইতে পারে।

২. এই ধরনের কোন চুক্তি যত সপ্তাহ যাবৎ কার্যকর থাকে, সেই সব সপ্তাহে কার্যকাল গড়ে আটচল্লিশ ঘন্টার অধিক হইবে না।

ধারা-৬

১. শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকারি কর্তৃপক্ষের নিয়মাবলীতে থাকিবে :

(ক) প্রতিষ্ঠানের সাধারণ কার্যক্রমের নির্দেশিত সীমার বাহিরে প্রাথমিক বা পরিপূরক কার্য সম্পাদনের জন্য স্থায়ী ব্যতিক্রমসমূহ অথবা সবিরাম কার্য সম্পাদনকারী শ্রমিক শ্রেণীগুলির নির্দেশনা ;

(খ) প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে ক্ষেত্র বিশেষে কাজের চাপের মোকাবিলা করিতে পারে তাহার জন্য ব্যতিক্রমী নির্দেশনা ;

২ যদি মালিক ও শ্রমিক সংগঠন থাকে তবে সেই সব সংগঠনের সাথে আলোচনার পর এই নিয়মাবলি গৃহীত হইবে। এই নিয়মাবলিতে প্রতিক্ষেত্রে অতিরিক্ত সময়ের সর্বোচ্চ সীমা নির্দেশিত থাকিবে এবং অতিরিক্ত সময়ের জন্য মজুরি সাধারণ মজুরির $\frac{১১}{৪}$ ভাগের কম হইবে না।

ধারা-৭

১. প্রত্যেক সরকার আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থাকে জানাইবে :

(ক) ধারা ৪-এর আওতায় যে সব প্রক্রিয়াকে নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদন প্রক্রিয়ার শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে তাহার একটি তালিকা।

(খ) ধারা ৫-এ উল্লেখিত চুক্তির কার্যকারিতা সম্বন্ধে তথ্য ; এবং

(গ) ধারা ৬-এর সহিত জড়িত এবং উহার বাস্তবায়ন সম্বন্ধে তথ্য।

২. আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা এই বিষয়ে উহার সাধারণ অধিবেশনে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করিবে।

www.pathagar.com

ধারা-৮

১. এই কনভেনশন এর ধারা প্রয়োগ সহজ করার জন্য প্রত্যেক মালিক কে :

(ক) প্রতিষ্ঠানের প্রকাশ্য জায়গায় বা অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে নোটিশ টানাইয়া বা সরকার অনুমোদিত অন্য কোন উপায়ে উহার দৈনন্দিন কার্য, কখন শুরু হয় এবং কখন শেষ হয় এবং যে ক্ষেত্রে পালাক্রমে কারখানা চলে, সে ক্ষেত্রে প্রত্যেক পালার সময়সূচি প্রচার করিতে হইবে। এই কার্যকাল কনভেনশনে বর্ণিত সীমা ছাড়াইয়া যাইবে না। এই বিজ্ঞপ্তির সময়সূচি সরকারের অনুমোদন ছাড়া পরিবর্তন করিবে না।

(খ) কার্যকালের মধ্যে বিশ্রামের যে সময় দেওয়া হয় তাহা যে কার্যকালের অংশ হিসাবে গণ্য হয় না তাহা নোটিশ দিয়া জানাইবে।

(গ) সব দেশেই ধারা ৩ ও ৬ অনুযায়ী অতিরিক্ত সময় কাজ করানো হইয়াছে সে সম্বন্ধে সরকারি বিধিমতো তথ্য সংরক্ষণ করিবে।

২। (ক) ও (খ)–এ বর্ণিত সময়ের বাহিরে কাহাকেও নিয়োগ করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ হইবে।

সারসংক্ষেপ

শুধু কর্ম দিয়েই যে মানুষের জীবন ঠাঁসা, সে মানুষ জীবনের কাছে বন্দি। সে বিশ্ব কারাগারের কয়েদি।

মানুষের তাই দাবি আছে যেমনি কর্মের, তেমনি অবসরের, তেমনি বিশ্রামের। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে All work and no play makes jack a dull boy। জীবনের বিকাশের জন্য, স্ফূর্তির জন্য চাই অবসর। এই দাবিকে মানবাধিকাররূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। মানুষের কর্মশক্তিও সীমাহীন নয়। অহোরাত্র সে কর্মে নিযুক্ত থাকতে পারে না। সে কারণে তার কর্মসময় নির্ধারিত থাকা উচিত। প্রতিদিন সে কাজ করবে ছয় থেকে আট ঘণ্টা, রাতে কাজ করলে দিনে ঘুমাবে। শুধু তাই নয়, সে ছুটি পাবে সপ্তাহে বা মাসে বা বছরে নির্ধারিত মেয়াদ অন্তে। এই ছুটির সময় সে বেতন পাবে। এটিও তার মানবাধিকার।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

(ক) প্রত্যেকেরই নিজের ও নিজ পরিবারের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের নিমিত্তে পর্যাপ্ত জীবনমানের অধিকার রয়েছে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সামাজিক সেবামূলক কার্যাদির সুযোগ, এবং বেকারত্ব, পীড়া, অক্ষমতা, বৈধব্য, বার্ধক্য অথবা অনিবার্য কারণে জীবন যাপনে অন্যান্য অপারগতার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

(খ) মাতৃত্ব ও শৈশব অবস্থায় প্রত্যেকে বিশেষ যত্ন ও সহায়তা লাভের অধিকারী। বৈবাহিক বন্ধনের ফলে বা বৈবাহিক বন্ধনের বাহিরে জন্ম হোক না কেন, সকল শিশুই অভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা ভোগ করবে।

Article : 25. (1) Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social service, and the right to security in the event of unemployment sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.

(2) Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

ভাষ্য

আলোচ্য অনুচ্ছেদের মূল বিষয় হচ্ছে—
নিজের ও নিজ পরিবারের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের নিমিত্তে পর্যাপ্ত জীবনমানের অধিকার।
এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে—

ক. খাদ্যের অধিকার
খ. বস্ত্রের অধিকার
গ. বাসস্থানের অধিকার
ঙ. চিকিৎসার অধিকার
চ. প্রয়োজনীয় সামাজিক সেবামূলক কার্যের অধিকার, এবং
ছ. নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে নিরাপত্তার অধিকার।
  ১. বেকারত্ব
  ২. পীড়া
  ৩. অক্ষমতা
  ৪. বৈধব্য
  ৫. বার্ধক্য, এবং
  ৬. জীবন যাপনে অন্যান্য অপারগতার ক্ষেত্রে
জ. মাতৃত্ব ও শৈশবে বিশেষ যত্ন ও সহায়তা লাভের অধিকার
ঝ. সকল শিশুর অভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা ভোগের অধিকার।

আলোচ্য অনুচ্ছেদের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে হলে আমাদেরকে উপরে বর্ণিত অধিকারগুলোর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে। তাই এই বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করা দরকার।

পরিবার কাকে বলে, পরিবারের পরিধি কতটুকু এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা ১৬ নং অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। অতএব, নিজের এবং নিজের পরিবার বলতে কি বোঝায় তা অনুধাবন করতে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। এভাবে আমরা আলোচনা করবো পর্যাপ্ত জীবনমান বলতে কি বোঝায়?

জীবন মান বা জীবন যাপনের মাত্রা একটি আপেক্ষিক বিষয়। তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ, ক্ষুধা দারিদ্র্য যাদের নিত্যসঙ্গী, তাদের জীবনমান আর পশ্চিমের শিল্পোন্নত দেশের মানুষের জীবনমান এক নয়, এক হতে পারে না। যে সব দেশের উৎপাদনের পরিমাণ বেশি, মোট জাতীয় আয় বেশি, সে সব দেশের জনগণের জীবনমান উন্নত। যে সব দেশে জনসংখ্যার পরিমাণ অধিক, মাথাপিছু আয় কম, জাতীয় উৎপাদন ও আয় কম, সে সব দেশের জনগণের

www.pathagar.com

জীবনমান অত্যন্ত নিম্ন। প্রশ্ন হচ্ছে জীবন মান কি? কিসের মাধ্যমে জীবন মান পরিমাপ করা হয়?

খাদ্যের মান ও পরিমাণ, কাপড় চোপড় ও পোশাক পরিচ্ছদের অবস্থা, বাসস্থানের অবস্থা, অবস্থান ও সুযোগ সুবিধা, চিকিৎসা সুবিধা এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামাজিক সেবা প্রাপ্তির সুবিধা ইত্যাদি মিলে নির্ধারিত হয় জীবন মান। খাওয়া পরা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি যত পর্যাপ্ত হবে, জীবন মান তত উন্নত হবে। এসবের যত অভাব হবে জীবনমান তত খারাপ হবে, অনুন্নত হবে। ব্যক্তির জীবনমানের বাহ্যিক নির্ধারকসমূহ হচ্ছে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা সুবিধা এবং অন্যান্য সেবামূলক সুযোগসুবিধা প্রাপ্তির পরিমাণ।

অবশ্য জীবনের মানের আরো কিছু পরোক্ষ নির্ধারক রয়েছে। এগুলো হচ্ছে জাতীয় আয়, জনসংখ্যার পরিমাণ, দ্রব্যমূল্য, উৎপাদনের মাত্রা, আর্থিক অবকাঠামো, ইত্যাদি। কোন দেশের জনগণের জীবন মানের পরিমাণ নির্ভর করে সে দেশের জাতীয় আয়, জনসংখ্যার পরিমাণ, দ্রব্যমূল্যের অবস্থা, উৎপাদনের পরিমাণ ইত্যাদির উপর। জনসংখ্যা বেশি হলে জীবনমান অনুন্নত হবে ; জাতীয় আয় উৎপাদনের মাত্রা বেশি হলে এবং দ্রব্যমূল্য কম হলে জীবনমান উন্নত হবে। আলোচ্য অনুচ্ছেদে উন্নত বা অনুন্নত জীবন মানের কথা বলা হয় নি বলা হয়েছে পর্যাপ্ত জীবন মানের অধিকারের কথা। ততটুকু পর্যাপ্ত, যতটুকু নিজের ও নিজ পরিবারের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের নিমিত্তে প্রয়োজন। এই অধিকার কার্যকর করার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অপরিহার্য।

এক. খাদ্যের অধিকার

খাবারের চাহিদা শুধু মানুষের নয়, অন্যান্য প্রাণীরও আছে। খাবার ছাড়া কোন প্রাণীই বাঁচতে পারে না। তাই বাঁচার জন্য খাবার অপরিহার্য। মানুষের খাবার দরকার, অন্য প্রাণীরও দরকার। কিন্তু মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে এক্ষেত্রে একটি মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে এই যে, মানুষ খাবার উৎপাদন করে, সঞ্চয় করে, সংরক্ষণ করে ; কিন্তু অন্যান্য প্রাণী অবারিত প্রকৃতি থেকে তাদের খাদ্য সংগ্রহ করে। বন্য প্রাণী বন থেকে নিজের খাবার সংগ্রহ করে আর গৃহপালিত প্রাণীর খাবারের যোগান দেয় মানুষ। প্রকৃতিতে মানুষের ও খাবার আছে কিন্তু তা চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। তাই মানুষ খাবার উৎপাদন, সঞ্চয় ও সংরক্ষণ করে।

সম্পদ সঞ্চয়, সংরক্ষণ এবং মালিকানা ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর থেকেই সম্পদ কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। উৎপাদন এবং বন্টন ব্যবস্থা এমন হয় যে, ক্রমশ সম্পদ কিছু মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত হতে থাকে এবং কিছু মানুষ হয়ে যায় সম্পদহীন বা নিঃস্ব। অনেক সময় দেখা যায় পর্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য থাকার পরও কিছু লোক ঠিকমতো খাবার পাচ্ছে না, দারিদ্র্যের কারণে অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাতে হচ্ছে মানুষকে। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের এবং নিজ পরিবারের সদস্যদের ন্যূনতম খাবারের নিশ্চয়তার অধিকার রয়েছে।

www.pathagar.com

খাবারের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য দুটি বিষয় অপরিহার্য। প্রথমত, খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি। পৃথিবীতে যত মানুষ আছে সকলের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করতে হবে। এই শতাব্দীর গেল দশক পর্যন্ত বিশ্বের উন্নত দেশসমূহ তাদের উৎপাদনের উপায় উপকরণের অধিকাংশই নিয়োজিত করেছে সমরাস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে। খাদ্য উৎপাদনের পরিবর্তে অস্ত্র উৎপাদনেই তারা নজর দিয়েছে বেশি। ফলে বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের মানুষ প্রচণ্ড খাদ্য ঘাটতির শিকার হয়েছে। ক্ষুধা এবং দারিদ্র্য ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী। বিশ্বের জনগণের খাদ্যের চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজন বিপুল পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন করা। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে মানবতার ধ্বংসের পথে ব্যবহার না করে তাদের খাবারের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য ব্যবহার করতে হবে, কাজে লাগাতে হবে। সকলের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করতে পারলেই মানুষের খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত করা যাবে।

খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য দ্বিতীয় যে বিষয়টি দরকার, সেটা হচ্ছে উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্য বণ্টনের ব্যবস্থা করা, যাতে খাদ্যদ্রব্যের প্রবাহ গতিশীল হয়। পর্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য থাকা সত্ত্বেও মানুষ না খেয়ে থাকে এটা হয় একমাত্র যথার্থ বণ্টনের অভাবে। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য যত কম হবে এবং মূল্য যতটা স্থিতিশীল থাকবে মানুষের পক্ষে তা সংগ্রহ করা ততটা সুবিধা হবে। অবশ্য এর জন্য মানুষের উপার্জন ও ক্রয় ক্ষমতা থাকতে হবে। পৃথিবীর অনেক দেশে, বিশেষ করে শিল্পোন্নত দেশসমূহে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত থাকে অন্য দিকে তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশসমূহে থাকে খাদ্যঘাটতি। উন্নত দেশসমূহে খাদ্য রাজনীতির শিকার হয় তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র্য মানুষজন। ফলে বিশ্বের সকল মানুষ খেতে পায় না, খাদ্যের অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হয়।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রতিটি মানুষের খাদ্যের অধিকার রয়েছে। মানুষের যে তিনটি অপরিহার্য মৌলিক প্রয়োজন রয়েছে এর মধ্যে সর্বপ্রথমটি হচ্ছে অন্নের চাহিদা। এই অধিকার কেড়ে নিলে তার বেঁচে থাকার কোন উপায় থাকে না।

খাদ্যের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, আহার্য হিসেবে গৃহীত যে সমস্ত বস্তু প্রাণীদেহে শক্তি যোগায়, দেহ গঠনে অংশ নেয়, ক্ষয় পূরণে সাহায্য করে দৈহিক কাজের স্বাভাবিকত্ব বজায় রাখে তাকেই খাদ্য বলে।

খাদ্যে বহুবিধ উপাদান আছে। পৃথিবীর যতরকম খাদ্য আছে তাদের বিশ্লেষণ করলে এতে ৬টি রাসায়নিক উপাদান পাওয়া যায় । সেগুলো হচ্ছে —

১. শর্করা (Carbohydrates)
২. আমিষ (Protein)
৩. তৈল (Fats and Oils)
৪. খনিজ লবনাদি (Mineral Salts)

www.pathagar.com

৫. ভিটামিন (Vitamins)

৬. পানি (Water)

এই উপাদানগুলো কোথায় পাওয়া যায় এবং এসবের কাজ কি, নিম্নে সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হচ্ছে—

১. শর্করা : ভাত, রুটি, আলু, সুজি, চিনি, গুড়, ফল শাকসব্জি, মধু ইত্যাদি থেকে শর্করা পাওয়া যায়। শর্করা জাতীয় খাদ্য, দেহের তাপ শক্তি বৃদ্ধি এবং কর্মশক্তি যোগাতে সাহায্য করে। বাংলাদেশীদের প্রধান খাদ্য শর্করা। অল্প খরচে শর্করা প্রচুর শক্তি সরবরাহ করে।

২. আমিষ : মাছ মাংস, ডিম, ছানা প্রভৃতি প্রাণীজ খাদ্য এবং মটরশুঁটি, বাদাম, ডাল, পেস্তা, আখরোট, সয়াবিন ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ খাদ্য থেকে আমিষ পাওয়া যায়। খাদ্য হিসেবে আমিষই প্রধান খাদ্য। ক্রমবর্ধমান শিশু কিশোরদের দেহে এর চাহিদা সর্বাপেক্ষা বেশি। কারণ আমিষ দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি ঘটায়। শরীর গঠনে এটি খুবই জরুরি।

৩. তৈল : সয়াবিন, বাদাম, সরিষা, তিল, সূর্যমুখীর বীজ, ভুট্টার দানা, নারিকেল , জলপাই প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ দ্রব্য এবং পণির, চর্বি, ঘি, মাখন, ডিমের কুসুম, কড মাছের যকৃতের তেল প্রভৃতি প্রাণীজ দ্রব্য থেকে তৈল বা স্নেহ জাতীয় উপাদান পাওয়া যায়। এসব খাদ্য অফুরন্ত শক্তির উৎস। ইহা দেহের কর্মশক্তি যোগায় এবং দেহে তাপ সঞ্চারে সাহায্য করে। এই শক্তির মাত্রা শর্করা থেকে উৎপন্ন শক্তির দ্বিগুণ। দেহের ভেতরে অনেক অঙ্গ স্নেহ পদার্থের প্রলেপে ঢাকা থাকে। ফলে বাইরের আঘাত লাগলেও ঐসব অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

৪. খনিজ লবনাদি : বিভিন্ন ধরনের খাদ্য ও পানির মাধ্যমে এটা গৃহীত হয়। এটা মানব দেহের রক্ত ও অন্যান্য তরল পদার্থের গঠনগত ধর্ম বজায় রাখে। নখ, চুল, ইত্যাদি তৈরিতে, দাঁতের এনামেল গঠনে, ইনসুলিন গঠনে প্রয়োজন হয়। এ ছাড়াও অস্থির অন্যতম উপাদান ফসফরাস লবনেই পাওয়া যায়। এটা স্নায়ুর স্বাভাবিক কাজকর্ম বজায় রাখতে সহায়তা করে।

৬. ভিটামিন : ভিটামিন এক বিশেষ ধরনের জৈব যোগ যা প্রাণী দেহে খুব অল্প পরিমাণে প্রয়োজন হয়, তবে এর অভাবে দেহের স্বাভাবিক কার্যকলাপে বিঘ্ন ঘটে। মাছের যকৃতের তেল, দুধ, মাখন, ডিম, সব্জি, চাল, গম, ভুট্টা, টমেটো, লেবু জাতীয় ফল. শাক ইত্যাদি থেকে বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন পাওয়া যায়। ভিটামিনের অভাবে চর্মরোগ, রাতকানা, বেরিবেরি, রক্তশূন্যতা, স্কার্ভি প্রভৃতি রোগ হয়।

৬. পানি : জীবকোষের প্রোটোপ্লাজমে ৬৫% থেকে ৯৫% পানি থাকে। দেহকে সতেজ রাখতে পানির প্রয়োজন। অনেক জৈবযোগ কোষস্থিত পানিতে দ্রবীভূত থাকে। পানি ছাড়া রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো সম্পন্ন হতে পারে না।

প্রতিটি মানুষেরই সুষম খাদ্য অত্যন্ত জরুরি। যে খাদ্যে শর্করা, আমিষ, তৈল, খনিজ লবন, ভিটামিন ও পানি প্রয়োজনীয় মাত্রায় থাকে তাই সুষম খাদ্য। সুষম খাদ্যে প্রধান তিনটি খাদ্য উপাদান তথা শর্করা, আমিষ ও তেলের অনুপাত হচ্ছে ৪ ঃ ১ ঃ ১। প্রাপ্ত বয়স্ক একজন

www.pathagar.com

লোকের প্রতিদিন ২৮০০ থেকে ৩০০০ ক্যালরি উত্তাপ দরকার যা সুষম খাদ্য থেকে মানুষ আহরণ করে। কিন্তু অভাব ও দারিদ্র্যের কারণে পৃথিবীর বিপুল সংখ্যক মানুষ সুষম খাদ্য ও প্রয়োজনীয় ক্যালরি লাভে বঞ্চিত। আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা এবং এশিয়াতেই এ ধরনের দুর্ভাগা মানুষের সংখ্যা বেশি।

বিশ্বে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন

মানুষ যদিও খাদ্যের জন্য বেঁচে থাকে না, তথাপি বেঁচে থাকার জন্য খাবার চাই। খাবার না খেলে যে মানুষ বাঁচে না তার প্রমাণ পৃথিবীর অনেক দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চল। খাবার না পেয়ে পেয়ে ক্রমেই হাড্ডিসার কংকাল হয়ে যাওয়া মানুষের বিভৎস চেহারা প্রতিদিন সংবাদ মাধ্যম আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে ইথিওপিয়া, সোমালিয়া আর সুদান থেকে। এখনো পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষের জীবনের সমগ্র শ্রমের অধিকাংশই ব্যয় করতে হয় খাবার সংগ্রহের জন্য। খাবার চাই, কারণ পরিজনের মুখে খাবার না দিলে সুখের হাসিও উধাও হয়ে যায়। খাদ্য এবং জীবন এক অভিন্ন সুর। একটির অভাবে অন্যটি স্তব্ধ হয়ে যায়।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের রুচি এবং অভ্যাসের যেমন পার্থক্য হয় তেমনি খাবারের ক্ষেত্রেও। পৃথিবীর সকল অঞ্চলের মানুষের খাবার একরকম নয়। তাদের রুচি এবং অভ্যাসে বিস্তর ব্যবধান। আমাদের মতো পৃথিবীর সকল দেশের মানুষেরই ভাত মাছ ডালের প্রতি প্রীতি আছে এটা বলা যায় না। অনেক দেশেই গম প্রধান খাদ্য, কোথাও কলা বা আলু প্রধান খাদ্য। তেমনি আবার একই দেশের খাবারের রুচি সব সময় এক থাকে না। মানুষের রুচি ও অভ্যাসের পরিবর্তন হয়, হতে পারে। আমাদের দেশে যেমনি স্বাধীনতা উত্তরকালে গমের প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়েছে। মানুষের খাবারের রুচি এবং অভ্যাস এক হলে সেটা হতো এক বড় বিপদ কারণ একই জিনিস উৎপাদন হতো বেশি এবং সেটার উপর চাপ পড়ে যেতো। তার চেয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের রুচি অভ্যাস বিভিন্ন হওয়ায় মানুষের খাবারের চাহিদা মেটানো অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছে।

মানুষের খাবার প্রধানত দুটি উৎস থেকে পাওয়া যায়। (১) উদ্ভিদ, (২) প্রাণী। পৃথিবী পৃষ্ঠের বিস্তীর্ণ সমতলভূমি, পার্বত্য অঞ্চল এবং জলভাগ থেকে মানুষ তার বহুবিধ খাবার উৎপাদন ও আহরণ করে। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদিত অধিকাংশ উদ্ভিদজাত এবং প্রাণীজ সম্পদই খাবার হিসাবে পরিগণিত হয়। যেমন—ধান, গম, ভুট্টা, রাই, বীট, যব, তৈলবীজ, শাকসব্জি, ফলমূল এবং গৃহপালিত পশুপাখি, জীবজন্তু ইত্যাদি। পার্বত্য অঞ্চলে রয়েছে বহুবিধ পশু পাখি জীবজন্তু যার মাংসে মানুষের জন্য উত্তম খাবার। আর আছে নদ-নদী খালবিল, পুকুর এবং সমুদ্রের অসংখ্য মাছ। এসব দিয়েই মানুষ উদর পূর্তি করে বলে আমরা এসবকে বলি খাদ্যদ্রব্য। প্রকৃতির দান এই বিস্তীর্ণ ভূভাগে বিপুল পরিমাণ খাবার আছে মানুষের জন্য। এসবের মধ্যে কিছু মানুষ প্রকৃতি থেকেই পায় আর কিছু উৎপাদন করে। পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে কি কি খাদ্য দ্রব্য উৎপন্ন হয় নিম্নে এর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো।

www.pathagar.com

ইউরোপ

সমগ্র ইউরোপ কৃষিকাজের অনুকূল না হওয়া সত্ত্বেও এই মহাদেশই কৃষিক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে উন্নত। চেকোশ্লোভাকিয়া, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, ইউক্রেন এবং রাশিয়ার উত্তর ককেসাস ও ভলগা নদীর অববাহিকায় গমের ব্যাপক চাষ হয়। গম উৎপন্ন হয় ফ্রান্স, জার্মানি এবং যুক্তরাজ্যেও। স্পেন, পর্তুগাল, ও ইতালিতে ধানের চাষ হয়। প্রায় সব দেশেই আলু উৎপন্ন হয়। পশ্চিম ইউরোপ এবং ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলে আঙ্গুর, কমলালেবু, আপেল, নাসপাতি প্রভৃতি প্রচুর পাওয়া যায়। স্পেন, ইতালি এবং গ্রিসে আখরোট, জলপাই, ডুমুর, কমলালেবু বাদাম প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

ইউরোপের তুন্দ্রা অঞ্চল ও আল্পস পার্বত্য অঞ্চলে অনেক জীবজন্তু পাওয়া যায় । এ ছাড়া বিভিন্ন শ্রেণীর গরু ও মেষ প্রতিপালিত হয়। ইউরোপের উপকূলে প্রচুর মৎস আহরিত হয়। বস্তুত খাদ্যদ্রব্যে ইউরোপ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ অঞ্চল।

এশিয়া

এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশ কৃষিতে খুবই সমৃদ্ধ। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বিপুল পরিমাণ ধান, গম, যব, ভুট্টা, আখ, ডাল, তেলবীজ, নারকেল, বাজরা, ফলমূল উৎপাদিত হয়। পার্বত্য অঞ্চল ও বনজঙ্গলে বিপুল সংখ্যক জীবজন্তু ও পশুপাখি রয়েছে। মরুভূমিসহ সারা এশিয়াতেই গৃহপালিত পশু পালন করা হয়। নদনদী এবং সমুদ্র উপকূল থেকে প্রচুর মৎস্য আহরণ করা হয়, দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশেই বিপুল পরিমাণ ধান উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এ অঞ্চলের কোন কোন দেশকে ব্যাপক খাদ্যঘাটতির মোকাবেলা করতে হয়। তদুপরি জনসংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধির ফলে চারণভূমি বিলুপ্ত হওয়ায় পশুপালন হ্রাস পাচ্ছে। এতে মাংসের সরবরাহও কমে গেছে। অধিক জনসংখ্যা, বৈরী প্রকৃতি এবং মান্ধাতা আমলের কৃষিপদ্ধতির কারণে এশিয়ার খাদ্য সংকট পুরোপুরি দূরিভূত হয় নি। তদুপরি বন্টন ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় সকলের খাবার পাওয়ার নিশ্চয়তা আসে নি।

আফ্রিকা

জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার কারণে আফ্রিকার কৃষি বিশেষ উন্নত নয়। বিস্তীর্ণ মরুভূমি, নিবিড় অরণ্য এবং সুউচ্চ মালভূমির কারণে আফ্রিকাতে কৃষিকাজ অত্যন্ত কঠিন। তবুও অধিকাংশ মানুষকেই কৃষি এবং পশুপালনের উপর নির্ভর করতে হয়। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে গম, যব, ভুট্টা, আখ এবং কলা, আঙ্গুর, ডুমুর, পিচ, লবঙ্গ প্রভৃতি উৎপাদন হয়। মেষ ছাগল, গরু প্রভৃতি পশুপালন আফ্রিকার মালভূমি অঞ্চলের পশুপালক সম্প্রদায়ের প্রধান উপজীবিকা। বর্ষা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস যেমন এশিয়ার জনজীবনকে বিপন্ন করে আফ্রিকাকে তেমনি বিপন্ন করে খরা । খরা আফ্রিকার অধিবাসীদের প্রায়ই দুর্ভিক্ষের মুখে

www.pathagar.com

ঠেলে দেয়। এর উপর আছে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং উপদলীয় ও গোত্রীয় কোন্দল। সব মিলিয়ে খাবারের নিশ্চয়তার অভাব আফ্রিকাতেই সর্বাধিক।

উত্তর আমেরিকা

গম, ভুট্টা, ধান, আখ উত্তর আমেরিকায় প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। দীর্ঘস্থায়ী শীত ঋতুর কারণে কানাডার সুবিস্তৃত সমভূমিতে গমের চাষ হয় প্রচুর। । তাই এই অঞ্চলকে পৃথিবীর রুটির ঝুড়ি বলে। আঙ্গুর, কমলালেবু, আপেল, আনারস, প্রভৃতিও উত্তর আমেরিকাতে প্রচুর পাওয়া যায়। নদীবহুল মহাদেশের ম্যাকেঞ্জি, মিসিসিপি, মিসৌরী প্রভৃতি নদী এবং এসবের শাখা নদী ও উপকূলীয় অঞ্চল থেকে বিপুল মৎস্য আহরণ করা হয়। নদী অববাহিকায় বিস্তীর্ণ চারণ ভূমিতে পশুপালন করা হয়। সব মিলিয়ে উত্তর আমেরিকায় খাবার দ্রব্যের উৎপাদন এবং সরবরাহ আশাব্যঞ্জক।

দক্ষিণ আমেরিকা

দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে কফি, কোকো, আখ, গম ও ধানের চাষ হয়। কলাম্বিয়া, ইকোয়েডর এবং দক্ষিণ ব্রাজিলে বিপুল পরিমাণ কলা চাষ হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচুর ফল পাওয়া যায়। কয়েকটি দেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাংসের জন্য পশুপালন করা হয়। দক্ষিণ আমেরিকার বনভূমিতে প্রচুর জীবজন্তু পাওয়া যায়। আমাজন নদীসহ বিভিন্ন নদী এবং উপকূলে মৎস্য আহরণ করা হয়। খাদ্যদ্রব্যে দক্ষিণ আমেরিকাও যথেষ্ট সমৃদ্ধ।

অস্ট্রেলিয়া

পশুপালনের উপরই অস্ট্রেলিয়া প্রধানত নির্ভরশীল। মাত্র ২ শতাংশ ভূমি কৃষির উপযোগী। এর মধ্যে গম, আখ, ভুট্টা, যব ও অন্যান্য ফলমূল উৎপন্ন হয়। শিল্পোন্নত মহাদেশ হওয়ার কারণে অস্ট্রেলিয়া বহির্বিশ্ব থেকে খাদ্যদ্রব্য আমদানি করে। বিপুল পরিমাণ গরু, ঘোড়া, শূকর ও মেষ প্রতিপালন করা হয় অস্ট্রেলিয়ায়।

বিশ্বের প্রায় ১১৪টি উন্নয়নশীল দেশের গ্রাম এলাকার প্রায় ১০০ কোটি মানুষ দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছে। বিশ্বের গ্রাম এলাকায় দারিদ্র্য পরিস্থিতির উপর জাতিসঙ্ঘ আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিলের পরিচালিত এক সমীক্ষায় সম্প্রতি জানা গেছে আফ্রিকার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শতকরা ৬৭ ভাগ অর্থাৎ বিশ কোটির বেশি লোক চরম দুরবস্থার মধ্যে রয়েছে। সমীক্ষায় আরো বলা হয়েছে গ্রাম এলাকায় যে সব লোকের আয় ব্যয় জাতীয়ভাবে স্বীকৃত, দরিদ্রসীমার নিচে তাদের হার এশিয়ায় শতকরা ৩১ ভাগ, সাহারান আফ্রিকায় ৬০ ভাগ, লাতিন আমেরিকায় এবং ক্যারাবিয়ান রাষ্ট্রসমূহে ৬০ ভাগ, নিকট প্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় শতকরা ২৬ ভাগ। অতএব বিশ্বের এই একশো কোটি মানুষের চাহিদা প্রয়োজন ও রুচিমতো খাবারের সংস্থান হচ্ছে একথা জোর দিয়ে বলা যায় না।

www.pathagar.com

দুই. বস্ত্রের অধিকার

লজ্জা নিবারণের জন্য কাপড়। কাপড় এখন শুধু লজ্জাই ঢাকে না, এটা রুচিরও প্রতীক। পোশাকের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে একটি জাতির বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য। সেইআদিম যুগে গাছের পাতা এবং ছাল, অথবা পশুর চামড়া দিয়ে শরীর ঢেকে রাখার প্রয়াস থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে মানব জাতির পোশাকের চাহিদা। পোশাক কি শুধু লজ্জা নিবারণ বা ফ্যাশনের জন্যই? হয়তো নয়। কারণ প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বা গরম থেকে বাঁচার জন্যও পোশাক দরকার। গুহাবাসী অরণ্যচারী মানুষও একেবারে সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকে না, কিছু না কিছু দিয়ে তার শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানকে ঢেকে রাখে। মানবজাতির তিনটি অপরিহার্য মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যে বস্ত্র অন্যতম। সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ বস্ত্রের প্রয়োজনকে অস্বীকার করতে পারে না। পোশাকের সাথে স্বাস্থ্যেরও একটা সম্পর্ক আছে। তাই রুচি ও স্বাস্থ্যসম্মত পোশাকের কথা বলা হয়। জন্মের সাথে সাথে পোশাক পরতে শুরু করে মানুষ। আর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এর সমাপ্তি ঘটে। মৃত্যুর পর মানুষকে সমাহিত করতে অথবা দাহ করতেও কাপড় দরকার হয়। কাপড় ছাড়া মানুষের কথা কল্পনাও করা যায় না। মানুষের সাথে পোশাকের, বস্ত্রের সম্পর্ক তাই অবিচ্ছেদ্য। প্রতিটি মানুষের কাপড়ের অধিকার রয়েছে, যে অধিকারকে আমরা বস্ত্রের অধিকার বলি।

বিশ্বের বিপুল পরিমাণ মানুষের বস্ত্রের চাহিদা পূরণের জন্য গড়ে উঠেছে বস্ত্র শিল্প ও পোশাক শিল্প। পাট, তুলা, রেশম, পশম ইত্যাদি থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় কাপড় তৈরি করে মানুষের বস্ত্রের অভাব পূরণ করা হচ্ছে। বস্ত্র ও পোশাক শিল্পকে উন্নত করার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে আধুনিক উন্নত প্রযুক্তি। মানুষের গায়ে উঠছে অতি আধুনিক রঙবেরঙের রকমারী পোশাক। চোখ ঝলসানো এইসব পোশাক মানুষকে আকৃষ্ট করছে, মানুষকে প্রলুব্ধ করছে। পোশাকের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য সৃষ্টি হয়েছে ফ্যাশন শিল্প। ফ্যাশনকারগণ আবহাওয়া, মানুষের রুচি ইত্যাদিকে বিবেচনায় রেখে নিত্যনতুন ফ্যাশন তৈরি করছেন। এই যে এত কাপড়, এতে পোশাক-আশাক, হরেকরকম বাহারি পোশাক পরছে মানুষ তারপরও দেখা যায় অনেকের লজ্জা নিবারণের, শীত নিবারণের কাপড় নেই। কাপড়ের অভাবে মানুষ উলঙ্গ, অর্ধউলঙ্গ অবস্থায় দিনাতিপাত করে। তৃতীয় দুনিয়ার দরিদ্র দেশসমূহের দরিদ্র মানুষেরই এই অবস্থা। দারিদ্র্য তাদেরকে এমনি এক নাজুক পরিস্থিতিতে নিমজ্জিত করে রেখেছে যে, এরা খাবার পায় না, খাবার পেলে কাপড় পায় না, কাপড় পেলে মাথা গোঁজার ঠাঁই পায় না। এমনিভাবে জীবনের ভার বইতে এরা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। অথচ প্রত্যেকেরই বস্ত্রের অধিকার রয়েছে।

বর্তমানে বিশ্বের বস্ত্র শিল্পে ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। বিশ্বে যে পরিমাণ কাপড় উৎপাদিত হচ্ছে তা বিশ্ববাসীর চাহিদা পূরণে মোটেও অপর্যাপ্ত নয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সামর্থ্যের অভাব। প্রয়োজনমতো স্বাস্থ্যসম্মত কাপড় কেনার সাধ্য নেই সকলের। বিশ্বের ১১৪টি দেশের যে ১০০

www.pathagar.com

কোটি মানুষের অবস্থান দরিদ্রসীমার নিচে তাদের কাপড় কেনার সামর্থ্য কোথায়? এক্ষেত্রে মুল সমস্যাটা মানুষের আর্থিক সঙ্গতির। অভাব বলতে হবে। আর্থিক দিক থেকে মানুষ যখন দুরবস্থার মধ্যে থাকে, যখন তার ক্রয়ক্ষমতা একেবারেই থাকে না বিশেষ করে খাবার জোগাতেই যখন মানুষ হয় প্রাণান্ত, তখন আবার কাপড়ের কথা ভাববে কিভাবে? মূলত দারিদ্র্য এবং বণ্টন ব্যবস্থার ত্রুটিই পৃথিবীর বহু মানুষের বস্ত্রের অধিকারের মতো মৌলিক অধিকারটি কেড়ে নিয়েছে।

পৃথিবীর সব মানুষের বস্ত্রের চাহিদা যে পূরণ হয় নি, শীত গ্রীষ্মে দরকারমতো স্বাস্থ্যসম্মত কাপড় যে সকলে পায় নি তার প্রমাণ মিলে তৃতীয় বিশ্বের পথে পথে ছিন্নমূল, ছিন্ন প্রায় অর্ধউলঙ্গ মানুষ দেখলেই। তারপরও বলতে হবে অবস্থা ক্রমেই উন্নতির দিকে। কারণ এখন লজ্জা নিবারণের জন্য মানুষকে গাছের পাতা আর ছালের সাহায্য তেমন একটা নিতে হয় না। নতুন কাপড় না হলেও মানুষ অন্তত পুরোনো কাপড় দিয়ে তার লজ্জা নিবারণ করতে পারছে, পারছে শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচতে।

তিন. বাসস্থানের অধিকার

'ধন নয়, মান নয়—এতটুকু বাসা' এ আকুতিকে তুচ্ছ করার উপায় নেই। সেই আদিকাল থেকেই মানুষ মাথাগোঁজার ঠাঁই অন্বেষণে বিশ্ব পরিক্রমায় রত। সাগর মহাসাগর মরুপ্রান্তর পাড়ি দিয়ে মানুষ ছড়িয়ে পড়েছে দেশ থেকে দেশান্তরে, গ্রাম নগর থেকে শুরু করে তুলেছে ছোট বড় রাষ্ট্র সংগঠন। মাথা গোঁজার আশ্রয় অন্বেষা কিন্তু আজো বিশ্বের বিপুল সংখ্যক মানুষের জন্যই অব্যাহত আছে। তিন মৌলিক চাহিদার তালিকায় খাদ্য বস্ত্রের পরই আশ্রয় বা বাসস্থানের অবস্থিতি।

আমাদের মতো দরিদ্র দেশে যদি হাজার হাজার মানুষকে নিরাশ্রয় ভাসমান জীবন যাপন করতে হয়, তাতে আর অবাক হওয়ার কারণ থাকে না যখন শুনতে পাই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো সমৃদ্ধ সমাজেও লাখ লাখ আশ্রয়হীন মানুষ অসহায় জীবনের যন্ত্রণা বয়ে চলেছে। সমস্যাটি সব দেশেই রয়েছে। তবে এক এক দেশে এক এক মাত্রার।

শীত, তাপ, রোদ, বৃষ্টি, ঝড়, তুফান থেকে বাঁচার জন্য মানুষের বাসস্থান দরকার। বাসস্থান ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। তাছাড়া বাসস্থান সমস্যা মেটানোর তাগিদ অন্য কারণেও অনুভূত হচ্ছে এবং তা ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। ভাসমান মানুষকে কোন শৃঙ্খলায় আনা যায় না, তাদের পেশা স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রভৃতি উন্নয়নের কোন প্রক্রিয়াতেই যুক্ত করা সম্ভব হয় না। ফলে বিশৃঙ্খলাই যে কেবল বাড়ে তাই নয়, জাতীয় উন্নয়নের উদ্যোগকেও পিছনে টেনে রাখে।

সমকালীন বিশ্ব আবাসনকে অসীম গুরুত্ব দিতে আগ্রহী। বিষয়টি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতিসংঘ প্রতিবছরই বিশ্ববসতি দিবস উদযাপন করে আসছে। বাংলাদেশেও অন্যান্য বছরের মতো বিগত ৫ই অক্টোবর '৯২ বিশ্ববসতি দিবস উদযাপিত হয়েছে। গতবারের দিবসের শ্লোগান ছিল, 'স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য আবাসন।'

www.pathagar.com

ঐতিহ্যসিকভাবে দেখতে গেলে দূর অতীতে আবাসন তেমন কোন বড় সমস্যা ছিল না। মানুষ নদীর তীরে, জলাশয়ের কাছাকাছি একটি উঁচু ডাঙ্গা পেলেই তাতে গোটা কয় খুঁটির উপর লতাপাতার চালা তুলে দিব্যি জীবন কাটিয়ে দিতে পারে। আয়াসসাধ্য দালানকোঠার স্বল্পতা কেবল এ অঞ্চলের মানুষের শ্রমবিমুখতারই ফল নয়। এর সঙ্গে প্রকৃতিরও যোগ রয়েছে। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এদেশে শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্য পুরু দেয়ালের প্রয়োজন হতো না। আর ঘর বাঁধার উপযোগী জমি এবং প্রাকৃতিক উপায় উপাদানের কোন ঘাটতি ছিল না। তাই এ অঞ্চলে কাঁচা ঘরই সুখের আবাসনের মর্যাদা পেয়েছে।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই আবাসনের সাথে সাংবিধানিক অঙ্গিকার জড়িত। আবাসন সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়ে সব নাগরিকের গৃহসংস্থানকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব বলে স্বীকার করা হয়েছে। তবে সাংবিধানিক অঙ্গীকারই বড় কথা নয়। এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। মানুষ যদি গৃহহীন হয়, মানুষের আবাসন ব্যবস্থা যদি না থাকে তাহলে মানুষ বাঁচবে কি করে? মানুষ এবং পশুর মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে এই যে, মানুষ ঘরে বাস করে, অন্য প্রাণী ঘর ছাড়াও বাঁচতে পারে।

উন্নয়নের উদ্যোগকে অর্থবহ করে তুলতে হলে আবাসনের নিশ্চয়তা দিতে হবে। বিশ্বের বিভিন্ন দিকে চোখ ফেরালে দেখা যাবে যাযাবর জাতিসমূহ আজ স্থায়ী আবাসন গড়ে তোলায় মন দিয়েছে। সেক্ষেত্রে গৃহী মানুষ যদি ক্রমেই ভাসমানে পরিণত হয়, তাহলে উল্টো স্রোতে উন্নয়নের স্বপ্ন, উন্নত জীবনের স্বপ্ন ভেসে যাবে। সমস্যার এই বিশালত্ব আরো বেড়েছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে। সনাতন উপকরণ দিয়ে আবাসন সমস্যার সমাধান এখন অকল্পনীয়। মাথা গোঁজার আশ্রয়ের জন্য উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার দরকার।

বর্তমান বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, দরিদ্রতা, এবং শিল্পায়ন ও শহরায়নের ফলে বাসস্থান সমস্যা সর্বত্রই প্রকট আকার ধারণ করেছে। তবে এ সমস্যার ভয়াবহতা উন্নয়নশীল দেশগুলোতেই বেশি। বাংলাদেশে এ সমস্যা সর্বাধিক জটিল আকার ধারণ করেছে। কারণ এদেশের শহরাঞ্চলে শতকরা ১৯ ভাগ পাকা, ২৬ ভাগ আধা পাকা, ৩৭ ভাগ কাঁচা, ৬ ভাগ ঝুঁপড়ি এবং ২ ভাগ অন্যান্য জাতের বাসস্থান রয়েছে। শহরের বাসস্থানের ৩৫ শতাংশ বাড়িতে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। এদেশের গ্রামাঞ্চলের ৮০ শতাংশে কাঁচা ১৭.৫ শতাংশে আধা পাকা এবং মাত্র ২.৫ শতাংশে পাকাবাড়ি আছে। এসব বাসস্থানের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগ লোক নিজের বাড়িতে বাস করে। ২২ শতাংশ লোক জরাজীর্ণ বাড়িতে এবং ৭ শতাংশ লোক অন্যের বাড়িতে থাকে। এ থেকেই বাংলাদেশের বাসস্থানের সমস্যার ভয়াবহতা সম্পর্কে আঁচ করা যায়।

বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে অধিকাংশ লোকই ভাড়াবাড়িতে থাকে। এর ফলে তাদের কষ্টার্জিত উপার্জনের সিংহভাগই চলে যায় বাড়ি ভাড়া পরিশোধ করতে। বাসস্থান সমস্যা বাংলাদেশের জনজীবনে ভয়াবহ ও অসহনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। ফলে এটি এদেশে বিরাট সমস্যা হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। এবং অন্যান্য বহুবিধ সমস্যা সৃষ্টিতে সহায়তা করছে। এই সমস্যা সমাধান করে দেশের মানুষের বাসস্থান তথা গৃহের অধিকার নিশ্চিত করা আবশ্যক।

www.pathagar.com

চার. চিকিৎসার অধিকার

মানুষ অসুস্থ হয়, রোগাক্রান্ত হয়। কোন মানুষই হয়তো চিরসুস্থ থাকে না। ছোটবড় কোন না কোন রোগ মানুষকে জীবনে দুএকবার হলেও আক্রমণ করেই। জীবিত মানুষের জন্য অসুখটা তাই অস্বাভাবিক কোন বিষয় নয়। অসুখ অস্বাভাবিক কিছু নয় যদিও, তথাপি অসুখ মানুষের কাম্য নয়। রোগ মানেই যন্ত্রণা। যন্ত্রণা মানুষ পেতে চায় না। তাই রোগ হলেই তাকে সারানোর চেষ্টা চলে। এই চেষ্টা মানুষের চিরন্তন। সেই আদিম কাল থেকেই মানুষ অসুস্থ হলে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন কায়দায় সুস্থ হওয়ার চেষ্টা চালায়। সেই চেষ্টাই হচ্ছে চিকিৎসা। কারো রোগ হলে সেই রোগ নির্ণয় করে তা নিরাময়ের বা উপশমের যে প্রয়াস বা প্রক্রিয়া সেটাকে বলে চিকিৎসা।

চিকিৎসা আদিম কালেও ছিল আজো আছে। তবে পার্থক্য হচ্ছে এই যে আদিম যুগে সেকেলে ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি চালু ছিল। মানুষ গাছের পাতা, ছাল, রস ইত্যাদিকে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করত কিন্তু আধুনিককালে চিকিৎসাবিজ্ঞান অনেক উন্নত হয়েছে। এখন শুধু ওষুধ নয়, রোগ নির্ণয়ের জন্যও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। চিকিৎসা পেশা এখন অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য হয়েছে। অনেক যন্ত্র মানুষের স্থান দখল করেছে। বস্তুত সভ্যতার ইতিহাস যত পুরোনো চিকিৎসা শাস্ত্রও তত পুরোনো। গ্রিক চিকিৎসক হিপোক্র্যাটিস সম্ভবত চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক। সেই গাছ-গাছড়া, গাছের পাতা, শিকড়, ছাল, ফুল, ফল সব কিছু নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে করতে আজ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান এক অভাবনীয় অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে, বিজ্ঞান অনেক অসাধ্যকে জয় করেছে। অনেক মারাত্মক রোগের ওষুধ আবিষ্কার করেছে। অনেক প্রতিষেধকের কল্যাণে বিভিন্ন মহামারী দূর হয়েছে। কিন্তু তাই বলে সকলের চিকিৎসালাভের অধিকার কি নিশ্চিত হয়েছে? সারা বিশ্বে এখনো বিপুল পরিমাণ মানুষ চিকিৎসা সুবিধা থেকে বঞ্চিত। অর্থের সংকটে, সামর্থ্যের অভাবে অনেকের পক্ষেই যথার্থ ও পর্যাপ্ত চিকিৎসা লাভ করা সম্ভব হয় না। অথচ মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুসারে সকলেরই চিকিৎসা সুবিধা পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

বিশ্বের সকলের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ব্যাপক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৪৫ সালে আমেরিকার সানফ্রান্সিসকো শহরে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গড়ে তোলার জন্য আলোচনা ও শেষ পর্যন্ত একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৪৬ সালের জুন মাসে নিউইয়র্ক শহরে অনুষ্ঠিত পরবর্তী সম্মেলনে সংস্থার সংবিধান স্বাক্ষরিত হয়। ৬৪টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি এই সংবিধানে স্বাক্ষর করেন। ১৯৪৮ সালের ৭ই এপ্রিল বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা আত্মপ্রকাশ করে। সেই থেকে ৭ই এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দিবস পালিত হয়। সংক্ষেপে সংস্থাটি (WHO) নামে পরিচিত। বিশ্বব্যাপী এই সংস্থার ৬টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মধ্যে আমাদের নিকটতমটি হচ্ছে ভারতের রাজধানী শহর নতুন দিল্লীতে।

www.pathagar.com

সবার জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা এই সংস্থার প্রধান লক্ষ্য। ২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য-বিশ্ব স্বাস্থ্য পরিষদের এই ঘোষণা বাস্তবায়নের জন্য সংস্থা ১৯৭৭ সাল থেকে নির্দিষ্ট কৌশল ও পরিকল্পনার ভিত্তিতে কাজ করে যাচ্ছে। সকলের জন্য সুস্বাস্থ্য কর্মসূচির ভিত্তি হচ্ছে, প্রাথমিক স্বাস্থ্য বিধি। যে সমস্ত বিষয় এর সাথে জড়িত সেগুলো হচ্ছে স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষাদান, যথাযথ খাদ্য ও পুষ্টির যোগান দেয়া, পানি ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিরাপদ রাখা, সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসংরক্ষণ ইত্যাদি।

১৯৯০ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ৬টি শিশুরোগ দূর করার জন্য বিশ্বব্যাপী তৎপরতা চালিয়েছে। এই ছয়টি রোগ হচ্ছে— ডিপথেরিয়া, হাম, পলিও, টিটেনাস, ক্ষয়রোগ ও হুপিং কফ। শিশু ও ছোট ছেলেমেয়েদের হত্যাকারী ডাইরিয়া দূর করার আন্তর্জাতিক প্রয়াসের সঙ্গেও এই সংস্থা বিশেষভাবে সক্রীয়। ইউ. এন. ডি. পি এবং বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় এই সংস্থা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগের উপর বিশেষ কর্মসূচি ও গবেষণাকর্ম হাতে নিয়েছে। এ রোগগুলোর মধ্যে রয়েছে, ম্যালেরিয়া, কুষ্ঠ, সিসটোসোমিয়াসিস, ফিলিরিয়াসিস, ট্রিপানোসোমিয়াসিস ও সেইসমানিয়াসিস।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিশ্বব্যাপী যে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে, তাতে দুহাজার সাল নাগাদ সবার জন্য সুস্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করতে না পারলেও তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহসহ সমগ্র বিশ্ব কতিপয় মহামারি থেকে রক্ষা পাবে বলে আশা করা যায়।

বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হচ্ছে বিশ্ব স্বাস্থ্য পরিষদ। ১৬৬ সদস্য বিশিষ্ট এই পরিষদ সংস্থার নীতি নির্ধারণ, কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাজেট অনুমোদন এবং এর কার্যাবলী পর্যালোচনা করে। প্রতিবছর পরিষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া রয়েছে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যনির্বাহী বোর্ড। সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে এর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। সংস্থার প্রশাসনিক প্রধান হচ্ছেন মহাপরিচালক।

বাংলাদেশে চিকিৎসা সংকট অত্যন্ত প্রকট। এই সংকট এদেশের জাতীয় জীবনে সজীবতা ও উদ্দীপনা বিনষ্ট করে। বাংলাদেশের ৫০ শতাংশ মানুষ স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগে । পুষ্টিহীনতাই এর প্রধান কারণ। পুষ্টিহীনতার জন্যই রোগশোক আমাদের নিত্যদিনের সাথী। রুগ্ন প্রসূতি আর স্বাস্থ্যহীন শিশু আমাদের উত্তরাধিকার। যত্ন ও পরিচর্যা এবং ওষুধপত্রের অভাবে এদেশের শিশুমৃত্যুর হারও অধিক।

বাংলাদেশে ১০ সহস্রাধিক লোকের জন্য মাত্র একজন ডাক্তার, ৬ হাজারেরও বেশি লোকের জন্য হাসপাতালের একটি বেড, ৪৩ হাজার মানুষের জন্য একজন নার্স বরাদ্দ রয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় আমাদের দেশের জনগণের স্বাস্থ্য সমস্যা ও চিকিৎসা সুবিধার অবস্থা কত ভয়াবহ। পুষ্টি পরিচর্যা ও চিকিৎসার অভাব থেকে সৃষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যা আমাদের ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে ধ্বংস বয়ে নিয়ে আসে। ফলে অকালে জীবন নাশ আমাদের জন্য যেন ললাট লিখনে পরিণত হয়েছে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে চিকিৎসা সংকটের প্রভাব প্রকট। স্বাস্থ্যহীনতার ফলেই এদেশের মানুষ কর্মদ্যোম ও জীবনীশক্তি সহসা হারিয়ে ফেলে, তারা দুর্বল ও অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। তারা অলস ও শ্রমবিমুখ জীবন যাপন করে। এতে মাঠে ঘাটে ফলে কলেকারখানায় উৎপাদন হ্রাস পায়, ফলে জাতীয় আয় কমে, মাথাপিছু আয় হ্রাস পায়। এতে দেশের মানুষ দিন দিন দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ভীষণভাবে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

চিকিৎসা সংকটের জন্য বাংলাদেশের অসংখ্য লোক দীর্ঘদিন রোগভোগের পর মৃত্যুমুখে পতিত হয় অথবা সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। ফলে তারা জীবনের মৌল চাহিদা পূরণের উদ্যম ও ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এতে তারা বাধ্য হয়ে জীবন ধারণের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে। কর্মক্ষমতার অভাবে অনেক লোক বেকার থাকে এবং নির্ভরশীলতার হার বাড়ায় যা জাতীয় অগ্রগতি ও প্রগতির প্রতি হুমকিস্বরূপ।

বস্তুত চিকিৎসা সংকট বাংলাদেশে এক মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এর কুপ্রভাবে দরিদ্রতা, দুর্নীতি, অপরাধ প্রবণতা, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদি বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের কোন দিকই এই সমস্যা থেকে মুক্ত নয়।

দারিদ্র্য, পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, কুসংস্কার, নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য কার্যক্রম, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ঘন ঘন সন্তান প্রসব, বিনোদনের অভাব, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম, শহরমুখী স্বাস্থ্যব্যবস্থা ইত্যাদি আমাদের দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আরো সংকটাপূর্ণ করে তুলেছে।

বাংলাদেশের জনগণের চিকিৎসার অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে হলে দারিদ্র্য দূরীকরণ, পুষ্টিকর ও উন্নত খাবারের নিশ্চয়তা বিধান, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, পরিকল্পিত স্বাস্থ্য কার্যক্রম গ্রহণ, মাতৃমঙ্গল শিশু কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন, পল্লী স্বাস্থ্য সহায়তা কর্মসূচি প্রতিষ্ঠা, উন্নত বাসগৃহ নির্মাণ এবং মহামারী প্রতিরোধ ইত্যাদির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নিরাপত্তা

মানব জীবনের এমন কিছু অবস্থা আছে যা অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও কখনো কখনো অনিবার্য। আমরা রোগ চাইনা তবুও অসুস্থতা আমাদেরকে মাঝে মাঝে গ্রাস করে, বেকারত্ব আমাদের কাম্য নয় তবুও মাঝে মাঝে আমরা এতে নিমজ্জিত হই, অক্ষমতা যা কারোই কাম্য নয়, তাও মানুষকে গ্রাস করে নিমজ্জিত করে ধ্বংসের অতলে। শারীরিক বিভিন্ন পীড়া মানুষের জীবনকে অসহনীয় করে তোলে। তেমনি বৈধব্য, বার্ধক্য এসব কোন কিছুই মানুষের জন্য, অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও, অবাস্তব নয়। তাছাড়া কোন আকস্মিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা মানব জীবনকে এমন অবস্থায় নিপতিত করতে পারে যে, জীবন যাপনে সে অপারগ হয়ে পড়ে। এমনি সব অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থায় নিরাপত্তা লাভের অধিকার আছে প্রত্যেকেরই।

www.pathagar.com

বেকারত্ব, পীড়া, অক্ষমতা, বৈধব্য, বার্ধক্য, অথবা অনিবার্য কারণে জীবন যাপনে অন্যান্য অপারগতা ইত্যাদি হচ্ছে সামাজিক সমস্যা। যদিও সমস্যাগুলোতে ব্যক্তিই আক্রান্ত হয়, ব্যক্তিকেই গ্রাস করে তথাপি তা সমাজেরই সমস্যা।

মানুষকে পরনির্ভরশীলতা, শ্রমবিমুখতা থেকে মুক্ত করে স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তুলতে হলে কাজের দরকার। কাজ না থাকলে বেকার মানুষ পরিশ্রমী ও স্বনির্ভর হতে পারে না। বেকারত্ব থেকে ব্যক্তিকে মুক্তি দেয়া সমাজের দায়িত্ব। তাই বেকারত্ব সামাজিক সমস্যা এবং এই সামাজিক সমস্যা থেকে নিরাপত্তা লাভের অধিকার প্রতিটি মানুষেরই রয়েছে। মানুষকে কাজ দেয়া আর কাজ না দিতে পারলে বেকার জীবনে জীবিকার নিরাপত্তা দেয়া সমাজের অপরিহার্য কর্তব্য।

কিছু কিছু বিষয় আছে, যা থেকে মানুষ স্বীয় দূরদৃষ্টি ও সামর্থ্যের দ্বারা রক্ষা পেতে পারে না। এগুলোর মধ্যে রয়েছে অসুস্থতা, পীড়া, বার্ধক্য, বৈধব্য, অকর্মণ্যতা ইত্যাদি। যদি মানুষ এসবে নিপতিত হয়, এসব যখন মানুষকে গ্রাস করে, তখন কে তাকে উদ্ধার করবে? সমাজকল্যাণ কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজই মানুষকে এই পরিস্থিতি থেকে নিরাপত্তা প্রদান করবে। পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, যৌথ বীমা, জীবন বীমা, সাধারণ বীমা ইত্যাদির মাধ্যমে এসব ক্ষেত্রে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

ব্যক্তি মানুষ মানব সমাজের অঙ্গ, সমাজের একক হচ্ছে ব্যক্তি। ব্যক্তি যখন সমস্যায় আক্রান্ত হয় তখন তা সমাজের সমস্যা হিসাবেই বিবেচিত হয়। ব্যক্তি যদি অচল হয়ে পড়ে তাহলে সমাজে এর প্রতিফলন ঘটে তাই সমাজকে সচল রাখার জন্য, ব্যক্তির সকল অক্ষমতা অসামর্থ্যতা দূর করা সমাজের দায়িত্ব। বেকারত্ব, পীড়া, অক্ষমতা, বৈধব্য, বার্ধক্য ইত্যাদির কারণে মানুষ যখন স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে না তখন তাকে সার্বিক নিরাপত্তা প্রদান করার দায়িত্ব সমাজের রাষ্ট্রের। প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই অধিকার রয়েছে যে, সে যদি কোন অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থায় নিমজ্জিত হয় তাহলে এক্ষেত্রে সে সার্বিক নিরাপত্তা লাভ করবে।

বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যাবলির মধ্যে বেকারত্ব অন্যতম গুরুতর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। কারণ এর প্রভাবে এদেশের মানুষ তাদের কর্মক্ষমতা থাকা সত্বেও কাজের সুযোগ না পেয়ে মেধা ও সামর্থ্যের অপচয় ঘটায়। এর ফলে তারা সমাজের বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। এতে তাদের ব্যক্তিগত পারিবারিক ও সামাজিক জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠে। এসব ব্যক্তির সেবা থেকে দেশ ও জাতি বঞ্চিত হচ্ছে। এর পরিণতিতে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সামাজিক প্রগতি ব্যাহত হয়।

বেকারত্ব বাংলাদেশের উৎপাদন ক্ষমতা ও জাতীয় আয়কে হ্রাস করে। এদেশের মানুষের জীবনযাত্রার মানকে নিম্নগামী করে। শ্রমিকদের মনে হতাশা ও তিক্ততার জন্ম দেয়। আইন শৃঙ্খলার প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলে, সামাজিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে, শ্রমশক্তির অপচয় ঘটায় এবং দারিদ্র্যতার সৃষ্টি করে।

www.pathagar.com

আমাদের দেশে বিভিন্ন রকমের বেকার রয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে এবং চিনি শিল্পকলসহ যে সব স্থানে সারা বছর কাজ থাকে না সেখানে মৌসুমী বেকারত্ব বিদ্যমান। কৃষিক্ষেত্রসহ বিভিন্নস্থানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত লোক কাজে নিয়োজিত থাকে, যাকে আমরা বলি প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব। এতে বিপুল পরিমাণ লোকের মেধা ও সামর্থ্যের অপচয় হয়। উৎপাদনের কলা কৌশল পরিবর্তনে নবতর প্রযুক্তির জ্ঞানের অভাবে এক শ্রেণীর কর্মক্ষম লোক বেকারত্বে নিমজ্জিত হয়। এ ছাড়াও শ্রম সচলতার অভাব, উৎপাদন ব্যবস্থায় সমন্বয়ের অভাব, শ্রমিক সংগঠনের ত্রুটি, যন্ত্রপাতি বিকলতা ইত্যাদি কারণে শ্রমিকরা অনেক সময় সাময়িক বা স্থায়ীভাবে বেকারে পরিণত হয়। এই বেকারত্ব মানব জীবনের জন্য অভিশাপ। এই অসহনীয় পীড়াদায়ক অবস্থা থেকে নিরাপত্তা লাভের অধিকার প্রতিটি মানুষের রয়েছে।

অক্ষমতা

যারা জন্মগত কারণে, দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে অথবা সমাজের প্রতিকূল প্রভাবে পড়ে শারীরিক, মানসিক ও অর্থনৈতিকভাবে অক্ষম ও অধঃপতিত জীবন যাপন করে তাদের অক্ষমতা থেকে নিরাপত্তা লাভের অধিকার আছে। অক্ষমতা বিভিন্ন রকমের হতে পারে। যেমন : শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, ও অর্থনৈতিক অক্ষমতা। শারীরিকভাবে অক্ষম ও স্বাভাবিক জীবনযাপনে অক্ষম ব্যক্তি হচ্ছে অন্ধ, বোবা, খোঁড়া অথবা অন্য কোন অঙ্গহানিজনিত পঙ্গুত্ব। মানসিক অক্ষমতা বলতে যে সব ব্যক্তিদের অবস্থা বোঝায় যারা পাগল, ক্ষীণমেধাসম্পন্ন ও অন্যান্য মানসিক রোগে আক্রান্ত। সামাজিক অক্ষমতা হচ্ছে পতিতা, ভিক্ষুক, অপরাধী জেলফেরত কয়েদী, যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারী প্রমুখের স্বাভাবিক জীবন যাপনে অসামর্থতা।

অক্ষম লোকজন সমাজের জন্য এক বিরাট সমস্যা। কেন না এরা সমাজের সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করে অথচ উৎপাদনে কোন অবদান রাখতে পারে না। অক্ষমতা সমাজে নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। বিশেষকরে ভিক্ষুকরা রোগব্যাধি ছড়ায়, ছোটখাট অপরাধ সংঘটিত করে, পতিতারা যুব চরিত্র হনন করে এবং তাদের জীবনীশক্তি বিনষ্ট করে। অক্ষমতার জন্য যারা সমাজে স্বাভাবিকভাবে বসবাস করতে পারে না তাদের জন্য সমাজ যেমন সংকটাপন্ন হয় তেমনি তারাও সংকটাপন্ন। সারা পৃথিবীব্যাপী এই সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পুষ্টিহীনতার কারণে তৃতীয় বিশ্বে হাজার হাজার শিশু বিকলাঙ্গ হচ্ছে, বিভিন্ন দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করছে।

এই অক্ষমতা থেকে নিরাপত্তা লাভের অধিকার প্রতি মানুষেরই রয়েছে। সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে শারীরিক, মানসিক, সামাজিকভাবে অক্ষম লোকদের পুনর্বাসিত করা।

www.pathagar.com

বৈধব্য ও বার্ধক্য

বার্ধক্য মানব জীবনের একটি স্বাভাবিক পরিণতি। জীবনের দীর্ঘপথ পরিক্রমায় এক সময় মানুষ বার্ধক্যে পৌঁছে। বৃদ্ধ বয়সের অনেকের পক্ষেই কর্মক্ষম বা কর্মতৎপর থাকা সম্ভব হয় না। তখন তার প্রয়োজন হয় সামাজিক নিরাপত্তা। বৈধব্য স্বাভাবিক এবং অনিবার্য কোন ঘটনা নয়। বিধবাবস্থা হচ্ছে জীবনের অনাকাঙ্ক্ষিত একটি পরিণতি। এই পরিণতি অত্যন্ত দুঃখের। মানব জীবনের এই অবস্থাতে মানুষ অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়ে। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ নারীর জীবন যেখানে পুরুষের উপর নির্ভরশীল সেখানে বিধবাবস্থা নারীর জীবনে অন্ধকারের অমানিশা নিয়ে আসে।

বৈধব্য ও বার্ধক্য অবস্থা, যখন মানুষ থাকে কর্মহীন, অসহায়, অনিশ্চিত তখন তার নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব সমাজের। সমাজে এটা একটা চক্রের মতো। আজকের স্বাভাবিক সুস্থ মানুষ একদিন বার্ধক্যে পদার্পণ করবে, তেমনি আজকের বৃদ্ধ একদিন ছিলেন কর্মদক্ষ তরুণ যুবক। জীবনের এই পরিণতিকে স্বাভাবিক মনে করেই বিধবা এবং বৃদ্ধদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে। এই নিরাপত্তা লাভের অধিকার প্রতিটি মানুষেরই রয়েছে। কোন মানুষ যখনই বৈধব্যে পতিত হবে অথবা যখন বৃদ্ধাবস্থায় জীবন যাপন করবে তখন তার জীবনের সকল রকম নিরাপত্তা প্রদান করা সমাজের দায়িত্ব।

মাতৃত্ব ও শৈশব অবস্থায় বিশেষ যত্ন ও সহায়তা লাভের অধিকার

মাতৃত্ব ও শৈশব অবস্থা পরস্পরের পরিপূরক। নারী গর্ভে সন্তান ধারণ করেন, সন্তান জন্ম দেন এবং সন্তানের লালন পালন করেন। গর্ভ ধারণের সঙ্গে সঙ্গে পরোক্ষভাবে ভাবী সন্তানের পরিচর্যা শুরু হয়। সন্তান জন্মের পর শৈশব অবস্থায় তাকে পূর্ণ যত্নের সাথে তদারকী করা হয়। অতএব মায়ের যত্ন আর শিশুর যত্ন পরস্পরের পরিপূরক। মাকে বাদ দিয়ে শিশুর যত্ন আর শিশুকে বাদ দিয়ে মায়ের যত্ন কল্পনা করা যায় না। অতএব মাতৃত্ব ও শৈশব অবস্থায় বিশেষ যত্ন লাভের এবং বিশেষ সহায়তা লাভের বিষয়টি একই শিরোনামে আলোচনা করতে পারি।

প্রথমেই দেখা যাক মাতৃত্ব বলতে কি বোঝায়? মাতৃত্ব হচ্ছে নারীর একটি বিশেষ অবস্থা। সন্তান ধারণ থেকে সন্তান জন্মদান এবং শৈশব অবস্থায় সন্তানের লালন পালনের সময়টাকেই বলে মাতৃত্ব। বলা হয় নারী জন্মের সার্থকতা মাতৃত্বে। সন্তান জন্মদানের মাধ্যমে বংশ রক্ষা এবং পারিবারিক ও জাতীয় জীবনে শ্রম শক্তির যোগান দেয় নারী। এটা নারীর একটি অন্যতম ক্ষমতা। প্রায় প্রতিটি সমাজেই সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব নারীর উপর অর্পিত হয়।

মাতৃত্ব নারীর সহজাত না আরোপিত এই নিয়ে বিতর্ক আছে। মার্কসবাদী দার্শনিকগণ নারীর মাতৃত্বকে সহজাত মনে করেন না, তাদের মতে এটা আরোপিত। যেহেতু সন্তান প্রতিপালন কষ্টকর এবং ঝামেলাপূর্ণ কাজ সেহেতু এটা নারীর উপর অর্পণ করা হয়েছে। সন্তান

www.pathagar.com

জন্মের ক্ষেত্রে বাবার তুলনায় মায়ের প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকে, সে কারণে নারীর সন্তানের প্রতি স্নেহবোধ বেশি থাকা স্বাভাবিক। স্বীয় সৃষ্টির আনন্দ তার বেশি হওয়াই সঙ্গত এবং সে কারণেই শিশুর লালন পালনের মুখ্য দায়িত্ব নারীর উপর বর্তায়।

মাতৃত্বের কারণে নারীকে বিপুল ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। সন্তানের কারণে তার স্বাভাবিকভাবে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ব্যাহত হয়। নারীর শিক্ষাজীবন, চাকরিজীবন এবং স্বাভাবিক সংসার কর্মও ব্যাহত হতে পারে মাতৃত্বের কারণে। গর্ভবতী নারীর গর্ভকালীন সময় অত্যন্ত নাজুক ও ক্রান্তিকাল। এই সময়ে তাকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্রতিটি মুহূর্ত অতিক্রম করতে হয়। গর্ভকালীন সময়ে নারীর জীবন যাপনে সামান্য অসতর্কতা তার নিজের এবং অনাগত সন্তানের জীবনের জন্য হুমকীর কারণ হতে পারে। গর্ভবতী মায়ের উপযুক্ত ও পূর্ণ পরিচর্যার মাধ্যমেই সুস্থ ও সবল শিশুর জন্মের প্রত্যাশা করা যায়। যে মুহূর্তে শিশু মাতৃগর্ভে আসে সে মুহূর্ত থেকেই শিশুর পরিচর্যা শুরু হয়। যথাযথভাবে শিশুর পরিচর্যা করলে মায়ের পরিচর্যা করা হয়। আবার সঠিকভাবে মায়ের পরিচর্যা করলে তা শিশুর পরিচর্যা করা হয়। সুস্থ শিশুর জন্য সুস্থ মায়ের দরকার। মা সুস্থ না হলে সুস্থ সন্তান আশা করা যায় না। তাছাড়া শিশু যত্ন ও লালন পালনের জন্য স্বাস্থ্যবতী মার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। অতএব মা ও শিশুর প্রতি সমভাবে যত্ন নিতে হবে।

যত্ন ও সহায়তা প্রদানের উপায়

মা ও শিশুকে বিশেষ যত্ন ও সহায়তা কিভাবে প্রদান করতে হবে? কি প্রকৃতির যত্ন ও সহায়তা লাভের অধিকার তারা রাখে?

প্রথমত, পিতামাতার শিক্ষা : শিশু জন্মপূর্ব ও পরবর্তী সতর্কতা ও সেবা সংক্রান্ত শিক্ষা। শিশু যত্ন ও তাদের দায়িত্ব সংক্রান্ত পিতামাতার উপযুক্ত শিক্ষা দরকার। শিক্ষিত পিতামাতার তত্ত্বাবধানেই শিশুর কল্যাণ নিশ্চিত হয়।

দ্বিতীয়ত, পারিবারিক পরিবেশ : শিশু ও মায়ের যথার্থ সেবার জন্য, তাদের মৌল চাহিদা পূরণের জন্য তাদের স্বাভাবিক বিকাশের জন্য সুস্থ পারিবারিক পরিবেশ দরকার। শিশুর উন্নতি ও বিকাশের জন্য সুস্থ পারিবারিক পরিবেশ অত্যন্ত জরুরি।

তৃতীয়ত, স্বাস্থ্যরক্ষা : মা ও শিশুর জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা। শিশুদের বিভিন্ন মারাত্মক রোগ থেকে রক্ষা এবং তাদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করতে হয়। এটা অত্যন্ত জরুরি।

চতুর্থত, শিক্ষা ও সেবা : প্রতিটি শিশু শিক্ষা ও সেবা লাভের ব্যাপারে পূর্ণ যত্ন ও সহায়তা লাভের নিশ্চয়তা থাকতে হবে। শিশুর ভবিষ্যত নির্মাণের জন্য যথাযথভাবে গড়ে উঠার জন্য যথাযথ শিক্ষা ও সেবা দরকার। অযত্ন অবহেলা ও বঞ্চনা শিশুর ভবিষ্যতকে তছনছ করে দিতে পারে। তাই শিশুর শিক্ষা ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে বিশেষ যত্ন ও সহায়তা দান করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে প্রতিবছর ২.৩৬ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে এদেশে বছরে ২৩ লাখ নতুন শিশু বিদ্যমান জনসংখ্যার সাথে যুক্ত হচ্ছে। এর মধ্যে ১ লাখ ৫০ হাজার শিশু আমিষ ক্যালরী জাতীয় পুষ্টির অভাবে ভুগছে। তাছাড়া বাংলাদেশে বছরে ১৭ হাজার শিশু ভিটামিন 'এ'র অভাবে অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ৫—১৪ বছরের শতকরা ৭৪ জন ছেলে এবং ৭৫ জন মেয়ে রক্ত শূন্যতায় ভুগছে। এ দেশে ১ থেকে ১১ মাস বয়সের শতকরা ২৫ জন শিশু পাঁচ বছর বয়সে পৌঁছার আগেই মারা যায়। এ থেকেই বাংলাদেশের শিশুদের অবস্থা অনুধাবন করা যায়। তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশের শিশুদের অবস্থাও তাই।

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের মানুষ জীবিকার তাড়নায় কর্মব্যস্ত হয়ে পড়ছে। গ্রাম ও শহরের অধিকাংশ পিতামাতা কর্মজীবী ও বহির্মুখী হয়ে উঠেছেন। ফলে ১৪ বছরের নীচের প্রায় ৪৮ শতাংশ শিশু কিশোরের লালন পালন ও নিরাপত্তা দারুণভাবে অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত কারণে এদেশে শিশু শিক্ষা ভীষণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। প্রতিবছর ১৮ লাখ শিশু নতুন করে স্কুলগামী হয়ে উঠছে। এদের যথাযথ শিক্ষাদান করা দরকার। অথচ অর্থনৈতিক সংকটের কারণে আমাদের দেশের সকল শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। তেমনি শিশুদের বিনোদন ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও উপযুক্ত সহায়তা এবং যত্ন নেয়া আমাদের দেশে সম্ভব হয়ে উঠছে না।

শিশুর সামাজিক নিরাপত্তা

শিশুর জন্ম তার পিতামাতার বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যেও হতে পারে আবার বৈবাহিক সম্পর্ক বহির্ভূতও হতে পারে। বলতে গেলে সারা পৃথিবী জুড়ে সন্তান জন্মদানের একটা স্বীকৃত পন্থা হচ্ছে বিয়ে। বিবাহিত দম্পতির সন্তান তাদের বৈধ উত্তরাধিকারী হিসেবে সমাজ এবং আইনে স্বীকৃত। কিন্তু বিবাহিত সম্পর্কের বাইরেও সন্তানের জন্ম হতে পারে। সমাজ বৈবাহিক সম্পর্ক বহির্ভূত সন্তানকে সুনজরে দেখে না। এ ধরনের সন্তান অবৈধ, জারজ ইত্যাদিতে আখ্যায়িত করা হয়। সমাজে এরা অপাংক্তেয় হিসেবে বিবেচিত হয়। সামাজিকভাবে এদেরকে শুধু কোণঠাঁসা করেই রাখা হয় না বরং বিভিন্নভাবে নিগৃহীত করা হয়।

কিন্তু মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য বলছে, সকল শিশুই অভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা লাভ করবে, সে বৈবাহিক বন্ধনের মাধ্যমেই জন্ম নিক, অথবা বৈবাহিক বন্ধনের বাইরে।

শিশুর জন্মের জন্য সে দায়ী নয়। জন্মকে কেউ নিজের ইচ্ছেমতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। কোন শিশুই তার জন্মস্থান বা কোন পরিবারে জন্মাবে এ ব্যাপারে নিজের পছন্দ প্রকাশ বা কার্যকর করতে পারে না। অতএব কোন সন্তান তার পিতামাতার বিবাহ বন্ধনের বাইরেও যদি জন্ম নেয় সেজন্য তার কোন অপরাধ নেই। অবিবাহিত অবস্থায় সন্তান জন্মদান যদি অপরাধ হয় তাহলে সে জন্য তার পিতামাতা অপরাধী হবে, শাস্তিভোগ করবে, শিশু নয়। শিশু সমাজের কাজে নিরাপত্তার অধিকার রাখে। এই অধিকার তাকে প্রদান করতে হবে।

সমাজের কাছে শিশুর অধিকার অনেক। শৈশব অবস্থায় বিশেষ যত্ন ও সহায়তা লাভ, খাবার, পরিচর্যা, আবাস, কাপড় চোপড়, চিকিৎসা এবং শিক্ষা। এইসব ক্ষেত্রে পিতামাতার

www.pathagar.com

বৈবাহিক বন্ধনের মাধ্যমে যে শিশুটি জন্মেছে তার অধিকার যেমন সেই শিশুটিরও তেমন যে তার পিতা মাতার বৈবাহিক বন্ধনের বাইরে জন্মেছে। শিশুর অভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তার অধিকারে কোন হেরেফের করা যাবে না, করলে সেটা মানবাধিকার লঙ্ঘনের শামিল হবে।

এই অনুচ্ছেদ ও বাংলাদেশের সংবিধান

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের সামঞ্জস্য রয়েছে। নিম্নে তা পরিবেশিত হলো :

অনুচ্ছেদ : ১৫।

রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় বৃদ্ধি সাধন, যাহাতে নাগরিকের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায় :

(ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা ;

(খ) কর্মের অধিকার অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরির বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার ;

(গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার ; এবং

(ঙ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার , অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার।

সার-সংক্ষেপ

প্রত্যেক মানুষের ন্যূনতম দাবি হচ্ছে , তার এবং তার পরিবারের ভালভাবে বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ, চিকিৎসা, নিরাপত্তা এবং অন্যান্য সামাজিক সেবার।

নিজের কোনো দোষে নয়, নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত অনেক কারণ ঘটতে পারে যাতে তার এই অধিকারগুলো বিপন্ন হয়। সেই কারণগুলোর মধ্যে আছে—(১) বেকারত্ব, (২) বিমার, (৩) বৈধব্য, (৪) বার্ধক্য, এবং (৫) নৈসর্গিক পরিস্থিতি। এই সব অবস্থাতেও নিরাপত্তার দাবি সে করতে পারে। কারণ সেটি তার মানবাধিকার।

শিশু যখন গর্ভে থাকে তখন প্রসূতির জন্য প্রয়োজন বিশেষ যত্ন এবং সহায়তা। জন্মের পরও দীর্ঘকাল মানুষ থাকে অসহায় এবং তার জন্য দরকার বিশেষ যত্ন ও সহায়তা। মাতা ও সন্তানের অধিকার আছে এই যত্ন ও সহায়তা লাভের।

পিতার ঔরসে এবং মাতার গর্ভে সন্তান জন্মলাভ করে। পিতা ও মাতা বিবাহিত হতে পারে আবার নাও হতে পারে। যত্ন এবং সহায়তার অধিকার সকল সন্তানের একরকম, তা সে বিবাহজাত হোক, বিবাহ বহির্ভূত হোক।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

(ক) প্রত্যেকেরই শিক্ষালাভের অধিকার রয়েছে। অন্ততপক্ষে প্রাথমিক ও মৌলিক পর্যায়ে শিক্ষা অবৈতনিক হবে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে। কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সাধারণভাবে লভ্য থাকবে এবং উচ্চতর শিক্ষা মেধার ভিত্তিতে সকলের জন্য সমভাবে উন্মুক্ত থাকবে।

(খ) ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ও মানবিক অধিকার ও মৌলিক অধিকারসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা পরিচালিত হবে। এটা সমঝোতা, সহিষ্ণুতা ও সকল জাতি বর্ণ ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে বন্ধুত্ব উন্নয়ন এবং শান্তি রক্ষার্থে জাতিসংঘের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করবে।

(গ) যে প্রকার শিক্ষা তাদের সন্তানদের দেয়া হবে তা পূর্ব থেকে বেছে নেয়ার অধিকার পিতামাতার রয়েছে।

(Article A 26. (1) Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory, Technical and Professional education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.

(2) Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among

www.pathagar.com

all nations, racial or religions groups and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.

(3) Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.)

ভাষ্য

এ অনুচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় :

ক. শিক্ষালাভের অধিকার।

খ. প্রাথমিক ও মৌলিক পর্যায়ে শিক্ষা অবৈতনিক।

গ. প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক।

ঘ. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সাধারণভাবে লভ্য।

ঙ. উচ্চশিক্ষা মেধার ভিত্তিতে সকলের জন্য সমভাবে উন্মুক্ত।

চ. শিক্ষার উদ্দেশ্য।

ছ. শিক্ষা পছন্দের অধিকার।

শিক্ষালাভের অধিকার

শিক্ষা, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, সুশিক্ষা, উপনিবেশিক শিক্ষা, সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা, পুঁজিবাদী শিক্ষা, শিক্ষিত জনতা, অশিক্ষিত জনতা, সাধারণ শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা, সেক্যুলার শিক্ষা ইত্যাকার বিষয়ে যখন লেখকরা প্রবন্ধ নিবন্ধ পুস্তক রচনা করেন, পণ্ডিতগণ সেমিনার সিম্পোজিয়াম, বিতর্ক আলোচনা সভা উত্তপ্ত করেন তখন স্বভাবতই প্রশ্ন দেখা দেয় শিক্ষা বিষয়টা আসলে কি? শিক্ষালাভের অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে আমাদেরকে শুরুতেই শিক্ষার উপর কিঞ্চিত আলোকপাত করতে হবে।

সাধারণভাবে কোন কিছু জানা বা শেখাই হচ্ছে শিক্ষা। সেই অর্থে পৃথিবীর সকল মানুষই কোন না কোনভাবে শিক্ষিত। সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা নাও হতে পারে, সে বিবেচনায় কারিগরি জ্ঞান , যা শুধু শারীরিক শ্রমের দ্বারাই বাস্তবায়ন করা হয়, মেধা বা পড়াশুনার দরকার হয় না, সেটাও শিক্ষা। আবার মনের ভাবকে লিখিতভাবে প্রকাশ করা এবং লিখিত কোন কিছু পড়তে পারার যোগ্যতাকেও শিক্ষা বলে। এই বিবেচনায় পৃথিবীর খুব স্বল্প সংখ্যক মানুষ শিক্ষিত। কারণ লেখাপড়া জানা মানুষের পরিমাণ বাস্তবিকই স্বল্প। বস্তুত শিক্ষা হচ্ছে অনেক ব্যাপক বিস্তৃত বিষয়। লিখতে পড়তে জানা এবং বিশেষ কোন উপায়ে জীবিকা অর্জনের কৌশল আয়ত্ত

www.pathagar.com

করার নামই শিক্ষা। আধুনিককালে লিখতে পড়তে জানাকে শিক্ষার অপরিহার্য দিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যিনি ন্যূনতম লিখা ও পড়া জানেন না তাকে শিক্ষিত বিবেচনা করা হয় না।

শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

লিখতে পড়তে জানার কি দরকার? যারা এই যোগ্যতা অর্জন করে নি বা করতে পারে নি তারা কি বিশেষ কোন অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে? অশিক্ষিত লোকদের জীবন যাপন কি খুব একটা অসম্ভব, সে বিষয়টি বিবেচনা করা দরকার। আরো একটা বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে যে যারা শিক্ষিত এবং যারা শিক্ষিত নয় তাদের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য আছে কি?

শিক্ষাটা অর্জনের বিষয়, এটা উত্তরাধিকারসূত্রে বা জন্মসূত্রে কেউ পায় না। জন্মের পর থেকে শিক্ষা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলতে থাকে মৃত্যু পর্যন্ত। এর মধ্যে কিছুটা সময় চলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার থাকে একটি নির্দিষ্ট সিলেবাস পাঠ্যসূচি, শিক্ষা কারিকুলাম। বিশেষ বিশেষ কারিকুলাম বা সিলেবাস মানুষকে বিশেষ বিশেষভাবে শিক্ষিত করে তোলে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে জ্ঞানী করে তোলে।

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানো। প্রতিটি মানব শিশুর মধ্যেই কিছু প্রতিভা সুপ্ত থাকে, উপযুক্ত চর্চা পেলে এগুলো বিকশিত হয়, আর যথাসময়ে যথাযথ চর্চা না করা হলে এসব প্রতিভা অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। মানব শিশুর ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশের জন্য শিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজন। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে জীবন যাপনের প্রতিক্রিয়াগুলো জানিয়ে দেয়া হয়। মানুষের বিশেষ বিশেষ যোগ্যতাকে কিভাবে কাজে লাগাতে হবে তা জানতে হলে শিক্ষালাভ করতে হবে। ব্যক্তির সব বৈশিষ্ট্য ও গুণের বিকাশের জন্য শিক্ষার বিকল্প নেই।

ক্রমবিকাশমান মানবসভ্যতার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে হলে লিখতে পড়তে জানতে হবে। মানব সভ্যতার অগ্রগতির ধারা ও গতিপ্রকৃতি বুঝতে হলে এ সম্পর্কে পড়তে হবে এবং এর জন্য দরকার শিক্ষা। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর জীবনধারা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য শিক্ষা দরকার। শিক্ষা ছাড়া লেখাপড়া ছাড়া অন্যকে জানার উপায় একেবারেই ক্ষীণ।

যে ভাষা মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যম, তাকে আয়ত্ত করতে হলে লিখতে পড়তে জানতে হবে। পৃথিবীতে অসংখ্য ভাষা আছে। এর মধ্যে কিছু কিছু ভাষা আছে খুবই সমৃদ্ধ। জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্যকে ধারণ করতে ভাষা জানার দরকার। মাতৃভাষার সাথে সাথে ভিনদেশীয় ভাষাও জানতে হয়। ভিন্ন ভাষার মাধ্যমে ভাবের আদান প্রদান করা সম্ভব এবং এতে করে জ্ঞান বিজ্ঞানের অগ্রগতি সকলের মধ্যে ভাগাভাগি করে তাকে আরো সমৃদ্ধ করা যায়। ভাষা বিশ্ব মানবের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের, সেতুবন্ধ রচনার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এই মাধ্যমকে আয়ত্ত করতে হলে শিক্ষা অর্জন করতে হবে।

www.pathagar.com

বিশেষ বিশেষ ব্যবহারিক জ্ঞান যা জীবনের জন্য অত্যন্ত জরুরি তা অর্জনের জন্য শিক্ষা আবশ্যক। আইন, চিকিৎসা, প্রকৌশল, চারুকলা ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে হলে, ব্যবহারিক জীবনে এসব কাজে লাগাতে হলে শিক্ষালাভ করতে হবে। আধুনিক যুগে এসব বিষয়ে উচ্চতর ও উন্নত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই এখন এসব ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও সনদ না থাকলে ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগানো যায় না।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হলে এ সম্পর্কে শিক্ষালাভ করতে হবে। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির অভাবিত উন্নতি হয়েছে। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই এখন এর ব্যবহার হচ্ছে। এই ব্যবহারকে বাস্তবানুগ এবং যথাযথ করতে বিজ্ঞান প্রযুক্তির জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার কলাকৌশল এবং সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকলে সময়ের অনেক পিছনে পড়ে থাকতে হবে। তাই বর্তমানে বিজ্ঞান যত অগ্রসর হচ্ছে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব তত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

যারা লিখতে পড়তে পারে না, যারা শিক্ষালাভ করে নি, বর্তমান সময়ে তাদের অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতেই হবে। এই অসুবিধাগুলো মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে খুবই বিপদজনক।

প্রথমত, উৎপাদনের যে কোন ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য উৎপাদনের কলাকৌশল সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সেটা কৃষি, শিল্প বা যে কোন ক্ষেত্রেই হোক। এই জ্ঞান না থাকলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা রাখা সম্ভব হয় না। এই জ্ঞান, জীবিকার সাথে সম্পৃক্ত অতএব জীবিকা অর্জনের জন্য শিক্ষা অত্যন্ত জরুরি। শিক্ষা না থাকলে উন্নত জীবিকা অর্জন প্রায় অসম্ভব। আর জীবিকা উপার্জন ছাড়া বেঁচে থাকা খুবই কঠিন।

দ্বিতীয়ত, নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কিত প্রাথমিক জ্ঞান থাকা জরুরি। শিক্ষা ছাড়া এ জ্ঞান অর্জনের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্পর্কে শিক্ষা না থাকলে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন। নিতান্ত অশিক্ষার কারণেই তৃতীয় বিশ্বের অনেক মানুষ অপুষ্টি ও বিভিন্ন ধরনের রোগে ভোগে।

তৃতীয়ত, জীবন হচ্ছে আদর্শ নির্ভর। জীবনযাপনের জন্য একটি জীবন দর্শনকে অবলম্বন করা চাই। একটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সংস্কৃতিক, দর্শন অবলম্বন করা ছাড়া জীবন যাপন সম্ভব নয়। জীবন দর্শন অবলম্বন করতে হলে এক্ষেত্রে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকা অত্যন্ত জরুরি। শিক্ষা ছাড়া জীবনে কোন আদর্শ অবলম্বন করা, মেনে চলা কঠিনই নয় শুধু, প্রায় অসম্ভব। বস্তুত শিক্ষা অর্জন করতে পারে নি, বা করে নি, তাদেরকে জীবনের পদে পদে মারাত্মক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান জীবনকে জটিল করে তুলেছে। এই জটিল জীবন শিক্ষা ছাড়া পরিচালনা করা অসম্ভব।

যারা শিক্ষিত এবং যারা শিক্ষিত নয়, তারা কি এক? যোগ্যতা তৎপরতায় তারা কি সমান? নিশ্চয়ই নয়?

www.pathagar.com

আইন প্রণয়ন, বিচারকার্য সম্পাদন, প্রশাসন পরিচালনা, ব্যবসা বাণিজ্য, কৃষি সম্প্রসারণ, শিল্প উৎপাদনসহ সকল কাজ কর্মে শিক্ষিত লোকজন যে যোগ্যতা ও দক্ষতার পরিচয় দিতে পারে, যার শিক্ষা নেই তার পক্ষে ততটুকু যোগ্যতা প্রদর্শন দক্ষতার পরিচয় দেয়া সম্ভব নয়। অবশ্য সামান্য ব্যতিক্রম যা হয়, তা সাধারণ নিয়ম হিসেবে গ্রাহ্য নয়। তেমনিভাবে যিনি শিক্ষিত এবং যিনি শিক্ষিত নন সেই দুই ব্যক্তি স্বীয় কর্মক্ষেত্রে সমান তৎপর হতে পারে না।

শিক্ষিত লোক তার কর্মের পরিণতি সম্পর্কে সচেতন থাকেন। তিনি মনীষীদের জীবন পর্যালোচনা করে নিজের জীবনের ছক বা নকশা তৈরি করে নেন। জীবনের ভালমন্দ, কল্যাণ অকল্যাণ, শুভ অশুভ সম্পর্কে পূর্ণ সতর্ক হয়ে তিনি দৈনন্দিন জীবনের কর্ম তৎপরতাকে নিয়োজিত করেন। শিক্ষা মানুষকে জীবন ও পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে সচেতন ও দূরদর্শী করে। একজন শিক্ষিত লোক যতটা সচেতন, দূরদর্শী ও পরিণামদর্শী হন অশিক্ষিত লোক ততটা হন না, হতে পারেন না।

শিক্ষা যেহেতু জীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, শিক্ষা ছাড়া যেহেতু মানব জীবনে পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়, প্রগতিশীল মানব সমাজের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত ও একাত্ম করার জন্য শিক্ষার যেহেতু বিকল্প নেই, সেহেতু মানুষকে শিক্ষা গ্রহণ ও অর্জন করতেই হবে। মানুষের মতো মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য, জীবনের সামগ্রিক উন্নতি ও বিকাশের জন্য শিক্ষা অর্জন করতে হবে। যথার্থ শিক্ষা লাভ না করলে শারীরিক উন্নতি ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হবে, তাই মানুষকে শিক্ষালাভ করতেই হবে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষের শিক্ষালাভের অধিকার রয়েছে। মানুষ যে সব অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, যে সব অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা যায় না, সে সবের মধ্যে শিক্ষার অধিকার অন্যতম। জীবনের সাথে সম্পৃক্ত এই অধিকার।

মানব জীবনের অপরিহার্য মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে শিক্ষা অন্যতম। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার মতোই জরুরি এই মৌলিক অধিকার। খাদ্য, কাপড়, বাসগৃহ এবং ওষুধ ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না, তেমনি শিক্ষা ছাড়াও মানুষ বাঁচতে পারে না। মানুষের মতো মানুষ হিসেবে বাঁচতে পারে না। শিক্ষা মানুষকে পরিশীলিত করে, মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায়, মানুষকে উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখায়, মানুষের বসবাস উপযোগী একটি সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়তা করে। তাই শিক্ষা লাভ করা মানুষের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

অবৈতনিক শিক্ষা

শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার পরও সকলের পক্ষে শিক্ষালাভ করা সম্ভব হয় না। সকল মানুষ শিক্ষিত হয় না। এর কারণ বহুবিধ। অনেক সমস্যা ও সংকট তৃতীয় বিশ্বের মানুষকে শিক্ষাবঞ্চিত করে রাখে। বিভিন্ন কারণে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার সামর্থ্য ও প্রবৃত্তি তাদের হয় না।

www.pathagar.com

প্রথমত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা সকলের শিক্ষা গ্রহণের পক্ষে অনুকূল নয়। তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রয়েছে জনসংখ্যার আধিক্য। বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার চাহিদার তুলনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হার বা পরিমাণ খুবই কম। এই স্বল্প সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিপুল পরিমাণ শিক্ষার্থী যথাযথভাবে শিক্ষা লাভ করতে পারে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থান সংকুলানের অভাব, আসবাবপত্র পাঠোপকরণের সংকট শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা বিমুখ করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতার কারণে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার্থীদের বাড়িঘর থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব অনেক বেশি হয়। পায়ে চলা পথই হয় যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। ফলে শিক্ষার্থীদের পক্ষে রোদ বৃষ্টি মাথায় নিয়ে দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের আগ্রহ এবং সামর্থ্য কোনটাই থাকে না। তৃতীয় বিশ্বে শিক্ষার বিস্তার না হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষালাভের জন্য যে আর্থিক সামর্থ্য থাকা দরকার সেটার অভাবেও অনেকের পক্ষে শিক্ষা লাভ সম্ভব হয়ে ওঠে না। আর্থিক সংকটের আবর্তে নিমজ্জিত অনেকের পক্ষেই শিক্ষার উপায় উপকরণ জোগাড় করা সম্ভব হয় না ফলে তাদের পক্ষে শিক্ষালাভ করা সম্ভব হয় না। শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের মতো আর্থিক সামর্থ্য সংকটে নিমজ্জিত অনেক পরিবারের সন্তানদের পেটের দায়ে বেরিয়ে পড়তে হয় রোজগারের জন্য। অনেক শিশুকে শ্রম দিয়ে নিজের এবং মা বাবার খাবার জোগাড় করতে হয়। শিশু শ্রমে নিমজ্জিত অনেকের পক্ষে লেখাপড়ার কথা চিন্তা করারই অবকাশ নেই। বস্তুত আর্থিক সংকট শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে এক প্রচণ্ড বাধা।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রাথমিক ও মৌলিক পর্যায়ে শিক্ষা অবৈতনিক হবে। শিক্ষার বিস্তারের ক্ষেত্রে উপরের সমস্যাগুলো বিবেচনা করলে মানবাধিকারের এই বক্তব্যটির গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়।

প্রাথমিক ও মৌলিক পর্যাপ্ত শিক্ষা অবৈতনিক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আলোচনার পূর্বে প্রাথমিক ও মৌলিক পর্যায় সম্পর্কে আলোকপাত করা দরকার।

শিক্ষার প্রাথমিক ও মৌলিক পর্যায় কতটুকু? মাধ্যমিক ও উচ্চতর স্তরে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষার স্তর হচ্ছে মৌলিক পর্যায়। এই পর্যায়ে মনের ভাব লিখে প্রকাশ করা এবং লিখিত কিছু পড়তে শিখার শিক্ষা দেয়া হয়। তদুপরি বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান প্রদান করা হয় এই স্তরে। এই স্তরই হচ্ছে শিক্ষার মূল ভিত্তি। উচ্চতর শিক্ষার অঙ্কুরোদগম হয় শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়েই।

প্রাথমিক শিক্ষাকে শিক্ষার মৌলিক স্তর হিসেবে বিবেচনা করা হয় এজন্য যে, এ সময় শিক্ষার যে ভিত্তি রচিত হয় তা যদি যথার্থ ও ত্রুটিমুক্ত হয় তাহলেই পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণ হবে সহজ ও সাবলিল। আর যদি প্রাথমিক পর্যায়েই শিক্ষা জটিল, ত্রুটিপূর্ণ হয় তাহলে মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ কঠিন হয়ে পড়ে। শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য প্রাথমিক ও মৌলিক পর্যায়ে শিক্ষা যথার্থ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রাথমিক ও মৌলিক পর্যায়ে শিক্ষা অবৈতনিক হবে কেন? অবৈতনিক হলে শিক্ষার খরচ কে বহন করবে? এ পর্যায়ে শিক্ষা অবৈতনিক না হলে অসুবিধা কোথায়? যদি প্রশ্নগুলো বিশ্লেষণ

www.pathagar.com

করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, প্রাথমিক ও মৌলিক পর্যায়ের শিক্ষা সকলেরই চাই। খুবই নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের মতোই এটি। প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণ না করলে কারোই চলবে না। অথচ সকলের পক্ষে শিক্ষা গ্রহণ, বেতন দিয়ে সম্ভব নয়। নুন আনতে যাদের পান্তা ফুরোয়, পেট পুরে যারা খেতে পায় না, শীতে গ্রীষ্মে বর্ষায় কখনোই যাদের গায়ে কাপড় উঠে না, রোগে শোকে যারা ওষুধ পায় না, তারা বেতন দিয়ে পড়াশুনা করবে, শিক্ষা অর্জন করবে এটা আশা করা যায় না। অতএব, সকলের জন্য কমপক্ষে প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত করতে হলে শিক্ষাকে অবৈতনিক করতেই হবে। এ ক্ষেত্রে অবৈতনিক বলতে শুধুমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাসিক বেতনের কথাই বলা হয় নি, সেই সঙ্গে শিক্ষার জন্য যে সব উপায় উপকরণ দরকার সেগুলোও বিনামূল্যে প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

অর্থ সংকটে জর্জরিত, দারিদ্র্যের কষাঘাতে নিমজ্জিত মানুষ যেখানে শিক্ষার প্রতি সকল আগ্রহ ও উৎসাহ হারিয়ে বসে আছে, সেখানে শিক্ষাকে অবৈতনিক না করলে, শিক্ষার উপায় উপকরণ বিনামূল্যে সরবরাহ না করলে মানুষকে শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করা যাবে না। তাছাড়া মানুষের সামর্থ্যের দিকটিও বিবেচনা করতে হবে। সামর্থ্যে না থাকলে আগ্রহ উদ্দীপনা থাকার প্রশ্নই আসে না। তাই মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদ প্রাথমিক ও মৌলিক পর্যায়ে শিক্ষা অবৈতনিক হওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেছে। অবৈতনিক না হলে সকলের পক্ষে এই অধিকার অর্জন সম্ভব হবে না।

প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক

মানবজাতিকে অজ্ঞতা, মূর্খতা ও অশিক্ষার অভিশাপ থেকে মুক্তি দিতে হলে যে সব শিশু প্রতিদিন স্কুলগামী হচ্ছে তাদের প্রাথমিক শিক্ষালাভের বিষয়টি বাধ্যতামূলক করতে হবে। জীবন সংকট মোকাবেলার জন্য দরিদ্র প্রপীড়িত অনেক পিতামাতা তাদের শিশু কিশোর সন্তানদের শ্রমে নিয়োজিত করেন। এতে তাদের সমস্যা আপাতত লাঘব হয় বটে কিন্তু স্থায়ীভাবে সমাধান হয় না। তাদেরকে শিশুশ্রম দান থেকে নিবৃত্ত করতে হলে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে, সেই সঙ্গে শিশুদের খাবার ও কাপড়-চোপড়ের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত পিতা-মাতা তার সন্তানের শিক্ষা অর্জনের বিষয়ে সচেতন থাকে না। তদুপরি মেয়ে শিশুর লেখাপড়ার তাদের সর্বদাই নেতিবাচক মনোবৃত্তি থাকে। এই অবস্থাকে অতিক্রম করতে হলে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে স্কুল গমনোপযোগী ছেলে মেয়েদের স্কুলে যেতে এবং লেখাপড়া প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত সমাপ্ত করতে বাধ্য করতে হবে।

তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই শিক্ষিত বেকারের আধিক্য রয়েছে। শিক্ষালাভের পর কাজ না পাওয়া অভিভাবকদের মধ্যে এক ধরনের হতাশার জন্ম দেয়। বেকার সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে, সেই সঙ্গে শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্বের অজুহাতে অভিভাবকরা যাতে তাদের সন্তানদের পাঠবিমুখ না করে এবং করার অবকাশ না পায়, সে জন্য প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

www.pathagar.com

প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা অত্যন্ত ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বাধ্যতামূলক করার অর্থ এই নয় যে, স্কুল গমনোপযোগী ছেলেমেয়েদের আইন করে প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত স্কুলে যাতায়াত বাধ্যতামূলক করলেই কাজ শেষ। বরং সকল শিশুর পড়াশুনা করার জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করা ; শিক্ষার উপায় উপকরণের নিশ্চয়তা বিধান করা, শিক্ষার্থী শিশুদের দুবেলা খাবারের নিশ্চয়তা প্রদান করা, পোশাক আশাকের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত।

প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ মানব শিশু পৃথিবীর আলো দেখছে। তৃতীয় বিশ্বে এই নবাগত শিশুর সংখ্যা অধিক। নবজাতক শিশুর বয়স পাঁচ অতিক্রম করলেই এরা স্কুলে যাবার উপযোগী হয়। তখন তাদের জন্য দরকার হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র প্রপীড়িত দেশগুলোতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিমাণ এত স্বল্প যে, বিপুল পরিমাণ শিক্ষার্থীর ধারণক্ষমতা এসব প্রতিষ্ঠানের নেই। যেখানে ভর্তি হওয়ার জন্য, পড়াশুনা করার জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই, শিক্ষক নেই, আসবাবপত্র নেই সেখানে শিক্ষা শুধু বাধ্যতামূলক করে কোন সুফল লাভের আশা করা যায় না। প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার মৌলিক শর্ত হচ্ছে পর্যাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা, এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা, শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকসহ অন্যান্য শিক্ষা-উপকরণ সরবরাহ করা। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা গুরুত্ব প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য শিক্ষা সম্প্রসারণের সকল ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষা একটি ব্যাপক ভিত্তিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া সচল রাখতে হলে এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়কে সচল রেখে প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করলেই তা কার্যকর হতে পারে।

শিক্ষার উপায় উপকরণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে অথচ শিক্ষার উপায় উপকরণের ব্যবস্থা করা হবে না এটা হয় না। শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য শিক্ষার উপকরণের যোগান দেয়া অপরিহার্য। দরিদ্র দেশমূহের অধিকাংশ শিক্ষার্থী শিক্ষার উপায় উপকরণ যোগাড় করতে পারে না। অর্থকষ্টে জর্জরিত এসব শিক্ষার্থীদের শিক্ষার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হলে তাদের পর্যাপ্ত শিক্ষাসামগ্রী সরবরাহ করতে হবে। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হলে এদিকে অবশ্যই নজর দিতে হবে।

যে শিশুর দিনে দুবেলা খাবারের সংস্থান হয় না, এক চিলতে কাপড় জোটে না তাকে স্কুলগামী করার কোন উপায় নেই। তাই প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হলে সেই বয়সের শিশুদের খাবার ও কাপড়ের বন্দোবস্ত করতে হবে। বস্তুত শিক্ষার সঙ্গে অন্যান্য জরুরি মৌলিক প্রয়োজনগুলো সম্পৃক্ত। শিক্ষা যেমন দরকার তেমনি দরকার অন্নবস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা। অর্ধাহারে অনাহারে, রোগে শোকে জর্জরিত বস্ত্রহীন, গৃহহীন মানুষের মনে শিক্ষার আলো জ্বালানো শুধু কঠিনই নয়, রীতিমত অসম্ভব। তাই প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার সাথে সাথে প্রতিটি শিশুর অপরিহার্য মৌলিক প্রয়োজনগুলো পূরণের সুবন্দোবস্ত করতে হবে।

www.pathagar.com

পৃথিবীর যে কোন দেশের হোক প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে এবং তা বাস্তবায়ন করতে হলে শিশুর এবং শিশুর পারিবারের মৌলিক প্রয়োজন, যা পূরণ না হলেই নয়, তা পূরণ করতে হবে। অত্যাবশ্যকীয় মৌলিক অভাব পূরণ হলে পাঠ গ্রহণের মানসিকতা গড়ে উঠতে পারে, অন্যথায় নয়।

কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা

শিক্ষাছাড়া জীবন যেমন যথার্থ জীবন নয়, তেমনি জীবনের স্পর্শ ছাড়া শিক্ষাও যথার্থ শিক্ষা নয়। সুস্থ মানুষ চায় জীবন ভিত্তিক শিক্ষা, জীবননির্ভর শিক্ষা। যথার্থ শিক্ষায় আছে জীবনের প্রতিচ্ছবি।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা হচ্ছে আদর্শ শিক্ষা, আদর্শ শিক্ষা জীবনকে দেয় মহিমা, উন্মোচন করে জীবিকার নতুন নতুন সিংহদ্বার। সুস্থ মানুষ তাই জীবনের প্রয়োজনে এক ঘেয়ে গতানুগতিক শিক্ষার পরিবর্তে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় আগ্রহী। গতানুগতিক শিক্ষায় জীবন কেমন ছকে বেধে যায়। বৃত্তি নির্বাচনে তা প্রায়শই ব্যর্থ। তাই বৃত্তিহীন শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শিক্ষার্থী যখন বাস্তবের মুখোমুখি হয়, সংসার সাগরের তীরে এসে দাঁড়ায় তখন জীবনের সকল পথ হয়ে যায় রুদ্ধ।

যে শিক্ষা মানুষকে কর্মহীন করে, যে শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ ডিগ্রী লাভ করে শুধু আরামে কাজ করতে চায়, যে শিক্ষা আমাদের কায়িক পরিশ্রমে লজ্জা জাগায়, সে শিক্ষা যথার্থ শিক্ষা হতে পারে না। বৃত্তিমূলক শিক্ষাই মানুষকে এই যাতনা থেকে মুক্তি দিতে পারে।

এ যুগ বিজ্ঞান প্রযুক্তির যুগ। সর্বত্রই যন্ত্রকুশলতার স্পর্শ। যন্ত্রের ব্যবহার, নির্মাণ বিদ্যা, কারিগরী শিক্ষা আয়ত্ত করতে না পারলে কাপড়ের কল, চিনির কল, ইস্পাতের কারখানা, সিমেন্টের কারখানা, নদীর বাঁধ নির্মাণ, রেলপথ বসানো ইত্যাদি সম্ভব হবে না। অর্থাৎ কারিগরী শিক্ষা ছাড়া কোন সমাজ চলতে পারে না। জাতিকে সচল রাখার জন্য, সমাজ উন্নয়নের জন্য, সামাজিক বিকাশের জন্য কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা অত্যাবশ্যক। গতানুগতিক ও বৃত্তিহীন শিক্ষা সমাজকে বন্ধ্যা ও অচল করে দেয়।

বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির এই যুগে যে দেশে যে বৃত্তির সুযোগ ও উপযোগিতা বেশি সে দেশে সেই বৃত্তির জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার বিস্তার দরকার। আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান দেশ। আমাদের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। কৃষিকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করলে এদেশের বেকার সমস্যা দূরীকরণ, কৃষি উন্নয়ন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন সবই সম্ভব। তেমনিভাবে যে দেশে যে বৃত্তির চাহিদা বেশি, সেই বৃত্তিভিত্তিক শিক্ষা গড়ে তুলতে হবে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি স্বনির্ভর হতে পারে না। পুঁথিগত শিক্ষা কোন জাতিকে পরনির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি দিতে পারে না। যে শিক্ষা মানুষকে হাত পা গুটিয়ে দিনরাত শুধু অফিসে আদালতে ঢোকার স্বপ্ন দেখায়, সে শিক্ষায় কখনো মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করে না।

www.pathagar.com

বয়ন শিল্প, চামড়া শিল্প, ডেয়ারী শিল্প, পোশাক শিল্প ইত্যাদিকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা হিসেবে উপযুক্ত মর্যাদা দিলে দেশ ও জাতি স্বনির্ভর হতে পারে।

কৃষি, শিল্প পণ্য উৎপাদনে উৎকর্ষ বিধান করতে হলে বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। জাতীয় উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রবর্তন করলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার্থীদের অবাঞ্ছিত ভিড় বন্ধ হবে। অন্যদিকে শিক্ষাভিমানীদের অভিমান আর আক্রোশ থেকে দেশ ও জাতি মুক্তি পাবে।

উচ্চতর শিক্ষা

সাধারণত বিশ্বব্যাপী শিক্ষা তিনটি স্তরে বিন্যস্ত। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর। প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষার ভিত্তিস্তম্ভ ; মাধ্যমিক স্তরটি হচ্ছে উচ্চতর প্রবেশিকা। উচ্চতর শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষার একটি পরিণত ও সম্পন্ন স্তর। উচ্চতর শিক্ষা সাধারণত বিষয়ভিত্তিক বা বৃত্তিভিত্তিক। শিক্ষার্থীরা উচ্চ মাধ্যমিক বা উচ্চতর প্রবেশিকা সম্পন্ন করার পর একটি নির্বাচিত বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়। ধর্ম, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, বিজ্ঞান, ফলিতবিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য, ভাষা, শিল্পকলা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের বিভাগ উপবিভাগে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ আছে। যেমন—সমাজবজ্ঞিানের মধ্যে রয়েছে আইন, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বিজ্ঞানের মধ্যে রয়েছে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, ভূতত্ত্ব, ফলিত বিজ্ঞানের মধ্যে রয়েছে কৃষি বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, পুরকৌশল, যন্ত্রকৌশল ইত্যাদি। এমনিভাবে অসংখ্য বিষয় রয়েছে উচ্চতর শিক্ষার।

জাতীয় জীবনে উচ্চতর শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় উন্নয়নের নীতি নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নে উচ্চতর শিক্ষার বিকল্প নেই। যে কোন ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে সেই বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী ব্যক্তির দরকার, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকলে কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা যেমন আবশ্যক তেমনি দরকার কারিগরি ও বৃত্তিমূলক ক্ষেত্রসহ দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, কলা, সাহিত্য, ভাষা ও ইতিহাসে উচ্চতর শিক্ষা।

উচ্চতর শিক্ষা চিন্তার বিকাশের সহায়ক। কোন বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করলে সে বিষয়ে উন্নত চিন্তা এবং নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। উচ্চশিক্ষা সংশ্লিষ্ট উন্নয়নের যেমন সহায়ক তেমনি ঐ বিষয়কে কাজে লাগিয়ে জাতীয় জীবনে উন্নতি ও অগ্রগতির সহায়ক। কোন জাতির রাজনীতি অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সমাজ তথা সর্বস্তরে উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য উচ্চতর শিক্ষা অত্যন্ত জরুরি।

www.pathagar.com

শিক্ষার উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্যহীন শিক্ষা শিক্ষা নয়। শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য আছে বা থাকা উচিত। কি সেই উদ্দেশ্য? কেন মানুষ শিক্ষা লাভ করে, জ্ঞান অর্জন করে? শিক্ষা লাভের পিছনে কি উদ্দেশ্য থাকে বা থাকা উচিত?

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদ শিক্ষার কয়েকটি উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করেছে। উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে :

১. ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ

২. মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সুদৃঢ় করা

৩. মৌলিক স্বাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সুদৃঢ় করা

৪. সকল জাতি, গোত্র ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সমঝোতা, সহিষ্ণুতা ও বন্ধুত্ব উন্নয়ন

৫. শান্তিরক্ষার্থে জাতিসংঘের তৎপরতা বৃদ্ধি করা।

উপরোক্ত পাঁচটি উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শিক্ষার সকল কার্যক্রম পরিচালিত হবে। ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে,শিক্ষা একটি ব্যাপকভিত্তিক প্রক্রিয়ার নাম। এই প্রক্রিয়াটি পরিচালনার পেছনে মহৎ উদ্দেশ্য থাকে। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদ অনুসারে উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়কে কেন্দ্র করে শিক্ষার সকল কার্যক্রম আবর্তিত হবে। যে পাঁচটি উদ্দেশ্যকে শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসাবে আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

১. ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ

ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ বলতে কি বোঝায় তা অনুধাবনের পূর্বে আমাদেরকে ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নিতে হবে। ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞার অন্ত নেই। ব্যক্তিত্ব হচ্ছে ব্যক্তির একটি সর্বান্তর্ভাবী স্বভাব। ব্যক্তির এমন কোন প্রকাশ বা ধর্ম নেই যা তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে পড়ে না। তাই ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা নিরূপণ করা খুব কঠিন ব্যাপার। প্রত্যেক ব্যক্তিই অপর ব্যক্তি থেকে কোন না কোনভাবে স্বতন্ত্র। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা সত্তা আছে। এই সব বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়েই ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির সকল বৈশিষ্ট্যের একটি প্রকাশ মাধ্যম। মানুষের আচরণ বা ক্রিয়ার মধ্য দিয়া সর্বদা ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয়। ব্যক্তিত্বের কয়েকটি সংজ্ঞা নিম্নে উল্লেখ করছি :

উডওয়ার্থ ও মার্কুইস বলেন, ব্যক্তির আচরণের গুণ যা তার চিন্তার ধরন ও প্রকাশভঙ্গি, মনোভাব ও আগ্রহ, কাজের প্রক্রিয়া এবং ব্যক্তিগত জীবন দর্শনে প্রকাশ পায়, তাকে ব্যাপক অর্থে ব্যক্তিত্ব হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে।

অ্যালপোর্ট (Allport)এর মতে, ব্যক্তিত্ব হচ্ছে ব্যক্তির মধ্যকার ঐসব মনোদৈহিক প্রক্রিয়ার গতিময় সংগঠন যা পরিবেশের সাথে তার অনুপম অভিযোজন নির্ধারণ করে।

মর্টন প্রিন্স (Morton Prince) এর মতে, সহজাত প্রবণতা ও প্রবৃত্তির সমষ্টিই হচ্ছে ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্ব মানুষের ক্রিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

www.pathagar.com

এন এল মানের মতে, বিশেষত সামাজিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ব্যক্তির গঠন আচরণের ধরন, আগ্রহ, মনোভাব, সামর্থ্য এবং প্রবণতার বিশেষ সংহতিকে ব্যক্তিত্ব হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে।

ক্রাইডার বলেন, ব্যক্তিত্বকে আচরণ ও মানসিক প্রক্রিয়ার অনুপম প্যাটার্ন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে, যা ব্যক্তির সাথে পরিবেশের সম্পর্ক নির্ধারণ করে।"

বস্তুত ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির সকল বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ মাত্র। ব্যক্তির দৈহিন গঠন, চুলের ধরন, চেহারা, শক্তি সামর্থ্য এবং তার বিশ্বাস মনোভাব, মূল্যবোধ, আবেগ প্রকাশভঙ্গি ইত্যাদি মিলেই ব্যক্তিত্ব । এসব বৈশিষ্ট্য কম বেশি সকলের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব আছে, কারো ব্যক্তিত্ব নেই একথা বলা চলে না।

মানুষ মাত্রেরই ব্যক্তিত্ব আছে। ব্যক্তিত্বের বিকাশ দরকার। ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্যই দরকার শিক্ষা। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদ অনুসারে মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্যই শিক্ষা পরিচালিত হবে। মানুষের যে বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে সুপ্ত রয়েছে, তার পরিপূর্ণ বিকাশ শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। বলতে গেলে শিক্ষাই আকৃতিগত মানুষকে প্রকৃতিগত মানুষে, অপূর্ণ মানুষকে সম্পন্ন মানুষে পরিণত করে। শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষ বিকশিত হয় তাই মানবাধিকারের ঘোষণা অনুসারে মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের লক্ষ্যে শিক্ষা পরিচালিত হওয়া উচিত।

ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপাদান

মানুষের ব্যক্তিত্ব তার একটিমাত্র গুণ বা বৈশিষ্ট্যের ফল নয়। এটা হচ্ছে ব্যক্তির সকল বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ। বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে। ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য এই উপাদানগুলোর উন্নয়ন দরকার। ব্যক্তিত্বের উপাদনগুলোর মধ্যে কিছু আছে এমন যেগুলো মানুষ জন্মসূত্রে বংশগতভাবে পেয়ে থাকে। ইচ্ছা করলেই এ গুলোর উন্নয়ন বা পরিবর্তন সম্ভব নয়। আর কিছু উপাদান এমন আছে যেগুলোর উন্নয়ন উন্মেষ ও বিকাশ সম্ভব। নিম্নে ব্যক্তিত্বের উপাদানগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

এক : দৈহিক গঠন (Physical condition)

দৈহিক আকৃতি, উচ্চতা, চেহারা, শক্তি সামর্থ্য ইত্যাদি ব্যক্তিত্ব বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। একজন স্থূলদেহের মানুষ সাধারণত আরামপ্রিয় এবং ক্ষীণদেহের লোক চঞ্চল প্রকৃতির হয়। কুৎসিত চেহারার লোকের চেয়ে একজন সুন্দর চেহারার লোক সহজেই আমাদের আকৃষ্ট করে থাকে। তাছাড়া ব্যক্তির দৈহিক শক্তি সামর্থ্যও ব্যক্তিত্ব গঠনে সাহায্য করে থাকে।

www.pathagar.com

দুই : অন্তক্ষরা গ্রন্থি (Endourine gland)

অন্তক্ষরা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এই গ্রন্থিগুলোর হরমোন রক্তের সাথে মিশে শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। যে সব অন্তক্ষরা গ্রন্থি ব্যক্তিত্বের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত সেগুলো হলো থাইরয়েড গ্রন্থি, এড্রিন্যাল গ্রন্থি, যৌন গ্রন্থি এবং পিটুইট্যারি গ্রন্থি।

তিন : বুদ্ধি (Intelligence)

ব্যক্তিত্ব গঠনের একটি অন্যতম উপাদন হলো বুদ্ধি। একজন কম বুদ্ধিমান লোকের চেয়ে একজন পরিণত বুদ্ধির লোকের ব্যক্তিত্ব অধিক আকর্ষণীয়।

চার : কৃষ্টি বা সংস্কৃতি (Culture)

ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষেত্রে কৃষ্টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এক একটা অঞ্চল, ধর্ম, গোত্রের মানুষের মধ্যে এক এক রকমের কৃষ্টি বা সভ্যতা গড়ে ওঠে। তাদের পোশাক পরিচ্ছেদ, আচার ব্যবহার, রীতিনীতির মধ্যে বেশ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। উন্নত কৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের মধ্যে উন্নত ব্যক্তিত্ব চোখে পড়ে। শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে তার পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব, সহপাঠি ও খেলার সাথীদের কৃষ্টি বিশেষভাবে ভূমিকা পালন করে।

মানুষের ব্যক্তিত্বের যেসব উপাদান চেষ্টা সাধনা করে বিকশিত করা যায় সেই সব উপাদান বিকাশে শিক্ষার ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বুদ্ধি এবং কৃষ্টি শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত করা যায়। মানুষকে উন্নত কৃষ্টিসম্পন্ন করা, মানুষের বুদ্ধিকে শাণিত করা, সভ্যতার বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকাকে খাট করে দেখার কোন উপায় নেই। অতএব শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সর্বোতোভাবে মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের সকল বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব, যদি শিক্ষার সেই লক্ষ্য থাকে।

২. মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সুদৃঢ় করা

মানবাধিকারের সাথে শিক্ষার সম্পর্ক অত্যন্ত ব্যাপক। মানব মনে শিক্ষার আলো প্রজ্জ্বলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের অধিকার সম্পর্কিত ধারণা বিস্তার লাভ করে থাকে। শিক্ষা না থাকলে অধিকার সচেতন হওয়া যায় না। আর অধিকার সম্পর্কে সচেতনা না থাকলে তা অর্জনের ইচ্ছা ও দৃঢ়তা কোনটাই থাকে না।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় মানুষের যেসব অধিকারের ঘোষণা দেয়া হয়েছে, যেগুলো মানব জীবনের জন্য অপরিহার্য সেগুলো সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা আবশ্যক। শিক্ষাই মানুষকে নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পারে। সেই সঙ্গে অপরের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলতে পারে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মানুষের মনে মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলা।

www.pathagar.com

কিভাবে মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগবে? শিক্ষা যদি মানুষের মন থেকে হিংসা, বিদ্বেষ, বর্বরতা, পাশবিকতা, নিষ্ঠুরতা, নির্দয়তা, ক্রুরতা, পৈশাচিকতা নির্মূল করে তাকে বিনয়, নম্রতা, কোমলতা, শিষ্টতা, সৌজন্যতা, শালীনতা দিয়ে ভরে দেয়, তাহলেই মানুষের মনে মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগতে পারে। শিক্ষাই মানুষকে মানবিকবোধ উজ্জীবিত করতে পারে। শিক্ষা মানুষের মনে মানবপ্রেম, মনুষ্যত্ব, মানবিকতা, ভ্রাতৃত্ব জাগিয়ে তোলে। স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, সুবিধাবাদ, সুযোগ সন্ধান, অনুদারতা, সঙ্কীর্ণতা, হীনতা, নীচতা যখন মানুষের মন থেকে দূরীভূত হবে, তখনই মানুষ হবে মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এবং এই গুণাগুণ সৃষ্টিতে শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত বেশি।

মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সুদৃঢ় করতে হলে মানুষ, মানুষের মর্যাদা ও অবস্থা, মানুষের অধিকার ও কর্তব্য, মানবিক এবং অমানবিক আচরণ ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। মানবিক গুণাবলীর তথা সহনশীলতা, সংযম, প্রফুল্লতা, প্রাণপ্রাচুর্য, গাম্ভীর্য, উদারতা, বদান্যতা, ক্ষমতাশীলতা, বিনয়, বিশ্বস্ততা ইত্যাদির বিকাশ ঘটাতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনের কতিপয় ত্রুটি তথা স্বার্থপরতা, স্বজনতোষণ, হিংসা, ঈর্ষা, নির্লজ্জতা, অহংকার, হিংস্রতা, জাত্যাভিমান ইত্যাদি দূর করতে হবে। এই কাজের জন্য শিক্ষা কারিকুলাম, পাঠ্যসূচি এবং কার্যক্রম পারিচালিত করতে হবে। শিক্ষা যদি হয় মানুষকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য, মানুষের মানবিক বোধ উজ্জীবিত করার জন্য, মানুষকে মর্যাদাবান করার জন্য তাহলে শিক্ষার মাধ্যমে মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সুদৃঢ় করা যাবে। কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি শুধু বৈষয়িক হয়, শুধুমাত্র কাজ কর্ম পাওয়ার জন্য, কর্মসংস্থানের জন্যই যদি শিক্ষা হয়, অর্থ উপার্জনই যদি এর একমাত্র লক্ষ্য হয় তাহলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে বাধ্য। শিক্ষা জীবিকার উপায় তবে উদ্দেশ্য নয়। শিক্ষা অর্জন করলে অর্থ উপার্জনের উপায় খুঁজে পাওয়া যাবে তবে অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যেই মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে না, করা উচিত নয়। প্রসঙ্গত একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করি : মনে করুন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, যাকে বলে হাড় কাঁপানো শীত। এ সময় দু'জন লোককে ডেকে বলা হলো, এই যে জ্যাকেটটি দেখছেন এর পকেটে এক লাখ টাকা আছে। আপনি কি জ্যাকেটটি নেবেন? না টাকা নেবেন? নির্বোধ টাকা নিতে চাইবে আর বুদ্ধিমান চাইবে জ্যাকেটটি কারণ জ্যাকেট নিলে এর সাথে টাকাটিও যাবে সহগামী হিসেবে। তেমনি শিক্ষা। শিক্ষা লাভ করলে জীবিকা অর্জনের উপায় হবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে ব্যক্তিত্বের বিকাশ, মানবিক মূল্যবোধ উজ্জীবন। ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত হলে শিক্ষার মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের উপায়ও হবে। শিক্ষা লাভ করলে জীবন জীবিকা কোথাও আটকাবে না মানুষ।

মানুষের মধ্যে প্রেম প্রীতি ভালবাসা জাগ্রত করতে পারলে, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করতে পারলেই শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হবে। মানবাধিকারের ঘোষণা অনুসারে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা পরিচালিত হবে। এজন্য শিক্ষার কারিকুলাম এমনভাবে তৈরি করা দরকার যাতে প্রত্যেকেই বুঝতে পারে, মানবাধিকার বলতে কি বোঝায়? সর্বজনীন ঘোষণায়

www.pathagar.com

কোন ধরনের মানবাধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে? সর্বজনীন ঘোষণায় কোন কোন অধিকার উল্লেখিত হয়েছে? ইত্যাদি। তাছাড়া শিক্ষা মানুষকে মানবাধিকার রক্ষায় অনুপ্রাণিত করবে, মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে। তাই স্কুল পর্যায়েই মানবাধিকার সম্পর্কে শিক্ষাদান করা দরকার। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে মানবাধিকার সম্পর্কিত কথা থাকলে মানুষ নিজের এবং অপরের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে এবং অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট হবে। তাই শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জোরদার করা, সুদৃঢ় করা।

৩. মৌলিক স্বাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সুদৃঢ় করা

মানুষের কিছু অধিকার আছে কিছু স্বাধীনতা আছে যেগুলো একান্তই মৌলিক। যে সব অধিকার এবং স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা যায় না, হস্তক্ষেপ করলে মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে, হয়ে পড়ে অসাধ্য। মানুষের এসব মৌলিক স্বাধীনতা কখনো কখনো ভূলুণ্ঠিত হয়, অধিকার হয় খর্বিত। কিন্তু মানুষের স্বাধীনতা হরণ করে কে? কে হরণ করে মানুষের অধিকার? এই অনাকাঙ্ক্ষিত কাজটি করে মানুষ। মানুষের দ্বারাই মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা ধূলায় লুটায়।

এই অনাকাঙ্ক্ষিত প্রবণতা প্রতিহত করতে হবে। মানুষের মৌলিক স্বাধিকার তথা স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষা করতে হবে। রক্ষা করতে হলে মানুষের প্রতি, মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি জাগাতে হবে শ্রদ্ধাবোধ। মানুষ যদি একে অপরের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়, পরস্পরের স্বাধীনতার প্রতি যদি হয় শ্রদ্ধাবান, মানবিকতা মানবতাবোধের প্রতি যদি ভক্তি থাকে তাহলে এই প্রবণতা বন্ধ হতে পারে। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদ অনুসারে শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে মানুষের মনে মানুষের মৌলিক স্বাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলা এবং তাকে সুদৃঢ় করা। এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শিক্ষার কারিকুলাম, সিলেবাস কার্যক্রম পরিচালিত হবে। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি যদি শ্রদ্ধাবোধ জাগানো যায় তাহলে শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হবে।

৪. সমঝোতা, সহিষ্ণুতা ও বন্ধুত্ব উন্নয়ন

মানুষের স্বভাব প্রকৃতি বৈশিষ্ট্য এক নয়, এক নয় তার চরিত্র মেজাজ প্রবণতা। জাতি, গোত্র বা ধর্মগত পার্থক্যের কারণে মানুষের মধ্যে এই পার্থক্য বিদ্যমান। ফলে দুনিয়ার তাবৎ মানুষের আচার ব্যবহার, চালচলন, রীতিনীতি, আদব কায়দা, ভাবভঙ্গি একরকম নয়। মানুষের স্বভাব চরিত্র, দেশাচারের বা প্রথার এই যে পার্থক্য এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, হতে পারে এই তারতম্য, হওয়া স্বাভাবিক। এই তারতম্য বা পার্থক্য অবাঞ্ছিত বা অনভিপ্রেত নয়। কিন্তু এই পার্থক্যের কারণে মানুষ যখন অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে জাতি, গোত্র বা ধর্মীয় বিরোধ যখন দেখা দেয়, বিপত্তি তখনই।

www.pathagar.com

জাতিগত বিদ্বেষ মানুষের চরিত্রের নতুন বৈশিষ্ট্য নয়। অতি সাধারণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মানুষ অসংযমী, অসহনশীল, অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে। এমন অনেক কাহিনী ইতিহাসের পুস্তককে কলংকিত করে যা মানুষের জাতিগত বিদ্বেষের প্রত্যক্ষ ফসল। মানুষের হৃদয়াবেগ, উম্মাদনা, উচ্ছ্বাস, মানসিক বিক্ষোভ কখনো কখনো মানুষকে অসহিষ্ণু করে তোলে। এতে করে এক জাতি অন্য জাতির বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে মেতে উঠে, যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে যায়, প্রাণহানি হয় মানুষের। জাত্যাভিমান মানুষের জীবনকে বিপন্ন করে তোলে। তেমনিভাবে গোত্রগত সংঘাত, ধর্মীয় ভেদাভেদ অনেক সময় মানুষের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। জাত, গোত্র, ধর্ম হয়ে পড়ে মানুষের চেয়ে বড় অথচ এসবই মানুষের জন্য, এসবের জন্য মানুষ নয়।

মানুষের মধ্যে জাতিগত কোন্দল, গোত্রীয় কলহ, ধর্মীয় বিরোধ অসন্তোষ মানুষের কাম্য নয়। এগুলো হচ্ছে কষ্টকর, পীড়াদায়ক, দুঃখময় অবস্থা। যা মানুষকে বিষাদক্লিষ্ট, মর্মাহত ও ব্যথাতুর করে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য দরকার পারস্পরিক সমঝোতা, আপোষ, বোঝাপড়া। আপোষ করতে হবে জাতিগত বিরোধের ক্ষেত্রে, গোত্রীয় কলহ ত্যাগ করে সমঝোতায় আসতে হবে, ধর্মীয় উম্মাদনা ত্যাগ করে পরস্পরের প্রতি সহনশীল হতে হবে। পরস্পরের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হতে হবে।

মানুষের জাতিগত গোত্রীয় ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে যত গোষ্ঠী রয়েছে তাদের মধ্যে সমঝোতা বৃদ্ধি সহনশীলতা ও সহিষ্ণুতা সৃষ্টি এবং বন্ধুত্ব উন্নয়নের জন্য শিক্ষা আবশ্যক। শিক্ষা মানবমনের অনুদারতা, নীচতা, সংকীর্ণতা, হীনতা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতিকে দূর করতে পারে, দূর করতে পারে মানুষের অহংকার, দাম্ভিকতা, অহমিকা, স্পর্ধা ইত্যাদি। মানুষের মনকে ভরে দিতে পারে মায়া-মমতা, ভালবাসা, দয়া-বদান্যতা এসব দিয়ে। মানুষকে করে তুলতে পারে সমব্যথী সহমর্মী, উদার, সহিষ্ণু। শিক্ষার মাধ্যমে তা সম্ভব, যদি শিক্ষা সে রকম হয়। মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, গোত্রে গোত্রে এবং বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীতে বন্ধুত্ব সদ্ভাব, সম্প্রীতি ও মৈত্রী গড়ে তুলতে হলে শিক্ষার কারিকুলাম ও কার্যক্রমকে সেভাবে তৈরি করতে হবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য, আন্তরিকতা, সমপ্রাণতা, সহমর্মিতা বৃদ্ধি করা, উন্নয়ন করা। শিক্ষার মাধ্যমে সকল জাতি, গোত্র ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সমঝোতা সহিষ্ণুতা ও বন্ধুত্ব উন্নয়ন করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে যদি শিক্ষা পরিচালিত হয় তবেই সত্যিকার অর্থে শিক্ষা হবে সফল ও কার্যকর।

৫. শান্তিরক্ষার্থে জাতিসংঘের তৎপরতা বৃদ্ধি

'যুদ্ধ নয় শান্তি' — এ হচ্ছে বিশ্বব্যাপী মানব জাতির প্রত্যাশা। কিন্তু তারপরও যুদ্ধ বাঁধে, যুদ্ধে বিপন্ন হয় মানুষের জীবন, বিনষ্ট হয় সম্পদ। দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ, যুদ্ধ বিগ্রহ মানুষই বাঁধিয়ে বসে। অসহিষ্ণুতাই যুদ্ধের প্রধান কারণ। যুগে যুগে মানব জাতি অনেক ভয়াবহ যুদ্ধের তাণ্ডব প্রত্যক্ষ করেছে। এর মধ্যে কোন কোন যুদ্ধ শতবর্ষব্যাপী অব্যাহত ছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের স্মৃতি এখনও মানুষের মন থেকে মুছে যায় নি।

www.pathagar.com

বিভিন্ন কারণে যুদ্ধ সংগঠিত হয়। যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে সরকার ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যুদ্ধ বাঁধে। কোন জাতি শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য অনেক সময় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। উগ্র স্বাদেশিকতা এবং উগ্র জাতীয়তাবাদও অনেক সময় যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শিল্পের জন্য কাঁচামাল আহরণ এবং শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার সম্প্রসারণ, ভূমি দখল, রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আধিপত্য বিস্তার ইত্যাদিরও জন্যও যুদ্ধ বাঁধতে পারে। সীমান্ত নিরাপত্তা, বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য যুদ্ধ করতে হতে পারে। তদুপরি মানবমনের ক্ষোভ, যুদ্ধ প্রবণতা, লোভ, কুসংস্কার ইত্যাদিও যুদ্ধের কারণ। যুদ্ধ যে কারণেই বাঁধুক না কেন, এর পিছনে যত যৌক্তিকতাই থাকুক না কেন, যুদ্ধ মানুষের কাম্য নয়। মানুষ চায় শান্তি, স্থিতি। শান্তিই মানুষের চিরদিনের প্রত্যাশা।

যে শান্তি মানুষের চিরদিনের প্রত্যাশা সেই শান্তির অর্থ কি? শান্তি বলতে আমরা কি বুঝি? সাধারণত যুদ্ধবিগ্রহের অনুপস্থিতি, দ্বন্দ্ব-সংঘাতমুক্ত অবস্থা এবং সক্রীয় বন্ধুত্বকে আমরা শান্তি বলি। শান্তি বললেই অবিরোধ, অবিগ্রহ, উদ্বেগশূন্যতা, নির্দ্বন্দ্ব, নির্বিবাদ বোঝায়। যেখানে কোন দাঙ্গাহাঙ্গামা নেই, অত্যাচার উৎপীড়ন নেই, জুলুম নির্যাতন নেই, উৎপাত উপদ্রব নেই সেখানেই শান্তি। শান্তি মানেই যুদ্ধ ও সংঘাতমুক্ত অবস্থা। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সুশৃঙ্খল ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা অর্থেও শান্তি শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

সভ্যতার আদিমতম দিন থেকেই মানুষ শান্তি অর্জনের প্রচেষ্টায় রত। সংগঠিত সমাজ জীবন প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই মানুষ স্থায়ী শান্তি কামনা করে এসেছে। প্রাচীন সমাজে যুদ্ধকে যে মর্যাদা দান করা হতো মানব সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে সেই মর্যাদা হ্রাস পেতে থাকে। বিভিন্ন ধর্মেও যুদ্ধকে নিরুৎসাহিত করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে মতবিরোধ মীমাংসার আহবান জানানো হয়। তথাপি পৃথিবীর ইতিহাসে দীর্ঘকালের জন্য অব্যাহত শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকার নজীর খুবই কম। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানব জাতি যুদ্ধের পেছনে যতখানি সময় ব্যয় করেছেন। শান্তির পেছনেও সম্ভবত ততখানি সময় ব্যয় করেছে। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে মানবতাবাদের উন্মেষের ফলে যুদ্ধের বিরোধিতা আরও জোরদার হয়ে উঠে। শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সংগঠন, আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন, নিরস্ত্রীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা উপস্থাপিত ও গৃহীত হতে থাকে। শান্তি স্থাপনের জন্য উনবিংশ শতাব্দীতে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি বীভৎসতা, ক্লান্তি হতাশা প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করে মানুষ যুদ্ধের উপর, বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে এবং স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। এজন্যই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য লীগ অব নেশনস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৩৮ সালে এর রাজনৈতিক অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। একদিকে জাপান, জার্মানি ও ইতালির আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ এবং অপরদিকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে অপরাপর বৃহৎ শক্তিগুলির নির্লিপ্ততা প্রভৃতি কারণে লীগ অব নেশনসের সমাধি হয়। এর পর শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বৃহৎ শক্তিবর্গ এই যুদ্ধে

www.pathagar.com

জড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অধিকতর ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করে মানুষ আরো বেশি শঙ্কিত হয়ে ওঠে। এ থেকেই বিশ্ববাসী একটি সুসংগঠিত ও শক্তিশালী আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রয়োজন অনুভব করে। বিশ্বের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও রাষ্ট্রনায়কগণ বিশ্ববাসীর মনে আশার আলো সঞ্চার করতে পারে এমন একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের সংকল্প করেন, এই প্রত্যয় থেকেই জাতিসংঘের জন্ম।

আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিধান করা ও শান্তি বজায় রাখা জাতিসংঘের প্রধান উদ্দেশ্য। এ ছাড়াও প্রত্যেক রাষ্ট্রের সমতা, আত্ম নিয়ন্ত্রণাধিকার স্বীকার করে নিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্য স্থাপন, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী সমস্ত মানব গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক ও কৃষ্টিমূলক সমস্যার সমাধান করা এবং এ সকল সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য জাতিসংঘের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতির কার্যকলাপের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা জাতিসংঘের উদ্দেশ্য।

জাতিসংঘের এই যে উদ্দেশ্য বিশ্বশান্তি রক্ষা করা, সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য জাতিসংঘের সকল কর্মতৎপরতা। এসবের মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা, যুদ্ধের ভীতি থেকে বিশ্ববাসীকে মুক্তি দান, অকেজো পুরাতন চুক্তি পরিবর্তন, আন্তর্জাতিক আইনের পরিবর্তন, এবং বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সহ অবস্থানের নীতি প্রতিষ্ঠিত করা। এই তৎপরতা চালানোর জন্য অনুকূল শিক্ষা দরকার। শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষের মধ্যে যুদ্ধবিরোধী চেতনার বিস্তার সম্ভব।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদ অনুসারে শান্তি রক্ষার্থে জাতিসংঘের তৎপরতা বৃদ্ধি করা হবে শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে মানুষের মধ্যে শান্তির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, শান্তিরক্ষার উপায় ও কৌশল এবং শান্তিকামী মনোভাব অনুধাবন ও সুদৃঢ় করার প্রয়াস চালানো হবে। জাতিসংঘের তৎপরতা বৃদ্ধি করতে মানুষ যাতে সচেষ্ট হয় সেটা শিক্ষার মাধ্যমে চেষ্টা করা হবে। বস্তুত শিক্ষা হবে শান্তি ও স্থিতির জন্য, শিক্ষা হবে মানুষের নিরাপত্তার জন্য। প্রাথমিক স্তর থেকেই যদি শিক্ষার কারিকুলামে মানুষকে শান্তির জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়, যুদ্ধবিরোধী চেতনা জাগিয়ে দেয়া হয়, শান্তি রক্ষার জন্য অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠবে। তাছাড়া জাতিসংঘের তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হলে শিক্ষার দরকার। শিক্ষা ছাড়া শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষা অনেকাংশেই অসম্ভব।

শিক্ষা পছন্দের অধিকার

শিক্ষা অনেক রকম আছে, অনেক রকম হতে পারে। বৃত্তির যেমন রকমফের আছে তেমনি বৃত্তিমূলক শিক্ষারও রয়েছে রকমফের। তাছাড়া আছে ধর্মভিত্তিক শিক্ষা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা। অসংখ্য বিষয় উপবিষয় আছে শিক্ষার। একজন মানুষের পক্ষে দুনিয়ার সকল বিষয়ের জ্ঞান শিক্ষা করা সম্ভব নয়। তাই বহুবিধ বিষয় এবং পদ্ধতি থেকে এক বা একাধিক বিষয় ও পদ্ধতি বেছে

www.pathagar.com

নিতে হয়। যে শিক্ষার্থী তার পক্ষে এই বেছে নেয়ার কাজটি করা সম্ভব নয়, কারণ কোন্ শিক্ষার গুরুত্ব কতটুকু, কোন্‌টির উপযোগিতা কেমন তা অনেক সময় শিক্ষার্থীর পক্ষে সঠিকভাবে বুঝে উঠা সম্ভব নয়। তাই এই কাজটি করতে হয় শিক্ষার্থীর পিতামাতা বা অভিভাবককে। সন্তানের শিক্ষা কেমন হওয়া উচিত, কি ধরনের শিক্ষা ছেলেমেয়ে গ্রহণ করবে তা বেছে নেয়ার, পছন্দ করার অধিকার প্রত্যেক পিতামাতারই রয়েছে।

শিক্ষা হচ্ছে শিশুর জীবনের ভিত্তি। শিক্ষার মাধ্যমে যে জীবন গড়ে উঠবে, সেই জীবনে শিক্ষার প্রভাব থাকবেই। যে যে শিক্ষা গ্রহণ করবে তার কাছ থেকে এর বিপরীত কাজ আশা করা যায় না। ডাক্তারের কাছে স্থাপত্য কর্ম, আইনজীবীর কাছে চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারের কাছে আইনের ব্যাখ্যা চাওয়া যায় না। চাওয়া গেলেও পাওয়া যাবে না। এ জন্যই কি শিখবে তা পূর্বেই স্থির করে নেয়া চাই। এই যে শিক্ষার বিষয়টি পূর্বেই নির্ধারণ করা এটা করবেন শিক্ষার্থীর পিতামাতা।

সন্তানের ওপর পিতামাতার যেমন অধিকার আছে, সন্তানেরও তেমনি পিতামাতার ওপর অধিকার আছে , তাদের সন্তানদের কি ধরনের শিক্ষা দেয়া হবে তা আগেই বেছে নেয়ার, স্থির করার। এই অধিকার সন্তানের উপর অধিকারের মতোই। পিতামাতার এই অধিকার হরণ করা হলে যুগপৎভাবে তাদের এবং তাদের সন্তানের স্বাধীনতা ও অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করা হয়। এটা সন্তানের ওপর পিতামাতার অধিকারের অস্বীকৃতিরই নামান্তর।

তাছাড়া শিশুর, সন্তানের সবচেয়ে আপনজন হচ্ছে তার পিতামাতা। সন্তানের ভালমন্দ কল্যাণ অকল্যাণ সুখ সুবিধার কথা পিতামাতাই বেশি ভাবে। পিতামাতাই তাদের সন্তানের সর্বাপেক্ষা অধিক শুভাকাঙ্ক্ষি, মঙ্গলকামী। তাই সন্তানের শিক্ষার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকারও তাদের থাকা উচিত। পিতামাতা সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনা করে সন্তানের শিক্ষার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।

বাংলাদেশে শিক্ষার হাল

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। এই অধিকার মানুষের জন্মগত। কোন জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে প্রায় সকলেই শিক্ষাকে চিহ্নিত করেছেন। শিক্ষাকে বাদ দিয়ে উন্নয়নের চিন্তা অসম্ভব। শিক্ষা সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান উপাদান। জনগণকে জাতীয় উন্নয়নের অংশ গ্রহণের উপযোগী ও সমর্থ করে তুলতে শিক্ষা প্রয়োজন। শিক্ষা ছাড়া ব্যক্তি বা জাতির ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

ভালমন্দ, ন্যায়-অনায়, কল্যাণ, অকল্যাণ, বিবেচনার জ্ঞান প্রদানই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য । শিক্ষার আর একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে তার পার্থিব জীবনের প্রয়োজন মেটানোর উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। গ্রিক দার্শনিক প্লেটো এরিস্টটল থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের খ্যাতিমান দার্শনিক বার্টান্ড রাসেল প্রমুখের মতে, শিক্ষা ভালমন্দের জ্ঞান প্রদানের জন্যই। কিন্তু শুধুমাত্র ভালমন্দের জ্ঞানদানের উদ্দেশ্যে যে শিক্ষা তা ব্যক্তি বা সমাজের অগ্রগতি সাধনে কি ভূমিকা রাখতে পারে।

www.pathagar.com

তাই একজন ব্যক্তিকে জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদান সাপেক্ষে পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত করা, মানব সম্পদে পরিণত করার জন্য শিক্ষা আবশ্যক।

উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা অপরিহার্য। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ এবং কর্মসংস্থানের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা অপরিহার্য। উৎপাদনের সাথে জড়িত বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান না থাকলে উৎপদন কার্যক্রম চলতে পারে না।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক বিকাশে শিক্ষার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। অথচ এদেশে শিক্ষার হার অত্যন্ত নগণ্য। কিন্তু দেশের উন্নয়ন, অগ্রগতি, সমৃদ্ধির জন্য শিক্ষার সম্প্রসারণ অপরিহার্য। বাংলাদেশে জনসংখ্যা অধিক এবং এর বৃদ্ধির হারও আশংকাজনক। অন্যদিকে ভূমি ও মূলধনের দারুণ সংকট। জনগোষ্ঠীকে শ্রমশক্তিতে পরিণত করার মতো উৎপাদন উপকরণ নেই, নেই শিল্প প্রতিষ্ঠান। এই নাজুক অবস্থায় উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করলে এই জনগোষ্ঠী মানব সম্পদে পরিণত হয়ে দেশে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি ছাড়া সমাজ বিকাশ সম্ভব নয়। আর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুদক্ষ ও সুশিক্ষিত জনশক্তি অত্যন্ত জরুরি। একটি সমাজের বিকাশের জন্য যে ধরনের উৎপাদনক্ষম ও বিবেকবান মানুষের দরকার সেটা একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই তৈরি করা সম্ভব।

সুশিক্ষিত মানেই স্বশিক্ষিত।' কথাটি বলেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। এই কথাটি শুধু অসাধারণ ব্যক্তিদের বেলাতেই বাস্তব, যা শুধু ব্যতিক্রম। সাধারণ নিয়ম হিসেবে যাকে এখনো গ্রহণ করা যায় নি। বর্তমান পৃথিবীতে শিক্ষিত হিসেবে বিবেচনা করা হয় কাকে? যারা স্ব স্ব দেশে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে একটি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে ধাপে ধাপে পাঠ্যক্রম সমাপ্ত করে পরীক্ষার মাধ্যমে সনদ লাভ করেন, তারাই শিক্ষত। এখন শিক্ষিত হওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া, সিলেবাস সমাপ্ত করা, পরীক্ষা দেয়া জরুরি। সাধারণ মানুষ এই প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশুনার মধ্য দিয়েই শিক্ষিত হয়।

বাংলাদেশে বর্তমানে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে তার সূত্রপাত হয়েছিল উপনিবেশিক আমলে। বৃটিশ ভারতে ইংরেজদের দৈনন্দিন প্রশাসনে সহায়ক একশ্রেণীর সহকারী সৃষ্টিই ছিল তখনকার শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর একমাত্র উদ্দেশ্য। এর মাধ্যমে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্টি করা হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে ইংরেজরা এদেশ ছেড়ে চলে যায়। শুরু হয় পাকিস্তানি শাসন। তখন থেকেই শিক্ষাকে প্রয়োজন উপযোগী করার প্রয়াস চলে। কিন্তু শিক্ষার সামান্য কিছু সম্প্রসারণ করা ছাড়া গুণগত তেমন কোন পরিবর্তন হয় নি। শিক্ষা ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক আমলের মূল ধারাই অক্ষুণ্ন থেকে যায়।

স্বাধীনতা অর্জনের পর উপলব্ধি করা হলো যে, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল পূর্বশর্ত হচ্ছে শিক্ষা। আর তাই শিক্ষাকে নতুন আঙ্গিকে ঢেলে সাজাতে হবে। সামগ্রিকভাবে শিক্ষাকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে এবং এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে শিক্ষা আমাদের জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে পরিণত করতে পারে। এবং এদেশের সর্বস্তরের মানুষ শিক্ষালাভের সুযোগ পায়।

কিন্তু ১৯৭১ থেকে ১৯৯৩ এর দুই দশকেরও বেশি সময়ে আমাদের শিক্ষা সম্প্রসারণের পরিমাণ এবং শিক্ষিত বেকারের তালিকা দুটিই হতাশাব্যঞ্জক। এই সুদীর্ঘ সময়ে শিক্ষার গুণ, মান

www.pathagar.com

এবং পরিমাণগত তেমন কোন অগ্রগতি সাধিত হয়েছে বলা যায় না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার উপায় উপকরণের স্বল্পতা, পরিবারের আর্থিক দুরবস্থা ইত্যাদির কারণে সকলের জন্য শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা যায় নি, আজো যাচ্ছে না। এখনো দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক শিশু কিশোর শিক্ষাঙ্গনে যেতে পারছে না। বস্তুত বাংলাদেশে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের আলোচ্য অনুচ্ছেদের বাস্তবায়ন আশানুরূপ নয়।

এই অনুচ্ছেদ ও বাংলাদেশের সংবিধান

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদের সাথে বাংলাদেশের সংবিধানের সামঞ্জস্য রয়েছে। নিম্নে তা পরিবেশিত হলো :

অনুচ্ছেদ : ১৭

রাষ্ট্র

(ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য,

(খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সংগতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য ,

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য ,

কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

এই অনুচ্ছেদ ও অন্যান্য সংবিধান

Indian Constitution. Article No. 29.

(1) Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same.

(2) No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the State or receiving aid out of State funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them.

Eire-Article No. 42 (3) of the Constitution of 1937

"The State shall not oblige parents in violation of their conscines and lawful perference to send their children to

www.pathagar.com

schools established by the State or to any particular type of school designated by the State."

Article : 44 (2)

"Legistation providing State aid for schools shall not discriminate between school under the management of different religious denominations."

সারসংক্ষেপ

শিক্ষার অধিকার সকল মানুষের জন্য মৌলিক। মানুষকে মানুষ হতে হলে শিক্ষা তার জন্য অপরিহার্য। আজকের যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যখন জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে নানাভাবে তখন শিক্ষাহীনতা একটি দুর্ভাগ্যজনক অভিশাপ।

মানবাধিকারের ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাকে করতে হবে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক। রাষ্ট্রকে এই দায়িত্ব নিতে হবে। কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা তারাই পাবে যাদের এদিকে প্রবণতা আছে। আর উচ্চশিক্ষা লাভের অধিকার তাদেরই থাকবে, যারা মেধাবী।

শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে তিনটি : (১) ব্যক্তিত্বের পূর্ণ এবং সফল বিকাশ (২) মানবাধিকারের প্রতি মর্যাদা দৃঢ়করণ, এবং (৩) মৌলিক স্বাধীনতা সংরক্ষণ।

শিক্ষার অভীষ্ট চারটি : (১) সকল জাতির মধ্যে সমঝোতা বৃদ্ধি, (২) সকলের মধ্যে সহনশীলতা সৃষ্টি (৩) সকলের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠা, এবং (৪) বিশ্বে শান্তির জন্য জাতিসংঘের কার্যক্রমকে উৎসাহ প্রদান।

শিশুদের শিক্ষার প্রকৃতি নির্ধারণের অধিকার পিতামাতার। দেশে নানা প্রকার শিক্ষা থাকতে পারে। রাষ্ট্র নানাবিধ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করতে পারে। সেগুলোর মধ্যে যে কোনটিকে সন্তানের জন্য বেছে নেয়ার অধিকার পিতামাতার রয়েছে।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ : ২৭

ক. প্রত্যেকেরই গোষ্ঠীগত সাংস্কৃতিক জীবনে অবাধে অংশগ্রহণ, শিল্পকলা চর্চা করা, এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও তার সুফলসমূহের অংশীদার হওয়ার অধিকার রয়েছে।

খ. প্রত্যেকেরই বিজ্ঞান সাহিত্য অথবা শিল্পকলা ভিত্তিক সৃজনশীল কাজ থেকে উদ্ভূত নৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থসমূহ রক্ষণের অধিকার রয়েছে।

(Article : 27. (1) Everyone has the right to freely participate in the cultural life of the community to enjoy the art and to share in scientific advancement and its benefits. (1) Every one has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.)

ভাষ্য

আলোচ্য অনুচ্ছেদে চারটি অধিকার বর্ণিত হয়েছে। অধিকারগুলো হচ্ছে :

১. সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অবাধে অংশগ্রহণের অধিকার।

২. শিল্পকলা উপভোগের অধিকার।

৩. বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও এর সুফলের অংশীদার হওয়ার অধিকার।

৪. সৃজনশীল কর্মের স্বার্থ সংরক্ষণের অধিকার।

অধিকারগুলো সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হচ্ছে :

১. সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অবাধে অংশগ্রহণের অধিকার :

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রত্যেকেরই গোষ্ঠীগত জীবনে অবাধে অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে সংস্কৃতি কি? সাংস্কৃতিক জীবন বা

www.pathagar.com

সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বলতে কি বোঝায়? কিভাবে সাংস্কৃতিক জীবনে অংশগ্রহণ করা যায়? উপরের তিনটি প্রশ্নের সঠিক জবাব পেলেই এতদসংক্রান্ত মানুষের অধিকার সম্পর্কে আমরা সুস্পষ্ট ধারণা নিতে পারবো।

সংস্কৃতি

সংস্কৃতি অর্থ হচ্ছে অনুশীলনের মাধ্যমে দেহ, মন, হৃদয় ও আত্মার উৎকর্ষ সাধন। কৃষ্টি হচ্ছে সংস্কৃতির সমার্থক শব্দ ইংরেজিতে যাকে বলে Culture। কমল হীরের পাথরটাকে বলে বিদ্যা, তার থেকে যে আলো ঠিকরে পড়ে তাকে বলে কালচার। পাথরের ভার আছে, আলোর আছে দীপ্তি। একথা বলেছেন কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের মতে, সংস্কৃতি বা কৃষ্টি হচ্ছে শিক্ষার ফসল। কৃষ্টি শব্দের অর্থ হচ্ছে কর্ষণ বা চাষ। ইংরেজি কালচার শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন ফ্রান্সিস বেকন ষোল শতকের শেষার্ধে। সমাজ বিজ্ঞানীগণ বিভিন্নভাবে সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে চেষ্টা করেছেন। কুলি (Cooley) এনজেল (Angel) এবং কারার (Carrer) সংস্কৃতির সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন, "সংস্কৃতি হচ্ছে সমস্ত জীবন প্রণালীর প্রতিফলন যা বংশ পরম্পরায় উৎকীর্ণ।' সমাজ বিজ্ঞানী রস (Ross) মনে করেন, সকল বস্তু ও অবস্তুর কৌশল হচ্ছে সংস্কৃতি। জোনস বলেছেন, 'সকল মানুষের সৃষ্টির সমষ্টিই হচ্ছে সংস্কৃতি।' কার্ল মার্কস বলেছেন, অর্থনৈতিক ভিত্তির বিশেষ কাঠামোই হচ্ছে সংস্কৃতি।

প্রকৃতপক্ষে কালচার বা সংস্কৃতির সংজ্ঞা প্রদান করা খুবই কঠিন ব্যাপার। অনেকেই সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে একে সভ্যতা বোঝাতে চেয়েছেন। আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে ই বি টেলরের প্রদত্ত সংজ্ঞা এখনো সর্বজন স্বীকৃত। তার মতে, 'সংস্কৃতি হচ্ছে সেই জটিল একটি পূর্ণ ব্যবস্থা, যার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে সমাজবাসীর জ্ঞান বিজ্ঞান, ধর্ম, ধ্যান ধারণা, বিশ্বাস, শিল্প, আইন আদালত, নীতিকথা, আচার ব্যবহার, অভ্যাস ও মূল্যবোধ প্রভৃতি সমাজবাসী বংশানুক্রমে অর্জন করে থাকে।' টেলরের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সংস্কৃতি হচ্ছে সমাজের মানুষের পূর্ণ জীবন প্রণালী। এ জীবন প্রণালীতে কোন মূল্যবোধের সীমা নেই। এজন্য আমরা বলতে পারি উন্নত সংস্কৃতি ও অনুন্নত সংস্কৃতি। সমাজবাসী একটি সংস্কৃতি ধারণ করে এবং পরে ধীরে ধীরে তার উন্নতি সাধন করে। সে কারণেই প্রতিটি সমাজের সংস্কৃতি ভিন্ন।

বস্তুতপক্ষে সংস্কৃতি হচ্ছে সামাজিক সৃষ্টি । সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিতে মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ক্রিয়াকলাপ ও কর্মকাণ্ডের ফলেই এর উদ্ভব। এ কারণে সমাজ সংগঠনের বিশিষ্ট রূপ দ্বারা সমাজের সাংস্কৃতিক রূপ প্রধানত নির্দিষ্ট হয়। এর ভিত্তিতেই এক সমাজের সংস্কৃতি থেকে আরেক সমাজের সংস্কৃতি পৃথক হয়, ভিন্ন হয়।

এছাড়াও অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানব সমাজের ইতিহাস শ্রেণীভেদের অবকাশহীন আদিম সাম্যবাদী সমাজ, তারপর শ্রেণীভেদসম্পন্ন দাস সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ এবং পুঁজিবাদী সমাজ হিসেবে এ পর্যন্ত বিভক্ত হয়েছে। এই স্তর ক্রমে মানুষের সংস্কৃতির

www.pathagar.com

ইতিহাসকেও আদিম সংস্কৃতি, দাস সমাজের সংস্কৃতি, সামন্তসমাজের সংস্কৃতি, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের সংস্কৃতি বলে চিহ্নিত করা হয়। এক একটা সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর ভিত্তিতেই সংস্কৃতির এ পরিচয়। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, দাস বা সমান্ততান্ত্রিক বা পুঁজিতান্ত্রিক সংস্কৃতি বলতে তার অভ্যন্তরের বৈচিত্র্য, বিরোধশূন্য একটি অখণ্ড সৃষ্টিকে বোঝায়। দাস সমাজে প্রভু এবং দাসের মধ্যে যে বিরোধ সে বিরোধ প্রভু ও দাসের বৈষয়িক ও মানসিক কর্মকাণ্ডের প্রতিফলিত হয়। সামন্ততান্ত্রিক সমাজেও অনুরূপ। পুঁজিবাদী সমাজেও উৎপাদনের হাতিয়ারের ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত মালিকানা উৎপাদনের যৌথ মালিকানা, যৌথ প্রক্রিয়া এবং উৎপাদিত সম্পদের ভোগ থেকে অধিকাংশকে বঞ্চিত রাখার ব্যবস্থায় যে শ্রেণীগত বিরোধ, বৈষম্য সংঘাত এবং ভাব ভাবনার সৃষ্টি হয় তার প্রতিচ্ছবি পুঁজিবাদী সমাজের সংস্কৃতিতে বিশেষভাবে প্রকাশ পায়।

আমরা যদি সংস্কৃতিকে শুধুমাত্র মানুষের ভাবগত সৃষ্ট কর্ম বলে বিবেচনা করি, তাহলে তার বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কারণ মানুষের সৃষ্টির সম্পূর্ণ অর্থে আর্থিক ও কারিগরী সৃজনকর্ম এবং তার সুফল অর্থাৎ উৎপাদনের যন্ত্র কলকারখানা এবং উৎপাদিত বৈষয়িক সম্পদকেও একটি মানব সমাজের সংস্কৃতি হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। সে জন্য সংস্কৃতির আরো নিগূঢ়তর ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে সমাজবিজ্ঞানীগণ একে বস্তুগত ও অবস্তুগত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। বস্তুগত সংস্কৃতির উপাদান হচ্ছে উৎপাদনের উপকরণ, যন্ত্রপাতি , দালানকোঠা ইমারত ইত্যাদি। আর অবস্তুগত সংস্কৃতির উপাদান হচ্ছে ধ্যান ধারণা, মূল্যবোধ, রীতিনীতি, আচার ব্যবহার ইত্যাদি। অবস্তুগত সংস্কৃতি হচ্ছে আত্মিক আর বস্তুগত সংস্কৃতি হচ্ছে বৈষয়িক।

সাংস্কৃতিক জীবন ও কর্মকাণ্ড

সাংস্কৃতিক আদর্শ ও সাংস্কৃতিক নমুনা বলতে বোঝায় কোন একটা দেশের বা সমাজের মানুষের মধ্যে কি ধরনের সংস্কৃতি রয়েছে এবং সে সংস্কৃতির আচার আচরণ বিশ্বাস, ধর্মাচরণ, লোককাহিনী লোককথা, সংগীত, খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। কোন দেশের সাংস্কৃতিক আদর্শ বা সাংস্কৃতিক নমুনা নির্ভর করে গোটা সমাজ ব্যবস্থার উপর। সাংস্কৃতিক আদর্শের মধ্যেই সামাজিক মানুষের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে। কারণ সাংস্কৃতিক আদর্শের মধ্যেই বসত বাড়ির নমুনা, আচার আচরণ, চালচলনের ধরন, পোশাক-পরিচ্ছদের নমুনা, খাবার-দাবারের প্রকৃতি এবং রুচিবোধ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। অতএব, সাংস্কৃতিক জীবন বলতে আমরা কোন একটি দেশ বা অঞ্চলের মানুষের বা কোন সম্প্রদায়ের জীবনপ্রণালী বা জীবনধারাকে বুঝি। মানুষের জীবনযাত্রা আচার আচরণ, বিশ্বাস, ধর্ম, বাসস্থান, নির্মাণকৌশল, পোশাকপরিচ্ছেদ, নাচগান লোকগীতি, ভাষাসাহিত্য তথা সমগ্র জীবন সম্পর্কিত জীবন সংশ্লিষ্ট যে কর্মকাণ্ড তাই হচ্ছে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। প্রতিটি মানুষের যেমন স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে, আছে নিজস্ব সংস্কৃতি। তেমনি আছে তাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, আছে সাংস্কৃতিক জীবন। যেখানে জীবন আছে,

www.pathagar.com

সেখানে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড আছে। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ছাড়া জীবন সচল থাকতে পারে না। বিকশিত জীবন চাইলে সংস্কৃতিকে সচল রাখতেই হবে।

সাংস্কৃতিক জীবনে অংশগ্রহণের উপায়

সাংস্কৃতিক জীবন মানে তো জীবনেরই চলমান ধারা। জীবন যেমন গতিশীল সংস্কৃতিও তেমনি প্রবাহমান। স্থান এবং কালভেদে সংস্কৃতিক পার্থক্য হয়। হাজার বছর আগে এই অঞ্চলের মানুষের জীবন ধারা এবং আজকের মানুষের জীবন ধারা এক নয়। তেমনি বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মানুষের জীবনধারা অভিন্ন নয়। এই যে, ভিন্নতা, পার্থক্য এটা কাল ও স্থানের পার্থক্যের কারণে।

এই যে বিভিন্ন সংস্কৃতি, বিভিন্ন কৃষ্টি, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, এর মধ্যে মানুষ অংশগ্রহণ করবে কোনটিতে। কোন সংস্কৃতিকে মানুষ ধারণ করবে, কোনটি সে উন্নত করবে? এ প্রশ্নের জবাব অতি সোজা মানুষ তার নিজের সমাজের সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে গ্রহণ করবে। নিজের সংস্কৃতিকে উন্নয়ন ও বিকাশের চেষ্টা করবে। মানুষ নিজস্ব সাংস্কৃতিক জীবনকে গ্রহণ করবে, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে পরিচালনা করবে। এ ভাবেই একটি সমাজের মানুষ কর্ষিত হতে হতে একটি উন্নত ও বিকশিত সংস্কৃতির জন্ম দেয়। শুরুতেই বলেছিলাম সংস্কৃতি বা কৃষ্টি শব্দের অর্থ চাষ বা কর্ষণ। এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া, কখনোই তা স্থিতিশীল থাকে না, স্তব্ধ হয় না। জীবনের গতি যেমন স্তব্ধ হয় না, সংস্কৃতির অবস্থাও তেমনি। ব্যক্তি মানুষের মৃত্যু হয় কিন্তু সমাজের মৃত্যু নেই তাই সংস্কৃতিও চির জাগ্রত এক কর্মকাণ্ড। মানুষ যেমন খায়, পরে, ঘুমায়, কথা বলে, হাসে, খেলে বেড়ায়, এসবে কোন বিরাম বিরতি নেই তেমনি তার সাংস্কৃতিক জীবন, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। এসবে মানুষের অংশগ্রহণটি হচ্ছে স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ বিষয়।

পৃথিবীতে যত সংস্কৃতি আছে সব কিছুই একসাথে ধারণ করার ক্ষমতা মানুষের নেই। একজন মানুষ একই সঙ্গে বাঙালি সংস্কৃতি ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে ধারণ করতে পারে না। তবে বিভিন্ন সংস্কৃতির কল্যাণকর দিকগুলো গ্রহণ করতে পারে। এতে করে অন্য সমাজের অন্য দেশের সংস্কৃতিও ক্রমে ক্রমে নিজের সংস্কৃতিতে প্রবেশ করে তাকে সমৃদ্ধ করে। সাংস্কৃতিক আদান প্রদান আধুনিককালে অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয়। বিশেষ করে যোগাযোগের ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং যাতায়াত ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন বিশ্বব্যাপী মানুষে মানুষে সম্পর্ক অনেক ঘনিষ্ট করেছে। এতে পরস্পরের মত বিনিময়, ভাবের আদান প্রদান এবং চিন্তার লেনদেন অনেক দ্রুত হয়েছে। ফলে এখন বিশ্বব্যাপী কিছু আচার আচরণ, পোশাক পরিচ্ছেদ মানুষের সাধারণ ও সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠছে। এতে এক বিশ্ব মানব সংস্কৃতিরই আলামত। তারপরও বিভিন্ন জাতি, গোত্র, সম্প্রদায় ও সমাজের নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে। যাকে মানুষ নিজের সংস্কৃতি বলে মনে করে। এই যে নিজের সংস্কৃতি যাতে স্বকীয় সত্তার প্রতিফলন ঘটে সেই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অবাধে অংশগ্রহণ করার, সেই সাংস্কৃতিক জীবনে অবাধে

www.pathagar.com

অংশগ্রহণ করার অধিকার প্রতিটি মানুষের রয়েছে। কোন মানুষকে তার সংস্কৃতি অনুশীলন চর্চা ও উন্নয়নে বাধা প্রদান করার অর্থ হচ্ছে তার স্বাধীন সত্তায় হস্তক্ষেপ করা। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদ অনুসারে এ ধরনের বাধা প্রদান কাঙ্ক্ষিত নয়।

২. শিল্পকলা উপভোগের অধিকার

ইংরেজি arts শব্দটির বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে শিল্পকলা। শিল্পকলা হচ্ছে মানবিক দক্ষতা বা মানবিক বিদ্যা। প্রধানত সাহিত্য, চিত্র, সংগীত এর অন্তর্ভুক্ত। চিত্রাংকণাদি তথা চারুকলা, গান সঙ্গীত তথা ললিতকলাসহ সকল সুকুমার শিল্পসমূহের সমন্বয়েই শিল্পকলার জগৎ। শিল্প একটি মানবিক ক্রিয়া। শিল্পসৃষ্টির প্রক্রিয়া এরূপ : কোন ব্যক্তি আপন হৃদয়ে উপলব্ধ অনুভূতিকে বাহ্য অভিজ্ঞানের মাধ্যমে অপরের চিত্তে সঞ্চারিত করেন। এবং অপরেও যখন অনুরূপ ভাবানুভূতির দ্বারা সংক্রামিত হয় এবং আপন হৃদয়ে অনুরূপভাবে উপলব্ধি করেন, তখনি হয় শিল্পের জন্ম।

শিল্প অনেক রকমের হতে পারে। গান, কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, চিত্র, ভাস্কর্য, তৈজষপত্র, বক্তৃতা বিতর্ক, আবত্তি, লেখা, বলা ইত্যাদি প্রায় সবই শিল্প। শিল্পের স্রষ্টা হচ্ছেন শিল্পী। শিল্পের ধরনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নির্ধারিত হয় শিল্পীর নাম। যেমন কবিতা লেখেন যিনি তিনি কবি আর কবিতা আবৃত্তি করেন যিনি তিনি আবৃত্তিকার। যিনি গান লিখেন তিনি গীতিকার, যিনি সুরারোপ করেন তিনি সুরকার আর যিনি গান গেয়ে শুনান তিনি সঙ্গীত শিল্পী। ছোটগল্প লিখেন যিনি তিনি কথাশিল্পী, উপন্যাস লিখেন যিনি তিনি ঔপন্যাসিক, বক্তৃতা করেন যিনি তিনি বক্তা, বিতর্ক করেন তার্কিক, চিত্রশিল্পী চিত্রাংকন করেন। এমনিভাবে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন ধরনের শিল্পের স্রষ্টা ও পরিপোষক।

মহৎ শিল্প জীবনাশ্রয়ী, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সে কারণেই জগৎ ও জীবনের নানাবিধ সমস্যা, মানবজীবনের উত্থান ও পতন, জয় ও পরাজয়ের কাহিনী যখন শিল্পীর মানস চেতনায় পরম সত্যরূপে ধরা পড়ে এবং তা শিল্পে প্রতিফলিত হয়, তখনই সে প্রয়াস যথার্থ শিল্পের মর্যাদা লাভ করে। জগৎ ও জীবন কখনো বস্তু নিরপেক্ষ নয়। জীবনে আকাঙ্ক্ষা আছে, কামনা আছে, লোভ লালসা ভোগ বাসনা সবই আছে। আছে দারিদ্র্য, রোগ-শোক মহামারী, সেই সঙ্গে আছে কল্পনার মনোময় ভুবনে অবগাহনের দুর্দম ইচ্ছা। বাস্তব জগতে যা অনিবার্যভাবে ঘটবে তাকে কে অস্বীকার করবে? এই অনিবার্য বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই মানুষ কল্পনার ভাবজগতে কখনো কখনো শান্তি ও স্বস্তি খোঁজে। শিল্পী তার সৃষ্টির মধ্যে অর্থাৎ শিল্পের মধ্যে এই শান্তি ও স্বস্তির ভুবন গড়ে তোলেন। তাই এই ভুবন গড়ে তুলতে এলোমেলা জগৎ ও জীবনের কাছেই হাত পাততে হয়। জগৎ ও জীবন এলোমেলো। এই কারণে যে, কোন সুস্থির নীতির বন্ধনে তা আবদ্ধ নয়। এ কারণে কখনো কখনো তা স্বপ্নের সঙ্গে তুলনীয়। স্বপ্নে নানা বিষয়ের যে উপস্থাপনা ঘটে, তাতে যুক্তি পরম্পরার নিতান্ত অভাব থাকে, একটি বিষয়ের সঙ্গে অন্য একটি বিষয়ের উপস্থিতি

www.pathagar.com

ঘটে নিতান্ত উদ্ভটভাবে। কিন্তু শিল্পী যতই কল্পনাবিলাসী হোন, সৃষ্টির সার্থকতার খাতিরে তাকে একটি বিশ্বাসযোগ্য অথচ কল্পনামধুর ভাব পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে হয়। এজন্য শিল্পী যখন এই এলোমেলো জগৎ ও অস্থির জীবনকে বিকাশের দায়িত্ব নেন, তখন তার অত্যাশ্চর্য সাধনায় বাস্তব আনন্দঘন হয়ে এক যুক্তিগ্রাহ্য বিষয়বস্তুরূপে শিল্পে বিকাশ লাভ করে। তাই শিল্পে যে জগৎ ও জীবনের প্রতিফলন ঘটে, তাতে স্বপ্নের স্পর্শ থাকলেও স্বপ্নের উদ্ভটতা থাকে না।

শিল্পের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে আনন্দ দান, মানব মনে রসের সৃষ্টি করা। শিল্পে এই রস সৃষ্টি কোন ক্রমেই বাস্তববিমুখ কিংবা কল্পনাসর্বস্ব নয়। শিল্পী প্রকৃতপক্ষে বস্তুজ্ঞানের অটল ভিত্তিতেই কাব্য সৃষ্টি করেন। মানব জীবনের বহু বিচিত্র কামনা বাসনা আকূতি আকুলতা, ছলাকলা, হাবভাব নিয়েই শিল্প, শিল্পীর সৃষ্ট শিল্পকর্ম।

সকল দেশের সকল কালের শিল্পের ভাব পরিমণ্ডল গড়ে উঠে প্রধানত মানবসত্যকে কেন্দ্র করেই। সেই সঙ্গে যুগের সামাজিক প্রতিবেশ, প্রাকৃতিক চিত্রণ, কখনো কখনো মানব মনের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটনের প্রয়াসও চলে। শিল্পের পটভূমি কখনো সমাজ জীবন, কখনো স্বর্গ, নরক, কখনো দেব বন্দনা। শিল্পের উপাদান এবং পটভূমি যাই হোক তা মানুষকে আনন্দ দেয়, আর শুধু আনন্দই দেয় না শিল্প মানুষকে উৎসাহ দেয়, প্রেরণা দেয়, উদ্বুদ্ধ করে, উদ্দীপ্ত করে।

বিশ শতকের কঠোর দারিদ্র্য ও সংকট আমাদের জীবনে উনিশ শতকীয় দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের পরিমাণ হ্রাস করে। সেই সঙ্গে আমাদের মানসিক শান্তিও বহুলাংশে কমে আসে। ক্ষুধার রাজ্যের অধিবাসীরা তাই পূর্ণিমার চাঁদকে প্রত্যক্ষ করে ঝলসানো রুটির মতো। দারিদ্র্যের করাল থাবা মানুষের জীবন থেকে ন্যায় নীতি ধর্মবোধ ও সুন্দরের কামনাগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। জীবনের পদে পদে অশান্তি, হিংসা দ্বেষ, ভয় বিভীষিকা, বিরহ, বিচ্ছেদ, আতঙ্ক, আশংকা, একাকীত্ব শূন্যতা ও বিচ্ছিন্নতা আর অস্বাচ্ছন্দ্যের কারণে জীবন সম্পর্কে পুরোনো ধ্যানধারণার অবসান হলো এবং তার বদলে জেগে উঠলে নতুন মূল্যবোধ। বাইরের দিক থেকে এই ওলোটপালটের কারণেই মানুষের অন্তর্জগতেও চেতনার রাজ্যের কিছু বিপ্লব, কিছু বিদ্রোহ, কিছু পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠলো। একালের মানুষ রূঢ় বাস্তবতার সম্মুখীন। সে কারণে অন্ধভক্তির স্থলে বিশ শতকীয় মানুষের মন বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের দ্বারা পরিচালিত। এ যুগের অভিজ্ঞতা ও বিভিন্নভাবে লব্ধ জ্ঞানবিজ্ঞান থেকে অবশেষে শিল্পের ক্ষেত্রেও দেখা দেয় প্রত্যক্ষ বাস্তববাদ। সৌন্দর্যচর্চার নন্দনতাত্ত্বিক ভাবনা থেকে শিল্পকে বিচ্ছিন্ন করে তার জায়গায় অসুন্দরকে আবাহন করা হলো অকৃত্রিমভাবে। যুগের যন্ত্রণা তাই একালের শিল্পে আরো ব্যাপক হলো। জীবনের যে দিকটি সাধারণের চোখে কুৎসিৎ অন্ধকার, তারই সঙ্গে এ যুগের শিল্পীদের পরিচয় ঘনিষ্ট হয়ে উঠলো ফলে শিল্প হয়ে উঠলো জীবন নির্ভর আর শিল্পী হলেন জীবনের রূপকার। শিল্পকলার যে বিষয় বা যে শাখাই হোক এবং তা জীবন নির্ভর হোক বা কাল্পনিক হোক—এটা উপভোগের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে। প্রত্যেকেরই অধিকার আছে শিল্পের যে কোন শাখায় বিচরণ করার এবং যে কোন ধরনের সুকুমার শিল্পের চর্চা করার। এই অধিকারের মধ্যে রয়েছে শিল্পকর্ম তৈরি, প্রদর্শন, অবলোকন, প্রকাশ, প্রচার তথা উপভোগ।

www.pathagar.com

শিল্পকলা হচ্ছে মানুষের মননশীলতা ও সুকুমারবৃত্তি প্রকাশের মাধ্যম। এই মাধ্যমকে যদি স্তব্ধ করা হয় তাহলে মানুষের সুকুমার বৃত্তিকেই গলা টিপে হত্যা করা হয়। তাই মানুষকে মানুষের মতো বেঁচে থাকতে হলে শিল্পকলা উপভোগের অধিকার থাকতেই হবে।

৩. বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি এবং এর সুফলের অংশীদার হওয়ার অধিকার

অস্তায়মান শতাব্দীর শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। আর মাত্র ক'দিন পরই আমরা একুশ শতকে পা রাখবো। শতাব্দীর প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে আমরা যদি পিছনে ফিরে তাকাই, যদি চোখ বুলাই শতবছর আগের দিনগুলোর প্রতি, তাহলে কি দেখতে পাবো? দেখতে পাবো আরেক পৃথিবীর চেহারা, ভয়ানক বীভৎস, সেই পৃথিবী। যেখানে উড়োজাহাজ নেই, চলচ্চিত্র নেই, এক্সরে নেই, অক্সিজেন নেই, রাডার নেই, টেলেক্স নেই, টেলিপ্রিন্টার নেই, কম্পিউটার নেই। বলতে গেলে আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারের অনেক কিছুই নেই। হাতে কাছে পাওয়া এমনি ধরনের বহুবিধ জিনিসের প্রাচুর্যে ডুবে থাকা এই প্রজন্মের কোন মানুষকে যদি বলা হয় এক সময় পৃথিবীতে এসব ছিল না তাহলে সে অবাক হবে, বিস্মিত হবে। অথচ এটাই স্বাভাবিক এবং বাস্তব। মানুষের নিরতিশয় সাধনায় বিজ্ঞানের যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তাতে পৃথিবীর রূপ পাল্টে গেছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির কল্যাণে মানব জীবনে গতি এসেছে, এসেছে স্বাচ্ছন্দ্য।

ডিজেল ইঞ্জিন, উড়োজাহাজ, অটোমোবাইল, গ্যাস ইঞ্জিন, জাহাজ, ডুবোজাহাজ, রকেট, হেলিকপ্টার, ইত্যাদির আবিষ্কার যাতায়াত ব্যবস্থাকে অসাধারণভাবে গতিময় করেছে, যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করেছে কাগজ, টাইপরাইটার, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিশন, প্রিন্টিং প্রেস, টেলিপ্রিন্টার, টেলেক্স, ফ্যাক্স, কম্পিউটার ইত্যাদি। টেলিস্কোপ, থার্মোমিটার, মাইক্রোস্কোপ, এক্সরে, ক্যামেরা, অক্সিজেন, টেরামাইসিন, সালফিউরিক এ্যাসিড, পলিও ভ্যাকসিন, বসন্তের টিকা, প্লেগ জীবাণু, ডিপথেরিয়া প্রতিষেধক, ম্যালেরিয়া জীবাণু ক্লোরোমাইসিন, বি.সি.জি, ইনসুলিন, আলট্রাসনোগ্রাম, ই.সি.জি ইত্যাদি আবিষ্কার চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক উন্নতি সাধন করেছে। এ ছাড়াও ট্রান্সফরমার, বৈদ্যুতিক বাতি, বৈদ্যুতিক ফার্নেস, বন্দুক, পিস্তল, বৈদ্যুতিক ঝালাই, বিদ্যুত পরিমাপক যন্ত্র, রেয়ন বুননযন্ত্র, ইলেক্ট্রন, নিউট্রন, নিয়ন, অর্গান, হিলিয়াম, ইউরেনিয়াম, বারুদ ইত্যাদি আবিষ্কার থেকে মানবজাতি কতটুকু অগ্রসর হয়েছে তা আন্দাজ করাও কঠিন।

মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি মৌলিক অধিকারগুলো অর্জনেও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সহযোগিতা পাওয়া গেছে। মানবজীবনে সুখ শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য আনতে বিজ্ঞানের অবদান অত্যন্ত বেশি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির কারণেই খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, উন্নত ও আরামপ্রদ বস্ত্র উৎপাদন, স্বল্প জায়গায় আকর্ষণীয় ও স্বাস্থ্যকর বাসস্থান নির্মাণ, দ্রুত নিখুঁতভাবে রোগ নির্ণয়, অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান সম্ভব হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি মানবজীবনের অনেক অসাধ্যকে সাধ্য করেছে। অনেক জটিল ও কঠিন কাজ বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির

www.pathagar.com

সাহায্যে অতি সহজে অতিদ্রুত সম্পন্ন করা যায়। মানুষের সাধনার ফসল মানুষকেই হতবাক করে দিয়েছে।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও এর সুফল ভোগ করছে কে? যিনি আবিষ্কার করেছেন তিনি বা শুধু তার জাতি? ব্যাপারটি তা নয়। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সুফল ভোগ করছে সমগ্র মানবজাতি। যুক্তরাষ্ট্রের আলেকজান্ডার ভি স্পিনা ১২৮৫ সালে চশমা আবিষ্কার করেছিলেন। এই চশমা শুধু যুক্তরাষ্ট্রের মানুষই চোখে দেয় না। বাংলাদেশের অজ পাড়াগাঁয়ের মানুষও চশমা পরে। ইংল্যান্ডের জন এল বেয়ার্ড ১৯২৬ সালে যে টেলিভিশন আবিষ্কার করেছিলেন তা এখন সারা দুনিয়ায় প্রায় ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। জার্মানির বিজ্ঞানী ফারেনহাইট যে থার্মোমিটার আবিষ্কার করেছিলেন ১৭১৪ সালে জ্বর পরিমাপের জন্য, প্রায় প্রত্যেক পরিবারেই এখন তা রাখা হয়। জার্মানির গুটেনবার্গ ১৪৪০ সালে যে ছাপার মেশিন আবিষ্কার করেন তার কাছে তো গোটা সভ্য জাতি ঋণী। ১৮৭৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী টমাস এডিসন আবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক বাতি তো সমগ্র দুনিয়াকেই আলোতে আলোকিত করে ফেলেছে। শতাব্দীর শুরুতে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় যুক্তরাষ্ট্রে যে উড়োজাহাজ আবিষ্কার করেছিলেন তাতো পৃথিবীর পরিধিকেই ছোট করে দিয়েছে। আলেকজান্ডার গ্রাহামবেল ১৮৭৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে যে টেলিফোন আবিষ্কার করেন তা ছাড়া এখন কোন সভ্য জাতির এক মুহূর্ত চলে না। ১৮৬৪ সালে অস্ট্রিয়ার মিটরহুকার সিটার যে টাইপরাইটার আবিষ্কার করেন তা এখন সারা বিশ্বের ব্যবসা ও প্রশাসনের অন্দরহলে জেঁকে বসে আছে। এমন কোন জিনিস আছে যা আবিষ্কারকের একচ্ছত্র অধিকারে আছে। একটিও নাই, থাকা সম্ভবও নয়, সংগতও নয়।

প্রতিটি বিজ্ঞানী তাদের সারা জীবনের সাধনায় যা কিছু আবিষ্কার করেছেন তা মানুষের জন্যই। ইতালির মার্কনির রেডিও, জার্মানির রঞ্জেনের এক্সরে, আরবিয় জাবিরের নাইট্রিক অ্যাসিড, ইংল্যান্ডের প্রিস্টলির অক্সিজেন, জন স্টিফেনসন–এর রেলইঞ্জিন, জেনার–এর বসন্তের টিকা, যুক্তরাষ্ট্রের গুথরির ক্লোরোফর্ম এখন ব্যবহার করছে সারা দুনিয়ার মানুষ। যারা এগুলো আবিষ্কার করেছেন এটা শুধু তাদেরই সম্পত্তি নয়, এটা সমগ্র মানব জাতির সম্পত্তি। প্রতিটি মানুষের এতে অধিকার রয়েছে। এই অধিকার দুরকমের। একটি হচ্ছে এই যে, প্রতিটি মানুষ বিজ্ঞান চর্চা, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির জন্য এবং নতুন কিছু আবিষ্কার, পুরোনো কিছুর উন্নয়নের জন্য অবদান রাখতে পারে। এটা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে অংশগ্রহণের অধিকার। অপরটি হচ্ছে এরকম যে বৈজ্ঞনিক অগ্রগতি যা হচ্ছে তার সুফল ভোগের অধিকার। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সাধনে অংশগ্রহণ এবং বিজ্ঞানের সুফলের অংশীদার হওয়া। এই দুটি অধিকারই প্রতিটি মানুষের আছে। এই অধিকার থেকে কাউকেই বঞ্চিত করা যাবে না।

৪. সৃজনশীল কর্মের স্বার্থ সংরক্ষণের অধিকার

বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, শিল্পী এরা হচ্ছেন সৃজনশীল কর্মের স্রষ্টা। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উদ্ভাবন করেন, সাহিত্যিক সাহিত্য রচনা করেন, শিল্পী শিল্প সৃষ্টি করেন। তাদের এই মহৎ কর্ম

www.pathagar.com

উপভোগের অধিকার আছে সবার কিন্তু দুটি বিষয়ে শিল্পীর একচ্ছত্র অধিকার থাকবে। বিষয় দুটি হচ্ছে শিল্পীর নৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থ।

যে সৃজনশীল কর্মের স্বার্থ সংরক্ষণের অধিকার শিল্পীর তথা সেই সৃজনশীল কর্মের স্রষ্টার রয়েছে সেগুলি প্রধানত তিন প্রকার : ১. বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, ২. সাহিত্যকর্ম, ৩. শিল্পকলা। নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে :

১. বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার : মানবজীবনকে সহজ, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তোলার জন্য, জীবনের বিভিন্ন জটিল বিষয়ের স্বরূপ উন্মোচনের জন্য জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিদের যে সাধনা তারই ফল হচ্ছে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। আর এই আবিষ্কারের পিছনে যার মেধা ও শ্রম নিয়োজিত থাকে, যিনি তা আবিষ্কার করেন তিনি হচ্ছেন বিজ্ঞানী। আবিষ্কারক হচ্ছেন স্রষ্টার মতো। শুধু অর্থ খরচ করলে আর পরিশ্রম করলেই আবিষ্কার করা যায় না। আবিষ্কারের জন্য দরকার হয় সৃষ্টিশীল মন, উন্নত মেধা আর একাগ্র সাধনা। তারপরও সৃষ্টি হবেই নতুন কিছু আবিষ্কার এই নিশ্চয়তা দেয়া যায় না। সেই প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত অসংখ্য মানুষ সাধনা করে আসছেন কিন্তু আবিষ্কারের আনন্দ সৃষ্টির তৃপ্তি পেয়েছেন খুব কম লোকই। আবিষ্কারক হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন এমন ভাগ্যবান বৈজ্ঞানিক সংখ্যায় খুবই স্বল্প। আবিষ্কারকগণ সমাজের শ্রেষ্ঠ সন্তান। মানবজাতির কল্যাণে তাদের অবদান অত্যন্ত বেশি।

২. সাহিত্যকর্ম : সাহিত্য কি? এ প্রশ্নের জবাব অনেক ব্যাপক। সাধারণত সাহিত্য বলতে গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও কাব্য, নাটক ইত্যাদি বোঝায়। অবশ্য ব্যাপক অর্থে ইতিহাসের বই, দার্শনিক বা গবেষণাকর্ম, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, অভিধান, নির্দেশিকা ভ্রমণ সহায়িকা ইত্যাদিও সাহিত্য। নতুন যন্ত্রপাতি কিনলে তার সাথে যে পুস্তিকা বা ছাপানো কাগজ দেয়া হয়, যাতে যন্ত্রটির ব্যবহার বিধি এবং অন্যান্য তথ্যাদি মুদ্রিত থাকে অথবা ওষুধের প্যাকেটের মধ্যে যে ঐরকম একটা ছাপানো কাগজ থাকে, তাকে ইংরেজিতে Literature বলে। বাংলায় সাহিত্য বলতে যা বোঝানো হয় ইংরেজি literature শব্দ দিয়ে তাই বোঝানো হয়। সাহিত্যের মধ্যে কিছু আছে যা তথ্য প্রদান করে আর কিছু আছে যা শুধু আনন্দ প্রদান করে। প্রথমোক্ত সাহিত্য হচ্ছে তথ্যাশ্রয়ী, শেষোক্তটি হচ্ছে কল্পনাশ্রয়ী। তথ্যাশ্রয়ী লেখা হচ্ছে প্রয়োজনের। জ্ঞানদান করা হচ্ছে এর প্রধান উদ্দেশ্য। ফলে এ ধরনের রচনার ভিত্তি হচ্ছে বস্তু নির্ভরতা। কিন্তু কল্পনাশ্রয়ী রচনা ঠিক তা নয়। সেজন্যই এগুলো প্রকৃত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রেণীর রচনার উদ্দেশ্য হলো মানুষের চিন্তা ও কল্পনার জগৎকে নাড়া দেয়া, অনুভূতিকে শাণিত করা। তার পরও একথা সত্য যে, সাহিত্য একেবারে অবাস্তব বা উদ্ভট কিছু নয়, মহৎ সাহিত্য অবশ্যই জীবন নির্ভর, জীবনাশ্রয়ী। জীবনের বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটলেই সাহিত্য প্রকৃত অর্থে সুসাহিত্য বা সৃজনশীল সাহিত্যকর্ম বলে বিবেচিত হয়। যিনি সাহিত্য রচনা করেন তিনি হচ্ছেন সাহিত্যিক। সাহিত্যিকের চিন্তা, মেধা, মনন ও অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটে তার সাহিত্য কর্মে।

www.pathagar.com

৩. **শিল্পকলা :** শিল্পকলা হচ্ছে এমন সৃজনশীল কর্ম, যা মানুষের মনে আনন্দ দেয়। মানুষের মনের খোরাক যোগায়। শিল্পকলার অনেক শাখা রয়েছে। প্রতিটি শাখায় বিভিন্ন মাধ্যমে শিল্পী তার শিল্পকর্ম তৈরি করেন। শিল্পকর্ম হচ্ছে সৃজনশীল কর্ম। শিল্পকর্ম বলতে চিত্র, ভাস্কর্য, ড্রইং, ডায়াগ্রাম, ম্যাপ, চার্ট, খোদাই ইত্যাদি বোঝায়। এসব কাজ কতখানি শিল্পসৃষ্টি হয়েছে বা আদৌ কোন শিল্পগুণ আছে কিনা সেটি বড় কথা নয় বরং কথা হচ্ছে এসবের ওপর শিল্পীর অধিকার অপ্রতিহত। এই অধিকার অস্বীকার করা যাবে না। স্থাপত্যকর্ম এবং কারিগরী কর্ম ও শিল্পকর্মের মধ্যে পড়ে। এচিং, লিথোগ্রাফ, উডকাট, প্রিন্টিং এবং ফটোগ্রাফও শিল্পের শ্রেণীভুক্ত। প্রয়োজন পূরণ এবং আনন্দ প্রদান শিল্পের কাজ। যে কাজ মানুষের সৌন্দর্যবোধকে উদ্দীপ্ত করে সে কাজই শিল্পগুণমণ্ডিত। কোন কাজ যদি ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটায়, তবে কেবলমাত্র সে কারণে সে কাজে কোন শিল্প গুণ নেই তা বলা যাবে না। ব্যবহারিক প্রয়োজন পূরণের সাথে সাথে যে কাজ মানুষের সৌন্দর্য পিপাসা মেটায় ও তৃপ্তি সাধন করে তাই শিল্পগুণ সম্পন্ন। চলচ্চিত্র এবং নাট্যকর্মও একধরনের শিল্প। তেমনি সংগীত, রেকর্ড, নৃত্য, বাদ্য ইত্যাদিও শিল্পের আওতাভুক্ত। বস্তুত যে ধরনের, যে আঙ্গিকের বা যে মানের শিল্পই হোক না কেন এর উপর শিল্পীর অধিকার নিরঙ্কুশ। অন্য কেউ এই অধিকার হরণ করতে পারে না।

৪. ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পোৎপাদন

ব্যবসা বাণিজ্য এবং শিল্পোৎপাদনের মধ্যেও একটা সৃজনশীল বিষয় রয়েছে। আমাদের দেশে পোস্টার, ভিউকার্ড ইত্যাদির ব্যবসা এখন বেশ জমে উঠেছে অথচ কয়েকবছর আগেও এ বিষয়টি তেমন চোখে পড়ে নি। পোশাকের উপর নকশা কারুকাজও অংকন করা মনোলোভা বিষয়। এসব অবশ্যই সৃজনশীল কাজ। তাছাড়া কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিশেষ বিশেষ দ্রব্য বা পণ্য বাজারে ক্রেতাদের অতিপ্রিয় হওয়ার পেছনেও উৎপাদক এবং বাজারজাতকারীর কুশলতা, কর্মদক্ষতা এবং সৃজনশীলতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আর তাই আধুনিককালে শুধু ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের সুনাম ও বিক্রয়যোগ্য সম্পত্তি বলে বিবেচ্য। ব্যক্তির সৃজনশীলতার কারণে অথবা কুশলতা ও দক্ষতার কারণে নতুন কিছু উদ্ভব হতে পারে। যা তার একান্ত নিজস্ব সম্পত্তি বলে বিবেচ্য। এজন্য প্যাটেন্ট, ডিজাইন, স্ট্যান্ডার্ড ইত্যাদি সম্পত্তি বলে বিবেচ্য। বস্তুত যে সব সৃজনশীল কাজে ব্যক্তির আর্থিক বা নৈতিক স্বার্থ রয়েছে সেগুলো রক্ষা করার অধিকার ব্যক্তির রয়েছে।

বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পকলার স্রষ্টা বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক ও শিল্পী তার সৃষ্টির স্বার্থ সংরক্ষণের অধিকার রাখেন। তারা যা সৃষ্টি করেন সে ক্ষেত্রে তাদের নৈতিক স্বার্থ রয়েছে আর রয়েছে বৈষয়িক স্বার্থ। যে শিল্পী যা সৃষ্টি করেন সেই সৃষ্টি তার নামেই দুনিয়াজোড়া পরিচিত হবে, তার নামেই প্রকাশিত ও প্রচারিত হবে। কোন আবিষ্কার, সাহিত্যকর্ম ও শিল্পকর্ম শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক ও শিল্পীর নামেই পরিচিত হবে, অন্য কারো নামে নয়। এটাই হচ্ছে নৈতিক

www.pathagar.com

স্বার্থ। সৃজনশীল কর্মের নৈতিক স্বার্থ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এটা স্থায়ী স্বার্থ। কখনো কোনভাবেই সেটা অবলুপ্ত হয় না। দ্বিতীয় স্বার্থটি হচ্ছে বৈষয়িক। সৃজনশীল কর্মের কপিরাইট বা স্বত্ব বলে যে আর্থিক সুবিধা পাওয়া যায়, সেটাই হচ্ছে বৈষয়িক স্বার্থ। প্রতিটি সৃজনশীল কর্মের স্রষ্টা তার কর্মের নৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থ সংরক্ষণের অধিকার রাখেন। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রত্যেক বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক ও শিল্পীর নিজের কর্মের সৃজনশীল কর্মের বৈষয়িক ও নৈতিক স্বার্থ রক্ষা করার অধিকার রয়েছে।

সারসংক্ষেপ

প্রত্যেক মানুষের একটি সাংস্কৃতিক জীবন আছে। তার অশন, ভূষণ, গৃহায়ন, অলঙ্করণ, চিত্রায়ন প্রভৃতির মধ্যে যে বিশিষ্টতা স্বতপ্রতীয়মান সেটি তার সংস্কৃতি। সংস্কৃতি মানুষকে যেমন বিশিষ্টতা দেয় তেমনি মানুষও সংস্কৃতিকে বিশিষ্টতা দেয়। একে অপরের মধ্যে প্রবিষ্ট। সাংস্কৃতিক জীবনে যুক্ত হওয়া তাই মানবিক অধিকার।

তার দেশ এবং সমাজ যে শিল্প প্রতিষ্ঠা করে, তার দেশ ও সমাজ যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ায় বিত্তবান হয় সেগুলো উপভোগ করা তার মানবাধিকার। তার দেশের শিল্প ও বিজ্ঞান তার অহংকার।

মানুষ সৃষ্টি করে সাহিত্য শিল্প এবং অবদান রাখে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। এগুলো তার ব্যক্তিগত সম্পদ। যার মেধায়, প্রজ্ঞায়, প্রতিভায় এবং সর্বশেষে শ্রমে যা সৃষ্টি হয়, সাহিত্যের ক্ষেত্রে, শিল্পের ক্ষেত্রে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, সেগুলো তারই সম্পদ। এই সম্পত্তির উপর তার স্বত্ব একটি মানবাধিকার।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

প্রত্যেক ব্যক্তি এমন এক সামাজিক ও আন্তর্জাতিক পরিবেশে বসবাসের অধিকারী যেখানে এই ঘোষণায় উল্লিখিত সকল অধিকার ও স্বাধীনতা পূর্ণরূপে কার্যকর করা যায়।

(Article : 28. Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this declaration can be fully realized.)

ভাষ্য

আলোচ্য অনুচ্ছেদে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় বর্ণিত অধিকার ও স্বাধীনতা পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের অনুকূল পরিবেশের কথা বলা হয়েছে। অনুকূল পরিবেশ সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আমরা পর্যালোচনা করে দেখি মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় কোন কোন অধিকারের কথা উল্লেখিত হয়েছে।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার ভূমিকায় বলা হয়েছে, "মানব সমাজের প্রতিটি সদস্যের আত্মমর্যাদা ও অবিচ্ছেদ্য সম অধিকারের স্বীকৃতিই হচ্ছে বিশ্বে স্বাধীনতা, ন্যায় বিচার ও শান্তির মূল ভিত্তি" এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জাতিসংঘে অন্তর্ভুক্তির পর সদস্য রাষ্ট্রগুলো বিশ্বসংস্থার সহযোগিতায় মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও মানুষের মৌলিক স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সাধারণ পরিষদ অতঃপর এই ঘোষণাকে "সকল মানুষ ও জাতির জন্য অবশ্য পালনীয় কর্তব্য" হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। প্রত্যেক ব্যক্তি ও সমাজের প্রতিটি অংশকে এসব অধিকার ও স্বাধীনতার মর্যাদা বিধান এবং এগুলোর সর্বজনীন স্বীকৃতি ও প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সচেষ্ট হতে হবে।

ঘোষণার প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "মর্যাদা ও অধিকারের ক্ষেত্রে সকল মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন ও সমান।"

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে, "জাতি, বর্ণ, নারী, পুরুষ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্যান্য মতামত, জাতীয় বা সামাজিক অবস্থান, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্যান্য কার্যকরণ ইত্যাদি যে কোন ধরনের বৈষম্য নির্বিশেষে, প্রতিটি মানুষ এই ঘোষণায় বর্ণিত সকল স্বাধীনতা ও অধিকার

www.pathagar.com

ভোগ করবে।" এতে আরো বলা হয়েছে যে, "কোন দেশ বা ভূখণ্ডের রাজনৈতিক বা আন্তর্জাতিক মর্যাদার ভিত্তিতে কোন মানুষের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না।"

অনুচ্ছেদ ৩ থেকে অনুচ্ছেদ ২১ পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে মানুষের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারসমূহ। অধিকারগুলো হচ্ছেঃ

* ব্যক্তির জীবনযাপন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার
* দাসত্ব থেকে মুক্তি
* নির্যাতন এবং নিষ্ঠুর অমানবিক ও অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তি থেকে অব্যাহতি
* আইনগত দিক থেকে ব্যক্তি মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি
* আইনগত সম নিরাপত্তা
* মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কার্যকর আইনগত প্রতিকার
* জবরদস্তিমূলক গ্রেফতার, আটক বা নির্বাসন থেকে মুক্তি
* স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ট্রাইবুনালে ন্যায়বিচার ও প্রকাশ্য শুনানি
* ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, পরিবার, বাসগৃহ বা চিঠিপত্র আদান প্রদানে স্বৈরাচারী হস্তক্ষেপ থেকে অব্যাহতি
* চলাচল ও বসবাসের স্বাধীনতা
* আশ্রয় প্রার্থনা
* জাতিসত্তা
* বিবাহ এবং পরিবার গঠন
* সম্পত্তির মালিকানা
* চিন্তা বিবেক ও ধর্মাচরণের স্বাধীনতা
* মতামত প্রকাশ ও অভিব্যক্তির স্বাধীনতা
* শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও মেলামেশা
* সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ
* সরকারি চাকুরিতে সমানাধিকার

অনুচ্ছেদ ২২ থেকে অনুচ্ছেদ ২৮ পর্যন্ত অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে :

* সামাজিক নিরাপত্তা
* কাজকর্ম এবং ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও এতে যোগদান
* বিশ্রাম ও বিনোদন
* স্বাস্থ্যসম্মত এবং কল্যাণকর জীবনযাপন
* শিক্ষা
* সমাজের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ

www.pathagar.com

প্রতিটি মানুষ উপরে বর্ণিত স্বাধীনতা ও অধিকারে সত্ত্ববান। এই সকল স্বাধীনতা ও অধিকার আপনাআপনি কার্যকর হয় না। পরিপূর্ণভাবে এসব কার্যকর করতে হলে চাই অনুকূল পরিবেশ। অনুকূল সামাজিক ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ না থাকলে মানুষের এসব অধিকার ও স্বাধীনতা পরিপূর্ণরূপে কার্যকর হতে পারে না। এই যে অনুকূল সামাজিক ও আন্তর্জাতিক পরিবেশে বসবাস এটাও মানুষের অধিকার। অন্যান্য সকল অধিকার ও স্বাধীনতা বাস্তবায়নের জন্য, কার্যকর করার জন্যে এই অধিকারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য। অনুকূল সামাজিক ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্পর্কে এবারে আলোচনা করছি।

মানবাধিকার কার্যকর করার অনুকূল পরিবেশ

মানুষের সকল অধিকার রক্ষার মত সামাজিক ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ কি আছে? এ প্রশ্নের জবাব খুব সহজ নয় কারণ পৃথিবীর সকল দেশের সমাজ এক রকম নয়। কিছু কিছু দেশ ও জাতি আছে যেখানে সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ হয়েছে সর্বোচ্চ। সে সব দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় অপেক্ষাকৃত কম। শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্পের বিকাশের কারণে ঐসব দেশের মানুষের মন মানবিক বোধে উজ্জীবিত ফলে মানবাধিকার কার্যকর করার মত অনুকূল সামাজিক পরিবেশ কিছুটা হলেও বিদ্যমান থাকে। আবার কিছু কিছু দেশ আছে যেখানে মানুষের সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ তেমন হয় নি, তদুপরি অজ্ঞানতা, কুসংস্কার, ইত্যাদির কারণে সেসব দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় মারাত্মকভাবে। এসব দেশে মানবাধিকার কার্যকর করার মত যথেষ্ট অনুকূল পরিবেশ থাকে না।

তাছাড়া আন্তর্জাতিক পরিবেশও সকল দেশে একরকম নয়। অনেক দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব যুদ্ধবিরোধী আবার অনেক দেশে যুদ্ধবাজ। এই দুই রকম দেশে মানবাধিকার বাস্তবায়নের বা কার্যকর করণের পরিবেশ সমান নয়। এই পরিবেশ নির্ভর করে রাষ্ট্রব্যবস্থা, রাজনৈতিক নেতৃত্বের সদিচ্ছা, কূটনীতির মান, অনুসৃত রাজনৈতিক আদর্শ, জনগণের ধৈর্য ও সহনশীলতা ইত্যাদির উপর। সামাজিক ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ সাধারণভাবে মানবাধিকার কার্যকরের অনুকূল নয়। জাতিসংঘ তাই অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট। এজন্য বিশ্ব সংস্থার কিছু সংস্থা জোর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। জাতিসংঘের কোন সংস্থা মানবাধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য জাতিসংঘ কি করছে নিম্নে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট জাতিসংঘের সংস্থা

মানবাধিকার কমিশনই হচ্ছে মানবাধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘের প্রধান সংস্থা। মানবাধিকার বিষয়ে এই কমিশনই সার্বিক নীতি নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের একটি সংস্থা হিসেবে ১৯৪৬ সালে কমিশনটি গঠিত হয়। ৪৩ সদস্যের এই কমিশন মানবাধিকার সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন সুপারিশের উদ্দেশ্যে প্রতি বছর ছয় সপ্তাহকাল অধিবেশনে বসে। কমিশন তার ব্যাপক ক্ষমতাবলে মানবাধিকার সম্পর্কিত যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম। মানবাধিকার এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি কিংবা মানবাধিকার উন্নয়নের মত বিভিন্ন মৌলিক প্রশ্নে কমিশন সমীক্ষা চালিয়ে থাকে। এই সংস্থা নতুন আন্তর্জাতিক চুক্তিও প্রণয়ন করে। প্রসঙ্গত উদাহরণস্বরূপ শিশুদের অধিকার এবং নির্যাতন নিষিদ্ধকরণ চুক্তির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সম্প্রতি এই কমিশন মানবাধিকারের প্রতি সার্বিক শ্রদ্ধাবোধবৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে সহযোগিতামূলক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এ ছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মানবাধিকার সংরক্ষিত হচ্ছে কিনা, তা তদন্ত করে দেখাও কমিশনের দায়িত্ব। ব্যাপক হারে মানবাধিকার লংঘনের প্রতিকার বিধানে সরাসরি ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতাও কমিশনের রয়েছে।

১৯৪৭ সালে অনুষ্ঠিত কমিশনের প্রথম অধিবেশনে সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ রোধ ও তাদের নিরাপত্তা বিধানের ব্যাপারে নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি উপকমিশন প্রতিষ্ঠা করে। বৈষম্যের অবসান এবং সংখ্যালঘুদের অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সমীক্ষা পরিচালনা ও সুপারিশ প্রদানই এই উপ কমিশনের মূল লক্ষ্য। এ ছাড়াও পরিষদ বা কমিশনের প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব ও সম্পাদন করতে হয় উপকমিশনকে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রধানত মানবাধিকার লংঘনের বিষয়ে পেশকৃত অভিযোগপত্র পরীক্ষা ও পর্যালোচনা।

উপকমিশন প্রায়শই বিশেষ বিশেষ প্রশ্নে সমীক্ষা প্রণয়নের জন্য বিশেষ প্রতিবেদক নিয়োগ করে থাকে। এ গুলোর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে : শিক্ষা, ধর্ম ও বিচার ব্যবস্থায় বৈষম্য ; দক্ষিণ আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক ও বর্ণবাদী শাসকগোষ্ঠীকে রাজনৈতিক মদদ এবং সামরিক অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ধরনের সাহায্য করার ফলে মানবাধিকারের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ; কোন দেশে বসবাসকারী অনাগরিকদের অধিকার ; জাতি, ধর্ম ও ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘুদের অধিকার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের বিষয়ে জাতিসংঘের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের ঐতিহাসিক ও বর্তমান বিকাশের ধারা ; নতুন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার সঙ্গে মানবাধিকার সমুন্নত করণের এবং মানবাধিকার হিসেবে পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার।

উপরোক্ত সমস্যাবলী সম্পর্কে সাধারণ নীতিমালা নির্ধারণ এবং খসড়া প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই সমীক্ষাগুলি ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

মানব তৎপরতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকায় জাতিসংঘের প্রায় সব কটি সংস্থাই কোন না কোনভাবে মানবাধিকারের সঙ্গে জড়িত। মানবাধিকার কমিশন ও তার উপকমিশন ছাড়া অপর যে সব প্রধান প্রধান ফোরামে মানবাধিকার প্রশ্নে আলোচনা করা হয়, সে গুলো হচ্ছে : সাধারণ পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, নারীদের মর্যাদাবিষয়ক কমিশন এবং বর্ণবৈষম্য

www.pathagar.com

দূরীকরণ কমিটি। এই সকল ফোরাম বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার কার্যকরী করার অনুকূল সামাজিক ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ গড়ে তুলতে প্রয়াসী।

জাতিসংঘ সনদে সাধারণ পরিষদকে, "অর্থনৈতিক , সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণ এবং জাতি, ধর্ম, ভাষা, নারী পুরুষ নির্বিশেষে মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করণে সাহায্য" করার উদ্দেশ্যে "সমীক্ষণ পরিচালনার নির্দেশ ও সুপারিশ প্রদান" করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের উদ্যোগে সাধারণ পরিষদের আলোচ্য সূচিতে মানবাধিকারের বিষয় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। কিংবা সাধারণ পরিষদের পূর্ববর্তী অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী কোন নির্দিষ্ট অধিবেশনে তা আলোচনার জন্য গৃহীত হয়েছে। জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলো কিংবা কখনো কখনো বিশ্বসংস্থার মহাসচিব মানবাধিকার বিষয়ক বিশেষ কোন প্রশ্ন সাধারণ পরিষদের আলোচ্য সূচিতে অন্তর্ভূক্তির প্রস্তাব করেছেন।

সাধারণ পরিষদের আলোচ্য সূচিভুক্ত মানবাধিকার সংক্রান্ত অধিকাংশ বিষয়ই আলোচনার জন্য তৃতীয় কমিটিতে তথা সামাজিক সাংস্কৃতিক ও মানবিক কমিটিতে পাঠানো হয়। মানবাধিকার বিষয়ক যে সব প্রশ্ন সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেগুলো বিবেচনার জন্য সাধারণ পরিষদের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন কিংবা বিশেষ রাজনৈতিক কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। একইভাবে, অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত প্রশ্নগুলো সাধারণত দ্বিতীয় কমিটিতে এবং ভূখণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলো চতুর্থ কমিটিতে বিবেচিত হয়ে থাকে।

সাধারণ পরিষদের গঠিত বেশ কয়েকটি অঙ্গসংস্থা ও কমিটি তাদের নিজ নিজ এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে কাজ করছে। এমন একটি সংস্থা হচ্ছে নামিবিয়া সংক্রান্ত জাতিসংঘ পরিষদ। ঔপনিবেশিক দেশ ও জনগোষ্ঠীকে স্বাধীনতা প্রদান বিষয়ক বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে গঠিত বিশেষ কমিটি এ ধরনের অপর একটি উল্লেখযোগ্য সংগঠন।

সাধারণ পরিষদ কখনো কখনো প্রয়োজন সাপেক্ষে মানবাধিকার কর্মসূচিতে সহায়তার উদ্দেশ্যে অস্থায়ী ভিত্তিতে অঙ্গসংস্থা এবং বিশেষ কমিটি প্রতিষ্ঠা করেছে। এ প্রসঙ্গে বর্ণবাদ বিরোধী বিশেষ কমিটি এবং ইসরাইল অধিকৃত এলাকায় বসবাসরত মানুষের মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা তদন্তের জন্য গঠিত বিশেষ কমিটির নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য।

নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার, আন্তর্জাতিক সনদের বিধি অনুসারে অধিকারসমূহ কার্যকর করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির গৃহীত পদক্ষেপ এবং এসব অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতি সম্পর্কে নিয়মিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এই কমিটির মূল দায়িত্ব। এই প্রতিবেদন সমূহের ভিত্তিতে কমিটি তার কর্মসূচি সম্পর্কিত শীর্ষ রিপোর্ট প্রণয়ন এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের মাধ্যমে তা সাধারণ পরিষদে পেশ করে। মানবাধিকারের ক্ষেত্রে অবদানের জন্য স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এবং উচ্চ নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ১৮ জন সদস্য নিয়ে গঠিত এই কমিটি, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র ও সাধারণ পরিষদে মতামত পাঠাতে পারে।

www.pathagar.com

জাতিসংঘ সনদ অনুসারে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ "সকলের জন্য মৌলিক স্বাধীনতা ও মানবাধিকার নিশ্চিত করা এবং এ ব্যাপারে মানুষের শ্রদ্ধাবোধ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে সুপারিশ" প্রদান করতে পারে। মানবাধিকার সমুন্নত করার লক্ষ্যে সাধারণ পরিষদে প্রেরণের জন্যে খসড়া কনভেনশন প্রণয়ন, আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান ও কমিশন গঠনের এখতিয়ারও পরিষদের রয়েছে। পরিষদ এ বিষয়ে তার সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত হবার জন্য জাতিসংঘের সদস্য দেশ ও জাতিসংঘের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে সমঝোতায় আসতে পারে। পরিষদের আলোচ্য সূচিভুক্ত মানবাধিকার প্রসঙ্গগুলি সাধারণত দ্বিতীয় (সামাজিক) কমিটিতে বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়।

জাতিসংঘের অন্যান্য প্রধান অঙ্গসংস্থা, নিরাপত্তা পরিষদ, অছি পরিষদ এবং আন্তর্জাতিক আদালতেও মাঝে মাঝে মানবাধিকার প্রসঙ্গ গৃহীত হয়ে থাকে।

মানবাধিকার লংঘনের ব্যাপারে জাতিসংঘের পদক্ষেপ

মানবাধিকার কমিশন ও তার উপ-কমিশন প্রতিবছর প্রকাশ্য অধিবেশনে মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা লঙ্ঘনের প্রশ্নে আলোচনা করে থাকে। বিশ্বের যে কোন অংশে বর্ণবৈষম্য ও বর্ণবাদের বিষয়বস্তু এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। পরিস্থিতির পর্যালোচনার আলোকে সংশ্লিষ্ট এলাকায় তথ্য সন্ধানীদল বা বিশেষজ্ঞ প্রেরণ, সরেজমিনে ঘটনাপ্রবাহ জরীপ, সরকার সমূহের সঙ্গে আলোচনা, প্রয়োজনীয় সহায়তা দান, অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে সরাসরি নিন্দা জ্ঞাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদক্ষপ নেয়া হয়।

এ ছাড়াও মানবাধিকার কমিশন ও তার উপ-কমিশন বিশেষত ব্যাপকহারে মানবাধিকার লংঘনের কার্যকারণ পরীক্ষা করে দেখেছে। এ উদ্দেশ্যে দুটি কার্যনির্বাহী গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। একটির দায়িত্ব হচ্ছে, দাসত্ব বা শিশু শ্রমের মতো দাসত্বমূলক আচরণ পর্যালোচনা। অপরটি বলপ্রয়োগের দরুন বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিরুদ্দেশ হবার ঘটনাবলী তদন্তের উদ্দেশ্যে গঠন করা হয়। নির্যাতনের ঘটনাও অনুরূপ একটি উদ্বেগজনক বিষয়। অপরদিকে, ব্যাপকহারে দেশত্যাগ এবং সংক্ষিপ্ত ও একতরফা বিচারে প্রাণদণ্ড দানের বিষয় তদন্তের জন্যেও বিশেষ প্রতিবেদক নিয়োগ করা হয়েছে।

গণহত্যা সম্পর্কে জাতিসংঘের ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে বিশাল জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্যাপক অপরাধের নিদারুণ অভিজ্ঞতার আলোকে ১৯৪৮ সালে সাধারণ পরিষদে গণহত্যার অপরাধ প্রতিরোধ ও তার দণ্ড বিধানের ওপর একটি কনভেনশন গৃহীত হয়। এতে গণহত্যাকে একটি জাতি, গোষ্ঠী, গোত্র বা ধর্মীয় গ্রুপকে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছামূলকভাবে পরিচালিত অভিযান হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কনভেনশনে ঘোষণা করা হয়, শান্তি বা যুদ্ধকালীন যে কোন সময়ে গণহত্যা আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে বিচারযোগ্য অপরাধ।

www.pathagar.com

বর্ণবৈষম্য প্রতিরোধকল্পে জাতিসংঘের পদক্ষেপ

বিশেষ করে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বসংস্থা বিষয়টির প্রতি প্রভূত নজর দিয়েছে। ঔপনিবেশিক শোষণের শিকার অনেক সদ্য স্বাধীন দেশ, দক্ষিণ আফ্রিকার সংখ্যাগুরু কৃষ্ণাংগ জনগণের ওপর প্রভুত্বকারী শ্বেতাঙ্গ সংখ্যালঘু শাসকগোষ্ঠীর কার্যকলাপে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। জাতিসংঘ এসব শাসকগোষ্ঠীর নীতি পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। বস্তুত জাতিসংঘ যে সব সমস্যার মোকাবেলা করছে, সেগুলির অধিকাংশ বৈষম্যমূলক আচরণ ও জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা থেকে উদ্ভূত।

সাধারণ পরিষদ বারম্বার বর্ণবাদী নীতির নিন্দা করেছে। ১৯৬৩ সালে পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে সকল প্রকার বর্ণবৈষম্য নির্মূল করণ সংক্রান্ত ঘোষণা গৃহীত হয়। এতে জোর দিয়ে বলা হয় : জাতি, গাত্রবর্ণ বা গোষ্ঠীগত কারণে বৈষম্যমূলক আচরণ মানবিক মর্যাদার প্রতি আঘাত স্বরূপ এবং তা জাতিসংঘ সনদ অস্বীকারের সামিল। এ ধরনের আচরণ মানবাধিকারের পরিপন্থী ও তা বিভিন্ন দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ঘোষণায় আরো বলা হয়, যে সব দেশ বর্ণবাদী নীতি অনুসরণ করে ও যে সব দেশ এই নীতির শিকার হয়—তারা উভয়ই সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কোন দেশ অবশ্য আইনত এই ঘোষণা মেনে চলতে বাধ্য নয়। তবে মনে রাখা প্রয়োজন, যে সব দেশ এই ঘোষণার পক্ষে ভোট দিয়েছে তারা তা অনুসরণে নৈতিকভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

সাধারণভাবে মানবাধিকারের সমর্থনে, বর্ণবৈষম্যের মোকাবেলা করতে গিয়ে একটি অত্যন্ত কার্যকর পন্থা হিসেবে জাতিসংঘ বিশ্বের মানুষের কাছে এর বিপদ ও ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরছে এবং তা অবসানের উপায় বাতলে দিচ্ছে। বর্ণবৈষম্য অবসানের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক দিবস পালনের এটাই মূখ্য উদ্দেশ্য। প্রতিবছর ২১ মার্চ দিবসটি পালন করা হয়। ১৯৬০ সালের এই দিনে দক্ষিণ আফ্রিকার শার্পভিলে বর্ণবাদের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে ৭০ জনেরও বেশি নিহত এবং ১৮০ জনেরও বেশি আহত হয়েছিলেন।

বর্ণবাদ ও বর্ণবৈষম্য নির্মূল করার উদ্দেশ্যে বিশাল এক অভিযানের অংশ হিসেবে সাধারণ পরিষদ, ১৯৭৩ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত ১০ বছর সময়কালকে বর্ণবাদ ও বর্ণবৈষম্য মোকাবেলার দশক নামে চিহ্নিত করে। এ উপলক্ষ্যে সকল দেশের প্রতি এই দশকে মানবাধিকার সমুন্নতকরণ, বিশেষ বর্ণবাদ ও বর্ণবৈষম্য উচ্ছেদের লক্ষ্যে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়। একইসঙ্গে বর্ণবাদী নীতির প্রসার রোধ, বর্ণবাদী শাসকচক্রের অবসান ঘটানো এবং বর্ণবাদ ও বর্ণবৈষম্যে মদদ যোগাতে পারে এমন সব ভ্রান্ত ধ্যান ধারণা পরিত্যাগেরও আহবান জানানো হয়।

দশকটির ঠিক মাঝামাঝি সময়ে, ১৯৭৮ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত একটি বিশ্ব সম্মেলন দশকের দ্বিতীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। কর্মসূচিতে দক্ষিণ আফ্রিকার শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্যাপক ও বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা আরোপ, সকল সরকার কর্তৃক সব ধরনের বৈষম্যমূলক আইন ও আচরণ বর্জন, জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব কিংবা ঘৃণার বশবর্তী হয়ে মতবাদ প্রচারের দণ্ড বিধান করে

www.pathagar.com

আইন অনুমোদন এবং দেশীয় জনগণ ও অপর দেশ থেকে আগত শ্রমজীবির অধিকার সংরক্ষণের ডাক দেওয়া হয়।

বর্ণবাদ ও বর্ণবৈষম্য মোকাবেলার উদ্দেশ্যে জেনেভায় দ্বিতীয় বিশ্ব সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৩ সালে। সম্মেলনে গৃহীত ২৮ দফা ঘোষণায় আবারও জোর দিয়ে বলা হয় : বর্ণবাদ ও বর্ণবৈষম্যের অব্যাহত অভিশাপকে বিশ্বের বুক থেকে চিরতরে উচ্ছেদ করতে হবে। বর্ণবাদ , বর্ণবৈষম্য এবং বর্ণবিদ্বেষ পুরোপুরি রহিত করার উদ্দেশ্যে এই সম্মেলনে বর্ণবাদ ও বর্ণবৈষম্য মোকাবেলার দ্বিতীয় দশক পালনের আহবান জানানো হয়। দ্বিতীয় দশকের জন্যে সম্মেলনে একটি কর্মসূচিও গ্রহণ করে। এতে বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে কার্যব্যবস্থা, বর্ণবাদ নির্মূলকরণের লক্ষ্যে শিক্ষা গ্রহণ, শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণ, বর্ণবাদের বিরুদ্ধে গণমাধ্যমসমূহে তথ্য অভিযান, বর্ণবৈষম্যের শিকার সংখ্যালঘু গ্রুপের নিরাপত্তা বিধান, বর্ণবৈষম্যের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন, বর্ণবৈষম্য বিরোধী জাতীয় আইন প্রণয়ন ও প্রতিষ্ঠান গঠন এবং বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক সমীক্ষা পরিচালনা ও সেমিনার আয়োজনের সুপারিশ করা হয়। কর্মসূচিতে বর্ণবৈষম্য দূর করার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রদান এবং সকল প্রকার বর্ণবৈষম্য নির্মূলকরণের কনভেনশন বাস্তবায়নেরও আহ্বান জানানো হয়। ১৯৮৫-এর জুলাইতে নিরাপত্তা পরিষদ দঃ আফ্রিকার বিরুদ্ধে কতিপয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ১৯৮৬-তে প্যারিসে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে দঃ আফ্রিকার বিরুদ্ধে বাধ্যতামূলক অর্থনৈতিক অবরোধের আহ্বান জানানো হয়।

জাতিগত বৈষম্যবিরোধী কনভেনশন

সাধারণ পরিষদ ১৯৬৫ সালে সকল প্রকার জাতিগত বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন গ্রহণ করে। এতে এ ধরনের বৈষম্যের অবসান ঘটানো এবং সকল জাতির মাঝে সমঝোতা গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। এটা করা হয় এই প্রত্যয়ের ভিত্তিতে যে, "জাতিগত বৈশিষ্ট্যভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্বের যে কোন মতবাদ বৈজ্ঞানিকভাবে ভ্রান্ত, নৈতিকতার দিক থেকে নিন্দনীয়, সামাজিকভাবে অন্যায় ও বিপজ্জনক এবং কোথাও, তত্ত্বে বা প্রয়োগে জাতিগত বৈষম্যের কোন যুক্তি নেই।" কনভেনশনটি ১৯৬৯ সালে বলবৎ করা হয়।

"জাতি, বর্ণ, বংশ, গোত্র ভিত্তিক যে কোন পার্থক্য, বহিষ্কার, বাধানিষেধ বা অগ্রাধিকার ,যার লক্ষ্য বা ফল হচ্ছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা জনজীবনের অন্য যে কোন ক্ষেত্রে, সমমর্যাদার ভিত্তিতে মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা ভোগ বা প্রয়োগের স্বীকৃতি রদ বা ক্ষতিসাধন করা", তাকে জাতিগত বৈষম্য বলে বর্ণনা করে কনভেনশনে এর নিন্দা করা হয়েছে।

কনভেনশনের শর্তাধীনে একটি জাতিগত বৈষম্য বিলোপ কমিটি গঠিত হয়েছে। কনভেনশন বাস্তবায়নের জন্য কনভেনশন অনুমোদনকারী দেশের গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের দেয়া রিপোর্ট বিবেচনা করা এই কমিটির দায়িত্ব। ১৮ জন বিশেষজ্ঞ নিয়ে গঠিত এই কমিটি সংশ্লিষ্ট দেশের

www.pathagar.com

প্রতিনিধিদের সঙ্গে রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করে এবং পরামর্শ দেয়। কমিটি সাধারণ পরিষদের কাছেও সুপারিশ ও রিপোর্ট পেশ করে। কমিটি কনভেনশন মেনে চলা নিয়ে বিভিন্ন পক্ষের মধ্যেকার মতভেদ দূর করার চেষ্টা চালাতে এবং এ ধরনের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ ও পেশ করতে পারে। কনভেনশনের ধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কমিটির কাছে তাদের অভিযোগ বা দুর্দশার কথা তুলে ধরতে পারে। অবশ্য তাদের সরকার এ ধরনের অভিযোগ গ্রহণের ব্যাপারে কমিটির যোগ্যতা স্বীকার করে নিলেই কেবল তারা তা করতে পারে।

জাতিবিদ্বেষ বা অ্যাপারথেইড সম্পর্কে জাতিসংঘের দৃষ্টিভঙ্গি

জাতিবিদ্বেষ হচ্ছে প্রতিষ্ঠানিক জাতিগত বৈষম্য ও পৃথকীকরণের একটি নিয়মানুগ রূপ। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার ১৯৪৮ সাল থেকে সরকারি নীতি হিসেবে এটা অনুসরণ করে আসছে। জাতি বিদ্বেষ নীতির অধীনে দক্ষিণ আফ্রিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সে দেশের কৃষ্ণাঙ্গদের দেশের রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয় না। তারা নির্যাতনমূলক নানা আইন ও বিধির শিকার।

সাধারণ পরিষদ এবং নিরাপত্তা পরিষদ উভয়েই জাতিবিদ্বেষকে জাতিসংঘ সনদের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ঘোষণা করেছে। অপরাধ বলে অভিহিত করে এর অবসানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল দেশের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

জাতিবিদ্বেষ সম্পর্কে জাতিসংঘের ভূমিকা

দক্ষিণ আফ্রিকার জনগণের বিরুদ্ধে ক্রমাগত সহিংসতা ও নির্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে নিরাপত্তা পরিষদ ১৯৭৭ সালের নভেম্বরে জাতিসংঘ সদস্য দেশ কর্তৃক দক্ষিণ আফ্রিকায় অস্ত্র সরবরাহের ওপর বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। জাতিসংঘের ইতিহাসে কোন সদস্য দেশের বিরুদ্ধে এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এটাই প্রথম। জাতিসংঘ সনদের সপ্তম অধ্যায়ের অধীনে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কোন সদস্য দেশ শান্তির প্রতি হুমকি সৃষ্টি করলে , শান্তি ভঙ্গ করলে এবং আগ্রাসী তৎপরতায় লিপ্ত হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা এই অধ্যায়ে বলা হয়েছে।

জাতিসংঘের বেশ কয়েকটি কমিটি জাতি বিদ্বেষ সমস্যা মোকাবেলায় নিয়োজিত। জাতি বিদ্বেষ বিরোধী বিশেষ কমিটি পরিস্থিতির ওপর সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখে এবং সাধারণ পরিষদ ও নিরপত্তা পরিষদের কাছে রিপোর্ট পেশ করে থাকে। মানবাধিকার কমিশনের আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চল বিষয়ক বিশেষজ্ঞ গ্রুপ দক্ষিণ আফ্রিকায় রাজবন্দী ও অন্যান্য অন্তরীণ ব্যক্তিদের প্রতি দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তদন্ত করে।

এ ছাড়া সাধারণ পরিষদ তিনটি স্বেচ্ছা তহবিল গঠন করেছে। এগুলো হচ্ছে : জাতিসংঘ দক্ষিণ আফ্রিকা বিষয়ক ট্রাস্ট তহবিল, আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চল বিষয়ক জাতিসংঘ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং বর্ণবাদ বিরোধী প্রচারণা সংক্রান্ত ট্রাস্ট তহবিল। এসব তহবিলের মাধ্যমে

www.pathagar.com

বর্ণবাদ বিরোধী সংগ্রামে সাহায্যদান করা যায়। জাতিসংঘ নামিবিয়া পরিষদ অপর একটি তহবিল পরিচালনা করে থাকে। বিশ্ব জনমত উপেক্ষা করে দক্ষিণ আফ্রিকা নামিবিয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে এবং অবৈধভাবে অধিকৃত অঞ্চলে বর্তমানে বর্ণবাদ প্রথা বহাল রয়েছে।

বর্ণবাদ প্রথার প্রতি বিশ্বের সরকারসমূহ ও জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা বিলোপের উপায় সম্পর্কে জাতিসংঘ বেশ কিছু সংখ্যক আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও সেমিনারের আয়োজন করেছে। সাধারণ পরিষদ ১৯৭৮ সালের মার্চ থেকে ১৯৭৯ সালের মার্চ পর্যন্ত সময়কে আন্তর্জাতিক বর্ণবাদ বিরোধী বিশেষ বর্ষ ঘোষণা করে। বর্ণবাদ বিরোধী কমিটি ১৯৭৭ সালে নাইজেরিয়ার লাগোসে বর্ণবাদ বিরোধী কার্যক্রম বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানে সাহায্য করে। এই সম্মেলনে গৃহীত ঘোষণায় বর্ণবাদ বিলোপের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণে বিশ্বের সরকারসমূহ ও জনগণের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়। পরে সাধারণ পরিষদ এই ঘোষণা অনুমোদন করে।

১৯৮১ সালে প্যারিসে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে দক্ষিণ আফ্রিকা কর্তৃক জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত মেনে চলা নিশ্চিত করার সবচেয়ে সঠিক ও কার্যকর উপায় হিসেবে নিষেধাজ্ঞা আরোপসহ দক্ষিণ আফ্রিকাকে এক ঘরে করার জন্য আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ ও বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা আরোপের সমর্থনে বিশ্ব জনমত গড়ে তোলা ও রাষ্ট্রসমূহকে ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষে সাধারণ পরিষদ ১৯৮২ সালকে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা সংগঠন বর্ষ ঘোষণা করে।

সাধারণ পরিষদ ১৯৮১ সালে প্রতি বছর ৯ই আগস্ট দক্ষিণ আফ্রিকা ও নামিবিয়ার নারী সমাজের সংগ্রামের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয়।

এ ছাড়াও বেশ কিছু সংখ্যক বিশেষ দিবস পালিত হয়ে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে শার্পভিল গণহত্যা স্মরণে আন্তর্জাতিক দিবস, দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রামরত জনগণের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস (জুন ১৬) এবং দক্ষিণ আফ্রিকান রাজবন্দীদের সঙ্গে সংহতি দিবস (অক্টোবর ১১)।

সাধারণ পরিষদ ১৯৭৩ সালে জাতিবিদ্বেষ অপরাধ দমন ও শাস্তি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন গ্রহণ করেছে এবং আন্তর্জাতিক আইনে জাতিবিদ্বেষ অপরাধের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

কনভেনশনে বলা হয়, জাতিবিদ্বেষ অপরাধের আন্তর্জাতিক দায়িত্ব ব্যক্তি, সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠানের সদস্য এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের বেলায় প্রযোজ্য হবে—তা যে দেশে অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে, সে দেশে বা অন্যত্র যেখানে থাকুন না কেন। কনভেনশন অনুমোদনকারী যে কোন দেশ অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচার করতে পারবে।

কনভেনশনটি ১৯৭৬ সালে বলবৎ হয়। কনভেনশন অনুমোদনকারী রাষ্ট্রকে তা বাস্তবায়নের জন্য তার গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে মাঝে মাঝে মানবাধিকার কমিশনের তিন সদস্যের একটি গ্রুপের কাছে রিপোর্ট পেশ করে থাকে।

www.pathagar.com

খেলাধুলা থেকে জাতিবিদ্বেষ বিলোপের প্রচেষ্টায় সাধারণ পরিষদ যে দেশে খেলাধূলার ক্ষেত্রে জাতি বৈষম্য সরকারি নীতি হিসেবে চালু আছে , সে দেশের কোন ব্যক্তি বা দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ না করার জন্য ব্যক্তি, ক্রীড়া সংগঠন ও উদ্যোক্তাদের প্রতি আবেদন জানিয়েছে। সাধারণ পরিষদ ১৯৭৭ সালে খেলাধূলায় জাতি বিদ্বেষ বিরোধী আন্তর্জাতিক ঘোষণা গ্রহণ করে। এবং ১৯৮৫ তে ক্রীড়াক্ষেত্রে অ্যাপারথেইড সংক্রান্ত কনভেনশন গ্রহণ করে। এ ছাড়া ১৯৮১ সাল থেকে প্রতি দু'বছর অন্তর দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে ক্রীড়া সম্পর্ক যারা রাখেন, তাদের একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়ে আসছে।

বৈষম্য রোধ ও সংখ্যালঘুদের রক্ষা সংক্রান্ত উপকমিশন ১৯৪৭ সালে থেকে ধর্ম রাজনৈতিক মতবাদ এবং গোত্র ও বর্ণসহ অন্যান্য কারণের ভিত্তিতে সংগঠিত বৈষম্যমূলক আচরণ সম্পর্কে সমীক্ষা চালিয়ে আসছে। উপকমিশন সকল প্রকার জাতিগত বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত কমিশন এবং ধর্ম বা বিশ্বাসভিত্তিক সকল প্রকার অসহিষ্ণুতা ও বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত ঘোষণা উভয়েরই প্রথম খসড়া প্রনয়ন করে।

জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ সংস্থাসমূহও নিজ নিজ কার্যক্ষেত্রে বৈষম্যের বিরুদ্ধে সক্রিয়। জাতিসংঘ শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা ইউনেস্কো শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য বিরোধী একটি কনভেনশন গ্রহণ করেছে। ১৯৬০ সালে এই কনভেনশন বলবৎ হয়। একই বছর আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা আইএলও কর্মসংস্থান ও পেশার ক্ষেত্রে বেষম্য সম্পর্কিত একটি কনভেনশন অনুমোদন করে। উভয় কনভেনশনেই তাদের বিভিন্ন ধারা বাস্তবায়নের জন্য সরকার সমূহ কী করছে এবং বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সে সম্পর্কে মাঝে মাঝে রিপোর্ট পেশের ব্যবস্থা আছে।

শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় জাতিসংঘ

জাতিসংঘের অন্যতম বিশেষ সংস্থা আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (আইএলও)-র প্রায় সকল কর্মকাণ্ডই শ্রমিক শ্রেণীর মানবাধিকার রক্ষার লক্ষ্যে পরিচালিত। ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত আইএলও ১৬২টি কনভেনশন এবং ১৭২টি সুপারিশ গ্রহণ করে। এগুলো মিলে তৈরি হয়েছে একটি আন্তর্জাতিক শ্রমবিধি যা শ্রমিক শ্রেণীর নানা ধরনের অধিকার রক্ষা করে থাকে। কাজের সময়, ন্যূনতম মজুরি, মাতৃত্ব রক্ষা, শিল্পক্ষেত্রে দুর্ঘটনা থেকে নিয়োগ নীতি পর্যন্ত সবই এর মধ্যে পড়ে। কনভেনশনগুলোর একটি হচ্ছে বলপূর্বক শ্রম আদায় প্রথার বিলোপ, এবং অপর একটি সভা সমিতির স্বাধীনতা ও শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার রক্ষা সংক্রান্ত।

স্বদেশহীন ব্যক্তিদের জন্য জাতিসংঘ

স্বদেশহীন ব্যক্তিদের অবস্থা সম্পর্কিত একটি কনভেনশন ১৯৫৪ সালে গৃহীত ও ১৯৬৯ সালে বলবৎ হয়। এতে জাতীয়তাবিহীন ব্যক্তিদের মর্যাদা বিধৃত হয়েছে। ভবিষ্যত স্বদেশহীনতা

www.pathagar.com

হ্রাস করার এবং এই সমস্যা মোকাবেলার চেষ্টায় জাতিসংঘ ১৯৬১ সালে একটি কনভেনশন গ্রহণ করে। এর নাম স্বদেশহীনতা হ্রাস সংক্রান্ত কনভেনশন। ১৯৭৫ সালে এটা বলবৎ করা হয়। কিন্তু ১৯৮৭ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত মাত্র ১৪টি দেশ এই কনভেনশন অনুমোদন করে বা মেনে নেয়। জাতীয়তা আইনের জটিলতা ও বিভিন্নতা এটাকে সবচেয়ে কঠিন প্রশ্নে পরিণত করেছে। তবে, জাতিসংঘ এই কনভেনশন অনুমোদনকারী রাষ্ট্রের সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

উদ্বাস্তুদের সাহায্যার্থে জাতিসংঘ

জাতিসংঘ মানবাধিকারের ক্ষেত্রে বাস্তব কিছু কাজ করেছে এ ক্ষেত্রে। উদ্বাস্তুদের বৈষয়িক সাহায্য দানের জন্য বিশেষ করে দুটি কর্মসূচির উপয় দায়িত্ব ন্যস্ত আছে। এগুলো হচ্ছে : দূরপ্রাচ্যে ফিলিস্তিন উদ্বাস্তুদের জন্য জাতিসংঘ ত্রাণ ও কর্মসংস্থান এবং জাতিসংঘ উদ্বাস্তু বিষয়ক হাই কমিশনের দপ্তর (UNRWA এবং UNHCR) যুদ্ধ নির্যাতন ও অভ্যন্তরীণ গোলযোগের শিকার লক্ষ লক্ষ মানুষকে দেখাশুনা করা এ দুটি সংস্থার দায়িত্ব।

UNRWA জর্ডান লেবানন, সিরিয়া এবং অধিকৃত পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকার ফিলিস্তিন উদ্বাস্তুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ও ত্রাণ সার্ভিস প্রদানের কাজে নিয়োজিত। সংস্থাটি ১৯৮৩ সালের মাঝামাঝি থেকে প্রায় ৮০ লক্ষ উদ্বাস্তুকে তালিকাভুক্ত করে। এবং ১৯৮২ সালের মাঝামাঝি থেকে লেবাননে সংঘর্ষের দরুণ দুর্ভোগের শিকার বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তুকে জরুরি ত্রাণ সাহায্য দিয়ে থাকে। বর্তমানে UNHCR আফ্রিকা, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু ও স্থানচ্যুত মানুষের প্রত্যাবাসন বা পুনর্বাসনে সাহায্য করছে। সাহায্য করছে তাদের আশ্রয়দানে, অধিকার তুলে ধরতে, আত্মনির্ভরশীল হতে এবং সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে।

১৯৫১ সালে সাধারণ পরিষদ উদ্বাস্তুদের মর্যাদা সম্পর্কিত এক কনভেনশন গ্রহণ করে। এই কনভেনশন অনুযায়ী জীবন বা স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে বিশেষ করে এমন কোন অঞ্চলে উদ্বাস্তুদের বহিষ্কার করা নিষিদ্ধ। যে দেশে উদ্বাস্তুরা অবস্থান করবে সে দেশে ধর্ম পালন, আদালতের স্মরণাপন্ন হওয়া, শিক্ষা, ত্রাণ, শ্রম আইন, গৃহসংস্থান এবং চলাচলের স্বাধীনতার ব্যাপারে তারা কি সুবিধা পাবে না পাবে এতে তারও সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে। ১৯৬৭ সালের একটি প্রটোকল অনুযায়ী এই কনভেনশন 'নতুন উদ্বাস্তু' অর্থাৎ ১৯৫১ সালের পয়লা জানুয়ারির পর সংগঠিত ঘটনাবলীর দরুণ যারা উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছে তাদের অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

তথ্যের স্বাধীনতার অধিকার সম্পর্কে জাতিসংঘে

মতামত প্রকাশ ও সংবাদপত্রসহ তথ্যের স্বাধীনতার প্রশ্নটি নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তির অন্তর্ভুক্ত আছে। 'শিল্পের আকারে বা অন্য যে কোন মিডিয়ার মাধ্যমে মৌখিকভাবে, লিখিতভাবে বা মুদ্রিত আকারে সকল প্রকার তথ্য ও চিন্তাধারা অর্জন ও পরিবেশনের স্বাধীনতা' এর মধ্যে পড়ে।

www.pathagar.com

তবে, এই অধিকারের আরো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা লিখিত আকারে গ্রথিত করার চেষ্টা সফল হয় নি। কারণ, বিভিন্ন দেশ এ সম্পর্কে, বিশেষ করে সমাজে সংবাদপত্রের ভূমিকার ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে থাকে।

এই বিষয়ের একটি দিকের উপর সাধারণ পরিষদ আন্তর্জাতিক সংশোধন অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন গ্রহণ করেছে। এই কনভেনশন অনুযায়ী কোন দেশ তার সম্পর্কে অপর কোন দেশে প্রকাশিত খবরকে মিথ্যা বা বিকৃত মনে করলে সেই দেশে তার সংশোধনী প্রকাশ করতে পারবে। ১৯৬২ সালে এই কনভেনশন বলবৎ হয়। তথ্যের অবাধ, ব্যাপক ও অধিকতর সুষম সরবরাহ হবে এর ভিত্তি।

ক্রীতদাসত্ব সম্পর্কে জাতিসংঘ

ক্রীতদাসত্ব সম্পর্কে সংস্থার প্রধান দলিল হচ্ছে : ১৯২৬ সালে লীগ অব নেশনস অনুমোদিত আন্তর্জাতিক দাসত্ব কনভেনশন। ১৯৫৬ সালে জাতিসংঘের এক সম্মেলনে গৃহীত দাসত্ব, দাস ব্যবসায় ও দাসত্বের অনুরূপ প্রতিষ্ঠান ও প্রথা বিলোপ সংক্রান্ত একটি সম্পূরক কনভেনশন এবং লোক পাচার ও বেশ্যাবৃত্তি রোধ সংক্রান্ত ১৯৪৯ সালের কনভেনশন। দাসত্ব কনভেনশন অনুমোদনকারী রাষ্ট্রসমূহ ক্রীতদাস ব্যবসায় রোধ ও দমন এবং সকল প্রকার ক্রীতদাসত্ব সম্পূর্ণ বিলোপের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সম্পূরক কনভেনশনে ক্রীতদাসত্বের ন্যায় কতিপয় প্রতিষ্ঠান ও প্রথা যেমন, ঋণের দায়ে দাসত্ব বন্ধন, কনে ক্রয়, নারী সমাজের প্রতি ক্রীতদাস সুলভ আচরণ এবং শিশু শ্রমিক নিয়োগ বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছে। লোকপাচার বিরোধী কনভেনশন অনুমোদনকারী রাষ্ট্রসমূহ এ ধরণের কারবারে নিয়োজিত ও বেশ্যাবৃত্তির শাস্তিদানে সম্মতি প্রকাশ করেছে।

ক্রীতদাসত্ব ও সংশ্লিষ্ট প্রথা বিলোপ সম্পর্কে পরামর্শ দানের উদ্দেশ্যে ১৯৭৪ সালের দাসত্ব বিষয়ক একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠিত হয়। এই গ্রুপ বৈষম্য রোধ ও সংখ্যালঘুদের রক্ষা সংক্রান্ত উপকমিশনের কাছে রিপোর্ট পেশ করে থাকে। এই গ্রুপকে ক্রীতদাসত্ব ও ক্রীতদাস ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ঘটনাবলী পর্যালোচনা এবং প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা সুপারিশের লক্ষ্যে, এ বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত যে কোন তথ্য পরীক্ষা করে দেখার অধিকার দেয়া হয়েছে। গ্রুপটি ক্রীতদাসত্ব নির্মূলের ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে। এসব ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে ভূমি সংস্কার এবং বিশেষ করে কৃষিক্ষেত্রে কারিগরী শিক্ষাদান নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন। কোন কোন পরিস্থিতিতে মানুষ নানা ধরনের অর্থনৈতিক ক্রীতদাসে পরিণত হয় সে সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ পরীক্ষা চালানোর জন্যও গ্রুপটি সুপারিশ করেছে। ১৯৮২ সালে ক্রীতদাসত্বের উপর একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। এতে নতুন ধরনের ক্রীতদাসসুলভ শোষণের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

শিশুদের অধিকার সম্পর্কে জাতিসংঘ

জাতিসংঘের অন্যতম বহুল পরিচিত সংস্থা জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ)। এর মুখ্য দায়িত্বই হচ্ছে বিশ্বের শিশুদের অধিকার রক্ষা ও কল্যাণ সাধন। এই তহবিল উন্নয়নশীল দেশসমূহের সুযোগ বঞ্চিত শিশুদের সুষ্ঠু স্বাস্থ্য প্রযত্ন ও পুষ্টি, ব্যবহারিক শিক্ষা, বিশুদ্ধ পানীয় জল ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং অন্যান্য মৌলিক সুবিধা লাভের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে থাকে। ইউনিসেফ স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পল্লীর পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ও অন্যান্য গণমুখী সেবার জন্য উপকরণ যোগান দেয় এবং এ ধরনের সেবা চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় স্থানীয় লোকজনকে প্রশিক্ষণ দানে সাহায্য করে। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি থেকে ইউনিসেফ গ্রাম বা শহরবাসীদের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে কমিউনিটি পর্যায়ে এ ধরনের প্রচেষ্টাকে সহায়তা দানের উপর ক্রমবর্ধমানভাবে দৃষ্টি দিয়ে আসছে।

শিশুদের অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা ইউনিসেফের প্রচেষ্টার জন্য কাঠামো তৈরি করেছে। সাধারণ পরিষদ ১৯৫৯ সালে সর্বসম্মতিক্রমে এই ঘোষণা গ্রহণ করে। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার কোন কোন ধারা শিশুদের বেলায়ও প্রযোজ্য বলে সেগুলো এই ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই ঘোষণায় আরো বলা হয় শিশু "জন্মের আগে ও পরে যথাযথ আইনগত আশ্রয়সহ তার বিশেষ সুরক্ষা ও যত্নের প্রয়োজন।'

ঘোষণার মূল কথা হচ্ছে, মানুষের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা শিশুর প্রাপ্য। ঘোষণায় বর্ণিত অধিকার ও স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দান এবং সেগুলো মেনে চলার জোর চেষ্টা চালানোর জন্য বাবা মা, ব্যক্তিমানুষ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং সরকার সমূহের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। ঘোষণার নীতিমালার একটিতে বলা হয়েছে, শিশুরা বিশেষ সুরক্ষা ভোগ করবে এবং তাদেরকে সুযোগ সুবিধা দিতে হবে যাতে তারা স্বাভাবিক ও সুস্থ উপায়ে এবং স্বাধীনতা ও মর্যাদার পরিবেশে বেড়ে উঠতে পারে। সাধারণ পরিষদ ১৯৭৯ সালকে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ ঘোষণা করে। শিশুদের কল্যাণ বৃদ্ধির জন্য গৃহীত নিজেদের কর্মসূচি পর্যালোচনায় সকল দেশকে উৎসাহিত করাই ছিল এর লক্ষ্য। মানবাধিকার কমিশন বর্তমানে শিশু অধিকার সংক্রান্ত একটি কনভেনশন প্রণয়নে রত।

শিক্ষার অধিকার প্রসঙ্গে জাতিসংঘ

স্কুলের অভাবে বিশ্বের প্রায় অর্ধেক শিশু বিনা শিক্ষায় বেড়ে ওঠে। প্রতি ১০ জনের ৪ জন একেবারেই লিখতে পড়তে জানে না বয়স্কদের মধ্যে। এমতাবস্থায় শিক্ষার অধিকার বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টার প্রয়োজন। জাতিসংঘের একটি বিশেষ সংস্থা "জাতিসংঘ শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা" (ইউনেস্কো) এই অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই এ ব্যাপারে তার পরিকল্পনা প্রনয়ন করেছে। সংস্থার প্রচেষ্টাসমূহের মধ্যে রয়েছে জাতীয় স্বাক্ষরতা কর্মসূচি উদ্ভাবনে বিভিন্ন দেশকে সহায়তা করা এবং জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)-র আর্থিক সহায়তায়

www.pathagar.com

পরীক্ষামূলক গণস্বাক্ষরতা কর্মসূচি পরিচালনায় সাহায্য করা। ইউনেস্কোর সহায়তার মধ্যে রয়েছে শিক্ষামূলক কর্মসূচি, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণদান, ব্যয়বহুল স্কুল নির্মাণে সহায়তা, পাঠ্যক্রমের আধুনিকায়ন এবং উন্নত মানের পাঠ্যবই তৈরি। সরবরাহ এবং উপকরণ দিয়ে ইউনিসেফও জাতীয় শিক্ষা কর্মসূচিতে সহায়তা করে থাকে।

বন্দী ও কারারুদ্ধ ব্যক্তিদের অধিকার প্রসঙ্গে জাতিসংঘ

জাতিসংঘ কারারুদ্ধ ও বন্দীদের আচরণের ন্যূনতম মান নীতি ঘোষণা করেছে। বর্তমানে সাধারণ পরিষদ এ ধরনের ব্যক্তিদের মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের লক্ষ্যে অতিরিক্ত নীতিমালা প্রনয়ন করেছে।

এ ছাড়াও বৈষম্যরোধ ও সংখ্যালঘুদের রক্ষা সংক্রান্ত উপকমিশন প্রতিবছর এ ধরনের ব্যক্তিদের আইনগত ও প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সরকার, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বেসরকারি সাহায্য সংস্থার পেশ করা তথ্য পরীক্ষা করে থাকে। এই পরীক্ষার ভিত্তিতে উপকমিশন বন্দী বা কারারুদ্ধ ব্যক্তিদের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাস্তব সুপারিশ করে থাকে।

নির্যাতনের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ

নির্যাতন সংক্রান্ত মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার ৫ নং অনুচ্ছেদ, পরে আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার চুক্তির ৭ নং ধারায় অন্তর্ভুক্ত করে তাকে আরো শক্তিশালী করা হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে জাতিসংঘ তার মান নির্ধারণ ও তথ্যানুসন্ধান তৎপরতার মাধ্যমে নির্যাতন বিলোপ করার ব্যাপারে তার প্রচেষ্টা জোরদার করেছে। ১৯৭৫ সালে সাধারণ পরিষদ নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তি থেকে সকল মানুষকে রক্ষা করা সংক্রান্ত ঘোষণা গ্রহণ করে। ১৯৮২ সালে পরিষদ নির্যাতন ও অন্যান্য নিষ্ঠুর অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তি থেকে কয়েদী ও আটক ব্যক্তিদের রক্ষার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর্মী, বিশেষ করে চিকিৎসকদের ভূমিকাকে চিকিৎসা ক্ষেত্রে নৈতিকতার নীতিমালা হিসেবে গ্রহণ করে।

সাধারণ পরিষদ নির্যাতন বিলোপের প্রচেষ্টার পাশাপাশি ১৯৮১ সালে নির্যাতনের শিকারদের জন্য জাতিসংঘ স্বেচ্ছা তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। যারা নির্যাতনের শিকার এবং তাদের পরিবারবর্গের কাছে এই তহবিলের মাধ্যমে মানবিক সাহায্য ও সহায়তা পাঠানো যাবে। সরকার, সংগঠন, ফাউণ্ডেশন এবং ব্যক্তিরা এই তহবিলে চাঁদা দিতে পারে।

এ পর্যন্ত তহবিলে ৩০ লাখ ডলারেরও বেশি চাঁদা উঠেছে। ১৯৮৪-তে সাধারণ পরিষদ নির্যাতন ও অন্যান্য নিষ্ঠুর অমানবিক বা অবমাননাকর ব্যবহারের বিরুদ্ধে একটি কনভেনশন গ্রহণ করে। জুন ১৯৮৭-তে এই কনভেনশন বলবৎ হয়। এর অধীনে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ নির্যাতন রোধ ও এর জন্য আইনগতভাবে শাস্তির বিধান করতে দায়বদ্ধ। এর মাধ্যমে ১০ সদস্যের নির্যাতন বিরোধী একটি কমিটি গঠিত হয়েছে যা নিয়মিতভাবে নির্যাতন বন্ধের ব্যাপারে সরকারসমূহের কার্যকলাপ নিরীক্ষা করে দেখবে।

www.pathagar.com

নারী সমাজের অধিকার রক্ষার্থে জাতিসংঘ

জাতিসংঘ শুধুমাত্র নারী সমাজের অধিকার সম্পর্কিত প্রথম যে আইনগত উদ্যোগ গ্রহণ করে, তা হচ্ছে নারী সমাজের রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন। ১৯৫২ সালে সাধারণ পরিষদ কনভেনশনটি গ্রহণ করে। কনভেনশনে বলা হয় নারী সমাজ পুরুষদের সঙ্গে সমমর্যাদায় সকল নির্বাচনে ভোট দিতে পারবে। তারা পুরুষদের সঙ্গে সমান মর্যাদায় জাতীয় আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সরকারি পদ অধিকার করতে ও সকল সরকারি দায়িত্ব পালন করতে পারবে।

১৯৫২ সালে বিবাহিত নারীদের জাতীয়তা সংক্রান্ত একটি কনভেনশন গৃহীত হয়। এই কনভেনশন অনুমোদনকারী রাষ্ট্রসমূহ স্বীকার করে নেয় যে, তার কোন নাগরিকের সঙ্গে কোন কোন বিদেশী বা বিদেশিনীর বিবাহ অনুষ্ঠিত হলে, বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে বা বিবাহকালে স্বামীর জাতীয়তার পরিবর্তন ঘটলে স্ত্রীর জাতীয়তা আপনাআপনি পরিবর্তিত হবে না।

সাধারণ পরিষদ ১৯৬৭ সালে নারী সমাজের বিরুদ্ধে বৈষম্য, বিলোপ সংক্রান্ত ঘোষণা গ্রহণ করে। পারিবারিক জীবন ও সমাজের সকল ক্ষেত্রে নারীর অধিকার সংক্রান্ত নীতিমালা ও মান এতে বিধৃত হয়েছে। এসব নীতিমালা ও মান নারী সমাজের বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত কনভেনশনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই কনভেনশন আইনগত দিক থেকে বাধ্যবাধকতাপূর্ণ। সাধারণ পরিষদ ১৯৭৯ সালে কনভেনশনটি গ্রহণ করে এবং ১৯৮১ সালে তা বলবৎ হয়। ১৯৮৭ সালের আগস্ট পর্যন্ত ৯০টি দেশ কনভেনশনটি অনুমোদন করেছে।

রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নাগরিক ক্ষেত্রে নারী সমাজের সমতা অস্বীকার বা সীমিতকারী বৈষম্যের অবসান ঘটানোই এই কনভেনশনের লক্ষ্য। কনভেনশন অনুমোদনকারী রাষ্ট্রসমূহকে এর বিভিন্ন ধারা বাস্তবায়নের জন্য তাদের গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে মাঝে মাঝে রিপোর্ট পেশ করতে হয়। নারী সমাজের বিরুদ্ধে বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত ২৩ সদস্যের একটি কমিটি এসব রিপোর্ট পরীক্ষা করে থাকে। ১৯৮২ সালে কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের প্রথম বৈঠকে এই কমিটি নির্বাচন করা হয়। এই কমিটি আবার সাধারণ পরিষদের কাছে প্রতিবছর তার রিপোর্ট পেশ করে থাকে।

নারী সমাজের অবস্থা বিষয়ক কমিশন সমতা অর্জনের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী নারী সমাজের অগ্রগতি পর্যালোচন্নার উদ্দেশ্যে এক বছর অন্তর অন্তর বৈঠকে মিলিত হয়। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ সংস্থা বিশেষ করে আইএলও এবং ইউনেস্কোর সঙ্গে অর্থনৈতিক অধিকার ও শিক্ষার অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে ঘনিষ্টভাবে কাজ করা এবং আঞ্চলিক আন্তসরকার সংস্থার ও বেসরকারি সাহায্য সংস্থা সমূহের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে কমিশন আইনের দিক থেকে ও বাস্তবে নারী সমাজের অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে বেশ কিছু সংখ্যক সুপারিশ গ্রহণ করেছে।

নারী সমাজ বিষয়ক জাতিসংঘের বর্তমান কর্মসূচিসমূহে পুরুষ ও নারীর সমান সুযোগ ও সমানাধিকারের উপর গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে পরিবারে নারীর

www.pathagar.com

ভূমিকা, দেশের অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতিতে তাদের পূর্ণাঙ্গ সমন্বয় সাধন এবং নারী সমাজের অবস্থা ও জনসংখ্যা সমস্যার আন্তসম্পর্কের উপর।

সাধারণ পরিষদের ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭৫ সাল আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ হিসেবে পালিত হয়। এই বর্ষে জাতিসংঘের উদ্যোগে মেক্সিকো সিটিতে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে নারী ও পুরুষের সমতা ও উন্নয়ন ও শান্তির ক্ষেত্রে তাদের অবদান সংক্রান্ত নীতিমালা সম্বলিত একটি ঘোষণা এবং নারীসমাজের অবস্থার উন্নয়নের রূপরেখা ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে একটি আন্তর্জাতিক জরুরি কর্ম পরিকল্পনা গৃহীত হয়। সম্মেলনের সুপারিশক্রমে সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘ নারী দশক ঘোষণা করে ১৯৭৬ থেকে ১৯৮৫কে।

১৯৭৬ সালে সাধারণ পরিষদ নারীসমাজের অগ্রগতির লক্ষ্যে একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপনের বিষয় অনুমোদন করে। ১৯৮৩ সালে ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রের সান্টো ডোমিঙ্গিতে এর সদর দপ্তর উদ্বোধন করা হয়। ১৯৮৫ সালের জুলাই মাসে নাইরোবীতে অনুষ্ঠিত নারী দশকের সাফল্য মূল্যায়ন সংক্রান্ত বিশ্ব সম্মেলনে নারী প্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ২০০০ সাল পর্যন্ত কার্যকর একটি কৌশলগত কর্ম পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

এভাবেই জাতিসংঘ তার কর্মতৎপরতার একটা বিরাট অংশ নিবেদন করে, মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা পূর্ণরূপে কার্যকর করার অনুকূল সামাজিক ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য। জাতিসংঘের প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের যেমন এই পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দায়িত্ব রয়েছে তেমনি দায়িত্ব রয়েছে সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের। প্রতিটি ব্যক্তিমানুষ মানবাধিকার উন্নয়নে কিভাবে জাতিসংঘকে সাহায্য করতে পারে এ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করছি।

১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র অনুমোদনের পর থেকেই এই সংস্থা মানবাধিকার উন্নয়ন প্রচেষ্টায় ভূমিকা পালনের জন্য ব্যক্তি মানুষের প্রতি বিশেষভাবে আহ্বান জানিয়ে আসছে। সকল জাতি ও জনগোষ্ঠীর অগ্রগতির একটি সাধারণ মানদণ্ড হিসেবে সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র অনুমোদত হয়। এর লক্ষ্য হচ্ছে, প্রত্যেক ব্যক্তি ও সমাজের প্রত্যেক অঙ্গ ঘোষণাপত্রটিকে সর্বদা স্মরণ রেখে শিক্ষাদান ও জ্ঞান প্রসারের মাধ্যমে এ সকল অধিকার ও স্বাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করতে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রগতিশীল ব্যবস্থাদির দ্বারা সদস্য রাষ্ট্রসমূহের জনগণ ও তাদের অধীনস্থ অঞ্চলসমূহের অধিবাসীবৃন্দ উভয়ের মধ্যে এগুলোর সর্বজনীন ও কার্যকর স্বীকৃতি ও মান্যতা অর্জনের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাবে।

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র অনুমোদনের পর চার দশক অতিক্রান্ত হতে চলেছে। এখনও বহু নাগরিক তাদের নিজ সম্প্রদায়ের মাঝে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এককভাবে চেষ্টা চালাবার সময় বা বেসরকারি সাহায্য সংস্থায় অন্যান্যের সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করার সময় কথাগুলো মনে প্রাণে স্মরণ রাখে। নিজের জানার এবং অন্যান্যকে জানানোর জন্য ব্যক্তি মানুষ মানবাধিকার প্রশ্নের উপর জাতিসংঘ ও অন্যান্য সূত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন ধরনের মুদ্রিত রচনা পেতে

www.pathagar.com

পারেন। নাগরিকরা স্কুলগুলোকে মানবাধিকার সম্পর্কে শিক্ষাদান করতে বা পত্রপত্রিকা ও সাময়িকী গুলোকে এ বিষয়ে লিখতে উৎসাহিত করতে পারেন। তারা তাদের সভার সদস্য বা অন্যান্য নেতাকে লিখতে পারেন, যাতে তারা সরকারকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কনভেনশন অনুমোদনে উদ্বুদ্ধ করেন।

এক্ষেত্রে জাতিসংঘের প্রচেষ্টায় আরো সরাসরি সাহায্য করার জন্য তারা ইউনিসেফ, জাতিসংঘ ত্রাণ ও কর্ম তহবিল, উদ্বাস্তু হাই কমিশনার, দক্ষিণ আফ্রিকা বিষয়ক ট্রাস্ট তহবিল, জাতিসংগ নামিবিয়া তহবিল, আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চল বিষয়ক জাতিসংঘ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বা নির্যাতনের শিকারদের জন্য জাতিসংঘ স্বেচ্ছা তহবিলসহ মানবাধিকারের অগ্রগতির লক্ষ্যে পরিচালিত জাতিসংঘে কমসূচিসমুহে অর্থ সাহায্য দিতে পারেন।

ব্যাপক অর্থে মানবাধিকার রক্ষা ও তার উন্নয়নের সমস্যার জাতিসংঘের প্রধান বিবেচ্য বিষয়। যেহেতু জীবিকা অর্জন করতে না পারলে বা পরিবারের ভরণপোষণে অপারগ হলে অধিকার ভোগের প্রশ্নই ওঠে না। সেহেতু আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর সকল অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের কর্মসূচি মানবাধিকার উন্নয়নেরই কর্মসূচি। যেহেতু যে দেশে মানুষ বাস করে সে দেশের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার নিজের না থাকলে মানুষ স্বাধীন থাকতে পারে না, সেহেতু ঔপনিবেশিক দেশ ও জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টা মূলত মানবাধিকার প্রতিষ্ঠারই প্রচেষ্টা।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার বিভিন্ন অনুচ্ছেদে যে সকল অধিকার ও স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করা হচ্ছে, সে সকল অধিকার যেমন মানুষের রয়েছে তেমনি রয়েছে সেগুলো পূর্ণরূপে কার্যকর করার মত অনুকূল সামাজিক ও আন্তর্জাতিক পরিবেশের অধিকার। পরিবেশ যদি অনুকূল না হয় তাহলে অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব নয়। স্বাধীনতা রক্ষা করার এবং অধিকার আদায় করার মত অনুকূল সামাজিক ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ দরকার। সেই অনুকূল পরিবেশের নিশ্চয়তা না দিলে শুধু অধিকারের আর স্বাধীনতার তালিকা দিয়ে লাভ কি? তাই সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের দুটি দিক। এক. স্বাধীনতা ও অধিকার লাভের অধিকার। দুই এই সব স্বাধীনতা ও অধিকার কার্যকর করার মতো অনুকূল পরিবেশ লাভের অধিকার। মোট কথা হচ্ছে অধিকারও দিতে হবে আবার অধিকার রক্ষার পরিবেশও সৃষ্টি করে দিতে হবে।

মানবাধিকার কার্যকরকরণের প্রয়াস

'পরবর্তী প্রজন্মগুলোকে যুদ্ধের অভিশাপ থেকে রক্ষা করতে হবে' এই মৌল অভিপ্রায় নিয়ে জাতিসংঘের স্থপতিরা ১৯৪৫ সালে এর সনদ প্রণয়ন করেছিলেন। এই সনদেই মৌলিক মানবাধিকার এবং ব্যক্তি মানুষের মূল্য ও মর্যাদার বিষয়ে নেতৃবৃন্দের আস্থা এবং দৃঢ়তা অভিব্যক্ত হয়। জাতিসংঘের সনদেই মূলত মানবাধিকারের প্রতিফলন ঘটে। সনদে বলা হয় যে, বিশ্বশান্তির জন্য স্থিতিশীলতা ও জনকল্যাণ অপরিহার্য। এ কারণেই জীবনযাত্রার উন্নততর মান নিশ্চিতকরণ,

www.pathagar.com

পূর্ণ কর্মসংস্থান, আর্থসামাজিক অগ্রগতির পরিবেশ সৃষ্টি এবং জাতি ধর্ম বা ভাষা, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানবাধিকারের প্রতি সর্বজনীন শ্রদ্ধা ও সকল মানুষের মৌলিক স্বাধীনতা সমুন্নত রাখার বিষয়টি বিশ্বসংস্থার অন্যতম অভীষ্ট লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়।

মানবাধিকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং বিশ্বশান্তির মত বিষয়গুলি পরস্পরের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। ছোটবড় নির্বিশেষে সকল দেশ ও জাতিকে এগুলো অর্জনে সহায়তার জন্য জাতিসংঘ তাই অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য হিসেবে মানবাধিকার বিষয়ক সর্বজনীন এই ঘোষণাপত্রটি প্রণয়ন করে। ১৯৪৮ সালে সংস্থার সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে এই ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়।

এর আঠার বছর পর ১৯৬৬ সালের ৬ই ডিসেম্বর অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কে আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ঘোষণাপত্রকে আরো সুনির্দিষ্ট আইনগত রূপ দেয়া হয়। এই সময় শেষোক্ত চুক্তিটির একটি ঐচ্ছিক সহ-দলিলও গৃহীত হয়। এই দুটি চুক্তি এবং ঐচ্ছিক সহদলিলটি যারা গ্রহণ করেন, সে সব দেশ থেকে মানবাধিকার কমিটি নামক আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ কমিটিতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিযোগপত্র দাখিল করা যাবে। বস্তুত শুরু থেকে মানবাধিকার সমুন্নত রাখার জন্য বিশ্বসংস্থার জোর প্রয়াস চলছে। এর বিভিন্ন অঙ্গসংস্থা বিভিন্ন কনভেনশন গ্রহণ করেছে। নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি।

জাতিসংঘ তার বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের সহায়তায় বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশন গ্রহণ করেছে। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের বিভিন্ন অনুচ্ছেদকে আরো সুনির্দিষ্ট এবং তাৎপর্যপূর্ণ করার জন্য এই কনভেনশনগুলো গ্রহণ করা হয়। মানবাধিকার রক্ষার জন্যই এসব কনভেনশন গ্রহন ও বলবৎ করা হয়। কখন থেকে এগুলো বলবৎ হয়েছে এবং কবে, কোন উদ্দেশ্যে গ্রহন করা হয়েছে এবং এসব কনভেনশনের প্রকৃতি কি সে সম্পর্কে আমাদের এবারের আলোচনা।

গণহত্যা সম্পর্কিত কনভেনশন

১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ গণহত্যা বন্ধ ও গণহত্যার অপরাধে শাস্তি সম্পর্কিত কনভেনশন গ্রহণ করে। এই কনভেনশন গণহত্যার সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছে, "গণহত্যা হচ্ছে নিম্নবর্ণিত যে কোন একটি কাজ করা, যার দ্বারা কোন জাতিগোষ্ঠী , ধর্মগোষ্ঠী বা কোন গ্রুপকে সমূলে বা আংশিকভাবে ধ্বংস করাই উদ্দেশ্য। ১. হত্যালীলা চালানো ; ২ জাতি বা গোষ্ঠীর সদস্যের উপর মারাত্মক দৈহিক বা মানসিক ক্ষতি সাধন ; ৩. এমন জীবন ব্যবস্থা তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া, যার ফলে তারা সমূলে বা আংশিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয় ; ৪. এমন ব্যবস্থা নেয়া, যাতে করে কোন জাতি বা গোষ্ঠীর সদস্যদের সন্তান জন্ম বন্ধ হয়ে যায় ; ৫. জোরপূর্বক এক গোষ্ঠীর সন্তানদের অন্যদের কাছে হস্তান্তর করে দেয়া। ১৯৫১ সালে বলবৎকৃত

www.pathagar.com

এই কনভেনশনে সদস্যরাষ্ট্রসমূহ এই মর্মে অভিমত ব্যক্তি করে যে, গণহত্যা সংগঠিত করা হলে এবং তা যদি কোন রাষ্ট্রের সরকার নিজ রাষ্ট্রসীমার মধ্যে নিজ জনগণের উপর চালায় তাহলেও সেটিকে আর রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে গণ্য করা হবে না, বরং বিষয়টি আন্তর্জাতিক বিষয়ে পরিগণিত হবে।

একইসঙ্গে সদস্যরাষ্ট্রগুলো ঐক্যমত ব্যক্ত করে যে, শান্তির সময়ই হোক বা যুদ্ধের সময়ই হোক, গণহত্যা আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং তা বন্ধ করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া যায়। যে কোন চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষ জাতিসংঘের অঙ্গসমূহকে এরকম ব্যাপারে হস্তক্ষেপের আহ্বান জানাতে পারে।

দেশত্যাগী ও শরণার্থী সম্পর্কিত কনভেনশন

১৯৫১ সালে গৃহীত শরণার্থীদের মর্যাদা সম্পর্কিত কনভেনশন ১৯৫৪ সালে বলবৎ হয়। ১৯৬৭ সালে প্রণীত একটি প্রটোকল দ্বারা শরণার্থীদের আইনগত মর্যাদা নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয়। ১৯৫৪ সালে প্রণীত দেশত্যাগীদের মর্যাদা সম্পর্কিত আরেকটি কনভেনশন ১৯৬০ সালে বলবৎ হয়। সব মিলিয়ে বাস্তুহারা, দেশত্যাগী এবং শরণার্থীদের আইনগত মর্যাদা সম্পর্কে একটি আইনগত ভিত্তি স্থাপিত হয়। আবার স্থায়ীভাবে দেশত্যাগী ও শরণার্থী সমস্যা নিরসণের জন্য এবং দেশত্যাগী সমস্যা কমিয়ে আনার জন্য দেশত্যাগী সংকোচন কনভেনশন গৃহীত ও বলবৎ হয় যথাক্রমে ১৯৬১ ও ১৯৭৫ সালে।

নারী অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন

নারী সমাজের রাজনৈতিক অধিকারসংক্রান্ত কনভেনশন ১৯৫২ সালে গৃহীত এবং ১৯৫৪ সালে বলবৎ হয়। এর মূল বিষয়গুলো হচ্ছে, মহিলারা পুরুষের মত সকল নির্বাচনেই ভোটদানের অধিকার পাবে, নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে, অফিসে পুরুষের সাথে সম অধিকারের ভিত্তিতে চাকুরির অধিকার পাবে। অর্থাৎ মহিলা হিসেবে নারী সমাজ বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার যাতে না হয় এবং পুরুষের মতো তাদেরও যাতে সমান অধিকার থাকে, সে বিষয়টি এই কনভেনশনের মূল বিষয়।

বিবাহিতা মহিলাদের জাতীয়তা সম্পর্কিত কনভেনশন

বিবাহিত মহিলাদের জাতীয়তা সম্পর্কিত কনভেনশন ১৯৫৭ সালে গৃহীত এবং ১৯৫৮ সালে বলবৎ হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো, একজন বিদেশীর সাথে একজন মহিলার বিয়ে হলে বিয়ের সাথে সাথে স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বামীর জাতীয়তা তার উপর বর্তাবে না। একইভাবে বিবাহ বিচ্ছেদের সাথে সাথে স্বামীর জাতীয়তা যদি তার উপর বর্তে থাকে, তা চলেও যাবে না। বৈবাহিক সম্পর্ক অটুট থাকা অবস্থায় যদি স্বামী তার জাতীয়তা পাল্টায়, তাহলেও স্ত্রীর জাতীয়তার কোন

www.pathagar.com

তারতম্য হবে না। অর্থাৎ একজন নাগরিক হিসেবে পুরুষর যে অধিকার থাকবে, একজন নারীরও তেমনি অধিকার থাকবে। কেবল বিয়ের কারণে সেসবের তারতম্য ঘটবে না। তবে স্ত্রী ইচ্ছা করলে তার স্বামীর জাতীয়তা গ্রহণ করতে পারে।

বিবাহে সম্মতিদান, ন্যূনতম বয়স ও বিবাহ নিবন্ধনকরণ সম্পর্কিত কনভেনশন।

এই কনভেনশনটি যথাক্রমে ১৯৬২ ও ১৯৬৪ সালে গৃহীত ও বলবৎ হয়। এর প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, কোন বিবাহ পক্ষদ্বয়ের অবাধ স্বাধীন সম্মতি ব্যতিরেকে আইনত বৈধ হবে না। সেই সম্মতি অবশ্যই উভয়কে ব্যক্তিগতভাবে প্রদান করতে হবে। সম্মতি প্রকাশ করতে হবে প্রকাশ্যে এবং বিবাহ বৈধরূপে সম্পাদিত হতে পারে এমন কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে। এই কনভেনশনের সদস্যরাষ্ট্রসমূহ এই মর্মে অঙ্গীকার করে যে, তারা এই কনভেনশনে বর্ণিত বিধি অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করবে এবং বিবাহের নিম্নতম বয়স নির্ধারণ করে দেবে। সব বিবাহ নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি রেজিস্ট্রারী খাতায় সঠিক ভাবে লিপিবদ্ধ হবে। তৃতীয় বিশ্বের সামাজিক অবস্থাকে সামনে রেখেই এই কনভেনশন গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ তৃতীয় বিশ্বে বিবাহের ক্ষেত্রে মেয়েদের মতামতের খুব একটা মূল্য দেয়া হয় না। বাল্য বিবাহ এসব দেশে নৈমিত্তিক ব্যাপার। এমনকি আশি বছরের বৃদ্ধের সাথে কিশোরী মেয়ের বিয়ের খবরও সংবাদপত্রে দেখতে পাওয়া যায়। এই কনভেনশনের সাথে সঙ্গতি রেখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে ১৯৬৫ সালে, যাতে বিবাহের ন্যূনতম বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে।

দাসত্ব ও ক্রীতদাসপ্রথা সম্পর্কিত কনভেনশন

লীগ অব নেশনস থাকাকালে ১৯২৬ সালে দাসপ্রথা উচ্ছেদের জন্য কনভেনশন গৃহীত হয়। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এর উদ্যোগে দাসপ্রথা, দাসব্যবসা, এবং এসব সম্পর্কিত সমস্ত ধরনের প্রতিষ্ঠান ও প্রথা সম্পূর্ণ উচ্ছেদের জন্য ১৯৫০ সালে অতিরিক্ত কনভেনশন গৃহীত হয় এবং ১৯৫৭ সালে তা বলবৎ হয়। এই কনভেনশনের মাধ্যমে পক্ষরাষ্ট্রসমূহ এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় যে, যত দ্রুত সম্ভব ক্রমে ক্রমে তারা অন্যান্য আপত্তিকর প্রথা—যেমন ঋণবদ্ধতা ও ভূমিদাসত্ব ধরনের প্রথা সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

জবরদস্তি শ্রমের বিলুপ্তি সংক্রান্ত কনভেনশন

আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার সাধারণ পরিষদ আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলন কর্তৃক ১৯৫৭ সালে জবরদস্তি শ্রম উচ্ছেদ সম্পর্কিত একটি কনভেনশন গৃহীত হয়। এবং ১৯৫৯ সালে তা বলবৎ হয়। এই কনভেনশনের সদস্যরা এই মর্মে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন যে, তারা সমস্ত ধরনের জবরদস্তি, বাধ্যতামূলক বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে শ্রমদানকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বা উচ্ছেদ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ ছাড়া রাজনৈতিক আবরণেও কাউকে শ্রমশিবিরে প্রেরণ করা বা বাধ্যতামূলক শ্রমে নিযুক্ত করা

www.pathagar.com

চলবে না। রাষ্ট্রের প্রচলিত রাজনৈতিক সামাজিক বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিপরীত মত প্রকাশ করলে কাউকে শাস্তিস্বরূপ বাধ্যতামূলক শ্রমে নিয়োগ করা চলবে না। হরতাল, ধর্মঘট, কর্মবিরতি বা বন্ধের সাজাস্বরূপ কাউকে শ্রমে নিযুক্ত করা চলবে না। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অন্যতম বিশেষজ্ঞ সংস্থা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) বিশ্বব্যাপী শ্রমিকদের অধিকার, সুযোগ সুবিধা, ন্যায্য মজুরি, কাজের অনুকূল পরিবেশ, অন্যান্য ন্যায়সঙ্গত সুবিধা আদায়ের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এটা মানবাধিকার উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ন পদক্ষেপ।

সমিতি, সংঘ করার ও সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতা সম্পর্কিত কনভেনশন ১৯৪৮ সালে প্রণীত ১৯৫০ সালে বলবৎ হয়। জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার যৌথ উদ্যোগের প্রথম ফসল এই যুগান্তকারী কনভেনশন। এই কনভেনশনের মাধ্যমে সদস্য রাষ্ট্রসমূহ চাকুরিদাতা এবং শ্রমিকদের পূর্ব অনুমতি ছাড়াই নিজেদের পছন্দমত সংগঠন তৈরি, বা নিজেদের পছন্দমত সংগঠনে যোগদানের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। এতে বলা হয় শ্রমিক এবং মালিক অন্যান্য নাগরিকের মত রাষ্ট্রের আইন মেনে চলবে তবে রাষ্ট্রের আইন এমন হবে না, যাতে এই কনভেনশন বর্ণিত অধিকার ক্ষুণ্ন হতে পারে।

যৌথ দরকষাকষি এজেন্ট সম্পর্কিত কনভেনশন

এই কনভেনশন ১৯৪৯ সালে গৃহীত এবং ১৯৫১ সালে বলবৎ হয়। শ্রমিকরা যাতে ইউনিয়ন বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রক্ষা পায় এবং নিরাপত্তা ভোগ করে সে ব্যবস্থা এই দলিলে রাখা হয়েছে। বৈষম্যের কারণে কোন শ্রমিকের অধিকার যাতে ক্ষুণ্ন না হয় সে ব্যবস্থা এই কনভেনশনে স্থান পেয়েছে। যেমন কোন শ্রমিকের চাকুরি এই মর্মে শর্তাধীন করা যাবে না যে, সে ইউনিয়নে যোগ দিবে না বা ট্রেড ইউনিয়ন সদস্যপদ পরিত্যাগ করবে।

চাকুরি ও পেশার ক্ষেত্রে বৈষম্য সংক্রান্ত কনভেনশন

১৯৫৮ সালে গৃহীত এবং ১৯৬০ সালে বলবৎকৃত এই কনভেনশনে প্রতিটি সদস্যরাষ্ট্র এই মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় যে, তারা এ ধরনের জাতীয় নীতি প্রণয়ন করবে যার মাধ্যমে জাতীয় প্রয়োজন ও চাহিদা সমুন্নত থাকে। চাকুরি ও পেশার সমান সুযোগ সৃষ্টি, কর্মক্ষেত্রে সব ধরনের বৈষম্যের অবসান ঘটানো এই কনভেনশনের মূল লক্ষ্য। একই সাথে কনভেনশনের পক্ষগণ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার গঠনতন্ত্রে বর্ণিত আন্তর্জাতিক তদারকি ব্যবস্থা মেনে নেয়ার অঙ্গীকার করে।

শিক্ষা ও শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য বিরোধী কনভেনশন

ইউনেস্কোর নীতি নির্ধারণী সর্বোচ্চ পরিষদে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য নিরসনে ১৯৬০ সালে এই কনভেনশন গৃহীত এবং ১৯৬২ সালে বলবৎ হয়। পেশা ও চাকুরি ক্ষেত্রে বৈষম্য সম্পর্কিত

www.pathagar.com

কনভেনশনের মত এই কনভেনশন শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য বিরোধী। গোষ্ঠী, বর্ণ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্য কোন মতামত, ধনী দরিদ্র, সামাজিক মর্যাদা বা অন্য কোন কারণে কোন ধরনের পার্থক্য বৈষম্য সৃষ্টি বা শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি এই কনভেনশনের সম্পূর্ণ বিরোধী। এতে পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, এবং চালানো নিষিদ্ধ নয়। তবে কথা হচ্ছে এতে ভর্তি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সকলের জন্য সমান সুযোগ সুবিধা থাকতে হবে।

এ ছাড়াও ১৯৬৫ সালে জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেশন গৃহীত হয়েছে। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

বস্তুত জাতিসংঘের প্রধান ছয়টি অঙ্গ সংস্থা এবং তাদের বিশেষিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানগুলো বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার কার্যকরকরণের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। সকলের প্রচেষ্টাকে সুসংগঠিত করার জন্য তারা উপরে বর্ণিত কনভেনশনগুলোসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কনভেনশন গ্রহণ করেছে। কাজটি যদিও সহজসাধ্য নয় তথাপি জাতিসংঘে মানবাধিকার কার্যকরকরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

সারসংক্ষেপ

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় অনেক অধিকারের কথা বলা হয়েছে, বলা হয়েছে স্বাধীনতার কথা। এই অধিকার ও স্বাধীনতা আকাশ থেকে পড়ে না। এগুলোকে লালন করতে হয়। এবং সংরক্ষণের জন্য শত্রুর মোকাবেলা করতে হয়।

একদিন হয়তো ছিল যখন এইসব অধিকার ও স্বাধীনতা মানুষ ভোগ করতো, সেই যুগ স্মরণাতীত। কালে কালে এবং ক্রমে ক্রমে মানুষের উপর মানুষ চালিয়েছে অনেক অন্যায়, অনেক জুলুম, অনেক অব্যবস্থা। শক্তিমানের দাপটে মানুষের মৌলিক অধিকার হয়েছে ভূলুণ্ঠিত।

আধুনিককালে আবার মানুষ ক্রমে ক্রমে সচেতন হচ্ছে মানবাধিকারের প্রতি। মানুষ আজ বুঝতে পারছে মানুষের মৌলিক অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে নইলে মনুষ্য জাতির ধ্বংস অনিবার্য। তারা আজ আস্তে আস্তে বুঝতে পারছে মানবাধিকার রক্ষা না হলে বিশ্বের শান্তি বিনষ্ট হবে, মানুষে মানুষে হানাহানি বাড়বে এবং পরিণামে মানুষ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে।

মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য তাই প্রয়োজন এক আন্তর্জাতিক নীতিমালা। সেই নীতিমালার দাবি সকল মানুষের মানবাধিকার।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯

(ক) প্রত্যেকেরই সমাজের প্রতি কর্তব্যাদি রয়েছে যার মাধ্যমেই কেবলমাত্র তার ব্যক্তিত্বের অবাধ ও পূর্ণ বিকাশ সম্ভব।

(খ) স্বীয় অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ প্রয়োগকালে প্রত্যেকেরই শুধু ঐ ধরনের সীমাবদ্ধতা থাকবে, যা কেবল অপরের অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহের যথার্থ স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধা নিশ্চিত করা এবং একটি গণতান্ত্রিক সমাজে নৈতিকতা, গণশৃঙ্খলা ও সাধারণ কল্যাণের ন্যায্য প্রয়োজনসমূহ মিটানোর উদ্দেশ্যে আইনের দ্বারা নিরূপিত হবে।

(গ) এই সকল অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগকালে কোন ক্ষেত্রেই জাতি সংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি লংঘন করা চলবে না।

(Article : 29. (1) Every one has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.

(2) In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society. (3) These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.)

www.pathagar.com

ভাষ্য

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের আলোচ্য অনুচ্ছেদটি ব্যতিক্রমধর্মী। ইতিপূর্বেকার ২৮টি অনুচ্ছেদের প্রতিটিতেই মানুষের কোন না কোন অধিকারের কথা বলা হয়েছে, বলা হয়েছে এই সব অধিকারের সীমা, আদায়ের পদ্ধতি ও উপযুক্ত পরিবেশের কথা। কিন্তু এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে কর্তব্যের কথা, সমাজের প্রতি কর্তব্যের কথা। মানুষ শুধু অধিকার আর স্বাধীনতা নিয়েই জন্মায় না, সেই সাথে থাকে কিছু কর্তব্য কিছু সীমাবদ্ধতা। যেখানেই অধিকার আছে, সেখানেই আছে দায়িত্ব ও কর্তব্য। অধিকার ও কর্তব্য মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। একজনের কর্তব্য আরেকজনের অধিকার। একজনের অধিকার আরেকজনের কর্তব্য। কর্তব্য পালন না করলে অধিকার বাস্তবায়ন হয় না। তেমনি অধিকার অর্জিত না হলে কর্তব্য সম্পাদন হয় না । আর এ কারণেই মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের আলোচ্য অনুচ্ছেদে কর্তব্যের কথা উল্লেখিত হয়েছে। এই অনুচ্ছেদ ছাড়া মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের পরিপূর্ণতাই আসতো না। তাই আলোচ্য অনুচ্ছেদের গভীরে যাওয়ার আগে আমরা কর্তব্য সম্পর্কে আলেকপাত করবো, আলোচনা করবো অধিকার ও কর্তব্যের সম্বন্ধ এবং পারস্পরিক নির্ভরতা সম্পর্কে।

আলোচ্য অনুচ্ছেদে স্বাধীনতা এবং অধিকারের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। যেখানেই স্বাধীনতার কথা আছে সেখানেই আছে স্বাধীনতার সীমার কথা। কারণ নিরঙ্কুশ ও অপ্রতিহত অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা ও অধিকারের সীমাবদ্ধতা কতটুকু তাও এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

সর্বোপরি জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি বহির্ভূত বা এর পরিপন্থী কোন অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করাকে সীমিত করা হয়েছে। তাই আমরা অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনার পর স্বাধীনতা ও অধিকারের সীমা এবং জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি সম্পর্কে আলোকপাত করবো।

উপ অনুচ্ছেদ ক

অধিকার ও কর্তব্য

অধিকার ও কর্তব্য মূলত একটি বিষয়কে দু'দিক থেকে দেখা। যে বিষয়ে অধিকারের ধারকের অধিকার আছে, বাহকের সেই একই রকম কর্তব্য আছে। যেমন সকলের কর্তব্য হচ্ছে আপনার জীবন হরণ না করা। আমার কাছে আপনার যেটি অধিকার সেটি হচ্ছে আপনার প্রতি আমার কর্তব্য। অধিকার ও কর্তব্য মূলত একই মুদ্রার এপিঠ ও ওপিঠ। প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকে। এই যে মৌলিক অধিকারগুলো— এগুলো হচ্ছে নাগরিকের পাওনা। এবং এসব অধিকার সংরক্ষণ করা রাষ্ট্রের মৌলিক কর্তব্য বলে গণ্য করা হয়। নাগরিকের দিক থেকে তাকালে অধিকার আর রাষ্ট্রের দিক থেকে তাকালে কর্তব্য।

www.pathagar.com

তাই অধিকার ও কর্তব্যকে আলাদা করে দেখার সুযোগ নেই। অবশ্য কোন কোন আইনবিদ শর্তহীন কর্তব্যের কথাও বলেছেন। যেমন ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য, প্রাণীকূলের প্রতি কর্তব্য, সমাজে শান্তি বজায় রাখার কর্তব্য ইত্যাদি। এসবের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন অধিকার নেই তথাপি এসব কর্তব্য পালন করতে হয়। তার পরেও বলা হয়ে থাকে যে, অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর গভীরভাবে সম্পর্কিত বিষয়। সম্ভব এই দুটি ধারণার উদ্ভব হয়ে একই সময়ে। তাই অধিকার প্রতিষ্ঠার সময় কর্তব্যের কথা ভাবতে হয়, আবার কর্তব্য পালনের সময় অধিকারের কথাটি এসে যায়।

সমাজের প্রতি কর্তব্যাদি

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ বহির্ভূত মানুষের কথা কল্পনাও করা যায় না। নিজের প্রয়োজনেই মানুষ সমাজ গড়ে তুলেছিল, নিজের প্রয়োজনেই একে টিকিয়ে রেখেছে। পরিবর্তন ও বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে মানুষ অনেক কিছুকেই ধারণ ও বর্জন করেছে কিন্তু সমাজকে ত্যাগ করতে পারে নি। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কারণে মানুষ অতীতের তুলনায় অনেক অনেক বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে সমাজের প্রতি।

মানুষের এই অত্যধিক সমাজ নির্ভরতা সমাজের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। যে সমাজ নামক প্রতিষ্ঠানের উপর তার এত নির্ভরতা সেই সমাজেকে টিকিয়ে রাখার, অক্ষুণ্ন রাখার দায় তারই। সমাজকে টিকিয়ে রাখতে হলে সমাজের প্রতি কর্তব্যাদি পালন করতে হয়। সমাজের প্রতি কর্তব্যাদি বলতে মানুষের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কর্তব্যকেই বুঝায়। সমাজের মূলে আছে একক মানুষ। মানুষের প্রতি সুনির্দিষ্ট কর্তব্য পালন করলেই সমাজের প্রতি কর্তব্য পালন করা হয়। যেমন : মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, মর্যাদা ও অধিকারের ক্ষেত্রে সকল মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন ও সমান।" এই যে প্রতিটি মানুষের স্বাধীনতা ও সমতার অধিকারের কথা বলা হয়েছে, এক্ষেত্রে প্রতি মানুষের উপর কিছু কর্তব্য আপতিত হয়েছে। কর্তব্য হচ্ছে, এমন আচরণ থেকে বিরত থাকতে হবে যা অন্যের স্বাধীনতা ও সমঅধিকারে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এটা নেতিবাচক কর্তব্য, অনাকাঙ্ক্ষিত কর্ম থেকে বিরত থাকার দাবি। ইতিবাচক কর্তব্য হচ্ছে, অন্যের স্বাধীনতা ও সমঅধিকার রক্ষার উপযুক্ত ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কাজ করা। এই ঘোষণাপত্রের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনুকূলে এমনিভাবে মানুষের কর্তব্য আছে। কর্তব্য পালন না করলে অধিকার কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হবে না।

প্রতিটি অধিকারই কর্তব্যের মুখাপেক্ষী। যেমন ব্যক্তির জীবন যাপন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার আছে, তেমনি প্রতিটি ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে অন্যের জীবন যাপন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত না করা। দাসত্ব থেকে মুক্তির অধিকার যেমন মানুষের রয়েছে তেমনি প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে অন্যকে দাসত্বে আবদ্ধ হতে বাধ্য না করা, দাসত্বের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি না করা

www.pathagar.com

এবং দাসকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়া। নির্যাতন এবং নিষ্ঠুর অমানবিক ও অবমাননার আচরণ বা শাস্তি থেকে অব্যাহতি লাভের অধিকার প্রতিটি ব্যক্তির রয়েছে তেমনি এই অধিকারের অনুকূলে প্রতিটি ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে, কারো প্রতি নির্যাতন এবং নিষ্ঠুর অমানবিক ও অবমাননাকর আচরণ বা শাস্তি আরোপ না করা, অধিকন্তু এসবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। আইনগত দিক থেকে ব্যক্তি মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি লাভের অধিকার যেমন প্রত্যেকেরই রয়েছে তেমনি প্রত্যেকেরই কর্তব্য হচ্ছে অন্যকে ব্যক্তি মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান। আইনগতভাবে সমনিরাপত্তা লাভের অধিকার যেমন প্রত্যেকের আছে তেমনি প্রত্যেকের কর্তব্য রয়েছে এই নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করা। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কার্যকর আইনগত প্রতিকার লাভের অধিকার যেমন প্রত্যেকেরই আছে তেমনি সংশ্লিষ্ট জনের কর্তব্য হচ্ছে এই প্রতিকারের ব্যবস্থা করা। প্রত্যেকেরই অধিকার রয়েছে জবরদস্তিমূলক গ্রেফতার, আটক বা নির্বাসন থেকে মুক্তিলাভের, তেমনি যারা গ্রেফতার আটক বা নির্বাসন প্রদানের দায়িত্বে রয়েছেন তাদের দায়িত্ব হচ্ছে, এক্ষেত্রে জবরদস্তি করা থেকে বিরত থাকা। প্রত্যেকেরই কর্তব্য রয়েছে কারো ব্যক্তিগত গোপনতা, পরিবার বাসগৃহ বা চিঠিপত্রের আদান প্রদানে স্বৈরাচারী হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকা। কারো চলাচলের ও বসবাসের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন না করার কর্তব্য রয়েছে সকলের উপর। আশ্রয় প্রার্থনার অধিকার যেমন রয়েছে সকলের, তেমনি যার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা হলো তার কর্তব্য হচ্ছে আশ্রয় দান করা।

পশুরও সমাজ আছে, থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের বক্তব্য হচ্ছে মানুষের সমাজকে নিয়ে। কারণ আমাদের আলোচ্য বিষয় মানবাধিকার। তাই যেখানে মানুষ থাকে না সেখানে সমাজ থাকে না। মানুষ না থাকলে সমাজ থাকে না। এটা যেমন সত্য তেমনি সমাজ না থাকলে মানুষ বাঁচতে পারে বটে তবে মানুষের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয় না। মানব প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ সমাজের মাধ্যমেই সম্ভব। আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও বিকাশ মানুষকে আরো অধিক মাত্রায় সমাজ নির্ভর করে তুলেছে, বিজ্ঞানের যুগ মানেই যৌথ জীবন। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সুফল মানুষ একা ভোগ করতে পারে না, সবাইকে নিয়ে এই সুফল ভোগ করতে হয় তেমনি সকল কিছুই এক ব্যক্তি বা এক জাতির পক্ষে উদ্ভাবন, আবিষ্কার সম্ভব নয় সেজন্য বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে দরকার সকলের সম্মিলিত প্রয়াস।

প্রত্যেকেরই জাতিসত্তার অধিকার আছে এবং এক্ষেত্রে সকলের কর্তব্য হচ্ছে কারো জাতিসত্তার অধিকার হরণ না করা। প্রত্যেক ব্যক্তির যেমন বিবাহ ও পরিবার গঠনের অধিকার আছে তেমনি এই অধিকারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকা সকলেরই কর্তব্য। সম্পত্তির মালিকানার অধিকার যেমন প্রত্যেকেরই রয়েছে তেমনি সেই অধিকার হরণ না করা অন্যান্য সকলের কর্তব্য। চিন্তা বিবেক ও ধর্মাচরণের স্বাধীনতা রয়েছে সকলের, তেমনি সেই স্বাধীনতা বিপন্ন করা থেকে বিরত থাকা সকলের কর্তব্য। মতামত প্রকাশ ও অভিব্যক্তির স্বাধীনতা রয়েছে সকলের, তেমনি সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে অন্যের মতামত প্রকাশ ও অভিব্যক্তির

www.pathagar.com

স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন না করা। প্রত্যেকেরই রয়েছে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও মেলামেশার অধিকার, আর এই অধিকার বিপন্ন না করাও প্রত্যেকের কর্তব্য। সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে সকলের, এই অধিকারে হস্তক্ষেপ না করাও প্রত্যেকের কর্তব্য। প্রত্যেকেরই সরকারি চাকুরিতে সমান অধিকার রয়েছে, তেমনি সরকারের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কর্তব্য হচ্ছে কারো উক্ত অধিকারে অসমতা না করা।

ব্যক্তি যে সমাজে বসবাস করে, সেই সমাজের কাছে কিছু অধিকার আছে। যেমন সামাজিক নিরাপত্তা, কাজকর্ম, ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও এতে যোগদান, বিশ্রাম ও বিনোদন, স্বাস্থ্যসম্মত ও কল্যাণকর জীবনযাপন, শিক্ষা, সমাজের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ইত্যাদি। সমাজের কাছে ব্যক্তির এই যে অধিকার এগুলো প্রদানের দায়িত্ব সমাজের, এটা সমাজের কর্তব্য। সমাজ এই কর্তব্য পালন না করলে ব্যক্তি অধিকার বঞ্চিত হবে। উপরের আলোচনা থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে, মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে বর্ণিত অধিকারগুলো কর্তব্য নির্ভর। এইসব অধিকারের অনুকূলে কোন কর্তব্য সম্পাদন করতে অথবা বিরত থাকতে হয়। নতুবা অধিকারটি বাস্তবায়িত হয় না।

মানুষের ব্যক্তিত্বের অবাধ ও পূর্ণ বিকাশ সমাজের মাধ্যমেই সম্ভব । নিজের মধ্যে কেন্দ্রীভূত থেকে, সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব নয়। কারণ সামাজিক উত্থান পতন, প্রেম ভালবাসা, ঘাত প্রতিঘাত, সমস্যা সংকট, বিক্ষোভ দ্বন্দ্ব বিদ্রোহ, কামনা বাসনা, সাহায্য সহযোগিতা, ত্যাগ তিতিক্ষা ইত্যাদির মধ্য দিয়েই মানব ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটে।

ব্যক্তিত্ব কাকে বলে, ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপাদানসমূহ কি কি এবং কিভাবে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে এ সম্পর্কে অনুচ্ছেদ ২৬-এর ভাষ্যে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাই এ বিষয়ে আলোচনা পুনরাবৃত্তি না করে আমরা সমাজের প্রতি ব্যক্তির কর্তব্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করবো।

যে সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে মানুষের ব্যক্তিত্বের অবাধ ও পূর্ণ বিকাশ সম্ভব, সেই সমাজের প্রতি মানুষের কি কর্তব্য রয়েছে? প্রত্যেক ব্যক্তিরই সমাজের প্রতি ততটুকু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে যতটুকু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করলে অন্যের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব।

সমাজের প্রতি ব্যক্তির কর্তব্যাদিকে নিম্নোক্ত কয়টি ভাগে বিভক্ত করা যায় :

(ক) ব্যক্তির সামাজিক ও নৈতিক কর্তব্য

(খ) ব্যক্তির রাজনৈতিক কর্তব্য

(গ) ব্যক্তির অর্থনীতিক কর্তব্য

(ঘ) ব্যক্তির সাংস্কৃতিক কর্তব্য

(ঙ) ব্যক্তির পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত কর্তব্য।

www.pathagar.com

ব্যক্তির সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব

সমাজে বসবাস করতে গিয়ে, সমাজের মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধকে জোরদার করার জন্য, সমাজের সামগ্রিক উন্নতি ও বিকাশের জন্য মানুষকে কিছু দায়িত্ব পালন করতে হয়। এ সকল দায়িত্ব পালনে মানুষ আইনগত বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ নয়, তথাপি মানুষ তা করে। এসবই ব্যক্তির সামাজিক কর্তব্য, নৈতিক কর্তব্য। আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশি ও বন্ধুবান্ধবের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা, সুসম্পর্ক বজায় রাখা, রোগে শোকে সেবা করা, সান্ত্বনা দেয়া, দুঃসময়ে সাহায্য করা, প্রত্যেকের সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব। তেমনি অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্রকে সাহায্য করা, বন্যা, মহামারী, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণকার্য পরিচালনা করা সামাজিক কর্তব্য। মানুষের সামাজিক ও নৈতিক কর্তব্য পালনের জন্য যদিও কোন বাধ্যবাধকতা নেই, এসব কর্তব্য পালন না করলে যদিও বিচারের সম্মুখীন হতে হয় না, তথাপি সমাজকে টিকিয়ে রাখতে সে কর্তব্য পালন করতেই হয়। ব্যক্তির সামাজিক ও নৈতিক কর্তব্য সম্পাদিত না হলে সামাজিক ঐক্য, দৃঢ়তা, বন্ধন হ্রাস পাবে, সমাজ তার উপযোগিতা হারাবে, মানুষ ক্রমশ আত্মকেন্দ্রিক ও ব্যক্তিমুখী হয়ে পড়বে। অথচ ব্যক্তির জন্য সমাজ। ব্যক্তির বিকাশের জন্যই সমাজের সকল আয়োজন। সমাজকে ধ্বংস করলে, ব্যক্তি তার মূলেই কুঠারাঘাত করল। অতএব ব্যক্তির সামাজিক ও নৈতিক কর্তব্যকে খাট করে দেখার কোন অবকাশ নেই। প্রতেক ব্যক্তিকেই তার নিজের এবং সমাজের অপরাপর ব্যক্তির উন্নতি ও বিকাশের জন্য, আন্তঃর্ব্যক্তিক ঐক্য সংহতি বজায় রাখার জন্য সামাজিক ও নৈতিক কর্তব্য পালন করতে হবে। ব্যক্তির সামাজিক ও নৈতিক কর্তব্যকে অবহেলা করার কোন সুযোগ নেই। ব্যক্তির সামাজিক কর্তব্যসমূহ হচ্ছে ঃ

১. আপদকালীন সহযোগিতা

মানুষের আপদ বিপদের অন্ত নেই। দৈব দুর্বিপাকে মানুষের জীবন বিপন্ন হওয়ার উপক্রম হয়। বিপদের সময় মানুষের প্রতি এগিয়ে আসা ব্যক্তির সামাজিক ও নৈতিক কর্তব্য। কারণ নিজের উপরও বিপদ আসতে পারে। অন্যকে সাহায্য না করলে সাহায্যের আশা করা যায় না।

২. আতিথেয়তা ও আপ্যায়ণ :

সমাজের মানুষ পরস্পরের সাথে মিলে মিশে থাকে। এ অবস্থায় একে অপরের অতিথি হয়। আপ্যায়ণ করে পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষার জন্য এটা জরুরি। ব্যক্তির সামাজিক দায়িত্ব হচ্ছে অতিথি হওয়া এবং আপ্যায়ন করা।

৩. সম্পর্ক রক্ষা করা :

সমাজবদ্ধ মানুষ পরস্পরের সাথে বিভিন্ন সম্পর্কে আবদ্ধ। এই সম্পর্ক সংরক্ষণ করা প্রত্যেক ব্যক্তির নৈতিক কর্তব্য। ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিদ্যমান স্বাভাবিক সম্পর্কে ফাটল ধরলে সমাজের স্থিতিশীলতা বিপন্ন হতে পারে।

www.pathagar.com

৪. মৃতের সৎকার :

মৃতব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও সৎকার করার দায়িত্ব জীবিত ব্যক্তিবর্গের দায়িত্ব ও কর্তব্য। মৃত ব্যক্তির সমাজের কাছে এটা অধিকার। সমাজের স্বাভাবিক বিকাশের জন্য ব্যক্তিকে এই কর্তব্য পালন করতে হবে।

বস্তুত সমাজে বসবাসকারী প্রতিটি ব্যক্তিকেই সমাজে বসবাস করার জন্য সামাজিক দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে হয়।

ব্যক্তির রাজনৈতিক কর্তব্য

ব্যক্তির যত রাজনৈতিক অধিকার আছে, সেই সব অধিকারের বিপরীতে তার কর্তব্যও রয়েছে। এগুলো হচ্ছে ব্যক্তির রাজনৈতিক কর্তব্য। ব্যক্তি হিসেবে প্রত্যেকেরই তার নিজ রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা রক্ষা করা এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা কর্তব্য। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাথমিক উপাদান হচ্ছে জনগণের কথা, জনগণের আওয়াজ কায়েম করা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এক ব্যক্তির কর্তৃত্বের স্থলে বহুব্যক্তির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। সেখানে সম্মিলিত কর্তব্যের স্থলে ব্যক্তিগত কর্তব্য আরোপিত হয়। তাই ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে ভোট প্রদান করা এবং নির্বাচিত হওয়া। যখন অবাধ ও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, তখন প্রত্যেক ব্যক্তির সরকার গঠন ও সরকারে অংশগ্রহণ করাটি তার রাজনৈতিক কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নিজের সামর্থ্য অনুসারে কর্তব্য পালন করতে হবে। গণতন্ত্র, তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, পশ্চিমা বা সমাজতান্ত্রিক, বুর্জোয়া বা জনপ্রিয় যে নামেই ডাকা হোক না কেন, প্রকৃত গণতন্ত্র আমরা তখনই বলব, যখন এতে সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে বর্ণিত মানবাধিকার মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত হবে, যখন প্রত্যেকেই মুক্ত ও অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে স্থানীয় অথবা জাতীয় পর্যায়ে রাজনীতিতে অংশ নিতে পারে। যেখানে বিধিসম্মতভাবে গণভোটের মাধ্যমে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। যোগ্যতা অনুসারে সকল প্রকার রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ করা প্রতিটি ব্যক্তির কর্তব্য। ব্যক্তির রাজনৈতিক কর্তব্যগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

১. আইন মান্য করা

আইন মেনে চলা ব্যক্তির প্রধান রাজনৈতিক কর্তব্য। শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সামগ্রিক কল্যাণ সাধনের জন্যই আইন প্রণীত হয়। সভ্য সমাজের মানুষ স্বেচ্ছায় আইন মেনে চলে। আইন মেনে চললেই সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা থাকে।

২. আনুগত্য স্বীকার

রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার প্রত্যেক নাগরিকের প্রধান রাজনৈতিক কর্তব্য। আনুগত্য স্বীকারের অর্থ হচ্ছে, ব্যক্তি রাষ্ট্রের স্বার্থকে নিজের স্বার্থ হিসেবে বিবেচনা করবে। অভ্যন্তরীণ

www.pathagar.com

শৃঙ্খলা বিধানে সহায়তা করবে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে সহায়ক হবে।

৩. কর প্রদান

দেশ রক্ষা, দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য অর্থের দরকার। এই অর্থের যোগান দিবে জনগণ। রাষ্ট্রকর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন সুযোগসুবিধা ভোগ করার বিনিময়ে ব্যক্তিকে রাষ্ট্র নির্ধারিত কর পরিশোধ করতে হয়।

৪. ভোটাধিকার প্রয়োগ

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দেশ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করতে হয়। সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গকে নির্বাচন করতে হয়। ব্যক্তির রাজনৈতিক কর্তব্য হচ্ছে, সকল নির্বাচনে সততার সাথে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা।

৫. এ ছাড়া রাষ্ট্রের স্বার্থে নিজের স্বার্থকে বিসর্জন দেয়া, সামগ্রিক স্বার্থে ব্যক্তি স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেয়া, ব্যক্তির রাজনৈতিক কর্তব্য বলে গণ্য হয়।

ব্যক্তির সাংস্কৃতিক কর্তব্য

ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে , সংস্কৃতি চর্চা ও এর বিকাশ ও উন্নয়ন সাধন। এক্ষেত্রে ব্যক্তির মেধা ও যোগ্যতাকে সর্বোচ্চ কাজে লাগানো দরকার। মানব চেতনার সর্বোচ্চ সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিকাশ ঘটে তার সংস্কৃতিতে। এ বিষয়ে আমরা অনুচ্ছেদ-২৭ এর ভাষ্যে বিস্তারিত আলোকপাত করেছি। তাই এখানে আলোচনাকে আর দীর্ঘায়িত করছি না। তবে একটা বিষয় বলে রাখা দরকার যে, প্রত্যেক সংস্কৃতিই অত্যন্ত মূল্যবান এবং গুরুত্ববহ। তাই সকল সংস্কৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং একে সংরক্ষণ করা কর্তব্য। প্রতিটি ব্যক্তিরই তার নিজস্ব সংস্কৃতি লালন ও বিকাশে অধিকার আছে, আছে কর্তব্য। সকল জাতি ও সকল ব্যক্তির অধিকার এবং কর্তব্য হচ্ছে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা লাভ এবং প্রদান। তাদের জ্ঞান ও দক্ষতার মাধ্যমে তারা এক্ষেত্রে পরস্পরের সহায়তা করবে।

পরিবেশ সংরক্ষণে ব্যক্তির কর্তব্য

এই একটিই মাত্র পৃথিবী মানুষের জন্য। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বন ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণে ব্যর্থতা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ব্যাপক শিল্পায়ন এবং আরো নানা কারণে বিশ্ব পরিবেশের উপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। ফলে পৃথিবী মানব বসতির অনুপযুক্ত হয়ে পড়ার মত পরিবেশগত বিপর্যয় দেখা দিতে পারে বলে পরিবেশ বিজ্ঞানী বা বিশেষজ্ঞগণ আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। এমতাবস্থায় মানব

www.pathagar.com

জাতির স্বার্থে পৃথিবীকে মানুষের বসবাসের উপযোগী রাখতে হলে, বিশ্বের পরিবেশ সংরক্ষণে মনোযোগী হতে হবে। পরিবেশ সংরক্ষণ যেমন প্রতিটি জাতির দায়িত্ব তেমনি প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে পরিবেশগত ভারসাম্য বিনষ্ট হয় এমন কাজ থেকে বিরত থাকা, অন্যদেরকে পরিবেশ সংরক্ষণে সচেষ্ট ও সচেতন থাকতে উৎসাহিত করা। পরিবেশ সংরক্ষণে ব্যক্তির দায়িত্ব অপরিসীম।

সম্প্রতি ব্রাজিলের রিও-ডি-জানেরিও শহরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলন। এতে বিশ্ব পরিবেশের ক্রমবর্ধমান ভারসাম্যহীনতায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিশ্ব নেতৃবৃন্দ। তারা পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। বিশ্ব পরিবেশ এখন সাড়া দুনিয়াব্যাপী একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। নিম্নে বিশ্ব পরিবেশ সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করছি।

বিশ্ব পরিবেশ

এই পৃথিবীতে মানুষ এবং মানুষের চারপাশে যা কিছু আছে বিশেষ করে আবহাওয়া, জলবায়ু, মহাসাগর, সাগর, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, পশুপাখি, জীবজন্তু ইত্যাদি নিয়েই বিশ্ব পরিবেশ। মানুষ হচ্ছে, এই পৃথিবীর প্রধান আকর্ষণ তাই মানুষের বসবাসের উপযোগী পরিবেশ চায় মানুষ।

মানুষই ক্রমাগত পরিবর্তন করে চলেছে বিশ্বের পরিবেশ। হাজার হাজার বছর আগে পৃথিবী নামক এই গ্রহে যখন মানুষের আবির্ভাব ঘটে তখন থেকেই বিভিন্নভাবে মানুষ পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। অবশ্য প্রথম দিকে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা কম থাকায় পরিবেশের উপর তার প্রভাব অতটা ব্যাপক ছিল না। কিন্তু বর্তমানে জনসংখ্যা অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কারণে পরিবেশের উপর মানুষের প্রভাব কতখানি তা উপলব্ধি করতে কষ্ট হয় না। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে পৃথিবীতে মানুষের পরিমাণ ছিল ১২৫ কোটি। মাত্র ৫০ বছরে তা দ্বিগুণেরও বেশি বৃষ্টি পেয়ে প্রায় ২৬০ কোটিতে দাঁড়িয়েছিল। ১৯৯০ সালে বিশ্বের জনসংখ্যা ৫০০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। শতাব্দী শেষে তা ৬০০ কোটি অতিক্রম করবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বর্তমান বিশ্বে পরিবেশের উপর যে মারাত্মক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, তার জন্য বহুলাংশে দায়ী বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধি। জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান হার পরিবেশ সংকটকে আরো মারাত্মক পরিণতির দিকে ধাবিত করছে। পৃথিবী নামক এই গ্রহের জীবজগতকে ধারণ করার ক্ষমতা কমে আসছে। তাই বিশ্ব পরিবেশ আজ প্রকৃত পক্ষেই মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, পৃথিবীর স্বাভাবিক অবস্থাকে তছনছ করে দিয়েছে। জনসংখ্যা যার বাড়ছে ততই ভূমি আসছে ক্রমশ চাষের আওতায়, বনজঙ্গল কেটে তৈরি হচ্ছে লোকালয়, বসতবাড়ি, আসবাবপত্রের জন্য অথবা ঘরবাড়ি ও জ্বালানির জন্য নিধন করা হচ্ছে গাছগাছালি। উন্নত চাষাবাদের জন্য জমিতে প্রয়োগ করা হচ্ছে কীটনাশক। এতে বিনষ্ট হচ্ছে কীটপতঙ্গ ও মৎস্য। এমনিভাবে দ্রুত নগরায়ন ও শিল্পায়ন, বনভূমি ধ্বংস, কৃষি জমির সম্প্রসারণ, মরুময়তা,

www.pathagar.com

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণির বিলুপ্তি, এবং আরো নানা কারণে, এখন পৃথিবীর স্বাভাবিক পরিবেশ সংকটের মুখে পতিত। এ ছাড়া গ্রীণহাউস প্রতিক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি, পরিবেশের বর্তমান অনুকূল অবস্থাকে সম্পূর্ণ বদলে দিতে পারে। সত্যি সত্যিই যদি গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়া কার্যকরী হয় তাহলে পৃথিবীর অনেক প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী বিলুপ্ত হবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। তাছাড়া খাদ্য উৎপাদন মারাত্মক হ্রাস পাবে, পৃথিবীর অনেকগুলো বদ্বীপ উপকূল ও নিম্নাঞ্চল সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাবে এবং সমুদ্রের লোনাজল গ্রাস করবে পৃথিবীর কৃষি ভূমি, সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা পরিবর্তনে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস বেড়ে যাবে, কোন কোন স্থানে মরুময়তা সম্প্রসারিত হবে, প্রতিক্রিয়া হতে পারে মৎস্য সম্পদের উপরও। এসবই হবে গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়ায়। এতে করে মানব জাতিকে এক ভয়াবহ ও অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্যোগের মোকাবেলা করতে হতে পারে। বস্তুত বিশ্ব পরিবেশের দ্রুত পরিবর্তন মানব জাতির জন্য বিরাট বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

প্রকৃতি বিজ্ঞানী মার্স্টন বেইটস (Marston Bates) পরিবেশ বিজ্ঞান সম্পর্কে বলেন, "পৃথিবীতে মানবজাতির দীর্ঘকালীন অস্তিত্বরক্ষার স্বার্থে পরিবেশ বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের সকল শাখার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সকল বিজ্ঞানের মধ্যে এটি জনসাধারণের নিকট সবচেয়ে কম পরিচিত।" আজ পরিবেশ সংক্রান্ত কথাবার্তা প্রায়ই শোনা যাচ্ছে। কারণ মানব সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ আজ বিপদসীমাকে অতিক্রম করে যাচ্ছে। তাই পরিবেশ বিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, লেখক, সাংবাদিক সকলেই পরিবেশ সম্পর্কে ভাবছেন, কথা বলছেন কারণ এখন এটা সবাইকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। সকলেই আক্রান্ত হচ্ছে, তা এখন না ভেবে উপায় নেই। সুস্থ ও অনুকূল পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা এবং পরিবেশ রক্ষায় মানুষের ভূমিকা সম্পর্কে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি আবশ্যক। দরকার পরিবেশ বিজ্ঞানের শিক্ষা প্রসার।

মানুষ এবং অন্যান্য জীব ও উদ্ভিদের জন্য তার আশেপাশের প্রাণী, উদ্ভিদ, অণুজীব, মাটি, পানি বাতাস, আলো, তাপ ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য উপাদান। তাই মানুষকে টিকে থাকতে হলে তার আশে পাশে যত জীব ও উদ্ভিদ আছে তাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেই বাঁচতে হবে। কেননা জীব ও উদ্ভিদের জীবন চক্রই পরিবেশকে ভারসাম্যপূর্ণ করে রাখে।

জীব বিজ্ঞানী ব্যারি কমোনার (Barry Commoner) এর ভাষায়, "The first law of ecology is that everything is related to everything else."

হরেক রকমের পরিবেশ নিয়ে আমাদের জীবন, আমাদের পৃথিবী। এক একটি পরিবেশ এক এক রকম। যেমন, নগর পরিবেশ, গ্রাম্য পরিবেশ, বনভূমির পরিবেশ, জলজ পরিবেশ, মরুময় পরিবেশ, পাহাড়ি পরিবেশ। তাছাড়া শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি, কলকারখানা, বিজ্ঞান অর্থনীতি সমাজনীতি ইত্যাদি মিলে মানুষের পরিবেশ অত্যন্ত জটিল। এই জটিল পরিবেশে অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাকের ভূমিকাও গৌণ নয়। মানুষ যেহেতু প্রকৃতিকে এবং

www.pathagar.com

নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সেহেতু মানুষকে এই পরিবেশ রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা নিতে হবে। মানুষের পক্ষেই তা সম্ভব।

মানুষের জন্য পৃথিবী। সৌর জগতে পৃথিবীই হচ্ছে একমাত্র গ্রহ যার গঠনপ্রণালী এবং অবস্থান জীবজগতের বেঁচে থাকার পক্ষে অনুকূল। জলবেষ্টিত এবং বায়ুমণ্ডলে ঢাকা নীলাভ পৃথিবী সমগ্র সৌরজগতের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান। আমরা এই পৃথিবীতে জন্মেছি এবং বেঁচে আছি এই উপলব্ধির আনন্দ এবং সুখ প্রায় অসীম—এই অসীম আনন্দের অনুভব থাকলেই আমরা এই পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য রাখার প্রয়াস পাব। পৃথিবীপৃষ্ঠের বিশাল জলরাশি, সূর্যের তাপ, আলো বাতাস সবই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এসবের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াই ঝড়বৃষ্টি, বায়ুপ্রবাহ, জলস্রোত, দিনরাতের আবর্তন, ঋতুচক্র ইত্যাদি হয়ে থাকে। এসবের স্বাভাবিক গতি বাধাপ্রাপ্ত হলেই অনিয়মের সৃষ্টি হয় এবং পৃথিবীর ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। পৃথিবীর পরিবেশ হয় মানুষের বসবাসের অযোগ্য।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, পৃথিবীর বয়স প্রায় ৪ শত ৫০ কোটি বছর। তাদের ধারণা পৃথিবী আরো ৪শ থেকে ৫শ কোটি বছর টিকে থাকবে। কিন্তু পরিবেশ দূষণের তীব্রতায় এই হিসেব ভণ্ডুল হতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। এই ৫শ কোটি বছর পেরোনোর আগেই পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার কারণে অথবা পরমাণু যুদ্ধের আঘাতে পৃথিবীসহ সমগ্র সৌরজগৎ ধ্বংস হয়ে যায় কিনা কে বলতে পারে।

মাটি, পানি, আলো, বাতাস, তাপ বা পরিবেশের অন্য কোন উপাদানের যখন কোনরূপ ভৌত, রাসায়নিক, জৈবিক বা তেজঃস্ক্রিয় পরিবর্তন ঘটে, যা জীবজগতের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তাকে বলে পরিবেশ দূষণ। পরিবেশ দূষণকে প্রকৃতিগতভাবে চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন—পানি দূষণ, মাটি দূষণ, শব্দ দূষণ ও বাতাস দূষণ। যে সব দ্বারা পরিবেশ দূষণ ঘটে সেগুলোকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন ১. শক্তিবিষয়ক দূষণ, তথা শব্দ তাপ ও তেজস্ক্রিয় বিকিরণ। ২. রাসায়নিক পদার্থসমূহ তথা জৈব ও অজৈব, কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক রাসায়নিক দ্রব্যাদি, ৩. প্রাণিজ দূষন তথা বিভিন্ন রোগের ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও পরজীবিসমূহ। এসবের দ্বারা বিভিন্নভাবে পরিবেশ দূষণ ঘটে।

বিভিন্ন কারণে পরিবেশ দূষণ ঘটতে পারে। পরিবেশ দূষণের প্রথম ও প্রধান কারণ হচ্ছে মানুষ। মানুষের অদূরদর্শী হঠকারিতামূলক কার্যকলাপ প্রধানত পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী। জমির অতিকর্ষণ, জমিতে অধিকমাত্রায় কীটনাশক ব্যবহার, রাসায়নিক সার প্রয়োগ, যথেচ্ছা বৃক্ষ কর্তন, প্রাকৃতির সম্পদের অতিমাত্রায় ব্যবহার, শিল্প কারখানার বর্জ্য, যানবাহনের কালো ধোঁয়া ইত্যাদি পরিবেশ দুষনের গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের সূচনা থেকেই পরিবেশ দূষণ ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আণবিক বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে তা মারাত্মকভাবে ব্যাপকতা লাভ করে। হিরোসিমা, নাগাসাকি ধ্বংসের সাথে সাথেই পরিবেশ দুষনের প্রতিক্রিয়া শেষ হয়ে যায় নি। ১৯৪৫

www.pathagar.com

সালে আণবিক বোমার আঘাতে তাৎক্ষণিকভাবে ২ লক্ষ লোক নিহত হয়েছিল এবং সেই দূষণের প্রতিক্রিয়া এখনো অব্যাহত আছে বলে জানা গেছে। এখনো বিবিধ রকমের মারাত্মক রোগ বিপন্ন করে হিরোসিমা, নাগাসাকির অধিবাসীদের জীবন। এরপর রাশিয়ার চেরনোবিল পারমাণবিক চুল্লি বিস্ফোরণ, ভারতের ভূপালে ইউনিয়ন কার্বাইড রাসায়নিক কারখানার গ্যাস দুর্ঘটনাসহ বিভিন্ন যুদ্ধ ইত্যাদির কারণে কত মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, প্রাণ হারিয়েছে কত প্রাণী, ধ্বংস হয়েছে উদ্ভিদ রাশি। এভাবেই কতিপয় স্বার্থবাদী মানুষের অপতৎপরতায় বিশ্ব পরিবেশ বিপন্ন হচ্ছে। অবশ্য কিছু কিছু প্রাকৃতিক কারণেও পরিবেশ বিনষ্ট হয়। যেমন আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, সাগর গোর্কি ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে পরিবেশ দূষিত হতে পারে তবে তা মনুষ্য সৃষ্ট দূষনের তুলনায় খুবই সামান্য। বস্তুত মানুষের অপতৎপরতার কারণেই বায়ুমণ্ডল, পানি, মাটি সবই ক্রমশ সাংঘাতিকভাবে দূষিত হয়ে পড়ছে। মানুষের প্রভূত্বকামীতা, আত্মম্ভরিতা, অহমবোধ, দুর্দান্ত অর্থলিপ্সা, তার আর্থিক তৎপরতাকে সীমাহীনভাবে জোরদার করেছে। এতে তার আগ্রাসী হাত বিস্তৃত হচ্ছে সুসজ্জিত প্রকৃতির উপর। প্রকৃতি হচ্ছে ছাড়খার। ধ্বংস হচ্ছে গাছপালা বন বনাঞ্চল, নদ-নদী। পরিবেশ হচ্ছে ভারসাম্যহীন।

দূষণমুক্তপরিবেশ মানুষের প্রত্যাশা

মানুষ চায় সুস্থ সুন্দর দূষণমুক্ত পরিবেশ। কারণ দূষণমুক্ত পরিবেশ মানুষের খুব প্রয়োজন। এই প্রয়োজন বিভিন্ন কারণে।

প্রথমত, মানব সমাজের স্বাস্থ্য সংরক্ষণের ব্যাপারে সুস্থ পরিবেশ অপরিহার্য। শরীর সুস্থ না থাকলে মনও সুস্থ থাকে না। দেহ, মন সুস্থ না থাকলে ইহজাগতিক কোন কাজই সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে পারে না। আবার দেহ ও মনের স্বাস্থ্য নির্ভর করছে সমাজের সুস্থতার উপর। কারণ মানুষ যেহেতু সমাজে বসবাস করে সেহেতু সমাজের প্রভাব তার উপর পড়বেই। সুস্থ সমাজের জন্য চাই সুস্থ পরিবেশ। অসুস্থ পরিবেশ মানুষকে অসুস্থ করে এবং এই অসুস্থতা সকল উন্নয়নকে ব্যাহত করে।

দ্বিতীয়ত, পরিবেশ দূষিত হলে, তার ভারসাম্য নষ্ট হলে এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের দেহ মনের উপর। দূষিত পরিবেশ অর্থনীতির উপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাই পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতে হবে।

তৃতীয়ত, পানি মানুষের জীবন রক্ষা করে। তাই পানির আরেক নাম জীবন। এই পানি বিভিন্নভাবে দূষিত হতে পারে। জৈব আবর্জনা, অজৈব রাসায়নিক পদার্থ, কৃত্রিম জৈব পদার্থসমূহ, পানি বাহিত পলি ও তলানী, তেজস্ক্রিয় পদার্থ, উষ্ণ পানি, তৈল, উদ্ভিদের পুষ্টিকর পদার্থ এবং জীবাণু দ্বারা পানি দূষিত হতে পারে। মানুষের জীবন রক্ষার জন্য পানিকে দূষণমুক্ত রাখা চাই।

www.pathagar.com

চতুর্থত, বায়ু না হলে মানুষ বাঁচে না। আয়ুর খোরাক বায়ু। বিভিন্ন কারণে বায়ুর দূষণ হতে পারে। কার্বন ডাই অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড, হাইড্রোজেন ফ্লুরাইড, হাইড্রোকার্বনসমূহ, সালফার অক্সাইডসমূহ, বায়ুবাহিত ধূলিকণা, ফটোকেমিকেলস্ বাতাসকে দূষিত করে। বায়ু দূষণই পরিবেশ দূষণের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মারাত্মক।

বায়ু দূষণের কারণে বায়ুমণ্ডলে ভারসাম্যহীনভাবে তাপবৃদ্ধির ফলে মেরু অঞ্চলে বরফ গলতে শুরু করবে, সমুদ্রের পানির উচ্চতা বাড়বে। বাতাসে কার্বনডাই অক্সাইড বৃদ্ধির ফলে মিঠাপানির অম্লত্ব বেড়ে যাবে, পানি দূষিত হবে। গ্রীণ হাউসের প্রভাবে সমুদ্র সমতল একমিটার বেড়ে যাবে ২০২৫ সাল নাগাদ। এই অবস্থা থেকে অতি অবশ্যই মানবজাতির মুক্তি দরকার।

মানবাধিকার ঘোষণার আলোচ্য অনুচ্ছেদ বলছে, পরিবেশ সংরক্ষণে ব্যক্তির কর্তব্য রয়েছে। কি সেই কর্তব্য বা করণীয়? মানুষ কি করতে পারে?

মানুষ এবং ব্যক্তি মানুষ পরিবেশ রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সাধারণ মানুষকে পরিবেশ ও প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন ও সজাগ করতে পারে মানুষই। বনভূমি, নদী, সাগর, খাল, বিল, পুকুর ইত্যাদিকে অমলিন অক্ষত রাখতে পারে। বৃক্ষরোপণ এবং বনায়নের মাধ্যমে পরিবেশকে সুন্দর করে তুলতে পারে। কৃষিতে অধিক পমিাণে রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহার করতে পারে। পরিবেশ সম্পর্কে এখনই সচেতন না হলে পৃথিবী হয়তো আগামী প্রজন্মের বসবাসের উপযোগী থাকবে না। তাই অপ্রত্যাশিত, অনাকাঙ্ক্ষিত এক ভয়ংকর দূর্যোগের কথা মনে রেখে প্রতিটি ব্যক্তিকেই তার করণীয় সম্পর্কে সক্রিয় হতে হবে।

উপঅনুচ্ছেদ (খ)

অধিকার ও স্বাধীনতার সীমা

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের আলোচ্য অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় দফায় মানুষে অধিকার এবং স্বাধীনতার সীমার কথা বলা হয়েছে। যে সীমাবদ্ধতা আরোপের কথা বলা হচ্ছে তা নিম্নোক্ত দুটি উদ্দেশ্যে আরোপিত হবে।

এক. অপরের অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহের যথার্থ স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধা নিশ্চিত করা।

দুই. গণতান্ত্রিক সমাজে নৈতিকতা, গণশৃঙ্খলা ও সাধারণ কল্যাণের ন্যায্য প্রয়োজনসমূহ পূরণ।

সীমাবদ্ধতা অবশ্যই আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে। মানুষের কোন স্বাধীনতাই ততটা অসীম হতে পারে না। যতটা অসীম হলে অপরের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হবে। তেমনি মানুষের অধিকারের পরিধিও ততটুকু অগ্রসর হতে পারে না যতটকু হলে অন্যের অধিকার খর্ব হয়। এজন্যই সকলের স্বাধীনতা ও অধিকার সমুন্নত রাখার প্রয়োজনে ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং অধিকারে খানিকটা লাগাম টেনে দিতে হয়, সীমা আরোপ করতে হয়। সীমাবদ্ধতা কেন আরোপ করা হবে, কি উদ্দেশ্যে আরোপ

www.pathagar.com

করা হবে এ সম্পর্কে আলোচ্য অনুচ্ছেদের এই দফায় সুস্পষ্ট কথা রয়েছে। এ বিষয়ে আমরা পরে আলেচনা করবো। তার আগে সীমা কে আরোপ করবে, কিসের ভিত্তিতে আরোপিত হবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করছি।

বলা হয়েছে, অধিকার ও স্বাধীনতা, যা প্রত্যেক ব্যক্তির রয়েছে, তাতে সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হবে আইনের দ্বারা। আইনের ভিত্তি ছাড়া কোন ব্যক্তির কোন অধিকার খর্ব করা যাবে না, হরণ করা যাবে না স্বাধীনতা। অতএব আমাদের জানতে হবে আইন কাকে বলে।

মানুষের মনে ভাল মন্দ, ন্যায় অন্যায়, মমতা নিষ্ঠুরতা, প্রভৃতি বিপরীতমুখী প্রত্যয়গুলো নির্ণয়ের সহজাত বোধ আছে। কোন কাজটা ভাল, ন্যায্য, সুস্থ, সুন্দর , স্বাভাবিকভাবে মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারে। স্বার্থের পীড়ন না থাকলে বা হিংসার প্রশ্রয় না থাকলে সত্যাসত্য বিচারের শক্তি মানুষের অবিকৃত থাকে। যে সূত্র বা নীতির উপর ভিত্তি করে এই নির্ণয় কর্মটি করা হয় তারই নাম আইন।

প্রকৃতির রাজ্যে সর্বত্রই নিয়ম প্রতিষ্ঠিত। আগুন পোড়ায়, বরফ ঠাণ্ডা করে, এগুলো তাদের অন্তর্নিহিত স্বভাব। তাদের এই স্বভাবের কারণে প্রকৃতিতে শৃঙ্খলা থাকে। মানুষও প্রকৃতির অংগ। সুতরাং মানুষেরও কিছু স্বভাব আছে। সেই স্বভাবের ফলেই শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত।

প্রকৃতির সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষ একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করে। জন্ম গ্রহণের পর সে ক্রমে ক্রমে বেড়ে উঠে এবং এক সময় সংসার গড়ে তোলে। পরিশেষে মরে যায়। এই জীবন পরিক্রমা মানুষের স্বভাবজাত অধিকার। এই অধিকার কেউ তাকে দেয় না তবে আইন মানুষের এসব অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করে। মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাপনের ক্ষেত্রে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা যাতে সৃষ্টি না হয় সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য যে নিয়ম কানুন তার নামই হচ্ছে আইন। এই নিয়মকানুন আইনসভা কর্তৃক তৈরি হতে পারে অথবা ধর্ম, বিচারকের রায়, প্রচলিত প্রথা ইত্যাদি থেকেও গ্রহণ করা হতে পারে ।

আইন ইতিহাসের সৃষ্টি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক এক সময় এক এক দেশে এক এক রকম রীতি-নীতি, প্রথা প্রচলিত ছিল। দীর্ঘ সময়ে এগুলো গড়ে উঠে। এই প্রথা পদ্ধতি যুগ থেকে যুগান্তরে প্রসারিত হয়। কখনো এক দেশ থেকে অন্য দেশে। এই প্রথা পদ্ধতির কালক্রমে আইনরূপে গৃহীত হয়।

আবার দেখা যায় সমাজে মানুষের চাহিদা অসংখ্য, তাদের বেগ ও আবেগ অফুরন্ত, এই চাহিদা এবং গতিবেগ অনেক সময় সমাজে কলহের সৃষ্টি করে। সমাজের মানুষ চেষ্টা করে কি করে এই কোলাহলকে প্রশমিত করা যায়। এই বুদ্ধিদীপ্ত প্রয়াসের মাধ্যমে তারা সমাজের এই অস্থিরতা নিরসনের পথ খুঁজতে গিয়ে আইন আবিষ্কার করে। শান্তির অন্বেষায় মানুষের সামাজিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলই হচ্ছে আইন।

আবার কখনো কখনো দেখা যায়, মানুষের মধ্যে ভালমন্দ, ন্যায় অন্যায় নির্ণয়ের ক্ষমতা এবং প্রবণতা থাকলেও হিংসা, স্বার্থপরতা, লোভ মানুষকে তাড়িত করে। এই কুপ্রবণতাকে দমন করতে

www.pathagar.com

না পারলে সমাজে প্রবল অশান্তির কারণ ঘটে। এই দুঃসহ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য মানুষ আইন তৈরি করে। এগুলি হচ্ছে দার্শনিক প্রত্যয়।

আসলে আইন হচ্ছে, আইন সভা বা ঐ জাতীয় কর্তৃপক্ষের তৈরি বিধান। নির্বাহী কর্তৃপক্ষের হুকুমকে আইন বলা যাবে না। কারণ নির্বাহী কর্তৃপক্ষ তাদের শাসন ক্ষমতা কার্যকর করার জন্য যথেচ্ছ নির্দেশ প্রদান করতে পারে। শাসন কর্তৃপক্ষের হাতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকলে মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা অযৌক্তিকভাবে খর্ব হতে পারে। আইনের কিছু উৎস আছে। নিম্নে সেগুলো বর্ণনা করছি। আইনের প্রাচীনতম উৎস হচ্ছে প্রথা। সমাজে সুদীর্ঘকাল থেকে চলে আসা রীতিনীতি আচার ব্যবহারই হচ্ছে প্রথা। কোন একসময় কোন এক ব্যক্তি বিশেষের প্রবর্তিত রীতি দীর্ঘদিন চলতে চলতে প্রথায় পরিণত হয়েছে। ইংল্যাণ্ডের সাধারণ ও সাংবিধানিক আইন এবং ভারতবর্ষের হিন্দু আইন মূলত প্রথাভিত্তিক।

ধর্ম আইনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস। প্রাচীনকালে অধিকাংশ সমাজ পরিচালিত হতো ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা। তখন ধর্ম ও আইনের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। আধুনিক কালেও হিন্দু মুসলমান এবং ইহুদি ধর্মের বিধি বিধান এইসব ধর্মাবলম্বীদের আইনের বিরাট অংশ দখল করে আছে।

বিচারের রায়, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত আইনের গুরুত্বপূর্ণ একটি উৎস। জীবন ক্রমশ জটিল হওয়ার কারণে বিচারকের সামনে এমন সমস্যার উদ্ভব হওয়া অসম্ভব নয় যেগুলোর সমাধান প্রচলিত আইনে নেই। বিচারক তখনই স্বীয় বিচারবুদ্ধি দিয়ে সমস্যা সমাধান করেন। তখন বিচারকের সিদ্ধান্ত থেকে নতুন আইনের উদ্ভব হয়, যা পরবর্তীকালে বিচারকগণ নজির হিসেবে গ্রহণ করেন।

আইন সম্পর্কিত বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা আইনের উৎস। আইনবিদ দার্শনিকগণ আইন সম্পর্কে চিন্তাগবেষণা করেন। তারা সমাজের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ আইনকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ করার চেষ্টা করেন। ফলে আইন বিদ্যার গ্রন্থসমূহ আইনের উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়। কোক (Coke), ব্ল্যাকস্টোন (Blackstone), স্টোরি (Story), কেন্ট (Kent) প্রমুখের অভিমতকে আইনের উৎস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

সীমাবদ্ধতা আরোপের উদ্দেশ্য

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার শুরু থেকে ২৮ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত সর্বত্র মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতার জয়গান গাওয়া হয়েছে। ২৯ অনুচ্ছেদে এসব স্বাধীনতা ও অধিকারের সীমা টেনে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, আইন সীমাবদ্ধতা আরোপ করতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কেন সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হবে? কি উদ্দেশ্য বা কি প্রয়োজনে সীমাবদ্ধতা আরোপিত হবে? আলোচ্য অনুচ্ছেদে এই উদ্দেশ্যের কথাও বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে :

১. অপরের অধিকার স্বীকার

২. অপরের অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান

www.pathagar.com

৩. অপরের স্বাধীনতার স্বীকৃতি প্রদান

৪. অপরের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান

৫. নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা

৬. গণশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা

৭. সাধারণ কল্যাণ

প্রথমোক্ত চারটি উদ্দেশ্যকে বলা যায়, "অপরের অধিকার ও স্বাধীনতা স্বীকৃতি ও নিশ্চয়তা প্রদান।" শেষোক্ত তিনটি হচ্ছে আমাদের প্রার্থিত গণতান্ত্রিক সমাজের ন্যায্য প্রয়োজন পূরণের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা। অর্থাৎ জনগণের তথা ব্যক্তির প্রয়োজন পূরণের জন্যই নৈতিকতা ও গণশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং সাধারণের কল্যাণ সাধন করতে হয়।

ব্যক্তির স্বাধীনতার পরিধি অপরের স্বাধীনতার অধিকার দ্বারা সীমিত। ব্যক্তি ততটুকু স্বাধীনতা ভোগের অপ্রতিহত অধিকার রাখেন যতটুকু স্বাধীনতা ভোগ বা চর্চা করলে অপরের স্বাধীনতা বিনষ্ট বা খর্ব হয় না। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার অনুচ্ছেদ ৩-এ তো বলা হয়েছে যে, প্রত্যেকেরই স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য অনুচ্ছেদে বিশেষ করে ১৩ অনুচ্ছেদে চলাচল ও বসতি স্থাপনের স্বাধীনতা, ১৮ অনুচ্ছেদে চিন্তা বিবেক ও ধর্মাচরনের স্বাধীনতা, ১৯ অনুচ্ছেদে মতামত প্রকাশ ও অভিব্যক্তির স্বাধীনতা ইত্যাদির যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তাতে কোথাও বিশেষ কোন শ্রেণী বা গোষ্ঠীর স্বাধীনতার কথা বলা হয় নি। বলা হয়েছে সকলের স্বাধীনতার কথা। অর্থাৎ স্বাধীনতা ভোগের অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির সমান। এখন কোন ব্যক্তি যদি ততটুকু স্বাধীনতা ভোগ করতে চান যতটুকু ভোগ করলে অন্যের স্বাধীনতা ও অধিকার বিপন্ন হবে তাহলে আইন তার এই ইচ্ছাকে বাধা প্রদান করবে। কারণ যার স্বাধীনতাকে খর্ব করেছেন বা করছেন তা স্বাধীনতার অধিকারতো খর্বকারীর তুলনায় কোন অংশে কম নয়। ঘোষণাপত্রের প্রথম অনুচ্ছেদেই বলা হয়েছে সকল মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন ও সমান। ব্যক্তির নিজের স্বাধীনতা ভোগের নিরঙ্কুশ অধিকার আছে। কিন্তু অপরের স্বাধীনতা ভোগে বাধা সৃষ্টি করার কোন অধিকার নেই। আপনি যখন অন্যের স্বাধীনতাকে খর্ব করবেন, তখন আপনার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকবে এটা কি করে আশা করতে পারেন। আপনি যখন নিজের স্বাধীনতা রক্ষায় সচেষ্ট হবেন তখন এটা স্বাভাবিক যে অন্যজনও তার স্বাধীনতা রক্ষায় যত্নবান হবেন। তাই অন্যের স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে এমন কাজ করার স্বাধীনতা কারো নেই, থাকতে পারে না।

নিরঙ্কুশ সীমাহীন স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতার শামিল। সমাজবদ্ধ মানুষের স্বেচ্ছাচারী হওয়ার কোন অবকাশ নেই। স্বেচ্ছাচারিতা সামাজিক সংহতিকে বিনষ্ট করে। মানুষে মানুষে তথা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিরোধ বিসম্বাদ বাধায়। তাই প্রত্যেক ব্যক্তির ঠিক ততটুকু স্বাধীনতা চর্চা করার অধিকার আছে যতটুকু করলে অন্যের স্বাধীনতা বিঘ্নিত হবে না। ব্যক্তির স্বাধীনতাকে ততটুকু সীমিত রাখতে হবে যতটুকুর মধ্যে থাকলে সামাজিক শৃঙ্খলা নিরাপত্তা বিঘ্নিত বা বিনষ্ট হবে না। এই সীমাবদ্ধতা আরোপ করবে আইন। মানুষ যে সমাজে বসবাস করে সেই সমাজ পরিচালনার

www.pathagar.com

জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়। মানব জীবনের সকল দিক বিবেচনা করে আইন প্রণয়ন করা হয়, যাতে কারো স্বাধীনতা ভোগে বেপরোয়া প্রবণতার কারণে অন্যের স্বাধীনতা বিপন্ন না হয়।

আমরা যদি স্বাধীনতার সংজ্ঞা আলোচনা করি তাহলেও দেখতে পাবো যে, যা খুশি তাই করার নাম স্বাধীনতা নয়।

স্বাধীনতা হচ্ছে, ব্যক্তির অধিকারের সীমা ও অপরের যুক্তি সংগত অধিকারের দাবি দ্বারা সীমাবদ্ধ। প্রত্যেক ব্যক্তিই ততটুকু অধিকার ভোগ করতে পারেন যতটুকু ভোগ করলে অপরের সেই পরিমাণ অধিকার খর্ব হবে না। যেমন শান্তিপূর্ণভাবে আলোচনা ও মেলামেশার অধিকার আপনার আছে কিন্তু এই অধিকার আপনার ততটুকু পর্যন্ত সীমিত যতটুকু চর্চা করলে অন্যের এই জাতীয় অধিকার ব্যাহত না হয়। সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণের অধিকার আপনার আছে কিন্তু এই অধিকার ততটুকুই, যতটুকু ভোগ করলে অন্যের এ জাতীয় অধিকার খর্ব না হয়। আপনার যেমন জীবনযাপন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার আছে তেমনি নিজের জীবন যাপনের অধিকার ভোগ করতে গিয়ে অন্যের এই অধিকার আপনি ব্যাহত করতে পারেন না, নিজের স্বাধীনতা ভোগ করতে গিয়ে অন্যের স্বাধীনতা ভোগের অধিকার বিনষ্ট করতে পারেন না, নিজের নিরাপত্তার অধিকার ভোগ করতে গিয়ে অন্যের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারেন না। বস্তুত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই নিজের অধিকার ভোগের সময় মনে রাখতে হবে যে, অন্যান্য ব্যক্তিরও এ জাতীয় অধিকার রয়েছে। অন্যের অধিকার খর্ব করে নিজের অধিকার চর্চার সুযোগ নেই। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় যত অধিকারের বর্ণনা রয়েছে, প্রত্যেক ব্যক্তিই এইসব অধিকারে সমান স্বত্ববান। প্রত্যেক ব্যক্তির এই অধিকারের সীমা ততটুকু, যতটুকু ভোগ করলে অন্য ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা ব্যাহত হবে না।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার এই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই অপর ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অধিকার সমূহের যথার্থ স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে এবং শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। অন্যের স্বাধীনতা ও অধিকারের প্রতি স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আইন ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতার উপর যুক্তিসঙ্গত সীমাবদ্ধতা আরোপ করতে পারে। ব্যক্তির অধিকার এবং স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই কিন্তু এই সীমাবদ্ধতা। প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতাকে একটি যুক্তিসঙ্গত সীমার মধ্যে আবদ্ধ না করলে সকলের অধিকার ও স্বাধীনতা সুরক্ষিত হবে না।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে বর্ণিত অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে সমাজ ব্যবস্থা কায়েম থাকবে বলে প্রত্যাশা করা হয় সেটা হচ্ছে গণতান্ত্রিক সমাজ।

এমন একটি সমাজ ব্যবস্থাকে আমরা গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা মনে করি যেখানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যক্তির মতামতের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালিত হয়, যেখানে ব্যক্তির নিজের যোগ্যতা ও সামর্থ অনুসারে সরকারে অংশগ্রহণ করতে পারে। ঘোষণাপত্রের ২২ থেকে ২৮ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত ব্যক্তির যে সকল অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের বয়ান দেওয়া হয়েছে সেগুলো পূর্ণরূপে কার্যকর করার জন্য গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বিদ্যমান থাকা আবশ্যক।

www.pathagar.com

তাছাড়া জবরদস্তিমূলক গ্রেফতার আটক বা নির্বাসন থেকে মুক্তির অধিকার, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ট্রাইবুনালে ন্যায়বিচার ও প্রকাশ্য শুনানি লাভের অধিকার ; ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, পরিবার বাসগৃহ বা চিঠিপত্র আদান প্রদানে স্বৈরাচারী হস্তক্ষেপ থেকে অব্যাহতি লাভের অধিকার ; শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও মেলামেশার অধিকার, সরকার পরিচালনায় অংশ গ্রহণের অধিকার, সরকারি চাকুরিতে সমানাধিকার, সম্পত্তির মালিকানার অধিকার, চলাচল ও বসবাসের স্বাধীনতা, আশ্রয় প্রার্থনার অধিকার ইত্যাদি কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক সমাজেই সুরক্ষিত হতে পারে। আর গণতান্ত্রিক সমাজে নৈতিকতা, গণশৃঙ্খলা, ও সাধারণ কল্যাণের ন্যায্য প্রয়োজন সমূহ পূরণের উদ্দেশ্যে বা প্রয়োজনে ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং অধিকারকে আইন দ্বারা সীমিত করা যায়।

নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা

গণতান্ত্রিক সমাজে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের দ্বারা ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অধিকারে সীমাবদ্ধতা আরোপ করা যায়। প্রশ্ন হচ্ছে নৈতিকতা কি ? কেন তা প্রতিষ্ঠা করা হবে ?

নৈতিকতা শব্দটি এসেছে নীতি থেকে। নীতি শব্দের সাথে ষ্ণিক প্রত্যয় যোগে গঠিত হয়েছে নৈতিক যার অর্থ নীতি বিষয়ক, সেই থেকে নৈতিকতা যার অর্থ নীতিবোধ। অতএব নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা অর্থ হচ্ছে ব্যক্তির মধ্যে নীতিবোধ প্রতিষ্ঠা।

সমাজবদ্ধ মানুষ তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক ক্রিয়াকর্মের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এর মধ্যে কিছু কিছু আচরণ মানুষের মানবিক আচরণের মানদণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। কোনটি ভাল, কোনটি মন্দ, কোনটি উচিত কোনটি অনুচিত, কোনটি ন্যায় কোনটি অন্যায়, এ ব্যাপারে সমাজে সাধারণত একটা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই যে, ভালমন্দ , ন্যায় অন্যায়, কল্যাণ অকল্যাণ, সত্য মিথ্যা, হক বাতিল ইত্যাদি সম্পর্কে সমাজের ধারণা স্থির নয়, প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে। আবার স্থানভেদেও এর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তবে এ সম্পর্কিত ধারণা একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট সমাজে প্রায় অভিন্ন। একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট সমাজের মানুষের ন্যায়, অন্যায়, কল্যাণ অকল্যাণ, ভালমন্দ, সত্যমিথ্যা, সম্পর্কিত ধারণাই হচ্ছে নীতি। যে নিয়মের মধ্য দিয়ে সমাজ অগ্রসর হয়, সমাজ পরিচালিত হয়। নীতির প্রতি ব্যক্তির শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করা এবং নীতি মেনে চলার প্রবণতা জাগ্রত করাই হচ্ছে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা।

কোন নীতিই স্থির নয়। হাজার হাজার বছর আগের মানুষের ন্যায় অন্যায় সম্পর্কিত ধারণার সাথে আধুনিক যুগের মানুষের ধারণার যোজন যোজন তফাৎ। তেমনি তফাৎ প্রাচ্যের মানুষের ধ্যান ধারণার সাথে পাশ্চাত্যের মানুষের ধ্যান ধারণার। সময়ের এবং স্থানের পার্থক্যের কারণে মানুষের নীতি নৈতিকতারও পার্থক্য হয়। এই পার্থক্য স্বাভাবিক। নৈতিকতার মানদণ্ড যেহেতু স্থির নয় সেহেতু কোন নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা করা হবে সে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত হচ্ছে, যে সময় আমরা অতিক্রম করছি আর যে সমাজে আমরা বসবাস করছি অর্থাৎ বর্তমানে আমাদের সমাজে যে নীতি প্রচলিত আছে সেই নীতিবোধ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে আইন দ্বারা ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অধিকারে সীমাবদ্ধতা আরোপ করা যায়।

www.pathagar.com

গণশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা

মানবজীবনে অন্ধকার দিক আছে। হিংসা, বিদ্বেষ, নিষ্ঠুরতা, অসততা, লোভ ইত্যাদি মানুষকে তাড়িত করে। মানুষ যখন এসব পঙ্কিল পথে ধাবিত হয়, অনাচার অবিচারে জড়িয়ে পড়ে, নৈতিকতার পথ থেকে হয় বিচ্যুত তখনই সমাজের শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়, শান্তি বিঘ্নিত হয়। শান্তি মানুষের স্বাভাবিক প্রত্যাশা, কিন্তু শান্তি চাইলেই কি শান্তি পৃথিবীতে সব সময় বিরাজ করে? স্বার্থ, লোভ, মোহ, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, সংকীর্ণতা মানুষকে সামাজিক শান্তি ভঙ্গ করতে প্ররোচিত করে। অন্যায় জেনেও মানুষ অন্যায় করে, পাপ জেনেও পাপের পথে অগ্রসর হয়, গর্হিত কাজ জেনেও মানুষ অসততা ও অন্যায় করে। এসব এজন্য করে যে, মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত কুপ্রবৃত্তি তখন এতটা প্রবল হয় যে, শুধুমাত্র নীতিবোধ মানুষকে এসব থেকে বিরত রাখতে পারে না। আর তখন গণশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। গণ শৃঙ্খলা বলতে জন নিরাপত্তা ও সামাজিক নিরাপত্তা বুঝায়। হিংস্র আচরণ, অন্যায়ভাবে বলপ্রয়োগ, আইন অমান্য করা, জনগণের মধ্যে জাতিগত বিদ্বেষ ছড়ানো, ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানো, দাঙ্গা ইত্যাদি গণশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করতে পারে। গণশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হতে পারে। গণশৃঙ্খলা তথা জন নিরাপত্তা ও সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের মাধ্যমে ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতা সীমিত করা যায়। বস্তুত গণশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হলে ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। তাই সকলের শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ জীবন যাপনের জন্যই গণশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে হয়। এটা ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্যও জরুরি।

আলোচ্য অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় বর্ণিত অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ কালে কোন ক্ষেত্রেই জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি লংঘন করা চলবে না। জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি হচ্ছে অধিকার ও স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা। জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতিকে অতিক্রম করে কোন রকমের অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করা যাবে না। তাই সংগত কারণেই জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি সম্পর্কে আলোকপাত করা দরকার।

জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি

আন্তর্জাতিক সংগঠনের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ জাতিসংঘ। বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার নতুন আশ্বাস নিয়ে বিশ্ব ইতিহাসের এক দুর্যোগময় মুহূর্তে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আগে কোন আন্তর্জাতিক সংগঠনই এত গভীরভাবে মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এমন ব্যাপক কাঠামো এবং বিস্তৃত পরিধি গড়ে তোলে নি। এদিক থেকে জাতিসংঘের কৃতিত্ব পূর্ববর্তী সকল সংগঠনের ইতিহাসকে ছাড়িয়ে গেছে।

বিশ্বের প্রধান প্রধান দেশের নেতৃবৃন্দের প্রায় চার বছরের নিরলস প্রচেষ্টার ফসল হচ্ছে জাতিসংঘ। ১৯৪১ সালের ১২ই জুন এর বীজ উপ্ত হয়। জার্মান নাৎসি বাহিনীর বোমাবর্ষণে বিধ্বস্ত আর বিমান আক্রনের সতর্কতামূলক ধ্বনিতে আতংকিত লণ্ডন শহরের জেমস রাজপ্রাসাদে।

www.pathagar.com

লণ্ডনে তখন আশ্রয় নিয়েছে নয়টি নির্বাসিত সরকার। এরা হল বেলজিয়াম, গ্রিস, চেকোশ্লোভাকিয়া, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যাণ্ডস, নরওয়ে, পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও যুগোশ্লাভিয়া। এদের সাথে বৃটেন অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং সাউথ আফ্রিকা ইউনিয়ন একটি ঘোষণায় স্বাক্ষর করে। এই ঘোষণা 'লণ্ডন ঘোষণাপত্র' (London Declaration) নামে পরিচিত। শান্তি প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যে এই ঘোষণা রচিত হয়। এই ঘোষণায় উল্লেখ ছিল যে, চিরস্থায়ী শান্তির জন্য আগ্রাসনমুক্ত এবং সকলের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা সমৃদ্ধ পৃথিবীর প্রয়োজন, যেখানে স্বাধীন এবং মুক্ত মানুষের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতা অর্জন সম্ভব। অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্য ছিল এই লক্ষ্য পূরণের জন্য যুদ্ধ ও শান্তির পরিস্থিতিতে সকল স্বাধীন মানুষের সাথে একত্রে কাজ করা।

লণ্ডন ঘোষণাকে জাতিসংঘ গঠনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এর পরবর্তী পদক্ষেপ হল আটলান্টিক সনদ (The Atlantic Charter)। ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে যখন অক্ষশক্তি (Axis Power) ক্রমশ এগিয়ে চলেছে, হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর আক্রমণ শুরু করেছে এই পরিস্থিতির মধ্যে আটলান্টিক মহাসাগরে একটি জাহাজে মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট এবং গ্রেট ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রি চার্চিল মিলিত হন। ১৪ই আগস্ট তারা এক যৌথ ঘোষণা প্রচার করেন। ইতিহাসে এই ঘোষণাকে আটলান্টিক সনদ (Atlantic Charter) বলে।

আটলান্টিক সনদ ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত কোন চুক্তি নয়। আবার একে শান্তির লক্ষ্য পূরণের চূড়ান্ত এবং আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হিসেবেও অভিহিত করা যায় না। এই চার্টার হল দুই দেশের জাতীয় নীতির কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়। চার্টারে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, নাৎসি স্বৈরাচার চূড়ান্তভাবে ধ্বংস হবার পর তারা শান্তি স্থাপনের জন্য কাজ করবেন। যে শান্তি সকল জাতিকে তাদের নিজ নিজ সীমানার মধ্যে বাস করার নিশ্চয়তা দিবে, যে শান্তি তাদের আশ্বাস দেবে যে, সকল জাতি ভীতি এবং অভাবের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবার স্বাধীনতাসহ নিজ নিজ দেশে বসবাস করতে পারবে।

চার্টারে নিরস্ত্রীকরণকে শান্তির অপরিহার্য শর্তরূপে গণ্য করা হয়েছিল। তাছাড়া আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, আক্রমণ প্রতিরোধ, কোন দেশের জনসাধারণের মতামত ছাড়া ভূখণ্ডগত পরিবর্তন নিষিদ্ধকরণ, নিজেদের পছন্দমত প্রত্যেক জাতির নিজ নিজ সরকার গঠনের অধিকার, প্রয়োজনীয় উপকরণের ক্ষেত্রে সকল জাতির সমান অধিকারের নীতিও ঘোষিত হয়েছিল। শ্রমের উন্নত মান, অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং সামাজিক নিরাপত্তার জন্য সকল জাতির মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার উপরেও গুরুত্ব আরোপ হয়েছিল। ১৯৪১ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন, বেলজিয়াম, চেকোশ্লোভাকিয়া, গ্রিস, লুকসেমুর্গ, নেদারল্যাণ্ডস, নরওয়ে, পোল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া ও ফ্রান্সের প্রতিনিধিগণ ঐ চার্টারে স্বাক্ষর করেন।

১৯৪২ সালের ১লা জানুয়ারি ওয়াশিংটনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল, এবং সোভিয়েত ও চিনের প্রতিনিধিগণ একটি দলিলে স্বাক্ষর করেন। এই দলিল

www.pathagar.com

পরবর্তীকালে জাতিসংঘ ঘোষণা (United Nation Declaration) নামে অভিহিত হয়। সে বছর ২রা জানুয়ারি আরো ২২টি রাষ্ট্র ঐ ঘোষণায় স্বাক্ষর করে। এর পর আরো ২১টি রাষ্ট্র এর প্রতি সমর্থন জানায়। এই ঘোষণায় বলা হয় যে, আটলান্টিক ঘোষণায় বর্ণিত সকল সাধারণ উদ্দেশ্য ও নীতির প্রতি অঙ্গীকার প্রদর্শন এবং জীবন, স্বাধীনতা, জাতীয় মুক্তি, ধর্মীয় স্বাধীনতা নিজের ও অন্যদেশের মানবিক অধিকার ও ন্যায়বিচার সংরক্ষণের জন্য শত্রুর সম্পূর্ণ পরাজয় অত্যাবশ্যক। এ কারণেই স্বাক্ষরকারী সকল জাতি বর্বর ও পাশবিক শক্তি কর্তৃক বিশ্ব পদানত করার বিরুদ্ধে যৌথ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। প্রতিটি স্বাক্ষরকারী দেশ এই শপথ গ্রহণ করেছে যে, তারা জাপান, জার্মানি ও ইতালির জোটের বিরুদ্ধে সকল সামরিক ও অর্থনৈতিক সম্পদ ব্যবহার করবে, তারা কেউ শত্রুর সাথে পৃথকভাবে যুদ্ধবিরতি বা শান্তিচুক্তি সম্পাদন করবে না। যে সকল দেশ হিটলারের বিরুদ্ধে বিজয়ের সংগ্রামে সাহায্য করবে, তারাও এই ঘোষণায় স্বাক্ষর করতে পারবে।

১৯৪৩ সালের ৩০শে অক্টোবর সোভিয়েত ইউনিয়ন, গ্রেট বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রসচিব এবং মস্কোয় নিযুক্ত চিনের রাষ্ট্রদূত আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলার অভিপ্রায় সম্বলিত একটি ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন। যত দ্রুত সম্ভব একটি সাধারণ আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা তারা সকলই স্বীকার করেন। এই ঘোষণায় বলা হয়েছিল যে, এই সংগঠন সকল শান্তিপ্রিয় দেশের সার্বভৌম সমতার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ছোটবড় শান্তিপ্রিয় সকল দেশের কাছেই এই সংগঠনের সদস্যপদ উন্মুক্ত থাকবে।

১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাসে তেহরানে স্টালিন, চার্চিল এবং রুজভেল্ট এক সভায় মিলিত হন। ১লা ডিসেম্বর এক যৌথ বিবৃতিতে তারা ঘোষণা করেন যে, একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনে যোগদানের জন্য ছোটবড় সকল দেশকেই আহ্বান করা হবে। এতে আরো বলা হয় যে, এই বিবৃতি চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় সফল হবে বলে তিন রাষ্ট্রপ্রধান নিশ্চিত। এতে তারা স্বীকার করেন যে, তাদের এবং জাতিসংঘের উপর শান্তি স্থাপনের এমন এক দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে যা পৃথিবীর বিপুলসংখ্যক মানুষের শুভেচ্ছা অর্জন করবে এবং বহু প্রজন্ম ধরে যুদ্ধ ও যুদ্ধের ভীতিকে নির্বাসিত করবে।

জাতিসংঘের এই রূপরেখা পরবর্তী সম্মেলনে গৃহীত হয়েছিল। ১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসে ওয়াশিংটনের ডাম্বারটন ওকসে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্যায়ে আমেরিকা, রাশিয়া, ব্রিটেনের মধ্যে আলোচনা হয়। ২১শে আগস্ট থেকে ২৮শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই আলোচনা চলে। দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচনা শুরু হয় ২৯শে সেপ্টেম্বর, চলে ৭ই অক্টোবর পর্যন্ত। আমেরিকা, ব্রিটেন ও চিনের প্রতিনিধিগণ এই আলোচনায় অংশ নেন। এই সম্মেলন শেষে একটি বিশ্ব সংগঠনের কাঠামো সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হয়। মিত্রশক্তির সাথে যুক্ত রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে এই কাঠামো নিয়ে বিশদ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ডাম্বারটন ওকসের প্রস্তাবানুসারে নামকরণ করা হয় "সম্মিলিত জাতিসংঘ" (The United Nations Organization)

www.pathagar.com

মানব সভ্যতার এক সংকটময় মুহূর্তে গভীর প্রত্যাশা এবং অঙ্গীকার নিয়ে সম্মিলিত জাতিসংঘের জন্ম হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মত কোন যুদ্ধ ইতিপূর্বে এমন বিভীষিকা, ধ্বংসলীলা এবং চরম বিপর্যয়ের মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতিকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেয় নি। জাতিপুঞ্জ যুদ্ধ বিধ্বস্ত, আতঙ্কগ্রস্ত এবং অসহায় মানুষের নিকট শান্তি, নিরাপত্তা ও অস্তিত্বের স্বপ্ন নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে জাতিপুঞ্জের জন্ম এক স্মরণীয় ঘটনারূপে চিহ্নিত হয়ে আছে।

জাতিসংঘ সনদের প্রণেতাগণ অতীতের অভিজ্ঞতার সূত্র ধরে এমন একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন গঠন করতে চেয়েছিলেন যা লীগ অব নেশনের সকল সীমাবদ্ধতা এবং দুর্বলতাকে অতিক্রম করে এক নবীন বিশ্বের আশা সঞ্চারিত করবে। লীগ অব নেশনস্-এর চুক্তিপত্রের প্রস্তাবনায় অতি সংক্ষেপে যে শান্তি ও নিরাপত্তার ললিতবাণী উচ্চারিত হয়েছিল, তা নিছক ঘোষণায় পরিণত হয়েছিল। অনভিজ্ঞতার বেড়াজাল ডিঙিয়ে এবং বৃহৎ শক্তিবর্গের উচ্চাশার প্রমত্ততা চূর্ণ করে লীগ অব নেশনস সাফল্যের উজ্জ্বল প্রভাত তুলে আনতে পারে নি। জাতিসংঘ সনদের রচয়িতাগণ ছিলেন ব্যাপক অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ রাষ্ট্রনায়ক। তাঁরা হতাশা এবং ধ্বংসের গভীর বৃত্ত থেকে ফুটন্ত সকালের সম্ভাবনাকে তুলে আনার প্রয়াসে ব্রতী হয়েছিলেন।

লীগ অব নেশনস ছিল আন্তর্জাতিক সংগঠনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ এক নতুন পদক্ষেপ। দীর্ঘকাল ধরে ব্যাপক আলোচনার মাধ্যমে তার চুক্তিপত্রকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার কোন অবকাশ ছিল না। তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই তার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য নির্ণীত হয়েছিল। পক্ষান্তরে জাতিসংঘ সনদের রচয়িতাগণ পূর্বের অভিজ্ঞতা, দু'টি বিশ্বযুদ্ধের সর্বনাশা পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত চিন্তাধারা এবং দীর্ঘকালব্যাপী আলোচনার অবকাশের সুযোগ অর্জন করেছিলেন। তাঁরা সুচিন্তিতভাবে নতুন আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং নীতি নির্ধারণের অবকাশ পেয়েছিলেন।

লীগ অব নেশনের তুলনায় সম্মিলিত জাতিসংঘের উদ্দেশ্য অনেক বেশি ব্যাপক। জাতিসংঘ সনদের প্রস্তাবনায় এবং ১ ও ২ নং ধারায় এই আন্তর্জাতিক সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং নীতিসমূহ সংযোজিত আছে।

জাতিসংঘের লক্ষ্য

ভাবীকালের মানুষ যেন যুদ্ধ ও ধ্বংসের ভয়াবহ পরিণতি থেকে মুক্ত হয়ে এক নতুন পৃথিবী গড়ে তুলতে পারে, তার স্বপ্ন এবং অঙ্গীকার নিয়ে সানফ্রানসিস্কো সম্মেলনে সমবেত রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিগণ সম্মিলিত জাতিসংঘের লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করেছিলেন। জাতিসংঘের সনদের প্রস্তাবনায় লক্ষ্যসমূহ বর্ণিত হয়েছে।

প্রস্তাবনার শুরুতেই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় শপথ গ্রহণ করা হয়েছে। স্বাক্ষরকারীদের জীবদ্দশায় দু'বার যুদ্ধের করাল গ্রাস মানব জাতির জীবনে অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা সৃষ্টি করেছে। যুদ্ধের ঐ ক্ষত থেকে ভাবী প্রজন্মদের রক্ষা করার জন্য তাঁরা দৃঢ় অঙ্গীকার ঘোষণা করেছেন।

www.pathagar.com

উপরোক্ত শপথের বাস্তবায়নের জন্য সনদের রচয়িতাগণ কয়েকটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সাধনে ব্রতী হয়েছেন। ঐ লক্ষ্যসমূহ হল : (১) মৌলিক মানবিক অধিকার, প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদা ও যোগ্যতা, নারী-পুরুষ এবং ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল জাতির সমানাধিকারের উপর পুনরায় আস্থাস্থাপন ; (২) এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে যেখানে সন্ধি এবং আন্তর্জাতিক আইনের অন্যান্য সূত্র থেকে উদ্ভূত সকল বাধ্যবাধকতা ন্যায়-নীতি এবং সম্মানের সাথে পালিত হবে ; (৩) এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হবে যেখানে ব্যাপক স্বাধীনতার পরিমণ্ডলের মধ্যে সামাজিক প্রগতি এবং উন্নতমানের জীবন সুনিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

কেবল লক্ষ্য ঘোষণাই কোন আন্তর্জাতিক সংগঠনের জীবনীশক্তি এবং সাফল্যের ভিত্তি প্রস্তুত করতে পারে না। তার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত সাংগঠনিক ব্যবস্থা, মানবিক মূল্যবোধ আর সদস্যদের গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি। সনদের প্রস্তাবনায় উল্লেখিত লক্ষ্যসমূহের কার্যকারিতার পথ-নির্দেশ আছে। সনদে বলা হয়েছে ঃ

(১) এই লক্ষ্যসমূহ রূপায়নের জন্য সকল সদস্য-রাষ্ট্র সহনশীলতার নীতি অনুসরণ করবে। সকল রাষ্ট্র সুপ্রতিবেশীরূপে শান্তিতে বসবাস করবে। প্রস্তাবনায় পথ-নির্দেশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সহনশীল মনোভাবের অভাব থেকেই আগ্রাসন ও বিরোধ সৃষ্টি হয়। সকল রাষ্ট্রেই সুপ্রতিবেশীসুলভ নীতিই একমাত্র শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করতে পারে।

(২) আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তা রক্ষা করার জন্য সকল রাষ্ট্রের শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, কোন রাষ্ট্রের একক শক্তি ও সামর্থ্যের দ্বারা আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তা রক্ষা করা সম্ভব নয়। যৌথ প্রয়াসেই শান্তির নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

(৩) জাতিসংঘের সকল সদস্য-রাষ্ট্রকে নীতি এবং পদ্ধতিগত ব্যবস্থার মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে যে, সমস্বার্থ ব্যতীত যেন সশস্ত্রবাহিনী ব্যবহার করা না হয়। ব্যক্তিগত স্বার্থে সামরিক বাহিনীর ব্যবহার যুদ্ধের পরিস্থিতির উন্মেষ ঘটায়। এই কারণেই সামরিক বাহিনী ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নীতি ও পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন।

(৪) বিশ্বের জনসমাজের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অগ্রগতির জন্য জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে আন্তর্জাতিক সংস্থার সাহায্য গ্রহণ করতে হবে।

জাতিসংঘের উদ্দেশ্য

জাতিসংঘ সনদের ১ম ধারায় তার উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণিত হয়েছে। লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য পরস্পরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সনদে জাতিসংঘের ৪টি উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পদ্ধতি ও ব্যবস্থা সংযোজিত হয়েছে। সনদ প্রণেতাগণ যথার্থ উপলব্ধি করেছিলেন যে, বাস্তবায়নের সঠিক ব্যবস্থা ছাড়া উদ্দেশ্যের ঘোষণা নিরর্থক। দুটি বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসাত্মক পরিণতি মানবজাতির মধ্যে এই অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত করেছে যে, যুদ্ধ এবং যুদ্ধের ভীতি থেকে মুক্ত একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলাই বিশ্ববাসীর সর্বাপেক্ষা জরুরি এবং মৌলিক কর্তব্য। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই

www.pathagar.com

জাতিসংঘের উদ্দেশ্য নির্ধারণ বা স্থির করা হয়েছে। জাতিসংঘের উদ্দেশ্যসমূহ হল ঃ

এক. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন ও বজায় রাখা। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য কোন পন্থা অবলম্বিত হবে, সনদে তার উল্লেখ আছে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য শান্তির প্রতি ভীতিপ্রদর্শন প্রতিরোধ ও নির্মূলীকরণ এবং অন্যান্য আগ্রাসী বা শান্তি ভঙ্গজনিত কার্যকলাপ দমনের জন্য যৌথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাছাড়া যে সকল আন্তর্জাতিক বিরোধ বা পরিস্থিতি শান্তিভঙ্গের কারণে হতে পারে ন্যায়নীতি এবং আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ঐ বিরোধ বা পরিস্থিতির নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন। অর্থাৎ আগ্রাসন দমন, শান্তি বিঘ্নকারী সকল ভীতি প্রদর্শনের প্রতিরোধ এবং ন্যায়-নীতিও আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে বিরোধের মীমাংসার মাধ্যমেই আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষিত হতে পারে।

দুই. সম্মিলিত জাতিসংঘের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল, সকল জাতির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন। সকল মানুষের সমানাধিকার এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত মর্যাদা হবে আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ভিত্তি। এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের বিকাশের জন্য আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার্থে অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অত্যাবশ্যক। বস্তুতপক্ষে বন্ধুত্বই হলো শান্তির সোপান।

তিন. সকলের সমানাধিকার এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত মর্যাদাবোধের স্বীকৃতি সকল জাতির মধ্যে শান্তিপূর্ণ এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন স্থিতিশীলতা এবং কল্যাণবোধের অনুপ্রেরণা। যুদ্ধের মূলোৎপাটনের জন্য প্রয়োজন ব্যাপক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সহযোগিতা। জাতিসংঘের তৃতীয় উদ্দেশ্যের মাধ্যমে এই আন্তর্জাতিক সহযোগিতার অভিপ্রায় এবং অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং মানবিক প্রকৃতির সমস্যা সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অর্জনের চেষ্টা করা হবে। সনদে আরো শপথ গ্রহণ করা হয়েছে যে, জাতি, ভাষা, ধর্ম, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং উৎসাহ সৃষ্টির জন্য জাতিসংঘ সচেষ্ট থাকবে। জাতিসংঘ সনদের ৫৫ নং ধারায় এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কর্মধারার মাধ্যমে এই উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটেছে।

চতুর্থ উদ্দেশ্য হল উপরোক্ত তিনটি উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য এই আন্তর্জাতিক সংগঠনকে সকল জাতির ক্রিয়াকলাপের সমন্বয় সাধনের কেন্দ্রে পরিণত করা।

জাতিসংঘের নীতিসমূহ

১. জাতিসংঘ এর সকল সদস্যের সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

২. প্রত্যেক সদস্যের জন্য সদস্যপদ প্রসূত সকল অধিকার ও সুবিধা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে, সকল সদস্য বর্তমান সনদ অনুসারে গৃহীত তাদের বাধ্যবাধকতাসমূহ বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করবে।

www.pathagar.com

৩. সকল সদস্য তাদের মধ্যকার আন্তর্জাতিক বিরোধসমূহ শান্তিপূর্ণ উপায়ে এমনভাবে মীমাংসা করবে যাতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা এবং ন্যায়বিচার বিপন্ন না হয়।

৪. সকল সদস্য আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, কোন রাষ্ট্রের আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অথবা জাতিসংঘের উদ্দেশ্যাবলীর পরিপন্থী সকল প্রকার বলপ্রয়োগের হুমকী প্রদান কিংবা বলপ্রয়োগ থেকে বিরত থাকবে।

৫. জাতিসংঘ বর্তমান সনদ অনুসারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সকল সদস্য সেই ব্যাপারে সর্বপ্রকার সহায়তা প্রদান করবে এবং জাতিসংঘ যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন নিরোধক বা বাধ্যকরণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, সেই রাষ্ট্রকে সাহায্য প্রদান করা থেকে বিরত থাকবে।

৬. যে সকল রাষ্ট্র জাতিসংঘের সদস্য নয় সে সকল রাষ্ট্র যাতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রয়োজন অনুসারে এই নীতিসমূহ অনুসরণ করে জাতিসংঘ তা নিশ্চিত করবে।

৭. বর্তমান সনদের কোন কিছুই জাতিসংঘকে এমন কোন ক্ষমতা প্রদান করে না। যার ফলে তা কোন রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে। অথবা কোন সদস্যকে অনুরূপ কোন বিষয় সনদের অধীন মীমাংসার জন্য পেশ করতে বাধ্য করতে পারে ; কিন্তু এই নীতি সপ্তম অধ্যায়ের অধীনে বাধ্যকরণমূলক ব্যবস্থার প্রয়োগ ক্ষুণ্ন করবে না।

মানুষের যত অধিকার ও স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হল সবই জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতির ভেতর থেকে ভোগ করতে হবে। মানুষের স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে উপরে বর্ণিত জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি অতিক্রম করা যাবে না। এটা অধিকার ও স্বাধীনতার অন্যতম সীমা। ব্যক্তিকে এই সীমাবদ্ধতা মেনেই চলতে হবে।

সার সংক্ষেপ

মানুষ একা বাঁচে না, যার জীবনে ভালবাসা নেই, যার জীবনে হাসিকান্না নেই, তার জীবন পশুর জীবন। বাঁচার মত বাঁচতে হলে তাই মানুষকে হতে হয় সমাজবদ্ধ। সমাজ গঠিত হয় অনেক মানুষ নিয়ে। প্রত্যেক মানুষের অধিকার আছে সফলভাবে বাঁচার। অনেক মানুষ নিয়ে যেহেতু সমাজ তাই একের অধিকার অন্যের অধিকার দ্বারা সীমায়িত। স্বাধীন দবিরের যে অধিকার স্বাধীন সাবেতেরও সেই অধিকার। দবির ব্যায়াম করতে গিয়ে তার নিক্ষিপ্ত হাত দ্বারা সাবেতকে আঘাত করতে পারে না। সাবেতের নাক যেখানে শুরু দবিরের স্বাধীনতা সেখানে শেষ। যে অধিকারের সীমা সম্পর্কে সচেতন নয় সে অধিকার দাবি করতে পারে না।

মানবাধিকারের সীমা পাঁচটি : (১) অন্যের অধিকারের স্বীকৃতি এবং মর্যাদা, (২) অন্যের স্বাধীনতার স্বীকৃতি ও মর্যাদা , (৩) স্বীকৃত নৈতিকতা, (৪) জনশৃঙ্খলা, এবং (৫) জনকল্যাণ।

স্বাধীনতা এবং অধিকারকে সামঞ্জস্য হতে হবে জাতিসংঘের নীতি এবং উদ্দেশ্যের সাথে।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

এই ঘোষণার কোন কিছুরই এমন ব্যাখ্যা প্রদান করা যাবে না যার অর্থ দাঁড়ায় যে, এতে বর্ণিত কোন অধিকার এবং স্বাধীনতা বিনষ্ট করার উদ্দেশ্য কোন রাষ্ট্র, গোষ্ঠী অথবা ব্যক্তির কোন কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার বা কোন কাজ সম্পাদন করার অধিকার রয়েছে।

(Article : 30. Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.)

ভাষ্য

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের সর্বশেষ অনুচ্ছেদ হচ্ছে এটি। মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা বিনষ্টের সকল রকম প্রয়াসের বিরুদ্ধে এটি হচ্ছে সর্বশেষ সতর্কতামূলক বক্তব্য। এই ঘোষণাপত্রের প্রতিটি কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করা, হরণ করা নয়। তাই কোন অজুহাতে মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা কেড়ে নেয়ার অপতৎপরতাকে রুখবার জন্য আলোচ্য অনুচ্ছেদে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, আরোপ করা হয়েছে সীমাবদ্ধতা।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র যখন গৃহীত হয় ১৯৪৮ সালে তখন পৃথিবী সবেমাত্র একটি ভয়াবহ মহাযুদ্ধ অতিক্রম করে এসেছে। বিভিন্ন দেশের শহর, বন্দর জনপদে তখনও যুদ্ধের দগদগে ঘা লেগে আছে। যুদ্ধের দুর্বিসহ স্মৃতি আর মারাত্মক ক্ষতচিহ্ন নিয়েই বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ভাবলেন মানব জাতিকে আর যুদ্ধের ভয়াবহতার মুখে ঠেলে দেয়া নয়, বরং একটি শান্তিপূর্ণ পৃথিবী, মানুষের বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তুলতে হবে। এই প্রত্যয় নিয়েই গড়ে উঠে জাতিসংঘ। লীগ অব নেশনস-এর ব্যর্থতার পর জাতিসংঘ গড়ে ওঠে মানবজাতিকে যুদ্ধের অভিশাপ থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য। যে সনদ গ্রহণের মধ্য দিয়ে এই বিশ্বসংস্থা গঠিত হয় সেই সনদেই মানবাধিকার রক্ষার অঙ্গীকার রয়েছে। পরবর্তীকালে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র গ্রহণের মধ্য দিয়ে

www.pathagar.com

তাকে আরো সুস্পষ্ট রূপ দেয়া হয়। এই ঘোষণাপত্রে মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অধিকারের বয়ান রয়েছে, বয়ান রয়েছে মানুষের স্বাধীনতার। এই ঘোষণাপত্র প্রস্তুতের জন্য অর্থাৎ মানবাধিকার সম্পর্কে জাতিসংঘের বক্তব্য পেশের জন্য ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্টের নেতৃত্বে মানবাধিকার বিষয়ক কমিশন গঠিত হয়। প্রায় আড়াই বছর পরিশ্রমের পর কমিশন মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের খসড়া প্রণয়ন করে। এবং ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর এই খসড়া অনুমোদিত ও গৃহীত হয়।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র, যাতে কিনা মানুষের সকল অধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে, তা প্রণয়ন অনুমোদন ও গ্রহণের পিছনে একটা মুখ্য উদ্দেশ্য কাজ করছে আর সেটা হচ্ছে, মানুষকে নিরাপত্তা প্রদান। মানুষ নামে সৃষ্টির যে সেরা জীব এই ভূ-পৃষ্ঠে বসবাস করছে, তাদের জানমান ইজ্জত আব্রু রক্ষা করাই এর মূল লক্ষ্য। মূল এবং প্রধান বিষয় হচ্ছে মানুষ, আর সবই উপলক্ষ্য। মানুষকে কেন্দ্র করেই সমাজ রাষ্ট্র, সভ্যতা আবর্তিত হয়। এসবই মানুষের জন্য, মানুষ কোন কিছুর জন্য নয়। তাই মানবাধিকারের ৩০টি অনুচ্ছেদ জুড়ে আছে মানবতার সংরক্ষণের জোরালো প্রয়াস। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে, এই ঘোষণাপত্র অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। খুব কম শব্দ প্রয়োগ করে একে উপস্থাপন করা হয়েছে। সামান্য কথায় অনেক বেশি বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই এই ঘোষণাপত্র হয়েছে কঠিন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে খানিকটা অস্পষ্ট। এমতাবস্থায় সাধারণ মানুষের পক্ষে এটি বুঝতে হলে চাই ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যা ছাড়া বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ ব্যাপার। অতএব ব্যাখ্যা লাগবেই। কিন্তু ব্যাখ্যা যেনতেনভাবে এবং যেমন খুশি তেমন করলে চলবে না। এ ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা আছে। ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আরোপিত সীমাবদ্ধতাই আলোচ্য অনুচ্ছেদের মূল বিষয়।

প্রথমেই আলোচনা করি ব্যাখা কাকে বলে সে বিষয়টি। ব্যাখ্যা হচ্ছে এমন একটি কর্ম, যার মাধ্যমে কোন বক্তব্য লেখনী বা বিষয়কে স্পষ্ট, বিশদ বা বোধগম্য করে তোলা হয়। ব্যাখ্যার কাজ হচ্ছে অস্পষ্টকে সুস্পষ্ট, দুর্বোধ্যকে বোধগম্য আর কঠিনকে সহজ করে তোলা।

কোন বক্তব্যের লক্ষ্য হচ্ছে কমিউনিকেট করা। বক্তব্যকে শ্রোতা বা পাঠকের বোধগম্য করে উপস্থাপনই বক্তা বা লেখকের উদ্দেশ্য। বক্তব্য যদি অস্পষ্ট হয় তাহলে যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হবে না এবং বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। তখনই বক্তব্যকে বোধগম্য করার জন্য ব্যাখ্যা করতে হয়। যে কোন বক্তব্যের অস্পষ্টতা দূরীভূত করার জন্য এটা অপরিহার্য।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে বর্ণিত বিষয়সমূহ যেহেতু সংক্ষিপ্ত এবং এর এক একটি শব্দ যেহেতু ব্যাপক তাৎপর্যবহ সেহেতু এই ঘোষণাপত্রের ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশি। ব্যাপক ব্যাখ্যা ছাড়া এই জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়টিকে সাধারণের বোধগম্য করা দুরূহ ব্যাপার। তদুপরি এটি আন্তর্জাতিক আইনের গুরুত্বপূর্ণ দলিল। আইন সংশ্লিষ্ট বিষয় হওয়ার কারণে এর সুপ্রয়োগ অনেকাংশেই নির্ভরশীল বিষয়টির যথাযথ ব্যাখ্যার উপর। যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকৃত ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাই কেবল মানবাধিকার সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে সচেতন করে তুলতে

www.pathagar.com

পারে। এই ঘোষণাপত্রের প্রতিটি বক্তব্য সঠিকভাবে বুঝতে না পারলে মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং একে কার্যকর করা দুরুহ হবে।

ব্যাখ্যা করার সময় অনেক কথা বলার অবকাশ থাকে। উদাহরণ, উপমা, নজির উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রেক্ষাপট উল্লেখ করে বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ করা হয় ব্যাখ্যাতে। ব্যাখ্যাতে যদিও অনেক কথা বলার ফুরসত থাকে তাই বলে বিষয়বস্তুকে ছাপিয়ে ভিন্নপথে যাওয়া যায় না। অপ্রাসঙ্গিকতা এবং বাহুল্য বর্জন করতে হয়। মূল বিষয়কে বাদ দিয়ে ভিন্ন বিষয়ে গেলে ব্যাখ্যা আর ব্যাখ্যা থাকে না। তাই ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে বক্তব্য বিষয়ানুগ হওয়া।

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার কোন কিছুরই এমন ব্যাখ্যা প্রদান করা যাবে না যার অর্থ দাঁড়ায় যে, এতে বর্ণিত কোন অধিকার এবং স্বাধীনতা বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে কোন রাষ্ট্র গোষ্ঠী অথবা ব্যক্তির কোন কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার কোন কাজ সম্পাদন করার অধিকার রয়েছে।

এক্ষেত্রে একটি বিষয় অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের উদ্দেশ্য পরিপন্থী কোন কাজের বৈধতা, প্রদানের অজুহাত সৃষ্টির কোন অবকাশ নেই। কেউ মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য তৎপর হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করবেন, এমনভাবে এই ঘোষণাপত্র ব্যাখ্যা করা যাবে না। বস্তুত মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র ব্যাখ্যা করার সময় সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে, মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এই ঘোষণাপত্র জারি হয়েছে। সুতরাং এর মাধ্যমে স্বাধীনতা ও অধিকার হরণ করার প্রয়াস যথার্থ হবে না।

ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এই সীমাবদ্ধতা আরোপের প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, জগৎ সংসারে সকল মানুষই সাধুসন্ত নয়। সকল সময় সকল দেশেই কিছু অসৎ, কায়েমী স্বার্থবাদী মানুষ থাকে। এরা বৃহত্তর মানবমণ্ডলীর স্বার্থের চেয়ে নিজের স্বার্থকে বড় করে দেখে। এরা সবসময়ই নিজের স্বার্থকে সুরক্ষা করতে চায়। উপায় অন্বেষণ করে কিভাবে নিজেকে আরো সমৃদ্ধ ও ক্ষমতাশালী করা যায়, এতে যদি অন্য সকলের স্বার্থও পদদলিত হয়। এদের দ্বারা মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা হওয়া অবাস্তব এবং আশ্চর্যজনক কিছু নয়। এরা সবসময়ই চেষ্টা করবে কি করে মানবাধিকার ঘোষণার কদর্থ দ্বারা মানুষের অধিকার হরণ করা যায়, স্বাধীনতা খর্ব করা যায়। ফলে আশংকা থেকে যায় যে, এরা এই সনদকে যথেচ্ছ ব্যাখ্যা করবে এবং এতে করে মানবাধিকার ঘোষণার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার মূল লক্ষ্য যেহেতু মানুষের অধিকার সংরক্ষণ সেহেতু ব্যাখ্যার কদর্থ দ্বারা এই অধিকার খর্ব করলে এই ঘোষণার উপযোগিতা ও কার্যকারিতাই বিপন্ন হয়। তাই অধিকার ও স্বাধীনতা হরণের লক্ষ্যে কোন রকমের কাজ করা যায় এমন সুযোগ সৃষ্টি করা ব্যাখ্যার মাধ্যমে—এই অধিকার খর্ব করা হয়েছে আলোচ্য অনুচ্ছেদে। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রকে গতিশীল ও সমুন্নত রাখার জন্যই ঘোষণাপত্রের সমাপ্তিতে এই অনুচ্ছেদ সংযুক্ত হয়েছে। এই অনুচ্ছেদ পুরো ঘোষণাপত্রের রক্ষকতুল্য।

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা করার অধিকার কার?

শিক্ষাবিদ, পণ্ডিত, বিশ্লেষক, সাংবাদিক, প্রশাসক সকলেই ব্যাখ্যা করতে পারেন। ব্যাখ্যা করতে পারেন দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদগণ। প্রশ্ন হচ্ছে যিনি ব্যাখ্যা করবেন তিনি ব্যাখ্যা করবার সময় নিজের স্বার্থকে বড় করে দেখবেন কিনা। যদি তিনি তা করেন, তাহলে ব্যাখ্যা আইনানুগ এবং যথার্থ হবে না। এ ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠ, যথার্থ ও অপক্ষপাতদুষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে আদালতের কাছ থেকে। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন শাসনতন্ত্র এবং এই শাসনতন্ত্র ব্যাখ্যা করার অধিকার সংরক্ষণ করে সুপ্রীম কোর্ট। সুপ্রীম কোর্ট যেহেতু সংবিধান ব্যাখ্যা করার অধিকার সংরক্ষণ করেন সেহেতু সুপ্রীমকোর্টের হাতেই মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ব্যাখ্যা সবচেয়ে নিরাপদ। আদালত নিরপেক্ষতার প্রতীক। তাই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যাতে নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন হওয়ার আশংকা কম। শাসক যদি ব্যাখ্যা করেন তাহলে তার ব্যাখ্যাতে মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হতে পারে কারণ তিনি ক্ষমতার স্বার্থে তা করতে প্রবৃত্ত হতে পারেন কিন্তু আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যায় সে আশংকা থাকে না। মোটামুটি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের প্রামান্য ব্যাখ্যা প্রদানের অধিকারী হচ্ছে আদালত।

তিনটি স্থান থেকে মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতায় আঘাত আসতে পারে। এই তিনটি স্থান হচ্ছে রাষ্ট্র, গোষ্ঠী এবং ব্যক্তি। মানবাধিকার রক্ষার দায়িত্বও এদেরই। রাষ্ট্র, গোষ্ঠী এবং ব্যক্তির ব্যক্তিগত এবং সামষ্টিক প্রয়াসেই মানবাধিকার রক্ষা পায়, কার্যকর হয়। কিন্তু কোন রাষ্ট্র, কোন গোষ্ঠী বা কোন ব্যক্তি যদি দুর্ভাগ্যজনক এবং অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা বিনষ্টে তৎপর হয় এবং সে লক্ষ্যে কোন কাজ সম্পাদন করে তাহলে সেটা হবে মানবতার জন্য দুর্ভাগ্য। তারপর সেটা যদি আবার করা হয় মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে, তাহলে সেটা হবে মর্মান্তিক, অসহনীয়। নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য, নিজের প্রয়োজনের পূরণের জন্য এমন অপকর্ম করেন অনেকেই। তাই রাষ্ট্র গোষ্ঠী বা ব্যক্তি যাতে নিজের স্বার্থে মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতাকে খর্ব করার জন্য এই ঘোষণাপত্রের অপব্যাখ্যা, ভুলব্যাখ্যা করতে না পারে সেই লক্ষেই আলোচ্য অনুচ্ছেদ ব্যাখ্যাকারদের একটা নীতিমালা মেনে চলতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, আপনারা যেই ব্যাখ্যা করুন না কেন, ব্যাখ্যার মাধ্যমে এমন সুযোগ অজুহাত বা ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটাবেন না যাতে করে কোন রাষ্ট্র, কোন গোষ্ঠী বা কোন ব্যক্তি এর সুবাদে মানবাধিকার হরণ না করে। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র প্রণেতা, অনুমোদনকারী এবং সামগ্রিকভাবে মানবজাতি মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এই ঘোষণাপত্র লালন করে আসছে। এখন কেউ যদি তা বিনষ্ট করার জন্য এই সনদকেই ব্যবহার করে তাহলে মানবমণ্ডলীর দীর্ঘ প্রয়াসই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। ব্যক্তি গোষ্ঠী বা রাষ্ট্রকে অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার সুযোগ দেয়া যাবে না, দেয়া উচিত নয়।

www.pathagar.com

ব্যক্তি গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব

ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রের মৌল উপাদান হচ্ছে মানুষ। মানব সমাজের মৌলিক একক। মানুষের অধিকার রক্ষার জন্যই মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র। আবার এটা রক্ষার জন্য মানুষকেই নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। পশু মানুষের অধিকার বা স্বাধীনতা হরণ করে না । এই অপকর্মটি করে মানুষ। অথচ বলা হয় মানুষে মানুষে ভাই ভাই। মানুষের প্রতি জুলুম, নিষ্পেষণ, অত্যাচার অবিচার নিষ্ঠুরতা চালায় মানুষ। মানুষই খুন করে মানুষকে, এমনকি এক প্লেটে খেয়ে এক বিছানায় শুয়ে স্বামী খুন করে স্ত্রীকে, অথবা স্ত্রী স্বামীকে। এতে বুঝা যায় মানুষের মিত্র যেমন মানুষ, তেমনি মানুষের শত্রুও মানুষই। তাই মানুষকে রক্ষার প্রধান দায়িত্ব পালন করতে পারে মানুষই। মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে এই ঘোষণাপত্রে বর্ণিত অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণ করা। ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং রাষ্ট্র মানুষেরই তিনটি রূপ। এই তিনটি রূপ এবং এসবের দায়িত্ব সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

ব্যক্তি ও ব্যক্তির দায়িত্ব

ব্যক্তি হচ্ছে মানব সমাজের মৌলিক একক। ব্যক্তিবর্গকে নিয়েই সমাজ। সমাজে প্রতিটি ব্যক্তির যেমন অধিকার আছে তেমনি রয়েছে দায়িত্ব ও কর্তব্য। প্রতিটি ব্যক্তি যদি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিক ও সুচারুরূপে পালন করে তবেই সমাজ হয় সুশৃঙ্খল ও শান্তিময়। ব্যক্তিকে নিয়েই যেহেতু সমাজ, রাষ্ট্র, গোষ্ঠী সেহেতু ব্যক্তির মধ্যে মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার প্রেরণা জাগিয়ে তুলতে পারলেই এই ঘোষণাপত্র কার্যকর করা সহজতর হবে। ব্যক্তিকে বুঝতে হবে যে, অন্যের অধিকার ও স্বাধীনতা হরণ করার অধিকার ও স্বাধীনতা ব্যক্তির নেই।

গোষ্ঠী ও গোষ্ঠীর কর্তব্য এবং দায়িত্ব

একাধিক ব্যক্তি মিলে গোষ্ঠীর উদ্ভব। সাধারণত একটি বিশেষ স্বার্থকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এক একটি গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠী থেকে বিভিন্ন দিক থেকে আলাদা। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় কারণে গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। রক্তসম্পর্ক বা বংশগত কারণেও গোষ্ঠী গড়ে উঠতে পারে। যার ভিত্তিতেই গোষ্ঠী গড়ে উঠুক না কেন গোষ্ঠীর একটি সাধারণ স্বার্থ থাকে। একটি অভিন্ন স্বার্থ রক্ষার জন্য গোষ্ঠীর তৎপরতা পরিচালিত হয়।

একটি গোষ্ঠী তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য অন্যের স্বাধীনতা ও অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। সকলের বৈধ স্বার্থ-সংরক্ষণের অধিকার সকলেরই আছে, কোন গোষ্ঠীই অপর কোন গোষ্ঠীর বা ব্যক্তির বৈধ স্বার্থ অধিকার এবং স্বাধীনতা হরণ করার প্রয়াস চালালে সামাজিক অশান্তি সৃষ্টি হবে। এই অশান্তি কারো কাম্য নয়। প্রতিটি গোষ্ঠীর দায়িত্ব হচ্ছে তাদের তৎপরতাকে এমনভাবে পরিচালিত করা যাতে অন্য কারো অধিকারের সীমায় তা প্রবেশ না করে, অন্য কারো স্বাধীনতাকে খর্ব না করে। সকলের স্বাধীনতা এবং অধিকার সংরক্ষণের অনুকূল পরিবেশ থাকলেই প্রতিটি গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা পাবে । অন্যথায় নয়।

www.pathagar.com

যিনি এই ঘোষণাপত্র ব্যাখ্যা করবেন তাকে এই বিষয়ে সতর্ক থাকবে হবে যে, তার ব্যাখ্যার সুবাদে গোষ্ঠী যেন এমন কাজ করতে সুযোগ না পায় যা করলে মানুষের স্বাধীনতা ও অধিকার বিনষ্ট হবে। কোন গোষ্ঠীরও এই ঘোষণাপত্রের কোন ব্যাখ্যার মাধ্যমে মানুষের স্বাধীনতা ও অধিকার হরণের অজুহাত খোঁজা চলবে না।

রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব

রাষ্ট্র হচ্ছে ব্যাপক সংখ্যক মানুষের সমন্বয়ে গঠিত একটি রাজনৈতিক সংগঠন। যার ভূখণ্ড, সরকার এবং সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে। যে সব মানুষ নিয়ে রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে সেসব মানুষ হচ্ছে এর নাগরিক বা সদস্য। রাষ্ট্রের পক্ষে সার্বভৌম ক্ষমতার চর্চা করে সরকার। এই ক্ষমতার বলে রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার নাগরিকদের অধিকার হরণ করতে পারে, স্বাধীনতা খর্ব করতে পারে। পৃথিবীর দেশে দেশে এখনো বোধ করি রাষ্ট্র তথা সরকার কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাই সর্বাধিক এবং লোমহর্ষক। প্রায়শই রাষ্ট্রের স্বার্থের ও নিরাপত্তা স্থিতিশীলতার দোহাই দিয়ে সরকার নাগরিকদের মৌলিক স্বাধীনতা ও অধিকার হরণ করে। রাষ্ট্র রক্ষক হয়ে যেখানে ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় সেখানে জনগণের কিছুই করার থাকে না।

অথচ রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের –নাগরিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা। তাদের অধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়া। রাষ্ট্রের কাজ হচ্ছে তার সামর্থ অনুযায়ী সম্ভাব্য সর্বোত্তমভাবে নাগরিক জীবনের মৌলিক প্রয়োজন পূরণসহ নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতার গ্যারাণ্টি প্রদান। এর বিপরীত কাজকর্ম রাষ্ট্রের কাছে প্রত্যাশা করা হয় না।

এই ঘোষণাপত্র এমনভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না যাতে রাষ্ট্র বা সরকার মানুষের স্বাধীনতা ও অধিকার হরণের জন্য এটাকে ব্যবহার করতে পারে। বস্তুত মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র জারি করার মূল লক্ষ্য হচ্ছে দেশ, জাতি, গোত্র, বর্ণ, ধর্ম ও নারী-পুরুষ ভেদে সকল মানুষের মানবাধিকার রক্ষা করা। অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করাই লক্ষ্য। এই অধিকার ও স্বাধীনতা যাতে কোনভাবে খর্ব না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার দায়িত্ব সরকার, গোষ্ঠী এবং ব্যক্তি সকলের। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা বা অপব্যাখ্যা না করার জন্য আলোচ্য অনুচ্ছেদে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। কারণ এই অপকর্মটি করলে ব্যর্থ হবে মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র, লঙ্ঘিত হবে মানুষের মৌলিক স্বাধীনতা ও অধিকার। অথচ এগুলো যথাযথভাবে রক্ষিত না হলে মানুষের পক্ষে প্রকৃত মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে না। মানুষ মানুষের জন্য, এই কথাটিকে অন্তরে লালন করে সকল মানুষের উচিত, মানুষের কল্যাণের জন্য নিজেকে নিবেদিত করা। একটি কল্যাণমূলক শান্তিময় পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য সকলের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করা এবং সকল মানুষের যুক্তিসঙ্গত দাবিকে সম্মান প্রদর্শন করা আবশ্যক, যাতে সকলের অধিকার ও স্বাধীনতা অক্ষত থাকে। কারো স্বাধীনতা এবং অধিকার ভূ-লুষ্ঠিত না হয়। মানুষকে মানবেতর জীবন যাপন করতে না হয়। আশরাফুল মাখলুকাত মানুষ যথার্থ মর্যাদায় আসীন হোক, মানবাধিকার হোক সমুন্নত।

www.pathagar.com

সারসংক্ষেপ

জাতিসংঘের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় যে সব স্বাধীনতা এবং অধিকারের কথা বলা হয়েছে সেগুলো নানাভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। এই বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করতে পারে (১) রাষ্ট্র, (২) দল, এবং (৩) ব্যক্তি। তারা ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে আবিষ্কৃত নীতিকে প্রয়োগ করতে পারে তাদের কর্মকাণ্ডে।

এখানে ছোট একটি হুশিয়ারি প্রয়োজন। কোন রাষ্ট্রের, দলের বা মানুষের ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে এমন কিছু আবিষ্কার করা এবং সেই আবিষ্ক্রিয়ার ফলে এমন কোন কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত হওয়া অন্যায়, যা মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় বিধৃত অধিকার ও স্বাধীনতার পরিপন্থী।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

মানবাধিকার ও আজকের বিশ্ব

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়েছে এই শতাব্দীর মধ্যভাগে। প্রায় অর্ধশতাব্দী হতে চলেছে এর বয়স। এর মধ্যে পৃথিবীর রূপ অনেক বদলে গেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দূরের মানুষকে কাছে এনে দিয়েছে। যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন মানুষে মানুষে সম্পর্ক জোরদার করেছে। সাংস্কৃতি আদানপ্রদান বেড়েছে। বন্যা, খরা, মহামারী, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় মানুষ পাচ্ছে অপর মানুষের সহযোগিতা। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রভাব পড়ছে। এর ফলে মানুষের জীবনমান আধুনিক ও উন্নত হয়েছে। সহযোগিতার নতুন নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের কল্যাণের জন্য নিবেদিত হয়ে বিজ্ঞান অনেক নিরাপদ করেছে মানুষের জীবনকে। করেছে গতিশীল। এই অর্ধ শতাব্দীতে অনেক পরিবর্তন হয়েছে আমাদের। কিন্তু পরিবর্তন কি শুধু ভালর দিকেই হয়েছে? নাকি খারাপের দিকেও গিয়েছে খানিকটা? এটা একটা আপেক্ষিক বিষয়। আমরা এগিয়ে গেছি না পিছিয়ে পড়েছি তা নিরূপণ করতে অনেক কিছুই পর্যালোচনা করতে হবে। দৃশ্যপটে চোখ বুলালে মনে হয় আমাদের জীবন অনেক সুখময় হয়েছে। টিভি, টেলিপ্রিন্টার, টেলেক্স, ফ্যাক্স, কম্পিউটার, ভূ-উপগ্রহ ইত্যাদি দেখলে মনে হয় আগের চেয়ে অনেক উজ্জ্বল হয়েছে দিন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দ্রুত আন্তর্জাতিক সাহায্য আসার ধরন দেখে মনে হয় আগের চেয়ে অনেক মানবিক হয়েছে পৃথিবী। মানুষ অনেক বেশি সহযোগী হয়েছে । কিন্তু পাশাপাশি যখন দেখি বোমা মেরে অসহায় নারী-পুরুষ-শিশু হত্যার দৃশ্য, যখন শুনি খাদ্য ও ওষুধের অভাবে মানুষ মরার খবর, যখন পড়ি কারাগারে পুলিশী নির্যাতনে আসামির মৃত্যুর সংবাদ তখন মন মানতে রাজী হয় না যে, আমরা ভাল আছি।

www.pathagar.com

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলেই আমরা বুঝতে পারবো যে, মানবাধিকারের অবস্থা কেমন, পৃথিবীর মানুষ তার অধিকার ও স্বাধীনতা কেমন ভোগ করছে।

১৯৪৮ সালে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা প্রচারের পর তার সফল বাস্তবায়নের জন্য অনেকগুলো কনভেনশন গৃহীত হয়েছে, গঠিত হয়েছে অনেক সংস্থা ও সংগঠন। ১৯৬৮ সালে ইরানের রাজধানী তেহরানে অনুষ্ঠিত হয় মানবাধিকারের উপর প্রথম বিশ্ব সম্মেলন। দীর্ঘ প্রায় পঁচিশ বছর পর এই ধরনের আরেকটি বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এ বছরের জুন মাসে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায়। এ সকল সম্মেলন, সংগঠন, সংস্থা কনভেনশন ইত্যাদির মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানবাধিকার বাস্তবায়ন। যদি এই ঘোষণা পত্রে বর্ণিত অধিকার ও স্বাধীনতা কার্যকর করা না হয় তাহলে এর সকল আয়েজনই কার্যত ব্যর্থ হয়ে যায়। মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা চিহ্নিত করাই একমাত্র কথা নয়। অবশ্যই এটা গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরি কিন্তু চিহ্নিত করার সাথে সাথে তা কার্যকর করাও অপরিহার্য। দিন কম হয় নি। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর। একজন মানুষের দৈহিক ও মানসিক বিকাশের জন্য এই সময়টি যেমন যথেষ্ট তেমনি একটি জাতির উন্নয়নের জন্যও তা পর্যাপ্ত সময়। সমাজ উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য এই সময়টি একেবারে কম সময় নয়। তাই এই সাড়ে চার দশক পর আমরা যদি আশা করি বিশ্বের সর্বত্র মানবাধিকার পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে তাহলে সে চাওয়া কি অসংঙ্গত হবে? নিশ্চয়ই নয়। সকল জাতির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দীর্ঘ '৪৫ বছরে মানুষের ন্যূনতম স্বাধীনতা এবং অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই আশা অসংগত নয়। অথচ বাস্তব অবস্থা খুবই হতাশাজনক। আজো পৃথিবীর দেশে দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে মারাত্মকভাবে। তাছাড়া এই লঙ্ঘন কোন কোন ক্ষেত্রে এত মারাত্মক, ভয়াবহ ও নিষ্ঠুর যে তা কল্পনা করলেও গাঁ শিউরে উঠে। ইসরাইল, বসনিয়া এর জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। এবারে আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি মহাদেশভিত্তিক খতিয়ে দেখব।

এশিয়া

ক্ষুধা, দারিদ্র্য অপুষ্টি অশিক্ষা এশিয়ার অধিকাংশ মানুষের নিত্যসহচর। পরনির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনেক দেশের অর্থনৈতিক স্বাভাবিক বিকাশকে ব্যাহত করছে। অনেক দেশই স্বাবলম্বী ও স্বকীয় সত্তা নিয়ে দাঁড়াতে পারছে না। আইএলও-র এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, দু'হাজার সালের মধ্যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো বস্তিতে ছেয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই তৃতীয় বিশ্বের ৭০টি শহরের ১৬টিতে ২১ থেকে ৬০ শতাংশ মানুষ বস্তিতে বাস করে। জানা গেছে, উন্নয়নশীল দেশের প্রতি দুই সেকেণ্ডে ১ জন শিশু মৃত্যুবরণ করে এবং একজন স্থায়ীভাবে দৈহিক পঙ্গুত্ব লাভ করে। এসবই হয় এমন সব রোগে যা টিকাপ্রদান, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ এবং পুষ্টিকর খাদ্য পরিবেশনার মাধ্যমে অতিসহজেই প্রতিরোধ করা সম্ভব। আর এসব বেশির ভাগই এশিয়ার দুর্দশাগ্রস্ত বণি আদমের ভাগ্যে ঘটে থাকে।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক অস্থিরতা, পার্শ্ববর্তী দেশের প্রতি অবিশ্বাস, গণবিচ্ছিন্ন সরকার, আন্তর্জাতিক চক্রান্ত এবং সুবিধাবাদী শাসকদের কারণে এশিয়ার জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের প্রয়াস নিতান্তই স্বল্প। দারিদ্র্য নিরসনের যথার্থ প্রয়াসের পরিবর্তে এসব দেশে সমরাস্ত্র আমদানির প্রতিযোগিতা চলে তীব্র ভাবে। অধিকাংশ দেশেই ভূখা মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে অস্ত্রখাতে ব্যয়বরাদ্দ। এশিয়ার বৃহত্তম দেশ ভারতের মাথাপিছু আয় বিশ্বের তালিকা শততম স্থানে। অথচ সমরাস্ত্র আমদানিতে তার অবস্থান শীর্ষে। ১৯৭৪ সালে ভারত যখন প্রথম আণবিক বিস্ফোরণ ঘটায় তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, "পাকিস্তান ঘাস খেয়ে হলেও পরমাণু বোমা বানাবে।' এই মনোবৃত্তি এশিয়ার দেশে দেশে অস্ত্র চাষাবাদ বৃদ্ধি করছে যা সাধারণ মানুষের জীবনকে হুমকির সম্মুখীন করে তুলেছে। অথচ সাধারণ মানুষ যুদ্ধ চায় না, চায় শান্তি ; তারা বুলেট চায় না, চায় খাবার। কারণ জীবনের জন্য খাবারই জরুরি।

মায়ানমার

মানবাধিকার সংস্থা এমন্যাস্টি ইন্টারন্যাশনাল জানিয়েছে, মায়ানমারের সামরিক জান্তা গতবছর পাঁচশ'র বেশি রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তি দেয়া সত্ত্বেও তাদের হাতে আরো এক হাজার পাঁচশ বা তারও বেশি এ ধরনের বন্দি রয়েছে। এমনেস্টি তার ৩৮ পৃষ্ঠার এক রিপোর্টে জানায়, আটকদের মধ্যে ছাত্র, শিল্পী, ধর্মযাজক, এমনকি ১৪ বছরের এক ছাত্রকে ১৩ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়। রিপোর্টে বলা হয়, ১৯৮৯ সালের দ্বিতীয়ার্ধে রাজনৈতিক কারণে তিনহাজারের বেশি লোককে কারাদণ্ড দেয়া হয় বলে বেসরকারি সূত্রে দাবি করা হয়েছে। এ ছাড়া বিরোধী দলকে দমনের জন্য সরকারের প্রচেষ্টায় তখন থেকে আরো কয়েক হাজার লোককে আটক রাখা হয়েছে। মায়ানমারের (বার্মা) মানবাধিকার পরিস্থিতি এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে সবচেয়ে নাজুক আকার ধারণ করেছে। দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেত্রী অং সান সূকী দীর্ঘদিন থেকে গৃহবন্দি অবস্থায় আছেন। যিনি কিনা শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন এবং তার পিতা ছিলেন মায়ানমারের স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোধা। মায়নমারে রাজনৈতিক নিপীড়নের মাত্রা এত বেশি এবং জাতিগত শুদ্ধি অভিযানের প্রবণতা এত প্রবল যে, সেখানকার আরাকান অঞ্চলের লক্ষাধিক রোহিঙ্গা মুসলমান মৃত্যুর আতংক নিয়ে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছে। অনেক বর্মী নাগরিক পার্শ্ববর্তী দেশ থাইল্যাণ্ডেও আশ্রয় নিয়েছে। বর্মী সামরিক বাহিনী কর্তৃক ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়া, লুণ্ঠন, ধর্ষন এবং গণহত্যার অভিযোগও রয়েছে। বস্তুত এশিয়ার এই দেশটিতে মানবাধিকার পরিস্থিতিকে তেমন সুখকর বলা যায় না। মায়ানমার সরকারের মানবাধিকার রক্ষার কোন তাগিদও নেই।

www.pathagar.com

ভারত

ভারতীয় কাশ্মিরে স্বাধীনতাকামী মুসলমানদের ভীড়ে কারাগারগুলো উপচে পড়ছে। কর্মকর্তারা বন্দি কাশ্মিরিদের নিয়ে মহাবিপদে পড়েছেন বলে টাইমস অব ইণ্ডিয়া জানায়। রাজ্যে মোট ১২টি কারাগার আছে এবং এসবের প্রত্যেকটিতেই ধারণ ক্ষমতার অধিক বন্দি রাখা হয়েছে। প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক কাশ্মিরিদের ধরে নিয়ে কারাগারে প্রেরণ করার ফলে সেখানকার পরিস্থিতি দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছে। কারাগারে পানি সংকট এবং ওষুধ ঘাটতি নৈমিত্তিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কাশ্মিরে ভারতীয় সৈন্য ও আধা সামরিক বাহিনীর কার্যকলাপ মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। স্বাধীনতাকামী জঙ্গী মুসলমানদের সাথে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে অনেক লোককে ধরে নিয়ে জেলখানায় চরম নির্যাতন চালানো হয়। সেখানে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অগ্নিসংযোগ, ধর্ষন, গণহত্যা এবং নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণের অভিযোগ রয়েছে। ভারতের একমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই প্রদেশটিতে দীর্ঘদিন থেকে প্রেসিডেন্টের শাসন জারি রয়েছে। সরকার গঠন ও পরিচালনায় অধিবাসীদর অংশগ্রহণের সুযোগ ও অধিকার হরণ করা হয়েছে। নির্যাতন, নিষ্ঠুরতার নজিরবিহীন উল্লাস চলছে। ভারত সরকার কাশ্মিরের জনগণের মৌলিক মানবাধিকারকে স্থগিত করে রেখেছে অনেকদিন থেকে। কাশ্মিরে মানবাধিকার কর্মী এবং আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কর্মীদের অবাধ গতিবিধিকেও নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে কাশ্মিরে মানবাধিকার পরিস্থিতি খুবই খারাপ।

উত্তর কোরিয়া

চিন সীমান্তবর্তী কোরিয়ান প্রদেশ নর্থ হ্যামকিয়ং এর বন্দি শিবিরে প্রায় পঞ্চাশ হাজার উত্তর কোরিয় বন্দি মানবেতর জীবন যাপন করছে। ২৪ বছরের দুই তরুন আন হিয়োক ও কাংচোল হোয়ান সম্প্রতি স্বপক্ষ ত্যাগ করে দক্ষিণ কোরিয়ায় এসে সিউলে সাংবাদিকদের এ তথ্য প্রদান করেন। রাজনৈতিক বিরুদ্ধাচারণের জন্য বন্দি হয়ে আন একবছর ৪ মাস এবং ক্যাং দশ বছর আটক ছিলেন।

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম এবং মানবাধিকার সংস্থার রিপোর্টে ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে যে, উত্তর কোরিয়ার ১২টি বন্দি শিবিরে প্রায় ২ লাখ বন্দি রয়েছেন। তবে এই প্রথম কোন উত্তর কোরিয় ন্যাগরিক এ ধরনের তথ্য প্রকাশ করলেন। এই স্বপক্ষত্যাগী তরুণদ্বয় আরো জানান, শিবিরে আটক বন্দিদের প্রত্যহ ভোর সাড়ে পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠতে হয় এবং রাত আটটা পর্যন্ত এক নাগাড়ে কাজ করে যেতে হয়। মাঝে অবশ্য এক আধঘন্টার বিরতি পায় ওরা। কায়িক পরিশ্রমের পর রাত এগারটা পর্যন্ত চলে আদর্শ শিক্ষার তালিম। খাবারের মান ও পরিমাণ দুইই অত্যন্ত খারাপ। তাদের তথ্য অনুসারে শিবিরের বেশিরভাগ বন্দিই ভূমি মালিকদের পরিবারবর্গ, খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এদের অপরাধ হচ্ছে কোরিয় যুদ্ধের সময় এরা দক্ষিণ কোরিয়াকে সাহায্য করেছিল।

www.pathagar.com

এই বন্দি শিবিরগুলোতে ভিন্ন মতাবলম্বী কর্মী, কূটনীতিক এবং বিভিন্ন পেশা ও ধর্মের লোক রয়েছেন। বস্তুত উত্তর কোরিয়া সরকারের বিরুদ্ধেও রাজনৈতিক নিপীড়ন, বিনাবিচারে আটক, মতপ্রকাশের অধিকার হরণ, গণতান্ত্রিক চেতনা বিনষ্ট করার মত অভিযোগ রয়েছে, যা কিনা মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের বিরোধী।

আফগানিস্তান

১৯৯২ সালের নভেম্বরে জাতিসংঘের জনৈক মানবাধিকার কর্মকর্তা জানিয়েছেন যে, আফগানিস্তানের বিভিন্ন ধরনের প্রায় ১৬টি সরকার ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতায় নেমেছে এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিভিন্ন জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যা লঘুদের উপর হত্যা নির্যাতনের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের মানবাধিকার কমিশনের কাছে লিখিত এক রিপোর্টে অস্ট্রিয়ার কেলিস্র এমরাকোরা জানিয়েছেন, গত এপ্রিলে সোভিয়েত সমর্থিত নজিবুল্লাহ সরকারের পতনের পর কোন মোজাহিদিন সরকারই আফগানিস্তানে মানবাধিকার রক্ষা করতে পারে নি। বরং আরো অবনতি ঘটেছে। তিনি তার রিপোর্টে বলেছেন অপর্যাপ্ত তহবিল ও আন্তর্জাতিক সাহায্যের পরিমাণ কাটছাট হওয়ায় ৪০ লাখেরও বেশি শরণার্থীর জীবন বিপর্যস্ত হতে চলেছে। তিনি আরো বলেছেন, বর্তমান সরকার ব্যাপক মানবাধিকার বিরাজ করছে বলে দাবি করলেও নজিবুল্লাহ সরকারের সমর্থক বহু লোককে গ্রেফতার করে তাৎক্ষণিকভাবে বন্দি শিবিরে আটক রাখা হচ্ছে। এসব শিবিরে আন্তর্জাতিক রেডক্রস বা মানবাধিকার কমিশনের লোকজনকে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না। কাবুলস্থ জাতিসংঘের একটি ভবনে অন্তরীন সাবেক প্রেসিডেন্ট যে মানবেতর জীবন যাপন করছেন রিপোর্টে সে বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। সে দেশে জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে চরম উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। গত বছর (১৯৯২) তাজিকিস্তানের রাজনৈতিক গোলযোগ এড়ানোর জন্য সে দেশ থেকে পালিয়ে আফগানিস্তানে আসা ১ শ'র বেশি তাজিক উদ্বাস্তু শীত ও অনাহারে মারা গেছে বলে আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটি জানিয়েছে। বস্তুত সোভিয়েত আগ্রাসনের পর থেকে সে দেশে যুদ্ধে বহু লোকের প্রাণহানী ঘটেছে। উদ্বাস্তু জীবনের মত অসহনীয় অবস্থায় দিনাতিপাত করতে হচ্ছে অসংখ্য আফগানকে। এটাও মানবাধিকারের লঙ্ঘন।

চিন

চিনে অপরাধ বিরোধী উপর্যুপরি অভিযানের ফলে গত দশকে সে দেশের কয়েদিদের উপর নির্যাতন আরো ব্যাপক ও নির্মম আকার ধারণ করেছে। মানবাধিকার গ্রুপ এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল তার এক প্রতিবেদনে জানায়, কয়েদিদের উপর নির্যাতন চালানোর জন্যে যে সব পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তার মধ্যে কয়েকটি ছিল বন্দুকের বাট দিয়ে আঘাত, অস্বস্তিকর অবস্থায় শৃঙ্খলিত রাখা, ক্ষুদ্র অন্ধকার সেলে আটক রাখা, ঘুমোতে না দেয়া, এবং প্রচণ্ড শীত বা গরমের মধ্যে রাখা। গ্রুপের মতে, চিনে আইন প্রয়োগ ও বিচার ব্যবস্থা আসলে নির্যাতন ছাড়া কিছু নয়। অনেক সময়

www.pathagar.com

অপরাধীদের খুঁজে বের করার জন্য নির্বিচারে গ্রেফতার করা হয় এবং পুলিশ স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য নির্যাতনের পথ বেছে নেয়। যাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হয় তাদের বেশির ভাগই অশিক্ষিত এবং গরীব কয়েদি। ১৯৮৯ সালে তিয়েনমেন স্কোয়ারে গণতন্ত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের উপরও ব্যাপক নির্যতন চালানো হয়েছে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয় চিনে কয়েদিদের পায়ে বেশিরভাগ সময় শিকল পড়িয়ে রাখা হয়, বেঞ্চের উপর স্থিরভাবে বার ঘণ্টা বসিয়ে রাখা হয়, এবং অন্য কয়েদিদের দ্বারা বেদম প্রহার করানো হয়। রাজনৈতিক ভিন্ন মতাবলম্বীদের দমনের প্রবণতা চিনে অত্যন্ত প্রবল। সেখানে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক অধিকারসহ বিভিন্ন রকমের মৌলিক অধিকার সঙ্কুচিত রয়েছে, যা মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি চিনে যথেষ্ট আশঙ্কাজনক বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখা গেছে।

সিরিয়া

প্রেসিডেন্ট আসাদ নিরাপত্তাজনিত কারণে আটক প্রায় তিন হাজার ৫শ সিরিয়াকে ১৯৯১ সালে ক্ষমা ঘোষণা করা সত্ত্বেও হাজার হাজার সিরীয় নাগরিক এখনো রাজনৈতিক বন্দি হিসেবে সে দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক রয়েছেন। মানবাধিকার সংস্থা, মিডল ইস্ট এই তথ্য দিয়েছে। “সিরিয়ায় অনির্দিষ্টকাল রাজনৈতিক বন্দিদশা” শীর্ষক এক প্রতিবেদনে সংস্থা উল্লেখ করেছে যে, সিরিয়ায় বিনাবিচারে প্রায় তিনহাজার ৮শ' রাজনৈতিক বন্দিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য আটক রাখা হয়েছে। তাদের মধ্যে প্রায় ২ হাজার বন্দি এমন অবস্থায় আছেন যে এদের সাথে বহির্বিশ্বের কোন সম্পর্ক নেই।

সিরিয়ার সামরিক আইনের ত্রিশতম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে এই রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। ১৯৯২ সালের জুলাই ও আগস্টে জর্ডান ও সিরিয়ার মানবাধিকার সংস্থার পরিচালিত গবেষণায় সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দি, বন্দিদের আত্মীয় স্বজন, সিরিয়া ও ফিলিস্তিনি মানবাধিকার পর্যবেক্ষক, এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা আদালতের বিবাদি পক্ষের আইনজীবিদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়।

সিরীয় কারাগারে বন্দিদের মধ্যে বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর লোক রয়েছেন। বর্তমানে আটক লোকদের মধ্যে অনেককে কোন অভিযোগ ছাড়াই দীর্ঘদিন ধরে কারাগারে আটক রাখা হয়েছে। প্রতিবেদনে বিনা প্ররোচনায় গ্রেফতার, নির্যাতন ও হয়রানীর বেশ কিছু ঘটনার উল্লেখ করা হয়। সিরীয় সরকার ভিন্ন মতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জরুরি অবস্থা অধ্যাদেশ ব্যবহার করে চলেছেন। ত্রিশ বছর আগে এই অধ্যাদেশটি আইনে পরিণত করা হয়। বস্তুত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অনুপস্থিতি, সামরিক একনায়কতন্ত্রের দীর্ঘস্থায়িত্ব ইত্যাদি কারণে জনগণের মৌলিক অধিকার ও মানবিক স্বাধীনতা লঙ্ঘিত হচ্ছে। এর উপর রয়েছে বিভিন্ন রকম শারীরিক নির্যাতন, যাতে ধুকে ধুকে মরছে অসংখ্য নিরীহ মানুষ।

www.pathagar.com

ইসরাইল

এশিয়ায় অমানবিকতার কলঙ্কিত অধ্যায়ের সূচনা করেছে ইসরাইল। ইসরাইলের হাতে সৃষ্ট ইতিহাসের নির্মম ট্র্যাজেডি ফিলিস্তিন। অর্ধ শতাব্দীকাল ধরে সেখানে গৃহহীন উদ্বাস্তু প্যালেস্টাইনিদের বুকে অমানবিকতা ও হিংস্রতার নিষ্ঠুরতম ছুরি চালাচ্ছে ইসরাইল। ইসরাইল অধিকৃত গাজা ও পশ্চিম তীরে বসবাসরত হাজার হাজার প্যালেস্টাইনিদের উপর নৃশংসভাবে নির্যাতনের ও নিষ্পেষণের স্টিমরোলার চালাচ্ছে ইহুদিরা। সাত বছরের নিষ্পাপ শিশুর বুলেটবিদ্ধ লাশ আঁকড়ে ধরে ক্রন্দনরতা প্যালেস্টাইনি জননীর আর্ত চিৎকারে যখন আকাশ বাতাস আর্দ্র হয়ে ওঠে, বেদনায় স্তব্ধ হয়ে যায় প্রকৃতি, তখন মানবাধিকার সম্পর্কে ভাবলে সত্যিই অবাক লাগে। বিশ্বের সর্ব কুখ্যাত মানবতাবিরোধী সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ইসরাইল। আর এই রাষ্ট্রটিকে প্রতিষ্ঠা থেকে আজ পর্যন্ত সর্বোতভাবে সাহায্য করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স। যারা কিনা সারা বিশ্বে মানুষের মানবাধিকার রক্ষার জন্য গলদঘর্ম।

কিন্তু ইসরাইলের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে এরা তেমন সোচ্চার নয়। অথচ ইসরাইলিদের হত্যা লুণ্ঠন আর অগ্নিসংযোগের শিকার হয়ে ৩০ লাখ ফিলিস্তিন গৃহহীন হয়েছিল, তাদের উদ্বাস্তু জীবনের আজো অবসান হয় নি। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া, নির্বিচারে অসামরিক এলাকায় বোমাবর্ষণ, শিশুদের বুলেটবিদ্ধ করা, নারী নির্যাতন আর উদ্বাস্তু শিবিরে গণহত্যা চালানোর মত নির্মম অমানবিক কাজ করে যাচ্ছে বিবেকবর্জিত জাতি ইসরাইল। সবচেয়ে অবাক কাণ্ড হচ্ছে, এই ইসরাইলিরা এই শতাব্দীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে সবচেয়ে বেশি এবং জঘন্যরকমভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে অথচ তাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তেমন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। অথচ এর চেয়ে অনেক কম মাত্রার করেও প্রচণ্ড শাস্তি পেতে হয়েছে অনেক দেশকে। বস্তুত ইসরাইলের এইসব অপকর্ম, যা মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন, তার পেছনে প্রচ্ছন্ন মদদ রয়েছে আমেরিকা, রাশিয়া, বৃটেন এবং ফ্রান্সের । আর এটাই ফিলিস্তিনিদের বড় দুর্ভাগ্য।

এশিয়ায় এমন কোন দেশ কি আছে, যাতে কোন না কোনভাবে মানবাধিকার কমবেশি লঙ্ঘিত হয় নি? সত্যিই তো খুঁজে পাওয়া যাবে না। মার্কিন আগ্রাসনের শিকার ভিয়েতনামে আজো অস্বাভাবিক বিকলাঙ্গ মানব শিশুর জন্ম হয়। ভিয়েতনামের বাতাসে আজো আগ্রাসীদের মৃত্যুবিভীষিকা সৃষ্টিকারী বারুদের গন্ধ বিদ্যমান। দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের সময় সেখানে মানবাধিকারের লঙ্ঘন কতখানি হয়েছে তা নিরূপণ করা সত্যিই কঠিন।

উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদভুক্ত দেশগুলোর অধিবাসীরা রাজনৈতিক অধিকার বঞ্চিত। রাজা, শেখ, আমীর বা দলীয় একনায়কত্বের নাগপাশে বন্দি সৌদি আরব, কুয়েত, আমিরাত, ইরাক, ইয়েমেনের মানুষ। মধ্যপ্রাচ্যের নারীরা এই আধুনিক যুগেও ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত। রাজনৈতিক নিপীড়নের মাত্রা এসব দেশে কম নয়। সৌদি আরব সম্প্রতি তার দেশে মানবাধিকার আন্দোলনের সাথে জড়িত থাকার কারণে অনেক নাগরিককে জেলে পুরেছে।

www.pathagar.com

এশিয়ার চিন অধিকৃত তিব্বতে, ইন্দোনেশিয়া, মঙ্গোলিয়া, সাবেক সোভিয়েত মধ্য এশিয়ায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগ রয়েছে শ্রীলঙ্কা এবং নেপালের বিরুদ্ধেও। ভুটানে মানুষের কোন অধিকারই নেই। সাবেক সোভিয়েত মধ্য এশিয়ায় দলীয় একানায়কতন্ত্র, ক্ষেত্র বিশেষে গোষ্ঠী আমলাতন্ত্রের থাবা এবং পরিবেশে অপশাসনে জর্জরিত অবরুদ্ধ মুক্তিকামী মানুষ যখন বেরিয়ে এলো একদলীয় শাসনের নাগপাশ থেকে তখন পরিস্থিতি আরো খারাপ। আজ সেখানে দেখা যায় অভুক্ত ভিক্ষুকের শীর্ণ মলিন হাত, এইডস বিস্তারী বারবণিতার প্রসাধনচর্চিত বিকৃত মুখ, জোচ্চুরি, ঠকবাজির লাগামহীন বিস্তার, গুণ্ডা বদমাশের উল্লেসিত নৃত্য। এসবই মধ্য এশিয়ার মানবাধিকারের অবস্থাকে আরো অবনতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। দুঃসময়ের নিকষ কালো আধার পেরিয়ে মানুষ যখন মুক্তির দ্বার প্রান্তে এসে পৌঁছল তখন দেখে সেখানেও নতুন আধার। অনিশ্চয়তা আর অন্ধকার থেকে পালানোর কোন পথ নেই।

ইউরোপ ঃ বসনিয়া

আমেরিকার নিউজ ডে পত্রিকা জানিয়েছে, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার দু'টি নির্যাতন শিবিরে শত শত বেসামরিক লোক হয় ক্ষুধা নয় তো নির্যাতনের শিকার হয়ে মারা গেছে। পত্রিকাটি নির্যাতন শিবির থেকে ছাড়া পাওয়া দুজন প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য উদ্ধৃত করে এ সংবাদ দিয়েছে। সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ৬৩ বছর বয়স্ক মেহো জানিয়েছেন তিনি সার্বিয়ার উত্তরাঞ্চলের ওমারস্কা নির্যাতন শিবিরে বন্দি ছিলেন। সেখানে সৈন্যরা প্রতিদিন দশ থেকে পনর জন বন্দি নিকটবর্তী একটি হ্রদের কাছে নিয়ে গুলি করে হত্যা করতো।

তিনি জানিয়েছেন, এক একদিন পর তাকে লাঠিপেটা করা হতো। পরে বয়সের কথা বিবেচনা করে অপর ৪৫জন বন্দির সাথে তাকেও মুক্তি দেয়া হয়। দ্বিতীয় প্রত্যক্ষদর্শী ৫৩২ বছর বয়স্ক অ্যালিনা লোজিনোভিক, ঐ নির্যাতন শিবিরে মে ও জুন মাসের মধ্যবর্তী সময়ে ১৩৫০ জন বন্দিকে হত্যা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন। ওমারশ বন্দি শিবিরে রেডক্রস কর্মীদের প্রবেশ করতে দেয়া হয় নি। জাতিসংঘের তথ্যবিরণীতে ঐ বন্দি শিবিরে ১১ হাজার বন্দি রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩রা জুন ১৯৯২ ক্রোয়েশিয়ায় নিয়োজিত জাতিসংঘ বাহিনীর কর্মকর্তা বসাসস্কিনভিতে দেখা একটি শিবিরের রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন যে, মুসলমানদের বাড়িতে তল্লাশী চালিয়ে তাদেরকে ঘর থেকে ধরে আনা হচ্ছে এবং একটি খোলামাঠে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তিনি বলেছেন জাতিসংঘ শান্তি রক্ষী বাহিনীর সদস্যরা অসহায়ের মত এসব ঘটনা প্রত্যক্ষ করছেন মাত্র।

এএফপি-র খবরে বলা হয় ৭ আগস্ট ১৯৯২ রাতে আড়াই হাজারেরও বেশি শরণার্থীসহ ৩টি বিশেষ ট্রেন জার্মানিতে পৌঁছেছে। এর আগের মাসে ৬টি ট্রেনে করে আরো ৪৫ হাজার শরণার্থী জার্মানি পৌঁছেছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে সার্বিয় বাহিনী মুসলমানদের হত্যা নির্যাতন এবং জোর করে দেশ থেকে বিতাড়িত করছে। তারা স্বেচ্ছায় যাবতীয়

www.pathagar.com

সম্পত্তি রেখে চিরদিনের মতো দেশ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে, এই মর্মে জোর করে স্বাক্ষর আদায় করে সার্বিয়রা দেশ থেকে মুসলমানদের দেশ থেকে বিতাড়িত করছে।

বসনিয়া বিধ্বস্ত, মুসলমানরা অরক্ষিত। তাদের বাঁচানোর জন্য কেউ নেই যেন মৃত্যু তাদের ললাটলিখন। বিড়ম্বিত ভাগ্য আর অনিশ্চিত গন্তব্য তাদের। বসনিয়ার মুসলমানদের উপর সার্বিয়দের নির্যাতনের খবর দেখে মনে হয় যেন সভ্যতার কসাইখানায় জবাই হচ্ছে মানবিকতার। আর উল্লাস চলছে পাশবিকতার। অবস্থা এতটা ভয়াবহ আর বিপদজনক যে খোদ জাতিসংঘের উদ্বাস্তু বিষয়ক হাইকমিশনার জোস মারিয়া মেণ্ডিলোস বলেছেন, "আমার মনে হয় আমরা অবস্থা সামাল দিতে পারবো না, আমার তো মনে হয় আমরা হেরে যাবো।"

সারাজেভোর দক্ষিণ পশ্চিমের মুসলিম শহর গোরাজদে থেকে একটি মেডিকেল টিম ফিরে এসে বলেছেন, তারা সেখানে দেখে এসেছেন ডাক্তাররা শিশুদের অস্ত্রোপচার করেছেন জ্ঞানশূন্য করার ওষুধ প্রয়োগ না করেই। চিকিৎসার ন্যূনতম ব্যবস্থা নেই। হাসপাতালে পানি নেই, বিদ্যুত নেই। সারা হাসপাতাল জুড়ে আহতদের আর্তনাদ ও গোঙানি। অস্ত্রের আঘাত ক্ষত বিক্ষত হয়ে শিশুরা হাসপাতালে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। একজন ফরাসি চিকিৎসক বলেছেন, "পরিস্থিতি ভয়াবহ, আমি এরকম পরিস্থিতি আফ্রিকায় দেখেছি, কিন্তু ইউরোপে নয়।" বসনিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হারিস সিলাজিক বলেছেন, 'শুধুমাত্র গত বছরের অর্থাৎ ১৯৯২-এর এপ্রিল মাসে ৫০ হাজার বসনিয় মুসলমান প্রাণ হারিয়েছে।'

জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের একজন বিশেষ কর্মকর্তা বলেছেন, বসনিয়ায় জাতিগোষ্ঠী নির্মূলকরণ, জবরদস্তিমূলক আটক, বন্দিদের প্রতি আচরণ ও অন্যান্য যুদ্ধাপরাধ, এবং ক্রোয়েশিয়া, কসোভা ও অন্যান্য জাতিসংঘ এলাকাগুলোতেও মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে কুখ্যাত অপরাধী ও পেশাদার ভাড়াটে সৈন্যদের কাজে লাগানো হয়।

কসোভা

সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার অধীনে অনেক বছর ধরে আলবেনীয় অধ্যুষিত কসোভা ছিল স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ। ১৯৯০ সালে সার্বিয়ার জাতীয়তাবাদী প্রেসিডেন্ট শ্লোবোদান মিলোসেভিক কসোভার স্বায়ত্তশাসন বাতিল করে দেন। তিনি দাবি করেন যে, এই প্রদেশের লোকেরা পার্শ্ববর্তী আলবেনিয়ার সাথে যুক্ত হতে চায়। আলবেনীয় ভাষা মাধ্যম এবং স্কুলের ক্লাস নিষিদ্ধ করা হয়। হাজার হাজার আলবেনীয় শ্রমিককে চাকুরিচ্যুত করা হয়। এই প্রদেশে সার্বিয় শক্তিবৃদ্ধির জন্য শত শত পুলিশ পাঠানো হয়।

বেলগ্রেডের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পর সার্ব জাতীয়তাবাদীরা এখন কসোভায় জাতিগত কাঠামোতে ভারসাম্য বিধানের উদ্যোগ নিয়েছেন। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে হাজার হাজার সার্বিয় কার্সোভোতে এসে পৌছেছে। সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধের কারণে অনেকে এসেছে উদ্বাস্তু হয়ে।

www.pathagar.com

সাবেক যুগোশ্লাভিয়ায় আলেবেনীয়, ক্রোটস, হাংগেরীয়ান ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে এবং বিশেষত মুসলমানদের নির্মূল করার প্রক্রিয়া সেখানে অব্যাহত রয়েছে, যাকে সুস্পষ্টরূপে গণহত্যা বলা যেতে পারে। সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার হত্যা, বন্দি নির্যাতন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের উপর যুক্তরাষ্ট্রের চুতুর্থ রিপোর্টেও বলা হয়েছে, সেখানে সার্বিয় বন্দি শিবিরে মুসলমানদের উপর পাইকারী হারে গণহত্যা চালানো হচ্ছে। তাদের হত্যাযজ্ঞ থেকে বৃদ্ধ বৃদ্ধা এবং নারী শিশু কেউই রেহাই পাচ্ছে না। সামগ্রিকভাবে সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার মানবাধিকার লঙ্ঘন ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি মারাত্মক হুমকী হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নৃশংসতা এবং অমানবিকতাও যুগোশ্লাভিয়ার বর্তমান ধ্বংসযজ্ঞের কাছে ম্লান হচ্ছে।

জার্মান

জার্মান পুরুষেরা নিজেদের দেশের অত্যাধুনিক মেয়েদের ছেড়ে ক্রমশ বিদেশী মেয়ে বিয়ে করার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠছে। এক্ষেত্রে তাদের বেশি পছন্দ দক্ষিণ পূর্ব এশিয় ও ল্যাটিন মেয়েদের। তবে কর্মসংস্থান বা বিয়ের মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে প্রলুব্ধ হয়েও ফিলিপাইন, থাইল্যাণ্ড, কম্বোডিয়া ও পূর্ব ইউরোপের হাজার হাজার মেয়ে প্রতিবছর অবৈধভাবে জার্মানিতে আসছে। এদের বেশিরভাগই যাচ্ছে দেশে দারিদ্র্যের কারণে। দালালদের মাধ্যমে জার্মানি যাওয়ার পরে অনেকের ভাগ্যেই প্রতিশ্রুত কাজ বা বিয়ে কোনটাই জোটে না। শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নিতে হয় বিভিন্ন পতিতালয়ে। বিশেষজ্ঞদের সমীক্ষা অনুসারে জার্মানির প্রায় ৭০ শতাংশ পতিতা বিদেশী। সংবাদসংস্থা রয়টার এ খবর দিয়েছে। এই একটি খবর থেকেই শিল্পোন্নত জার্মানির মানবাধিকার পরিস্থিতি আঁচ করা যায়। দুই জার্মানির বিভক্তিরেখা 'বার্লিন প্রাচির' ভেঙ্গে ঐক্যবদ্ধ জার্মানি গড়ে তোলার পর সাবেক পূর্বজার্মানিতে যে রাজনৈতিক দলন প্রতিক্রয়া অব্যাহত ছিল তা বন্ধ হয়। সেক্ষেত্রে মানবাধিকার পরিস্থিতির সামান্য অগ্রগতি হলেও একথা বলার সুযোগ নেই যে জার্মানিতে মানবাধিকার পরিস্থিতি খুব সন্তোষজনক। সম্প্রতি জার্মান সরকার সেদেশে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রাপ্তির বিষয়টি কড়াকড়ি আরোপ করবেন বলে আলোচনা হচ্ছে। যদি তা করা হয় তাহলে সেটা হবে মানবাধিকারের লঙ্ঘন। তাছাড়া জার্মানিতে তুর্কি বংশোদ্ভূত ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর নাগরিকদের উপর দলননীতির অভিযোগ রয়েছে, অভিযোগ রয়েছে তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের। আর এসবই মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন।

ইউরোপের রুমানিয়া হাঙ্গেরি, চেকোশ্লাভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, তুরস্ক, গ্রিস, জার্মানি এবং সাবেক সোভিয়েতভুক্ত দেশসমূহ এমনকি বৃটেনের বিরুদ্ধেও মানবাধিকার লঙ্গনের অভিযোগ আছে। ইউরোপের বুকে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র সহ্য করা হবে না। বসনিয়া প্রসঙ্গে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী জন মেজরের একটি মাত্র কথা থেকেই মানবাধিকারের প্রতি তাদের মনোভাব বুঝা যায়। শুধু বসনিয়ায় আমরা ইউরোপীয় সভ্যতার যে নগ্ন চেহারা দেখেছি, তারপর ইউরোপে মানবাধিকার লঙ্ঘনের খবর আর খোঁজার দরকার নেই। হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষন, অগ্নিসংযোগ, নির্যাতন কোন ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

ইউরোপীয়রা অদক্ষ। হেন অপকর্ম নেই যা তারা পারে না, পারে নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর আর কোথাও এতটা পাশবিক আচরণের নজির স্থাপন করে নি। তাছাড়া পশুও এতটা হিংস্র হতে পারে না যতটা পেরেছে ইউরোপের সার্বরা? যাদেরকে আমরা সভ্য বলি, যেখান থেকে আমরা সভ্যতা আমদানি করি, সভ্যতা শেখার ক্ষেত্রে যারা আমাদের আদর্শ তারাই এবার বসনিয়ায় এমন অসভ্যতা দেখাল যা আমরা কোন দিন কল্পনাও করতে পারি নি। মানবাধিকার সংক্রান্ত একটি বিশ্ব সম্মেলন ইউরোপেই অনুষ্ঠিত হলো। কত বিশাল আয়োজন, কত লম্বা লম্বা কথা। কিন্তু বসনিয়ায় মানুষের অস্তিত্ব যেখানে সংকটের সম্মুখীন তার কোন উন্নতি করা গেল না। একদিকে ভারী অস্ত্রে সজ্জিত সার্বিয়দের হিংস্র থাবার নিচে প্রায় নিরস্ত্র বসনীয় জনগণকে সঁপে দিয়ে যুদ্ধরত অঞ্চলের উপর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা দিয়ে বসে আছে জাতিসংঘ। যেন মৃত্যুর জন্য তৈরি হয়েই বসে থাকতে হবে বসনিয়দের। এসব দেশে বিশ্বের বিবেকবান মানুষের অনুভূতি অসাড় হয়ে আসে। সামগ্রিক অবস্থাদৃষ্টে বিশ্বের মানবাধিকারের ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বিগ্ন না হয়ে উপায় থাকে না। আগামী দিনটি আরো ভাল হবে, আরো উজ্জ্বল হবে এই আশা নেই।

আফ্রিকা

আফ্রিকায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটেছে দক্ষিণ আফ্রিকায়। বর্ণ বৈষম্যই সেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের মূল কারণ। মুষ্টিমেয় অর্থাৎ প্রায় বিশ শতাংশ সাদা মানুষের হাতে শাসিত, নির্যাতিত নিগৃহীত হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ কালো মানুষ। পুলিশী নির্যাতন, হত্যা, লুণ্ঠন ব্যাপক ধরপাকড় শিকার হওয়ার, সেখানকার কালো আদমীদের ললাট লিখন। সরকারি বাহিনী কর্তৃক দেশের নাগরিকদের উপর এত নির্যাতন পৃথিবীর আর কোথাও হয় নি। উত্তর আফ্রিকার মিশর, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, মৌরিতানিয়ায় ইসলামি মৌলবাদী আন্দোলনের নেতা কর্মীদের চরম জেল জুলুম ও নির্যাতন করা হয়। সাম্প্রতিকালেই সামরিক বাহিনীর আশীর্বাদপুষ্ট সরকারের জেলে জুলুম ও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ইসলামি সালভেন ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ, যারা সাম্প্রতিক নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছিল। লিবিয়ায় লৌহ মানব গাদ্দাফীর নেতৃত্বে একনায়কের শাসন চলছে দীর্ঘ দিন থেকে।

ক্ষুধা, দারিদ্র্য, রোগ, মহামারি, অশিক্ষা ইত্যাদির কারণে আফ্রিকার অনেক দেশে মানবাধিকার কার্যকর করা কঠিন হয়ে পড়ে পড়েছে। খরা, দুর্ভিক্ষ আর রাজনৈতিক সন্ত্রাস, অরাজকতা আফ্রিকার মানচিত্রকে ক্ষতবিক্ষত করে রেখেছে। সে সব দেশে মানবাধিকার রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক নিশ্চিত, রাজনৈতিক স্থিতি, শিক্ষা ইত্যাদি না থাকায় আফ্রিকার মানবাধিকার পরিস্থিতিকে সন্তোষজনক বলার উপায় নেই। তদুপরি আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে স্বৈরাচার, সামরিক একনয়ক, সে সব দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতিকে আরো পতনোন্মুখ করে তুলেছে।

www.pathagar.com

জিম্বাবুয়ে

কারাগারে কয়েদিদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় জিম্বাবুয়ের শত শত বন্দিকে মুক্তি দেয়া হবে। জিম্বাবুয়ের কারাগারগুলোতে মোট ১৬ হাজার কয়েদিকে রাখার ব্যবস্থা রয়েছে অথচ সেখানে ২১ হাজার কয়েদিকে রাখা হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই ছিচকে চোর, যাদের জরিমানা বা জামিন মঞ্জুরের অর্থ দেয়ার ক্ষমতা নেই।

১৯৯২ সালে জিম্বাবুয়ের খরা কবলিত এলাকায় ত্রাণ সামগ্রি না পৌঁছানোর কারণে গ্রামবাসীদের বাধ্য হয়ে গবাদী পশুর চামড়া খেতে হচ্ছে।

মিশর

রাজনৈতিক বন্দিসহ অন্যান্য অপরাধী মিলিয়ে ১ হাজারেরও বেশি লোককে মিশরের জরুরি আইনে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়েছে। ১৯৮১ সালে প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত নিহত হওয়ার পর দেশটিতে জরুরি আইন জারি করা হয় এবং এই আইনে নিপীড়নমূলকভাবে হাজার হাজার মানুষকে কারারুদ্ধ করা হয়েছে। মিশরের মৌলবাদী মুসলিম ব্রাদারহুড–এর সদস্যদের উপর জেলখানার অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। বস্তুত বিনাবিচারে আটক, আটক ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালতে বিচার, বিচারে আত্মপক্ষ সমর্থনের পর্যাপ্ত সুযোগ না দেয়া, জেলখানায় নিপীড়ন ফাঁসিতে মৃত্যুদণ্ড ইত্যাদি মিশরীয় রাজনীতির অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। রাজনৈতিক ভিন্ন মতাবলম্বীদের দমন করার জন্য চরম নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা নেয়ার ঘটনা সেখানে নৈমিত্তিক। মিশরীয় রাজনীতিতে এই বিষয়টি নতুন নয়। রাজার শাসন থেকে সামরিক শাসন, একনায়কতন্ত্র ইত্যাদি মিশরীয়দের রাজনৈতিক জীবনের অঙ্গ। তাই মিশরের মানবাধিকারের বাস্তবায়ন খুব আশাপ্রদ নয়।

সোমালিয়া

সোমালিয়াতে দুর্ভিক্ষ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। সেখানে লাখ লাখ মানুষ মৃত্যুর প্রহর গুনছে। ক্ষুধা, অপুষ্টি, বিভিন্ন রোগ ও দাঙ্গার কারণে প্রতিদিন অসংখ্য শিশুদের এক চতুর্থাংশই দুর্ভিক্ষ ও দাঙ্গার কারণে প্রাণ হারিয়েছে। এদিকে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পাশাপাশি সারাদেশ জুড়ে চলছে অব্যাহত নৈরাজ্য ও সন্ত্রাস। কিশোর তরুণেরা হাতে অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সাহায্য সামগ্রির অধিকাংশই লুট হয়ে যাচ্ছে। ১৯৯১ সালের জানুয়ারি মাসে প্রেসিডেন্ট সাঈদ বারীর পতনের পর ১৯৯২ সালের মধ্যভাগ পর্যন্ত ৭ মিলিয়ন অধিবাসী অধ্যুষিত দেশটির ছয় ভাগের একভাগ লোক উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছে। এর মধ্যে শুধুমাত্র কেনিয়াতেই ৩ লাখ ৪০ হাজার উদ্বাস্তু আশ্রয় নিয়েছে। বাদবাকীরা ইয়েমেন, সুদান ও ইথিওপিয়ায় প্রবেশ করেছে। উল্লেখ্য শেষোক্ত দুটি দেশের আর্থিক অবস্থাও অত্যন্ত খারাপ। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মতে, সোমালিয়াতে প্রতিদিন অন্তত ১০০০ লোক মারা যাচ্ছে। এবং দুর্ভিক্ষ ও রোগব্যাধী সমগ্র দেশের

www.pathagar.com

জনগোষ্ঠীকে কুরে কুরে খাচ্ছে। সোমালিয়ার অধিবাসীদের জীবনের নিরাপত্তা হুমকীর সম্মুখীন। সম্প্রতি জেনারেল ফারাহ আইদিদ আর জাতিসংঘ বাহিনীর মধ্যে তুমুল সংঘর্ষে অনেক অসামরিক নিরীহ মানুষের জীবন বিপন্ন হয়। জীবনের নিরাপত্তাহীনতা, অন্নবস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ইত্যাদির সংকট, রাজনৈতিক অস্থিরতা বেকারত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে সোমালিদের জীবন সংকটের মুখে। আর এ কারণেই সেখানে চলছে মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। আফ্রিকার যে সব দেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ তার মধ্যে সোমালিয়া অন্যতম।

আমেরিকা

এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল মানবাধিকারের অনেকগুলো গুরুতর লঙ্ঘনের দায়ে যুক্তরাষ্ট্রকে অভিযুক্ত করেছে। এসব ঘটনার মধ্যে মানসিক রোগীদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ঘটনাও ছিল। ১৯৯২ সালের রিপোর্টে এ সংস্থা বলেছে, গত বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৩১ জন বন্দির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। যাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়, তাদের অনেককেই তাদের বিচারের সময় আত্মপক্ষ সমর্থনের পর্যাপ্ত সুযোগ ছিল না। যেমন আদালত নিযুক্ত আইনজীবিরা মানসিক অসুস্থতার ইতিহাসসহ মৃত্যুদণ্ড লাঘবের জন্য প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য উপস্থাপনে ব্যর্থ হন। প্রাণঘাতি ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার একটি ঘটনায় চেম্বার থেকে গোঙানির শব্দ শোনা যায় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়। টেকনিসিয়ানরা তখন সূচ ঢোকানোর উপযুক্ত শিরার খোঁজে প্রায় একঘণ্টা ধরে চেষ্টা চালায়। বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের কারাগারে নির্যাতনের অনেক খবর পাওয়া যায় বলে ঐ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গরা বর্ণবৈষম্যের শিকার। সাম্প্রতিককালে লস এঞ্জেলেস-এ যে বর্ণদাঙ্গা সংঘটিত হলো, তা কালো আদমীদের নিরাপত্তাহীনতারই সাক্ষ্য বহন করে। যুক্তরাষ্ট্রের বেকারত্বের হারও কম নয়। অবশ্য পানামা, হণ্ডুরাস, কোস্টারিকা প্রভৃতি দেশে মার্কিন সরকারের মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ করেন অনেকেই। তদুপরি ইসরাইলের অমানবিক কার্যক্রমে মার্কিন মদদ ও সাহায্য ও সমর্থনের অভিযোগ সর্বজনবিদিত। বহির্বিশ্বে আমেরিকার তৎপরতা কোন কোন ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সামিল। যাত্রীবাহী ইরানি বিমান ধ্বংস এর অন্যতম উদাহরণ।

উত্তর দক্ষিন এবং মধ্য আমেরিকার সর্বত্রই কমবেশি লঙ্ঘিত হচ্ছে মানবাধিকার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগর উপকূলবর্তী শহর লসএঞ্জেলেসে সংগঠিত সাম্প্রতি ভয়াবহ বর্ণদাঙ্গা সে দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। লাতিন আমেরিকার এল সালভেদর, মণ্ডুরাস, মেক্সিকো, নিকারাগুয়া, কোস্টারিকা, গুয়েতেমালা, এবং ক্যারাবিয়ান রাষ্ট্র কিউবা, জ্যামাইকা এবং হাইতিতেও মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলা, কলম্বিয়া, উরুগুয়ে প্রভৃতি দেশসমূহও মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। অনেক দেশেই চলছে আদিবাসীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস। গুয়াতেমালার নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী রিগোবার্তা মেঞ্চুর পরিবারের করুন কাহিনী থেকেই আঁচ করা যায় ল্যাতিন আমেরিকার মানবাধিকার পরিস্থিতির ভয়াবহতা। রাজনৈতিক নিপীড়নের মাত্রা এসব দেশে অত্যন্ত মারাত্মক। গুপ্ত হত্যার পরিমাণও বেশি। একসময় স্পেন পর্তুগাল ও ফ্রান্সের উপনিবেশ বর্তমান লাতিন আমেরিকার

www.pathagar.com

দেশসমূহে স্বৈরাচার, সামরিক শাসন সামাজিক ও সাম্রাজ্যবাদের তাবেদারী যেন তাদের ললাট লিখন। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ও ন্যায়বিচার এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা থেকে তারা মারাত্মকভাবে বঞ্চিত। একনায়কতান্ত্রিক শাসন মানবাধিকারের পরিপন্থী।

নারী-নিপীড়ন

১৯৯২ সালের নভেম্বর মাসে জেনেভা থেকে রয়টার পরিবেশিত এক খবরে প্রকাশ আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা জানিয়েছে সমগ্র শিল্পায়িত বিশ্বের কর্মজীবী মহিলারা যৌন নিপীড়নের শিকার হচ্ছে আর এর ফলে অনেকে চাকুরিচ্যুত হচ্ছে, হতে বাধ্য হচ্ছে।

আইএলও'র এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জাতিগত ও বর্ণগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে আসা এবং সমকামী ও যে সকল তরুণ তরুণী মাত্র কাজ শুরু করেছে তারাও যৌন নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। সংস্থার মহাপরিচালক মাইকেল হেনসেন বলেন, গবেষনায় দেখা গেছে পৃথিবীর ২৩টি শিল্পায়িত দেশে যৌন নিপীড়ন এমন একটি মারাত্মক সমস্যা যা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মজীবী মহিলাকে প্রবলভাবে সমস্যায় ফেলেছে। ৩০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে, স্পেনের ৪৮ শতাংশ এবং বৃটেনের ৭৪ শতাংশ কর্মজীবী মহিলা যৌণ নিপীড়নের শিকার।

এশিয়া ও আফ্রিকায় নারী নির্যাতন কোন অংশেই কম নয়। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে স্বামী কর্তৃক স্ত্রী নির্যাতন, গৃহপরিচালিকা ও অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত নারীদের উপর নিয়োগকর্তার নির্যাতন খুবই ভয়াবহ পর্যায়ে। ভারত বাংলাদেশের নারীদের সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত নাজুক পর্যায়ে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে নারীদের গণতান্ত্রিক ও নাগরিক অধিকার নেই। এ ছাড়া আরো বিভিন্ন ভাবে বিশ্বের দেশে দেশে নারীদের নির্যাতন নিপীড়ন চালানো হয়। পতিতাবৃত্তির মত অমানবিক পেশায় বিভিন্ন দেশে অনেক নারী ক্ষতবিক্ষত, যা মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের বিরোধী।

বস্তুত এই হচ্ছে বিশ্বব্যাপী মানবাধিকারের অবস্থা। জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা, এনজিও, দেশীবিদেশী সাহায্য সংস্থা, সংবাদপত্র বার্তা সংস্থা এবং বিভিন্ন সরকারের সাম্প্রতিককালে প্রদত্ত বিভিন্ন রিপোর্ট ও প্রতিবেদন থেকে এই চিত্রটি সংগ্রহ করা হয়েছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের যথার্থতা নিরূপণ করার কোন কৌশল আমাদের আয়ত্তে নেই। তাই পরিবেশিত তথ্য সম্পূর্ণ সঠিক কিনা তা আমাদের পক্ষে বলা মুশকিল। তবে আমরা শুধু এতটুকু বলতে পারি যে, বাস্তব অবস্থা এর প্রায় কাছাকাছি। আমরা এও বলতে পারি যে, বিশ্বব্যাপী মানবাধিকারের অনুসৃতি ও কার্যকরতা মোটেই সন্তোষজনক নয়। এই অবস্থা চলতে থাকলে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র প্রচার সত্যিই অর্থহীন হয়ে পড়বে। তাই বিশ্ববাসীকে বিশেষ করে বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে এ ব্যাপারে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা সহকারে এগিয়ে আসতে হবে। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র কার্যকর করার পেছনে যে প্রতিবন্ধক রয়েছে সেগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত করে বাধাসমূহ অপসারণের কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। তাহলে পৃথিবী হয়ে উঠবে সত্যিকার অর্থে মানুষের বাসযোগ্য আর মানুষ হবে আরো মানবিক চেতনাসম্পন্ন। মানুষের মধ্যে মানবিকবোধ জাগ্রত হলে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা সার্থক হবে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় ভাগ

পরিশিষ্ট-১

রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি

[মূলনীতিসমূহ]

৮। [1][(১) সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার—এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।

(১ক) সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি।]

(২) এই ভাগে বর্নিত নীতিসমূহ বাংলাদেশ-পরিচালনার মূলসূত্র হইবে, আইন প্রণয়নকালে রাষ্ট্র তাহা প্রয়োগ করিবেন, এই সংবিধান ও বাংলাদেশের অন্যান্য আইনের ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে তাহা নির্দেশক হইবে এবং তাহা রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কার্যের ভিত্তি হইবে, তবে এই সকল নীতি আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য হইবে না।

[স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন]

[2][৯। রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিগণ সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ দান করিবেন এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহে কৃষক, শ্রমিক এবং মহিলাদিগকে যথাসম্ভব বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হইবে।

[জাতীয় জীবনে মহিলাদের অংশগ্রহণ]

১০। জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

[গণতন্ত্র ও মানবাধিকার]

১১। প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে[3] * * *।

[4]* * * * * * *

---

১. ১৯৭৮ সনের ২য় ঘোষণাপত্র আদেশ নম্বর ৪-এর ২য় তফসিলবলে (১) দফার পরিবর্তে (১) এবং (১ক) দফা প্রতিস্থাপিত।

২. উপরোক্ত আদেশবলে ৯ এবং ১০ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে ৯ এবং ১০ অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপিত।

৩. ১৯৭৫ সনের ২ নং আইনের ২ ধারাবলে "এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে" শব্দগুলি বিলুপ্ত।

৪. ১৯৭৮ সনের ২য় ঘোষণাপত্র আদেশ নম্বর ৪-এর ২য় তফসিলবলে ১২ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত।

www.pathagar.com

১৩। উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বণ্টনপ্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা-ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে ঃ

(ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারি খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা ;

(খ) সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা ; এবং

(গ) ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা।

[কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি]

১৪। রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতি মানুষকে—কৃষক ও শ্রমিককে—এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।

[মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা]

১৫। রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায় :

(ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা ;

(খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরির বিনিময়ে নিশ্চয়তার অধিকার ;

(গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার ; এবং

(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্যলাভের অধিকার।

[গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব]

১৬। নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষিবিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তরসাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

[অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা]

১৭। রাষ্ট্র

www.pathagar.com

(ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য,

(খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য,

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থ গ্রহণ করিবেন।

[জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা]

১৮। (১) জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন এবং বিশেষত আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

[সুযোগের সমতা]

১৯। (১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।

(২) মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করিবেন।

[অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম]

২০। (১) কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয়, এবং "প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী"—এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।

(২) রাষ্ট্র এমন অবস্থাসৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কায়িক—সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে।

[নাগরিক ও সরকারি কর্মচারীদের কর্তব্য]

২১। (১) সংবিধান ও আইন মান্য করা, শৃঙ্খলা রক্ষা করা, নাগরিকদায়িত্ব পালন করা এবং জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।

(২) সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।

www.pathagar.com

[নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ]

২২। রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।

[জাতীয় সংস্কৃতি]

২৩। রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করিবেন এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন।

[জাতীয় স্মৃতি নিদর্শন প্রভৃতি]

২৪। বিশেষ শৈল্পিক কিংবা ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন বা তাৎপর্যমণ্ডিত স্মৃতিনিদর্শন, বস্তু বা স্থানসমূহকে বিকৃতি, বিনাশ বা অপসারণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

[আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন]

২৫। [১] [(১)] জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসঙ্ঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা—এই সকল নীতি হইবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি এবং এই সকল নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র ঃ

(ক) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তিপ্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করিবেন।

(খ) প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায়-অনুযায়ী পথ পন্থার মাধ্যমে অবাধে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকার সমর্থন করিবেন ; এবং

(গ) সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করিবেন।

[২] [(২) রাষ্ট্র ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সংহত, সংরক্ষণ এবং জোরদার করিতে সচেষ্ট হইবেন।

www.pathagar.com

তৃতীয় ভাগ

মৌলিক অধিকার

[মৌলিক অধিকারের সহিত অসামঞ্জস্য আইন বাতিল]

২৬। (১) এই ভাগের বিধানাবলী সহিত আসমঞ্জস্য সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এই সংবিধান-প্রবর্তন হইতে সেই সকল আইনের ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।

(২) রাষ্ট্র এই ভাগের কোন বিধানের সহিত অসামঞ্জস্য কোন আইন প্রনয়ন করিবেন না এবং অনুরূপ কোন আইন প্রণীত হইলে তাহা এই ভাগের কোন বিধানের সহিত যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।

[১] [(৩) সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত সংশোধনের ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।]

[আইনের দৃষ্টিতে সমতা]

২৭। সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী।

[ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য]

২৮। (১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারীপুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

(৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।

(৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোনকিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

[সরকারি নিয়োগলাভে সুযোগের সমতা]

২৯। (১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।

---

১. ১৯৭৩ সনের ২৪ নং আইনের ২ ধারাবলে নূতন (৩) দফা সংযোজিত যাহা ১৯৭৩ সনের ১৫ই জুলাই হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

www.pathagar.com

(২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।

(৩) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই

(ক) নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান-প্রণয়ন করা হইতে,

(খ) কোন ধর্মীয় বা উপ-সম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠানে উক্ত ধর্মাবলম্বী বা উপসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষণের বিধান-সংবলিত যে কোন আইন কার্যকর করা হইতে,

(গ) যে শ্রেণীর কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তাহা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয়, সেইরূপ যে কোন শ্রেণীর নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হইতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

[বিদেশী খেতাব প্রভৃতি গ্রহণ, নিষিদ্ধকরণ]

[১] [৩০। রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন নাগরিক কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট হইতে কোন উপাধি, সম্মান, পুরস্কার বা ভূষণ গ্রহণ করিবেন না।]

[আইনের আশ্রয়লাভের অধিকার]

৩১। আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহারলাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষত আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।

[জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার রক্ষণ]

৩২। আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।

[গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ]

[২] [৩৩। (১) গ্রেপ্তারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাঁহার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

---

১. ১৯৮৮ সনের ৩০ নং আইনের ৩ ধারাবলে ৩০ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।
২. ১৯৭৩ সনের ২৪ নং আইনের ৩ ধারাবলে মূল ৩৩ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

www.pathagar.com

(২) গ্রেফতারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটবর্তী ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে (গ্রেপ্তারের স্থান হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে তদতিরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (১) ও (২) দফার কোন কিছুই সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না,

(ক) যিনি বর্তমান সময়ের জন্য বিদেশী শত্রু, অথবা

(খ) যাঁহাকে নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বা আটক করা হইয়াছে।

(৪) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইন কোন ব্যক্তিকে ছয় মাসের অধিককাল আটক রাখিবার ক্ষমতা প্রদান করিবে না, যদি সুপ্রীম কোর্টের বিচারক রহিয়াছেন বা ছিলেন কিংবা সুপ্রীম কোর্টের বিচারকপদে নিয়োগলাভের যোগ্যতা রাখেন, এইরূপ দুইজন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত একজন প্রবীন কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত কোন উপদেষ্টা পর্ষদ্ উক্ত ছয় মাস অতিবাহিত হইবার পূর্বে তাঁহাকে উপস্থিত হইয়া বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগদানের পর রিপোর্ট প্রদান না করিয়া থাকেন যে, পর্ষদের মতে উক্ত ব্যক্তিকে তদতিরিক্তকাল আটক রাখিবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে।

(৫) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে আটক করা হইলে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে যথাসম্ভব শীঘ্র আদেশদানের কারণ জ্ঞাপন করিবেন এবং উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বক্তব্য-প্রকাশের জন্য তাঁহাকে যত সত্বর সম্ভব সুযোগদান করিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় তথ্যাদি প্রকাশ জনস্বার্থবিরোধী বলিয়া মনে হইলে অনুরূপ কর্তৃপক্ষ তাহা প্রকাশে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবেন।

(৬) উপদেষ্টা-পর্ষদ কর্তৃক এই অনুচ্ছেদের (৪) দফার অধীন তদন্তের জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।]

[জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধকরণ]

৩৪। (১) সকল প্রকার জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধ; এবং এই বিধান কোনভাবে লঙ্ঘিত হইলে তাহা আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই সেই সকল বাধ্যতামূলক শ্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যেখানে

(ক) ফৌজদারি অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তি আইনত দণ্ডভোগ করিতেছেন; অথবা

(খ) জনগণের উদ্দেশ্যসাধনকল্পে আইনের দ্বারা তাহা আবশ্যক হইতেছে।

www.pathagar.com

[বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে রক্ষণ]

৩৫। (১) অপরাধের দায়যুক্ত কার্যসংঘটনকালে বলবৎ ছিল, এইরূপ আইন ভঙ্গ করিবার অপরাধ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে না এবং অপরাধ-সংঘটনকালে বলবৎ সেই আইনবলে যে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারিত, তাঁহাকে তাহার অধিক বা তাহা হইতে ভিন্ন দণ্ড দেওয়া যাইবে না।

(২) এক অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে একাধিকবার ফৌজদারিতে সোপর্দ ও দণ্ডিত করা যাইবে না।

(৩) ফৌজদারি অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচারলাভের অধিকারী হইবেন।

(৪) কোন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাইবে না।

(৫) কোন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাইবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেওয়া যাইবে না কিংবা কাহারও সহিত অনুরূপ ব্যবহার করা যাইবে না।

(৬) প্রচলিত আইনে নির্দিষ্ট কোন দণ্ড বা বিচারপদ্ধতি সম্পর্কিত কোন বিধানের প্রয়োগকে এই অনুচ্ছেদের (৩) বা (৫) দফার কোন কিছুই প্রভাবিত করিবে না।

[চলাফেরার স্বাধীনতা]

৩৬। জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধসাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, ইহার যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতিস্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

[সমাবেশের স্বাধীনতা]

৩৭। জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হইবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

৩৮। জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে সমিতি বা সঙ্ঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে ;

১ * * * * * * *

[চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্ স্বাধীনতা]

৩৯। (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হইলো।

www.pathagar.com

(২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানী বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং

(খ) সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার

নিশ্চয়তা দান করা হইল।

[পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা]

৪০। আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে কোন পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোন যোগ্যতা নির্ধারিত হইয়া থাকিলে অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের এবং যে কোন আইনসঙ্গত কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার অধিকার থাকিবে।

[ধর্মীয় স্বাধীনতা]

৪১। (১) আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা-সাপেক্ষে

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে;

(খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে।

(২) কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্মসংক্রান্ত না হইলে তাঁহাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না।

[সম্পত্তির অধিকার]

৪২। (১) আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি-ব্যবস্থা করিবার অধিকার থাকিবে এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ত বা দখল করা যাইবে না।

[১] [(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রণীত আইনে ক্ষতিপূরণসহ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখলের বিধান করা হইবে এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ, কিংবা ক্ষতিপূরণ নির্ণয় বা প্রদানের নীতি ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা হইবে, তবে অনুরূপ কোন আইনে ক্ষতিপূরণের বিধান অপর্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া সেই আইন সম্পর্কে কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

১. ১৯৭৮ সনের ২য় ঘোষণাপত্র আদেশ নম্বর ৪-এর ২য় তফসিলবলে (২) দফার পরিবর্তে (২) এবং (৩) দফা প্রতিস্থাপিত।

www.pathagar.com

(৩) ১৯৭৭ সালের ফরমানসমূহ (সংশোধন) আদেশ (১৯৭৭ সালের ১ নং ফরমানসমূহ আদেশ) প্রবর্তনের পূর্বে প্রণীত কোন আইনের প্রয়োগকে, যতদূর তাহা ক্ষতিপূরণ ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখলের সহিত সম্পর্কিত, এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই প্রভাবিত করিবে না।]

[গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ]

৪৩। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনসাধারণের নৈতিকতা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের

(ক) প্রবেশ, তল্লাশী ও আটক হইতে স্বীয় গৃহে নিরাপত্তালাভের অধিকার থাকিবে ; এবং

(খ) চিঠিপত্রের ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনতারক্ষার অধিকার থাকিবে।

[মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ]

[১] [৪৪। (১) এই ভাগে প্রদত্ত অধিকারসমূহ বলবৎ করিবার জন্য এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগের নিকট মামলা রুজু করিবার অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হইল।

(২) এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীন হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতার হানি না ঘটাইয়া সংসদ আইনের দ্বারা অন্য কোন আদালতকে তাহার এখ্‌তিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে ঐ সকল বা উহার যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষমতা দান করিতে পারিবেন।]

[শৃঙ্খলামূলক আইনের ক্ষেত্রে অধিকারের পরিবর্তন]

৪৫। কোন শৃঙ্খলা-বাহিনীর সদস্য-সম্পর্কিত কোন শৃঙ্খলামূলক আইনের যে কোন বিধান উক্ত সদস্যের যথাযথ কর্তব্যপালন বা উক্ত বাহিনীতে শৃঙ্খলারক্ষা নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধান বলিয়া অনুরূপ বিধানের ক্ষেত্রে এই ভাগের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

[দায়মুক্তি -বিধানের ক্ষমতা]

৪৬। এই ভাগের পূর্ববর্ণিত বিধানাবলীতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি বা অন্য কোন ব্যক্তি জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের প্রয়োজনে কিংবা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে কোন অঞ্চলে শৃঙ্খলা-রক্ষা বা পুনর্বহালের প্রয়োজনে কোন কার্য করিয়া থাকিলে সংসদ আইনের দ্বারা সেই ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করিতে পারিবেন কিংবা ঐ অঞ্চলে প্রদত্ত

---

১. উপরোক্ত আদেশবলে মূল ৪৪ অনুচ্ছেদের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত যাহা ১৯৭৫ সনের ২ নং আইনের ৩ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত হইয়াছিল।

www.pathagar.com

কোন দণ্ডাদেশ, দণ্ড বা বাজেয়াপ্তির আদেশকে কিংবা অন্য কোন কার্যকে বৈধ করিয়া লইবে পারিবেন।

[কতিপয় আইনের হেফাজত]

৪৭। (১) নিম্নলিখিত যে কোন বিষয়ের বিধান-সংবলিত কোন আইনে (প্রচলিত আইনের ক্ষেত্রে সংশোধনীর মাধ্যমে) সংসদ যদি স্পষ্টরূপে ঘোষণা করেন যে, এই সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতিসমূহের কোন একটিকে কার্যকর করিবার জন্য অনুরূপ বিধান করা হইল, তাহা হইলে অনুরূপ আইন এই ভাগে নিশ্চয়কৃত কোন অধিকারের সহিত অসামঞ্জস্য কিংবা অনুরূপ অধিকার হরণ বা খর্ব করিতেছে, এই কারণে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে না ঃ

(ক) কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখল কিংবা সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে কোন সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনা ;

(খ) বাণিজ্যিক বা অন্যবিধ উদ্যোগসম্পন্ন একাধিক প্রতিষ্ঠানের বাধ্যতামূলক সংযুক্তকরণ ;

(গ) অনুরূপ যে কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, ব্যবস্থাপক, এজেন্ট ও কর্মচারীদের অধিকার এবং (যে কোন প্রকারের) শেয়ার ও স্টকের মালিকদের ভোটাধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ ;

(ঘ) খনিজদ্রব্য বা খনিজ তৈল-অনুসন্ধান বা লাভের অধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ ;

(ঙ) অন্যান্য ব্যক্তিকে অংশত বা সম্পূর্ণত পরিহার করিয়া সরকার কর্তৃক বা সরকারের নিজস্ব, নিয়ন্ত্রণাধীন বা ব্যবস্থাপনাধীন কোন সংস্থা কর্তৃক যে কোন কারবার, ব্যবসায়, শিল্প বা কর্মবিভাগ-চালনা ; অথবা

(চ) যে কোন সম্পত্তির স্বত্ব কিংবা পেশা, বৃত্তি, কারবার বা ব্যবসায় সংক্রান্ত যে কোন অধিকার কিংবা কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান বা কোন বাণিজ্যিক বা শিল্পগত উদ্যোগের মালিক বা কর্মচারীদের অধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ।

(২) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও প্রথম তফসিলে বর্ণিত আইনসমূহ (অনুরূপ আইনের কোন সংশোধনীসহ) পূর্ণভাবে বলবৎ ও কার্যকর হইতে থাকিবে এবং অনুরূপ যে কোন আইনের কোন বিধান কিংবা অনুরূপ কোন আইনের কোন কর্তৃত্বে যাহা করা হইয়াছে বা করা হয় নাই, তাহা এই সংবিধানের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস্য বা তাহার পরিপন্থী, এই কারণে বাতিল বা বেআইনি বলিয়া গণ্য হইবে না ;

[১] [তবে শর্ত থাকে যে, এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই অনুরূপ কোন আইনকে সংশোধন, পরিবর্তন বা বাতিল করা হইতে নিবৃত্ত করিবে না।]

[২] [(৩) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য

---

১. ১৯৭৮ সনের ২য় ঘোষণাপত্র আদেশ নম্বর ৪-এর ২য় তফসিলবলে শর্তাংশটি প্রতিস্থাপিত।
২. নূতন (৩) দফা ১৯৭৩ সনের ১৫ নং আইনের ২ ধারাবলে সংযোজিত।

www.pathagar.com

কোন সশস্ত্র বাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য কিংবা যুদ্ধবন্দীকে আটক, ফৌজদারিতে সোপর্দ কিংবা দণ্ডদান করিবার বিধান-সংবলিত কোন আইন বা আইনের বিধান এই সংবিধানের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস বা তাহার পরিপন্থী, এই কারণে বাতিল বা বেআইনী বলিয়া গণ্য হইবে না কিংবা কখনও বাতিল বা বেআইনি হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।]

[সংবিধানের কতিপয় বিধানের অপ্রযোজ্যতা]

[১] [৪৭ক। (ক) যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোন আইন প্রযোজ্য হয়, সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদ, ৩৫ অনুচ্ছেদের (১) ও (৩) দফা এবং ৪৪ অনুচ্ছেদের অধীন নিশ্চয়কৃত অধিকারসমূহ প্রযোজ্য হইবে না।

(২) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোন আইন প্রযোজ্য হয়, এই সংবিধানের অধীন কোন প্রতিকারের জন্য সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করিবার কোন অধিকার সেই ব্যক্তির থাকিবে না।]

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট – ২

গ্রন্থপঞ্জি

সহায়ক গ্রন্থের তালিকা

পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে মানুষ / লুই মামফোর্ড
—শওকত ওসমান অনূদিত

আন্তর্জাতিক সমস্যা ও বিশ্বরাজনীতি
—মোরশেদ শফিউল হাসান সম্পাদিত

রাষ্ট্রতত্ত্বের ইতিহাস
—জর্জ, এইচ সেবাইন

রাষ্ট্রবিজ্ঞান
—সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নিমাই প্রামাণিক

International Encyclopedia of the Social Sciences
—David L. Sills (editor)

History of Mankind
—edited by Charles Moraze

The Encyclopedia Britanica
—The University of Chicago

সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি
—মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

আধুনিক সমাজকল্যাণ
—আবদুস সামাদ

উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতি
—ড: সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম ও বিপুলরঞ্জন নাথ

দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাজনীতি
—গিয়াস উদ্দিন মোল্লা

মনোবিদ্যা
—প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত

মনোবিদ্যা
—পরেশনাথ ভট্টাচার্য

www.pathagar.com

আদিম সমাজ /লুইস হেনরি মর্গান
—বুলবন ওসমান অনূদিত ও সম্পাদিত
মধ্যপ্রাচ্য : অতীত ও বর্তমান /ইয়াহইয়া আরমাজানী
—মুহাম্মদ-ইনাম-উল হক অনূদিত
ফিলিস্তিন শতাব্দীর ট্রাজেডী
—কাজী আবু মোহাম্মদ আবদুল্লাহ
Human Societies
—Gerhard Lenski
সমাজবিজ্ঞান
—মোঃ আমির হোসন মিয়া
মানুষের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ)
—আবদুল হালিম ও নূরুন নাহার বেগম
মানুষের ইতিহাস (আধুনিক যুগ)
—নূরুন নাহার বেগম
Human Rights Issues and International Law
—Muhammad Zamir
আন্তর্জাতিক সংগঠন
—শাহ্ আলম
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক : তত্ত্বীয় ও বাস্তবরূপ
—আবুল কালাম
Human Rights and State Sovereignty
—Richard Falk
ইসলামে নাগরিক ও মানবাধিকার
—তমিজুল হক
ইসলামে মানবাধিকার
—মুহাম্মদ সালহুদ্দীন
Human Rights, International law and the Helsinki Accord
—Edited by Thomas Buergenthal
The Economist : World Human Rights Guide
—Originated and Compiled by Charles Humana
The Law of Citizenship, Passport in Bangladesh
—I. M. M. Mohsin

www.pathagar.com

American Dream Global Nightmare
—Sandy Vogelgesany
Human Rights and Basic Needs in the America's
—Edited by Margared E. Crahan
Human Rights and American Foreign Policy
—Donald P. Kammers and Gilburt D. Loescher
United National Action in the Field of Human Rights
—United Nations, New York, 1983
Freedom of the Individual Under Law
—United Nations, New York, 1990
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক
—নির্মল কান্তি ঘোষ

যেসব গ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে :

আন্তর্জাতিক আইনের মূল দলিল
—আবুল ফজল হক
আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে মানবাধিকার
—মোঃ মাহবুব উল হক জোয়ার্দার
Human Dignity
The Internationalization of Human Rights
—Edited by Alice H Henkin
সংবিধানের ভাষ্য
—গাজী শামছুর রহমান
ইসলামি আইনের ভাষ্য
—ঐ
হিন্দু আইনের ভাষ্য
—ঐ
ফৌজদারি কার্যবিধির ভাষ্য
—ঐ
দণ্ডবিধির ভাষ্য
—ঐ
আন্তর্জাতিক আইনের ভাষ্য
—ঐ

www.pathagar.com

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ

বিশ্বের প্রথম যে ২২টি দেশ জাতিসংঘে শিশু অধিকার সনদ অনুসমর্থন করেছিল তার মধ্যে একটি হচ্ছে বাংলাদেশ।

১৯৯১ সালের ২ সেপ্টেম্বর থেকে এই সনদের বাস্তবায়ন বাংলাদেশের জন্য আবশ্যকীয় হয়েছে। শিশুদের কল্যাণে যথাসম্ভব উদ্যোগ ও সহযোগিতা প্রদানে বাংলাদেশ সরকার দেশের জনগণ এবং জাতিসংঘের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ ব্যাপারে ইতিমধ্যে ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

শিশুর জীবন রক্ষা, নিরাপত্তা ও বিকাশের লক্ষ্যে প্রণীত নীতিমালা বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি প্রয়াস কেবলমাত্র তখনই সফলতা অর্জন করবে যখন সমাজের সকল পর্যায়ের মানুষ জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ--এর সব ক'টি ধারা অনুধাবন করতে সক্ষম হবে এবং ব্যক্তিগত ও সমাজজীবনে তা বাস্তবায়িত করবে।

www.pathagar.com

শিশু অধিকার সনদ
প্রস্তাবনা

এই সনদে শরীক রাষ্ট্রসমূহ
জাতিসংঘ ঘোষণায় বর্ণিত নীতিমালা অনুসারে স্বাধীনতা, ন্যায় বিচার ও বিশ্বশান্তির ভিত্তি হচ্ছে মানব জাতির প্রতিটি সদস্যের সহজাত মর্যাদা এবং অলঙ্ঘণীয় স্বীকৃতি; একথা বিবেচনায় রেখে—

জাতিসংঘের আওতাভুক্ত সকল দেশ উক্ত ঘোষণায় বর্ণিত মৌলিক মানবাধিকার এবং ব্যক্তি মানুষের মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি তাদের বিশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করেছে এবং আরো স্বাধীনভাবে সমাজ-প্রগতিকে এগিয়ে নিতে ও জীবনমানের উন্নয়ন সাধনে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে; এই বিষয়টি মনে রেখে—

জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার নীতিমালায় একথা ঘোষিত ও স্বীকৃত হয়েছে যে, গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক কিংবা অন্যান্য মত, জাতীয় অথবা সামাজিক পরিচয়, বিত্ত, জন্মসূত্র কিংবা অন্যবিধ কৌলীন্য নির্বিশেষে কোনো প্রকার ভেদাভেদ ব্যতিরেকে প্রতিটি মানুষ উক্ত ঘোষণায় বর্ণিত সকল অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করবে; এই বিষয় মনে নিয়ে—

বিশেষ তত্ত্বাবধান ও সহায়তা শিশুদের প্রাপ্য, মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায় বর্ণিত জাতিসংঘের এই উচ্চারণকে স্মরণে রেখে—

পরিবার যেহেতু সমাজের প্রাথমিক সংগঠন এবং এর সকল সদস্য বিশেষ করে শিশুদের বিকাশ ও কল্যাণের স্বাভাবিক পরিবেশ, সেহেতু তাকে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা এবং সহায়তা দিতে হবে যাতে সমাজ অভ্যন্তরে সে তার দায়িত্বসমূহ পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে; এ ব্যাপারে আস্থাশীল হয়ে—

শিশুর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ ও সুষম বিকাশের স্বার্থে আনন্দ, ভালবাসা ও সমঝোতাপূর্ণ পারিবারিক পরিবেশে তাকে বেড়ে উঠতে দিতে হবে; একথা অনুধাবন করে—

সমাজে স্বকীয় জীবনযাপনের জন্যে শিশুকে পুরোপুরি প্রস্তুত করে তুলতে হবে এবং জাতিসংঘ ঘোষণায় বর্ণিত আদর্শসমূহের আলোকে বিশেষভাবে শান্তি, মর্যাদা, সহনশীলতা, স্বাধীনতা, সমতা ও সংহতির চেতনায় তাকে গড়তে হবে; এ বিষয়টি চিন্তায় রেখে—

শিশু অধিকার সম্পর্কে ১৯২৪ সালের জেনেভা ঘোষণা ও ১৯৫৯ সালের ২০ নভেম্বর সাধারণ পরিষদে গৃহীত শিশু অধিকার ঘোষণায় শিশুদের প্রতি বিশেষ যত্নের কথা বর্ণিত হয়েছে এবং সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায়, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক নীতিমালায় (বিশেষভাবে ২৩ ও ২৪ অনুচ্ছেদ), অর্থনৈতিক-সামাজিক—সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক নীতিমালায় (বিশেষভাবে ১০ অনুচ্ছেদ) এবং শিশু কল্যাণের কাজে নিয়োজিত আন্তর্জাতিক সংস্থা ও অপরাপর বিশেষ সংগঠনসমূহের বিধিবিধান ও প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রে তা স্বীকৃত রয়েছে, এটা মনে রেখে—

"শিশুর শারীরিক ও মানসিক অপরিপক্বতার কারণে তার জন্মের আগে থেকে এবং পরেও তার জন্যে চাই যথাযথ আইনী রক্ষাব্যবস্থাসহ বিশেষ নিরাপত্তা ও যত্ন"—শিশু অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণায় ব্যক্ত এই কথা চিন্তায় রেখে—

জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে পালক প্রদান ও দত্তক গ্রহণের প্রসঙ্গ বিশেষভাবে উল্লেখসহ শিশুদের সুরক্ষা ও কল্যাণ সম্পর্কিত সামাজিক আইনগত নীতিমালা সংক্রান্ত ঘোষণা, শিশু সংক্রান্ত বিচারকার্য

www.pathagar.com

পরিচালনার জন্যে জাতিসংঘের আদর্শ ন্যূনতম বিধিমালা (বেইজিং রুলস), এবং জরুরি অবস্থা ও সশস্ত্র সংঘাতকালীন মহিলা ও শিশুর নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঘোষণার শর্তাবলী স্মরণে রেখে—

বিশ্বের সকল দেশেই এমন শিশুরা রয়েছে যারা বিশেষ দুর্দশাগ্রস্ত পরিস্থিতিতে বাস করছে, সেই সব শিশুর জন্যে বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন ; একথা উপলব্ধি করে—

শিশু সুরক্ষা ও তাদের সুষম বিকাশের স্বার্থে প্রতিটি জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতির মূল্যবোধের গুরুত্বের কথা যথাযথ বিবেচনায় নিয়ে—

প্রতিটি দেশে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে শিশুদের জীবনমান উন্নয়নে আন্তর্জাতিক গুরুত্ব অনুধাবন করে—

পরিচ্ছেদ ১

ধারা—১

এই সনদে শিশু বলতে বোঝাবে ১৮ বছরের কম বয়সী প্রতিটি মানব-সন্তান, যদি না শিশুদের জন্যে প্রযোজ্য আইনের আওতায় আরো কম বয়সে নাবালকত্ব নির্ধারিত হয়ে থাকে।

ধারা—২

(১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ তাদের নিজ নিজ আওতাধীন প্রতিটি শিশুর জন্যে এই সনদে নির্ধারিত অধিকারসমূহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে এবং এগুলির নিশ্চয়তা বিধান করবে। এ ব্যাপারে শিশু অথবা তা পিতামাতা কিংবা আইনসম্মত অভিভাবকের ক্ষেত্রে গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক ও অন্যান্য মত, জাতীয়-গোষ্ঠীগত-সামাজিক পরিচয়, বিত্ত, আসমর্থ, জন্মসূত্র কিংবা অন্যবিধ কৌলীন্য, নির্বিশেষে কোনো ধরনের বৈষম্য করা হবে না।

(২) পিতা, আইনসম্মত অভিভাবক কিংবা পরিবারের সদস্যদের সামাজিক অবস্থান, কার্যকলাপ, ব্যক্ত মতামত কিংবা বিশ্বাসের কারণে যে কোনো ধরনের বৈষম্য অথবা শাস্তি থেকে শিশুরা নিরাপদ থাকবে ; এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে শরীক রাষ্ট্রসমূহ যথাযথ কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধারা—৩

(১) সমাজকল্যাণমূলক সরকারি কিংবা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, আইন-আদালত, প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ কিংবা আইনসভা—যেই হোক না কেন, শিশু-সংক্রান্ত তাদের যে কোনো কার্যক্রমের প্রধান বিবেচ্য হবে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ।

(২) শিশুর পিতামাতা, আইনসম্মত অভিভাবক কিংবা আইনত দায়িত্ব বর্তায় এমন কোনো ব্যক্তির অধিকার ও কর্তব্য বিবেচনায় রেখে শিশুর কল্যাণার্থে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ও যত্ন নিশ্চিত করতে শরীক রাষ্ট্রসমূহ যথাযথ আইনগত ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেবে।

(৩) শরীক রাষ্ট্রসমূহ শিশুপরিচর্যা ও সুরক্ষার জন্যে প্রতিষ্ঠান, সেবা ও সুবিধাদি নিশ্চিত করবে। এ ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য এবং কর্মচারীর সংখ্যা ও উপযুক্ততা সেই সাথে পর্যাপ্ত তদারকীর ব্যবস্থা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত মানের অনুরূপ হতে হবে।

ধারা—৪

এই সনদে স্বীকৃত অধিকারসমূহ শরীক রাষ্ট্রসমূহ প্রয়োজনীয় আইনগত, প্রশাসনিক ও অপরাপর সকল ব্যবস্থা নেবে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহের ক্ষেত্রে শরীক রাষ্ট্রগুলো প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং প্রয়োজনবোধে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কাঠামোর মধ্যে উপরোক্ত পদক্ষেপগুলো নেবে।

ধারা—৫

এই সনদে স্বীকৃত শিশুর অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে শিশুর বিকাশযোগ্যতার সাথে সংগতিপূর্ণ যথাযথ নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদানের প্রশ্নে পিতামাতা বা স্থানীয় রীতি অনুযায়ী সম্প্রসারিত পরিবার বা সমাজ-

www.pathagar.com

সদস্য, আইনসম্মত অভিভাবক অথবা আইনানুগভাবে শিশুর দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য কোনো ব্যক্তির দায়িত্ব, অধিকার এবং কর্তব্যের প্রতি শরীক রাষ্ট্রসমূহ সম্মান দেখাবে।

ধারা—৬

(১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ স্বীকার করে যে, প্রতিটি শিশুর বেঁচে থাকার সহজাত অধিকার রয়েছে।

(২) শরীক রাষ্ট্রসমূহ শিশুদের বেঁচে থাকা এবং বিকাশের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সর্বাধিক নিশ্চয়তা বিধান করবে।

ধারা—৭

(১) জন্মের অব্যবহিত পরেই শিশুকে নিবন্ধিকরণ করতে হবে এবং জন্ম থেকেই তার নামকরণ লাভের, একটি জাতীয়তা অর্জনের এবং যতটা সম্ভব, পিতামাতার পরিচয় জানবার ও তাদের হাতে প্রতিপালিত হওয়ার অধিকার থাকবে।

(২) শরীক রাষ্ট্রসমূহ তাদের জাতীয় আইন অনুসারে এই অধিকারসমূহের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে এবং এই ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক দলিলসমূহের বাধ্যবাধকতা মেনে চলবে, বিশেষ করে সে সব ক্ষেত্রে এর অন্যথা হলে শিশু রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়ে।

ধারা—৮

(১) জাতীয়তা, নাম এবং পারিবারিক সম্পর্কসহ আইনসম্মত পরিচিতি সংরক্ষণে শিশুর অধিকারের প্রশ্নে শরীক রাষ্ট্রসমূহ উদ্যোগী হবে, যেখানে কোনো বেআইনী হস্তক্ষেপ চলবে না।

(২) কোথাও কোনো শিশু যদি তার নিজস্ব পরিচয়ের কতিপয় বা সবগুলো দিক থেকে বেআইনী বঞ্চিত হয় তাহলে শরীক রাষ্ট্রসমূহ যত দ্রুত সম্ভব সেই পরিচয় পুনপ্রতিষ্ঠায় যথাযথ সহায়তা প্রদান ও সুরক্ষায় ব্যবস্থা করবে।

ধারা—৯

(১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ কোনো শিশুকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার পিতামাতার কাছ থেকে আলাদা না করার নিশ্চয়তা বিধান করবে, তবে কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যদি প্রযোজ্য আইন ও বিধিবিধান অনুসারে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করে যে, শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থে এ ধরনের বিচ্ছিন্নতা প্রয়োজন, কেবল সে ক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম হবে। এ ধরনের সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হতে পারে নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে যেমন, সন্তানের প্রতি পিতামাতার উৎপীড়ন বা অবহেলা কিংবা পিতা ও মাতা আলাদা বাস করছে এবং সন্তান কোথায় বাস করবে তা নির্ধারণ যে ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয়।

(২) এই ধারার অনুচ্ছেদ-১ অনুযায়ী কোনো মোকদ্দমা হলে তাতে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে উপস্থিত থাকার এবং তাদের মতামত জ্ঞাপন করার সুযোগ দিতে হবে।

(৩) পিতামাতার যে কোনো একজনের অথবা উভয়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন শিশুর পিতা মাতা উভয়ের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বজায় রাখার এবং নিয়মিত সরাসরি যোগাযোগ রাখার অধিকারের প্রতি শরীক রাষ্ট্রসমূহ সম্মান দেখাবে, অবশ্য যদি তা শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থের পরিপন্থী না হয়।

(৪) শরীক রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত কোনো কার্যব্যবস্থা, যেমন পিতামাতার যে কেউ অথবা দু'জনকে কিংবা শিশুকে আটক, কারাদণ্ড, নির্বাসন, স্বদেশ থেকে বিতাড়ন অথবা মৃত্যু (রাষ্ট্রকৃত আটক ব্যক্তি যে কোনো কারণে মৃত্যুসহ) ইত্যাকার কারণে যদি এ ধরনের বিচ্ছিন্নতা ঘটে তাহলে পিতামাতা, শিশু কিংবা যথোপযুক্ত ক্ষেত্রে পরিবারের অন্য সদস্যকে অনুরোধের ভিত্তিতে পরিবারের অনুপস্থিত সদস্য সম্পর্কে শরীক রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জ্ঞাপন করবে, অবশ্য যদি সে তথ্যের বিষয়বস্তু শিশুর কল্যাণের জন্যে ক্ষতিকর না হয়। শরীক রাষ্ট্রসমূহ এটাও নিশ্চিত করবে যে, এই ধরনের অনুরোধ পেশ করাটা যেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য কোনো বিরূপ প্রতিফল ভোগের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়।

ধারা—১০

(১) নবম ধারার অনুচ্ছেদ-১ এর ভিত্তিতে শরীক রাষ্ট্রসমূহের বাধ্যবাধকতা মোতাবেক কোনো শিশু বা তার পিতামাতা পারিবারিক পুনর্মিলনের উদ্দেশ্যে কোনো একটি শরীক রাষ্ট্রে প্রবেশ বা রাষ্ট্র ত্যাগের দরখাস্ত করলে শরীক রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক তা ইতিবাচক, মানবিক ও ত্বরিৎ পন্থায় বিবেচিত হতে হবে। শরীক

www.pathagar.com

রাষ্ট্রসমূহ আরো নিশ্চয়তা বিধান করবে যে, এ ধরনের আবেদন আবেদনকারী এবং তার পরিবারের সদস্যদের জন্যে কোনো বিরূপ প্রতিফল বয়ে আনবে না।

(২) কোনো শিশুর পিতামাতা পৃথক পৃথক রাষ্ট্রে বাস করলে উভয়ের সাথে নিয়মিত এবং অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নিরাপদে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও সরাসরি যোগাযোগ রাখাটা ঐ শিশুর অধিকার। সেই উদ্দেশ্যে এবং নবম ধারার প্রথম অনুচ্ছেদে বর্ণিত কর্তব্য অনুসারে শিশু কিংবা তার পিতামাতার নিজেদের দেশসহ যে কোনো দেশ ত্যাগ করার এবং নিজেদের দেশে প্রবেশ করার অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে শরীক রাষ্ট্রসমূহ। কোনো দেশ ত্যাগের এই অধিকার শুধুমাত্র এমন কিছু বিধিনিষেধ দ্বারা রহিত করা যাবে যেগুলি আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ এবং যেগুলি জাতীয় নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনস্বাস্থ্য কিংবা নৈতিকতা কিংবা অন্যের অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় এবং সনদে স্বীকৃত অন্যান্য অধিকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

ধারা—১১

(১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ শিশুদের অবৈধভাবে বিদেশে পাচার এবং দেশে ফিরতে না দেয়া প্রতিহত করতে ব্যবস্থা নেবে।

(২) এ উদ্দেশ্যে শরীক রাষ্ট্রসমূহ দ্বিপক্ষীয় বা বহুপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদনে উদ্যোগী হবে অথবা বিদ্যমান চুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করবে।

ধারা—১২

(১) নিজস্ব ধারণা বা মত গঠনে সক্ষম শিশু তার নিজের সকল বিষয়ে অবাধে মতামত প্রকাশের অধিকারী। সেই অধিকার যাতে রক্ষিত হয় এবং শিশুর বয়স ও পরিকক্কতা অনুযায়ী তার সেইসব মতামতকে যাতে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয় শরীক রাষ্ট্রসমূহ তার নিশ্চয়তা দেবে।

(২) এই উদ্দেশ্যে শিশুকে সুনির্দিষ্টভাবে এই সুযোগ দিতে হবে যাতে শিশুর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিচার বিভাগীয় বা প্রশাসনিক মোকদ্দমার ক্ষেত্রে শিশু সরাসরি অথবা কোনো প্রতিনিধি কিংবা কোনো উপযুক্ত সংস্থার মাধ্যমে জাতীয় আইনের বিধিবদ্ধ ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তার কথা বলতে পারে।

ধারা—১৩

(১) শিশুর স্বাধীনভাবে ভাবপ্রকাশের অধিকার থাকবে। এই অধিকারের মধ্যে রয়েছে সীমান্ত নির্বিশেষে সব ধরনের তথ্য ও ধ্যান-ধারণা জানতে চাওয়া, গ্রহণ করা এবং অবহিত করার স্বাধীনতা। এটি মৌখিকভাবে, লিখিত, মুদ্রিত কিংবা চারুশিল্পের আকারে অথবা শিশুর পছন্দসই অন্য কোনো পন্থায় হতে পারে।

(২) এই অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে কতিপয় বিধিনিষেধ আরোপ করা যেতে পারে, তবে তা হবে আইন দ্বারা নির্ধারিত এবং নিম্নোক্ত প্রয়োজনে :

ক) অন্যের অধিকার ও সুনামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে ; কিংবা

খ) জাতীয় নিরাপত্তা অথবা জনশৃঙ্খলা, জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা সুরক্ষার জন্যে।

ধারা—১৪

(১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ শিশুর চিন্তা, বিবেক ও ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারের প্রতি সম্মান দেখাবে।

(২) শরীক রাষ্ট্রসমূহ শিশুর বিকাশযোগ্যতার সাথে সঙ্গতি রেখে তার অধিকার চর্চায় নির্দেশনা দেয়ার ব্যাপারে পিতামাতা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইনসম্মত অভিভাবকের অধিকার ও কর্তব্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে।

(৩) কারো ধর্ম বা বিশ্বাস সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সেইসব সীমাবদ্ধতা আরোপ করা যাবে যা আইনে উল্লেখিত রয়েছে এবং নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য অথবা নৈতিকতা কিংবা অন্যদের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্যে প্রয়োজন।

ধারা—১৫

(১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ শিশুদের সংঘবদ্ধ হবার এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকারকে স্বীকার করে।

www.pathagar.com

(২) এই অধিকার চর্চার উপর আইনানুসারে প্রযোজ্য বিধিনিষেধ ছাড়া এবং একটি গণতান্ত্রিক সমাজে জাতীয় কিংবা জননিরাপত্তা, শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য, নৈতিকতা এবং অপরের অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্যে প্রয়োজনীয় নিষেধাজ্ঞা ছাড়া অন্য কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করা যাবে না।

ধারা—১৬

(১) কোনো শিশুর নিজস্ব গোপনীয়তা, আবাস কিংবা পত্র যোগাযোগের উপর স্বেচ্ছাচারী অথবা বেআইনী হস্তক্ষেপ কিংবা তার মর্যাদা ও সুনামের উপর বেআইনী আক্রমণ করা যাবে না।

(২) এই ধরনের কোনো হস্তক্ষেপ কিংবা আক্রমণের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নেয়ার অধিকার শিশুর রয়েছে।

ধারা—১৭

শরীক রাষ্ট্রসমূহ গণমাধ্যমের দ্বারা সাধিত কর্মকাণ্ডের গুরুত্বের স্বীকৃতি দেয় এবং তারা শিশুর জন্যে বিভিন্নমুখী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সূত্র থেকে তথ্য ও বিষয়বস্তু প্রাপ্তির সুবিধা নিশ্চিত করবে। বিশেষ করে যে সব তথ্য ও বিষয়বস্তু শিশুর সামাজিক, আত্মিক ও নৈতিক কল্যাণ এবং শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশ সাধনের জন্য প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে শরীক রাষ্ট্রসমূহ :

ক) শিশুর সামাজিক ও সাংস্কৃতি দিক থেকে উপকারী এবং ২৯ ধারায় ব্যক্ত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য এবং বিষয়বস্তু প্রচারে গণমাধ্যমকে উৎসাহিত করবে ;

খ) বিভিন্নমুখী সাংস্কৃতি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সূত্র থেকে এ ধরনের তথ্য ও বিষয়বস্তু প্রস্তুত, বিনিময় এবং প্রচারের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে উৎসাহিত করবে ;

গ) শিশুগ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রচারে উৎসাহ যোগাবে :

ঘ) সংখ্যালঘু গোষ্ঠীভুক্ত বা আদিবাসী শিশুদের ভাষাগত চাহিদার প্রতি বিশেষভাবে সম্মান দেখাবার ব্যাপারে গণমাধ্যমকে উৎসাহ দেবে ;

ঙ) ১৩ থেকে ১৮ ধারায় বর্ণিত বিষয় মনে রেখে শিশুর কল্যাণের জন্যে ক্ষতিকারক তথ্য ও বিষয়বস্তু থেকে তার সুরক্ষায় যথাযথ দিকনির্দেশনা প্রণয়নকে উৎসাহিত করবে।

ধারা—১৮

(১) শিশুর প্রতিপালন, শিক্ষাদান ও বিকাশের ব্যাপারে পিতামাতা উভয়ের অভিন্ন দায়িত্ব রয়েছে—এই নীতির স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে শরীক রাষ্ট্রসমূহ সর্বাত্মক প্রয়াসী হবে। শিশুকে লালন-পালন, শিক্ষাদান ও গড়ে তোলার প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে পিতামাতা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইনসম্মত অভিভাবকের। শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থই হবে তাদের মূল চিন্তা।

(২) শরীক রাষ্ট্রসমূহ এই সনদে স্থিরকৃত অধিকারসমূহ নিশ্চিত এবং জোরদার করার উদ্দেশ্যে পিতামাতা ও আইনসম্মত অভিভাবককে তাদের শিশুর লালন-পালনে যথাযথ সহায়তা দেবে এবং শিশু-পরিচর্যার প্রতিষ্ঠান, সুযোগসুবিধা ও সেবা মাধ্যমসমূহের বিকাশ নিশ্চিত করবে।

(৩) শরীক রাষ্ট্রসমূহ কর্মজীবী পিতামাতার সন্তানদের প্রাপ্তিযোগ্যতা অনুসারে শিশু-পরিচর্যা কার্যক্রম সুবিধাদি থেকে উপকৃত হওয়ার অধিকার নিশ্চিত করতে যথাযথ ব্যবস্থাদি নেবে।

ধারা—১৯

(১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ পিতামাতা, আইনানুগ অভিভাবক অথবা শিশু পরিচর্যায় নিয়োজিত অন্য কোনো ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে থাকাকালীন শিশুকে আঘাত অথবা অত্যাচার, অবহেলা অথবা অমনোযোগী আচরণ, দুর্ব্যবহার অথবা শোষণ এবং যৌন অত্যাচারসহ সকল ধরনের শারীরিক ও মানসিক হিংস্রতা থেকে সুরক্ষার জন্য যথোপযুক্ত আইনানুগ, প্রশাসনিক, সামাজিক এবং শিক্ষাগত সকল ব্যবস্থা নেবে।

(২) এ ধরনের সুরক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যথার্থ ব্যবস্থা হিসাবে শিশু এবং শিশু পরিচর্যায় নিয়োজিতদের জন্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়ার প্রশ্নে সামাজিক কর্মসূচি প্রবর্তন, সেই সাথে প্রতিরোধের অন্য ব্যবস্থাদির জন্যে কার্যকর পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এবং উল্লেখিত শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে সে ক্ষেত্রে সনাক্তকরণ, বিবৃতকরণ, দায়িত্ব অর্পণ, তদন্ত, চিকিৎসা ও পরবর্তী কার্যকারণ এবং প্রয়োজনবোধে বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা নিতে হবে।

www.pathagar.com

ধারা—২০

(১) যে শিশু স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী ভিত্তিতে তার পারিবারিক পরিবেশ থেকে বঞ্চিত অথবা যে শিশুকে তার সর্বোত্তম স্বার্থে ঐ পরিবেশে থাকতে দেয়া যাবে না, সেই শিশু রাষ্ট্রকর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ সুরক্ষা ও সহায়তার অধিকারী।

(২) শরীক রাষ্ট্রসমূহ তাদের জাতীয় আইনানুসারে এ ধরনের শিশুর জন্যে বিকল্প তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করবে।

(৩) ঐ ধরনের পরিচর্যায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, পালিত সন্তান হিসাবে অর্পণ, ইসলামি আইনের কাফালা, দত্তক প্রদান কিংবা প্রয়োজনবোধে কোনো উপযুক্ত সংস্থার কাছে শিশুকে লালন-পালন করতে দেয়া। এ ক্ষেত্রে সমাধানের কথা ভাবার সময় শিশুর প্রতিপালন অব্যাহত রাখার বাঞ্ছনীয়তা এবং শিশুর জাতিগোষ্ঠী, ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষাগত পটভূমির প্রতি যথাযথ সম্মান দিতে হবে।

ধারা—২১

দত্তক পদ্ধতির স্বীকৃতিদান এবং/কিংবা অনুমোদনকারী শরীক রাষ্ট্রসমূহ এটা নিশ্চিত করবে যে, শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থই হবে এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বিবেচনা এবং তারা :

ক) এটা নিশ্চিত করবে যে, কোনো শিশুকে দত্তক গ্রহণের বিষয়টি শুধুমাত্র উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা নির্ধারিত হবে। ঐ কর্তৃপক্ষ প্রযোজ্য আইন ও কার্যপ্রণালী অনুসারে এবং সকল প্রাসঙ্গিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন যে, পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন ও আইনসম্মত অভিভাবকদের দিক থেকে শিশুর অবস্থান অনুযায়ী দত্তক অনুমোদনযোগ্য এবং আবশ্যক বিবেচনা করলে এ ব্যাপারেও নিশ্চিত হতে হবে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রয়োজনীয় পরামর্শের ভিত্তিতেই দত্তকের ব্যাপারে সুস্পষ্ট সম্মতি দিয়েছেন ;

খ) এটা অনুমোদন করবে যে, যদি শিশুকে পালক বা দত্তক হিসাবে কোনো পরিবারে স্থান করে দেয়া না যায় কিংবা শিশুর নিজস্ব দেশে যদি উপযোগী কোনো পন্থায় প্রতিপালনের ব্যবস্থা না করা যায় তাহলে তার পরিচর্যার বিকল্প উপায় হিসেবে আন্ত:দেশীয় দত্তকের কথা বিবেচিত হতে পারে ;

গ) এই বিষয় নিশ্চিত করবে যে, আন্ত:দেশীয় দত্তকের ক্ষেত্রে শিশুর জন্যে এমন রক্ষাব্যবস্থা ও মান বজায় রাখতে হবে যা জাতীয় পর্যায়ের দত্তকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য রক্ষাব্যবস্থা ও মানের অনুরূপ ;

ঘ) আন্ত:দেশীয় দত্তকের ক্ষেত্রে শিশুকে প্রদান যাতে সংশ্লিষ্টদের অবৈধ আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির নিমিত্ত না হয় তা নিশ্চিত করতে উপযুক্ত সকল পদক্ষেপ নেবে ;

ঙ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত লক্ষসমূহকে কার্যকর করতে দ্বিপক্ষীয় বা বহুপাক্ষিক সমঝোতা বা চুক্তি সম্পন্ন করবে এবং এই কাঠামোর মধ্যে এ কথা নিশ্চিত করতে উদ্যোগী হবে যে, অপর দেশে শিশুর স্থানান্তরের বিষয়টি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কিংবা সংস্থার দ্বারা পরিচালিত হবে।

ধারা—২২

(১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ এ বিষয় নিশ্চিত করতে যথাযথ কার্যব্যবস্থা নেবে যে, প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক কিংবা দেশীয় আইন ও কার্যপদ্ধতি অনুসারে কোনো শিশু যদি শরণার্থীর অবস্থান প্রার্থনা করে কিংবা শরণার্থী বিবেচিত হয়, তার সাথে পিতামাতা বা অন্য কোনো লোক থাকুক বা না থাকুক, ঐ শিশু এই সনদে এবং সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র সামিল রয়েছে এমন অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কিংবা জনহিতকর দলিলে বর্ণিত অধিকারসমূহ ভোগের ক্ষেত্রে উপযুক্ত সুরক্ষা ও মানবিক সহায়তা পাবে।

(২) ঐ ধরনের শিশুর সুরক্ষা ও সহায়তায় এবং কোনো শরণার্থী শিশুর পরিবারের সাথে পুনর্মিলনের জন্যে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহার্থে তার পিতামাতা কিংবা পরিবারের অন্য সদস্যদের খোঁজ পেতে জাতিসংঘের যে কোনো প্রয়াস এবং জাতিসংঘকে সহযোগিতাকারী অন্যান্য উপযুক্ত আন্ত:সরকারি সংস্থা বা বেসরকারি সংস্থাকে শরীক রাষ্ট্রসমূহ তাদের বিবেচনা অনুযায়ী যথাযথ সহযোগিতা প্রদান করবে। যে ক্ষেত্রে পিতামাতা কিংবা পরিবারের অপর সদস্যদের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে শিশুর জন্যে এরূপ সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হবে যা যে কোনো কারণে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে পারিবারিক পরিবেশ বঞ্চিত অন্য শিশুদের জন্যে এই সনদে নির্ধারিত হয়েছে।

www.pathagar.com

ধারা—২৩

(১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ স্বীকার করছে যে, মানসিক অথবা শারীরিকভাবে পংগু শিশু এমন পরিবেশে পরিপূর্ণ ও সুন্দর জীবনযাপন করবে যেখানে মর্যাদার নিশ্চয়তা থাকবে, আত্মনির্ভরতা বাড়বে এবং সমাজে শিশুর সক্রিয় অংশগ্রহণের পথ সুগম হবে।

(২) শরীক রাষ্ট্রসমূহ পংগু শিশুর বিশেষ যত্ন লাভের অধিকারকে স্বীকার করে এবং প্রাপ্ত সম্পদ অনুযায়ী, পংগু বলে গ্রহণযোগ্য শিশু ও তার পরিচর্যার দায়িত্বে নিয়োজিতদেরকে, আবেদনের ভিত্তিতে শিশুর পরিচর্যাকারী অন্যান্যদেরকে, পারিপার্শ্বিকতা অনুযায়ী যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদানকে উৎসাহিত ও নিশ্চিত করবে।

(৩) পংগু শিশুর বিশেষ প্রয়োজনের কথা স্বীকার করে এই ধারার অনুচ্ছেদ-২ মোতাবেক সহায়তা বিনামূল্যে প্রদান করতে হবে এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে পিতামাতা অথবা শিশুর পরিচর্যাকারী অন্যান্যদেরকে আর্থিক সংগতির বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে এবং সহায়তা এমনভাবে প্রদান করতে হবে যাতে পংগু শিশুর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থা, পুনর্বাসন পরিসেবা কর্মসংস্থানের প্রস্তুতি এবং বিনোদন লাভের ক্ষেত্রে কার্যকর সুযোগ থাকে এবং তা এমনভাবে লাভ করতে পারে যাতে শিশুর সাংস্কৃতিক এবং আত্মিক বিকাশসহ ব্যক্তিগত উন্নয়ন এবং তার সম্ভাব্য পুরোপুরি সমাজ সমন্বয় অর্জিত হয়।

(৪) শরীক রাষ্ট্রসমূহ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার চেতনায় প্রতিষেধক স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং পংগু শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও ক্রিয়ামূলক চিকিৎসাক্ষেত্রে যথাযথ তথ্যের বিনিময়কে উৎসাহিত করবে। এই তথ্য বিনিময়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে পুনর্বাসন, শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক সেবার পদ্ধতি সংক্রান্ত তথ্য প্রচার এবং সংগ্রহ। এর লক্ষ্য হবে এই সব বিষয়ে শরীক রাষ্ট্রসমূহের যোগ্যতা ও দক্ষতার উন্নয়ন এবং তাদের অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণ। এ প্রসঙ্গে উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রয়োজনের কথা বিশেষ বিবেচনায় থাকবে।

ধারা—২৪

(১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ শিশুর সর্বোচ্চ অর্জনযোগ্য মানের স্বাস্থ্য লাভ এবং ব্যাধির চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের সুবিধা ভোগের অধিকারকে স্বীকার করে। এ ধরনের স্বাস্থ্য পরিচর্যা সেবা প্রাপ্তির অধিকার থেকে কোনো শিশু যাতে বঞ্চিত না হয়, শরীক রাষ্ট্রসমূহ তা নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেবে।

(২) শরীক রাষ্ট্রসমূহ এই অধিকারের পূর্ণ বাস্তবায়নে উদ্যোগী হবে এবং বিশেষভাবে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেবে :

ক) নবজাত ও শিশুমৃত্যু হ্রাস করতে ;

খ) প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার উন্নয়নের উপর গুরুত্ব প্রদানসহ সকল শিশুর জন্যে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সহায়তা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রদানের ব্যবস্থাদি নিশ্চিত করতে ;

গ) প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কাঠামোর আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, সহজলভ্য প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে এবং পরিবেশগত দূষণের বিপদ ও ঝুঁকির কথা বিবেচনায় রেখে পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য ও পরিষ্কার খাবার পানির ব্যবস্থাসহ ব্যাধি ও অপুষ্টির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে ;

ঘ) মায়েদের জন্যে গর্ভকালীন এবং সন্তান প্রসবের পরবর্তী উপযুক্ত স্বাস্থ্য পরিচর্যা নিশ্চিত করতে ;

ঙ) শিশু-স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, মায়ের দুধ পানের সুফল, স্বাস্থ্য ও পরিবেশসম্মত পয়:নিষ্কাশন এবং দুর্ঘটনা নিরোধ সংক্রান্ত প্রাথমিক জ্ঞানের ব্যবহার সম্পর্কে সমাজের সকল অংশ, বিশেষভাবে পিতামাতা ও শিশুদের অবহিত, শিক্ষাপ্রাপ্ত ও সহায়তা লাভ নিশ্চিত করতে ;

চ) প্রতিষেধক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পিতামাতার করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা এবং পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত শিক্ষা ও সেবা উন্নত করতে ;

(৩) শরীক রাষ্ট্রসমূহ স্বাস্থ্যের জন্যে অনিষ্টকর চিরাচরিত সংস্কার বিলোপ করার লক্ষ্যে সকল কার্যকর ও উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে।

(৪) শরীক রাষ্ট্রসমূহ এই ধারায় স্বীকৃত অধিকার ক্রমোন্নয়নের ভিত্তিতে পূর্ণ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে জোরদার ও উৎসাহিত করতে প্রয়াসী হবে । এ প্রসঙ্গে উন্নয়নশীল দেশের প্রয়োজনের বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় নেয়া হবে।

www.pathagar.com

ধারা—২৫

শরীক রাষ্ট্রসমূহ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচর্যা, সুরক্ষা অথবা শারীরিক বা মানসিক চিকিৎসায় নিয়োজিত শিশুকে প্রদত্ত চিকিৎসা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল পারিপার্শ্বিকতা সময়ে সময়ে পর্যালোচনার প্রশ্নে শিশুর অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়।

ধারা—২৬

(১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ প্রতিটি শিশুর সামাজিক বীমাসহ সামাজিক নিরাপত্তা থেকে উপকৃত হবার অধিকারকে স্বীকার করে এবং নিজ নিজ জাতীয় আইনানুসারে এই অধিকারের পরিপূর্ণ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(২) এই সুবিধাদি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মঞ্জুর করার ব্যাপারে বিচার্য বিষয়সমূহ হলো, সম্পদের সংস্থান এবং শিশু ও শিশুর ভরণপোষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের অবস্থা। এ ছাড়া, শিশু কিংবা তার পক্ষ থেকে সুবিধাদি প্রাপ্তির জন্যে পেশকৃত দরখাস্তের সাথে সংগতিপূর্ণ অন্য কোনো বিবেচনা।

ধারা—২৭

(১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ প্রতিটি শিশুর শারীরিক, মানসিক, আত্মিক, নৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত জীবনমানের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়।

(২) পিতামাতা কিংবা শিশুর দায়িত্ব গ্রহণকারী অন্যান্যদের প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে, সামর্থ্য ও আর্থিক সংগতি অনুযায়ী শিশুর উন্নয়নের জন্যে উপযোগী জীবনমান নিশ্চিত করা।

(৩) শরীক রাষ্ট্রসমূহ জাতীয় পরিস্থিতি অনুসারে এবং তাদের সামর্থ্যানুযায়ী এই অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পিতামাতাকে কিংবা শিশুর দায়িত্বে নিয়োজিত অন্যদেরকে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত উপকরণ সাহায্য এবং সহায়তা কর্মসূচির ব্যবস্থা করবে, বিশেষভাবে পুষ্টি, পোশাক ও গৃহায়নের ক্ষেত্রে।

(৪) শরীক রাষ্ট্রসমূহ দেশের অভ্যন্তরে এবং বাইরে, উভয় ক্ষেত্রে, শিশুর পিতামাতা কিংবা শিশুর অর্থনৈতিক দায়িত্বে নিয়োজিত অন্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে শিশুর খোরপোষ আদায় নিশ্চিত করতে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বিশেষভাবে, যে ক্ষেত্রে শিশুর অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি শিশুর থেকে পৃথক কোনো দেশে বসবাস করে, সে ক্ষেত্রে শরীক রাষ্ট্রসমূহ এতদসম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তিতে সামিল হবে কিংবা এ জাতীয় চুক্তি সম্পাদনে উৎসাহ যোগাবে, একই সাথে অন্যান্য উপযোগী ব্যবস্থাদিও গ্রহণ করবে।

ধারা—২৮

(১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ শিশুর শিক্ষালাভের অধিকারকে স্বীকার করে এবং এই অধিকার প্রগতিশীলভাবে এবং সমান-সুযোগের ভিত্তিতে অর্জনের লক্ষ্যে তারা, বিশেষভাবে :

ক) সকলের জন্যে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও বিনা খরচে লাভের সুযোগ করে দেবে ;

খ) সাধারণ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাসহ মাধ্যমিক শিক্ষাকে বহুমুখী করে গড়ে তোলার বিষয়ে উৎসাহ দেবে এবং প্রতিটি শিশুর জন্যে এই শিক্ষার সুযোগ করে দেয়া এবং বিনা খরচে শিক্ষা লাভ ও প্রয়োজনে আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তনের মতো উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহ দেবে ;

গ) সকল উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে যোগ্যতার ভিত্তিতে উচ্চ শিক্ষার দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত করবে ;

ঘ) শিক্ষাগত ও বৃত্তিমূলক তথ্য এবং দিক নির্দেশনা সকল শিশুর জন্যে লভ্য ও প্রাপ্য করবে ;

ঙ) বিদ্যালয়ে নিয়মিত হাজিরাকে উৎসাহিত করতে এবং স্কুল ত্যাগের হার কমাতে পদক্ষেপ নেবে।

(২) শরীক রাষ্ট্রসমূহ বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বিধানের রীতি যাতে শিশুদের মানবিক মর্যাদা এবং এই সনদের সাথে সংগতিপূর্ণ হয় তা নিশ্চিত করতে উপযুক্ত সকল ব্যবস্থা নেবে।

(৩) শরীক রাষ্ট্রসমূহ শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত বিষয়সমূহে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে জোরদার এবং উৎসাহিত করবে, এ ক্ষেত্রে বিশ্বে বিরাজমান অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে সহায়তা দান এবং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি জ্ঞান ও আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতি আয়ত্বে আনার পথ সুগম করার দিকে বিশেষ লক্ষ্য থাকবে। এ প্রসঙ্গে উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রয়োজনের ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।

www.pathagar.com

ধারা—২৯

(১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ এ ব্যাপারে সম্মত যে, শিশুদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে লক্ষ্য থাকবে :

ক) শিশুর ব্যক্তিত্ব, মেধা এবং মানসিক ও শারীরিক সামর্থ্যের পরিপূর্ণ বিকাশ ;

খ) মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার এবং জাতিসংঘ ঘোষণায় বর্ণিত নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ ;

গ) শিশুর পিতামাতা, তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক সত্তা, ভাষা ও মূল্যবোধ, শিশু যে দেশে বাস করে সেখানকার জাতীয় মূল্যবোধ, তার মাতৃভূমি এবং অপরাপর সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ ;

ঘ) সমঝোতা, শান্তি, সহিষ্ণুতা, নারী–পুরুষের সমানাধিকার এবং সকল মানুষ, নৃগোষ্ঠী, জাতীয় ও ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং আদিবাসী লোকজনের মধ্যে মৈত্রীর চেতনার আলোকে একটি মুক্তসমাজে দায়িত্বশীল জীবনের জন্যে শিশুর প্রস্তুতি ;

ঙ) প্রাকৃতি পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ ;

(২) এই ধারা কিংবা ধারা ২৮–এর কোনো অংশই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং পরিচালনার ব্যাপারে ব্যক্তি বা সংস্থার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না যদি সব সময় এই ধারার অনুচ্ছেদ-১–এ বর্ণিত নীতিমালা অনুসৃত হয় এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রদত্ত শিক্ষা রাষ্ট্র নির্দেশিত ন্যূনতম মানের সাথে সংগতিপূর্ণ থাকে।

ধারা—৩০

যে সব দেশে জাতি গোষ্ঠীগত, ধর্মীয় কিংবা ভাষাগত সংখ্যালঘু কিংবা আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোক রয়েছে, সে দেশে ঐ ধরনের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত বা আদিবাসী শিশুকে সমাজে তার সম্প্রদায়ের অপরাপর সদস্যের সাথে, তার নিজস্ব সংস্কৃতি ধারণ, নিজস্ব ধর্মের কথা ব্যক্ত করা ও চর্চা করা, কিংবা তার নিজ ভাষা ব্যবহার করার অধিকার ভোগ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

ধারা—৩১

(১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ শিশুর বিশ্রাম ও অবকাশ যাপন, বয়স অনুযায়ী উপযুক্ত খেলাধুলা ও বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ এবং সাংস্কৃতিক জীবন ও সুকুমার শিল্পে অবাধে অংশগ্রহণের অধিকার স্বীকার করে।

(২) শরীক রাষ্ট্রসমূহ সংস্কৃতি ও শিল্প সংক্রান্ত জীবনে শিশুর পরিপূর্ণ অংশগ্রহণের অধিকারকে সম্মান দেবে ও জোরদার করবে এবং সংস্কৃতি, সুকুমার শিল্প, বিনোদন ও অবকাশমূলক কার্যক্রমে যথাযথ ও সমান সুযোগ থাকার ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করবে।

ধারা—৩২

(১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ অর্থনৈতিক শোষণ থেকে শিশুর অধিকারকে রক্ষা করবে এবং শিশুকে যাতে বিপদাশংকাপূর্ণ ও শিশুর শিক্ষায় ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী কিংবা তার স্বাস্থ্য অথবা শারীরিক, মানসিক, আত্মিক, নৈতিক বা সামাজিক বিকাশের জন্যে ক্ষতিকর কাজ করানো না হয় সে ব্যবস্থা নেবে।

(২) শরীক রাষ্ট্রসমূহ এই ধারার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে আইনগত, প্রশাসনিক, সামাজিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত পদক্ষেপ নেবে। এই উদ্দেশ্যে এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিলের প্রাসঙ্গিক ধারাসমূহের প্রতি লক্ষ্য রেখে শরীক রাষ্ট্রসমূহ বিশেষভাবে :

ক) কর্মে নিয়োগের ব্যাপারে ন্যূনতম বয়সসীমা নির্ধারণ করবে ;

খ) কর্মস্থলে কর্মঘণ্টা এবং কাজের পরিবেশ সম্পর্কে উপযুক্ত নিয়ম–নীতি ঠিক করে দেবে;

গ) এই অনুচ্ছেদ কার্যকরভাবে প্রয়োগ নিশ্চিত করতে উপযুক্ত শাস্তি বা অন্যান্য বিধি–নিষেধের ব্যবস্থা রাখবে।

ধারা—৩৩

শরীক রাষ্ট্রসমূহ প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক চুক্তির বর্ণনা অনুযায়ী শিশুদের মাদক ও মনস্প্রভাবী দ্রব্যের অবৈধ সেবন থেকে রক্ষা করবে এবং এই ধরনের বস্তুর অবৈধ উৎপাদন ও চোরাচালানের কাজে শিশুদের নিয়োজিত করা থেকে বিরত রাখার সকল প্রকার যথোপযুক্ত আইনানুগ, প্রশাসনিক, সামাজিক এবং শিক্ষাভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

www.pathagar.com

ধারা—৩৪

শরীক রাষ্ট্রসমূহ সকল প্রকারের যৌন অপব্যবহার ও যৌন উৎপীড়ন থেকে শিশুর সুরক্ষায় সচেষ্ট হবে। এই উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ রোধ করতে শরীক রাষ্ট্রগুলো জাতীয়, দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপক্ষীয় সকল উপযোগী কার্যব্যবস্থা নেবে :

ক)কোনো বেআইনী যৌন ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত হতে শিশুকে প্ররোচিত কিংবা বাধ্য করা ;

খ) পতিতাবৃত্তি কিংবা অন্যান্য বেআইনী যৌন তৎপরতায় শিশুদেরকে অপব্যবহার করা ;

গ) যৌন অশ্লীলতাপূর্ণ কোনো ক্রিয়াকর্ম বা বিষয়বস্তুতে শিশুদেরকে অপব্যবহার করা।

ধারা—৩৫

শরীক রাষ্ট্রসমূহ যে কোনো উদ্দেশ্যে বা যে কোনো ধরনের শিশু অপহরণ, বিক্রি বা পাচার রোধে জাতীয়, দ্বিপাক্ষিক ও বহুপক্ষীয় সকল উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবে।

ধারা—৩৬

শরীক রাষ্ট্রসমূহ শিশুর কল্যাণে যে কোনো দিক থেকে অনিষ্টকর অন্যান্য সব ধরনের শোষণের বিরুদ্ধে শিশুদেরকে সুরক্ষা করবে।

ধারা—৩৭

শরীক রাষ্ট্রসমূহ নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত করবে :

ক) কোনো শিশুই নির্যাতন কিংবা অন্যবিধ নৃশংস, অমানবিক বা মর্যাদাহানিকর কোনো আচরণ বা শাস্তির শিকার হবে না। ১৮ বছরের কম বয়স্ক কোনো অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড অথবা মুক্তির সম্ভাবনাহীন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করা হবে না।

খ) বেআইনী কিংবা স্বেচ্ছাচারিতামূলকভাবে কোনো শিশুকেই তার মুক্তজীবন থেকে বঞ্চিত করা হবে না। কোনো শিশুর গ্রেফতার, আটকাদেশ বা কারাদণ্ড আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে এবং এই সকল পদক্ষেপ শুধুমাত্র সর্বশেষ উপায় হিসাবে এবং সবচাইতে সংক্ষিপ্ততম উপযুক্ত সময়ের জন্যে গৃহীত হবে।

গ) মুক্তজীবন-বঞ্চিত প্রতিটি শিশুর সঙ্গে মানবিক এবং মানুষের সহজাত মর্যাদার প্রতি সম্মান রেখে এবং তার বয়সানুপাতিক প্রয়োজনাবলীর দিকে লক্ষ্য রেখে আচরণ করা হবে। বিশেষ করে, মুক্ত-জীবন বঞ্চিত প্রতিটি শিশুকে পূর্ণবয়স্কদের থেকে পৃথক রাখা হবে, যতক্ষণ তা শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থের পরিপন্থী না হয় এবং পত্রালাপ ও সাক্ষাতের মাধ্যমে পরিবারের সাথে কেবলমাত্র অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ব্যতীত যোগাযোগ অব্যাহত রাখার অধিকার শিশুর থাকবে।

ঘ) মুক্তজীবন-বঞ্চিত প্রতিটি শিশুর দ্রুততার সাথে আইনগত ও অন্যান্য উপযুক্ত সহায়তা লাভের এবং সেই সাথে মুক্ত জীবন থেকে তাকে বঞ্চিত করার আইনগত বৈধতাকে আদালতে কিংবা অন্যান্য উপযুক্ত, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষের সামনে চ্যালেঞ্জ করার এবং ঐ ধরনের যে কোনো কার্যব্যবস্থা সম্পর্কে ত্বরিত সিদ্ধান্ত লাভের অধিকার থাকবে ।

ধারা—৩৮

(১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ সশস্ত্র সংঘাতকালীন সময়ে তাদের জন্যে প্রযোজ্য এবং শিশুদের ব্যাপারে প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিকতা মানবতা আইনের বিধিবিধানসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে এবং এগুলোর পরিপালন নিশ্চিত করতে অঙ্গীকার করছে।

(২) শরীক রাষ্ট্রসমূহ ১৫ বছরের কম বয়সী কেউ যাতে সরাসরি কোনো সংঘাতে না জড়ায় তা নিশ্চিত করতে সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ নেবে।

(৩) শরীক রাষ্ট্রসমূহ তাদের সশস্ত্র বাহিনীতে ১৫ বছরের কম বয়স্কদের অন্তর্ভুক্ত করা থেকে বিরত থাকবে। যাদের বয়স ১৫ হয়েছে কিন্তু ১৮ বছরের কম তাদেরকে সেনাদলে ভর্তির সময় শরীক রাষ্ট্রসমূহ অপেক্ষাকৃত বেশি বয়স্কদের অগ্রাধিকার প্রদানের চেষ্টা করবে।

(৪) সশস্ত্র সংঘাতকালীন বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার বিষয়ে আন্তর্জাতিক মানবতা আইনের বাধ্যবাধকতা অনুসারে শরীক রাষ্ট্রসমূহ যুদ্ধকবলিত শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ফলপ্রসূ সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

www.pathagar.com

ধারা—৩৯

(১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ যে কোনো ধরনের অবহেলা, শোষণ বা দুর্ব্যবহার, নির্যাতন বা অন্য কোনো ধরনের নৃশংস, অমানবিক বা অমর্যাদাকর আচরণ বা শাস্তি, কিংবা সশস্ত্র সংঘাতের শিকার শিশুদের শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক সুস্থতা এবং সামাজিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত করতে উপযোগী সকল কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই সুস্থতা এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠা এমন এক পরিবেশে হবে যা শিশুর স্বাস্থ্য, আত্মসম্মান এবং মর্যাদাকে পুষ্ট করবে।

ধারা—৪০

(১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ ফৌজদারী আইন লংঘনকারী হিসাবে কথিত, অভিযুক্ত কিংবা চিহ্নিত প্রতিটি শিশুর এই অধিকারের স্বীকৃতি দেয় যে, তার সাথে এমন আচরণ করা হবে যা শিশুর আত্মসম্মান ও স্বকীয়তাবোধ বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যার ফলে মানবাধিকার ও অপরের মৌলিক অধিকারসমূহের প্রতি শিশুর শ্রদ্ধাবোধ জোরদার হবে এবং এ ক্ষেত্রে শিশুর বয়স বিবেচনায় রেখে সমাজে তার পুনর্বাসন ও গঠনমূলক ভূমিকা পালনের আকাঙ্ক্ষাকে উৎসাহিত করতে হবে।

(২) এ উদ্দেশ্যে এবং আন্তর্জাতিক দলিলসমূহের প্রাসঙ্গিক ধারাগুলোর প্রতি সম্মান রেখে শরীক রাষ্ট্রসমূহ বিশেষভাবে নিশ্চিত করবে যে :

ক) কোনো কাজ করা বা না করার কারণে কোনো শিশুই ফৌজদারী আইনভঙ্গকারী হিসাবে কথিত, অভিযুক্ত বা চিহ্নিত হবে না, যে কাজ করা বা না করার সময়ে জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক আইনে তা নিষিদ্ধ ছিল না ;

খ) ফৌজদারী আইনভঙ্গকারী হিসাবে কথিত কিংবা অভিযুক্ত প্রতিটি শিশুর ন্যূনপক্ষে নিশ্চয়তা থাকবে যে :

১. আইনানুসারে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ হিসাবে বিবেচিত হবে ;

২. শিশুকে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ দ্রুত এবং সরাসরি অবহিত করতে হবে এবং যথাযথ ক্ষেত্রে পিতামাতা কিংবা আইনসম্মত অভিভাবকের মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রস্তুতি ও তা তুলে ধরার জন্য আইনগত ও অন্যান্য উপযুক্ত সহায়তা দিতে হবে ;

৩. শিশুকে আইনগত ও যথাযথ সহায়তা প্রদানপূর্বক কালক্ষেপন ব্যতিরেকে উপযুক্ত, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষ কিংবা বিচার সংস্থায় আইনানুসারে সুষ্ঠু শুনানীর মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রস্তুতি ও তা তুলে ধরার জন্য আইনগত ও অন্যান্য উপযুক্ত সহায়তা দিতে হবে ;

৩. শিশুকে আইনগত ও যথাযথ সহায়তা প্রদানপূর্বক কালক্ষেপণ ব্যতিরেকে উপযুক্ত, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষ কিংবা বিচার সংস্থায় আইনানুসারে সুষ্ঠু শুনানীর মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে হবে এবং শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থের পরিপন্থী না হলে, এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে শিশুর বয়স ও পারিপার্শ্বিকতা, পিতামাতা অথবা আইনসম্মত অভিভাবকের কথা বিবেচনায় রাখতে হবে ;

৪. প্রমাণাদি পেশ বা অপরাধ স্বীকার, প্রতিপক্ষ সাক্ষীদের জেরা করা বা তাদের জেরার জবাব দান এবং সমতার শর্তে তার পক্ষে সাক্ষী হাজির করা ও সেই সাক্ষীদের সওয়াল-জওয়াব করার ব্যাপারে বাধ্য করা যাবে না ;

৫. ফৌজদারী আইন লংঘন করেছে বলে বিবেচিত হলে এবং তার পরিণতিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং কোনো কার্যব্যবস্থা আরোপিত হলে তা উচ্চতর কোনো উপযুক্ত, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষ কিংবা বিচার সংস্থায় আইনানুসারে পুনর্বিবেচিত হতে হবে ;

৬. ব্যবহৃত ভাষা শিশু বুঝতে বা বলতে না পারলে বিনা ব্যয়ে একজন দোভাষীর সহায়তা পাবে ;

৭. বিচার প্রক্রিয়ার সর্বস্তরে তার একান্ত গোপনীয়তার প্রতি পূর্ণ সম্মান দিতে হবে।

(৩) শরীক রাষ্ট্রসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে ফৌজদারী আইনভঙ্গকারী হিসাবে কথিত, অভিযুক্ত কিংবা চিহ্নিত শিশুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন এবং প্রশাসনিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান স্থাপনকে উৎসাহিত করবে এবং বিশেষভাবে :

ক) এমন একটি ন্যূনতম বয়সসীমা নির্ধারণ করবে, যার নিচের বয়সী শিশু ফৌজদারী আইন লংঘনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না ;

www.pathagar.com

খ) এই ধরনের শিশুর বেলায় কখনো বিচার বিভাগীয় প্রক্রিয়া বাদ দিয়ে অন্য কোনো উপযোগী এবং বাঞ্ছনীয় পদ্ধতি অবলম্বিত হলে অবশ্যই মানবাধিকার এবং আইনগত রক্ষাব্যবস্থার প্রতি পুরোপুরি মর্যাদা দিতে হবে।

(৪) শিশুর জন্য বিভিন্ন ধরনের বন্দোবস্ত, যেমন তত্ত্বাবধান, নির্দেশনা ও তদারকী, উপদেশ প্রদান, শিক্ষানবিসী, লালন-পালন সিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের কর্মসূচি এবং প্রাতিষ্ঠানিক তত্ত্বাবধানের অন্যান্য বিকল্প লভ্য হতে হবে যাতে এ বিষয় নিশ্চিত হয় যে, শিশুর সাথে কৃত আচরণরীতি তার কল্যাণের জন্য উপযোগী এবং পারিপার্শ্বিকতা ও অপরাধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

ধারা—৪১

এই সনদের কোনো কিছুই সেই সব বিধি ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না, যা শিশু অধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অধিকতর অনুকূল এবং যা রয়েছে :

ক) শরীক রাষ্ট্রের আইনে ; কিংবা

খ) ঐ রাষ্ট্রের জন্যে প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক আইনে।

পরিচ্ছেদ ২

ধারা—৪২

শরীক রাষ্ট্রসমূহ যথাযথ এবং কার্যকর পন্থায় এই সনদের নীতিমালা ও বিধিব্যবস্থাসমূহকে বয়স্ক ও শিশুর প্রতি সমান গুরুত্ব দিয়ে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে উদ্যোগী হবে।

ধারা—৪৩

(১) এই সনদে বর্ণিত দায়দায়িত্বসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরীক্ষার্থে শিশু অধিকার বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে, যে কমিটি অতঃপর প্রদত্ত কর্মকাণ্ড সম্পাদন করবে।

(২) এই কমিটিতে থাকবে উচ্চ নৈতিকতামানসম্পন্ন এবং এই সনদের আওতাধীন ক্ষেত্রে স্বীকৃত যোগ্যতাসম্পন্ন দশজন বিশেষজ্ঞ। শরীক রাষ্ট্রসমূহের নাগরিকদের মধ্য থেকে কমিটির সদস্য নির্বাচিত হবে এবং তারা ব্যক্তিগত যোগ্যতাবলে দায়িত্ব পালন করবেন, এ ক্ষেত্রে সুষম ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্ব এবং মুখ্য আইনগত কাঠামোসমূহ বিবেচনায় নিতে হবে।

(৩) শরীক রাষ্ট্রসমূহের মনোনয়নপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের তালিকা থেকে গোপন ব্যালটে কমিটি সদস্যরা নির্বাচিত হবেন। প্রতিটি শরীক রাষ্ট্র তার নাগরিকদের মধ্য থেকে একজনকেই মনোনয়ন দেবে।

(৪) কমিটির প্রারম্ভিক নির্বাচন এই সনদ কার্যকর হবার ছয় মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে এবং পরবর্তীতে প্রতি দ্বিতীয় বছরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি নির্বাচনের অন্তত চার মাস আগে জাতিসংঘের মহাসচিব শরীক রাষ্ট্রসমূহকে দুই মাসের মধ্যে তাদের মনোনয়ন পেশের আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র দেবেন। এরপর মহাসচিব মনোনয়নপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা কে কোন রাষ্ট্রকর্তৃক মনোনীত তার উল্লেখ সহকারে উক্ত ব্যক্তিদের নামের বর্ণক্রমানুসারে একটি তালিকা তৈরি করে এই সনদের শরীক রাষ্ট্রসমূহের বরাবরে পেশ করবেন।

(৫) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে জাতিসংঘ সদর দফতরে, মহাসচিব আহূত শরীক রাষ্ট্রসমূহের বৈঠকে। এই বৈঠকে দুই-তৃতীয়াংশ শরীক রাষ্ট্রের উপস্থিতি কোরাম হিসাবে বিবেচিত হবে এবং কমিটির সদস্য হিসাবে তারাই নির্বাচিত হবেন যারা উপস্থিত ও ভোটদানকারী শরীক রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিদের সর্বাধিক ভোট এবং নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট লাভ করবেন।

(৬) কমিটি সদস্যগণ চার বছর মেয়াদে নির্বাচিত হবেন। মনোনয়ন পেলে তাঁরা পুনর্নির্বাচিত হবার যোগ্য বিবেচিত হবেন। প্রথমবারের নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যকার পাঁচজন সদস্যের মেয়াদ প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর দুই বছরের শেষে উত্তীর্ণ হবে। এই পাঁচজন সদস্যের নাম সভার সভাপতি কর্তৃক লটারীর মাধ্যমে ঠিক হবে।

www.pathagar.com

(৭) কমিটির কোনো সদস্যের মৃত্যু, পদত্যাগ কিংবা অন্য যে কোনে কারণে তিনি কমিটির দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করলে শূন্যপদে ঐ সদস্যের মনোনয়নদানকারী শরীক রাষ্ট্র তার নাগরিকদের মধ্য থেকে আরেকজন বিশেষজ্ঞ মনোনীত করবেন এবং তিনি কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে বাদবাকী মেয়াদের জন্য দায়িত্ব পালন করবেন।

(৮) কমিটি তার নিজস্ব কার্যপ্রণালী বিধি প্রণয়ন করবে।

(৯) কমিটি দুই বছর মেয়াদে তার কর্মকর্তাদের নির্বাচিত করবে।

(১০) কমিটির বৈঠক সাধারণত জাতিসংঘ সদর দফতরে কিংবা কমিটি নির্ধারিত অন্য কোনো সুবিধাজনক স্থানে অনুষ্ঠিত হবে। কমিটির সভা হবে সাধারণত বছরে একবার। কমিটির বৈঠকগুলির স্থায়িত্ব নির্ধারণ এবং প্রয়োজনবোধে তা পুনর্বিবেচনা করা হবে এই সনদের শরীক রাষ্ট্রগুলোর বৈঠকে, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে।

(১২) সাধারণ পরিষদের অনুমোদনক্রমে এই সনদের আওতায় প্রতিষ্ঠিত কমিটির সদস্যগণ সাধারণ পরিষদ নির্ধারিত শর্তানুযায়ী জাতিসংঘের সংস্থান থেকে বেতন-ভাতা গ্রহণ করবেন।

ধারা—৪৪

(১) শরীক রাষ্ট্রসমূহ জাতিসংঘ মহাসচিবের মারফত কমিটির কাছে অত্র সনদে স্বীকৃতি অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে তাদের গৃহীত ব্যবস্থা এবং সেই সব অধিকার বিষয়ে অগ্রগতির ব্যাপারে প্রতিবেদন পেশের অঙ্গীকার করছে :

ক) সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের এই সনদে অন্তর্ভুক্তির দুই বছরের মধ্যে ;

খ) এরপর থেকে প্রতি পাঁচ বছরে।

(২) এই ধারার অধীনে প্রণীত প্রতিবেদনে এই সনদের আওতাধীন বাধ্যবাধকতাসমূহ পরিপূরণের ক্ষেত্রে যাবতীয় প্রয়োজনীয় উপাদান এবং অসুবিধা, যদি থাকে, তার উল্লেখ থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট দেশে সনদ বাস্তবায়ন সম্পর্কে কমিটিকে একটি ব্যাপক ধারণা দেয়ার জন্য প্রতিবেদনে পর্যাপ্ত তথ্যের সন্নিবেশও থাকতে হবে।

(৩) যে শরীক রাষ্ট্র কমিটির নিকট ব্যাপক প্রাথমিক প্রতিবেদন পেশ করেছে, তাকে এই ধারার অনুচ্ছেদ-১(খ) অনুযায়ী পেশকৃত পরবর্তী প্রতিবেদনসমূহে পূর্বে প্রদত্ত মৌলিক তথ্যাদির পুনরুল্লেখ করতে হবে না।

(৪) কমিটি শরীক রাষ্ট্রসমূহের নিকট সনদ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আরো তথ্যের অনুরোধ জানাতে পারে।

(৫) কমিটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের মাধ্যমে সাধারণ পরিষদের নিকট প্রতি দু'বছরে তার কর্মতৎপরতার উপর প্রতিবেদন পেশ করবে।

(৬) শরীক রাষ্ট্রসমূহ তাদের প্রতিবেদনসমূহ নিজ নিজ দেশের জনসাধারণকে ব্যাপক অবহিত করার ব্যবস্থা নেবে।

ধারা—৪৫

এই সনদের কার্যকর বাস্তবায়নকে উৎসাহিত করতে এবং এই সনদের আওতাধীন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করতে :

ক) এই সনদের সেইসব বিধিব্যবস্থা বাস্তবায়নের ব্যাপারে বিশেষায়িত সংস্থা, জাতিসংঘ শিশু তহবিল এবং জাতিসংঘের অপরাপর প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার হিসাবে বিবেচিত হবে, যে সকল বিধিব্যবস্থা উল্লেখিত সংগঠনসমূহের নিজস্ব দায়িত্বের আওতাভুক্ত। এই সনদের সেইসব বিষয় বাস্তবায়নের ব্যাপারে কমিটি প্রয়োজনবোধে বিশেষায়িত সংস্থা, জাতিসংঘ শিশু তহবিল এবং অন্যান্য উপযোগী সংস্থার কাছ থেকে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ আহবান করতে পারে, যে সকল ক্ষেত্র ঐ সব সংস্থার নিজস্ব দায়িত্বের আওতাভুক্ত। বিশেষায়িত সংস্থা, জাতিসংঘ শিশু তহবিল এবং জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থার কাছ থেকে কমিটি এই সনদের সেইসব ক্ষেত্র বাস্তবায়নের উপর প্রতিবেদন দাখিলের আহ্বান জানাতে পারে, যেগুলো ঐ সব সংস্থার তৎপরতার আওতায় পড়ে ;

www.pathagar.com

খ) শরীক রাষ্ট্রগুলোর কোনো প্রতিবেদন যদি কারিগরি পরামর্শ কিংবা সহায়তার জন্যে কোনো অনুরোধ, কিংবা প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ থাকে তাহলে উক্ত অনুরোধ কিংবা চাহিদা সম্পর্কে কমিটি তার মন্তব্য এবং পরামর্শ (যদি থাকে) উল্লেখপূর্বক প্রতিবেদনটি বিশেষায়িত সংস্থা, জাতিসংগ শিশু তহবিল এবং অন্যান্য উপযুক্ত সংস্থার কাছে পাঠিয়ে দেবে ;

গ) কমিটি তার পক্ষ থেকে শিশু অধিকারের সাথে সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট প্রসঙ্গসমূহ পর্যালোচনার জন্যে মহাসচিবকে অনুরোধ জানাতে সাধারণ পরিষদের কাছে সুপারিশ করতে পারে ;

ঘ) বর্তমান সনদের ৪৪ এবং ৪৫ ধারার আওতায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কমিটি প্রস্তাবাবলী ও সাধারণ সুপারিশমালা প্রণয়ন করতে পারে। এ ধরনের প্রস্তাব ও সাধারণ সুপারিশ সংশ্লিষ্ট শরীক রাষ্ট্রসমূহের কাছে পাঠানো হবে এবং শরীক রাষ্ট্রগুলোর তরফ থেকে কোনো মন্তব্য থাকলে তা সহ সাধারণ পরিষদে পেশ করা হবে।

পরিচ্ছেদ ৩

ধারা—৪৬

এই সনদ সকল রাষ্ট্রের স্বাক্ষরের জন্যে উন্মুক্ত থাকবে।

ধারা—৪৭

এই সনদ অনুমোদন সাপেক্ষ। অনুমোদনের দলিল জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে জমা থাকবে।

ধারা—৪৮

এই সনদে যে কোনো রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হবার পথ খোলা থাকবে। এই অন্তর্ভুক্তির দলিলাদি জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে জমা থাকবে।

ধারা—৪৯

(১) জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে অনুমোদন বা অন্তর্ভুক্তির বিংশতিতম দলিল জমা হওয়ার পরবর্তী ত্রিশতম দিনে এই সনদ কার্যকর হবে।

(২) অনুমোদন অথবা অন্তর্ভুক্তির বিংশতিতম দলিল জমা দেয়ার পর সনদ অনুমোদন অথবা সনদে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্রে ঐ রাষ্ট্রকর্তৃক তার অনুমোদন অথবা অন্তর্ভূক্তি সংক্রান্ত দলিল জমা দেয়ার পরবর্তী ত্রিশতম দিবসে এই সনদ কার্যকর হবে।

ধারা—৫০

(১) যে কোনো শরীক রাষ্ট্র কোনো সংশোধনীর প্রস্তাব করতে পারবে এবং তা জাতিসংঘ মহাসচিবের নিকট পেশ করতে হবে। অতঃপর মহাসচিব প্রস্তাবিত সংশোধনী শরীক রাষ্ট্রসমূহকে অবহিত করবেন, সেই সাথে প্রস্তাবের উপর আলোচনা এবং ভোট গ্রহণের উদ্দেশ্যে শরীক রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলন অনুষ্ঠানে তারা পক্ষপাতি কিনা তা উল্লেখ করার অনুরোধ জানাবেন। এই যোগাযোগের তারিখ থেকে চার মাসের মধ্যে কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ শরীক রাষ্ট্র এ ধরনের সম্মেলনের পক্ষপাতি হলে মহাসচিব জাতিসংঘের আয়োজনে সম্মেলন আহ্বান করবেন। সম্মেলনে গরিষ্ঠসংখ্যক শরীক রাষ্ট্রের উপস্থিতি এবং ভোটের মাধ্যমে যে কোনো সংশোধনী গৃহীত হলে তা অনুমোদনের জন্য সাধারণ পরিষদে পেশ করতে হবে।

(২) এই ধারার অনুচ্ছেদ -১ মোতাবেক গৃহীত কোনো সংশোধনী কার্যকর হবে যখন তা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত এবং দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠ শরীক রাষ্ট্র কর্তৃক সমর্থিত হবে।

(৩) যখন কোনো সংশোধনী কার্যকর হবে, তা ঐ সকল শরীক রাষ্ট্রকে বাধ্যবাধকতাধীন করবে যারা তা গ্রহণ করেছে, অন্যান্য শরীক রাষ্ট্রসমূহের ক্ষেত্রে এই সনদের শর্তাবলী এবং তাদের দ্বারা গৃহীত যে কোনো পূর্বতন সংশোধনী বাধ্যবাধকতাধীন হবে।

www.pathagar.com

ধারা—৫১

(১) অনুমোদন কিংবা অন্তর্ভুক্তির সময় রাষ্ট্রসমূহের উত্থাপিত কোনো আপত্তির বিষয়বস্তু জাতিসংঘ মহাসচিব গ্রহণ করবেন এবং তা সকল রাষ্ট্রকে অবহিত করবেন।

(২) এই সনদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিহীন কোনো আপত্তি গ্রাহ্য করা হবে না।

(৩) জাতিসংঘ মহাসচিব বরাবরে নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে যে কোনো সময় আপত্তি প্রত্যাহার করা যাবে। মহাসচিব অতঃপর তা সকল রাষ্ট্রকে জানাবেন। মহাসচিব যেদিন নোটিশটি পাবেন সেদিন থেকে তা কার্যকর হবে।

ধারা—৫২

জাতিসংঘ মহাসচিবকে লিখিত নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে কোনো শরীক রাষ্ট্র এই সনদ বর্জন করতে পারে। মহাসচিব কর্তৃক নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে এক বছর পর এই বর্জন কার্যকর হবে।

ধারা—৫৩

জাতিসংঘ মহাসচিব এই সনদের সংরক্ষকের দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা—৫৪

এই সনদের মূল কপি, যার আরবি, চিনা, ইংরেজি, ফরাসি, রুশ ও স্পেনীয় সংস্করণ সমান মানসম্পন্ন—জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে সংরক্ষিত থাকবে।

www.pathagar.com

মানবাধিকার ভাষ্য

গাজী শামছুর রহমান